প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৩শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

১৩৩৯

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ—আশ্বিন

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৩৯

বিষয়-সূচী

অগ্রদূত (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১
অটোয়া কন্‌ফারেন্স ও ভারতবর্ষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫৯
অনামী (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৬৩৫
অনিলকুমার দাসের মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯২
অবনত শ্রেণী কাহারা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৪
অরণ্য-কাণ্ড (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু ... ২৯
অর্ডিন্যান্সের পুনর্জন্ম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪২৮
অর্পণ (কবিতা)—শ্রীঅনিলবরণ রায় ... ৭৪৯
অসময়ে (কবিতা)—শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ... ৫১৬
"অসমাপ্ত"—শ্রীযুগলকিশোর সরকার ... ৪৯৬
অহিন্দু "অবনত" শ্রেণী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৫
আজব রোগ (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪১
আগাখানি আবদারের একটা ওজুহাত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৯১
আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরস (কষ্টি) ... ৬৬৬
আপনারা অবশ্যই অস্পৃশ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৭
আবার রাজকর্ম্মচারী হত্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৮৫
আমারে বেসেছি ভাল (কবিতা)—শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৮৪৯
আর্ম্‌ষ্ট্রঙের যুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯৫
আলবেয়ার টোমা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৩
"আল্লবৎ হাম গদ্‌হা" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৬
আয়ার্ল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯১
আলোচনা ১২২, ২৫২, ৩৬২, ৫৩৯, ৮৩০
ইংরেজদের মাতৃভাষা-বিকৃতি অসহিষ্ণুতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৬
ইরা (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ... ৬১৮
উড়িষ্যা ও ভারতবর্ষ—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৪৬৩
...ন্দ্র ও অনুন্মত্ত হাতীর উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৪
...র শোচনীয় মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪৬
...র্গ অর্থ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৯১
...)—শ্রীরামানন্দ ... ৪০৬
... (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৬
... বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৮৭
... ... ৮৪৬

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২০
কলিকাতার পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৯৬
কষ্টিপাথর ৮৯, ২৩৮, ৪০৬, ৫১৭, ৬৬৪, ৮৪৪
কামরূপ রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ... ৬১
কালো মেয়ে (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬৮২
কুমার (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩
কোরাণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
ক্যাথেরিন্ মেয়োর দোসর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৩
ক্যাথেরিন মেয়োর ভারতদর্শনের সহায়ক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
খালাসের পর আবার গ্রেপ্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫৪, ৭২৪
গবর্ন্মেণ্টের একটি কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮১
গয়লানী (গল্প)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৪১৯
(মহাত্মা) গান্ধীর বর্ণাশ্রম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৩
গীতা—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ৩৯, ২০০, ৩৩১, ৫০৯, ৬৭২, ৭৮২
গোবিন্দকুমার আশ্রম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৮
গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৪৭৯
চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ১৬৫
চণ্ডীদাসের পদাবলী (আলোচনা)—শ্রীগৌরীহর মিত্র ... ৩৬২
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭১৯
চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৪৭
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
চীন জাপান যুদ্ধ ও কয়েকটি সভ্য জাতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৩
চীনদেশের ছেলেদের খেলা (সচিত্র)—শ্রীসংগ্রাহক ২৫৭
চৈত্যমঠ (কবিতা)—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৭৮
ছাত্রদের স্বদেশী সংঘ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৬
ছায়ার মায়া (গল্প)—শ্রীবিমল মিত্র ... ৪৬৭
"জনশক্তি"র অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪২
জাপানী কাপড় ও বিলাতী কাপড় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৯৬
জাপানী কুসংস্কার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭
জাপানে সেন্সসের কর্ম্ম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৮

জার্মিন্ ক্লবের বিরুদ্ধে আপীল নামঞ্জুর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩১
জেলের বাহিরে ও ভিতরে অত্যাচারের অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫২
জৈন জলমন্দির (সচিত্র)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৮৭
টেরারিজম্ দমনের উপায় অবলম্বন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৯৪
টেরারিজম্ দমনের আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৩
টেরারিষ্ট দমনের নূতন নিয়মাবলী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪৮
টেরারিষ্টদের সম্বন্ধে বঙ্গের সাবেক লাট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৮৯
ট্রেনে এক রাত্রি (গল্প)—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১১৩
ডাকবাক্সে চিঠি পোড়ান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৬
ডায়ারের পক্ষ সমর্থন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০২
ডেটেনুদের ভাতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
ঢাকায় প্রবেশিকায় অসদুপায় অবলম্বন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪২
তারা (আলোচনা)—শ্রীবীরেশ্বর সেন ... ১২৩
তারার মত মরা (কবিতা)—শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ... ৮৩৮
তিনশো পঁয়ষট্টির এক—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ... ১২৩
তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪১
তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য হাতপাখা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৭২১
তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা রাজনৈতিক বন্দী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২২
দমদমার "বিশেষ জেল" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৩
দমনমূলক কার্য্যের সংবাদ বিলাত পৌঁছা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫২
দুর্গাদাস লাহিড়ী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
দুর্নীতি দমন আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৩
দেওলী জেলের ডেটেনুদের জন্য নিয়মাবলী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩০
দেশ বিদেশের কথা ১২০, ২৬৮, ৪২৫, ৫৬৩, ৬৯৮, ৮৭৫
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (কষ্টি)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৮, ৬৬৪
দেশের পথে (আলোচনা)—শ্রীভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী ও প্রবাসীর সম্পাদক ... ১২২
ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫০৯
ধলঘাটের শাস্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৭
(শ্রীযুক্ত) ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রহার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫১
নক্ষত্রের জন্মকথা (সচিত্র)—শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর ... ৬৪০
নদীমাতৃক বঙ্গদেশ—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫০
নরদেবতা (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৬৫
নারীধর্ষণের শাস্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯৬
নারী সমবায় ভাণ্ডার—শ্রীঅবলা বসু ... ১১৮
নালন্দায় দুই দিন (সচিত্র)—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ... ৭৬৯
নিখিলভারতীয় মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৮
নিজামের পর্দ্দাবিরোধিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৪
নিত্যেন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৬
নিবেদিতার স্মৃতি—শ্রীসরলাবালা সরকার ... ৭৬১
নিরস্ত্রীভবন কন্‌ফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯২
নিরুদ্দেশ (গল্প)—শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় ... ১৭০
(স্যর) নীলরতন সরকারের সপ্ততিপূর্ত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯১
নূতন এমার্জেন্সী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪২৯
নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৫
নূন, কাগজ, চিনি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৬
নেপালের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯৪
পঞ্চশস্য (সচিত্র) ১৩৯, ৫৬৯, ৭১৫
পত্রধারা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৭, ১৬২, ৪৫১, ৫৯৪, ৭৫০
পথবাসিনী (গল্প)—শ্রীশান্তা দেবী ... ৫৪৪
পদ্মাবত কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ৮১
পরলোকগত মাসিকপত্র পাঠ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৩
পল্লীশিল্প (সচিত্র)—জসীম উদ্দীন ... ৫২০
পাঠান ও ভারতীয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৮
পাণ্ডুয়া (সচিত্র)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৫০
পারস্য-ভ্রমণ (সচিত্র)—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৫২, ৭০০, ৮৬৫
পারস্য-যাত্রা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪১৩
পুনরাগমনায় (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৩৭১
পুনা ও ভোর—শ্রীশান্তা দেবী ... ১৭৯
পুরুষোত্তম দেব (কষ্টি)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... ৮৪৪
পুস্তক পরিচয় ৯১, ২৪০, ৩৭৮, ৫৪০, ৬৮২, ৮২৮
পূর্ব্ববঙ্গে ঝড় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৬
পৃথিবীতে মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৫
পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা কত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫০৬
পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭১৭
পোড়াকপালী (গল্প)—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৩৯
(মহারাণা) প্রতাপসিংহ (সচিত্র)—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ২১৩
প্রতাপাদিত্যের কথা—শ্রীনিখিলনাথ রায় ... ৫

প্রতাপাদিত্যের কথা (আলোচনা)—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী ... ৩৬২
প্রতাপাদিত্যের কথা (আলোচনা) —শ্রীনিখিলনাথ রায় ... ৫৩৯
প্রথম পূজা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭৩৭
প্রবর্ত্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৬
প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৮
প্রবেশিকার একটি প্রশ্নপত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬০
প্রবেশিকার সংস্কার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৭
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৬
প্রাচীন সাহিত্যে মহিলা কবি ও বিদুষী (কষ্টি) —শ্রীমৃণাল দাশগুপ্তা ... ২৩৯
প্রেম নাই (গল্প)—শ্রীবিমল মিত্র ... ৮৫৪
প্লেগ এখনও আছে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭১৯
(অধ্যাপক) ফণীন্দ্রনাথ বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৪
ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্টদের কথা (সচিত্র) —শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ... ৩৮৪
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা অদূরে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪১
ফিলিপাইন্সের স্বাধীনতালাভে বিলম্ব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৫
বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি সমিতি (সচিত্র)— শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত ... ৩৩৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্বাজাতিকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫০
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৮
বঙ্গে কোন্ সম্প্রদায় ট্যাক্স বেশী দেয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৮৩
বঙ্গে চুরি ডাকাতি ও খুন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৬
বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৮৮, ৮৯৫
বঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৭
বঙ্গের দুরবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৩
বঙ্গের প্রতি অবিচারের উপর অপমান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৭
বঙ্গের সামাজিক, ধার্ম্মিক ও ভাষিক মানচিত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৫
বঙ্গের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৮২
বয়ঃস্থা গৃহিণীদের জ্ঞানানুরাগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪২
বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ (আলোচনা) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১২২
বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিন্যান্সের দৌড় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭
বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ... ৪৫
বাংলাকে বরাবর কম প্রতিনিধি দান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৪, ৫৮১
বাংলা দেশের সাধারণ পুস্তকালয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৫
বাংলা প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি অগ্রাহ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩২
বাংলার বানান-সমস্যা (কষ্টি) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৮৪৪
বাংলার রসকলা-সম্পদ (সচিত্র) —শ্রীগুরুসদয় দত্ত ... ১০১
বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত (সচিত্র) —শ্রীগুরুসদয় দত্ত ... ৮০৯
বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল (সচিত্র) ... ২৫৩
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৩৪
বাক্যহারা (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৪৯
বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে অপনিয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮০
বাঙালী মুদ্রাবিজ্ঞানবিদের সম্মান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৪
বাঙালীর শিক্ষায় বাংলা ভাষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮৫
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (কষ্টি)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... ৮৯
বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা —শ্রীদীননাথ সান্যাল ... ১৭৪
বাস্তুভিটা-সংলগ্ন কৃষির সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
বিদেশের কথা (সচিত্র)—শ্রী[illegible] দেবী ... ৬১২
বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৫৪
বিনা-বিচারে বন্দীদের নির্ব্বাসন আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৪
বিপিনচন্দ্র পাল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৫
বিবিধ প্রসঙ্গ (সচিত্র) ১৪১, ২৮৫, ৪২৮, ৫৭৩, ৭১৭, ৮৭৭
বিভীষিকাবাদ ও বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০২
বিভীষিবাদ সম্বন্ধে চিন্তা আবশ্যক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯১
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকাদি নিয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮৪
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৯
বিশ্বভারতী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৪
বিশ্বভারতী-সংবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
বিশ্বভারতী অর্থসাহায্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫৫
বিশ্বভারতী—নারী-বিভাগ—শ্রীআশা দেবী ... ৪০৪

বিশ্বভারতীর ভাঙা জমী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮০
বিস্তর মহল নীলাম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৬
বেড়ার ধারের ফুল (কবিতা)—শ্রীক্ষিতীশ রায় ... ৩৮
বেলা পড়ে আসে (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ... ৪২৪
বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৭
বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ ... ৩৭২
ভদ্রলোকের স্বহস্তে হলচালন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৪
ভারতগবর্ন্মেণ্টের নূতন ঋণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪২
ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১০০
ভারতশাসনবিধি প্রণয়নের নূতন পন্থা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯০
ভারত-সচিবের আস্ফালন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯০
ভারত-সম্বন্ধীয় বিলাতী খবর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৩
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯২
ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের দাবির হেতু
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩২
ভীরু (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৯৬
ভূমিকম্প (গল্প)—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫৫
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬০১
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা
—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩৩
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা (আলোচনা)
—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবুল হুসেন ৮৩০
মনস্কাম (গল্প)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র ... ৬৭৯
মনের পদ্ম (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৩০
মহাজাতি-সংঘের যুদ্ধসজ্জা আবশ্যক কি-না
(বিবিধ প্রসঙ্গ) .. ৫৭৫
মহিলা-সংবাদ (সচিত্র) ৩০৮, ৫৬৬, ৭১২
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮১
মাতৃঋণ (উপন্যাস)—শ্রীসীতা দেবী
৯৩, ২০৫, ৩৬৪, ৪৯৮, ৬৪৭, ৭৮৯
মানবপুত্র (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬১১
মিলিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭০১
মুদী (গল্প)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ২৬২
মুসলমান বাঙালীদের প্রাধান্যের দাবি
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৩
মুসলমান বাঙালীর অতীত গৌরব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৪৯
মুস্লিম সাহিত্যসমাজ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৯
মৃত্যুঞ্জয় (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৯৩
মেঝেরি (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে ... ২৩৬
মোহেন-জো-দাড়ো ও প্রাচীন সিন্ধুতীরের
সভ্যতা (সচিত্র)—ডোরোথি ম্যাকাই ... ৮৩১
মোহেন্-জো-দাড়ো ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭
ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
যশোহর জেলায় ও অন্যত্র নারীহরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৬০
যাও পাখী ব'লো তারে (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু ... ৩৮৭
যামিনী সেন, ডাক্তার—শ্রীকামিনী রায় ... ৫১৭
যুদ্ধসজ্জা হ্রাসের চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৩
"যে-কোন এবং প্রত্যেক উপায় অবলম্বন"
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০০
যোগাযোগ—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২১
রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৭
রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা (আলোচনা)
—শ্রীরঙীন হালদার ... ২৫২
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২০
রবীন্দ্রনাথের পারস্য-গমন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৫
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৩
রবীন্দ্র প্রশস্তি (কবিতা)
—শ্রীইন্দুভূষণ দেব বিদ্যাবিনোদ ... ৫৫১
রবীন্দ্রনাথের সুর—শ্রীমণিলাল সেন-শর্ম্মা ... ৬৬৮
রয়্যালিষ্টদের কীর্ত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৯
রাজনৈতিক বন্দীদের আণ্ডামান প্রেরণ
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৯
"রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক" পদে অপনিয়োগ
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৬
রাধানাথ শিকদার—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ৬৫৫
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (কুষ্টি)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫১৮
লণ্ডনে প্রদর্শিত বাঙালী চিত্রকরের ছবি
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৩
লণ্ডনে সঙ্গীতনিপুণা বাঙালী মহিলা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪২
ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ জাতি (সচিত্র)
—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ ৩১৫, ৭৭৭
শশাঙ্কের কলঙ্ক—রাজ্যবর্দ্ধন-হত্যা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৭৪২
শান্ত (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৬১
শান্তিনিকেতনে উপনিবেশ স্থাপন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪৫
শান্তিনিকেতনে পূর্ব্ব-আফ্রিকার ছাত্র
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮০
শিক্ষা-সঙ্কট (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৭৯৭
শিল্পী (কবিতা)—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পাল ... ৬৯
শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী (সচিত্র)
—শ্রীশান্তা দেবী ... ১২৭

শৃঙ্খল (উপন্যাস)—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী
৭, ৭০, ২৭১, ৩৯৫, ৫২৯, ৬৮৭, ৮১৭
শেষের কবিতা (সমালোচনা)
—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় … ৩৫২
শেষের খেয়া (গল্প)—শ্রীভোলানাথ ঘোষ … ২২৭
শোক-সংবাদ (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৪৪
শোধ (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র … ১৪
শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৮৮৭
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার চিড়িয়াখানা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৪৩৮
সন্তান-স্নেহ (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় … ৩৩৬
সরকারী কোন কোন লোকের টেম্‌পরিজ্‌ম্ আছে
কি-না (বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৭২৪
সরকারী সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৮৭৭
সাংখ্য ও যবন দর্শন (সচিত্র)
—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ … ৩০৫
"সাবিত্রীর" ও "দেবী"র ভাগ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) … ২৯৪
সাম্প্রদায়িক রাজত্ব ও দাসত্ব প্রথা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৮৮
"সাম্রাজ্য দিবসে" প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৪৪৩
সাহিত্যসৃষ্টি—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য … ২১
সুইডেন (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ … ১৮২
সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা (বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৭২৫
সূর্য্যালোক ও কাষ্ঠালোকের সম্বন্ধ (কষ্টি)
—শ্রীসহায়রাম বসু … ৮০৭
সেকালের বিলাসিতা
—শ্রীবসন্তকুমার বিদ্যারত্ন … ৫০৪
স্পাই (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর … ৫৪৯
স্বর্ণকুমারী দেবী (বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৫৭৭
স্বাগতা (উপন্যাস)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৩২১, ৪৫৫, ৬০২, ৭৫২
হলদীঘাটের যুদ্ধ ও মহারাণা প্রতাপের শেষজীবন
—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো … ৬২৬
হাফেজ (সচিত্র)—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন … ৩১৫
হিংসা ও অহিংসার বিরুদ্ধে একই অস্ত্র প্রয়োগ
(বিবিধ প্রসঙ্গ) … ২৮৯
হিন্দুরাজও নয়, মুস্‌লিম রাজও নয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) … ৭২১

চিত্র-সূচী

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান শিশু … ১৪০
ইউরোপে প্রথম জাপানী রাজদূত … ৭১৬
ইন্দুমতী বক্সী, শ্রীমতী … ৭১৩
ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক (রঙীন) … ১২০
একাকী (রঙীন)—শ্রীকনু দেশাই … ৫৪৪
কচুরিপানা পূর্ণ খাল … ৩৩৮
কমলরাণী সিংহ … ৭১৩
করুণাকণা গুপ্ত, শ্রীমতী … ৪১০
কল্যাণী গুপ্ত, শ্রীমতী … ৫৬৭
কীর্ত্তনে (রঙীন)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী … ২০৮
কুকা, মিস্ ডি … ৭১৪
গাছের তলায় (রঙীন)—শ্রীসুধাংশু রায় … ২৫৬
গোয়ালিনী (রঙীন)—শ্রীসোমলাল শা … ৮১৬
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় … ৭১৪
চীন-জাপান যুদ্ধ—জাপানী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা … ১৩৭
বিধ্বস্ত সাংহাই … ১৩৭
চীনদেশের ছেলেদের খেলা (চিত্রে) ২৫৭—২৬১
চীনের হল্‌দিঘাট (চিত্রে) … ১৩৮
চুল ও দাঁতের জোর (চিত্রে) … ৫৮
ছেলেদের চিড়িয়াখানা … ৭১৫
জলধর সম্বর্দ্ধনা … ২৬৮
জাহান্ আরা চৌধুরী, শ্রীমতী … ৭১২
জৈন জল-মন্দির … ১৮৮
ঝড়ের পর (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ
রায়চৌধুরী … ৩২
ঢেউ (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী … ৬৪০
ঢোণ্ডো কেশব কার্ভে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রভৃতি … ৫৬৮
তেহারানে আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ
হইতে কবিকে অভ্যর্থনা … ৩১২
তেহারানে গৃহীত কবির আলোক চিত্র … ৩১২
তেহারানের আমেরিকান কলেজ-উদ্যানে
কবির বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সমাগত বিশিষ্ট
ব্যক্তিগণ … ৩১২
দুয়ারে (রঙীন)—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় … ১৬১

নক্ষত্রের জন্মকথা—চিত্রে ৬৪২-৬৪৫
নাগীর্জুন কুণ্ডে ৫৬৯, ৫৭০
নারী কর্ম্মি-মণ্ডলী—'অলিম্পিক' ক্রীড়া … ৭১৫
নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ … ৪০৯
নালন্দায় দুই দিন—একটি মূর্ত্তি … ৭৭৫
কুমোর … ৭৭৪
খিলানের ভিতরের মূর্ত্তি … ৭৭৫
ঘাষ্‌রাওয়ালীদের তাঁবু … ৭৭০
দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ঘাট, পাটনা … ৭৭০
পল্লীবালাদের জল-তোলা … ৭৭৪
পাটনার গোলাঘর … ৭৭১
বুদ্ধ মূর্ত্তি … ৭৭৬
মাঠের মাঝে ভগ্ন মূর্ত্তি … ৭৭৫
মুদিনীর দোকান … ৭৭২
যুয়াফর, নালেন্দার … ৭৭৩
ক্ষুদ্র পল্লী নালন্দার … ৭৭৫
*নির্ব্বাণ (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী … ৩৮৪
শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় … ৫৬৪
নীলরতন সরকার, স্যর … ৮৯২
পল্লীশিল্প—কাঠের পানের বাটা … ৫২৭
কাঠের পুতুল … ৫২৩
কাঁথার মাঝে পদ্ম … ৫২৩
চিনির খেলনা বা সাজ … ৫২৫
দোতালা ঘর … ৫২৭
পক্ষী পূজার সরা … ৫২১
ফরিদপুরের মাটির পুতুল ৫২২, ৫২৫
বেতের তৈরি গহনার ঝাঁপি … ৫২২
বেতের তৈরি পানের ঝাঁপি … ৫২২
মাটির হাঁস, ঘোড়া, সিংহ, টিয়া … ৫২৫
লক্ষ্মী পূজার সরা ৫২১, ৫২৪, ৫২৫
লক্ষ্মীর পদচিহ্ন … ৫২৮
শঙ্খপদ্ম—আলপনা … ৫২৬
শিকা … ৫২৬
পশ্চিম-আফ্রিকার 'অ্যামাজন' নিগ্রো রমণী … ১৩৯
পাণ্ডুয়া—আদিনা মস্‌জিদ … ৫০
একলক্ষী মস্‌জিদ … ৫৩
পরিখা-প্রাচীরবেষ্টিত পৌণ্ড্রনগর … ৫৪
রাজবাড়ীর জরিপী নক্সা … ৫৫
রাজসিংহাসন … ৫১
সিংহাসন-কক্ষ … ৫১
সিংহাসন-বেদীতে উঠিবার প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান … ৫২
সেকেন্দর শাহের সমাধি … ৫২
—পারস্য ভ্রমণ—করিম খাঁ জেন্দ … ৮৬৬
—কাজেরুণ—দূরের দৃশ্য … ৭০৩
—কাজেরুণের পথে পাহাড় ও সেতু … ৭০২
—কাজেরুণের পথে-ভাঙা সেতু এবং পুলিসের ঘাঁটি … ৭০১
—কাজেরুণ—বাস-এ-নজরের পুষ্পোদ্যান … ৭০৩
—পারস্য—কোনার তখ্‌তে চাষার বাড়ি … ৭০২
—দমদমে যাত্রারম্ভ … ৫৫৩
—নক্স-ই-শাপুর ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১
—বুশীর এরোড্রোম … ৫৫৫
—বুশীর, ব্রিটিশ কন্সলেটের কাছে … ৫৫৬
—বুশীর হইতে যাত্রা … ৭০০
—বুশীরে কবির গাড়ীর কাছে ভিড় … ৫৫৮
—বোরস্‌জানে পুলিসের ঘাঁটি … ৭০১
—রবীন্দ্রনাথের এরোপ্লেন বুশীরে নামিতেছে … ৫৫৯
—রাজনিমন্ত্রিতের দল … ৫৬০
—লেখকের হোটেল হইতে বুশীরের দৃশ্য … ৫৫৭
—শিরাজ … ৭০৪
—শিরাজ আহমোদিয়া উদ্যানে চায়ের নিমন্ত্রণ … ৭০৫
—শিরাজ প্রবেশ … ৭০৪
—শিরাজ—বাগ মহম্মদিয়ে প্রাসাদে কবির অবতরণ … ৭০৫
—শিরাজের গভর্ণর এবং কবি … ৭০৮
—শিরাজের বাহিরের দৃশ্য … ৮৬৫
—শিরাজের মস্‌জিদ … ৮৬৬
—শুষ্টর, নৃপতি শাপুর নির্ম্মিত কারুন নদীর বাঁধ … ৮৭২
—সাদীর কবরগৃহের সম্মুখে … ৭০৭
—সাদীর কবর স্থান … ৭০৬
—সাদীর কবরোদ্যানে কবিকে নাগরিক অভিনন্দন … ৭০৬
—হাফিজিয়ে … ৮৬৭
—হাফেজের কবর … ৭১০
—হাফেজের কবরের পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ … ৭০৯
—পানা পরিষ্কারের পরে খালের দৃশ্য … ৩৩৯
শ্রীপুনামচাঁদ শেঠিয়া … ১৮৭
*পূজারিণী (রঙীন)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত … ৭৩৭
প্রতাপসিংহ (মহারাণা) … ২১৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় … ১৪৬
মানে—লোলা … ৩৮৫
—ফরাসী ইম্‌প্রেসনিষ্টদের কথা—
পিসারো—"কিশোর ঢোল-বাদক" … ৩৯৩

মানে—"ল্যা বাঁক্" ... ৩৮৫
মোনে—"টেম্‌সের তীরে পার্লামেণ্ট" ... ৩৮৯
"রুয়ঁ ক্যাথিড্রাল" ... ৩৯০
"স্নানের ঘাট" ... ৩৮৯
রেনোয়ার—"বাগানে প্রাতরাস" ... ৩৯১
—নিদাঘে
সিসলে—'নদীতীর" ... ৩৯৩
সিঁঞাক—"বন্দরে" ... ৩৯৪
স্যুরা—"বেড়াবার বাগান" ... ৩৯৪
ফুলের তোড়া (রঙীন)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ... ৮৫৬
বগদাদ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা ... ৩১২
বধূবরণ (রঙীন)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৭৩
বয়েজ নার্সারি হোম—একটি ক্লাস ... ৪২৬
ফুটবল খেলা ... ৪২৬
ব্যায়াম ... ৪২৬
বর্ষায় (রঙীন)—প্রাচীন রাজপুত চিত্র ৪৯৬
বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম—অধিবাসিনীগণ ... ৪১১
—মেয়েরা বাগানে কাজ করিতেছে ... ৪১১
বাংলার রসকলা সম্পদ—শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াই বুড়ি ... ১১০
—গোষ্ঠ-লীলা ... ১০৯
—দশরথের মৃত্যু ... ১০৯
—দোলনায় ... ১০৪
—নাপিত ও নাপিতানী ... ১০৬
—পরী ও হাতী ... ১০৫
—ব্যায়ামরতা নারী ... ১০৬
—মাহুত ও হাতী ... ১০৪
—রাধার প্রসাধন ... ১০৭
—রামচন্দ্র ও গুহক ... ১০৮
বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত—অবতার নৃত্য, ফরিদপুর ৮১০, ৮১১
—কাঠি নৃত্য, বীরভূম ... ৮০৮
—জারি নৃত্য, ময়মনসিংহ ... ৮১৫
—ধর্ম্মপূজার নৃত্য, বীরভূম ... ৮১২
—ধূপ নৃত্য, ফরিদপুর ... ৮১০
—ব্রত নৃত্য, যশোহর ৮১১, ৮১৩, ৮১৬
—মাদল পূজায় নৃত্য ... ৮১৬
—রায়বেঁশে নৃত্য ৮১৩
বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল—ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেনদের বাসগৃহ ... ২৫৬
—নীলাম্বর ভবন ... ২৫৩
—নূতন কুটীরসমূহ ... ২৫৬
—পুরুষদের অস্ত্রোপচার-গৃহ ... ২৫৪
—প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী ... ২৫৪
—প্রসব করাইবার গৃহ ... ২৫৫
—প্রাইভেট ওয়ার্ড ... ২৫৬
—সংক্রামকরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র রাখিবার গৃহ ... ২৫৫
—সাধারণ অস্ত্রোপচার-গৃহ ... ২৫৫
—স্কুলগৃহ ... ২৫৩
—স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা-গৃহ ... ২৫৫
—হাসপাতালের রেসিডেণ্ট-সার্জ্জনের আবাস গৃহ ... ২৫৪
বাঘ ও হাতী ... ১০৫
বাটলিওয়ালা, মিস ভিখু ... ৭১৩
বাঁশরী (রঙীন)—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার ... ৩৪৪
বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রী ... ৪২৭
বিদেশের কথা—গ্রিমসেল্ হ্রদ ... ৬১৪
—গ্লেশিয়ারের একাংশের দৃশ্য ... ৬১৫
—রোন্ গ্লেশিয়ারের সুড়ঙ্গ ... ৬১৭
বিপিনচন্দ্র পাল ... ৪৩৫
বিরহী যক্ষ (রঙীন)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে ... ৩০৫
মত্ত হস্তী (রঙীন)—কাশী ভারত-কলাভবনের সৌজন্যে ... ১
মন্দিরের পথে (রঙীন)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ
মায়ালতা সোম শ্রীমতী ... ৪০৯
মোহেন-জো-দাড়ো—খনন কার্য্য ... ৮৩৪
—গলি ও বাড়ি ... ৮৩৬
—চীনামাটির টুকরা, বোতাম ও মীনার কাজ ... ৮৩৫
—ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য ... ৮৩৩
—নরকঙ্কাল ... ৮৩৭
—নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টিযোগীর মূর্ত্তি (পার্শ্বচিত্র) ... ৩০৭
—নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি যোগীর মূর্ত্তি (সম্মুখ) ... ৩০৯
—বড় চৌবাচ্চার উত্তর প্রান্তের ধাপ ... ৮৩৬
—মুদ্রায় যোগাসনস্থ পশুপতির চিত্র ... ৩১১
—মুদ্রায় যোগীর পূজার চিত্র ... ৩১২
যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী—কৃষ্ণ রাজা ... ১৩১
জমিদার-গৃহিণী ... ১২৮
নরমেধ যজ্ঞ (উর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশ) ... ১৩০
বাল্মীকি ও লবকুশ ... ১৩২
বিশ্রামরত সম্ভ্রান্ত বাঙালী ... ১২৮
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও তাঁহার পত্নী ... ১২৯
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোক ... ১২৭
রবীন্দ্রনাথ ও বেদুঈন শেখ ... ৩১৩

রমলা দে, শ্রীমতী ... ৪১১
রমা সরকার, শ্রীমতী ... ৫৬৬
রৈস্কুর বাসভবনে কবির সান্ধ্যভোজন
(বুশায়ারে) ... ৩১৩
লণ্ডনে প্রদর্শিত বাঙালী চিত্রকরের ছবি—
কাসিমগীর—শ্রীসারদাচরণ উকিল ... ১৪৪
—দাক্ষার রাণী—শ্রীসারদাচরণ উকিল ... ১৪৩
ফনীন্দ্রনাথ বসু ...
বুদ্ধ, জননী ও মৃত শিশু ... ১৪৪
লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাবৃন্দ ... ২৭০
ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপজাতি—একটি ল্যাপ ... ৭৮০
—এঞ্জিনের সম্মুখভাগে তুষার পর্ব্বত কাটিবার যন্ত্র ৩৫৯
—এরোপ্লেনে হাসপাতালে গমন ... ৫৫০
—কুকুর ও ল্যাপ শিশু ... ৩১৫
—কুটীরের বাহিরে ল্যাপ-গৃহিণী ... ৫৪৮
—তুষারপর্ব্বত ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতেছে ... ৩৫৯
—তুরী, যোহান্, ল্যাপ কবি ও গ্রন্থকার ... ৭৮১
—দুইটি ল্যাপ শিশু পুস্তকের ছবি দেখিতেছে ... ৩৫১
—দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বনভূমিতে ছত্রভঙ্গ
হরিণ পালের উপর দৃষ্টি রাখা হইতেছে ... ৩৫১
—পাঠরত ল্যাপ শিশু ... ৩৪৮
পার্ব্বত্যপ্রদেশে হরিণের যাত্রা ... ৩৫০
—প্রবন্ধ-লেখক ... ২৪৫
—বনে কুটীর স্থাপন ... ৭৮১
—বল্‌গা হরিণের দল সাঁতার কাটিয়া হ্রদ
পার হইতেছে ... ৭৭৮
—বল্‌গা হরিণের বরফের নীচে খাদ্যান্বেষণ ... ৭৭৮
—বিদ্যালয়ের নূতন ধরণের বাড়ী ... ৭৭৭
—বিশ্বস্ত কুকুর সহ শ্রী পার্থপুত্রী ... ৭৮০
—বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত একুশ শত টন
লৌহ বোঝাই গাড়ী ... ৩৪৯
—ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের চিরাচরিত জীবন-যাপন ... ৩৫১
—মালপত্র ও হরিণ শিশুদিগকে হরিণের
উপর চাপাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে যাত্রা ... ৭৮০
—রাখাল-বালিকা পর্ব্বতের পাদদেশে
হরিণপালসহ বিশ্রাম করিতেছে ... ৭৭৯
—রেডক্রস্ এরোপ্লেন ... ৩৫০
—ল্যাপ বিদ্যালয় ... ৩৪৭
—ল্যাপ মাতা ও কন্যা ... ৩৪৭
—ল্যাপ যুবক ও বল্‌গা হরিণ ... ৩৪৭
—শীতবস্ত্রে লেখক ... ৩৪৬
—সারা বৎসরের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ ... ৭৭৯
—'স্লেজ' নৌকায় ল্যাপ শিশু ... ৩৫০
শিরাজের মস্‌জিদ ... ৩১৯
সন্ধ্যা (রঙীন)—শ্রীভুবন ... ৬৬৮
সরস্বতী নন্দী, (ডাঃ) ... ৭১২
সরোজিনী দত্ত, শ্রীযুক্তা ... ৭১২
সারদাচরণ উকিল শ্রী ... ১৪৩
সুইডেন—অরোরাবরিয়ালিস মেরুপ্রদেশের
আলোর নৃত্য ... ১৯৮
—আগষ্ট ষ্ট্রিনবের্গ ... ১৯০
—এরোপ্লেন হইতে তোলা ষ্টকহল্‌মের দৃশ্য—
মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদ ... ১৯৪
—কার্লফেল্ড ... ১৯৩
—গুস্তাভ ফ্রয়োডিং ... ১৯১
—ছাত্রদের স্কেটিং খেলা ... ১৯৯
—জলপ্রপাত স্তোরা সোফালেৎ ... ১৯৬
—তবনে ট্রাক্কের নিকটবর্ত্তী তুষারমালা ... ১৯৬
—বরফে আচ্ছন্ন গাছপালা ... ১৯৭
—মধ্যরাত্রির সূর্য্য ... ১৯৮
—মানচিত্র ... ১৮৯
—'জল প্রপাত' ... ১৯৬
—ল্যাপ ল্যাণ্ডের বিখ্যাত পর্ব্বত
'কেবনেকাইসের' শিখর ভাগ ... ১৯৬
—ষ্টকহল্‌মের টাউন হল ... ১৯৪
—ষ্টকহল্‌মের নৈশ দৃশ্য ... ১৯৫
—ষ্টকহল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান ... ১৯৫
—ষ্টকহল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যানের এক অংশ ... ১৯৩
—সেফটি ম্যাচের আবিষ্কারক লুণ্ডষ্ট্রম্ ... ১৯০
—(লেখিকা) সেল্‌মা লাগেরলফ ... ১৯১
—হাইডেনষ্টাম্ ... ১৯২
—সুরভি সিংহ, শ্রীমতী ... ৪০৯
সুরেশচন্দ্র দাস শ্রী, ... ৫৬৪
সুলোচনা শ্রীখণ্ডী, ডাঃ ... ৭১২
সুষমা সিংহ, শ্রীযুক্তা ... ৪১০
সোভিয়েট রুশিয়ায় শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের
অবস্থা— ... ৫৭১, ৫৭২
সৌদামিনী দেবী শ্রীমতী ... ৭১৪
স্বর্ণকুমারী দেবী ... ৫৭৮
হনুমানের লঙ্কাদাহন (রঙীন)
—শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী ... ৭৭৬
হাফেজিয়া (হাফেজের সমাধি-উদ্যান) ... ৩১৭
হিমালয়ের চটি (রঙীন)
—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ... ৫৯৩
শ্রীহৃষীকেশ সুর মহাশয়ের বিদায়-
অভিনন্দন সভা ... ৫৬৫
হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্তা ... ৪২২

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩২শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

১৩৩৯

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ—আশ্বিন

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৩৯

বিষয়-সূচী

অগ্রদূত (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১
অটোয়া কন্‌ফারেন্স ও ভারতবর্ষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫৯
অনামী (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৬৩৫
অনিলকুমার দাসের মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯২
অবনত শ্রেণী কাহারা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৪
অরণ্য-কাণ্ড (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু ... ২৯
অর্ডিন্যান্সের পুনর্জন্ম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪২৮
অর্পণ (কবিতা)—শ্রীঅনিলবরণ রায় ... ৭৪৯
অসময়ে (কবিতা)—শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ... ৫১৬
"অসমাপ্ত"—শ্রীযুগলকিশোর সরকার ... ৪৯৬
অহিন্দু "অবনত" শ্রেণী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৫
আজব রোগ (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪১
আগাখানি আবদারের একটা ওজুহাত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৯১
আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরস (কষ্টি) ... ৬৬৬
আপনারা অবশ্যই অস্পৃশ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৭
আবার রাজকর্ম্মচারী হত্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৮৫
আমারে বেসেছি ভাল (কবিতা)—শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৮৪৯
আর্ম্‌ষ্ট্রঙের যুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯৫
আলবেয়ার টোমা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৩
"আল্লবৎ হাম গদ্‌হা" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৬
আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯১
আলোচনা ১২২, ২৫২, ৩৬২, ৫৩৯, ৮৩০
ইংরেজদের মাতৃভাষা-বিকৃতি অসহিষ্ণুতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৬
ইরা (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ... ৬১৮
উড়িষ্যা ও ভারতবর্ষ—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৪৬৩
...ন্দ ও অনুন্মত্ত হাতীর উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৪
... শোচনীয় মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪৬
...ণ অর্থ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৯১
...)—শ্রীরামানন্দ ... ৪০৬
... (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৬
... বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৮৭
... ৮৪৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২০
কলিকাতার পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৯৬
কষ্টিপাথর ৮৯, ২৩৮, ৪০৬, ৫১৭, ৬৬৪, ৮৪৪
কামরূপ রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ... ৬১
কালো মেয়ে (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬৮২
কুমার (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩
কোরাণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
ক্যাথেরিন্ মেয়োর দোসর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৩
ক্যাথেরিন মেয়োর ভারতদর্শনের সহায়ক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
খালাসের পর আবার গ্রেপ্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫৪, ৭২৪
গবর্ন্মেণ্টের একটি কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮১
গয়লানী (গল্প)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৪১৯
(মহাত্মা) গান্ধীর বর্ণাশ্রম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৩
গীতা—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ৩৯, ২০০, ৩৩১, ৫০৯, ৬৭২, ৭৮২
গোবিন্দকুমার আশ্রম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৮
গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৪৭৯
চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ১৬৫
চণ্ডীদাসের পদাবলী (আলোচনা)—শ্রীগৌরীহর মিত্র ... ৩৬২
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭১৯
চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৪৭
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
চীন জাপান যুদ্ধ ও কয়েকটি সভ্য জাতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৩
চীনদেশের ছেলেদের খেলা (সচিত্র)—শ্রীসংগ্রাহক ২৫৭
চৈত্যমঠ (কবিতা)—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৭৮
ছাত্রদের স্বদেশী সংঘ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৬
ছায়ার মায়া (গল্প)—শ্রীবিমল মিত্র ... ৪৬৭
"জনশক্তি"র অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪২
জাপানী কাপড় ও বিলাতী কাপড় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৯৬
জাপানী কুসংস্কার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭
জাপানে সেন্সসের কর্ম্ম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৮

জামিন কুলবের বিরুদ্ধে আপীল নামঞ্জুর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩১
জেলের বাহিরে ও ভিতরে অত্যাচারের অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫২
জৈন জলমন্দির (সচিত্র)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৮৭
টেরারিজম্ দমনের উপায় অবলম্বন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৯৪
টেরারিজম্ দমনের আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৩
টেরারিষ্ট দমনের নূতন নিয়মাবলী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪৮
টেরারিষ্টদের সম্বন্ধে বঙ্গের সাবেক লাট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৮৯
ট্রেনে এক রাত্রি (গল্প)—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১১৩
ডাকবাক্সে চিঠি পোড়ান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৬
ডায়ারের পক্ষ সমর্থন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০২
ডেটেন্যুদের ভাতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
ঢাকায় প্রবেশিকায় অসদুপায় অবলম্বন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪২
তারা (আলোচনা)—শ্রীবীরেশ্বর সেন ... ১২৩
তারার মত মরা (কবিতা)—শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ... ৮৩৮
তিনশো পঁয়ষট্টির এক—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ... ১২৩
তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪১
তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য হাতপাখা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৭২১
তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা রাজনৈতিক বন্দী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২২
দমদমার "বিশেষ জেল" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৩
দমনমূলক কার্য্যের সংবাদ বিলাত পৌঁছা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫২
দুর্গাদাস লাহিড়ী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
দুর্নীতি দমন আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৩
দেওলী জেলের ডেটেন্যুদের জন্য নিয়মাবলী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩০
দেশ বিদেশের কথা ১২০, ২৬৮, ৪২৫, ৫৬৩, ৬৯৮, ৮৭৫
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (কষ্টি)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৮, ৬৬৪
দেশের পথে (আলোচনা)—শ্রীভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী ও প্রবাসীর সম্পাদক ... ১২২
ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫০৯
ধলঘাটের শাস্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৭
(শ্রীযুক্ত) ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রহার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫১
নক্ষত্রের জন্মকথা (সচিত্র)—শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর ... ৬৪০
নদীমাতৃক বঙ্গদেশ—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫০
নরদেবতা (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৬৫
নারীধর্ষণের শাস্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯৬
নারী সমবায় ভাণ্ডার—শ্রীঅবলা বসু ... ১১৮
নালন্দায় দুই দিন (সচিত্র)—শ্রীসত্যরঞ্জন রায় চৌধুরী ... ৭৬৯
নিখিলভারতীয় মেডিক্যাল কনফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৮
নিজামের পর্দ্দাবিরোধিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৪
নিত্যেন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৬
নিবেদিতার স্মৃতি—শ্রীসরলাবালা সরকার ... ৭৬১
নিরস্ত্রীভবন কনফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯২
নিরুদ্দেশ (গল্প)—শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় ... ১৭০
(স্যর) নীলরতন সরকারের সপ্ততিপূর্ত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯১
নূতন এমার্জেন্সী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪২৯
নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৫
নুন, কাগজ, চিনি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৬
নেপালের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯৪
পঞ্চশস্য (সচিত্র) ১৩৯, ৫৬৯, ৭১৫
পত্রধারা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০, ১৬২, ৪৫১, ৫৯৪, ৭৫০
পথবাসিনী (গল্প)—শ্রীশান্তা দেবী ... ৫৪৪
পদ্মাবত কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ৮১
পরলোকগত মাসিকপত্র পাঠ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৩
পল্লীশিল্প (সচিত্র)—জসীম উদ্দীন ... ৫২০
পাঠান ও ভারতীয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৮
পাণ্ডুয়া (সচিত্র)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৫০
পারস্য-ভ্রমণ (সচিত্র)—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৫২, ৭০০, ৮৬৫
পারস্য-যাত্রা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪১৩
পুনরাগমনায় (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৩৭১
পুনা ও ভোর—শ্রীশান্তা দেবী ... ১৭৯
পুরুষোত্তম দেব (কষ্টি)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... ৮৪৪
পুস্তক পরিচয় ৯১, ২৪০, ৩৭৮, ৫৪০, ৬৮২, ৮২৮
পূর্ব্ববঙ্গে ঝড় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৬
পৃথিবীতে মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৫
পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা কত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫০৬
পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭১৭
পোড়াকপালী (গল্প)—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৩৯
(মহারাণা) প্রতাপসিংহ (সচিত্র)—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ২১৩
প্রতাপাদিত্যের কথা—শ্রীনিখিলনাথ রায় ... ৫

প্রতাপাদিত্যের কথা (আলোচনা)—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী ... ৩৬২
প্রতাপাদিত্যের কথা (আলোচনা) —শ্রীনিখিলনাথ রায় ... ৫৩৯
প্রথম পূজা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭৩৭
প্রবর্ত্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৬
প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয় (বিবিধ প্রসঙ্গ ... ৫৮৮
প্রবেশিকার একটি প্রশ্নপত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬০
প্রবেশিকার সংস্কার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৭
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৬
প্রাচীন সাহিত্যে মহিলা কবি ও বিদুষী (কষ্টি) —শ্রীমৃণাল দাশগুপ্তা ... ২৩৯
প্রেম নাই (গল্প)—শ্রীবিমল মিত্র ... ৮৫৪
প্লেগ এখনও আছে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭১৯
(অধ্যাপক) ফণীন্দ্রনাথ বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৪
ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্টদের কথা (সচিত্র) —শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ... ৩৮৪
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা অদূরে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪১
ফিলিপাইন্সের স্বাধীনতালাভে বিলম্ব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৫
বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি সমিতি (সচিত্র)— শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত ... ৩৩৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্বাজাতিকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫০
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৮
বঙ্গে কোন্ সম্প্রদায় ট্যাক্স বেশী দেয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৮৩
বঙ্গে চুরি ডাকাতি ও খুন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৬
বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৮৮, ৮২৫
বঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৭
বঙ্গের দুরবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৩
বঙ্গের প্রতি অবিচারের উপর অপমান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৭
বঙ্গের সামাজিক, ধার্ম্মিক ও ভাষিক মানচিত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৫
বঙ্গের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫৮২
বয়ঃস্থা গৃহিণীদের জ্ঞানানুরাগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪২
বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ (আলোচনা) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১২২
বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিন্যান্সের দৌড় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭
বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ... ৪৫
বাংলাকে বরাবর কম প্রতিনিধি দান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ২৯৪, ৫৮১
বাংলা দেশের সাধারণ পুস্তকালয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩৫
বাংলা প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি অগ্রাহ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩২
বাংলার বানান-সমস্যা (কষ্টি) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৮৪৪
বাংলার রসকলা-সম্পদ (সচিত্র) —শ্রীগুরুসদয় দত্ত ... ১০১
বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত (সচিত্র) —শ্রীগুরুসদয় দত্ত ... ৮০৯
বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল (সচিত্র) ... ২৫৩
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৩৪
বাক্যহারা (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৪৯
বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে অপনিয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮০
বাঙালী মুদ্রাবিজ্ঞানবিদের সম্মান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৪
বাঙালীর শিক্ষায় বাংলা ভাষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮৫
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (কষ্টি)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... ৮৯
বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা —শ্রীদীননাথ সান্যাল ... ১৭৪
বাস্তুভিটা-সংলগ্ন কৃষির সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
বিদেশের কথা (সচিত্র)—শ্রী[illegible] দেবী ... ৬১২
বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৫৪
বিনা-বিচারে বন্দীদের নির্ব্বাসন আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৪
বিপিনচন্দ্র পাল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৫
বিবিধ প্রসঙ্গ (সচিত্র) ১৪১, ২৮৫, ৪২৮, ৫৭৩, ৭১৭, ৮৭৭
বিভীষিকাবাদ ও বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০২
বিভীষিবাদ সম্বন্ধে চিন্তা আবশ্যক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯১
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকাদি নিয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮৪
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৯
বিশ্বভারতী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৪
বিশ্বভারতী-সংবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
বিশ্বভারতী অর্থসাহায্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫৫
বিশ্বভারতী—নারী-বিভাগ—শ্রীআশা দেবী ... ৪০৪

বিশ্বভারতীর ভাঙা জমী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮০
বিস্তর মহল নীলাম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৬
বেড়ার ধারের ফুল (কবিতা)—শ্রীক্ষিতীশ রায় ... ৩৮
বেলা পড়ে আসে (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ... ৪২৪
বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪০৭
বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ ... ৩৭২
ভদ্রলোকের স্বহস্তে হলচালন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৪
ভারতগবর্ন্মেণ্টের নূতন ঋণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪২
ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১০০
ভারতশাসনবিধি প্রণয়নের নূতন পন্থা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯০
ভারত-সচিবের আস্ফালন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৯০
ভারত-সম্বন্ধীয় বিলাতী খবর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৩
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৯২
ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের দাবির হেতু
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩২
ভীরু (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৯৬
ভূমিকম্প (গল্প)—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫৫
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬০১
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা
—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩৩
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা (আলোচনা)
—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবুল হুসেন ৮৩০
মনস্কাম (গল্প)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র ... ৬৭৯
মনের পদ্ম (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৩০
মহাজাতি-সংঘের যুদ্ধসজ্জা আবশ্যক কি-না
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৫
মহিলা-সংবাদ (সচিত্র) ৩০৮, ৫৬৬, ৭১২
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮১
মাতৃঋণ (উপন্যাস)—শ্রীসীতা দেবী
৯৩, ২০৫, ৩৬৪, ৪৯৮, ৬৪৭, ৭৮৯
মানবপুত্র (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬১১
মিলিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭০১
মুদী (গল্প)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ২৬২
মুসলমান বাঙালীদের প্রাধান্যের দাবি
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৩
মুসলমান বাঙালীর অতীত গৌরব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৪৯
মুস্লিম সাহিত্যসমাজ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৯
মৃত্যুঞ্জয় (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৯৩
মেঝেরি (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে ... ২৩৬
মোহেন-জো-দাড়ো ও প্রাচীন সিন্ধুতীরের
সভ্যতা (সচিত্র)—ডোরোথি ম্যাকাই ... ৮৩১
মোহেন্-জো-দাড়ো ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭
ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৯
যশোহর জেলায় ও অন্যত্র নারীহরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৬০
যাও পাখী ব'লো তারে (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু ... ৩৮৭
যামিনী সেন, ডাক্তার—শ্রীকামিনী রায় ... ৫১৭
যুদ্ধসজ্জা হ্রাসের চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৩
"যে-কোন এবং প্রত্যেক উপায় অবলম্বন"
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০০
যোগাযোগ—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২১
রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৭
রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা (আলোচনা)
—শ্রীরঙীন হালদার ... ২৫২
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২০
রবীন্দ্রনাথের পারস্য-গমন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৫
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৩
রবীন্দ্র প্রশস্তি (কবিতা)
—শ্রীইন্দুভূষণ দেব বিদ্যাবিনোদ ... ৫৫১
রবীন্দ্রনাথের সুর—শ্রীমণিলাল সেন-শর্ম্মা ... ৬৬৮
রয়্যালিষ্টদের কীর্ত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৯
রাজনৈতিক বন্দীদের আণ্ডামান প্রেরণ
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮৯
"রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক" পদে অপনিয়োগ
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৬
রাধানাথ শিকদার—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ৬৫৫
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (কুষ্টি)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫১৮
লণ্ডনে প্রদর্শিত বাঙালী চিত্রকরের ছবি
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৩
লণ্ডনে সঙ্গীতনিপুণা বাঙালী মহিলা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪২
ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ জাতি (সচিত্র)
—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ ৩৩৫, ৭৭৭
শশাঙ্কের কলঙ্ক—রাজ্যবর্দ্ধন-হত্যা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৭৪২
শান্ত (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৬১
শান্তিনিকেতনে উপনিবেশ স্থাপন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪৫
শান্তিনিকেতনে পূর্ব্ব-আফ্রিকার ছাত্র
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৮০
শিক্ষা-সঙ্কট (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৭৯৭
শিল্পী (কবিতা)—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পাল ... ৬৯
শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী (সচিত্র)
—শ্রীশান্তা দেবী ... ১২৭

শৃঙ্খল (উপন্যাস)—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ৭, ৭০, ২৭১, ৩৯৫, ৫২৯, ৬৮৭, ৮১৭
শেষের কবিতা (সমালোচনা) —শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫২
শেষের খেয়া (গল্প)—শ্রীভোলানাথ ঘোষ ... ২২৭
শোক-সংবাদ (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৪৪
শোধ (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায় ... ১৪
শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮৭
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার চিড়িয়াখানা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৩৮
সন্তান-স্নেহ (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৩৬
সরকারী কোন কোন লোকের টেররিজ্‌ম্ আছে কি-না (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৪
সরকারী সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৭৭
সাংখ্য ও যবন দর্শন (সচিত্র) —শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ... ৩০৫
"সাবিত্রীর" ও "দেবী"র ভাগ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৯৪
সাম্প্রদায়িক রাজত্ব ও দাসত্ব প্রথা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৮৮৮
"সাম্রাজ্য দিবসে" প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৪৩
সাহিত্যসৃষ্টি—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ... ২১
সুইডেন (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ ... ১৮২
সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭২৫
সূর্য্যালোক ও কাঠালোকের সম্বন্ধ (কষ্টি) —শ্রীসহায়রাম বসু ... ৩০৭
সেকালের বিলাসিতা —শ্রীবসন্তকুমার বিদ্যারত্ন ... ৫০৪
স্পাই (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৪৯
স্বর্ণকুমারী দেবী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫৭৭
স্বাগতা (উপন্যাস)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩২১, ৪৫৫, ৬০২, ৭৫২
হলদীঘাটের যুদ্ধ ও মহারাণা প্রতাপের শেষজীবন —শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ৬২৬
হাফেজ (সচিত্র)—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ... ৩১৫
হিংসা ও অহিংসার বিরুদ্ধে একই অস্ত্র প্রয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ২৮৯
হিন্দুরাজও নয়, মুসলিম রাজও নয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৭২১

চিত্র-সূচী

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান শিশু ... ১৪০
ইউরোপে প্রথম জাপানী রাজদূত ... ৭১৬
ইন্দুমতী বক্সী, শ্রীমতী ... ৭১৩
ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক (রঙীন) ... ১২০
একাকী (রঙীন)—শ্রীকনু দেশাই ... ৫৪৪
কচুরিপানা পূর্ণ খাল ... ৩০৮
কমলরাণী সিংহ ... ৭১৩
করুণাকণা গুপ্ত, শ্রীমতী ... ৪১০
কল্যাণী গুপ্ত, শ্রীমতী ... ৫৬৭
কীর্ত্তনে (রঙীন)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ২০৮
কুকা, মিস্ ডি ... ৭১৪
গাছের তলায় (রঙীন)—শ্রীসুধাংশু রায় ... ২৫৬
গোয়ালিনী (রঙীন)—শ্রীসোমলাল শা ... ৮১৬
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ... ৭১৪
চীন-জাপান যুদ্ধ—জাপানী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা ... ১৩৭
বিধ্বস্ত সাংহাই ... ১৩৭
চীনদেশের ছেলেদের খেলা (চিত্রে) ২৫৭—২৬১
চীনের হলদিঘাট (চিত্রে) ... ১৩৮
চুল ও দাঁতের জোর (চিত্রে) ... ৫৮
ছেলেদের চিড়িয়াখানা ... ৭১৫
জলধর সম্বর্দ্ধনা ... ২৬৮
জাহান্‌ আরা চৌধুরী, শ্রীমতী ... ৭১২
জৈন জল-মন্দির ... ১৮৮
ঝড়ের পর (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৩২
ঢেউ (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ... ৬৪০
ঢোণ্ডো কেশব কার্ভে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ... ৫৬৮
তেহারানে আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কবিকে অভ্যর্থনা ... ৩১২
তেহারানে গৃহীত কবির আলোক চিত্র ... ৩১২
তেহারানের আমেরিকান কলেজ-উদ্যানে কবির বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ... ৩১২
দুয়ারে (রঙীন)—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ... ১৬১

নক্ষত্রের জন্মকথা—চিত্রে	৬৪২-৬৪৫	—পারস্য ভ্রমণ—করিম খাঁ জেন্দ	৮৬৬
নাগার্জুন কুণ্ডে	৫৬৯, ৫৭০	—কাজেরুণ—দূরের দৃশ্য	৭০৩
নারী কর্ম্মি-মণ্ডলী—'অলিম্পিক' ক্রীড়া	৭১৫	—কাজেরুণের পথে পাহাড় ও সেতু	৭০২
নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ	৪০৯	—কাজেরুণের পথে-ভাঙা সেতু এবং পুলিসের ঘাঁটি	৭০১
নালন্দায় দুই দিন—একটি মূর্ত্তি	৭৭৫	—কাজেরুণ—বাস-এ-নজরের পুষ্পোদ্যান	৭০৩
কুমোর	৭৭৪	—পারস্য—কোনার তখ্‌তে চাষার বাড়ি	৭০২
খিলানের ভিতরের মূর্ত্তি	৭৭৫	—দমদমে যাত্রারম্ভ	৫৫৩
ঘাষ্‌রাওয়ালীদের তাঁবু	৭৭০	—নক্স-ই-শাপুর	৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১
দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ঘাট, পাটনা	৭৭০	—বুশীর এরোড্রোম	৫৫৫
পল্লীবাসীদের জল-তোলা	৭৭৪	—বুশীর, ব্রিটিশ কন্সলেটের কাছে	৫৫৬
পাটনার গোলাঘর	৭৭১	—বুশীর হইতে যাত্রা	৭০০
বুদ্ধ মূর্ত্তি	৭৭৬	—বুশীরে কবির গাড়ীর কাছে ভিড়	৫৫৮
মাঠের মাঝে ভগ্ন মূর্ত্তি	৭৭৫	—বোরস্‌জানে পুলিসের ঘাঁটি	৭০১
মুদিনীর দোকান	৭৭২	—রবীন্দ্রনাথের এরোপ্লেন বুশীরে নামিতেছে	৫৫৯
মুসাফর, নালেন্দার	৭৭৩	—রাজনিমন্ত্রিতের দল	৫৬০
ক্ষুদ্র পল্লী নালন্দার	৭৭৫	—লেখকের হোটেল হইতে বুশীরের দৃশ্য	৫৫৭
*নির্ব্বাণ (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৩৮৪	—শিরাজ	৭০৪
শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৪	—শিরাজ আহমোদিয়া উদ্যানে চায়ের নিমন্ত্রণ	৭০৫
নীলরতন সরকার, স্যর	৮৯২	—শিরাজ প্রবেশ	৭০৪
পল্লীশিল্প—কাঠের পানের বাটা	৫২৭	—শিরাজ—বাগ মহম্মদিয়ে প্রাসাদে কবির অবতরণ	৭০৫
কাঠের পুতুল	৫২৩	—শিরাজের গভর্ণর এবং কবি	৭০৮
কাঁথার মাঝে পদ্ম	৫২৩	—শিরাজের বাহিরের দৃশ্য	৮৬৫
চিনির খেলনা বা সাজ	৫২৫	—শিরাজের মস্‌জিদ	৮৬৬
দোতালা ঘর	৫২৭	—শুষ্টর, নৃপতি শাপুর নির্ম্মিত কারুন নদীর বাঁধ	৮৭২
লক্ষ্মী পূজার সরা	৫২১	—সাদীর কবরগৃহের সম্মুখে	৭০৭
ফরিদপুরের মাটির পুতুল	৫২২, ৫২৫	—সাদীর কবর স্থান	৭০৬
বেতের তৈরি গহনার ঝাঁপি	৫২২	—সাদীর কবরোদ্যানে কবিকে নাগরিক অভিনন্দন	৭০৬
বেতের তৈরি পানের ঝাঁপি	৫২২	—হাফিজিয়ে	৮৬৭
মাটির হাঁস, ঘোড়া, সিংহ, টিয়া	৫২৫	—হাফেজের কবর	৭১০
লক্ষ্মী পূজার সরা	৫২১, ৫২৪, ৫২৫	—হাফেজের কবরের পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ	৭০৯
লক্ষ্মীর পদচিহ্ন	৫২৮	—পানা পরিষ্কারের পরে খালের দৃশ্য	৩৩৯
শঙ্খপদ্ম—আলপনা	৫২৬	শ্রীপুনামচাঁদ শেঠিয়া	১৮৭
শিকা	৫২৬	*পূজারিণী (রঙীন)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	৭৩৭
পশ্চিম-আফ্রিকার 'অ্যামাজন' নিগ্রো রমণী	১৩৯	প্রতাপসিংহ (মহারাণা)	২১৫
পাণ্ডুয়া—আদিনা মস্‌জিদ	৫০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪৬
একলক্ষী মস্‌জিদ	৫৩	মানে—লোলা	৩৮৫
পরিখা-প্রাচীরবেষ্টিত পৌণ্ড্রনগর	৫৪	—ফরাসী ইম্‌প্রেসনিষ্টদের কথা—	
রাজবাড়ীর জরিপী নক্সা	৫৫	পিসারো—"কিশোর ঢোল-বাদক"	৩৯৩
রাজসিংহাসন	৫১		
সিংহাসন-কক্ষ	৫১		
সিংহাসন-বেদীতে উঠিবার প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান	৫২		
সেকেন্দর শাহের সমাধি	৫২		

মানে—"ল্যা ব্বঁ বাক্" ... ৩৮৫
মোনে—"টেম্‌সের তীরে পার্লামেণ্ট" ... ৩৮৯
"রুয়ঁ ক্যাথিড্রাল" ... ৩৯০
"স্নানের ঘাট" ... ৩৮৯
রেনোয়ার—"বাগানে প্রাতরাস" ... ৩৯১
—নিদাঘে
সিসলে—"নদীতীর" ... ৩৯৩
সিঞাক—"বন্দরে" ... ৩৯৪
স্যরা—"বেড়াবার বাগান" ... ৩৯৪
ফুলের তোড়া (রঙীন)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ... ৮৬৬
বগদাদ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা ... ৩১২
বধূবরণ (রঙীন)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৭৩
বয়েজ নার্সারি হোম—একটি ক্লাস ... ৪২৬
ফুটবল খেলা ... ৪২৬
ব্যায়াম ... ৪২৬
বর্ষায় (রঙীন)—প্রাচীন রাজপুত চিত্র ৪৯৬
বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম—অধিবাসিনীগণ ... ৪১১
—মেয়েরা বাগানে কাজ করিতেছে ... ৪১১
বাংলার রসকলা সম্পদ—শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াই বুড়ি ... ১১০
—গোষ্ঠ-লীলা ... ১০৯
—দশরথের মৃত্যু ... ১০৯
—দোলনায় ... ১০৪
—নাপিত ও নাপিতানী ... ১০৬
—পরী ও হাতী ... ১০৫
—ব্যায়ামরতা নারী ... ১০৬
—মাহুত ও হাতী ... ১০৪
—রাধার প্রসাধন ... ১০৭
—রামচন্দ্র ও গুহক ... ১০৮
বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত—অবতার নৃত্য, ফরিদপুর ৮১০, ৮১১
—কাঠি নৃত্য, বীরভূম ... ৮০৮
—জারি নৃত্য, ময়মনসিংহ ... ৮১৫
—ধর্ম্মপূজার নৃত্য, বীরভূম ... ৮১২
—ধূপ নৃত্য, ফরিদপুর ... ৮১০
—ব্রত নৃত্য, যশোহর ৮১১, ৮১৩, ৮১৬
—মাদল পূজায় নৃত্য ... ৮১৬
—রায়বেঁশে নৃত্য ৮১৩
বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল—ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেনদের বাসগৃহ ... ২৫৬
—নীলাম্বর ভবন ... ২৫৩
—নূতন কুটীরসমূহ ... ২৫৬
—পুরুষদের অস্ত্রোপচার-গৃহ ... ২৫৪
—প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী ... ২৫৪
—প্রসব করাইবার গৃহ ... ২৫৫
—প্রাইভেট ওয়ার্ড ... ২৫৬
—সংক্রামকরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র রাখিবার গৃহ ... ২৫৫
—সাধারণ অস্ত্রোপচার-গৃহ ... ২৫৫
—স্কুলগৃহ ... ২৫৩
—স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা-গৃহ ... ২৫৫
—হাসপাতালের রেসিডেণ্ট-সার্জ্জনের আবাস গৃহ ... ২৫৪
বাঘ ও হাতী ... ১০৫
বাটলিওয়ালা, মিস ভিখু ... ৭১৩
বাঁশরী (রঙীন)—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার ... ৩৪৪
বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রী ... ৪২৭
বিদেশের কথা—গ্রিমসেল্ হ্রদ ... ৬১৪
—গ্লেশিয়ারের একাংশের দৃশ্য ... ৬১৫
—রোন্ গ্লেশিয়ারের সুড়ঙ্গ ... ৬১৭
বিপিনচন্দ্র পাল ... ৪৩৫
বিরহী যক্ষ (রঙীন)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে ... ৩০৫
মত্ত হস্তী (রঙীন)—কাশী ভারত-কলাভবনের সৌজন্যে ... ১
মন্দিরের পথে (রঙীন)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ
মায়ালতা সোম শ্রীমতী ... ৪০৯
মোহেন-জো-দাড়ো—খনন কার্য্য ... ৮৩৪
—গলি ও বাড়ি ... ৮৩৬
—চীনামাটির টুকরা, বোতাম ও মীনার কাজ ... ৮৩৫
—ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য ... ৮৩৩
—নরকঙ্কাল ... ৮৩৭
—নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টিযোগীর মূর্ত্তি (পার্শ্বচিত্র) ... ৩০৭
—নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি যোগীর মূর্ত্তি (সম্মুখ) ... ৩০৯
—বড় চৌবাচ্চার উত্তর প্রান্তের ধাপ ... ৮৩৬
—মুদ্রায় যোগাসনস্থ পশুপতির চিত্র ... ৩১১
—মুদ্রায় যোগীর পূজার চিত্র ... ৩১২
যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী—কৃষ্ণ রাজা ... ১৩১
জমিদার-গৃহিণী ... ১২৮
নরমেধ যজ্ঞ (ঊর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশ) ... ১৩০
বাল্মীকি ও লবকুশ ... ১৩২
বিশ্রামরত সম্ভ্রান্ত বাঙালী ... ১২৮
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও তাঁহার পত্নী ... ১২৯
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোক ... ১২৭
রবীন্দ্রনাথ ও বেদুঈন শেখ ... ৩১৩

রমলা দে, শ্রীমতী ... ৪১১
রমা সরকার, শ্রীমতী ... ৫৬৬
রেঙ্গুনের বাসভবনে কবির সান্ধ্যভোজন
(বুশীরে) ... ৩১৩
লণ্ডনে প্রদর্শিত বাঙালী চিত্রকরের ছবি—
কাঁসিমণীর—শ্রীসারদাচরণ উকিল ... ১৪৪
—ঝান্সীর রাণী—শ্রীসারদাচরণ উকিল ... ১৪৩
ফনীন্দ্রনাথ বসু ...
বুদ্ধ, জননী ও মৃত শিশু ... ১৪৪
লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য-সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ ... ২৭০
ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপজাতি—একটি ল্যাপ ... ৭৮০
—এঞ্জিনের সম্মুখভাগে তুষার পর্ব্বত কাটিবার যন্ত্র ৩৫৯
—এরোপ্লেনে হাসপাতালে গমন ... ৩৫০
—কুকুর ও ল্যাপ শিশু ... ৩৩৫
—কুটীরের বাহিরে ল্যাপ-গৃহিণী ... ৩৪৮
—তুষারপর্ব্বত ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতেছে ... ৩৬৯
—তুরী, যোহান্, ল্যাপ কবি ও গ্রন্থকার ... ৭৮১
—দুইটি ল্যাপ শিশু পুস্তকের ছবি দেখিতেছে ... ৩৫১
—দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বনভূমিতে ছত্রভঙ্গ
হরিণ পালের উপর দৃষ্টি রাখা হইতেছে ... ৩৫১
—পাঠরত ল্যাপ শিশু ... ৩৪৮
পার্ব্বত্যপ্রদেশে হরিণের যাত্রা ... ৩৫০
—প্রবন্ধ-লেখক ... ২৪৫
—বনে কুটীর স্থাপন ... ৭৮১
—বল্‌গা হরিণের দল সাঁতার কাটিয়া হ্রদ
পার হইতেছে ... ৭৭৮
—বল্‌গা হরিণের বরফের নীচে খাদ্যান্বেষণ ... ৭৭৮
—বিদ্যালয়ের নূতন ধরণের বাড়ী ... ৭৭৭
—বিশ্বস্ত কুকুর সহ শ্রী পার্থপূজী ... ৭৮০
—বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত একুশ শত টন
লৌহ বোঝাই গাড়ী ... ৩৪৯
—ভ্রাম্যমাণ ল্যপদের চিরাচরিত জীবন-যাপন ... ৩৫১
—মালপত্র ও হরিণ শিশুদিগকে হরিণের
উপর চাপাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে যাত্রা ... ৭৮০
—রাখাল-বালিকা পর্ব্বতের পাদদেশে
হরিণপালসহ বিশ্রাম করিতেছে ... ৭৭৯
—রেডক্রস্ এরোপ্লেন ... ৩৫০
—ল্যাপ বিদ্যালয় ... ৩৪৭
—ল্যাপ মাতা ও কন্যা ... ৩৪৭
—ল্যাপ যুবক ও বল্‌গা হরিণ ... ৩৪৭
—শীতবস্ত্রে লেখক ... ৩৪৬
—সারা বৎসরের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ ... ৭৭৯
—'স্লেজ' নৌকায় ল্যাপ শিশু ... ৩৫০
শিরাজের মস্‌জিদ ... ৩১৯
সন্ধ্যা (রঙীন)—শ্রীভুবন ... ৬৮৮
সরস্বতী নন্দী, (ডাঃ) ... ৭১২
সরোজিনী দত্ত, শ্রীযুক্তা ... ৭১২
সারদাচরণ উকিল শ্রী ... ১৪৩
সুইডেন—অরোরাবরিয়ালিস্ মেরুপ্রদেশের
আলোর নৃত্য ... ১৯৮
—আগষ্ট ষ্ট্রিনবের্গ ... ১৯০
—এরোপ্লেন হইতে তোলা ষ্টক্‌হল্‌মের দৃশ্য—
মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদ ... ১৯৪
—কার্লস্‌ফেল্ড ... ১৯৩
—গুস্তাভ ফ্রয়োডিং ... ১৯১
—ছাত্রদের স্কেটিং খেলা ... ১৯৯
—জলপ্রপাত স্তোরা সোফালেং ... ১৯৬
—তবনে ট্রাঙ্কের নিকটবর্ত্তী তুষারমালা ... ১৯৬
—বরফে আচ্ছন্ন গাছপালা ... ১৯৭
—মধ্যরাত্রির সূর্য্য ... ১৯৮
—মানচিত্র ... ১৮৯
—'জল প্রপাত' ... ১৯৬
—ল্যাপ ল্যাণ্ডের বিখ্যাত পর্ব্বত
'কেবনেকাইসের' শিখর ভাগ ... ১৯৬
—ষ্টক্‌হল্‌মের টাউন হল ... ১৯৪
—ষ্টক্‌হল্‌মের নৈশ দৃশ্য ... ১৯৫
—ষ্টক্‌হল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান ... ১৯৫
—ষ্টক্‌হল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যানের এক অংশ ... ১৯৩
—সেফটি ম্যাচের আবিষ্কারক লুণ্ডষ্ট্রম্ ... ১৯০
—(লেখিকা) সেল্‌মা লাগেরলফ ... ১৯১
—হাইডেনষ্টাম্ ... ১৯২
—সুরভি সিংহ, শ্রীমতী ... ৪০৯
সুরেশচন্দ্র দাস শ্রী, ... ৫৬৪
সুলোচনা শ্রীখণ্ডী, ডাঃ ... ৭১২
সুষমা সিংহ, শ্রীযুক্তা ... ৪১০
সোভিয়েট রুশিয়ায় শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের
অবস্থা— ৫৭১, ৫৭২
সৌদামিনী দেবী শ্রীমতী ... ৭১৪
স্বর্ণকুমারী দেবী ... ৫৭৮
হনুমানের লঙ্কাদাহন (রঙীন)
—শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী ... ৭৭৬
হাফেজিয়া (হাফেজের সমাধি-উদ্যান) ... ৩১৭
হিমালয়ের চটি (রঙীন)
—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ... ৫৯৩
শ্রীহৃষীকেশ সুর মহাশয়ের বিদায়-
অভিনন্দন সভা ... ৫৬৫
হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্তা ... ৪২২

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পাল—
শিল্পী (কবিতা) … ৬৯

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস (কষ্টি) … ৬৬৭

শ্রীঅনিলবরণ রায়—
অর্পণ (কবিতা) … ৭৪৯

শ্রীঅবলা বসু—
নারী-সমবায় ভাণ্ডার … ১১৮

আবুল হুসেন—
মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা (আলোচনা) ৮৩০

শ্রীআশা দেবী—
বিশ্ব-ভারতী নারীবিভাগ … ৪০৪

শ্রীইন্দুষণ দেব বিদ্যাবিনোদ—
রবীন্দ্র-প্রশস্তি (কবিতা) … ৫৫১

শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী—
অসময়ে (কবিতা) … ৫১৬
তারার মত মরা (কবিতা) … ৮৩৮

শ্রীকামিনী রায়—
যামিনী সেন, ডাক্তার (কষ্টি) … ৫১৭

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো—
পদ্মাবত কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা ৮১
মহারাণা প্রতাপ সিংহ (সচিত্র) … ২১৩
হলদীঘাটের যুদ্ধ ও মহারাণা প্রতাপের শেষজীবন ৬২৬

শ্রীকালীমোহন ঘোষ—
কর্ম্মী-সংগঠন … ৮৪৬

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—
পারস্য-ভ্রমণ (সচিত্র) ৫৫২, ৭০০, ৮৬৫

শ্রীক্ষিতীশ রায়—
বেড়ার ধারের ফুল (কবিতা) … ৩৮

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—
অনামী (গল্প) … ৬৩৫

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ—
বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ … ৩৭২

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু—
গীতা ৩৯, ২০০, ৩৩১, ৫০৯, ৬৭২, ৭৮২

শ্রীগুরুসদয় দত্ত—
বাংলার রসকলা-সম্পদ (সচিত্র) … ১০১
বাংলার লোকনৃত্য ও লোক-সঙ্গীত (সচিত্র) ৮০৯

শ্রীগোপাললাল দে—
মেঝেরি (কবিতা) … ২৩৬

শ্রীগৌরীহর মিত্র—
চণ্ডীদাসের পদাবলী (আলোচনা) … ৩৬২

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
যোগাযোগ (সমালোচনা) … ২২১
শেষের কবিতা (সমালোচনা … ৩৫২
সন্তান-স্নেহ (গল্প) … ৩৩৬

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—
বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ … ৪৫

জসীম উদ্দীন—
পল্লীশিল্প (সচিত্র) … ৫২০

শ্রীদীননাথ সান্যাল—
বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা … ১৭৪

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—
চণ্ডীদাসের পদাবলী … ১৬৫
রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা … ৬৪
স্বাগতা (উপন্যাস) ৩২১, ৪৫৫, ৬০৩, ৭৫২

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী—
প্রতাপাদিত্যের কথা (আলোচনা) … ৮৬২

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার—
তিনশো পঁয়ষট্টির এক (গল্প) … ২১৩

শ্রীনিখিলনাথ রায়—
প্রতাপাদিত্যের কথা …
প্রতাপাদিত্যের কথা (আলোচনা) … ৫৩৯

শ্রীপারুল দেবী—
বিদেশের কথা (সচিত্র) ... ৬১২
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী—
বেলা পড়ে আসে (কবিতা) ... ৪২৪
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—
হাফেজ (সচিত্র) ... ৩১৫
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—
বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ (আলোচনা) ... ১২২
শ্রীবসন্তকুমার বিদ্যারত্ন—
সেকালের বিলাসিতা ... ৫০৪
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য—
সাহিত্য সৃষ্টি ... ২১
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—
শিক্ষাসঙ্কট (গল্প) ... ৭৯৭
শোক-সংবাদ (গল্প) ... ২৪৪
শ্রীবিমল মিত্র—
ছায়ার মায়া (গল্প) ... ৪৬৭
প্রেম নাই (গল্প) ... ৮৫৪
শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়—
নিরুদ্দেশ (গল্প) ... ১৭০
শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—
আমারে বেসেছি ভাল (কবিতা) ... ৮৪৯
শ্রীবীরেশ্বর সেন—
তারা (আলোচনা) ... ১২৩
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (কষ্টি) ... ২৩৮
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা ... ১৭৮
বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা ... ৪৫৪
শ্রীভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী ও প্রবাসী সম্পাদক—
'দেশের পথে' (আলোচনা) ... ১২২
শ্রীভোলানাথ ঘোষ—
শেষের খেয়া (গল্প) ... ২২৭
মণিলাল সেনশর্ম্মা
রবীন্দ্রনাথের সুর ... ৬৬৮
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু—
ইরা (গল্প) ... ৬১৮
ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্টদের কথা (সচিত্র) ... ৩৮৪
শ্রীমনোজ বসু—
অরণ্য-কাণ্ড (গল্প) ... ২৯
যাও পাখী ব'লো তারে (গল্প) ... ৩৮৭
ম্যাকাই ডোরোথি—
মোহেন-জো-দাড়ো ও প্রাচীন সিন্ধুতীরের সভ্যতা (সচিত্র) ... ৮৩১
শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—
পোড়াকপালী (গল্প) ... ৮৩৯
ভূমিকম্প (গল্প) ... ৩৫৫
শ্রীমৃণাল দাশ-গুপ্তা—
প্রাচীন সাহিত্যে মহিলাকবি ... ২৩৯
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার—
পাণ্ডুয়া (সচিত্র) ... ৫০
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত—
বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি সমিতি (সচিত্র) ... ৩৩৭
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—
কালো মেয়ে ... ৬৮২
পুনরাগমনায় (কবিতা) ... ৩৭১
শ্রীযুগলকিশোর সরকার
অসমাপ্ত ... ৪৯৬
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—
রাধানাথ শিকদার ... ৬৫৫
শ্রীরঙীন হালদার—
রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা (আলোচনা) ... ২৫২
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
অগ্রদূত (কবিতা) ... ১
কুমার (কবিতা) ... ৩
পত্রধারা ৫৬, ১৬২, ৪৫১, ৫৯৪, ৭৫০
পারস্য-যাত্রা ... ৪১৩
প্রথম পূজা (কবিতা) ৭৩৭
বাংলার বানান-সমস্যা (কষ্টি) ... ৮৪৪
ভীরু (কবিতা) ... ৫৯৬

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা ... ৬০১
মানবপুত্র (কবিতা) ... ৬১২
মৃত্যুঞ্জয় (কবিতা) ... ৫৯৩
শান্তি (কবিতা) ... ১৬১
সাঁই (কবিতা) ... ৪৪৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র—
মনস্কাম (গল্প) ... ৬৭৯

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—
কামরূপ রাজমালা ... ৬১
গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি ... ৪৭৯
শশাঙ্কের কলঙ্ক—রাজ্যবর্দ্ধন হত্যা ... ৭৫২
সাংখ্য ও যবন দর্শন (সচিত্র) ... ৩০৫

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা ... ১৩৩
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা (আলোচনা) ... ৮৩০

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়—
উড়িষ্যা ও ভারতবর্ষ ... ৪৬৩

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—
ঐক্যের একটি পথ (কষ্টি) ... ৪০৬

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ—
ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ জাতি (সচিত্র) ৩৪৫, ৭৭৭
সুইডেন (সচিত্র) ... ১৮৯

শ্রীশান্তা দেবী—
পথবাসিনী (গল্প) ... ৫৪৪
পুনা ও ভোর ... ১৭৯
শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী (সচিত্র) ১২৭

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—
গয়লানী (গল্প) ... ৪:৯
মুদী (গল্প) ... ২৬২

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
নদীমাতৃক বঙ্গদেশ ... ৮৫০

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—
বাক্যহারা (কবিতা) ... ৪৯
মনের পদ্ম (কবিতা) ... ৬৩০

শ্রীসংগ্রাহক—
চীনদেশের ছেলেদের খেলা (সচিত্র) ... ২৫৭

শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর—
নক্ষত্রের জন্মকথা (সচিত্র) ... ৬৪০

শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায় চৌধুরী—
নালন্দায় দুই দিন (সচিত্র) ... ৭৬৯

শ্রীসরলাবালা সরকার—
নিবেদিতার স্মৃতি ... ৭৬১

শ্রীসহায়রাম বসু—
সূর্য্যালোক ও কাষ্ঠালোকের সম্বন্ধ (কষ্টি) ... ৪০৭

শ্রীসীতা দেবী—
মাতৃঋণ (উপন্যাস) ৯৩, ২০৫, ৩৬৪, ৪৯৮, ৬৪৭, ৭৮৯

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী—
শৃঙ্খল (উপন্যাস) ৭০, ২৭১, ৩২৭, ৫২৯, ৬৮৭, ৮১৭

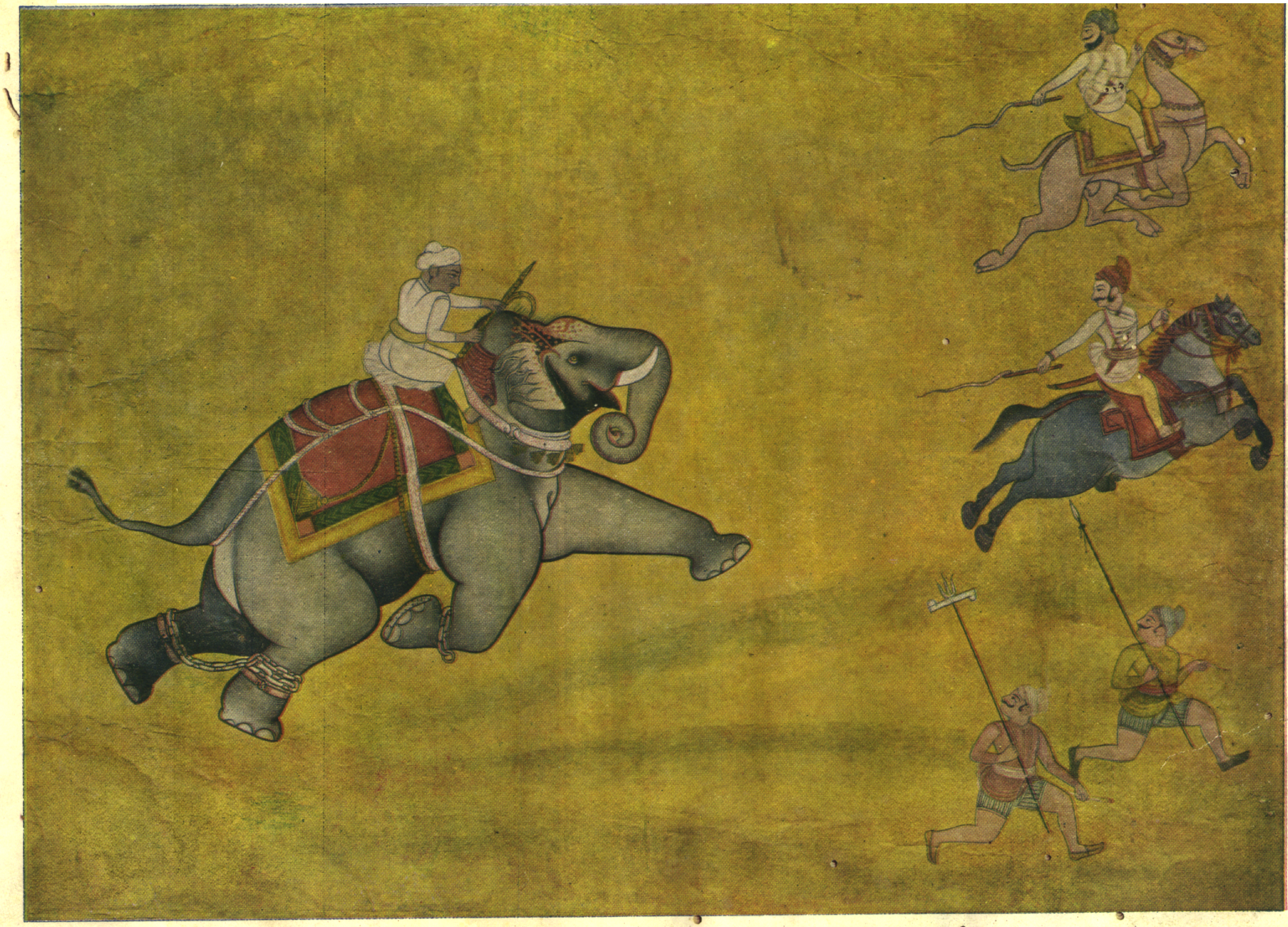
শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত—
ট্রেনে এক রাত্রি (গল্প) ... ১১৩

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
চৈত্যমঠ (কবিতা) ... ৪৭৮

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
আজব রোগ (গল্প) ... ৩৪১
নরদেবতা (গল্প) ... ৭৬৫

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—
পুরুষোত্তম দেব (কষ্টি) ... ৮৪৪
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (কষ্টি) ... ৮৯
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (কষ্টি) ... ৫১৮

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—
জৈন জল-মন্দির (সচিত্র) ... ১৮৭



মত্ত হস্তী

প্রাচীন চিত্র

কাশী ভারত-কলাভবনের সৌজন্যে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৯

১ম সংখ্যা

অগ্রদূত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে পথিক তুমি একা,
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা।
যে পথে পড়েনি পায়ের চিহ্ন
সে পথে চলিলে রাতে,
আকাশে দেখেছ কোন্ সঙ্কেত,
কারেও নিলে না সাথে
তুঙ্গ গিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা ॥

প্রথম যেদিন ফাল্গুন তাপে
নব নির্ঝর জাগে,
মহা সুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।
আছে, আছে, আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।

সেই মতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে, আছে, আছে, এ মহামন্ত্র
প্রতি নিঃশ্বাসে বাজে ॥

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে, নহে, নহে, এ নিষেধ-বাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জ্জন
ভীরু জন মরে ভুলে,
জনহীন পথে সংশয় মোহ
রহে তর্জ্জনী তুলে।
অলস মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে,
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে ॥

নব জীবনের সঙ্কটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী—আছে আছে ॥

১২ চৈত্র
১৩৩৮

কুমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে,
জয়মাল্য-যে পরাবে তোমার কেশে,
বরণ করিবে তোমারে, সে উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি॥

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে, বীর, জাগো ভয়ার্ত্ত ভবে।
ভাই ব'লে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে, রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় ব'লে গলে করিবে মাল্যদান
আনন্দে গৌরবে॥

হের, জাগে সে যে রাতের প্রহর গণি,
তোমার বিজয়-শঙ্খ উঠুক্ ধ্বনি।
গর্জ্জিত তব তর্জ্জন ধিক্কারে
লজ্জিত কর কুৎসিত ভীরুতারে,
মন্দ্রিত হোক্ বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী॥

তুমি এসে যদি পাশে নাহি দাও স্থান
হে কিশোর, তাহে নারীর অসম্মান।
তব কল্যাণে কুঙ্কুম তার ভালে,
তব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে,
তব বন্দনে সাজায় পূজার থালে
প্রাণের শ্রেষ্ঠ দান॥

তুমি নাই, মিছে বসন্ত আসে বনে
বিরহ-বিকল চঞ্চল সমীরণে।
দুর্ব্বল মোহ কোন্ আয়োজন করে
যেথা অরাজক হিয়া লজ্জায় মরে,
ঐ ডাকে, রাজা, এস এ শূন্য ঘরে
হৃদয় সিংহাসনে॥

চেয়ে আছে নারী, প্রদীপ হয়েছে জ্বালা,
বিফল ক'রো না বীরের বরণডালা।
মিলন লগ্ন বারে বারে ফিরে যায়
বরসজ্জার ব্যর্থতা-বেদনায়,
মনে মনে সদা ব্যথিত কল্পনায়
তোমারে পরায় মালা॥

রথ তব তারা স্বপ্নে দেখিছে জেগে,
ছুটিছে অশ্ব বিদ্যুৎ-কষা লেগে।
ঘুরিছে চক্র বহ্নি-বরণ সে যে,
উঠিছে শূন্যে ঘর্ঘর তার বেজে,
প্রোজ্জ্বল চূড়া প্রভাত সূর্য্যতেজে,
ধ্বজা রঞ্জিত রাঙা সন্ধ্যার মেঘে॥

চাহে নারী তব রথ-সঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহভরে,
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে,
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে,
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে॥

প্রতাপাদিত্যের কথা

শ্রীনিখিলনাথ রায়

বাঙ্গালীর ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। বাঙ্গলার সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ থাকিলেও বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছুই নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঐতিহাসিক যুগেও বাঙ্গালীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অবশ্য এ সময়ের কতক পুঁথিপত্র আছে বটে, কিন্তু তাহা যথাসময়ে লিখিত না হওয়ায় এবং কল্পনা ও অতিরঞ্জনে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করা সুকঠিন। সেই সকল পুঁথিপত্র আবার অধিকাংশ স্থলেই প্রবাদ-অবলম্বনে লিখিত। 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ' কথাটা মানিয়া লইলেও, যেখানে মূলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে তাহার সার্থকতা কোথায়? প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আমরা তাঁহার অনেক কথারই মূল খুজিয়া পাই না। যদিও প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে সেকালে ও একালে অনেক পুঁথিপত্র ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তথাপি তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃত ইতিহাস হইতে প্রতাপ-সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু আনুপূর্ব্বিক কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই আমরা প্রতাপের সম্বন্ধে লিখিত ও কথিত বিবরণসমূহ আলোচনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে-সকল জেস্যুইট পাদরী এদেশে আসিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম কথা। তাঁহাদের কথা লইয়া ডুজারিক, সামুয়েল পার্শা প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই ক্রমে প্রচারিত হয়। কিন্তু এদেশে ইংরেজ-আগমনের পূর্ব্বে অবশ্য এ-সকল কথা লোকে জানিতে পারে নাই। ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবদুল লতীফের

ভ্রমণ-কাহিনী ও মির্জ্জা সহন লিখিত বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের কথা জানা যায়। তাঁহারা ভারতবাসী হওয়ায় তাঁহাদের লিখিত বিবরণ যে এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়, রামরাম বসু-প্রণীত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রই ইহার প্রমাণ। বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পারসিক ভাষায় প্রতাপাদিত্যের কিছু কিছু বিবরণ আছে, কিন্তু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ না থাকায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে বোধ হয় বসু-মহাশয় বাহারিস্তান প্রভৃতির কথা অবগত ছিলেন, বাহারিস্তানের কোন কোন কথা তাঁহার গ্রন্থেও দেখা যায়। রাজনামা নামে এক পারসিক গ্রন্থের কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এক্ষণে কিন্তু তাহার অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। সে যাহা হউক আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী ও বাহারিস্তান প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছে এবং অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সে-কথা জানাইয়া দিয়া প্রতাপাদিত্যের শেষ-জীবন সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রদান করিয়া যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন,সে কথা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। পাদরীগণ, আবদুল লতীফ ও মির্জ্জা সহন প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক, কাজেই তাঁহাদের বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত কথা অনেক পরিমাণেই জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ সকল বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের এক এক সময়ের কথাই জানা যায়, তাঁহার আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত বিবরণ কি তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই সকল বিবরণের পর আমরা ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত, ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গল হইতে প্রতাপের কোন কোন বিবরণ জানিতে পারি। কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

ইতিহাসের সহিত তাহাদের যথেষ্ট অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের কথাই সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই রামরাম বসু মহাশয় তাঁহার রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতাপাদিত্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহ-মুখশ্রুত বিবরণ ও কোন কোন পারসিক ভাষায় লিখিত বিবরণ দেখিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে কিছু কিছু ইতিহাসের কথা থাকিলেও জনশ্রুতি যে তাহার প্রধান অবলম্বন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাকে প্রতাপের প্রকৃত বিবরণ বলা যায় না। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার বসু-মহাশয়ের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার গ্রন্থের যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে নূতন কোন কথাই নাই। তাহার পর গবরমেণ্টের Gazetteer, Statistical Account প্রভৃতিতে ঐ সকল গ্রন্থ ও প্রবাদ অবলম্বন করিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক উপন্যাস গ্রন্থেও কিছু কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ঔপন্যাসিক বিবরণই অধিক। অবশেষে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, দুঃখের বিষয় তাহাতেও অনেক স্থলে প্রবাদই স্থান পাইয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কোন কোন উপন্যাস ও নাটকও রচিত হইয়াছে। ইহার পর আমরা প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত বিবরণসমূহ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের 'প্রতাপাদিত্য' প্রকাশ করি। তাহার পর অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 'প্রবাসী' পত্রে আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী ও বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ দিয়া নূতন তথ্য জানাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার যশোহর খুলনার ইতিহাসে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত প্রবাদ ও কল্পনা বিজড়িত করিয়া এরূপ করিয়া তুলিয়াছেন যে, কোন্‌টি প্রকৃত ইতিহাস, কোন্‌টি প্রবাদ বা কল্পনা তাহা স্থির করা কঠিন। আমরা এই সকল বিবরণ আলোচনা করি প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সে-সময়ের প্রকৃত ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রবাদ সকলের মূল কিরূপ তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব। এ-প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপেই প্রতাপের জীবনী আলোচনা করিব।

বার-ভুঁইয়া

মোগল-আমলে বঙ্গদেশে বারজন ভুঁইয়ার কথা জানা যায়, ইঁহারাই বাঙ্গলার প্রকৃত মালিক ছিলেন। আকবর-নামা, ডুজ্জারিক ও পার্শার গ্রন্থ এবং রামরাম বসু প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে একথা জানা গিয়া থাকে। কাজেই মোগল-আমলের এই বার-ভুঁইয়ার কথা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। হিন্দু-আমল হইতে এই বার-ভুঁইয়া প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে হিন্দু রাজত্বকালে বার-ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কোন কোন ইংরেজ লেখকও হিন্দু-আমলের বার-ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও মোগল-আমলের বার-ভুঁইয়ার বিদ্যমানতা দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতে যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মোগল-আমলে যে-বারজন ভুঁইয়া ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে। ডুজ্জারিক, পার্শা প্রভৃতি উক্ত বারজনের মধ্যে তিনজনকে হিন্দু ও অবশিষ্ট নয়জনকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হিন্দু তিনজন শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকান বা চান্দেকানের রাজা। আমরা জানিতে পারি, চাঁদরায়-কেদাররায় শ্রীপুরের, কন্দর্পরায়-রামচন্দ্র রায় বাকলার ও প্রতাপাদিত্য চ্যাণ্ডিকানের রাজা। কাজেই প্রতাপাদিত্য যে বার-ভুঁইয়ার অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ভুঁইয়াদের মধ্যে ইশা খাঁর নামই দেখা যায়, তিনি সকল ভুঁইয়ার প্রধান বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থে এবং আকবরনামায়ও উল্লিখিত হইয়াছেন। কেহ কেহ অবশিষ্ট আটজনের মধ্যে কোন

হিন্দু ভুঁইয়ার নামোল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বংশ-পরিচয়

কুলগ্রন্থ, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ ও বংশপরম্পরায় প্রচলিত বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের বংশ-পরিচয় জানিতে পারা যায়। এই বংশ-পরিচয়কে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোন কোন ইতিহাসের দ্বারা তাহার কোন কোন কথা সমর্থিতও হইয়াছে। রামচন্দ্র গুহ যশোর রাজবংশের আদি-পুরুষ। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামের নিকট বাস করেন, তথায় বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র সপ্তগ্রামের কাননগো-দপ্তরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। শিবানন্দও কাননগো-দপ্তরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। এই শ্রীহরির পুত্রই প্রতাপাদিত্য। ইহারা সপ্তগ্রাম হইতে পরে গৌড়ে গমন করেন। সে-সময়ে স্থলেমান কররাণী গৌড়ের মসনদে উপবিষ্ট। তিনি দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেও, একরূপ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র দায়ুদের সহিত শ্রীহরির পরিচয় ঘটে, দায়ুদের রাজত্বকালে শ্রীহরি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি লাভ করেন। সে সূত্রেই জানকীবল্লভও 'বসন্তরায়' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। বিক্রমাদিত্য ও কতলু খাঁ দায়ুদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তবকাৎ-ই-আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এ কথা জানিতে পারা যায়। কতলু ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

দায়ুদ বাঙ্গলার শেষ পাঠান নরপতি। ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আকবর বাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে, মোগলেরা তাঁহাকে অনেকবার পরাজিত করিয়া অবশেষে নিহত করে। মোগলদিগের সহিত সংঘর্ষকালে দায়ুদ গৌড় হইতে উড়িষ্যায় পলায়নকালে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন বিক্রমাদিত্যের হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি সে-সমস্ত নৌকা বোঝাই করিয়া দায়ুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তবকাৎ-ই-আকবরী ও বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে একথা জানা যায়। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাঁহারা সুন্দরবনের যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তাহা চাঁদ খাঁ নামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের জায়গীর ছিল। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া তথাকার জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আবাসস্থান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ইহারই নিকটে যশোরেশ্বরী নামে পীঠদেবতার স্থান ছিল। তাহার পর দায়ুদের নিধন ঘটিলে, তাঁহার সেই সমস্ত ধনরত্ন লইয়া বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও যশোর-সমাজ গঠন করেন। তাঁহাদের রাজ্যের চিহ্ন ও যশোর-সমাজ আজও বিদ্যমান আছে। অবশেষে বাদশাহ-দরবার হইতে তাঁহারা তাঁহাদের জমিদারী মঞ্জুর করিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে একজন ভুঁইয়া হইয়া উঠেন।

প্রতাপের বাল্যজীবন

গৌড়েই প্রতাপের বাল্যজীবন আরম্ভ হয় বলিয়া মনে হয়। তথায় তিনি পারসিকাদি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষারও আরম্ভ হয়। পরে যশোরে আসিয়া বিশেষভাবে অস্ত্রপরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বসু-মহাশয় বলেন, একদিন একটি উড্ডীয়মান পক্ষীকে শরবিদ্ধ করিয়া নিপাতিত করায়, বিক্রমাদিত্য দুঃখিত ও ভীত হইয়া প্রতাপকে সভ্যভাবে শিক্ষিত করিবার জন্য আগরায় পাঠাইয়া দেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি ইহাতে আপত্তি করিলে বিক্রমাদিত্য তাহা শুনেন নাই। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফলে তিনি নাকি পিতৃদ্রোহী হইবেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রতাপ আগরায় গিয়া বাদশাহ আকবরকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং যশোরের রাজস্ব যাহা তাঁহার দ্বারা দাখিল করা হইত, তাহা গোপন করিয়া, নিজ নামে যশোর-রাজ্যের সনন্দ লইয়া আসেন। এ-সকল কথার অবশ্য আমরা কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাই নাই।

সুতরাং ইহার সত্যতাসম্বন্ধে বলিতে পারি না। তবে প্রতাপ যে যশোর-রাজ্যের ভুঁইয়া হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য মানিয়া লইতে হয় এবং তাহাও যে বাদশাহের অনুমোদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যশোর-রাজ্য-বিভাগ

প্রতাপের একচ্ছত্রত্বলাভের আশা দিন-দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায়, বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া প্রতাপকে দশ আনা ও বসন্তরায়কে ছয় আনা সম্পত্তি দিয়া যান। যশোর-রাজ্য ভাগীরথী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্ব ভাগ প্রতাপের ও পশ্চিম ভাগ বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। কিন্তু চাকসিরি বা চকশ্রী নামে একটি স্থান পূর্ব্বদিকে বসন্তরায়ের অধিকারে থাকায় প্রতাপাদিত্য তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন এবং বসন্তরায়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠেন। ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও ঘটনাপরম্পরায় এ সকল কথাকে মানিয়া লওয়া যায়। প্রতাপ অবশেষে বসন্তরায়কে হত্যা করিয়া সমস্ত যশোর-রাজ্যের ভুঁইয়া হইয়াছিলেন। যে-সময়ে পাদরীগণ এদেশে আসেন, তখন প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর-রাজ্যেরই রাজা। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

প্রতাপের রাজধানী গঠন

যশোর নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ধূমঘাট নামক স্থানে প্রতাপ তাঁহার রাজধানী গঠন করেন। বসন্তরায় তাঁহাদের স্থাপিত যশোরেই অবস্থান করিতেন। এই দুই নগর পরে এক হইয়া যশোর বা ধূমঘাট নামেই অভিহিত হয়। প্রতাপ যশোরেশ্বরী পীঠদেবতার স্থান নির্ণয় করিয়া তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, বসু-মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন। ধূমঘাটে দুর্গনির্ম্মাণ, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে জাহাজাদি রাখিবার এবং কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি প্রস্তুতেরও স্থান হয়। প্রতাপের কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ সাগরদ্বীপে তাঁহার নৌবাহিনীর প্রধান আড্ডা করিয়াছিলেন। এই সাগরদ্বীপকে ইউরোপীয়েরা চ্যাণ্ডিকান বা চান্দেকান বলিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদের নিকট প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের শেষ রাজা (Last King of Saugur Island) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

উড়িষ্যায় প্রতাপ

প্রতাপ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেও মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা অবলম্বনের ইচ্ছা করিতেন। যখন মোগলেরা উড়িষ্যায় কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানদিগকে দমন করিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্য একবার উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আনীত গোবিন্দ-দেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ হইতে তাহা বুঝা যায়। উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে উক্ত শিবলিঙ্গ উৎকল হইতে প্রতাপকর্ত্তৃক আনীত ও বসন্তরায় কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া লিখিত ছিল, অনেকে তাহা দেখিয়াছেন। প্রস্তর-ফলক, শিবলিঙ্গ ও তাহার মন্দিরের এখন আর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু গোবিন্দদেব আজও বিদ্যমান আছেন। উড়িষ্যায় প্রতাপ কোন্ পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিশ্বকোষে এবং পরে সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাসে প্রতাপ মোগলপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আমরা মনে করি যে, তিনি পাঠানপক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন। কারণ পাঠান-সর্দ্দার কতলু খাঁর সহিত তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একথা আমাদের প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি। মোগলেরা জমীদারদিগকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে কথা অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের সহিত কতলু খাঁর বন্ধুত্ব এবং কতলুর কনিষ্ঠ পুত্র জমাল খাঁকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি-নিয়োগ করায়, প্রতাপাদিত্যের পাঠানপক্ষে যোগদানই যে অধিকতর সম্ভবপর ইহাই মনে হয়। আবার

আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার পরেই মোগলদিগের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

মোগলদের সহিত সংঘর্ষারম্ভ

উড়িষ্যায় প্রতাপ পাঠানদিগের সহিত যোগ দেওয়ায় এবং স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ করায়, মোগলেরা তাঁহার দমনে প্রবৃত্ত হয়। যে-সময়ে আজিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন, সেই সময়ে প্রথমে মোগলদের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথমে আবরাম খাঁ নামে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ইব্রাহিম খাঁ নামে একজন সেনাপতি আজিম খাঁর সময়ে এদেশে ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রতাপের বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বসু-মহাশয় তাঁহার নিপাতের যে কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। ইব্রাহিম খাঁ ইহার পর অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তবে তিনি পরাজিত হইতে পারেন, কারণ আমরা দেখিতেছি স্বয়ং আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ঘটককারিকাতে যে আজিমের নিহত হওয়ার কথা আছে, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য, কারণ আজিম অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তবে যশোর-চাঁচড়ার রাজবংশের কাগজপত্রে ও অন্যান্য প্রমাণে জানা যায় যে, আজিম প্রতাপকে দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকৃত কোন কোন স্থান চাঁচড়া রাজবংশের আদিপুরুষ ভবেশ্বর রায়কে প্রদান করা হইয়াছিল। ভবেশ্বর যুদ্ধে আজিমকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখানে একটা কথা বলিবার আছে যে, ইব্রাহিম ও আজিমের যুদ্ধযাত্রা স্বতন্ত্র কি একই তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বসন্তরায়ের হত্যা

ইহার পর প্রতাপ অনেক দিন পর্য্যন্ত নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি বলসঞ্চয় করিতে চেষ্টা করেন, সৈন্য, হস্তী, রণতরী, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি-নির্ম্মাণের বিপুল আয়োজন এ-সময়ে তিনি করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরে

মোগলদিগের সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহার বিপুল অয়োজনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বলসঞ্চয় আরম্ভ করিয়া প্রতাপের একচ্ছত্রত্বলাভের প্রবৃত্তিও প্রবল হইয়া উঠে, কারণ তিনি পিতৃব্য বসন্তরায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া সমস্ত যশোর-রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বসু-মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ-তিথিতে তিনি যখন শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত, তখন প্রতাপ কাপুরুষতাসহকারে শ্রাদ্ধস্থলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। বসন্তরায়ের কোন কোন পুত্রও প্রতাপের হস্তে নিহত হন। ইহা কোন ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও বসন্তরায়ের বংশীয়গণ পুরুষপরম্পরাক্রমে একথা বলিয়া আসিতেছেন। রামরাম বসু-মহাশয়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতাপের রাজ্যে পাদরীগণ

প্রতাপ যে-সময়ে যশোর-রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময় ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে গোয়ার জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রধান পাদরী নিকোলাস পাইমেণ্টা বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামে দুই জন পাদরীকে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে মেলসিওর ফনসেকা ও এণ্ড্রু বাউয়েস আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। ইঁহারা বাঙ্গলার নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। সোসা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাদরীরা প্রধান প্রধান ভুঁইয়াদের সহিত সাক্ষাৎও করেন। বাকলার রামচন্দ্র রায় ও চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাতের কথা তাঁহারা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান কোথায় সে-কথা আমরা পরে বলিব। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে প্রথমে সোসা ও ৯৯ খৃঃ অব্দে ফার্ণাণ্ডেজ ও ফনসেকা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন। সোসা বরাবরই সেখানে থাকিতেন। রাজা তাঁহাদিগকে খুবই সম্মান করিতেন। এইখানে ৯৯ খৃঃ অব্দের শেষভাগে তাঁহারা একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন, তাহাই বাঙ্গলার প্রথম গির্জ্জা বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু ব্যাণ্ডেল ও

চট্টগ্রামে একই বৎসরে গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। চ্যাণ্ডিকানের গির্জ্জানির্ম্মাণে রাজা ও যুবরাজ পাদরীদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন।

কার্ভালোর হত্যা

পর্ত্তগীজদিগের মধ্যে কার্ভালো নামে একজন সর্দ্দার জলযুদ্ধে বিশেষরূপ দক্ষ ছিল। কার্ভালো শ্রীপুরের ভুঁইয়া কেদাররায়ের অধীনে সন্দীপে অবস্থিতি করিত। আরাকান-রাজ সন্দীপ অধিকারের চেষ্টা করিলে কার্ভালো সেখান হইতে চলিয়া আসে, ক্রমে ক্রমে সে চ্যাণ্ডিকান উপস্থিত হয়। চ্যাণ্ডিকানের রাজা তাহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আরাকানের রাজা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। তিনি কার্ভালোর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এইরূপ কথিত হয় যে, প্রতাপাদিত্য আরাকান-রাজকে ভয় করিতেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি কার্ভালোকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন। কার্ভালো চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে, রাজা প্রথমে তাহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে লইয়া আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়া পাদরী ও অন্যান্য পর্ত্তগীজগণ কার্ভালোর হত্যা আশঙ্কা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে উপদেশ দেন। কার্ভালো কিন্তু চ্যাণ্ডিকান হইতে যশোরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তিন দিন পরে রাজা তাহাকে ও তাহার অনুচর-দিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে তাহাদের হত্যাসম্পাদন হয় বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল। প্রতাপকর্ত্তৃক কার্ভালোর হত্যা সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ইহার অনেক পরে কাশীম খাঁর সুবেদারী সময়ে আরাকান-রাজের একজন পর্ত্তুগীজ সর্দ্দার কাপ্তেন ডোরমশ কার্ভালো তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোগলপক্ষে যোগ দিয়াছিল বলিয়া বাহারিস্তানে উল্লেখ আছে। এই ডোরমশ্ বা ডো-আমো পর্ত্তগীজ ডোমিঙ্গস (Domingos) শব্দের ফারসী অপভ্রংশ। প্রতাপকর্ত্তৃক হত কার্ভালোরও ডোমিঙ্গ নামই ছিল। সুতরাং এই দু-জনই এক ব্যক্তি। কিন্তু এক নামের কি দুই ব্যক্তি হইতে পারে না? আর ডোরমশ ও ডোমিঙ্গকে একই প্রমাণ করিতে চেষ্টা যে কষ্টকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ডুজারিকের গ্রন্থে প্রথমোক্ত কার্ভালোকে ডোমিনিক (Dominique) নামে উল্লিখিত দেখা যায়। কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ পরদিন মধ্যরাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া পাদরীগণ উল্লেখ করিয়াছেন। পাদরী ও অন্যান্য পর্ত্তগীজগণ চ্যাণ্ডিকান হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের গির্জ্জা ভূমিসাৎ হয়। এখানে আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি যে, দুই কার্ভালো একই ব্যক্তি হইলে, যশোরের ঘটনার দীর্ঘকাল পরে কার্ভালোর কোনও সংবাদ না পাওয়ার কারণ বুঝা যায় না। গঞ্জালেশ ফিরিঙ্গীর নামই সে-সময়ে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরাকান-রাজ ও কার্ভালো দুই শত্রুর মিলনও অসম্ভব। সতীশবাবু এ সম্বন্ধে আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবাদ বা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত।

চ্যাণ্ডিকান কোথায়?

চ্যাণ্ডিকান কোথায় এ-সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রতাপাদিত্যে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা নানা প্রমাণে দেখাইয়াছিলাম যে, সাগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। সার টমাস রোর মানচিত্রে এঞ্জিলি বা হিজলীর পরপারে চ্যাণ্ডিকান দ্বীপ (Ile de Chundican) অঙ্কিত আছে। এই মানচিত্র সার টমাস রোর সহচর বেসিনকর্ত্তৃক অঙ্কিত। সামুয়েল পার্শাও লিখিয়াছেন যে, চ্যাণ্ডিকান গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত (Chandican which lyeth at the mouth of the Ganges)। আর বহুস্থলে প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা (The last King of Saugur Island) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব ও সতীশচন্দ্র মিত্র ধূমঘাটকে চ্যাণ্ডিকান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব চ্যাণ্ডিকান প্রদেশকে চাঁদ খাঁর জায়গীর বলিয়া চাঁদখা হইতে চ্যাণ্ডিকান কথার উৎপত্তি মনে করেন এবং ধূমঘাটকেই চাঁদখা জায়গীরের প্রধান স্থান

মনে করিয়া তাহাকেই চ্যাণ্ডিকান নগর বলিতে চাহেন। বেভারিজ সাহেব কোন মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি অবশ্য সার টমাস রোর মানচিত্র দেখেন নাই। সতীশবাবুও ধূমঘাটকেই চ্যাণ্ডিকান বলিতে চাহেন। তিনি সার টমাস রোর মানচিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। ঢাকার নিকট সাতগাঁ অঙ্কিত থাকার কথা বলিয়া উহা অবিশ্বাস্য মনে করেন। অবশ্য উক্ত মানচিত্র জরীপ করিয়া অঙ্কিত নহে, উহাতে কেবল প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থানই দেখান হইয়াছে। কাজেই কোন্ স্থান কোন্‌দিকে তাহা উহা হইতে বুঝিয়া লওয়া যায়। আর ঢাকার পার্শ্বেই সাতগাঁ অঙ্কিত নাই, উভয়ের মধ্যে দূরত্বও দেখান হইয়াছে। গঙ্গার মোহনায় যে চ্যাণ্ডিকান অবস্থিত, আমরা পার্শার এ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সতীশবাবু সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। অবশ্য ধূমঘাট কদাচ গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত নহে। আর ধূমঘাট ও যশোর যে পরস্পর সংলগ্ন ও একই নগর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সতীশবাবুও তাহা স্বীকার করেন। তাহা হইলে কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ যশোর হইতে পরদিন মধ্যরাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে পৌছিলে, উভয় স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তাহা কি বোধ হয় না? বেভারিজ সাহেবও তাহা মনে করিয়াছিলেন। সতীশবাবু এই বিলম্বের কারণ কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিতে চাহেন। এরূপ বলিবার কারণ তাঁহার মত বজায় রাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর তিনি বা ফকনার সাহেব ঈশ্বরীপুরে পূর্ব্ব-পশ্চিমে স্থিত কয়েকটি সমাধি দেখিয়া তাহা মুসলমানদিগের কবর নহে এবং খৃষ্টানদিগেরই সম্ভব বলিয়া সেইখানেই পাদরীদিগের গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল, অতএব ঐ স্থানেই চ্যাণ্ডিকান বলিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত কবরগুলি খৃষ্টানদিগের হইলেও বহু পর্ত্তুগীজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য্য করিত। তাহাদের কবর হওয়া কি সম্ভব নহে? সুতরাং এরূপ যুক্তির কোনই মূল্য নাই। ফলতঃ সাগরদ্বীপই যে চ্যাণ্ডিকান তাহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদখা জায়গীর হইতে তাহার উক্ত নাম হইলেও হইতে পারে। সতীশবাবু প্রতাপের রাজধানী সাগরদ্বীপে ছিল বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। আমরা ধূমঘাট-যশোরকেই প্রতাপের রাজধানী বলিয়াছি। আমাদের প্রতাপাদিত্য দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

জামাতৃ-বিদ্বেষ

বাকলার রাজা কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্দ্র রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী বা বিমলার বিবাহ হইয়াছিল। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপ চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা রাজ্য ও সমাজের আধিপত্যের জন্য বিবাহরাত্রিতেই জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বসু-মহাশয় বলেন যে, বিবাহ-সময়েই ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এক সময়ে রামচন্দ্র যে অধিক দিন নিজরাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র ছিলেন এবং আরাকান-রাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা জানা যায়। রামচন্দ্রের বিবাহসময়ে তাহা হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ এবিষয়ে কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এ-কথাটা যশোর ও বাকলা উভয়ত্রই চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র নিজ পত্নী ও শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে যশোর হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

প্রতাপ ও মানসিংহ

আমরা বলিয়াছি যে, প্রতাপ অনেক দিন নীরব থাকিয়া বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যের গৌরবও দিন-দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। পণ্ডিত, কবি ও অন্যান্য গুণিগণ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া পুরস্কৃত হইতেন। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস তাঁহার গানে প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপের দানও অসীম ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সকল দিক্ হইতে তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হওয়ায় ক্রমে তাঁহার আবার স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তিনি সে-ভাব প্রকাশ করিতেও আরম্ভ করেন। বসন্তরায়ের হত্যার

পর তাঁহার এক পুত্র রাঘব রায় বা কচু রায় প্রথমে উড়িষ্যার ইশা খাঁ লোহানীর নিকট পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের সমস্ত কথা জানাইলে এবং সে-সময়ে পাঠানেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজা মানসিংহকে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আবার বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে মানসিংহ ১৬০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় সুবেদারী করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমবার সুবেদারী সময়ে কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানগণ, ইশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি ভুঁইয়া তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বারে তাঁহার প্রতাপাদিত্যের সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মানসিংহ রাজধানী রাজমহল হইতে যশোর অভিমুখে যাত্রা করিলে, হুগলীর কাননগো দপ্তরের মোহরের ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কয়েকটি পরগণার জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পরগণাগুলির জমিদারী সনন্দের তারিখ ১০১৫ হিজরী (১৬০৬ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে, সুতরাং এই সময়েই মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইসলাম খাঁ চিস্তির সময়ে ভবানন্দ 'মজুমদার' উপাধিলাভ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সে-সময়েও মোগল সেনাপতিদিগকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। ভবানন্দ যে পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের সরকারে কাজ করিতেন, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তিনি মোগল সেনাপতিদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যে দেশদ্রোহী তাহাও বলা যায় না। কারণ তিনি সরকারের কর্ম্মচারী আর প্রতাপাদিত্য সরকারের বিদ্রোহী। নিমকহারামী দোষটাও কম নহে। মানসিংহ যশোর অভিমুখে যাত্রা করিয়া কোন কোন স্থানে নূতন পথ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত সে পথকে আজিও গৌড়-বঙ্গের রাস্তা বলিয়া থাকে। যশোর-দুর্গের নিকটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কয়েক দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষের কোনও ঐতিহাসিক সমর্থন নাই, তবে ভবানন্দের সনন্দ, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ এবং রাজপুতানা-জয়পুরের বংশাবলী পুঁথি হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ প্রতাপের গড় দখল করিয়াছিলেন। উক্ত বংশাবলীতে কেদাররায়ের সহিত মানসিংহের যুদ্ধের কথাও আছে এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে 'শিলাদেবী' নামে প্রতিমা অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী লইয়া যান বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে। আমাদের প্রতাপাদিত্যে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে, একথা যে সত্য নহে তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বংশাবলী ও বসু-মহাশয়ের গ্রন্থেও একথা নাই। বাহারিস্তান তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। নানাদিক্ দিয়া আলোচনা করিলে মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে যে একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া যায়। সংঘর্ষে অবশ্য প্রতাপই পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কচু রায় মানসিংহকে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার সঙ্গে বাইশ জন আমীরও আসেন। এই বাইশ জন আমীর হত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ঈশ্বরীপুরে বার ওমরার গোর বলিয়া কতকগুলি সমাধি আমীরদিগের গোর বলিয়া কথিত হয়। যুদ্ধে হতাহত হওয়া অসম্ভব নহে। কচু রায় যে মানসিংহের নিকট হইতে 'যশোরজিৎ' উপাধি পাইয়া পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

শেষ সংঘর্ষ

ইসলাম খাঁ চিস্তি ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। ইনি ফতেপুর শিকরীর প্রসিদ্ধ ফকীর শেখ সেলিম চিস্তির পৌত্র, যাঁহার নামানুসারে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সেলিম নাম হয়। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ ইসলাম খাঁর দেওয়ান হইয়া আসেন। ইঁহার

অনুচর আবদুল লতীফ খাঁর ভ্রমণ-কাহিনী ও ইসলাম খাঁর অন্যতম সেনাপতি মির্জ্জা সহনের প্রণীত বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের সে-সময়ের কথা জানিতে পারা যায়। ইসলাম খাঁ রাজমহলে আসিলে, প্রতাপের দূত শেখ বদী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে লইয়া নানা উপহার-সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুবেদার রাজকুমারের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া প্রতাপাদিত্যকে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। লতীফ লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থ বলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা ও বিশ হাজার পাইক এবং পনর লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য ছিল। ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় যান ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। পথিমধ্যে অনেক জমিদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য শেখ বদীর সহিত উপহার লইয়া উপস্থিত হন। সুবেদার প্রতাপাদিত্যের সম্মান করিয়া তাঁহাকে ভাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদানের কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেন। প্রতাপ কিন্তু যথাসময়ে সুবেদারের সহিত যোগ দেন নাই। ইহাতে সুবেদার যাঁরপরনাই ক্রুদ্ধ হন। শেষে যখন সংগ্রামাদিত্যকে কতকগুলি রণপোত সহ পাঠাইয়া সুবেদারের নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন সুবেদার ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সকল রণপোত এমারতের জিনিষপত্র বহিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জ্জা সহনকে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য দখল করার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইনায়েৎ খাঁ প্রধান সেনাপতি হইয়া স্থলসৈন্যের এবং সহন রণতরী ও তোপ লইয়া যাত্রা করিলেন। এই সহনই তাঁহার বাহারিস্তান গ্রন্থে এই সকল বিবরণ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঢাকা হইতে নানা নদনদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে ইচ্ছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে সালিখা থানায় প্রতাপের সৈন্যের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। প্রতাপ অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য রণতরী, হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। কমল খোজা ও কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাঁহার সহকারি-স্বরূপে গমন করেন। কমল খোজা নৌসেনার ও জমাল খাঁ স্থলসৈন্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিলে ক্রমে মোগলেরা জয়লাভ করিতে আরম্ভ করে। কমল খোজা নিহত হন। উদয় ও জমাল ক্রমে হটিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে মোগলেরা ধূমঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া হকীম খাঁকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ধৃত হইয়া ঢাকায় নজরবন্দী রূপে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। হকীম খাঁ তাহার পর যশোরে আসিয়া মোগল-সৈন্যের সহিত যোগ দেন। প্রতাপের সেনাপতি জমাল খাঁও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোগলদিগের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে মোগলদিগের বলবৃদ্ধি হইয়া উঠে। মোগলেরা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে, কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের গোলাবৃষ্টির পর প্রতাপ অনন্যোপায় হইয়া ইনায়েতের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। ইনায়েৎ তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া গেলে ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এদিকে মির্জ্জা সহন যশোরে থাকিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্যের কি হইল জানা যায় না, তিনি যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। প্রতাপেরও পরিণাম কি হইয়াছিল তাহাও জানা যায় না। তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আগরায় পাঠাইতে তাঁহার যে বারাণসীতে দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল, ইহার কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নাই। ইসলাম খাঁর সময়েই যে প্রতাপের পতন ইহা বাহারিস্তান সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। বসু-মহাশয়ও সেই কথা বলিয়াছেন।

শোধ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

১

ষ্টেশনের বাহিরে বটতলায় একখানি ছোট ময়রার দোকান। কিন্তু তাহাতে পান-তামাকও বিক্রয় হয়। কানাই দ্বিপ্রহরের ট্রেন হইতে নামিয়াই দোকানের সম্মুখে গিয়া মাথার গাঁঠ্‌রিটা নামাইল। একগাল হাসিয়া দোকানীকে কহিল, "ময়রার পো, ভাল ত ?"

ময়রার পো তখন মাথা নীচু করিয়া একমনে বাতাসা কাটিতেছিল, তাহার আগমন জানিতে পারে নাই। আহ্বানে চোখ তুলিয়া স্মিতমুখে কহিল, "কে ? কানাই যে ? এই বাড়ি আসা হচ্ছে বুঝি ?"

কানাই উত্তর অঞ্চলে কোন্ একটা বড় রেল ষ্টেশনে চাকুরি করে; ময়রার পো'র কাছে তাহার একটু খাতির আছে।

ময়রার পো'র প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া মাথা নাড়িল। ময়রার পো তৈলাক্ত বেঞ্চিখানা দেখাইয়া কহিল, "তা বসা হ'ক্।"

"বস্‌তে পারব না, বেলা গড়িয়ে যায়। তিন ক্রোশ পথ পার হ'তে হবে।"

"কতদিন থাকা হবে ?"

"সাতদিন" বলিয়াই গম্ভীর মুখে পাশের লোকটির হাত হইতে কল্কিটা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কয়েকটা টান দিল। ময়রার পো'র চোখ দু'টি গিয়া পড়িল কানাইয়ের গাঁঠরির গায়ে। জিজ্ঞাসা করিল, "গাঁঠ্‌রির গায়ে ওটা কি ?"

নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কানাই কহিল, "ঠেঙা।"

"আরে না। উই যে সাপের লেজের মত—"

"শাঙস্ মাছের লেজ—"

ময়রার পো বাহির ছাড়িয়া গাঁঠরির ভিতরটাও অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বেই কানাই কল্কিটা লোকটির হাতে ফিরাইয়া দিয়া গাঁঠ্‌রিটা মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল, "চল্‌লাম ময়রার পো। ফির্‌বার পথে আবার দেখা হবে।" তারপর "ঠেঙা" গাছটি ঢক্ ঢক্ শব্দে মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে পথের উপর গিয়া পড়িল।

২

মেটে পথ। শস্য-সবুজ ক্ষেতখামারের মধ্য দিয়া দক্ষিণে-বামে ঘুরিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই উত্তরে, দিলগঞ্জের দিকে। গোযানের যাতায়াতের পথটির মাঝে হাতখানেক গভীর দু'টি খাল;—বর্ষায় জলেকাদায় ভরিয়া উঠে। এখন শুষ্ক ও ধূলি ভরা। দুই পাশে প্রকাণ্ড আম, জাম, কাঁটাল ও সজনে গাছের সারি। মাঝে মাঝে দুই চারিটা জিউলি ও বাবলা গাছও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও কোথাও চারা-খেজুরের চারিধার ঘিরিয়া ভাঁটি, কালকাশুন্দি, শেয়াল-কাঁটা, আশ্‌শেওড়া প্রভৃতির ঘন ঝোপ। ভিতরটা অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। বুলবুল, চড়ুই ও টুন্‌টুনি তাহার আওতায় ছোট নীড় রচনায় ব্যস্ত। ঝোপকে শতপাকে জড়াইয়া, বাঁধিয়া আলোকলতা, ঝুম্‌কোলতা, বন-কলমী ও আরও যেন কি। সময়টা তখন মাঘের মাঝামাঝি। ও-অঞ্চলে শীত আছে। সব গাছে ভাল করিয়া ফুলও ফোটে নাই, ডালে ডালে নব পল্লব ও কলিকার ভারে শিহরণ জাগিতেছে মাত্র। কিন্তু দূরে ও কাছে কোকিলের একটানা স্বরের বিরাম নাই। দক্ষিণ হাওয়া ফসল-ভারের উপর দিয়া দূর হইতে ঝম্ ঝম্ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পথের ধূলা উড়াইয়া, গাছের ডালে দোলা দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সেই উত্তরে দিলগঞ্জের দিকে। কিন্তু গ্রামখানাকে দেখা যায় না; তাহার আগে আর একখানা গ্রাম চণ্ডীপুর—কালো প্রাচীরের মত আকাশের কোলে দাঁড়াইয়া আছে। দূরে এক দল রাখাল বাঁশী বাজাইতেছিল, একটি ঘুঘু বাঁশবনের মাথায় বসিয়া কেবলি বলিতেছে, "বউ তিল ধুবি, তিল ধুবি ?"

নিরুদ্দিষ্টা বধূর উদ্দেশ্যে তাহার অলস সুর ক্ষেতের উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

কিছুদূরে আগে আগে ছইয়ে ঢাকা একখানি গোযান যাইতেছিল ধূলা উড়াইয়া। কানাই হাঁক দিল, "কোথাকার গাড়ী গো?" চালকও উত্তর দিল, কিন্তু কথা বোঝা গেল না। তাহার হাঁকে ছইয়ের নীচে পর্দাখানা একটু সরাইয়া ফুটিয়া উঠিল একখানি কমনীয় মুখের একটি ধার ও কৌতূহলী একটি চোখ। রংটা ফর্সা। কানাইয়ের মনে হইল, মুখখানি বেশ। কিন্তু তাহার লক্ষ্মীর মুখখানি আরও মিষ্ট। সে দীর্ঘপদক্ষেপণে গাড়ীখানাকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গেল।

দেড় ক্রোশ পথ পার হইলেই দক্ষিণে ক্ষেতের পারে গড়ই নদীর বিরাট চর। উদাস হাওয়ায় আকাশ পানে বালুর ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছে। ঐ যে ভাঙনের ফাঁকে ফাঁকে জলের একটু দেখা যায়—নীল, রৌদ্রালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীপারেই লক্ষ্মীর বাপের বাড়ী; দিলগঞ্জের ঠিক পশ্চিমে। লক্ষ্মী যেদিন প্রথম তাহার ঘরে আসে, নদীপারে মেঘ করিয়াছিল, কালো; চারিদিকে থম-থমে ভাব। লক্ষ্মীটা নদীর দিকে তাকাইয়া কি কান্নাই কাঁদিয়াছিল!

পথের দক্ষিণে বাঁশবনের মাথায় তখন সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছে, কানাই চণ্ডীপুরে পৌছিল। ছোট গ্রাম। খানকয়েক খড় ও টিনের ঘর। পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড দীঘি। পথটা গিয়াছে তাহারই তীর ঘেঁষিয়া। দু'টি বধূ তখনও ঘাটে একরাশি কাপড় কাচিতেছে। লক্ষ্মীরও এই রোগ। পুষ্করিণীতে একরাশি সিদ্ধ কাপড় লইয়া কাচিতে বসিবে, তা বর্ষাই বা কি, শীতই বা কি। বারণ মানে না। সেবার তো মরিতে মরিতে সারিয়া উঠিয়াছে। কানাইয়ের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। লক্ষ্মী এখন ভাল আছে ত? দীঘিটা পার হইতেই দক্ষিণ দিক হইতে কে যেন হাঁকিল, "আরে কে ও? কানাই যায় না কি?"

কানাই ফিরিয়া দেখে, ঘরের পাশে গদাই দাস রৌদ্রে বসিয়া পাটের দড়ি পাকাইতেছে। গদাই কহিল, "এই আসা হচ্ছে? তামাকটাও এই সাজলাম—" বলিয়াই হাঁক দিল, "ওরে হারাণি, কল্কেটায় একটুকরা আগুন দিয়ে যা।"

তাম্রকূটের ধূমের অভাবে কানাইয়ের পা দুইখানা ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছিল, মনটাও যেন মুষ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেলাও বেশী নাই, সম্মুখে দেড় ক্রোশি মাঠের শেষে দিলগঞ্জের কালো রেখাটি তাহাকে টানিতেছে চুম্বকের মত। এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া সে পরিশেষে গদাইয়ের কাছে গিয়াই গাঁঠ্‌রি নামাইয়া বসিল। হারাণীও ততক্ষণে একখানি জ্বলন্ত কাঠ আনিয়া কল্কিটার মুখে রাখিয়া একটু চাড় দিয়া খানকয়েক কয়লা ভাঙিয়া দিয়া গেল।

কানাই কহিল, "বনমালীর খবর কি খুড়ো?"

"খবর আর কি? গত সনে সে ত মারা গেছে। বিষয়-আশয় ত সবই বেঁচে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—"

"খুড়ো, এ ধর্ম্মের মার। মাথার উপর এখনও ভগবান আছেন। শোয়াশো টাকার জন্যে আমার অমন সোনাফলা খামারখানা নীলেমে তুল্‌লে। সেখানা থাকলে আজ আমি চাকরিতে বার হই? তার সেই ছেলেটা?—"

"ছোঁড়াটার কথা আর ব'ল না—ভারি বদ্। আমাদের ঐ উত্তর দিকে রাধাকান্তর বাড়ি থাকত। একদিন কি যেন নষ্টামি করেছিল। রেধো তাই মারধোর করে। ছোঁড়াটা সেই থেকে পালিয়ে যায়—এ সব তুমি যাবার পরই হয়েছিল। শুনছি না কি সে তোমাদের গাঁয়েই কোথায় আছে। তুমি ত বছর পরে বাড়ি আস্‌ছ?"

কানাই মাথা নাড়িয়া কহিল, "হাঁ।"

"উত্তর অঞ্চলের হাল-চাল কি রকম?"

"এই রকমই। আমাদের মত গরীব-দুঃখীদের বড় কষ্ট।" তারপর কল্কিটায় একটা শুকটান দিয়া গদাইয়ের হাতে তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, "যাই খুড়ো। একদিন যেও —আমি সাত দিন থাকব—"

গদাই একবার কানাইয়ের নীল পিরাণটার দিকে, একবার মাথার উপর গুরুভার গাঁঠ্‌রিটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইল। কানাই তাহার কাছ হইতে উঠিয়া চলিতে লাগিল সোজা।

সম্মুখেই গ্রাম দেখা যাইতেছে। চলিতে চলিতে ক্রমে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু স্পষ্টতর হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যার ছায়ায় মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ফুটিয়া রহিল কেবল গ্রামের দু-একটি আলো।

২

অন্ধকারের গায়ে গায়ে খদ্যোতের দল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একখানি বাড়ির আঙিনার মাঝখানে আগুন দেখা গেল। গৃহস্থের ছেলে-মেয়েগুলি তাহার চারিধার ঘিরিয়া কলরোল তুলিয়াছে। গোয়াল হইতে সাঁজালের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগিতেছে। কানাই পুষ্করিণীর তীর দিয়া চলিতে চলিতে জলে ছলাৎ করিয়া শব্দ হইল। সে জলের দিকে তাকাইয়া দেখে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারার ছায়া দুলিতেছে যেন নানা রঙের উজ্জ্বল ফুলের রাশি। সম্মুখের ঘরখানির পরেই তাহার ঘর। পার হইতে হইতে হাঁক দিল, "সৈরভি! ও স্বরো!"

বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠ। "সৈরভী" গোয়াল হইতে হাম্বা রবে সাড়া দিল।

লক্ষ্মী তখন আঙিনার এক প্রান্তে প্রদীপ রাখিয়া মাথা কুটিতেছে, প্রবাসী কানাইয়ের জন্য, "ঠাকুর তাকে ভাল রেখো।" কিন্তু কানাইয়ের স্বরটা কানে লাগিতেই প্রার্থনার মাঝে চম্‌কাইয়া উঠিল। কানাই আবার ডাকিল, "সৈরভি!" না ভুল নয়। সত্যই কানাই আসিয়াছে। কিন্তু এমন হঠাৎ যে? গোয়ালের সম্মুখ দিয়াই ভিতর-বাহিরের পথ। লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া ঘরের বারান্দা হইতে কেরোসিনের কুপীটা হাতে করিয়া গোয়ালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার ঘোমটাটি একটু দীর্ঘ। তাহার ফাঁকে সুন্দর মুখখানির নিম্নভাগ ও স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল চোখদু'টির আধখানা দেখা যাইতেছে। সৈরভীও ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; আলোয় তাহার চোখ দু'টি চক্ চক্ করিতে লাগিল।

বহিরাঙ্গনে পা দিয়াই কানাই দেখে সম্মুখে আলো হাতে লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া। লক্ষ্মী কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া হাতের আলোটি আঙিনায় রাখিয়া গলবস্ত্রে কানাইয়ের পায়ের ধূলা লইতে গেলে কানাই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি যে কর। চল, ঘরে চল—"

লক্ষ্মীর হাতখানি তবুও তাহার পা-দু'টি স্পর্শ করিয়া মাথায় উঠিল। তারপর হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "দাও, বোঝাটা আমার হাতে।"

"এত ভারী তুমি টান্‌তে পার্‌বে না—কেমন আছ লক্ষ্মি?"

"ভালই। তুমি কেমন আছ?"

"ভাল।"

"হঠাৎ এলে যে—?"

"ছুটি পেলাম।"

আলো হাতে লক্ষ্মী আগে আগে চলিল। গোয়ালে "সৈরভী" ছট্‌ফট্ করিতেছে। কানাই হাসিতে হাসিতে কহিল, "আস্‌ছি রে, আস্‌ছি।"

ভিতরে গিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিতে উঠিতে লক্ষ্মী ডাকিল, "ওরে ধনা, ধনু—"

রাখালের নব নামকরণে কানাই কৌতুক অনুভব করিল। কহিল, "মধ্যে আবার ধনু হ'ল কবে থেকে?"

লক্ষ্মী কানাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল না; কহিল, "কই রে? এলি?"

ধনা ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কৃশ ছেলেটি, ফর্সা রং, বৎসর আষ্টেক বয়স। মুখখানি অতি ম্লান। কানাই তাহার দিকে তাকাইয়া অবাক্। ধনাও তাহাকে দেখিয়া দরজার কাছটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

মাদুরখানা বারান্দায় বিছাইতে বিছাইতে লক্ষ্মী কহিল, "হাঁদা ছেলে, দোর ধরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মেসোর পায়ের ধূলো নাও—"

কানাইয়ের বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। মেসো? লক্ষ্মীর কোনো ভগ্নী ছিল বলিয়া ত এতদিন তাহার জানা ছিল না। তবুও ভাবিল, হয়ত লক্ষ্মীর কোন দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নীর ছেলে; মাদুরের উপর বসিতে বসিতে ধনাকে অভয় দিয়া ডাকিল, "আয় এদিকে। শোন্, ভয় কি রে?"

ধনা এক পা, এক পা করিয়া সরিয়া আসিয়া কানাইয়ের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। কানাই কহিল, "এ তোমার কোন্ বোনের ছেলে গো?"

"ওর কাছেই জিজ্ঞেস কর, কার ছেলে ও—"

"কি রে ধনু, তোর বাপের নাম কি ?"

"বনমালী বিশ্বাস।"

"কোন্ বনমালী ? বাড়ি কোথায় ?" কানাই ধনার মুখের দিকে তাকাইল।

"চণ্ডীপুর।"

কথাটা শুনিয়াই কানাইয়ের মুখখানা কঠিন হইয়া চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বলিয়া উঠিল। ধনা সে মুখের দিকে তাকাইয়া আড়ষ্ট। লক্ষ্মী তখন কানাইয়ের জন্য ঝারিতে জল ভরিতে আঙিনায় নামিয়াছে। কানাই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "এটা এ বাড়িতে কেন ? বনমালী আমার কি সর্ব্বনাশটা করেছে জান না ?"

জলভরা ঝারিটা কানাইয়ের পাশে রাখিতে রাখিতে লক্ষ্মী কহিল, "সবই জানি। আগে হাত-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দাও। ঠাণ্ডা হয়ে সব শুনো'খন।

কানাই ফিরিয়া দেখে ধনা নাই। কোন্ ফাঁকে উঠিয়া গিয়াছে। কোথায় গেল জানিতে ইচ্ছা হইল না। কানাইয়ের হাতমুখ ধোয়া শেষ হইলে পাকশালা হইতে লক্ষ্মী একটি মাজা কাঁসার বাটিতে চারটি লাড়ু ও একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আহার শেষে লক্ষ্মী কানাইয়ের হাতে দুটি পান আনিয়া দিলে সে গাঁঠ্রি খুলিয়া নিজেই তাম্রকূটের ব্যবস্থা করিতে করিতে কহিল, "এইখানে বস লক্ষ্মি।"

"বস্ব কি এখন ? রান্নার জোগাড় আগে করি।"

"সে হবে'খন" বলিয়া "লক্ষ্মীর একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইল। তারপর কহিল, "সাতদিনের ছুটি দেখ্তে দেখতে কেটে যাবে—"

লক্ষ্মী বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিল।

কানাই কহিল, "বড় একলা ঠেকে, না লক্ষ্মি ?"

উত্তরে লক্ষ্মী একটু হাসিল মাত্র।

"ঐ দেখ, আমি ভুলেই গেছি। গাঁঠ্রি থেকে সব বার কর।"

মুখে ঔদাসীন্যের আবরণ টানিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল "কি আছে ওতে !"

চোখ টিপিয়া কানাই কহিল, "দেখই" ; স্বরটাও রহস্যভরা।

লক্ষ্মী গাঁঠ্রি হইতে বাহির করিতে লাগিল,—নূতন দু-জোড়া সাড়ী, লাল টকটকে চওড়া পাড় যেন রক্তের ধারা ; একখানি ঘন নীল রঙের আলোয়ান, ধারে ধারে সাদা ফুল, লতা, পাতা ; একখানি কালো রঙের মোটা চিরুণী ; একশিশি আল্তা, আধসেরটাক্ চুন, সুপারী, খয়ের, পানের আরও নানা রকম মশলা ও ছোট একখানি আয়না। এগুলির নীচে ছিল কম্বল, একজোড়া খড়ম, কানাইয়ের ব্যবহৃত কাপড়, জামা প্রভৃতি। আলোয়ানখানার ভাঁজ খুলিতে খুলিতে লক্ষ্মী কহিল, "ভালই হয়েছে। ছোঁড়াটা শীতে কষ্ট পায়।"

"ও কি আমার বাড়িতেই থাকে ?"

"কোথায় আর যাবে ?"

"খবরদার বল্ছি, এ বাড়িতে ওর জায়গা নেই ! আমার মাণিক যখন রোগে শুষ্ছে, ওর বাপ তখন জমিখানা নীলেম করে নিলে। তারই ছেলেকে—" বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর হাত হইতে আলোয়ানখানা টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইয়া দিল। নীল আলোয়ানের উপর লক্ষ্মীর সুন্দর মুখখানি ফুটিয়া রহিল যেন একটি পদ্ম।

লক্ষ্মী তখন আপত্তি করিল না ; কানাইয়ের পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, "সেই ও বছর তুমি যাবার পরই একদিন রাতে কি ঝড়-জল। সারারাত ঘুমোতে পারি না। গোয়ালে সৈরভী ছট্ফট্ করছে। মনে হ'ল, ঘরের দাওয়ায় কে যেন গুম্রে গুম্রে কাঁদছে। একবার ভাবলাম, দরজা খুলে দেখি ; কিন্তু ভয়ে পার্লাম না। রাখাল ছোঁড়াটাও জ্বরের জন্যে আস্তে পারে নি। ভোরের দিকে ঝড়-জল থাম্লে বেরিয়ে দেখি, বারান্দার এক কোণে ছোঁড়াটা কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। সারারাতের জলের ঝাপ্টায় সব ভিজে, চোখ দু'টো লাল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কথা কইতে পারে না। কে জানে কার বাছা। মনে হ'ল, আমার মাণিক থাকলে আজ এত বড়ই হ'ত। গায়ে হাত দিয়ে দেখি, আগুন। কোলে ক'রে ঘরে শুইয়ে দিলাম। সাতদিন পরে জ্বরটা ছাড়্ল, চোখ মেলে তাকাল। আমায় বড্ড ভালবাসে। আহা !

ওর মা নেই, বাপও নেই। সংসারে আর তবে থাক্‌ল কে বলত? তাই ভাবি আমার মাণিকের বদলে ঠাকুর ওকেই আমার কোলে ফেলে দিলেন।" লক্ষ্মীর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল।

একখানি শস্য-শূন্য ক্ষেতের ওধারে জলা; তাহার ধারে গোটা দুই নিমগাছের তলায় শ্মশান। অন্ধকার রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ঘরের চালে পেচক ডাকিয়া উঠিল। কানাই দূর শ্মশানের পানে তাকাইয়া অন্তরে অন্তরে ডাকিতে লাগিল, "আমার মাণিক, মাণিক রে—"

কিন্তু রাত্রে ধনা আর আসিল কি না এবং কখন আহার করিল, তাহা সে জানিতে চাহিল না। কেবল লক্ষ্মীর মুখে শুনিল, ঘোষেদের ঘরে তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভোরে উঠিয়াই কানাই দেখে, লক্ষ্মী আঙিনায় জল ছিটাইতেছে। শীতের হাওয়ায় তাহার হাত দুটি ও মুখখানি নীল। গায়ে আঁচলখানি মাত্র জড়ানো। কহিল, "লক্ষ্মি, আলোয়ানখানা তোলা রইল আর এই ঠাণ্ডায়—"

লক্ষ্মী কহিল, "ঠাণ্ডা কোথায়?" কানাই কিন্তু ঘর হইতে আলোয়ানখানি আনিয়া তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল। তারপর গোয়ালে গিয়া সৈরভীকে আদর করিল এবং মাঠে রৌদ্র নামিলে গ্রামের পথে বাহির হইল।

গ্রামের চারিধারে ঝোপ-ঝাড়, বেত বন। পূর্ব্বেও পশ্চিমে খান দুই বাগান, গোটাকয়েক নারিকেল ও খেজুর গাছ, বাঁশ বন। উত্তরে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। ইহাদেরই মাঝে মাঝে গৃহস্থের ঘরবাড়ি ও পথ। গ্রামের পরেই বিশাল ক্ষেত, প্রান্তর, জলা। পথের ধারে একটা গাব গাছের ডালে বসিয়া একটি "বসন্ত বউরী" কেবলই করিতেছে "টঙ, টঙ, টঙ—"; ঝোপের নীচে একদল ছাতারে নিজেদের মধ্যে বিষম সোরগোল বাধাইয়া তুলিয়াছে' আর বাগানের শেষ দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে "চোখ্‌ গেল, চোখ্‌ গেল স্বর।" বাতাসে ক্ষীণ পুষ্প গন্ধ। কানাইয়ের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সম্মুখে গ্রামের গোমস্তার দর্শন পাইয়া, চিন্তাধারা সহসা অন্যপথে মোড় ঘুরিল।

বেলা তখন অনেক। ফিরিয়া আসিয়া কানাই দেখে পাকশালার বারান্দায় উচ্ছিষ্ট সমেত একখানি কাঁসি;—ধনাই আহার শেষ করিয়াছে। লক্ষ্মী তখনও পাকশালায় কি কাজে যেন ব্যস্ত। বাসন নাড়া-চাড়ার শব্দ আসিতেছে। কানাই তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে শয়নঘরে গিয়াই তাহার চোখ পড়িল শয্যার উপর। দেখে শয্যার এক প্রান্তে নূতন আয়নাখানি পড়িয়া; পাশে তাহার চিরুণীখানি। আয়নাখানি ভাঙিয়া চৌচির; চিরুণীরও দুটি দাঁত ভাঙা। সেদুটি হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মি, এ দুটো ভাঙ্‌ল কি ক'রে?"

লক্ষ্মী তখন সৈরভীকে ফেন দিতে যাইতেছিল। প্রথমে কানাইয়ের কথার কোন উত্তর দিল না।

কানাই আবার জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মী কহিল, "কি হবে ও আয়না চিরুণীতে? সেই দুটোই আছে ত?"

"বাল ভাঙল কি ক'রে?"

"হাত ফস্কে চৌকাঠের ওপর পড়ে।"

ব্যাপারটা পূর্ব্ব হইতে বুঝিলেও কানাই কহিল, "কার হাত থেকে?" বলিতে বলিতে সে সৈরভীকে জাব-দেওয়া মাটির নাদাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নাদাটাও ফাটিয়া দু' আধখানা। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা ফাট্‌ল কি ক'রে?"

"কি ক'রে আবার!"

"কোথায় গেল সে হতভাগা?"

বলিয়া কানাই সরোষে পথের দিকে যাইতেই লক্ষ্মী তাহার পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ছেলেমানুষে এমন করেই, আজ তোমার ছেলেটা এসব কর্‌লে কি কর্‌তে শুনি?"

"সে জানিনে। ও আমার ছেলে নয়। ওর বাপ—" বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর মুখের পানে তাকাইয়াই কানাই সহসা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু ধনার প্রতি মনের মাঝে কেমন একটা বিদ্বেষ জমিয়া ভার হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী তাহাকে আড়াল করে, ভালবাসে, তাহার মনের একটি ধার জুড়িয়া ধনা বিরাজ করিতেছে। ইহা কানাই কিছুতেই যেন সহ্য করিতে পারে না। অথচ তাহার প্রতি লক্ষ্মীর মনোযোগের এতটুকু ত্রুটি নাই। এই সাতটি দিন ও

রাত্রিকে এই নারীটি পরিপূর্ণরূপে অন্তরপুটে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ব্যাকুল।

ইহার পর কয়দিন ধনারও দর্শন পাওয়া গেল না। কোন্ ফাঁকে বাড়ি আসে আহার সারিয়া চলিয়া যায়, কানাই জানিতেও পারে না।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যার পরে বারান্দায় বসিয়া কানাই তাম্রকুট সেবন করিতেছে, লক্ষ্মী পাকশালায় ব্যস্ত। ধনা ঘোষেদেরই ঘরে হয়ত ছিল। কানাইয়ের নজর পড়িল ভিতরে বাঁশের আন্‌লাটায়। দেখিল, লক্ষ্মীর আলোয়ান খানি সেখানে ঝুলিতেছে। কিন্তু তাহার একটি পাশ যেন দগ্ধ! সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, আলোয়ানখানি টানিয়া হাতে লইয়া দেখে, প্রায় হাতখানেক অংশ পুড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরই অসাবধানতায় হয়ত তাহা হইয়া থাকিবে ভাবিয়া সেখানি হাতে লইয়া সে পাকশালায় গিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ধনা অন্ধকারে চোরের মত চুপে চুপে লক্ষ্মীর পিছনে গিয়া চাপা গলায় ডাকিল, "মাসি—?"

লক্ষ্মী ঘাড় ফিরাইয়া ধনাকে দেখিয়াই হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তুই কি কনে বউ?"

ধনা হাসিয়া তাহার পাশে বসিতেই কানাই সেখানে উপস্থিত হইল। এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া ধনার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইয়া লক্ষ্মীকেই জিজ্ঞাসা করিল, "এখানা পোড়ালে কে লক্ষ্মি?"

কিন্তু লক্ষ্মী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ধনা সভয়ে কহিল, "আমি।"

কানাই খপ করিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। তারপর তাহাকে শূন্যে তুলিয়া কহিল, "চল্, আজ সব শোধ তুল্‌ব।' তাহার গলার স্বর বিকৃত; মুখে কাঠিন্য, চোখে জ্বালা। দেখিয়া লক্ষ্মীরও বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি সেখান হইতে সে উঠিতে পারিল না।

ধনাকে আঙিনার মাঝে ফেলিয়া কানাই ছুটিয়া গিয়া ঘরের বেড়া হইতে শঙ্খমাছের চাবুকখানি টানিয়া লইয়া নামিয়া আসিল। চাবুকখানি এক গার্ড সাহেব ঝোঁকের মাথায় তাহাকে বখ্‌শিষ্ দিয়া যায়। তারপর ধনার হাতে, পায়ে, পৃষ্ঠে নির্ম্মমভাবে সেখানি চালাইতে লাগিল। প্রহারের জ্বালায় ধনা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা গো, বাবা গো।"

কানাইও সপ্তমে চীৎকার করিতে লাগিল, "বেরো আমার বাড়ি থেকে।" চাবুকটা ধনার দেহের স্থানে স্থানে কাটিয়া বসিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া আসিয়া ধনাকে দু-হাতে বুকে জড়াইয়া সরাইয়া লইল। গোলমালে আশপাশের অনেকেই ততক্ষণে আসিয়া উপস্থিত। কানাইয়ের দুই চারিটি কথা হইতে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ঘোষগিন্নী কহিল, "বউকে আমি সেইকালেই মানা করেছি। পেটের নয়, ষেটের নয় তবে ওর জন্যে এত কেন? এ দৌরাত্ম্য কে সহ্য করে বাপু? ছোঁড়াটা বছর পরে বাড়ি এল; কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদে থাকবে তা নয়, মাঝখানে এক ধ্বজা তুলেছিস। পরের ছাপা নিস্ নে, এই বেলা বিদায় ক'রে দে,—বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল, আর যাহারা আসিয়াছিল তাহারও দাঁড়াইল না।

সে রাত্রে কাহারও মুখে অন্ন রুচিল না; লক্ষ্মী ধনাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া শুইয়া রহিল।

পরদিন ব্যথার টাড়সে ধনার জ্বর দেখা দিল। পর পর দু'টি দিন তাহা ছাড়িল না। লক্ষ্মীর মুখে উদ্বেগের ছায়া; কানাইও কিছুতে স্ফূর্ত্তি পায় না। তাহার ও লক্ষ্মীর মাঝখানে একটি কিসের যেন কালো ছায়া নামিয়া পড়িল।

৩

যাইবার দিন সকালে ধনার জ্বর নাই; কানাইয়ের মন অপেক্ষাকৃত হাল্কা, লক্ষ্মীর মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া কানাই দেখে, লক্ষ্মী কাজের পাকে আঙিনায় ঘোরা-ফেরা করিতেছে। ধনা বারান্দার এক কোণে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া। তাহার গায়ে নিজেরই কাপড়ের একটি প্রান্ত জড়ানো—মুখ শুষ্ক; চোখ দুটি নিষ্প্রভ। কানাইকে দেখিয়া তাহার মুখখানি আরও শুষ্ক হইয়া গেল। সে সভয়ে উঠিবার উপক্রম করিতেই কানাই কহিল, "বোস, বোস। ভয় কিসের?" তারপর নিজের গা হইতে গায়ের কাপড়খানি খুলিয়া তাহার ক্ষুদ্র দেহটি ঢাকিয়া দিল।

আঙিনার মাঝে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যে লক্ষ্মী স্মিতমুখে কহিল, "তুমি এমনি মাথাপাগ্‌লা!"

"মাথাপাগ্‌লা নয়, লক্ষ্মি। আমার মাণিক থাক্‌লে আজ এত বড়টাই হ'ত।" বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল।

"তা, ঘর থেকে আমার আলোয়ানখানা এনে গায়ে দাও—"

"আর আমার শীত করছে না," বলিয়া কানাই পুষ্করিণীর পথে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর কানাইয়ের গাড়ী। দ্বিপ্রহরে না বাহির হইলে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ধরা যায় না। কানাই সকালে পাড়াটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া ধনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিল,—রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, হাওয়া-গাড়ী ও সাহেবমেমের। তারপর পাকশালায় লক্ষ্মীর কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

পরিশেষে আহারাদি সারিয়া বিশ্রামান্তে দ্বিপ্রহরে যাত্রা করিল। হাতে কাপড়চোপড়ের ছোট একটি পোঁট্‌লা ও "ঠেঙা" গাছটি। আঙিনায় নামিতেই লক্ষ্মী তাহার পায়ের ধুলা লইল; তারপর ধনা।

কানাই লক্ষ্মীর মুখের পানে সতৃষ্ণনয়নে একবার তাকাইল। কহিল, "সাবধানে থেক লক্ষ্মি! সাম্‌নের পূজোতেই আবার আসব।"

লক্ষ্মী কহিল, "তুমি শরীরকে কষ্ট দিও না। এ দুঃখ ঠাকুর কবে যে ঘুচাবেন।" তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

কানাই চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে অগ্রসর হইল। পিছনে লক্ষ্মী, তাহার পার্শ্বে ধনা। চলিতে চলিতে গোয়ালের পানে তাকাইয়া কানাই কহিল, "সৈরভীটার সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

বহিরাঙ্গন ও গ্রামের পথটা যেখানে মিশিয়াছে লক্ষ্মী ধনাকে লইয়া সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত। কানাই চলিতে চলিতে ফিরিয়া দেখে, তাহারা দুটিতে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। সে পুষ্করিণীর তীরে পৌছিতেই ধনা সহসা পিছন ফিরিয়া ঘরের দিকে ছুট্ দিল। তারপর বেড়ার গা হইতে শঙ্খমাছের চাবুকখানি খুলিয়া লইয়া ছুটিতে ছুটিতে কানাইয়ের পার্শ্বে গিয়া কহিল, "মেসো, এটা ফেলে যাচ্ছ।"

কানাই ধনার হাতে চাবুকখানা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। । মনে হইল, সহসা তাহার পৃষ্ঠে কে যেন ঐ চাবুক দিয়া নির্ম্মমভাবে আঘাত করিল। অন্তরের ঠিক মধ্যখানে সে আঘাতের গভীর একটা দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কি দুর্ব্বিষহ তাহার জ্বালা! সে পোঁট্‌লা ও "ঠেঙা" গাছটি পথের উপর ফেলিয়া ধনার হাত হইতে চাবুকখানা ছিনাইয়া লইয়া পুষ্করিণীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর ধনাকে বুকে তুলিয়া পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "সেদিন বড় লেগেছিল, না রে ধনু?" বলিতে বলিতে তাহার স্বরটা গাঢ় হইয়া চোখ দুটি অশ্রু সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ধনাও তাহার স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্যথিত কণ্ঠে কানাই কহিল, "চুপ কর্, চুপ্ কর্, মাণিক। তোর মাসীকে ছেড়ে আর কোথাও যাস্‌নে—"

তারপর তাহাকে বুক হইতে ধীরে নামাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আবার চলিতে লাগিল সেই দূরের পথে।

সাহিত্যসৃষ্টি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

চিত্রকর যখন চিত্রপটে রেখাপাত করেন, তখন চিত্রণীয় বিষয়টি তাঁহার মানসপটে স্পষ্ট হইয়া থাকে। যাহা তাঁহার মানসপটে থাকে তাহাই তিনি চিত্রপটে নানা রেখাপাতে ফুটাইয়া তুলিয়া স্বয়ং দর্শন করেন, এবং অন্যকেও তাহা দর্শন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। দর্পণের প্রতিবিম্বে মানুষ যেমন নিজেকেই দর্শন করে, চিত্রকরও সেইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়া তাঁহার নিজেরই ভিতরের মূর্ত্তিটিকে বাহিরে দর্শন করেন। এবং তাহার আনন্দে নিজেও তিনি মুগ্ধ হন, এবং অন্যকেও মুগ্ধ করেন। চিত্রে অঙ্কনীয় বস্তুটি তাঁহার অন্তঃকরণে স্পষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই তাঁহার চিত্রের প্রত্যেকটি রেখার একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলা ও অপর রেখার সহিত তাহার একটা সুসামঞ্জস্য থাকে, এবং ইহাতেই ঐ রেখাগুলির সমগ্রতায় একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের ব্যঞ্জনা হয়, একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্রকরের অন্তঃকরণের ভাবটি বহির্ভাগে একটি আকার পরিগ্রহ করে। তাঁহার মানসপটে পূর্ব্বে যদি ঐ ভাব বা মূর্ত্তি না থাকিত তাহা হইলে তাঁহার চিত্রপটের রেখাপাতগুলি কোনো কিছু উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিত না, একটা কি এক কিম্ভূত কিমাকার হিজি-বিজি হইয়া থাকিত। কবির সম্বন্ধেও এইরূপ। মানস-সরোবরে কোনো এক ভাবলহরীর উদয় হইলে কবি তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া একটির পর একটি, তারপর আর একটি, এইরূপে শব্দবিন্যাস করিয়া তাহাকে একটা বাহিরের রূপ প্রদান করেন, এবং তাহাই কবিবরের দ্বারা শ্রোতার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানেও সেই ভাবলহরীকে অভিব্যক্ত করে। কাব্যের কর্ত্তা ও শ্রোতা উভয়েই তাহাতে পরম আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু পূর্ব্বে যদি কবির হৃদয়ে ভাব না থাকে, তবে তাঁহার কতকগুলি শব্দের বিন্যাস করা হইলেও কাব্য সৃষ্টি হয় না, তাহাতে কোনো রসের উদ্রেক হয় না। অথচ রসস্ফূর্ত্তিরই জন্য কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন।

চিত্রকরই হউন, সাহিত্যিকই হউন, অথবা আমাদের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তিই হউন, প্রত্যেকেই স্রষ্টা; কেহ বড় আর কেহ ছোট, এই মাত্র ভেদ। আমরা প্রত্যেকেই, এবং প্রতিদিনই আমাদের কর্ম্মের দ্বারা কিছু-না-কিছু সৃষ্টি করিতেছি, এবং সেই সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করিতেছি—ঠিক যেমন সূর্য্য নিজের আলোক দিয়া, প্রকাশ দিয়া, তাপ দিয়া প্রতিদিনই নব নব সৃষ্টির অবতারণা করে, আর তাহারই মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। ঐ সৃষ্টিকে বাদ দিলে সূর্য্য আর সূর্য্য থাকে না। সূর্য্যের অন্য কাজ আর কিছুই নাই, তাহার নিজের মধ্যে যাহা আছে কেবল তাহাই সে বাহিরে প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার ক্রিয়া হয় সমগ্র জগতে, তা কোথাও ভালই হউক, আর মঙ্গলই হউক, ও কথা স্বতন্ত্র। চিত্রকর, সাহিত্যিক সকলেই এইরূপ নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা, সৃষ্টির দ্বারা নিজের মধ্যে যাহা থাকে তাহাই বাহিরে আনয়ন করেন, অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করেন; এবং ইহার ক্রিয়া হয় তাঁহার মধ্যে যিনি ঐ চিত্র, বা সাহিত্য আলোচনা করেন।

সৃষ্টি দ্বিবিধ, দৈবী ও আসুরী। যেমন কোন্ ঔষধটি ভাল আর কোন্ ঔষধটি মন্দ ইহা ঐ ঔষধের রোগীর প্রতি গুণাগুণ বা ফলাফল দেখিয়া স্থির করা হয়; সেইরূপ সৃষ্টির সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ তাহাদের ঐ সৃষ্টিতে শুভাশুভ ভাল-মন্দ কিরূপ কি হয় না-হয়, তাহা বিচার করিয়া তাহাকে দৈবী বা আসুরী বলা হয়। বলাই বাহুল্য, যে সৃষ্টি সম্পদের জন্য, শান্তির জন্য, তাহা দৈবী; অপর পক্ষে, যাহা বিপদের জন্য, অশান্তির জন্য তাহা আসুরী; অন্য কথায়, দৈবী সৃষ্টি আমাদিগকে পরমানন্দময় মুক্তির দিকে, আর আসুরী সৃষ্টি পরম দুঃখময় বন্ধের দিকে লইয়া চলে। আসুরী সৃষ্টি অতিসহজেই হইতে পারে, পলকে তাহা প্রলয়ও আনিতে পারে; কিন্তু দৈবী সৃষ্টির পশ্চাতে বহু তপস্যার প্রয়োজন হয়, বহু ধৈর্য্য, বহু চিন্তা আবশ্যক

হয়। উপনিষদে পুনঃপুন দেখা যাইবে যেখানেই সৃষ্টির কথা, সেইখানেই তাহার পূর্ব্বে তপস্যার কথা। বিনা তপস্যায় সৃষ্টি, অর্থাৎ কল্যাণ সৃষ্টি, একথা উপনিষদে পাওয়া যাইবে না। সেইজন্যই দৈবী সৃষ্টি আসুরী সৃষ্টির মত সহজ নহে।

এই দুই সৃষ্টির অনুসারে স্রষ্টাও দুই প্রকার; প্রেয়স্কাম ও শ্রেয়স্কাম। আসুরী সৃষ্টির কর্ত্তা প্রেয়স্কাম, তিনি তাঁহার সৃষ্টির দ্বারা প্রথমত নিজের, তারপর অন্যের ইন্দ্রিয়-প্রীতিমাত্র চাহেন। তাহার পর কতদূর কি দেখিবার আছে, কি না-আছে, ঐ প্রীতির পরিণাম কি, তিনি তাহা তলাইয়া দেখিতে পারেন না। কিন্তু শ্রেয়স্কাম স্রষ্টা অন্যরূপ। তিনি নিজের সৃষ্টির দ্বারা নিজের ও অন্যের, সকলেরই শ্রেয়, অর্থাৎ কল্যাণ কামনা করেন; তিনি এমন একটি বস্তুকে পাইতে ইচ্ছা করেন যাহা আশ্রয় করিয়া কেহ বস্তুত বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, তাহার সত্তাটা থাকে; এবং তিনি জানেন, যদি তাহা হয় তবে যথার্থ প্রীতি বা আনন্দ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে—যদিও সেই প্রীতি বা আনন্দের আকারটা অন্য হয়।

সৃষ্টিশক্তি ঠিক সমান থাকিলেও, দেখা যায়, দুই স্রষ্টার ঠিক একই বস্তুর সৃষ্টিতে বহু ভেদ হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যদিও উভয় স্রষ্টারই সৃষ্টির বাহ্য অংশ নির্ম্মাণে শক্তি সমান, তথাপি তাহার আন্তর অংশের জ্ঞানে তাঁহারা উভয়ে সমান নহেন। চিত্রের রেখাঙ্কন বা বর্ণবিন্যাস প্রভৃতিতে দুই চিত্রকরই সমান-সমান হইতে পারেন, কিন্তু চিত্রের ভাব ও কল্পনায় উভয়ের মধ্যে বহু ভেদ থাকে। তাই চিত্রণীয় বস্তু এক হইলেও দুই চিত্রকরের দুই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়।

দেখা যায়, যে বস্তু সামাজিকের চক্ষুতে স্বভাবত লজ্জা বা জুগুপ্সার উদ্রেক করে, চিত্রকরের তুলিকার টানে তাহাও তাহার কোথায় উড়িয়া যায়। নারীর নগ্নমূর্ত্তির দিকে তাকাইতে পারা যায় না, কিন্তু গ্রীক ভাস্করগণের নির্ম্মিত এমন অনেক ঐরূপ নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার নগ্নতা নগ্নতা বলিয়াই মনে হয় না। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের বারাণ্ডায় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় বিভিন্ন দেশের এক-একখানি চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একখানি মিশর দেশের। এই চিত্রের ভিতরে বাদ্যযন্ত্র হস্তে তিনটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত। মধ্যকার মূর্ত্তিটি একেবারে নগ্ন। কিন্তু ঐ নগ্ন মূর্ত্তিটি নগ্ন বলিয়া মোটেই মনে হয় না; ইহা দেখিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদ্রেক হয় না। চিত্রকরের কি অদ্ভুত প্রতিভা, কি অদ্ভুত কুশলতা! অপর পক্ষে, কোনো কোনো চিত্রকরের হস্তে যাহা প্রকৃতি-সুন্দর তাহাও নিতান্ত বিকৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার কারণ সব সময়ে ইহা নয় যে, এই চিত্রকরেরা কেমন করিয়া তুলি ধরিতে-হয়, কেমন করিয়া রং দিতে হয়, ইত্যাদি জানেন না; এ বিষয়ে তাঁহারা খুবই দক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটি এই যে, তাঁহারা অঙ্কনীয় বস্তুর কেবল দেহই দেখিতে পান, তাদের প্রাণের কোনই সন্ধান করিতে পারেন না।

বলাই বাহুল্য, সাহিত্যের প্রয়োজন আছে, খুবই আছে; ঠিক খাদ্যের মত, খাদ্য না পাইলে আমাদের চলে না। কিন্তু খাদ্য কি? যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাই খাদ্য নহে। কারণ, এমন বহু সুস্বাদু দ্রব্য আছে, যাহা খাইলে উপকার তো হয়ই না, বরং বিশেষ অপকারই হয়। তাহাই খাদ্য, যাহা শরীরের নানা কাজকর্ম্মে ও শ্রমে স্বভাবতই যে ক্ষয় হয় তাহা দূর করিয়া ঐ ক্ষতির পূরণ করে, তাহার পুষ্টিসাধন করে, যদি শরীরের বৃদ্ধির বয়স থাকে, তবে সেই বৃদ্ধিরও সাধন করে, আর তাহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই স্বাস্থ্য বিধান করে। এরূপ খাদ্য যে সুস্বাদু হয় না তাহা কে বলিবেন? কিন্তু খাদ্যের ঐ তত্ত্বটি ভুলিয়া গিয়া যিনি কেবল রসনার তৃপ্তিকেই খাদ্যা-খাদ্য নির্ণয়ের উপায় মনে করেন, তাঁহার যে নিতান্ত ভুল করা হয় তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি উত্তেজক মশলা প্রচুর পরিমাণে দিলেও রান্না ভাল হয় না, আবার সেরূপ না করিলেও তাহা ভাল হয়। যে পাক করে তাহারই দক্ষতার উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। এইরূপই দক্ষ চিত্রকর অত্যল্প অত্যাবশ্যক রেখাপাতে যে-চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন, বা সুকবি কতিপয় মাত্র শব্দের যোজনায় যে-কাব্য রচনা করিতে পারেন কুচিত্রকর বা কুকবি বহু রেখাপাতেও বা বহু শব্দসন্নিবেশেও সেইরূপ

চিত্র অঙ্কন করিতে, বা সেইরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন না। সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ কথা।

সাহিত্যিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই তাহাতে তাঁহার কোনো প্রয়োজন থাকে, না থাকিলে তিনি তাহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। দেশ-বিদেশের নানা পণ্ডিতে এই সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যের নানা প্রয়োজন দেখিয়াছেন। কিন্তু যত প্রয়োজনই থাকুক, আমাদের দেশের সাহিত্যের মর্ম্মজ্ঞেরা বলেন যে, সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমানন্দের উদয় হয় তাহাই সমস্ত প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠ ("সকল-প্রয়োজনমৌলিভূত")। আমাদেরই দেশের আর একজন সাহিত্যের মর্ম্মবিদ্ 'চিরন্তন'দের অর্থাৎ প্রাচীনদের নাম করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সাহিত্য বা কাব্যের ইহাই প্রয়োজন যে, তাহা রসাস্বাদরূপ নিবিড় আনন্দ প্রদান করে; আর তাহা দ্বারা 'রামের মত চলিতে হয়, রাবণের মত নহে' এইরূপে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তি আর অকর্ত্তব্য হইতে নিবৃত্তির উপদেশ দেয়। বলিয়াছি, ইহা চিরন্তনদের কথা। পুরাতন হইলেই অনেক স্থলে তাহার প্রতি একটা গৌরব-বুদ্ধি হয়, এবং তাহা হইলেই যথাযথরূপে বিচার না করিয়াই তাহাকে ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু পুরাতন হইলেই ভাল হইবে, আর নূতন হইলেই তাহা খারাপ হইবে; অথবা নূতন হইলেই ভাল হইবে, আর পুরাতন হইলেই খারাপ হইবে,ইহা বলা যায় না। পুরাতনই হউক, আর নূতনই হউক, তাহার গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া ভাল-মন্দ স্থির করিতে হয়। পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে, 'চিরন্তনেরা' সাহিত্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লিখিত যে দুইটি কথা বলিয়াছেন তাহার একটিকেও বর্জ্জন করা যায় না। অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক। ইহা না হইলে চলে না। এই অর্থোপার্জ্জন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতী ইত্যাদি নানা উপায়ে হইতে পারে। সেখানে নিয়ম করা হয়—

"অকৃত্বা পরসন্তাপম্ অগত্বা নীচসঙ্গতিম্।
অনুৎসৃজ্য সতাং বর্ত্ম যৎ স্বল্পমপি তদ্ বহু ॥"

'পরকে পীড়ন না করিয়া, নীচগণের সহিত সংসর্গ না করিয়া, ও সজ্জনগণের পথ পরিত্যাগ না করিয়া, যদি অত্যন্ত অল্পও কিছু পাওয়া যায় তো তাহাই অনেক।'

আহার করিতে হইবে, না করিলে চলে না। যে-কেহ যে-কোন বস্তু আহার করিতে পারে। সেখানেও নিয়ম করা হয়, যাহা দেহের ও মনের, উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে, তাহাই আহার করিবে। আনন্দ পাইতে হইবে, না পাইলে আমরা বাঁচি না। যে-কোন উপায়ে আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে; মন্দ উপায়েও আনন্দ হইতে পারে। সেখানেও নিয়ম করা হয়; না, ঐ জাতীয় উপায়ে নহে, অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই যে নিয়ম, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ যে অর্থোপার্জ্জন, ঐ যে আহার-গ্রহণ, ঐ যে আনন্দানুভব তাহা যাহাতে ঐ ঐ ব্যক্তির নিজের এবং তাহারা যাহাদের সঙ্গে বাস করে তাহাদের সকলেরই বস্তুত কল্যাণের জন্য বা অকল্যাণ নিবৃত্তির জন্য হয় তাহারই ব্যবস্থা করা; কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা মোটেই তাহার উদ্দেশ্য নহে।

আমার যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে আমি আনন্দ অনুভব করিব, আমি নিয়ম কানুন মানিতে যাইব কেন? আমি স্বাধীন।—একথা বলিবার অধিকার কোনো সামাজিক ব্যক্তির নাই, এবং উহাই স্বাধীনতার অভিপ্রেত অর্থও নহে। উহা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। আমার গৃহের আমিই স্বামী, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু এই বলিয়া আমি ঐ গৃহে এমন কিছু করিতে পারি না, যাহা আমার চারিদিকের আর সমস্ত লোকের অনিষ্টের জন্য হয়। আমি আমার নিজেরও ঘরে আগুন লাগাইতে পারি না, কেন-না তাহাতে চারিদিকের আর সমস্ত ঘরের বিপদ্ সম্ভাবনা আছে। আমি মদ্যপান করিতে পারি না, উহাতে আমার অধিকার নাই, কারণ মত্ততায় আমার ব্যক্তিগত অপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার প্রতিবেশীদের নানাদিকে ও নানারূপে তাহাতে বহু ক্ষতি হয়। ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন, তাই বলিয়া কাহাকেও হত্যা করিবার অধিকার তাহারও নাই। আমি নিজে নিজেকেও হত্যা করিতে পারি না। আত্মহত্যার অপরাধে সরকার বাহাদুর আমাকে দণ্ড দিবেন। এই সব অধিকার না থাকাতে যদি স্বাধীনতা না থাকে তো সেই স্বাধীনতা না থাকুক, তাহাতে কাজ নাই। যাহাতে নিজের ও অন্যের কল্যাণ না হয়, বরং অকল্যাণই হয়, সেই স্বাধীনতা যেন

কখনও কাহারও না হয়। যে সাহিত্যের সৃষ্টিতে স্রষ্টার পাঠকবর্গের কল্যাণের ইঙ্গিত না থাকে, বা কল্যাণে প্রবৃত্তি ও অকল্যাণ হইতে নিবৃত্তির ইঙ্গিত না করা হয়, বরং ইহার বিপরীতই হয় তাহার প্রয়োজন কি?

এক শ্রেণীর ভাবুক ও সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে, তা যেমন বিদেশে তেমনি স্বদেশে। স্বদেশ এ সম্বন্ধে বিদেশকে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। ইহাদের চিন্তা সমাজে বিপ্লব আনয়ন করিতেছে। যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাই এখনও থাকিবে; আর যাহা পূর্ব্বে ছিল না এখনও তাহা হইবে না; এ কথা ঠিক নহে, ইহা হইতে পারে না। যদি কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহাও এখন করিতে হইবে; এবং আবশ্যক হইলে যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাও বর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ, আমরা আছি এই কালে, এই যুগে; পূর্ব্ব কালে, পূর্ব্ব যুগে নহে। যতদূর পারি আমরা বাঁচিতে চাই, সুখে বাঁচিতে চাই; মরণ আমরা কেহই চাই না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এই সুখে বাঁচিবারই জন্য সমাজে নানারূপ নিয়ম ও সংযম আবশ্যক হইয়াছে। যদি কখন কোনো নিয়ম-সংযমের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে না দেখা গিয়াছে, তখনই তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নিয়ম-সংযমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে আবার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বরাবরই এইরূপ চলিয়াছে, চলিবে—তা একটু পূর্ব্বে আর পরে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। পূর্ব্বে—অতিপূর্ব্বে বর্ত্তমানের ন্যায় বিবাহ-পদ্ধতি ছিল না। নারীরই হউক, বা পুরুষেরই হউক, পরস্পরের সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা ছিল না। পরবর্ত্তী সমাজের লোকেরা দেখিলেন, উহার ফল ভাল হয় নাই, তাহাতে বহু অনর্থ হইত, তাই কল্যাণ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা নরনারীর সম্মেলনের একটা নিয়ম করিলেন। বিবাহ-বিধির উদ্ভব হইল। এই নিয়মের ফল কল্যাণ হইয়াছে।

কিন্তু বিদেশে এক নূতন উচ্ছৃঙ্খলতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহা অনেকে আমা অপেক্ষা বেশী ও অনেক ভাল জানেন। ইহা ভাবিলে মনে হয়, পাশ্চাত্য সমাজের এক অংশ আবার নিজের আদিম অবস্থার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে বা যাত্রাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, যদিও ইহার বাহ্য আকার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু তা যাহাই হউক, ইহা হাসিবার বা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে, ইহা আমাদিগকে ধীর ও শান্তভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইয়াছে—বিশেষত যখন ইহা ঐ পশ্চিম দেশ হইতে 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' হইয়া আমাদেরও দেশে উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, এক বা অন্য আকারে তাহার ক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহা এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা নিজেকে 'ভদ্র' ও 'সুশিক্ষিত' মনে করেন, এবং সমাজের উচ্চস্তরে বিহরণ করেন।

এই ভাব দেশের মধ্যে প্রধানত দুই প্রকারে উপস্থিত হইয়াছে; দেশের কতকগুলি 'শিক্ষিত' ব্যক্তির পাশ্চাত্য সমাজের সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গে, আর তরুণগণের অথবা তরুণোচিতবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত কতকগুলি বৈদেশিক পুস্তকের পাঠে। ইহার প্রচারের অগ্রদূত হইতেছে আমাদের 'তরুণ' সাহিত্য।

তরুণ সাহিত্যিকগণ যদি দেখাইয়া দিতে পারেন যে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের দ্বারা, যাহাদের জন্য ঐ সাহিত্য অভিপ্রেত তাহাদের কোনো কল্যাণ না হইলেও, অন্তত কোনো অকল্যাণ হইতেছে না, তবে তাঁহাদিগকে ঐ সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কেহ কিছু বলিতে পারে না। অপর পক্ষে, যদি ইহা দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, উহা দ্বারা অকল্যাণ হইতেছে তবে তাঁহাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

সামাজিক ব্যবস্থাই হউক, আর যে-কোনো কাজই হউক, নিয়ম ও সংযম তাহার মূলে। যদি কেহ না বলিয়া না কহিয়া যখন-তখন যাহার-তাহার জিনিস-পত্র লইয়া যায়, অপর কথায় চুরি করে, তবে তাহাতে স্পষ্টতই নানা দিকে নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। তাই সেখানে নিয়ম করা হয়, 'ও রকম করিবে না,' 'চুরি করিবে না'। কিন্তু উহাও পর্য্যাপ্ত নহে। নিয়ম করিলেও যদি তাহা প্রতিপালিত না হয়, তবে সে নিয়ম করা না-করা উভয়ই সমান।

তাই যাহাতে সে নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারা যায় তাহার জন্য সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করা আবশ্যক, ইহাতে হয় চুরি করিবার ইচ্ছাই হয় না, অথবা হইলেও লোকে তাহা দমন করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। চুরি করিতে হইবে না, তাহা ভাল নহে, একথা চোরও জানে, তবুও সে তাহা করে, কারণ তাহার সংযম নাই। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয় না; কারণ তাহার সংযম নাই, সে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করিতে পারে না। তাহা করিতে না পারায় তাহার মোহ উৎপন্ন হয়, মোহ তাহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, সে তাহাতে বস্তুতত্ত্ব দেখিতে পায় না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। আবার যাহা কর্ত্তব্য তাহাকে অকর্ত্তব্য মনে করে, আর যাহা অকর্ত্তব্য তাহাও কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবে; এবং তাহাই অনুসরণ করিয়া সে নিজে অধঃপতিত হয় এবং অন্যকেও অধঃপতিত করায়।

জগতে রাজায়-রাজায়, রাজায়-প্রজায়, জাতিতে-জাতিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এত যে মারা-মারি কাটা-কাটি হানাহানি হইতেছে; এত যে দুঃখের উপর দুঃখের ভার ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে; ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে তাহারও মূলে এই অসংযম। উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতিপ্রবল বিষয়সুখলালসা মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে। সে তখন নিজের সীমা লঙ্ঘন করে, আর সঙ্গে-সঙ্গে গভীর গর্ত্তের মধ্যে পতিত হয়। বিষয়লালসার তৃপ্তি হইবে অথচ কোনো উপদ্রবই হইবে না, শোক দুঃখ আসিবে না, সে ইহার উপায় অন্বেষণ করে, খুবই করে। সে গুলি-গোলা কামান-বন্দুক ইত্যাদি যত রকমের যত কিছু সম্ভব সবই সংগ্রহ করিয়া রাখে। কিন্তু দেখা যায় তাহাতে অভিলষিত ফল হয় না, যে ফল হয় তাহা বিপরীত। তাহার দুঃখ কমে না, বাড়িয়াই যায়। রোগের নিদান না জানিয়া চিকিৎসা করিতে গেলে যাহা হইবার তাহাই হয়। সে জানে না যে, তাহার ঐ রোগের মূল তাহার ভিতরে রহিয়াছে, বাহিরের প্রলেপে তাহার প্রশমন হইবে কেন? ঐ মূলটি হইতেছে অত্যধিক বিষয়-সুখসম্ভোগের লালসা, যাহার অপর নাম আসক্তি, তৃষ্ণা, কাম।

যতক্ষণ তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ শান্তি পাওয়া যায় না। তাহা যত-যত বাড়ে অশান্তিও তত-তত বাড়িতে থাকে। অতি উপাদেয়, অতি দুর্লভ খাদ্য সামগ্রী আনিলেও তাহা ঐ অবস্থায় মানুষকে রোচে না; দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা থাকিলেও তাহাতে তাহার ঘুম হয় না, দিবারাত্রি সে ছটফট করিতে থাকে। পরে যখন সে তাহার অভিলষিত বিষয়টি পায় তখন আর তাহাতে তাহার তৃষ্ণা থাকে না, সে সুখী হয়, শান্তি পায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যতক্ষণ তাহার তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ সে সুখ-শান্তি পায় না; কিন্তু যখনই ঐ তৃষ্ণা যায় তখনই তাহা আসে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তৃষ্ণাই দুঃখ ও অশান্তির কারণ, আর তৃষ্ণারই অভাব সুখ ও শান্তির কারণ।

এই তৃষ্ণার অভাব দুই প্রকারে হয়। তৃষ্ণার বিষয় বা বস্তুটি পাইলে, আর মোটেই তৃষ্ণা না জন্মিলে, কাহারও রোগ হইয়া তাহা ভাল হইলে, স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বেশ ভাল লাগে; আবার যাহার রোগ হয় নাই এবং এই জন্যই স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, তাহাকেও বেশ ভাল লাগে। উভয়েরই ভাল-লাগার মধ্যে ঐ রোগের অভাবটি আছে।

তৃষ্ণার জ্বালা উপস্থিত হইলে সেই সেই অভীষ্ট বস্তুকেই পাইয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা সাধারণত সকলেই করে। কিন্তু অভীষ্ট ফল তাহাতে পাওয়া যায় না। সকলেরই নিকটে ইহা প্রত্যক্ষ, এবং তাহাই বেদের একটি পঙক্তিতে বলা হইয়াছে যে, "কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ।" বেদজ্ঞেরা ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সমুদ্রের যেমন অন্ত নাই, কামেরও তেমনি অন্ত নাই। বিষয়ভোগের দ্বারা তৃষ্ণার নিবৃত্তি বড় দুরাশা। কাহারও কোনো দিন ইহা হয় নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে এ বিষয়ে একটি বড় চমৎকার গল্প আছে। অনন্তযশ নামে এক খুব বড় রাজা ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়া কিছু দিন পরে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হন। পরে তাঁহার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন তাঁহার রাজ্যের পৌরজানপদবর্গ, ও সামন্ত রাজগণ সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে রাজা প্রিয়ঙ্কর অনন্তযশের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ,

লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে, মহারাজ অনন্তযশের সুভাষিত কি, তিনি কোন্ ভাল কথা বলিয়া গিয়াছেন? তখন আমরা কি বলিব?' তিনি বলিলেন 'এই কথা বলিতে হইবে—মহারাজ অনন্তযশ চারিটি মহাদ্বীপের রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনো মনোরথ ব্যর্থ হয় নাই। সমস্ত বিষয় উপভোগ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তৃষ্ণা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কামোপভোগে অতৃপ্ত থাকিয়াই তিনি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন।' ঘৃতধারা দিয়া অগ্নিকে শান্ত করিতে গেলে তাহা শান্ত না হইয়া আরও প্রবল হইয়া উঠে। তেমনি বিষয়ভোগের দ্বারা বিষয়তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিতে গেলে তাহা নিবৃত্ত না হইয়া বরং আরও বাড়িয়াই চলে। এবং ইহা যতই বাড়ে দুঃখ অশান্তিও ততই বাড়ে।

এই তৃষ্ণা এত অনর্থ করে বলিয়াই ইহাকে রিপু বা শত্রু, মহাশত্রু বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, ইহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুই বলা হয়। মৃত্যুর অপর নাম মার। মৃত্যু ও মার শব্দের কেবল আকারে ভেদ, অর্থে কোনো ভেদ নাই। বুদ্ধদেব যতক্ষণ এই মারকে বিজয় করিতে পারেন নাই। ততক্ষণ তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয় নাই। এই মারের সহিত তাঁহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তিনি তাহাকে পরাভূত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবং ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, সমস্ত দুঃখের মূল ঐ মার। মারকে সংহার করিতেই হইবে। তিনি তাহাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধের এই মার-বিজয় তাঁহার জীবনের বা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব। তাই তাঁহার জীবনচরিতে এই ঘটনাটিকে অতি প্রধান স্থান দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাহা খুবই ঠিক করা হইয়াছে।

কঠোপনিষদে সাক্ষাৎ যমের সহিত নচিকেতার সংবাদে এই তত্ত্বটিই বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন আকারে বলা হইয়াছে। ভোগেচ্ছার ক্ষয় না হইলে শিবকে পাওয়া যায় না। তাই মদনভস্ম হওয়ার পূর্ব্বে পার্ব্বতীর শিবের সহিত যোগ হয় নাই। এ কথা কুমারসম্ভবের পাঠকেরা জানেন। মারকে মৃত্যুকে ভস্ম করিয়াছিলেন বলিয়াই

বুদ্ধদেবকে যখন মারজিৎ বলা হয় তখন বুঝিতে হয় যে তিনি মৃত্যুঞ্জয়। মদনভস্ম না হইলে যে, বস্তুত মঙ্গল হয় না কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা প্রথমে মদনের প্রেরণায় মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কল্যাণের জন্য হয় নাই বরং তাহাতে অকল্যাণই দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন উভয়েরই হৃদয় মদনের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তখন তাঁহাদের শুভসংযোগ দেখা গিয়াছিল।

হৃদয় হইতে তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই মুক্তি, ভারতের সাধনার আগাগোড়া সর্ব্বত্রই পুনঃপুন এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন সমস্ত নদীর একমাত্র সমুদ্রেরই দিকে গতি, তেমনি দেখা যায় ভারতীয় সমস্ত সাধনার গতি একমাত্র এই দিকে—তা সে সাধনা বৈদিকই হউক আর অবৈদিকই হউক। বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি তাহারই উল্লেখমাত্র করিলাম।

যাহাই হউক, এই তৃষ্ণার ক্ষয়ের কথা শুনিলেই অধিকাংশ লোকের মনে একটা আতঙ্কের ভাব হয়; মনে হয় তবে তো সবই গেল, কিছু ভোগ করা হইল না, অথচ মন চায় ভোগ করিতে; তবে তো চারিদিকের এই ঘর-বাড়ী, লোক-জন, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, ধন-ধান্য সবই ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বনের মধ্যে গিয়া বাস করিতে হয়! তাহাতে সুখ কোথায়?

অপর পক্ষে, যাঁহারা তত্ত্ববিদ্, যাঁহারা সাধনা করিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বস্তুতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা বারবার বলিতেছেন, আসক্তচিত্তে বিষয়-সম্ভোগ করিয়া যত রকমের যত সুখই পাওয়া যায়, বা স্বর্গে যত রকম যত সুখ হয়, ঐ উভয় প্রকারই সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। গুড়, চিনি, মধু, সন্দেশ সবই মধুর, কিন্তু সবই একরূপ মধুর নহে, প্রত্যেকেরই মাধুর্য্য ভিন্ন-ভিন্ন। এখানে যদি সরস্বতীকেও প্রশ্ন করা যায় যে, ঐ জিনিসগুলি কেমন মধুর, আর উত্তর দিবার জন্য তাঁহাকে সহস্র বৎসরও সময় দেওয়া হয়, তবে তিনিও পৃথক পৃথক্

চিনি এইরূপ মধুর, মধু-সন্দেশ এইরূপ মধুর। জিজ্ঞাসুকে ঐ সব নিজে আস্বাদ করিয়া তাহাদের মাধুর্য্যের প্রকার বা তারতম্য বুঝিতে হয়। তৃষ্ণাক্ষয়ের সুখ সম্বন্ধেও সেই কথা। নিজের অনুভব ভিন্ন ইহা অন্যরূপে জানা যায় না। তবে যুক্তির দ্বারা ইহার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারা যায়, একটা পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। আর কতকটা ঐরূপ জ্ঞান হইতে পারে যাঁহারা তাহা অনুভব করিয়াছেন বা অনেকটা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া-শুনিয়া। জগতের সৌভাগ্য, ভারতবর্ষের অতি সৌভাগ্য আর আমাদের আরও অতিমহৎ পরমমহৎ সৌভাগ্য যে, এমন এক ব্যক্তি আমাদের এই জীবদ্দশায় এ দেশে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়াও বলিতে পারেন "I am the richest man in the world!" তিনি নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ সমস্ত অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেও নির্ব্বিকার ও স্থির থাকিয়া বলিতে পারেন "I am not capable of being unhappy."

তৃষ্ণাক্ষয়ের কথা শুনিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই। যাহারা ভয় পায় তাহারা "অভয়ে ভয়দর্শিনঃ"—অর্থাৎ যেখানে বস্তুত ভয় নাই সেখানে ভয় দেখে। তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য যে বিষয়ভোগ ছাড়িয়া দিতে হইবে বা সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইতেই হইবে তাহা নহে। বিষয়ভোগ একেবারে ছাড়িয়া দিলে যে জীবনই থাকে না। আর সন্ন্যাসী হইয়া বনে যাওয়া? কারণান্তরে কেহ ইহা করিতেও পারেন। তাহা না হইলে তৃষ্ণাক্ষয় হয় না, ইহাও নহে। গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম, এ কথা আমাদের দেশের ভাবুকেরা এক বাক্যে দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং ইহাই যে ঠিক, যুক্তি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে যাঁহারা গৃহস্থ হইবার অযোগ্য তা যে কোনো কারণেই হউক, তাঁহারা গৃহস্থ না হইয়া একবারে সন্ন্যাসী হন। বীর না হইলে কেহ যথার্থ গৃহস্থ হইতে পারে না। দুর্ব্বলের আশ্রম সন্ন্যাস। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। অর্জ্জুন শেষে বলিয়াছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ, আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, সব বুঝিয়াছি, তোমার কথা আমি পালন করিব'—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা করিষ্যে বচনং তব।"

কি ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধ হিংসাশ্রিত হইলেও কিরূপে তাহাতে পাপ হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহাও তন্নতন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সার কথাটি এই যে, আসক্তিকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। আসক্তি-ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, এ সবই এক, কেবল শব্দের ভেদ। অর্জ্জুন ছিলেন গৃহস্থ, যুদ্ধ পর্য্যন্ত তিনি করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করেন নাই—যদিও আসক্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের যদি কোন ঐতিহাসিকতা না থাকে, না-ই থাকুক; উহা বেদব্যাসের লেখা হউক বা না-ই হউক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে বলা হইয়াছিল, বা না-ই হইয়াছিল; কিন্তু ঐ একটা সংবাদ যে আছে, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন শব্দ দুইটি বাদ দিয়া দুইটা অপর কোনো শব্দ সেখানে যোগ করা হউক। উহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এই সংবাদ হইতে যে ভাবটি পাওয়া যাইতেছে, তাহারই সহিত আমাদের সম্বন্ধ। এই ভাবকে জীবনে মোটেই পালন করা যায় না, অন্তত ইহার বহু নিকটেও যাওয়া যায় না, ইহা কি করিয়া বলিব, যখন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ ঐ কৌপীনধারীকে দেখিতেছি, আর বলিতেও শুনিতেছি 'আমি উনচল্লিশ বৎসর যাবৎ গীতার উপদেশকে নিজের জীবনে পালন করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছি।'

বিষয় ভোগ করিতে হইবে না ইহা কখনও নহে; ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে, এবং আসক্তি ত্যাগ করিলেই তাহা ভাল করিয়াই করিতে পারা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির ইহা একটি বিশেষ কথা। কালিদাস রঘুবংশে একটি খুবই ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তিতে নিজের পাঠকগণের সম্মুখে ইহা ধরিয়া দিয়াছেন—

"অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ"

যে-সরাগ অর্থাৎ যাহার রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা, আসক্তি আছে, ও যে বীতরাগ অর্থাৎ যাহার রাগ নাই, উভয়েই যদি বিষয় ভোগ করে তবে তাহাদের মধ্যে ভেদ কি? রাজা মিলিন্দের মনেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই সম্বন্ধে ভিক্ষু নাগসেনের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা এইরূপ :—

রাজা বলিলেন—'ভগবন্ নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগের ভেদ কিসে?'

'মহারাজ, একজন আসক্ত, আর একজন অনাসক্ত।'

'ভগবন্ নাগসেন, আসক্ত ও অনাসক্ত ইহার মানে কি?'

'মহারাজ, একজন অর্থী আর একজন অর্থী নহে।'

'ভগবন্ নাগসেন, আমি তো এইরূপ দেখিতে পাই যে সরাগ ও যে বীতরাগ, উভয়েই উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য ইচ্ছা করে, নিকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য ইচ্ছা করে না।'

'মহারাজ, যে সরাগ সে ভোজ্য বস্তুর স্বাদ, আর ঐ স্বাদে একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া ভোজ্য বস্তু ভোজন করে; কিন্তু যে বীতরাগ সে ভোজ্যবস্তুর স্বাদমাত্র অনুভব করিয়া তাহা ভোজন করে, সে ঐ স্বাদে কোনো আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না।'

আসক্তিই যখন দুঃখের, অশান্তির, অকল্যাণের মূল, আর আসক্তির ত্যাগই সুখ-শান্তি-কল্যাণের মূল, তখন কোন্ পথ দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে তাহা স্থির করা মোটেই শক্ত নহে। তখন সাহিত্যিক নিজের সাহিত্য-সঙ্গীতকে কোন্ সুরে বাঁধিবেন তাহাও জানা কঠিন নহে। পাঠকের চিত্তে যাহাতে আসক্তির তরঙ্গ উত্তরোত্তর অধিক অধিকতর ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে তিনি তাহাই করিবেন, অথবা পাঠকের চিত্তে পূর্ব্বে আসক্তি থাকিলেও যাহাতে তাহা ক্রমশ কম হইয়া তিরোহিত হইয়া যায় তাহাই তিনি করিবেন? সেই চিরন্তনদের কথা মনে করিয়া প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কি নিজের সাহিত্য-রচনার দ্বারা পাঠকগণকে এমন ইঙ্গিত প্রদান করিবেন যে, সীতার প্রতি রাবণের যে ভাব ছিল তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে, অথবা তাঁহার রচনার ইঙ্গিত এরূপ হইবে যে, সেই ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে?

একটি শ্লোক বলিতে চাই। আজকালকার ইস্কুলের ছেলেদের অনেকে ইহা জানে। শ্লোকটি পুরাতন, কিন্তু তা বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা নষ্ট হয় নাই। সূর্য্য কত পুরাতন বলা যায় না, তবুও ইহা এখনও অকেজো হয় নাই (—যদিও বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের ভয় দেখাইয়াছেন যে কালে নাকি তাহাও হইবে)। শ্লোকটি এই :—

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

'ইন্দ্রিয়ের অসংযম বিপদের পথ, আর ইন্দ্রিয়ের জয় সম্পদের পথ; যে পথে ইচ্ছা হয় সেই পথেই চল।'

কাহারও ভাল করিতে পারা গেলে তাহা খুবই ভাল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না-ই হয়, অন্তত এইটুকু দেখা দরকার যে, কাহারো মন্দ না হয়। এক একটি কার্য্যের ফল এত বিস্তৃত যে, অনেক সময়ে, অনেকের পক্ষে তাহা ভাবিয়া দেখা সম্ভব হয় না। কেহ কাহারও ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়, ইহাতে তাহার বেশী সময় বা বেশী শ্রম আবশ্যক হয় না; কিন্তু তাহার ফলটা অপর লোকের নিকটে কিরূপ ভীষণ হয়, তাহা সহজেই ভাবিয়া দেখিতে পারা যায়। ক্রিয়ার ফলটি যদি সেই ক্রিয়ার কর্ত্তাতেই আবদ্ধ থাকে তো কিছু বলিবার প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেকের সম্বন্ধ থাকে, তখন তাহা করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তাকে অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়।

ধ্বংস সহজেই হইতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি তেমন সহজ নহে। কোনো সেতুকে এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শেষ করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা বন্ধন করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক হয়। ঘরখানা ভাঙিয়া ফেলাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে থাকিবার ব্যবস্থাটা কি তাহাও ভাবা দরকার। সংস্কারের খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহার নামে যদি মূলেরই উচ্ছেদ হয় তবে সে বড় ভয়ের ও ভাবনার কথা। সংস্কারের উদ্দেশ্য ভাল করা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে বস্তুত ভাল হইবে কি না, সংস্কার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহা শান্ত ও গভীর ভাবে বহুবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

"॥ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥"
'তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দান করুন!'
"॥ স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য ॥"
বিশ্বের কল্যাণ হউক।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মেদিনীপুর শাখার ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, ফাল্গুন, ১৩৩৮।

অরণ্য-কাণ্ড

শ্রীমনোজ বসু

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরীপ চলিতেছে, খানাপুরী শেষ হইল এতদিনে। হিঞ্চে-কল্মীর দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটী সদর ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌছিয়াছে। উপলক্ষ্য একটা জটিল রকমের মোকর্দ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারী চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক'টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সুধারাণী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল—পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানিনে—তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল—চলে যাবেন তাই ভয় দেখান হচ্ছে, ভারী কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল—যদি মানা কর তবে না হয় যাইনে—

—থাক্।

—তার মানে? এই যে আমি চলে যাব আমার মোটেই কেন কষ্ট হচ্ছে না—না?

কোন জবাব না দিয়া সুধারাণী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

—শোন সুধারাণী, উত্তর দাও—

—বা-রে পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি—

—নিজের ত জান—। তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল—আমি চলে যাব ব'লে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বল আমায়—না বললে শুনছি নে কিছুতে—।

—না—

—সত্যি বলছ?

—না—না—না—বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

—মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারাণী—

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝর-ঝর করিয়া গাল বহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।...

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল—ছোটবাবু, ঘাটে ষ্টীমার সিটি দিয়েছে।

সুধারাণী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল—দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গীর কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—হপ্তায় একখানা ক'রে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে?...

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকাল বেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরীপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারাণী নাই।

ইতিমধ্যে নক্সা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—দু'শ দশ—এগার—তার উত্তরে এই হ'লগে দু'শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নক্সার উপর জায়গাটা

চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল—অনাবাদি বন-জঙ্গল একটা, মানুষ-জন কেউ যায় না ওদিকে—তবু এই নিয়ে যত মামলা—

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল—সেই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধ করি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপনমনে দিব্য শিষ দিতে সুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে—

বলিল—হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক··· এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারী গোলমেলে ব্যাপার—

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দু'শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে—শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল—আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নীচে নীচে উড পেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এইরকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন ত হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে—এই পাতায় কুলোবে না—

শঙ্কর কহিল—কুড়ি পুরে যাবে—যাওয়াচ্ছি আমি, রোসো না—আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বল্‌লে কখন ?

—সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজ কর্ম্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি ?

আরও খানিকটা কাজকর্ম্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল। বলিল—মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে' তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায় ?···এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই—ওগুলো ভাঁটফুল, না ? কিন্তু গাঙের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল—ঘোড়া থাক্‌গে, এক কাজ করলে হয় বরং—চল না কেন দু'জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি ; মাইলখানেক হবে—কি বল ? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভাল থাকে—চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনদিকে লোক চলাচল নাই ; শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মত,—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল—গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে ?

ভজহরি কহিল—না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই, সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়—

—গড় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ রাজারামের গড়। রাজারাম ব'লে নাকি কে-একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিচ্ছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব—

তারপর দু'জনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই ত হে !

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল—বাঘ ? চারিদিকে ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর—তবে হ্যাঁ অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো গোবাঘা দু-একটা আসত, এবারে আমাদের জ্বালায়—বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল—উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর ? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে' করে' সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিচ্ছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না—

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট-দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল। ঘন

শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁটাল গাছের সংখ্যাই বেশী, পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমীর, ছাতাধরা সবুজ···ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা···একদা মানুষেই যে ইহাদের প্রতিপালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিমকালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনদিন সূর্য্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।···

এইরকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

—ওখানটায় ত ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল—ওর নাম পঙ্কদীঘি—

—খুব পাঁক বুঝি?

—তা হবে, কেউ কেউ আবার বলে পঙ্খী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে—

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল।

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড, দুই কামরা ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারী নৌকা, কিন্তু তলীর ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেশারেশি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার অন্ততঃপক্ষে মরিবার অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার যো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মত করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায় এক-একদিন নিঝুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতীমালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মত পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষসংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নীচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চ-লতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মত কালো জল। সাড়া পাইয়া ক'টা ডাকপাখী নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআঁচড়ার কাঁটা ঝোপের নীচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্ব্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়ত প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সম্বিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

—ধ্যেৎ, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে?

—কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চল মালতীমালা—লক্ষ্মীটি, চল যাই—

—আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি আজকের দিনটে থাক শুধু—

ঐ যেখানে আজ পুরাণো ইটের সমাধিস্তূপ ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনখানে হয়ত একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়ত বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কী

খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ছুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিস্‌ফাস্ কথাবার্ত্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল···শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই···এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল···

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে শঙ্করের ভাবিতে কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জ্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম-ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মত হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।···সহসা সচেতন হইয়া বারম্বার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারী কর্ম্মচারী··· তার পসার-প্রতিপত্তি···ভবিষ্যতের আশা···মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল—আমিন মশাই!—

ভজহরি কহিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল হুজুর—

—যাচ্ছি—

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল—ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপ্‌রে বাপ্—এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্ব্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল—চুরুট টেনে টেনে ত আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশী মতে বসে বসে টানা যায়—

আমিনও হাসিয়া বলিল—অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ'র থেকে বিশটা রূপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট-দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল—মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে—ধনঞ্জয় চাকলদার আগে আসুন—

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠির মত জড়ানো একখানা লম্বা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা, পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরপে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামজাদা রাজারামের গড় একশ' বাহান্ন বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোস-কোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি, ধনঞ্জয় বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল—ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ, পিতামহ হ'লেন কৈলেসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশী সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুণে আসছি কালেক্টরীতে—গুডিভ সাহেবের জরীপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য ক'রে দেখবেন হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল—তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব—

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে' দাঁড়াচ্ছে হুজুর—

—বারো-শ উনিশ সনের পুরাণো দলিল দেখাচ্ছে যে—

ভজহরি কহিতে লাগিল—এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন-সিকে কবুল করুন তার কাছে



ঝড়ের পর

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গিয়ে—উনিশ সন ত কালকের কথা, হুবহু আকব্বর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে, আসল নকল চেনা যায় না—

বস্তুতঃ ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরাণো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনীও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায় রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল—দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের ত হ'তে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—নয়ই ত—

—আপনারা হলপ করে' বলুন এর সত্যি মালিক কে—

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল—দু'শ' বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল—না এরা পাটোয়ারী বটে—দেখে শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে—

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এরকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল—তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যে গুলো রেজেষ্ট্রী? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে দুপুরুষ আগে থেকে তাই তৈরী হয়ে আসছে। চুলোয় যাক্‌গে দলিল-পত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজ খবর করে' কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে' যাই—পরে যেমন হয় হোক্‌গে—

ভজহরি বলিল—কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষীসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক একজনে এক এক রকম বলে—বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল—নরলোকে আস্কারা হ'ল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে' জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়—

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল—কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাককাটীর খাল পেরিয়ে তেঁথরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে' যান—সে ভারী অদ্ভুত গল্প,—কাজ কর্ম্ম নেইত এখন?

*　*　*

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনদিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারী করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল—কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ শ' ঢালী ঘায়েল হয়ে' গেল, সেই পাঁচশ' মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার শ' বছর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদী-কূলবর্ত্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থম-থম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত

জয়োল্লাস…দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটি শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোন দিকে কেহ নাই…

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়ন পথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে! দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শেষ?—

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল—বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন—নৌকা সাজানো হোক্—

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন—নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খীখানা সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয় হ'ল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন খোঁপা ঘিরিয়া তার কতগুলি বসাইলেন, বাকীগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দু'টি কাণে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালবাসার স্মৃতিমণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, দীঘির পাড় দিয়া দলে দলে রক্ত পতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

—ধর, ধর নৌকো—

মালতীমালা তলীর পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘমাস্তলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্ণিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময়ে কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

—চলুন, প্রভু—

—কোথা?

—বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব—

—গড়ের আর-আর সব?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা কহিল। বলিল—কোন চিহ্ন নেই আর, জলের উপরে কনকচাঁপা ছাড়া—

কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—আন্‌তে পার নি? ঘোড়ায় তুলে' দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে'—আমি একটা ফুল আন্‌ব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খট-খট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাতদুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছায়, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশঃ গাঢ়তম হইয়া ওঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার শ' বছর আগেকার সেই রাজবধূ পদ্মদীঘির হিমশীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া

দাঁড়ান। ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুইহাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘুচরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশঃ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া ওঠে···কুঙ্কুমে-মাজা মুখ···গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা···সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো···পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলী ও মেঘডম্বুর সাড়ী হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে···বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধ-সর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায় কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায় ···

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিক-কার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব্ব রহস্যময় বলিয়া ঠেকিল। ঐ খানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোন একটা অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল···সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা··· ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না! ···ক্রমশঃ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল—সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনী, তার ক্ষুদ্রহৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বনে জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।···

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপততঃ আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু'পয়সা পাইবার লোভে এত মোকর্দ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ, গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশ-মুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজরে পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা! সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত বর্ত্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্য-রাত্রে যদি এই সিংহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায় শতাব্দী-পারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধান পায়ের নীচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্ম্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্ণিরীক্ষ সান্ত্রীগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল—জুতা খুলিয়া এস—

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা···জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিতহস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারম্বার দেখিতে লাগিল।···আর একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই সুধারাণী ও আর কে-কে তার নূতন দামী তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল; কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চ্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তাহারা একটি অতি দরকারী নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা' হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশী। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হুহু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্ত্তে মর্ম্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোন কিছুর জোগাড় নাই। চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মত সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যাহারা সব আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গের সিপাহীসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলিসঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না ত!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্ব্বশেষ সোপানের নীচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মত গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারম্বার থামিতে ইসারা করিতেছে—

সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!…কিন্তু কান্না থামিল না। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চারশ' বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মত উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, তাহার কিছু নীচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মত সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বালিতে না জ্বালিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গেল, কোনদিকে কিছু নাই।

তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল—আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মত দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধর, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজ্ঞানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ'সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা ত নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্ত করিতে এখানে আসিয়াছে। জরীপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-বাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না, তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া জামিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্সা কাগজ পত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মত ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে' করে'…

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল—তাই পারিবে নাকি কোন দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে ত আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরাণো ঘর-বাড়ী আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।…

হা-হা-হা হা-হা তাহাদেরই হাসির মত আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।…

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকী, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ…বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়ীতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে; এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে! যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারাণী আসিয়া দাঁড়ায়…কপালে জলজলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামীর হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে…মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া

শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে—কি করেছি আমি তোমার?···

এই সময়ে হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আ'ল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধান-ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌঁছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আ'ল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার পিঠ হইতে ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া আ'লের উপর কে তাহাকে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে নীচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মত মাঠে গিয়া উঠিল, শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে ক্ষুর বাজিতে লাগিল—খট্‌খট্ খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চারশ' বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন সেইখানে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর মাঠের ওপারে তেঘরা-বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আঁধারু মাঠে ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

বেড়ার ধারের ফুল

শ্রীক্ষিতীশ রায়

বেড়ার ধারের ছোট্ট কাঁটাফুল,
অদেখা সে—না জানে কেউ তারে,
অন্তরালে গোপন-প্রিয়ার মত
জন্ম নিল ছায়ার অন্ধকারে।
আলোর হাসির সঞ্জীবনী
পাবে না ক ফুল
ঝরবে জানি কণ্টকেরি ঘায়
বিফল প্রেমের বেদনাতে
অজানিতা প্রিয়া,
গুমরি' মরে মৃত্যু—তমসায়!*

* ইটালিয়ান হইতে

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৭

গীতায় বিভিন্ন মার্গ

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই অবতারবাদের কথা আসিয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সংন্যাস ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগ-মার্গ আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে অন্যান্য বিবিধ মার্গ ও নানা প্রকারের ধর্ম্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই সকল বিভিন্ন নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত স্মরণ না রাখিলে গীতার উপদেশের তাৎপর্য্য সুগম হইবে না। এজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই সংক্ষেপে গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গের আলোচনা করিব।

শিক্ষা দীক্ষা ও প্রবৃত্তিভেদে মনুষ্যের নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মে। সকল ব্যক্তির পক্ষে একই মার্গের ব্যবস্থা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অধিকারভেদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। হিন্দুধর্ম্মের উদার উপদেশ এই যে, তুমি যে-কোন মার্গই অবলম্বন কর না কেন, উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল মার্গেই কিছু-না-কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকারভেদ বিচার করিলে কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না। গীতার বিশেষত্ব এই যে, কোন একটি বিশেষ মার্গ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গীতাকারের মতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে সকল মার্গই অন্তিমে পরব্রহ্মে পৌছাইয়া দিবে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই উদারতা অতুলনীয়। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ কোথাও কিছু দূষণীয় দেখিলে সেই প্রথার সমূল উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, মানুষ যে ভ্রান্ত আচরণ করে তাহার মূলে কোন-না-কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রেরণা আছে। এইজন্যই কুপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে উপদেশের দ্বারা বা বলপূর্ব্বক নিরোধের দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস—তাহা অন্ধবিশ্বাসই হউক বা যুক্তিযুক্তই হউক—মানিয়া লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক মার্গের আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ এমনই সুনিপুণভাবে করিয়াছেন যে, সেই মার্গের দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাই সাধকের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিয়াছে; তন্মার্গাবলম্বীর আপত্তি করিবারও কিছুই রাখেন নাই। এইজন্যই গীতা সকল মার্গের উপাসকদিগের পক্ষেই আদরণীয়। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বাসের যে মূল্য আছে এবং তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে তাহার দ্বারাই মানুষ উন্নত হইতে পারে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম্ম। কোন ধর্ম্মমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আত্যন্তিক বিরোধ নাই। এভাবে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত উদারচেতা সংস্কারকও আর কেহই জন্মেন নাই।

গীতাকার তৎকাল-প্রচলিত প্রায় সকল মার্গেরই অল্পস্বল্প আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য গীতার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তৎকালে যে-সকল মার্গ প্রচলিত ছিল সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ও পরে প্রত্যেক মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামতের উল্লেখ করিব। ইহা পাঠ করিলে, পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহার মর্ম্ম পরিস্ফুট হইবে। আধুনিক যুগে জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিতেন। এমন কি সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম তাঁহার আলোচনায় বাদ যাইত না। কেন একথা বলিতেছি পরে তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুমান করা যায় যে, তৎকাল-প্রচলিত কোন বিশিষ্ট মার্গই গীতায় বাদ পড়ে নাই।

গীতায় নিম্নলিখিত মার্গ ও ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।—সাংখ্যযোগ, সংন্যাস, কর্ম্মযোগ, যোগ, যজ্ঞ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়-নিরোধ, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্ম-সংযম, তপ, বেদপাঠ, প্রাণায়াম, উপবাস, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, দান, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, অবতারবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, ওঙ্কারের

ধ্যানে, অহোরাত্রবিদ্যা, অধ্যাত্ম-অধিদৈব-অধিযজ্ঞবাদ, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা, যক্ষপূজা, পত্রপুষ্পফলজল ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ, রাজবিদ্যা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহ বিচার করিলে অনুমান হয় যে, তখনকার দিনে যজ্ঞেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল এবং যজ্ঞকার্য্যে নানা রাজসিকতা ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্যই কি করিয়া নিষ্কামচিত্তে যজ্ঞ আচরণ করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ বার-বার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। দান ও তপস্যারও অপব্যবহার লক্ষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ, দান, তপকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন ও দোষ পরিহারের জন্য সাত্ত্বিকভাবে আচরণের উপদেশ দিয়াছেন। যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানের আচরণ প্রধান সাধনা হিসাবে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্য এই কয়টি কথার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। পূজা অর্চ্চনা সমধিক প্রচলিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র এক শ্লোকে তাঁহার কথা শেষ করিয়াছেন। হঠযোগ প্রাণায়াম ইত্যাদিরও বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনকার মত তখনও কেহ কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। তখনকার দিনে এমন কতকগুলি মার্গের প্রচলন ছিল যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, যথা অহোরাত্র বিদ্যা। তখনও লোকে ভূতপ্রেতের পূজা করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই কথা গীতায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে-গীতাকার ভূতপ্রেত পূজাও বাদ দেন নাই, তিনি যে লোকপ্রচলিত থাকিলে এত বড় একটা কথা বাদ দিবেন, তাহা মনে হয় না। ১৬।২ শ্লোকে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে শান্তি, পরনিন্দা—বর্জ্জন ইত্যাদি গুণের সহিত দৈবী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ উপদেশের মধ্যেও অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ দেখা যায়। গীতাকারের মনে এই সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা উঠিয়াছিল কি না বলা যায় না। তিলক বলেন, বৌদ্ধগ্রন্থের এই সব কথা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভজন নামগান ইত্যাদির বহুল প্রচার হইয়াছে। গীতায় এ সকলের উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মলাভের দুই উপায়।—ব্রহ্মলাভের দুই প্রকার উপায় প্রচলিত আছে। এক সাংখ্য ও অপরটি যোগ। সাংখ্যযোগ বা সংক্ষেপে সাংখ্য, কর্ম্মযোগ বা সংক্ষেপে যোগ—এই দুই শব্দের উল্লেখ গীতার বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদিতে যে "যোগ" শব্দ আছে তাহার অর্থ উপায় বা প্রয়োগ। ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তি যেখানে সাধনের উপায়, ইত্যাদি। এই হিসাবে হঠযোগ ইত্যাদি যোগরূপ বিশেষ মার্গকে যোগ-যোগ বলা যাইতে পারে, যদিও একথার প্রচলন নাই। গীতাকার সাংখ্য এবং যোগ শব্দে ঠিক কোন্ কোন্ মার্গ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচার্য্য। অধুনা সাংখ্য বলিলে লোকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমন্বিত কাপিল সাংখ্য-শাস্ত্রই বুঝেন, এবং যোগ বলিলে পাতঞ্জল যোগ বা হঠযোগ বুঝায়। গীতায় ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে কপিলের নাম করিয়াছেন এবং ১৩।৫ শ্লোকে কাপিল সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে; কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব ত্রিগুণবাদ শ্রীকৃষ্ণ মানিয়া লইয়াছেন। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সাংখ্য কাপিল সাংখ্য—এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্য কথার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখা যায়, যথা—জ্ঞাতব্য পদার্থের যে শাস্ত্রে "সংখ্যা" বিচার হয় তাহাই সাংখ্য, এই অর্থে কাপিল সাংখ্যের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। আর এক ব্যুৎপত্তি, যাহাতে বস্তুতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব "সম্যক্ খ্যায়তে" অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, সেই শাস্ত্রই সাংখ্য। এই ব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা-গণনার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। যে-কোন দার্শনিক আলোচনাই এই হিসাবে সাংখ্যশাস্ত্র। এই ব্যুৎপত্তি মানিলে সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগের একই অর্থ হয়। কাপিল শাস্ত্রও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাই একমাত্র সাংখ্যশাস্ত্র নহে। শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ সুবিধামত কোথাও প্রথম অর্থ

কোথাও দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যযোগ জ্ঞানযোগ ও সংন্যাসযোগের একই অর্থ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিতেছেন, সাংখ্যানাং অর্থাৎ "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃত সংন্যাসানাং বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংস পরিব্রাজকানাং"—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রাদির দ্বারা পরমার্থ তত্ত্বের সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকদিগকে সাংখ্য বলা হয়।

২।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে, সাধারণ জ্ঞানিগণের উপদেশকেও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। গীতায় যে-যে শ্লোকে সাংখ্য কথার উল্লেখ ও আলোচনা আছে, সংক্ষেপে তাহার বিচার করিতেছি। ২।৩৯ শ্লোকে আছে, এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্যশাস্ত্রানুযায়ী বুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম, এইবার যোগানুযায়ী বুদ্ধির কথা শুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শঙ্করাচার্য্যের অর্থ না মানিয়া সাংখ্য শব্দে সাধারণ জ্ঞানী বুঝিলে তবে পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত সঙ্গতি থাকে। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে সাধারণ জ্ঞানীদের উপদিষ্ট স্বর্গাদিলাভ ও ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রভৃতির কথা আছে। ৩।৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, সাংখ্য ও যোগ নামক দুই প্রকার নিষ্ঠা লোকে প্রচলিত আছে। তিনি মাত্র দুই প্রকার নিষ্ঠার কথাই বলিলেন, অতএব বুঝিতে হইবে যে তাবৎ মার্গই এই দুইয়ের মধ্যে কোন-না-কোনটির অন্তর্গত। সাংখ্যকে কেবল কাপিল সাংখ্য বলিয়া ধরিলে অন্যান্য জ্ঞানমার্গের স্থান কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং" অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানই সাধনা, যোগীদিগের কর্ম্মই সাধনা, এখানে জ্ঞান কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান সূচিত হইতেছে, কেবল সংখ্যা-সূচক কাপিল শাস্ত্রই বুঝাইতেছে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা পরে করিতেছি।

৫।৪,৫।৫ শ্লোকে বলিতেছেন যে, দুই মার্গের একই ফল। এখানেও কাপিল সাংখ্য মাত্রই সূচিত হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী শ্লোকেই

সহিত যোগের তুলনা আছে, কিন্তু এখানে সন্ন্যাসকে সাংখ্যান্তর্গত একটি বিশেষ মার্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়।

১৩।২৫ শ্লোকে আছে, কেহ ধ্যানের দ্বারা, কেহ সাংখ্যের দ্বারা ও কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মার দর্শনলাভ করে। সাংখ্যকে কাপিল সাংখ্য বলিলে বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্র বাদ যায়। অতএব সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানশাস্ত্রই সাংখ্যের অন্তর্গত। এই শ্লোকে ধ্যানকে জ্ঞান বা কর্ম্ম মার্গের অন্তর্গত করা হয় নাই, তাহার পৃথক উল্লেখ আছে। কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় বিভাগেই ফেলা যায়, সেইরূপ ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শনও উভয় মার্গেরই অন্তর্ভুক্ত। ধ্যানকে ক্রিয়া বলিয়া ধরিলে ধ্যান কর্ম্মমার্গেরই একটি বিশিষ্ট পন্থা। কিন্তু আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া আত্মদর্শন করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানেই আসিয়া পৌছিতে হয়। গীতাতে বহুস্থলে আছে যে, বুদ্ধিযোগসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় মার্গের চরম অবস্থা। একথা স্বীকার্য্য যে, তাবৎ নিষ্ঠাকে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই মার্গের মধ্যে ফেলিলে যুক্তিবাদীর কাছে জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১৮।১৩ শ্লোকে আছে যে। "সাংখ্যে কৃতান্তে" কর্ম্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮।১৯ শ্লোকে আছে, "গুণসংখ্যানে" গুণভেদ হিসাবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার—তিন তিন বিভাগ করা হয়। এই দুই শ্লোকের 'সাংখ্য কৃতান্ত' ও 'গুণসংখ্যান' কথার অর্থ অধিকাংশ ভাষ্যকার কাপিল সাংখ্য বলিয়া মনে করেন। কাপিল সাংখ্যে যে কোথাও কর্ম্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণের উল্লেখ আছে বা ত্রিবিধ কর্ত্তা ইত্যাদির বর্ণনা আছে আমার তাহা জানা নাই। এই সকল কথা যদি কাপিল শাস্ত্রে না থাকে তবে সাংখ্য অর্থে সাধারণ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কোন্ কার্য্যের কতগুলি কারণ আছে বা কোন বিশেষ পদার্থকে কয়ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বিশ্লেষণ করিয়া

আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মসিদ্ধির যে পাঁচটি কারণ আছে তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধিতেই বুঝা যাইবে। ২।৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায়—১৩।২৫ শ্লোকেরও ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্য। এই কয়টি শ্লোক ব্যতীত গীতায় আর কোথাও সাংখ্য শব্দের উল্লেখ নাই।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, সাংখ্য মার্গকে জ্ঞানমার্গ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কাপিল সাংখ্য এই জ্ঞানমার্গেরই অন্তর্গত। সাংখ্য ও যোগ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধন গীতারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬।১৩ শ্লোকে আছে—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাদিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অর্থাৎ, যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনাশীলদের মধ্যে চেতনা, এক হইয়াও যিনি অনেকের কাম্যবস্তুসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগাদিগম্য সেই কারণরূপী দেবকে জানিলে সর্ব্বপাশের মোচন হয়।

কারণরূপী দেব ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার সাংখ্য ও যোগ এই দুই প্রকার সাধনের কথা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মলাভের সাধন কেন দুই প্রকার বলা হইল তাহা বিচার্য্য। জীব যতক্ষণ বহির্জ্জগতের মায়ায় আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় না। বহির্জ্জগতের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে তাহা জীবকে আকৃষ্ট করে না ও তখনই ব্রহ্মদর্শনের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বহির্জ্জগতের সহিত মনুষ্যের দুই প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান—এক আদান ও অপরটি প্রদান। একটির দ্বার জ্ঞানেন্দ্রিয়, অপরটির দ্বার কর্ম্মেন্দ্রিয়। বহির্জ্জগৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বহির্জ্জগতকে নিজ আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্রিয় যদি আমাদের বহির্জ্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করাইতে পারে তবে মন অন্তর্ম্মুখ হইয়া ব্রহ্মদর্শন করায়। এইজন্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন সম্ভব। অপর পক্ষে যদি আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের স্বরূপ জানিতে পারি তাহা হইলেও বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্কের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ও তখন ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়। যে-সমস্ত মার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য আছে সে-সমস্তই সাংখ্যের অন্তর্গত। আর যাহাতে কর্ম্মের প্রাধান্য আছে তাহাই যোগের অন্তর্গত। কর্ম্মের দ্বারা আমাদের বহির্জ্জগতের সহিত বস্তুগত সংযোগ হয় বলিয়াই এই মার্গকে যোগ বলা হয়। কাপিল সাংখ্য যেমন সাংখ্য মার্গের অন্তর্গত, সেইরূপ পাতঞ্জল যোগও যোগমার্গের অন্তর্গত। গীতায় পাতঞ্জলযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মপ্রধান ব্রহ্মলাভের উপায়কে যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বহির্জ্জগতের সহিত আদান-প্রদানের যেমন দুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই, তেমনি ব্রহ্মলাভেরও দুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই। এইজন্য শ্বেতাশ্বতরে ব্রহ্মকে সাংখ্যযোগাদিগম্য বলা হইয়াছে।

গীতায় যে-সকল নিষ্ঠা বা সাধনের উল্লেখ আছে তাহা জ্ঞান বা কর্ম্মের প্রাধান্য হিসাবে এই দুই বিভাগে ফেলা যায়।

সাংখ্যমার্গ:—সংন্যাস, কাপিল সাংখ্য, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, ওঁকারের ধ্যান, ধ্যান বা আত্মার স্বরূপ চিন্তন, অবতারবাদ, অহোরাত্র বিদ্যা, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবাদ।

যোগমার্গ:—পাতঞ্জল যোগ, প্রাণায়াম, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, তপ, বেদপাঠ, উপবাস, দান, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপ্রেত পূজা, পত্রপুষ্প ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ, রাজবিদ্যা।

সাংখ্য ও যোগ মার্গান্তর্গত সাধনপদ্ধতিগুলির যে-বিভাগ উপরে দেখান হইল তাহা নির্দ্দোষ নহে। এমন অনেক মার্গ আছে—যথা ইন্দ্রিয়সংযম বা ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার—যাহা দুই মার্গের মধ্যেই পড়িতে পারে; ধ্যান সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। সাংখ্য ও যোগমার্গকে সাধারণ ভাবেই পৃথক বলা যাইতে পারে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন, অর্ব্বাচীনগণই এই দুই মার্গের পার্থক্য দেখে; জ্ঞানিগণের নিকট এই দুই মার্গই এক (৫।৪-৫)। কৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে যে জ্ঞান জন্মে তাহাতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞানেই মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি সাংখ্যলভ্য, কিন্তু জ্ঞান কর্ম্মলভ্য, অতএব এই দুই মার্গকে পৃথক করা যায় না। কর্ম্ম নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা সম্ভব নহে; জ্ঞানমার্গেও কর্ম্মত্যাগ হয় না।

গীতোক্ত প্রত্যেক মার্গের পৃথক আলোচনার পূর্ব্বে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের অধিকাংশই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর। উভয়ের কথোপকথনে পর পর অর্জ্জুনের মনে যে-সব প্রশ্ন উঠিতেছে তাহাতে অস্বাভাবিকতা এবং অসংলগ্নতা কিছুই নাই; একাগ্রমনে গীতা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকের মনেও এই সব প্রশ্নই যথাক্রমে উঠিবে। আমি বিভিন্ন অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এই সকল প্রশ্নের পারম্পর্য্যের ধারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গীতাকার এত নিপুণভাবে এই প্রশ্নোত্তরমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, হঠাৎ মনেই হয় না যে অর্জ্জুনের সমস্যাপূরণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে প্রশ্নোত্তর ছলে গীতাকার তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গগুলির আলোচনা করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে জ্ঞানীদের উপদেশ, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ও সমাজধর্ম্মের আলোচনা আছে; শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বুদ্ধিযোগও এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞকথা ও স্বধর্ম্মের বিবরণ আছে। সমাজধর্ম্মের আচরণে ক্রূর কর্ম্ম করিতে হয়; তাহা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি ভাল কাজই কেন না করি এই প্রশ্নের উত্তরে যজ্ঞকথা ও স্বধর্ম্মের বিচার স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। স্বধর্ম্মপালনে ক্রূর কর্ম্ম করিতে হইলে দোষ হয় কি না ইহার আলোচনায় কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, বিকর্ম্ম কি ইত্যাদি প্রশ্ন চতুর্থ অধ্যায়ে আসিয়াছে; দুষ্কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পায় তাহার ব্যাখ্যায় অবতারবাদ আসিয়াছে এবং পূর্ব্বাধ্যায়ের যজ্ঞ-কথারও বিশদ আলোচনা আছে; কৃষ্ণ দেখাইলেন স্বধর্ম্মানু-মোদিত হইলে ক্রূর কর্ম্মেও দোষ হয় না, অপর পক্ষে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে যজ্ঞরূপ ভাল কাজেও দোষ হয়। কি করিয়া এই দোষ কাটাইতে হয় কৃষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিলেন। ভাল, মন্দ ইত্যাদি সকল রকম কর্ম্মেই যখন বন্ধন আসিতে পারে তখন কর্ম্মের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাসী হই না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চম অধ্যায়ের অবতারণা। পঞ্চম অধ্যায়ে সংন্যাস মার্গ আলোচিত হইয়াছে ও সেই সূত্রে জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের কথা উঠিয়াছে। সংন্যাসীদের কথা হইতে যতিদের কথা ও যতিদের কথা হইতে যোগীদের কথা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সহজভাবে উঠিয়াই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বক্তব্যের সূচনা করিয়াছে। কৃষ্ণ দেখাইলেন প্রকৃত সংন্যাসী যোগীই হন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের (ইহাকে কর্ম্মযোগান্তর্গত পাতঞ্জল মার্গ বলা যাইতে পারে) আলোচনায় আসন ইত্যাদি শারীরিক যোগ ও ধ্যান চিত্তবৃত্তি-নিরোধ রূপ মানসিক যোগের বিবরণ আসিয়াছে। যোগীর তাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় ও আত্মদর্শন হয় ও তখন তিনি সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সম্পর্কেই সপ্তম অধ্যায়ের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা। কাপিল সাংখ্যোক্ত সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; কৃষ্ণ যেমন যজ্ঞ, সংন্যাস, যোগ ইত্যাদি প্রচলিত মার্গ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত পরিবর্জ্জিত আকারে অনুমোদন করিয়াছেন, কাপিল সাংখ্যও সেইরূপ ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাপিল সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, জীব ও তৎসহ কৃষ্ণের যোজিত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ আসিয়াছে। তখনকার দিনে অধিভূতবাদ ইত্যাদি যে এক বিশেষ সাধনমার্গের অঙ্গ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭।৩০ ও ৮।২ শ্লোক দেখিয়া মনে হয় মৃত্যুকালে ব্রহ্মস্মরণ এই মার্গেরই এক অঙ্গ। মনে যে চিন্তা লইয়া মানুষের মৃত্যু হয় পরজন্মের গতি সেই অনুসারে হইয়া থাকে, এই বিশ্বাসও এই মার্গান্তর্গত। অন্তকালে যোগাসন আশ্রয় করিয়া ওঁকারের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগের উল্লেখ ইহার পরেই আসিয়াছে। এই উপায়ে দেহত্যাগের চেষ্টা এখনও যোগীদের মধ্যে দেখা যায়। অধিযজ্ঞবাদের বিচার ও ওঁকারের ধ্যান অষ্টম অধ্যায় ভুক্ত। ওঁকারের ধ্যানে পুনর্জন্ম হয় না ও সমস্ত জগৎ পুনরাবর্ত্তনশীল এই কথায় (৮।১৫-১৬) পরবর্ত্তী শ্লোকের অহোরাত্র বিদ্যার উল্লেখের সুবিধা হইল। শুক্লকৃষ্ণগতি দেবযান পিতৃযান পথ ইত্যাদির কথা এই মার্গের পরেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়া নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোনীত

মার্গের উপদেশ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজের মত পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি কোন বিশেষ মার্গকে একমাত্র মার্গ বলিয়া মনে করেন না। যে যে-মার্গের সাধক হউক শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত সাধনা করিলে তাহার মুক্তি হইবে। কোন মার্গই পরিত্যাজ্য নহে। এইজন্যই নবম অধ্যায়ে সমস্ত মার্গের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমাতেই সমস্ত আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ নিজ নির্দ্দিষ্ট উপায়কে রাজগুহ্য রাজবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; ইহা পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষবোধগম্য, ধর্ম্মপ্রদ, সুখে প্রযোজ্য, অব্যয় ও স্ত্রী শূদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা নির্ব্বিশেষে সকলের উপযোগী। নবম অধ্যায়ে যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সাধনমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হঠাৎ বুঝা যায় না। ৯।৭ শ্লোকে অহোরাত্রবাদের কথার আভাস আছে; ৯।৮-১০ শ্লোকে পরিবর্ত্তিত কাপিল সাংখ্যবাদ, ৯।১১ শ্লোকে অবতার-বাদ, ৯।১২ শ্লোকে অধ্যাত্ম, অধিভূতবাদ, ৯।১৫-১৬ শ্লোকে বিবিধ যজ্ঞ, মন্ত্র, ঔষধ (রসসাস্ত্রের সাহায্যে মোক্ষলাভ), ৯।১৭ শ্লোকে ওঁকারবাদ, ৯।১৯-২১ শ্লোকে বেদোক্ত দেবতাগণ, যজ্ঞ, স্বর্গ ইত্যাদি, ৯।২২ শ্লোকে ধ্যান, ৯।২৩-২৫ অন্য দেবতা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা ইত্যাদি, ৯।২৬ শ্লোকে ফল পুষ্পাদি উপচারের দ্বারা পূজা, ৯।২৭-২৮ শ্লোকে সংন্যাস মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে সমস্ত মার্গগুলির আলোচনা শেষ না হওয়ায় ১০ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,'তোমাকে আরও বলিতেছি শোন'। ১০।৪-৮ শ্লোকে বিবিধ মানসিক সাধনা, যথা ক্ষমা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে এবং ১০।৯-১০ শ্লোকে ভক্তিবাদের কথা আছে। যে যে ভাবে বা যে যে বস্তুতে মানুষের ভগবদুপাসনার ভাব উদ্দীপিত হয় ১০।২০ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিবরণ আছে। উপনিষদোক্ত আত্মা, রুদ্রাদিত্য প্রভৃতি বেদোক্ত এবং ইন্দ্রিয়াদি উপনিষদোক্ত দেবতা বৃহস্পতি, স্কন্দ, ভৃগু প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিগণ, হিমালয়, গঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু, নানাবিধ গুণাবলী এই অধ্যায়ে উপাস্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে, তাবৎ উপাস্য পদার্থ সহিত সমগ্র বিশ্ব আত্মাতে অবস্থিত। একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন এই সমস্তই কৃষ্ণের দেহে অবস্থিত দেখিতেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন আত্মাই যখন বিশ্বজগতের আধার তখন আত্মাতেই মনোনিবেশ কর। বিশ্বে আত্মদর্শন বা আত্মার বিশ্বদর্শন উভয় উপায়েই মুক্তি সম্ভব। আত্মপ্রীতি বা আত্মরতিই প্রকৃত ভক্তি। কৃষ্ণভক্তি আত্মরতি একই কথা। কোথায় এই আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আত্মা শরীরবাসী, এজন্য আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিলে আত্মদর্শন হয়। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত, এইজন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ, তমের আলোচনা। পঞ্চদশ অধ্যায়ে কি করিয়া নির্গুণ আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করে এবং কি করিয়া আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাহার বন্ধন মোচন হইতে পারে, তাহা আলোচিত হইয়াছে। কোনও ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বিচার করিলে তাহার মোক্ষের সম্ভাবনা কতটা বলা যায়। এই সম্পর্কেই ১৬ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের আলোচনা। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণভেদে মানুষের একই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষত্বে বিভিন্ন ফল হইতে পারে; তাহা ১৭ অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানের বিশেষত্বে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েরই হেতু হইতে পারে। ১৮শ অধ্যায়েও ত্যাগ জ্ঞান কর্ম্ম ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদ দেখানো হইয়াছে এবং মানুষের পক্ষে কি প্রকার আচার কর্ত্তব্য তাহা স্বধর্ম্মের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। গীতার সার ধর্ম্মোপদেশ ১৮ অধ্যায়ের ৬৫-৬৬ শ্লোকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুমোদিত নবম অধ্যায়ে আরব্ধ রাজগুহ্য রাজবিদ্যার ব্যাখ্যা শেষ করিলেন। এইখানেই গীতার সমাপ্তি।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটক সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত একথা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের কোনরূপ যোগসম্বন্ধ আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, তাহা আলোচনা তেমন ভাবে কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের উপর ইউরোপীয় নাটকের যে অবিসংবাদিত প্রভাব বর্ত্তমান তাহার অন্তরালে সংস্কৃত রীতির ছায়া প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। বাঙ্গালা নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের অনুবর্ত্তন করেন নাই সত্য, তবে তাঁহারা অনেকস্থলে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটককে নানা ভাবে সংস্কৃত আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সংস্কৃত রূপ দিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। ফলে, তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে—ইউরোপীয় শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের দ্বারা তাঁহারা এস্থলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অবশ্য সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দের প্রচলিত অর্থ রক্ষিত হয় নাই—অর্থ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা বিকৃত হইয়াছে। অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচনাকারীদের নিকট ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে। বস্তুতঃ, অনেকস্থলে বাঙ্গালা নাটকের প্রাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত এবং ইহার বাহ্যিক আকার ভারতীয় রীতিতে গঠিত। আর অনেক স্থলে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বস্তুর উপর প্রাচ্যবর্ণের অনুলেপন। সম্প্রতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালা নাটকের উপর ভাব প্রভৃতির দিক দিয়া সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভূত প্রভাবের আভাস দিয়াছেন।* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি শব্দের ব্যবহার-প্রণালী লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে, বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে ব্যবহৃত কতকগুলি নূতন শব্দের কথাও উল্লিখিত হইবে।

প্রথমে নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত রীতি আদৌ অনুসৃত হয় নাই। কতকগুলি সংজ্ঞা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে সত্য—কিন্তু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য মোটেই রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, নাট্যসাহিত্যের প্রকারভেদ নিরূপণে অনেক স্থলে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণ করা হইয়াছে।

বাঙ্গালায় নাট্যসাহিত্যের সাধারণ নাম নাট্য বা নাটক। ইহার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে মিলনান্ত নাটক, বিয়োগান্ত-নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, গীতিনাটক, গীতিনাট্য বা নাট্যগীতি, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, পারিবারিক নাটক, ভাবরসাত্মক নাটক, প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য।+ এই নামগুলির আকর সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নহে—অনেক স্থলে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে অনুবাদ না করিয়া খাঁটি ইউরোপীয় নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' 'প্যারডি নাটিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংস্কৃত কোন্ কোন্ সংজ্ঞা নাট্য-সাহিত্যের প্রকার-নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাউক। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা রূপক নাট্য-সাহিত্যের সাধারণ নাম। ঠিক এই অর্থে না হইলেও এই দুইটি নাম

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ৪৮; *The Calcutta Review*, October, 1931.

\+ সম্প্রতি বায়স্কোপের এক বিজ্ঞাপনে 'চিত্রনাট্য' এই নূতন নাম দেখিলাম।

বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে অজ্ঞাত নহে। যে নাট্যগ্রন্থে শ্রব্যকাব্যোচিত বর্ণনাদির আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালায় কোথাও কোথাও তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে দৃশ্যকাব্য। অবশ্য এই নাম সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'অভিমন্যুবধ'কে দৃশ্যকাব্য আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' প্রভৃতি এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থকে তিনি নাটক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যে-অর্থে দৃশ্যকাব্য শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কোন কোন স্থলে অভিনয়কাব্য এই শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে নাট্যকাব্য শব্দটিরই সমধিক প্রচার।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রূপক শব্দের অর্থ শুধু নাট্যগ্রন্থ নহে। যে গ্রন্থে রূপক বা allegory-র আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—বাঙ্গালায় তাহারই নাম রূপক। সংস্কৃতে রূপক, উপরূপক এই দুইভাগে নাট্য-সাহিত্যকে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত নাটকের উৎপত্তিবিষয়ক গ্রন্থ 'নাট্যসম্ভবের' নাম উপরূপক দেওয়া হইয়াছে। এই নামকরণের হেতু অজ্ঞাত।

বাঙ্গালায় নাটিকা শব্দ ক্ষুদ্র নাটক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা নাটিকার রস ও অঙ্কাদি বিষয়ে তেমন কোনও বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রহসন বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রায় অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রহসনের অঙ্ক-সংখ্যা এক। বাঙ্গালায় কিন্তু প্রহসনের একাধিক অঙ্কও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত তিন অঙ্কের প্রহসন 'চক্ষুদান'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা কোন প্রকার নাট্যভেদেই সংস্কৃতের ন্যায় অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই। সংস্কৃত নাটকের সাধারণ নিয়মানুসারে অঙ্ক-সংখ্যা পাঁচ হইতে দশ।* বাঙ্গালায় কিন্তু এরূপ কোনও নিয়ম নাই। বাঙ্গালায় নাটকের অঙ্ক-সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ, কিন্তু ইহার বেশী বা কম সংখ্যাও অনেক সময় দেখা যায়। হাস্যরসবহুল নাট্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় কেবল প্রহসন এই সংজ্ঞা দ্বারাই যে নির্দ্দিষ্ট হয় এমন নহে। এই অর্থে বহু সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—হাসক, পঞ্চরং বা পঞ্চরঙ্গ, রঙ্গনাট্য, নাট্যরঙ্গ, কৌতুকনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য প্রভৃতি।

অমৃতলাল বসু তাঁহার 'অবতার'-এর আখ্যা দিয়াছিলেন—'প্র-পরা-অপ-সং-হসন'; প্র-হসন এই ক্ষুদ্র নামে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

নাট্যরাসকের প্রকৃত স্বরূপবিষয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত সাহিত্যদর্পণের মতে—নাট্যরাসক একাঙ্ক, বহুতাললয়-বিশিষ্ট, উদাত্তনায়ক ও পীঠমর্দ্দ উপনায়কযুক্ত, শৃঙ্গার-রসান্বিত, হাস্যরসবহুল ও রাসকসজ্জিকা নাম্নী নায়িকা-যুক্ত।

আর নাট্যদর্পণকারের মতে যে-গ্রন্থে রমণীগণ সংগ্রহে নৃত্য দ্বারা বসন্তকালে নরপতির কার্য্যাবলী প্রকাশ করে তাহারই নাম নাট্যরাসক।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার 'পতিব্রতা' নাট্যগীতির ভূমিকায় নাট্যরাসকের এক অতি স্পষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'নাট্যরাসক বা নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আদ্যন্ত স্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময় অভিনেয় গ্রন্থ।'

অমৃতলালের 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভঞ্জন' ও গিরিশচন্দ্রের 'অকাল বোধন' নাট্যরাসক নামে অভিহিত হইয়াছে।

কয়েকটি নূতন নাম বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আলঙ্কারিক নাটক (হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—যোগা, ১২৯৭ সাল)। প্রেমের মধ্য দিয়াও মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

নবনাটক নামে একটি ভেদও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ, রামনারায়ণ তর্করত্নের একখানি নাটকের নামই ধরা হয় নবনাটক। তবে, ইহা নাটকখানির নিজ সংজ্ঞা অথবা জাতিসংজ্ঞা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রে 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক

* অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃতেও একাঙ্ক, দ্ব্যঙ্ক, ত্র্যঙ্ক ও চতুরঙ্ক নাটক দেখিতে পাওয়া যায় (Keith—*Sanskrit Drama*, পৃ. ৩৪৫)।

নবনাটক।' এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নবনাটক কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সত্য তবে সমগ্র পঙ্‌ক্তিটির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে জাতিসংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। গ্রন্থের প্রস্তাবনার দুইটি স্থল হইতেও এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—'এই নবনাটুকে দেশে নব নাটকের অভাব নাই,' 'এ সমাজে একখানি নবনাটকের অভিনয় করি'। তাহা ছাড়া, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ১২৮২ সালে প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর' নামক নাটককেও আখ্যাপত্রে নবনাটক এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নবনাটক যে নাটকের এক স্বতন্ত্র প্রকারভেদের নাম ছিল এই নামকরণকে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে নবনাটকের লক্ষণ কি—ইহার বৈশিষ্ট্য কি, সে-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

পরলোকগত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'রসাবিষ্কার' নামক এক অভিনব নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন—'বৃন্দক'।* শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ প্রভৃতি পরস্পর নিরপেক্ষ এক-একটি বিষয় এই গ্রন্থের এক-একটি দৃশ্যে নাট্যাকারে চিত্রিত হইয়াছে। পরস্পরনিরপেক্ষ বহু বিষয়ের অবতারণাই বৃন্দকের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'যে নাট্যে বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে নানা জাতীয় কার্য্য এককালে প্রদর্শিত হয় এবং যার অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই তাহাকেই বৃন্দক বলে।' (পৃঃ ২)

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিত'-এর নাম দিয়াছেন 'দেবনাটক।' ঔপন্যাসিক নাটক, নাট্যোপন্যাস, নাট্যলীলা প্রভৃতি আরও নানা নাম নাটকের প্রকারভেদ সূচনার জন্য বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে।

বাহ্য নামকরণের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া আভ্যন্তরিক বিষয়বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাট্যে একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সূত্রপাতে যে-সমস্ত নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনা ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সকল স্থলে সংস্কৃত রীতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। হরচন্দ্র ঘোষ কৃত 'কৌরববিয়োগ' নাটকের নান্দী গদ্যে বিরচিত। কিন্তু গদ্যে নান্দী রচনার প্রথা সংস্কৃতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী কালে কোন কোন গ্রন্থে প্রস্তাবনা এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে তাহার সহিত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে সকলে এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা এই নাম ব্যবহার করেন নাই। অমৃতলাল বসু তাঁহার নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বরূপ, সূচনা, পূর্ব্বদৃশ্য প্রভৃতি নানারূপ নাম তাঁহার নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'মনীষা' নামক নাটকে এইরূপ স্থলে 'উদ্বোধন' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকে নটী ও সূত্রধারের যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বাঙ্গালা নাটকে তাহা হইতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা নাটকে অনেক সময় সূত্রধারকে প্রাচীন ধরণের যাত্রার অধিকারীর অনুরূপ কার্য্য করিতে হয়।* বর্ত্তমান যুগের প্রথম সময়ের বাঙ্গালা নাটকের বিবরণ দিতে গিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছিলেন—'অভিনয়ের প্রথমে নট-নটী (সূত্রধার নহে) নৃত্যগীতের দ্বারা দর্শকদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া পাত্রপরিচয় করাইয়া দেয়। অভিনয়ে নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়া কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহারা তাহারও বিবরণ প্রদান করে।'†

রামনারায়ণের নবনাটকে নটী ও সূত্রধার নাটকের অবসানে রঙ্গভূমিতে আসিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

* শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'গিরিশ-প্রতিভা' গ্রন্থে (পৃঃ ৫১২) ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থকে 'রসাবিষ্কারবোধক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত 'ডমরুক' নামক রূপকখানি (Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental Library, Madras—Vol. XXI, No. 12519) অনেকটা এইরূপ বলিয়া মনে হয়। ইহা দশ 'অলঙ্কারে' সম্পূর্ণ। সূত্রধার এখানে নির্ব্বাহক নামে পরিচিত।

* প্রাচীন আসামী নাটকেও সূত্রধারের এইরূপ কার্য্য ছিল। শঙ্করদেবের 'পারিজাত-হরণ' নাটকে সূত্রধার সকল সময় রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন।

† *Calcutta Review*, 1873, Vol. 57—পৃঃ ২৪৮।

ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'বৌমা'তে অভিনেত্রীগণ দ্বারা নাটকের উপসংহারে এইরূপ কার্য্য করান হইয়াছে।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা নাটকেও পরিচ্ছেদবিভাগ সাধারণতঃ 'অঙ্ক' এই প্রাচীন নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।* তবে কোথাও কোথাও অন্য নামও ব্যবহার করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ প্রণীত সংস্কৃত রত্নাবলীর অনুবাদ হইলেও রামনারায়ণ তাঁহার 'রত্নাবলী', নাটকে অঙ্কের পরিবর্ত্তে 'প্রকরণ' এই নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'মালতীমাধব-এ অঙ্কের নাম দিয়াছেন কাণ্ড। বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে বিরচিত বর্দ্ধমান হইতে শকাব্দা ১৭৯৬-তে প্রকাশিত 'কাপালিক' নাটকেও অঙ্কের নাম প্রকরণ।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের কোন উপবিভাগ করা হয় নাই। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৩) প্রভৃতি প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকেও এইরূপ উপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে ইউরোপীয় আদর্শে এই উপবিভাগ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হয়। এই উপবিভাগের নামকরণ সম্বন্ধে কিন্তু একটু অসুবিধা হইয়াছিল—তাহার কারণ সংস্কৃতে এ জাতীয় বিভাগ ও তৎসূচক শব্দের অভাব। তাই এক-এক জনে এক-এক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তারাচরণ সিকদার তাঁহার 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে (১৮৫২) 'সংযোগস্থল' এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের Merchant of Venice-এর বঙ্গানুবাদ 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'কৌরববিয়োগ' নাটকে হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন 'অঙ্গ'। তিনি তাঁহার 'রজতগিরি-নন্দিনী'তে কিন্তু বর্ত্তমান রীতি অনুসারে 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'সাবিত্রীসত্যবান্' ও 'মালতীমাধব' নাটকে ইহাকে 'অঙ্ক' আখ্যা দিয়াছেন। আর যাহা সংস্কৃত-সাহিত্যে চিরদিন অঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে তিনি 'কাণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন।১ কোন কোন স্থলে নাটকের শেষ দৃশ্য ক্রোড়াঙ্ক বা উজ্জ্বল দৃশ্য নামে অভিহিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে পটপরিবর্ত্তন এই নির্দ্দেশ দেখা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটকের তৃতীয়াঙ্কে এই উপবিভাগ অর্থে প্রস্তাব শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে (১৮৫৮ ?) ইহার নাম প্রস্তাবনা।২ বর্ত্তমানে এই বিভাগনির্দ্দেশের জন্য সাধারণতঃ দুইটি নাম ব্যবহৃত হয়—(১) দৃশ্য, (২) গর্ভাঙ্ক। দৃশ্য কথাটি ইংরেজী scene-এরই অনুবাদ। গর্ভাঙ্ক শব্দটি সংস্কৃত বটে—তবে ইহা সংস্কৃতে 'নাটকান্তর্গত নাটক' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃশ্য অর্থে নহে।৩

আশ্চর্য্যের বিষয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ও দৃশ্য অর্থে গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ('মালতীমাধব', 'রুক্মিণীহরণ' ও 'নবনাটক'-এর প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।৪

ভারতীয় নাট্যরহস্য (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪) নামক 'সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ' গ্রন্থে (পৃ. ৫) গ্রন্থকার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ও গর্ভাঙ্ক শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

* কৃষ্ণকমলের গ্রন্থে অঙ্কবিভাগ নাই। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (সন ১২৫৪ সাল—শকাব্দাঃ ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ সাল) নাটক নামে অভিহিত হইলেও অঙ্ক বা কোনরূপ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয় নাই।

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬, পাদটীকা।

২ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। এই সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশকের নিবেদন হইতে জানা যায় যে সাত বৎসর পূর্ব্বে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোক কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহাদেরই ব্যবহারার্থ ইহার একশত খণ্ড মাত্র মুদ্রিত করান। বোধ হয় এই গ্রন্থকেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (সুশীলকুমার দে—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ খণ্ড, পৃ. ৪১)।

৩ সংস্কৃতেও গর্ভাঙ্ক শব্দটি কেবল বিশ্বনাথই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'উত্তরচরিতে' সপ্তম অঙ্কে রাম প্রভৃতির সম্মুখে রামচরিতবিষয়ক যে নূতন নাটকের অভিনয় দেখান হইয়াছে টীকাকারদের মতে তাহার নাম গর্ভাঙ্ক নহে, অন্তর্নাট্য বা অন্তর্নাটিক।

৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন— '... গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের Act ও Sceneএর অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ হইলে এক-একটি গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও সংস্কৃত গর্ভাঙ্ক শব্দের ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য।' (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ ভাগ, পৃ. ৩৬)। এরূপ উক্তির ভিত্তি কি বুঝা গেল না।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের গ্রন্থাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা এই দুইটি শব্দের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য করিয়াছেন। নাটক নামে অভিহিত গ্রন্থেই সাধারণতঃ গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রহসনাদি স্থলে দৃশ্য শব্দটি দেখা যায়।*

আজকাল বাঙ্গালা নাটকে যবনিকাপতন এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি অঙ্কের শেষেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত নাটকে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার সিনের বদলে তখন একটি পর্দ্দামাত্র ব্যবহৃত হইত। পর্দ্দা ঠেলিয়া সত্বর প্রবেশ করিলে বলা হইত 'অপটীক্ষেপে প্রবেশ।' প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকে অনেক স্থলে বর্ত্তমান কালের যবনিকা পতনের অর্থে—পটক্ষেপ শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানাধিপতি আফ্‌তাব চন্দ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুরের আদেশানুসারে শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক প্রণীত শকাব্দা ১৭০৪ (?), বঙ্গাব্দ ১২৮৯ তে বর্দ্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত 'সতী-বিয়োগ' নাটকের প্রথমে আছে অপটীক্ষেপ। প্রতি অঙ্কের শেষে পটক্ষেপ এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত 'কাপালিক নাটকে'ও প্রতি প্রকরণের শেষে এই শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

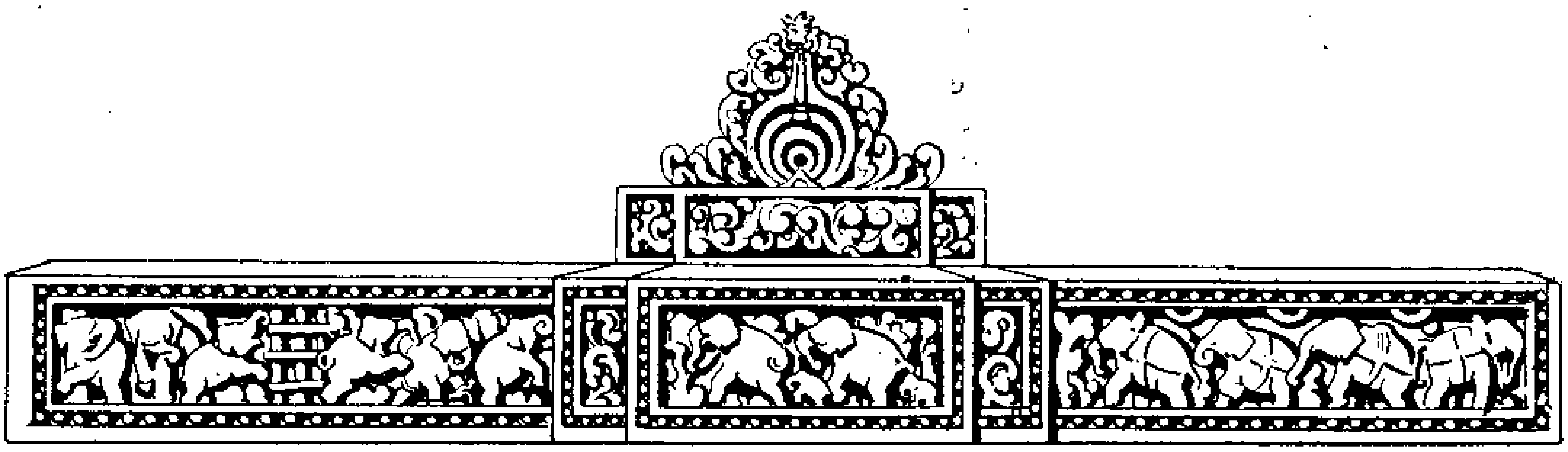
* এই নিয়মের ব্যতিক্রমের মধ্যে অমৃতলালের প্রহসন 'কৃপণের ধন' এবং গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক অনূদিত শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক উল্লেখযোগ্য। কৃপণের ধনে গর্ভাঙ্ক এবং ম্যাক্‌বেথে দৃশ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাক্যহারা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভেবেছিনু কেঁদে কেঁদে তোমারে ডাকিয়া
করিব চরণে তব আত্ম-নিবেদন;
ঢালিয়া প্রাণের দাহ তব পদতলে—
করিব গো চিরশান্ত অনন্ত বেদন।
আর্ত্তের ব্যাকুল-ডাকে হইয়া কাতর,
হে দয়াল, তুমি যবে হবে মূর্ত্তিমান;
ধন্য করি অভাগায় স্নেহ-দিঠি দিয়া
হেসে যবে দিবে মোরে বরাভয় দান।

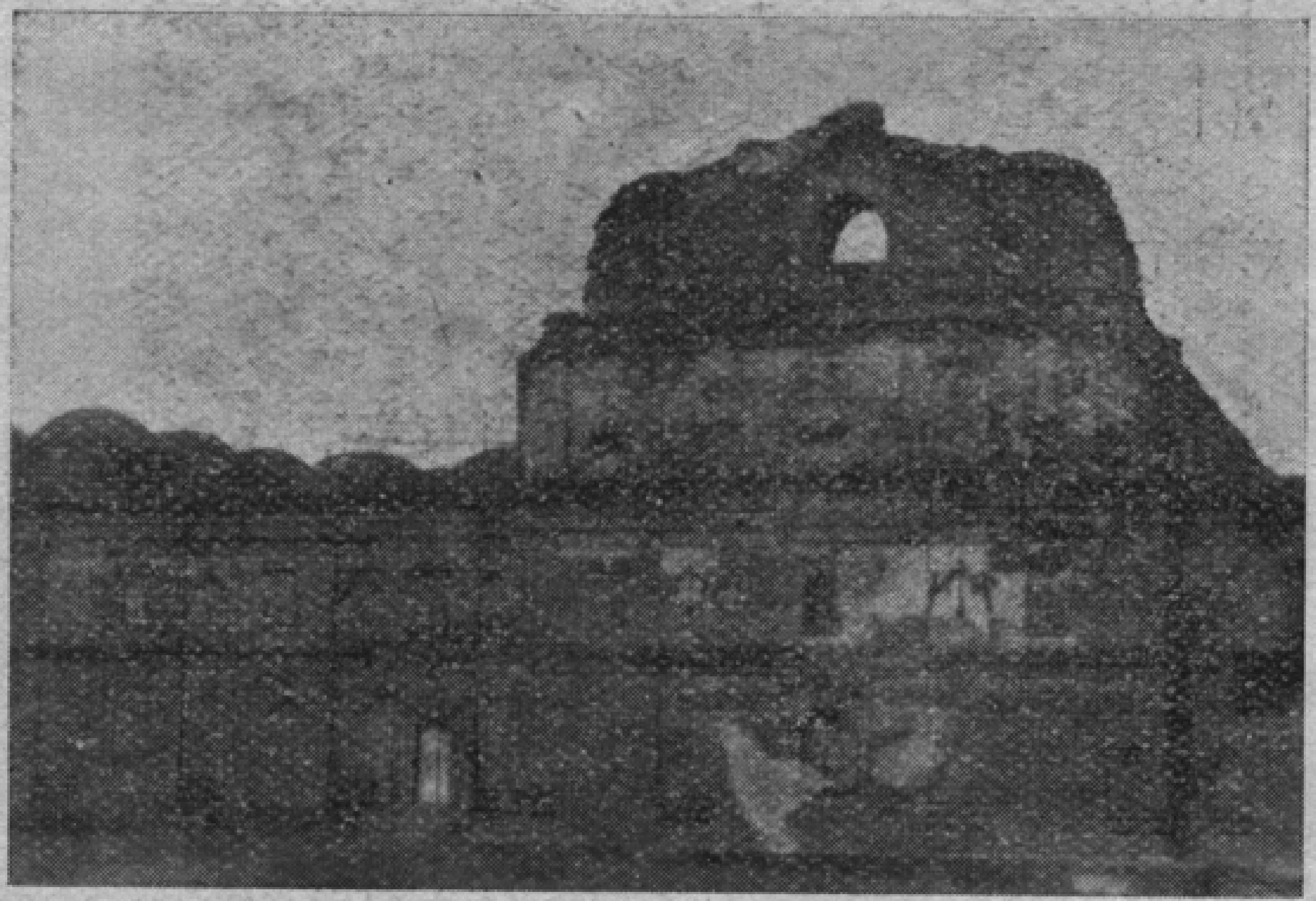
ভেবেছিনু চাহিব গো কাঁদিয়া তখন,
তোমার চরণ-তলে রত্ন-হেম-ধনে;
তুমি কিন্তু সত্য ক'রি মূর্ত্ত হ'লে যবে
রহিনু চাহিয়া শুধু এ মুগ্ধ-নয়নে।
ভুলে গেনু সব ভিক্ষা—ভুলিনু আপন,
জাগে শুধু স্বেদ-কম্প-লাজ-শিহরণ।



পাণ্ডুয়া

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার, বি-এ

পাণ্ডুয়া মালদহ জেলার অতি প্রাচীন নগর। নগরের অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও উক্ত দেশের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের অনুমান, এখানে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল, এবং আপামরসাধারণের ধারণা যে, ইহা পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের স্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম পাণ্ডুয়া হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, আদিনা ডাক বাংলার সম্মুখে যে বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, ইহাই তৎকালীন রাজন্যগণের দরবার-গৃহ ছিল; এবং এই স্থানেই অজ্ঞাতবাসের নির্দ্দিষ্টকাল অন্ত হইলে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

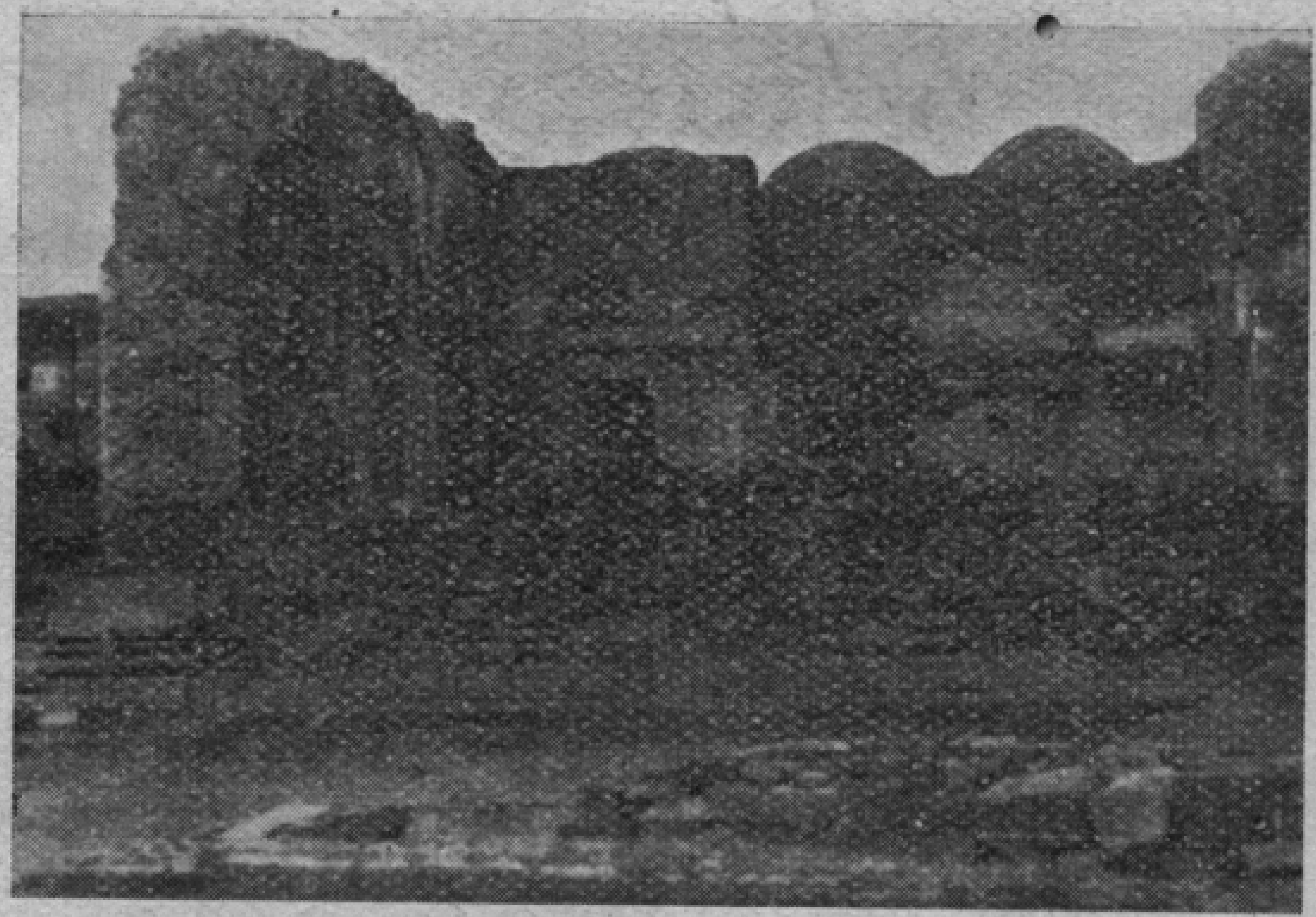


আদিনা মস্‌জিদ

বাহির হইতে একাংশের দৃশ্য; ইহাতে বুদ্ধদেব ও গণেশের মূর্ত্তি আছে

আদিনার বৃহৎ গম্বুজ-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ অট্টালিকা বিরাট-রাজের নাট্যশালা ছিল বলিয়া অনুমান। এই স্থানে বৃহন্নলা বিরাট-কন্যাগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন এবং এই স্থানেই ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ হইয়াছিল।

আদিনা ডাকবাংলার সম্মুখস্থ অট্টালিকা আদিনা মস্‌জিদ বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ হিঃ ৭৬৩ সালে শেকন্দর শাহ কর্ত্তৃক এই অট্টালিকা মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহা যে হিন্দু আমলের রাজ-সভা অথবা তদনুরূপ অন্য কোন দরবার-গৃহ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এখনও উক্ত অট্টালিকার তিন চারিটি দরজার উপর গণেশমূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অস্ত্রের আঘাতে ঐ সকল মূর্ত্তির অবয়ব বিকৃত হইলেও নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একটি প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও আছে। দেবমন্দিরের উপকরণাদি আনিয়া নূতনভাবে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইলে অপৌত্তলিক মুসলমানগণ কর্ত্তৃক কখনও প্রতি দ্বারদেশের উপরিভাগে এরূপ মূর্ত্তি খোদিত হইত না। এতদ্ব্যতীত যেরূপ মস্‌জিদ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই

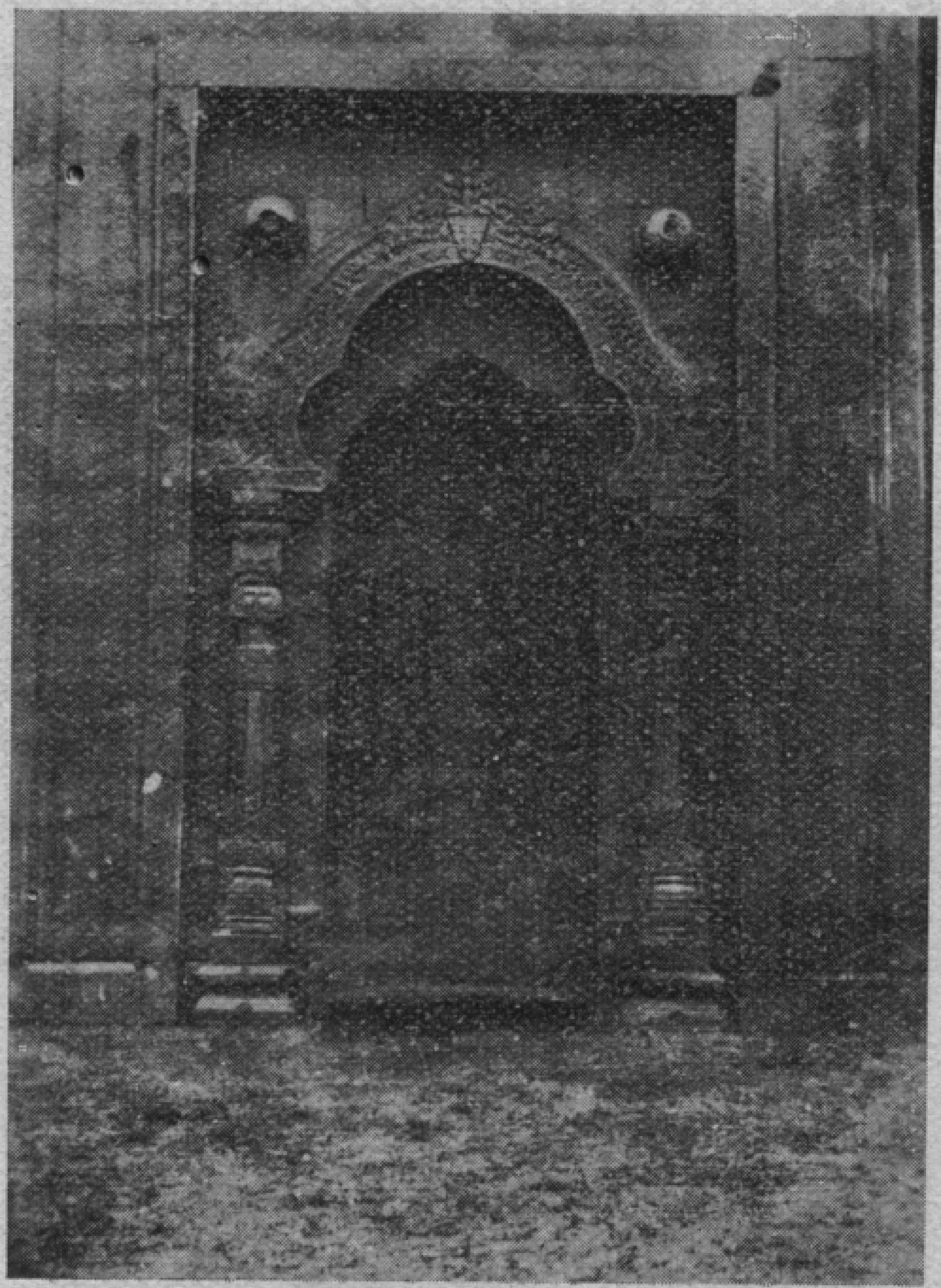


আদিনা মস্‌জিদ

ভিতর হইতে একাংশের দৃশ্য

তাহার সহিত ইহার আকৃতিগত যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। কোন বৃহৎ দরবার-গৃহকে মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত করিলে যেরূপ দেখিতে হয় ইহাও তদ্রূপ। এই অট্টালিকার দৈর্ঘ্য পাঁচ শত সাত ফিট, প্রস্থ দুই শত পঁচিশ ফিট এবং দেওয়ালের উচ্চতা এখনও প্রায় তেইশ ফিট হইবে। তন্মধ্যে প্রায় এগার ফিট কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত। পশ্চিম দেওয়ালে আরবী ভাষায় কোরাণের বচন লিখিত আছে। মধ্যস্থলে নয়টি গম্বুজবিশিষ্ট বৃহৎ কক্ষ, এই

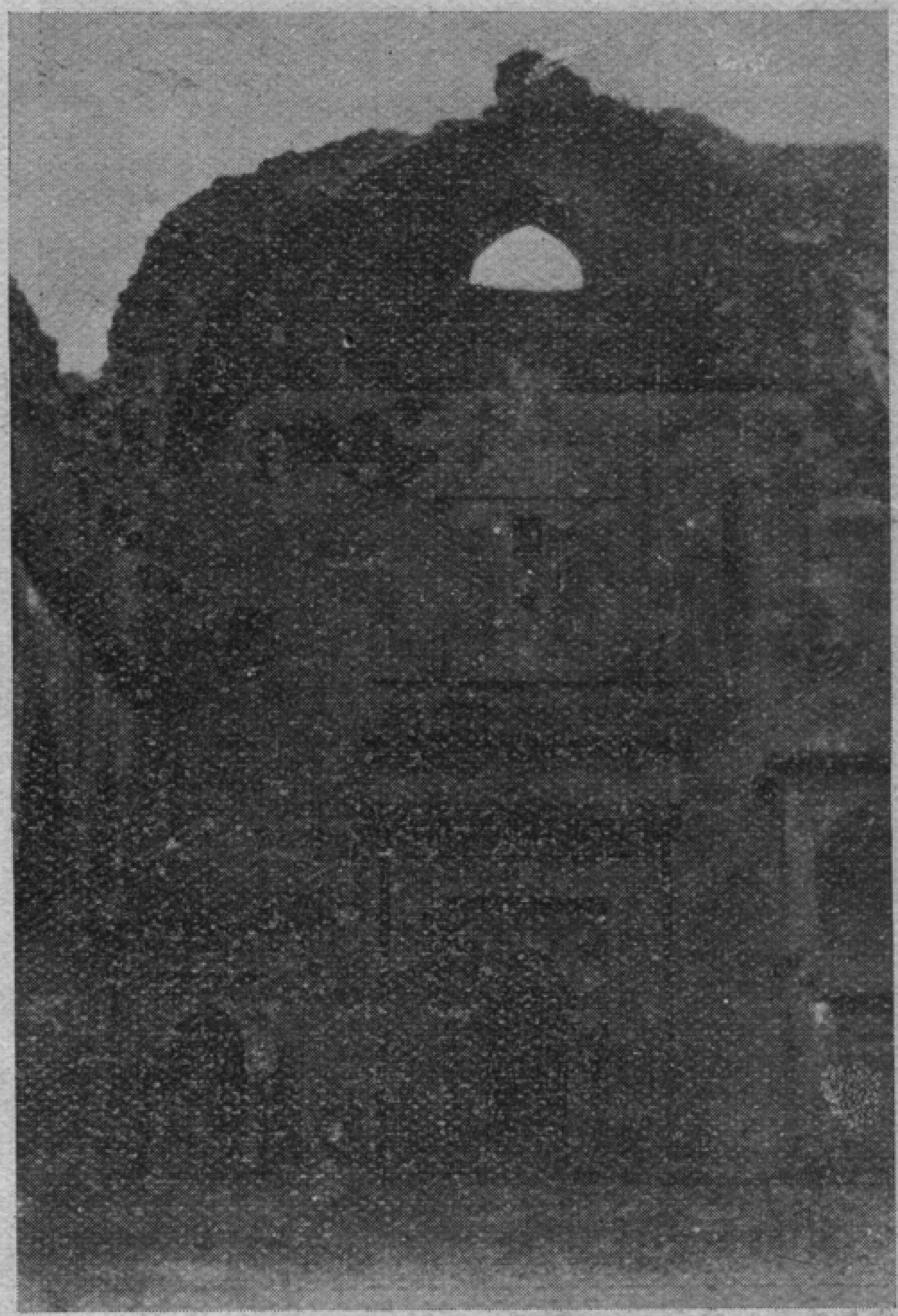
কক্ষেই বোধ হয় পূর্ব্বাস্য হইয়া উচ্চ বেদীর উপর রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশ্চাতে মসৃণ কৃষ্ণ-প্রস্তরের কক্ষ প্রাচীর—এমন মসৃণ যে তাহাতে মুখ দেখা চলে। তাহার উপর স্থানে স্থানে নানাপ্রকার ফুল, ফল, লতা পাঁতা খোদিত। সিংহাসনের উপরিভাগে প্রাচীরগাত্রে একটি গোলাকৃতি স্থান অস্ত্র দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া আছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে লতাপাতার কারুকার্য্য—যাহা কেবল স্বর্ণরৌপ্যেই সম্ভবে। সেই গোলাকৃতি অস্ত্র-বিধ্বস্ত স্থানের একখণ্ড মহার্ঘ মণির আলোকে সিংহাসন-কক্ষ আলোকিত হইত বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকে। মণি অপহৃত হইয়াছে বটে,কিন্তু শূন্য আধার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সিংহাসন-বেদীতে উঠিবার প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান এখনও বর্ত্তমান



রাজসিংহাসন

আছে। ইহাতে কেহ আরোহণ করে না এবং কেহ আরোহণ করিতে গেলেও স্থানীয় লোক পূর্ব্বস্মৃতির সম্মান-স্বরূপ বারণ করিয়া থাকে। দক্ষিণে বামে অমাত্য সভাসদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের বসিবার স্থান। সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপে সাধারণ লোক সহস্রে সহস্রে দাঁড়াইবার স্থান। এই সবই হিন্দুকীর্ত্তি। বিধিনির্ব্বন্ধে রূপান্তর ও নামান্তর হইয়াছে মাত্র। এখানে বর্ত্তমানে একটি কবর আছে। লোকে ইহাকে সেকন্দর শাহের সমাধি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে আইন দ্বারা সংরক্ষিত হইলেও পূর্ব্বে এই



মণি-অপহৃত শূন্য আধার সম্বলিত সিংহাসন-কক্ষ

অট্টালিকার পাথরে আদিনায় কত সমাধি কত গৃহের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সোনা মস্‌জিদের অনেক পাথর এই অট্টালিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যাহাকে বিরাটের নৃত্যশালা বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা একলক্ষী মস্‌জিদ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহাতে মস্‌জিদের কোন আকৃতি নাই। সোনা মস্‌জিদের এত নিকটে অন্য মস্‌জিদের কোন আবশ্যকতাও দেখা যায় না। ইহা বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ অট্টালিকা। গম্বুজের ব্যাস ৪৮—৬″; এবং দেওয়াল ১৩ ফিট পুরু। চারিদিকে চারিটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার উপরে গণেশমূর্ত্তি ধ্বংসাবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে। আমার মনে হয় ইহা রাজা গণেশের রাজত্বকালে নগরের

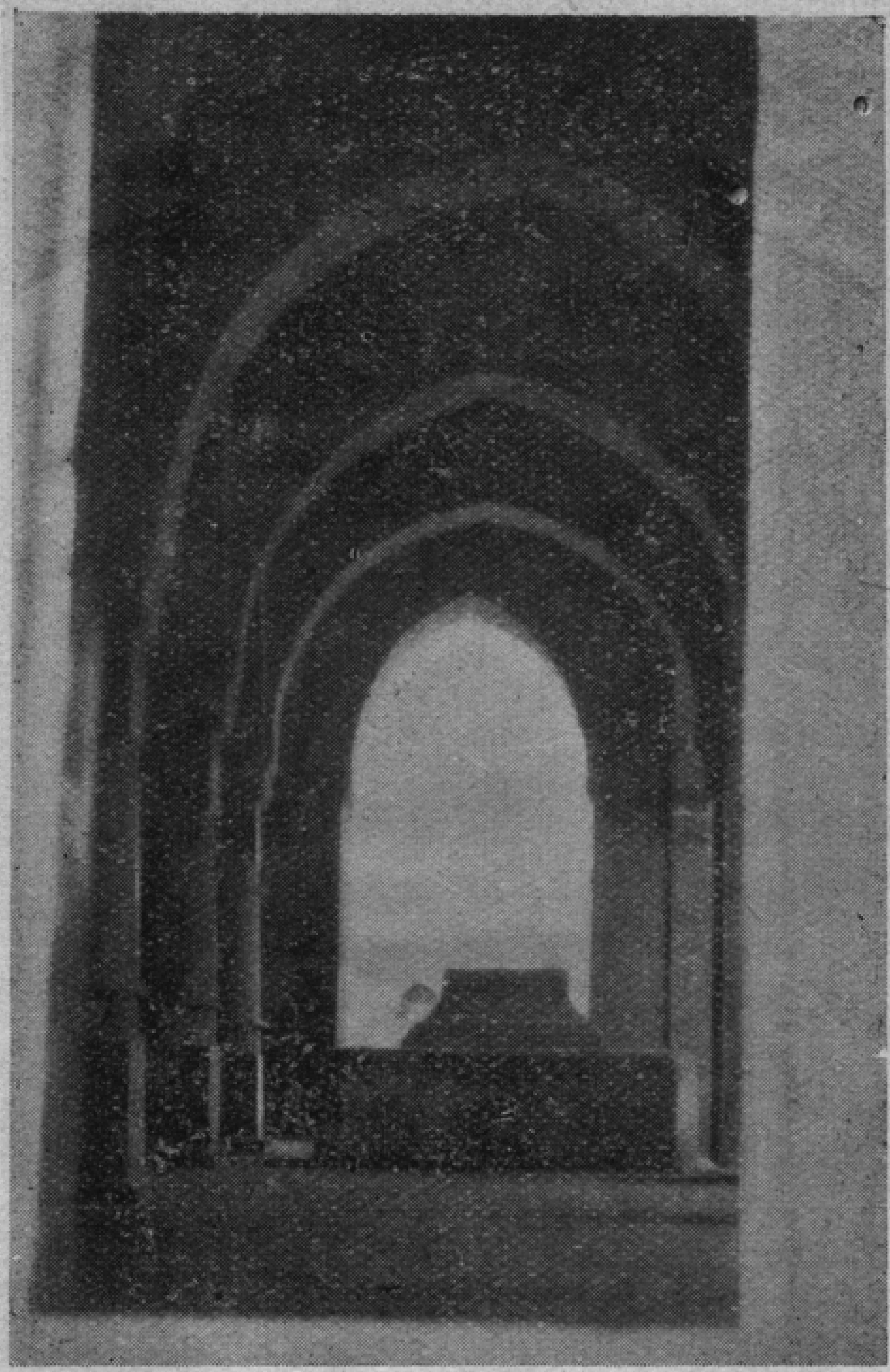
নাট্যশালা ছিল। চারিদিকে দরজাযুক্ত চতুষ্কোণ আকৃতি বিশিষ্ট এই গৃহের গঠন-বৈচিত্র্যে ইহা নাট্যশালা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। বর্ত্তমানে ইহার ভিতরে তিনটি সমাধি দৃষ্ট হয়। এইগুলি অনেকে



সিংহাসন-বেদীতে উঠিবার প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান

যদু জালালউদ্দিন, তাঁহার পত্নী এবং পুত্রের সমাধি বলিয়া অনুমান করেন।

পাণ্ডুয়া যে এক প্রাচীন নগর এবং গৌড় হইতে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ অনুমান করেন (জেনারেল কনিংহাম) চীন পর্য্যটক হিউএনসাং লিখিত পৌণ্ড্রনগর বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে অবস্থিত ছিল; কেহ-বা বর্দ্ধনকোটকে পৌণ্ড্রনগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উভয়স্থানেই অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে কোন-না-কোন রাজবাড়ি ছিল। মহাস্থান গড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে বর্ত্তমানে একটি ক্ষুদ্র তোরণ এবং একটি বৃহৎ কূপ আছে; আর সমস্তই ধ্বংস হইয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মহাস্থান গড়কে দুর্গ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং দেখিলে ইহা দুর্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহার অনতিদূরে চাঁদ সওদাগরের বাড়ি এবং লক্ষীন্দরের বাসরঘরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। একটি বৃহৎ উচ্চ চতুষ্কোণ ঢিপির ভিতর লক্ষীন্দরের বাসরগৃহ ছিল বলিয়া স্থানীয় লোক অনুমান করিয়া থাকে। স্থানটি সর্পসঙ্কুল। যা হউক মহাস্থান গড় বা বর্দ্ধনকোট যে পৌণ্ড্রনগর হইতে পারে না, তাহা তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান হইতে প্রমাণ হয়। এতদ্ব্যতীত চীনপর্য্যটক হিউএনসাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে পৌণ্ড্রনগরের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তদ্দ্বারাও পৌণ্ড্রনগরের স্থান-নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা হইতে বুঝা যায় পৌণ্ড্রনগর হইতে পূর্ব্বদিকে কামরূপ রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য—উভয় রাজ্যই সমান দূরে



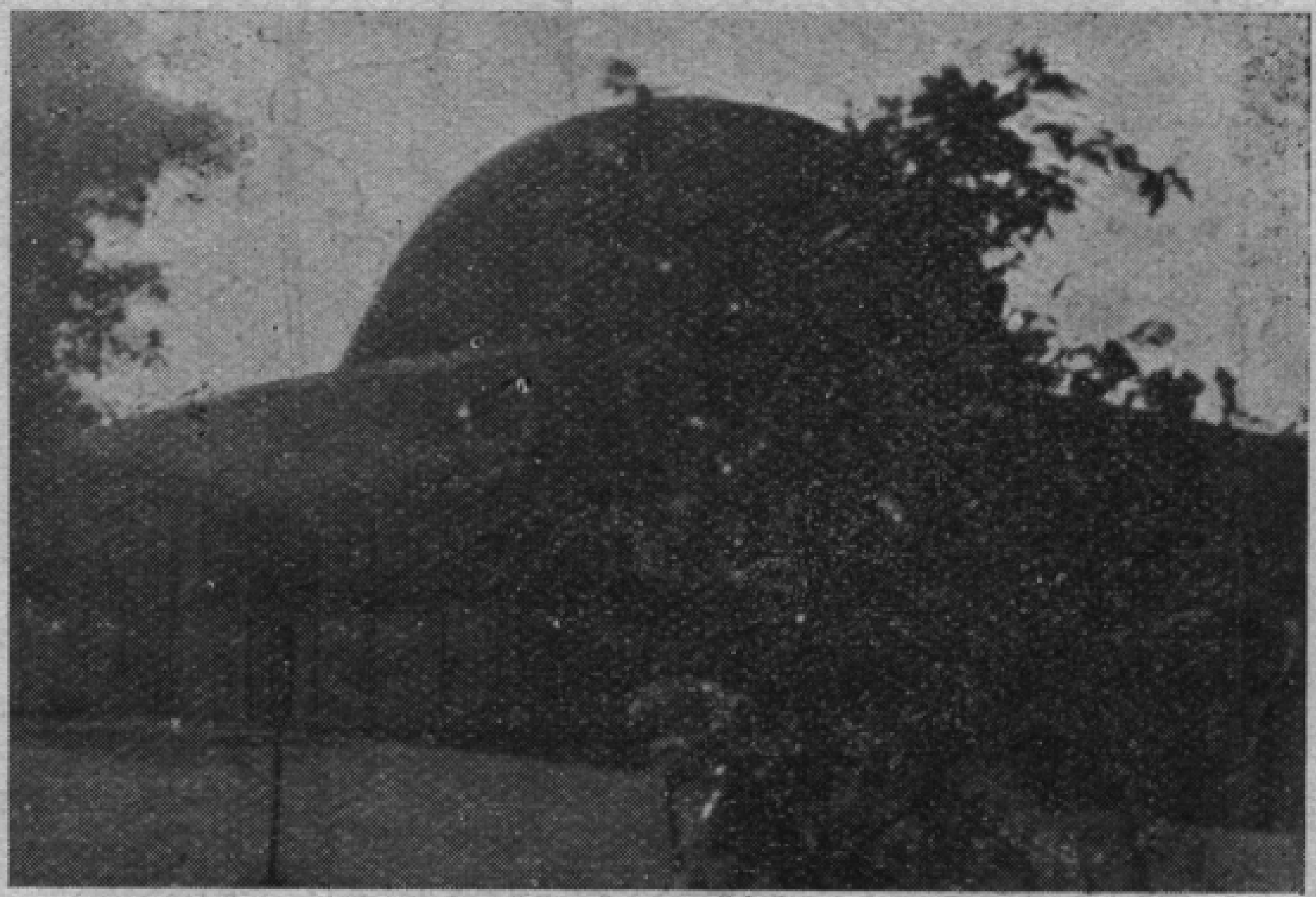
সেকেন্দর শাহের সমাধি

অবস্থিত:—তাহার পরিমাণ ৯০০ লি। মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের অনতিদূরে রাঙামাটি কর্ণসুবর্ণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পৌণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় করতোয়া নদীর অপর তীরে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত। তাহা হইলে বৌদ্ধ পরিব্রাজকের উল্লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত

অনুসারে মহাস্থান গড় বা বর্দ্ধনকোট, পৌণ্ড্রনগর হইতে পারে না। মহাস্থান গড় বা বর্দ্ধনকোট, কামরূপ রাজ্য, কর্ণসুবর্ণ ও পাণ্ডুয়ার প্রাকৃতিক অবস্থান এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজকের জীবনকাহিনী ও ভ্রমণবৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া মহানন্দার তীরেই পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানীর অবস্থান সম্ভবপর বলিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সুচিন্তিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন।* ইহা ছাড়া পাণ্ডুয়াকে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিলে ভ্রমণকারী লিখিত পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানীর অনেক দৃশ্য এখনও পাওয়া যায়। হিউএনসাং-এর বৃত্তান্ত অনুসারে ঃ—

"পুণ্ড্ররাজ্যের বেষ্টন ৪০০০ লি, রাজধানীর বেষ্টন ৩০ লি। রাজ্যটি ঘনবসতিসম্পন্ন। রাজধানীতে জলাশয়, রাজকার্য্যালয় ও পুষ্পোদ্যান সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। রাজ্যের ভূমি সমতল, বালুকা ও কঙ্করময়, রাজধানীতে ১০০ হিন্দু দেবালয় আছে। রাজধানীর ২০ লি অন্তরে রাশিভা সঙ্ঘারাম, তাহার অদূরে অশোকস্তুপ।"

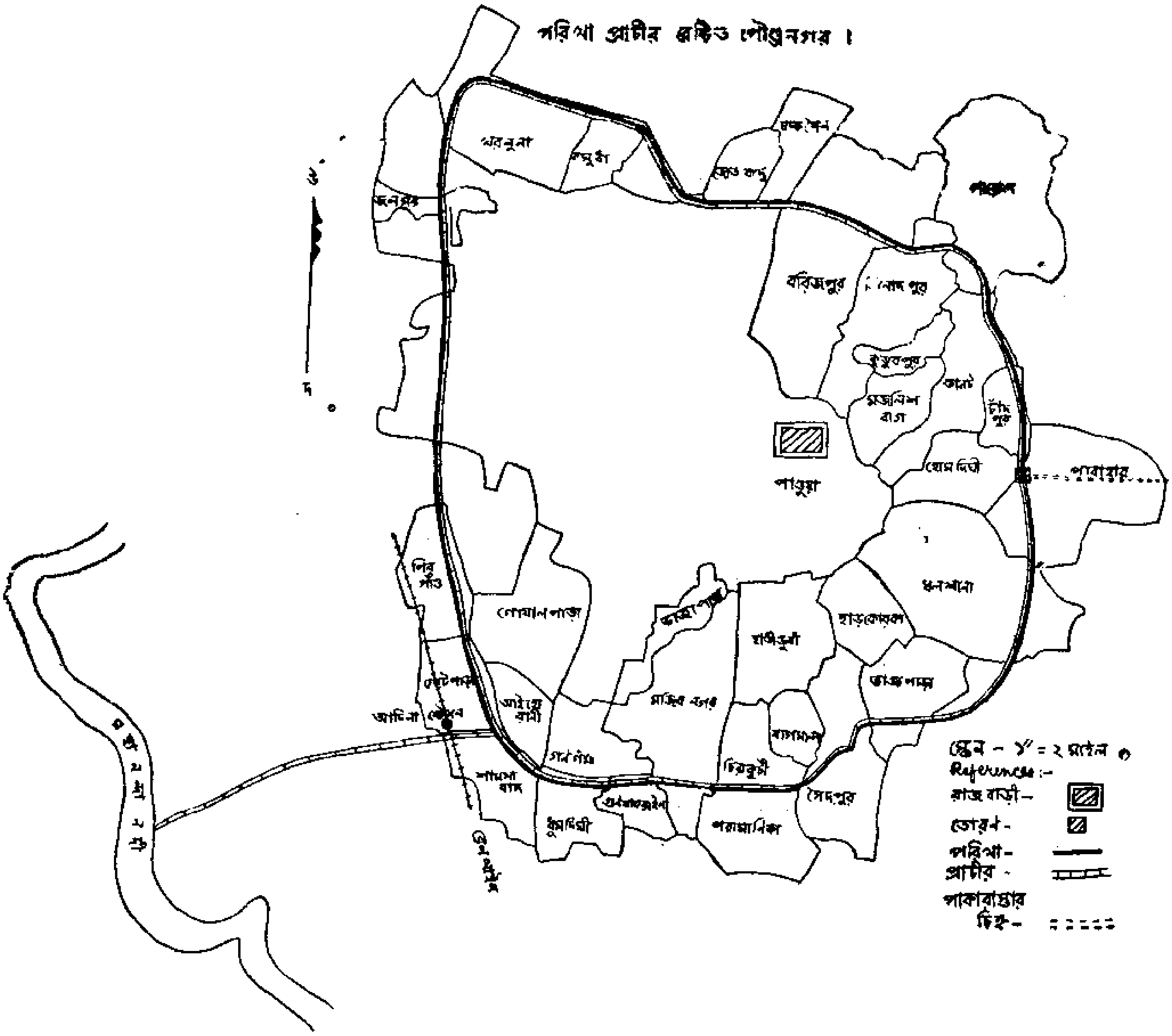
মহানন্দাতীরস্থ ধনামনার টিলাকে অশোক স্তূপ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন; তাহা ছাড়া অধুনা পাণ্ডুয়ার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত একটি বৃহৎ বাঁধ পাওয়া গিয়াছে। ইহা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য গড়, তৎপর উচ্চ প্রাচীর। গড় এখন ভরাট হইয়া আবাদোপযোগী হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহা দেখিলেই একটি খালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বাঁধ বরিজপুর প্রভৃতি গ্রাম এখনও অত্যুচ্চ কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা কতকটা সমতল করিয়া লোকে রবিশস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। দুই একটি স্থানে সাঁওতালের বাসস্থানও হইয়াছে। পরিখাটি ভরাট হইলেও এই বাঁধের উপর দাঁড়াইলে স্পষ্ট চেনা যায়। ঘুরিতে ঘুরিতে পারাহার গ্রামের একস্থানে এই পরিখা সমতল এবং প্রাচীরটিও ভগ্ন অবস্থায় দেখিলাম। অনুসন্ধিৎসুচক্ষে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহাই নগরের একমাত্র প্রবেশ দ্বার ছিল বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ উচ্চ ইষ্টক-স্তূপ সে ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিল। এই তোরণ হইতে পূর্ব্ব দিকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি ইষ্টকনির্ম্মিত রাজবর্ত্ম বরাবর চলিয়া গিয়াছে।



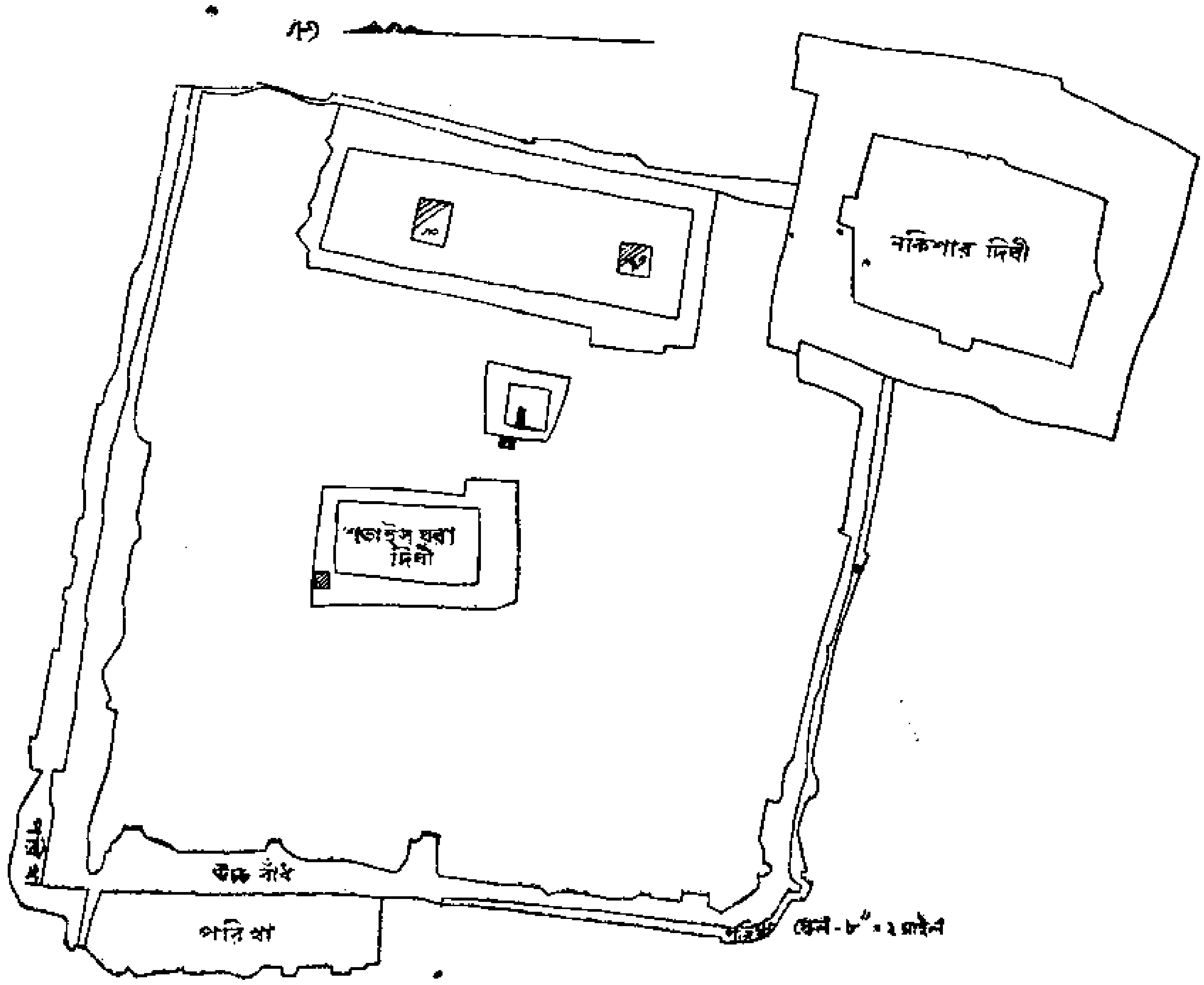
একলক্ষী মসজিদ

পারাহার, ছুটীকান্দর, ছয়ঘাটী এবং তাঁতিবাড়ি প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে উক্ত পাকা রাস্তার চিহ্ন পাওয়া যায়। এই ফটকের সোজাসুজি পশ্চিমে নগরের প্রাচীরের প্রায় মধ্যস্থলে বৃহৎ পরিখা এবং অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। রাজপ্রাসাদ হইতে নগর প্রাচীর উত্তরে দুই মাইল, দক্ষিণে তিন মাইল, পূর্ব্বে দুই মাইল এবং পশ্চিমে তিন মাইল দূর হইবে। রাজবাড়ির চতুষ্পার্শ্বের পরিখা এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরিখার পর উচ্চ বাঁধ তার পর সমতলক্ষেত্র তৎপরে উচ্চ সমতল ক্ষেত্রের উপর রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত তিন-চার হাত প্রশস্ত প্রাচীর। তাহা স্থানে স্থানে ভগ্নাবস্থায় আছে এবং স্থানে স্থানে ভিত্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালচক্রে এই স্থান এখন ক্রমে সাঁওতালের বসতি হইতে চলিয়াছে। রাজবাড়িতে তিনটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, দুইটি প্রাসাদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে, অপরটি পরিখা প্রাচীরসংলগ্ন। শেষোক্ত দীর্ঘিকা 'নকিশার দীঘি' বলিয়া পরিচিত। উত্তর দক্ষিণের দৈর্ঘ্য অনুসারে এই দীর্ঘিকাগুলি হিন্দু কর্ত্তৃক খনিত

* "ভারতবর্ষ" ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।



বলিয়াই মনে হয়; পরবর্ত্তী মুসলমান রাজত্বকালে ইহাদের নামান্তর হইয়া থাকিবে। এই দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে সোপানাবলীশোভিত বাঁধা ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা বোধ হয় রাজপরিবারের পুরুষদিগের ব্যবহারের জন্য ছিল। বৃহৎ দীর্ঘিকা, উচ্চ পাড়—তদুপরি বহুতর বৃক্ষশ্রেণী পরস্পর শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সম্বদ্ধ হইয়া পাহাড়ের ন্যায় দেখাইতেছিল। স্বচ্ছ নীলজলে এ সকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আশেপাশে জনমানবের সাড়া নাই। এ অবস্থায় দীর্ঘিকার ভগ্ন ঘাটে দাঁড়াইয়া ভীতির সঞ্চার হইতেছিল, তাই অন্যান্য পাড় দেখিবার সুযোগ হয় নাই। এই দীঘির মোট পরিমাণ ৬২ একর ৫০ ডেঃ অর্থাৎ ১৮৯ বিঘা এক কাঠা। পরিখাবেষ্টিত রাজবাড়ি সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৭ একর ৫০ ডেঃ অর্থাৎ ৯০০ বিঘা ১ কাঠা জমির উপর অবস্থিত। ইহার মধ্যে একটি দীঘি অতি বৃহৎ। দীঘির মধ্যে দ্বীপের ন্যায় দুইটি স্থলভাগ আছে—তাহাতে ইষ্টক-স্তূপ ও জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নাই। রাজবাড়ির নক্সায় স্থান দুইটি দীর্ঘিকার ভিতর দেখান হইয়াছে। এই সকল স্থানে হয় ত রাজপ্রমোদভবন অথবা নির্জ্জন আরাধনা গৃহ ছিল। সাতাইশ ঘরা নামে পরিচিত দীঘি অন্দরমহলের মহিলাদিগের ব্যবহারের পুষ্করিণী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই দীঘির ধারে অন্তঃপুরিকাদিগের স্নানের জন্য সাতাইশটি স্নানাগার ছিল। তাহা হইতে ইহার সাতাইশ ঘরা নাম হইয়াছে। উত্তর পাড়ে এখনও কয়েকটি স্নানাগার বর্ত্তমান। পাড়ের উপরে



রাজ বাড়ীর জরিপী নক্সা।

যাতায়াতের একটি দরজা আছে, তাহা দিয়া স্নানাগারে এখনও যাতায়াত করা যায়। দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি দালান আছে। তাহার পরিধি চব্বিশ ফিট। প্রত্যেক কোণের পাশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। দেওয়ালে মৃত্তিকানির্ম্মিত নল ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। রাজবাড়ির নক্সায় সাতাইশ ঘরা দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে এই স্নানাগারের স্থান দেখান হইয়াছে। অন্দরমহলে আর একটি পুকুরের পশ্চিম পাড়েও কয়েকটি কক্ষবেষ্টিত দালান আছে এবং তৎসঙ্গে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি বৃহৎ কূপ। ইহার দেওয়ালেও মৃৎ পাইপ—তদ্দ্বারা ইহাও অন্তঃপুরচারিণীদিগের স্নানাগার বলিয়া ধারণা করা যায়।

পাণ্ডুয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে পুষ্করিণী অসংখ্য। প্রত্যেকটিতেই এক, দুই বা ততোধিক বাঁধা ঘাট। কোথাও ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজবর্ত্ম, স্থানে স্থানে ভগ্ন অট্টালিকা, ইষ্টক স্তূপ, ভগ্ন প্রাচীর এবং দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক স্থানে একটি জঙ্গলাকীর্ণ মন্দিরের মধ্যে ভগ্ন শিবলিঙ্গও দেখিয়াছি। ইহা যে কোনও সময়ে অত্যন্ত সুশোভিত, সমৃদ্ধিশালিনী ও জনাকীর্ণ নগরী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার যে মত,চিন্তাপ্রণালী দিয়ে তার সঙ্গে তোমার মিল হয়ত হবে না, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে মিল হবে তোমার হৃদয় যে-গন্ধে আনন্দ পেল, হয়ত ঠিক জানল না সে-গন্ধ রজনীগন্ধার বন থেকে আসচে, কিন্তু আনন্দটি সত্য। যদি ঐখানেই শেষ হ'ত তাহ'লে কথা ছিল না, আনন্দ যদি একান্ত নিজের মধ্যে এসে অবসান হ'ত তাহ'লে চুকে যেত। ওকে যে আবার কোনো-না-কোনো একটা আকারে ফিরিয়ে দিতে হয়, পূজায়, সেবায়। কিন্তু ঠিকানা ভুল হ'লে আপশোষের কথা। আনন্দ যখন পাই তখন সেটা কোথা থেকে পাই স্পষ্ট নাই-বা জানলুম, পেলেই হ'ল। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সেবা যখন দিই তখন কোথায় গেল না জানলে লোকসান। পোষ্টবাক্সে চিঠি ফেলে দিলুম সেটা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছল এটা কি সেই রকম ব্যাপার? ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌঁছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পাবে যে-মানুষ জলের অভাবে তৃষিত তাপিত? তা যদি না হ'ল তাহ'লে এ সেবা কোন্ কাজে লাগল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে? নিজের ছেলেকে যখন কাপড় পরাই তখন তার মধ্যে দুটো কথা থাকে, এক হচ্চে সে কাপড় যথার্থই ছেলের প্রয়োজনের কাপড়, দুই হচ্চে ছেলের প্রতি আমার স্নেহ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে নিজেকে সার্থক করে। খেলার সামগ্রীকে যখন কাপড় পরাই তখন কেবলমাত্র আমারই তৃপ্তি হ'ল, বাকিটুকু ব্যর্থ।

তুমি লিখেচ ঠাকুরের সেবা এবং জীবের সেবা দুইই আমাদের পূজার অঙ্গ, কিন্তু দুর্ম্মতিবশত যে-সেবাটা জগতের দুঃখ-নিবারণের জন্য সত্যকার কাজে লাগে বর্ত্তমানকালে সেটা আমরা উপেক্ষা করেচি। ভাল ক'রে ভেবে দেখো কালক্রমে এ মোহ এল কেন? তার কারণ, এই বিশ্বাস মনে মনে আছে যে, ঠাকুরকে অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে একটা সত্যকার কাজ করা হ'ল। তা ছাড়া ঠাকুরের স্থান সর্ব্বাগ্রে, জীবের স্থান তার পরে, অতএব বড় কর্ত্তব্যটাকে সস্তায় সেরে বড় পুণ্যটাকে লাভ করা হয়ে গেলে বাকিটা বাদ দিতে ভয় হয় না, দুঃখ হয় না—বিশেষত বাকিটাই যেখানে দুষ্কর। জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ, লোকে তাই করে,—সে ভক্তি অধিকাংশ স্থলে অস্থানে প'ড়ে নিষ্ফল হয়; যথার্থ ব্রহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হ'ন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা সত্য ফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয় এই জন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েচে।

আমাদের দেশে মানুষ সর্ব্বত্রই বঞ্চিত, উপেক্ষিত, মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে থাকে আচারে নেই; তার প্রধান কারণ ধর্ম্মসাধনায় মানুষ গৌণ। সস্তায় পাপ-মোচনের ও পুণ্যফল পাবার হাজার হাজার কৃত্রিম উপায় যে-দেশের পঞ্জিকায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধানে অজস্র মেলে সে-দেশে বীর্য্যসাধ্য সত্যসাধ্য ত্যাগসাধ্য বুদ্ধিসাধ্য ধর্ম্মসাধনা বিকৃত না হয়ে থাকতেই পারে না। যেটা অন্তরের জিনিষ, যেটা চৈতন্যের জিনিষ সেটাকে জড়ের অনুগত ক'রে যদি নিয়ত তার অসম্মান করা হয় তবে আমাদের অন্তর-প্রকৃতি জড়ত্বে ভারগ্রস্ত হ'তে বাধ্য।

দেবপ্রতিমার কাছে পাঁঠা বলিদানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যখন করি তখন ব'লে থাকি পাঁঠাটা প্রতীকমাত্র, আসল জিনিষটা হচ্চে মনের পাপ, কিন্তু ব্যাখ্যাটা মুখের কথা, কর্ম্মটাই বাস্তব, তাই পাপটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায় বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে। মাঝের থেকে হতভাগা প্রতীকটা পায় দুঃখ। প্রতীকেরই

উপর দিয়েই যত ফাঁকি চালিয়ে দিয়ে মানুষ আপন বুদ্ধিকে আপন মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে; আপন সাধনাকে দুর্ব্বল ও লঘু ক'রে দেয়। পুনশ্চ ব্যাখ্যা করবার সময় বলা হয়, যারা অজ্ঞান তাদের পক্ষেই এই বিধি। কিন্তু যারা অজ্ঞান তাদের অজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিয়ে চিরস্থায়ী করার দ্বারাই মুক্তির পন্থা সুগম করা হয় এ কথা মানতে পারিনে। চিরজীবন পাঁঠা বলি দিয়ে এবং বলির সংখ্যা ভীষণভাবে বাড়িয়ে তোলার রক্তসিক্ত পথ দিয়ে কয়জন পূজক অবশেষে বাহিরের ঐ পাঁঠা থেকে অন্তরের পাপের ঠিকানায় পৌঁছেচে?

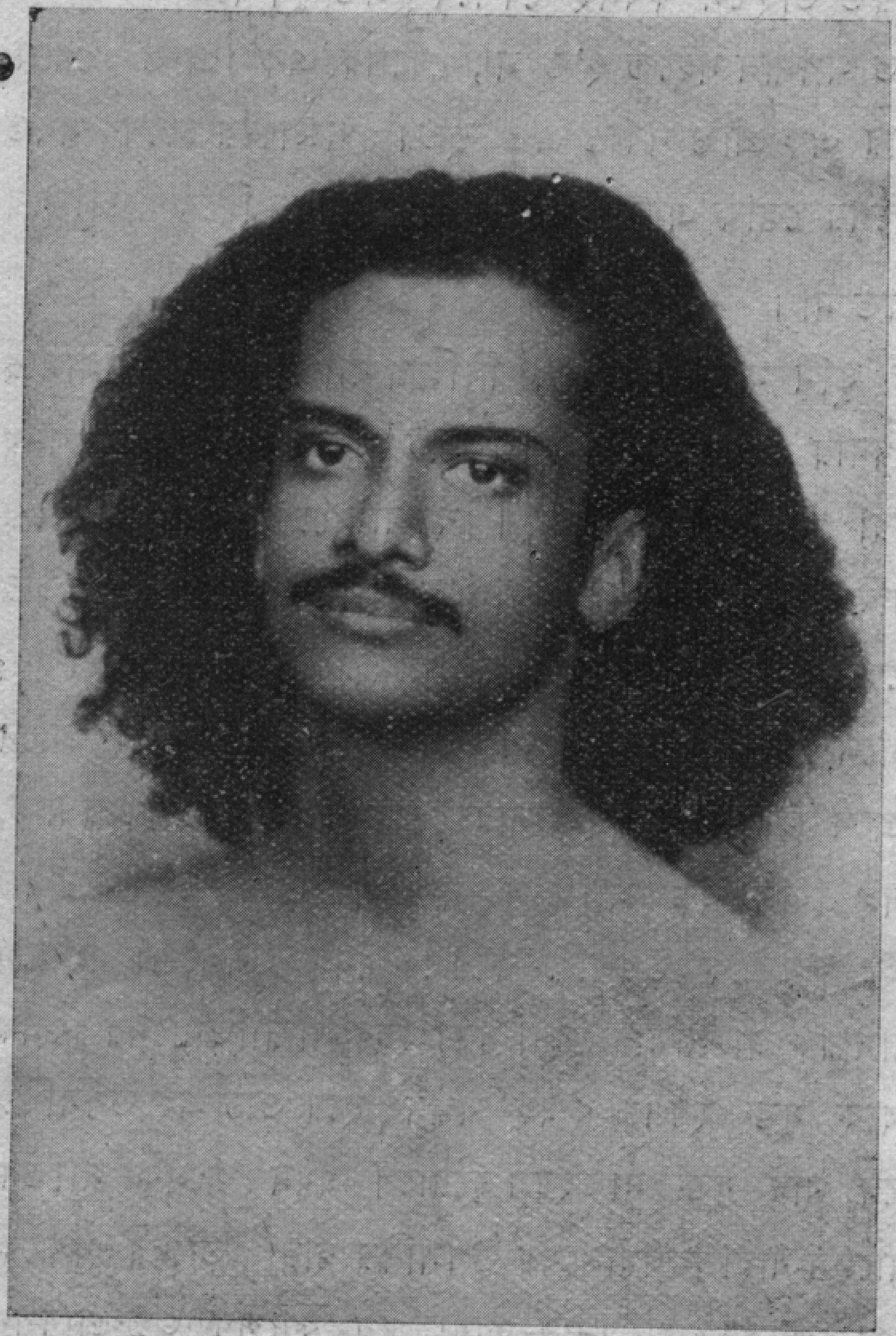
যারা জ্ঞানী তাদের ত কোনো ভাবনাই নেই, তারা সকল ক্ষেত্রেই স্বতই ঠিক পথ বেয়ে চলে, যারা অজ্ঞান তাদের মুগ্ধ ক'রে রাখলে মোহের অন্ত তারা পাবে না। এই কারণেই এদেশে বহু যুগ থেকেই পুণ্যলুব্ধ মানুষ পাণ্ডার পায়ে মোহর ঢেলে আসচে, দেশের লোকের গভীর দুঃখ যেখানে সেখানকার জন্যে, না মন, না ধন, কিছুই রইল বাকি। এ সম্বন্ধে দোষ দেবার বেলা আমরা আর এক প্রতীক পাকড়াও করেচি, সে হচ্চে ঐ বিদেশী। সন্দেহ নেই বিদেশীর হাত দিয়ে মার খেয়ে থাকি, কিন্তু সেই বিদেশীদের দিয়ে আমাদের আঘাত করাচ্চে কে? আমাদের ভিতরকার সেই পাপ সেই কলি যে চিরদিন দেশের মানুষকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত ক'রে এসেচে—তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার মত কৌতূহলও যার নেই। যে-মারের জমি বহুকাল থেকে আমরা নিজের হাতে তৈরি করেচি সেইখানেই আজ বহুকাল ধরে বিদেশী মারের ফসল বুনে আসচে। আমাদের ধর্ম্মকে যদি সত্য করতে পারতুম, পূজার মধ্যে যথার্থ বীর্য্য, সেবার মধ্যে যথার্থ ত্যাগ থাকত, আমাদের সাধনা যদি যথার্থ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ আত্মীয়তার সঙ্গে স্বীকার করতে পারত তাহ'লে কখনই দেশকে এত যুগ ধরে এত দৈন্য এত অপমান সইতে হ'ত না, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত দুর্ভর অজ্ঞানের চাপে সমস্ত দেশের লোক এমন অসহায় ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে মরত না।

তুমি মনে ক'রো না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষ আমার সাধনার লক্ষ্য। চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড় আমি, মহান আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির যোগে আমার পূজা আমার সেবা সত্য হয় আত্মাভিমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। কর্ম্মই বন্ধন হয়ে ওঠে এই উপলব্ধির সঙ্গে যদি যুক্ত না হয়। য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্ম্মকে মহৎ ক'রে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্য প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত। যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারাজীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজা করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি ব'লে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ।

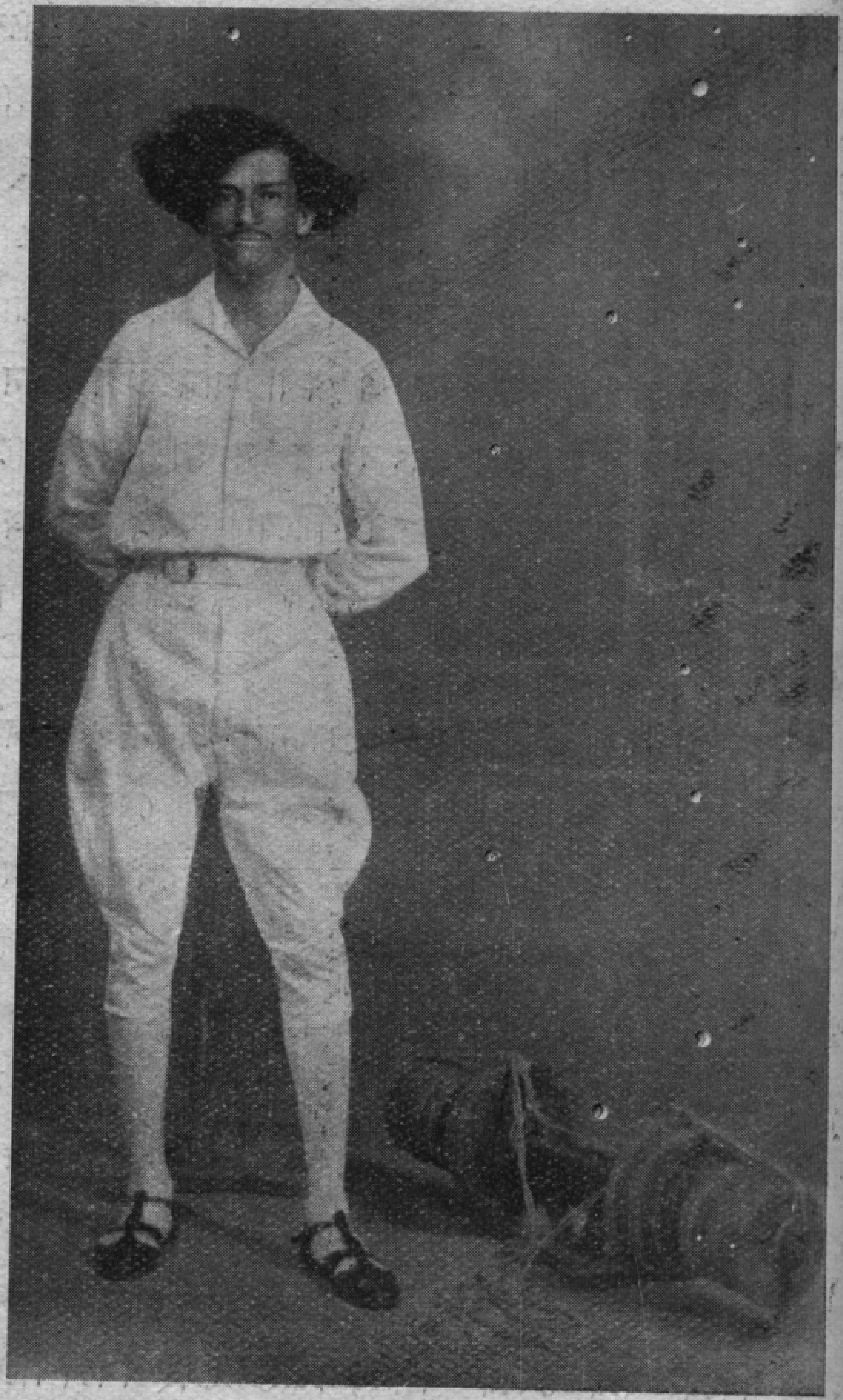
ইতি ১২ আষাঢ়, ১৩৩৮

চুল ও দাঁতের জোর

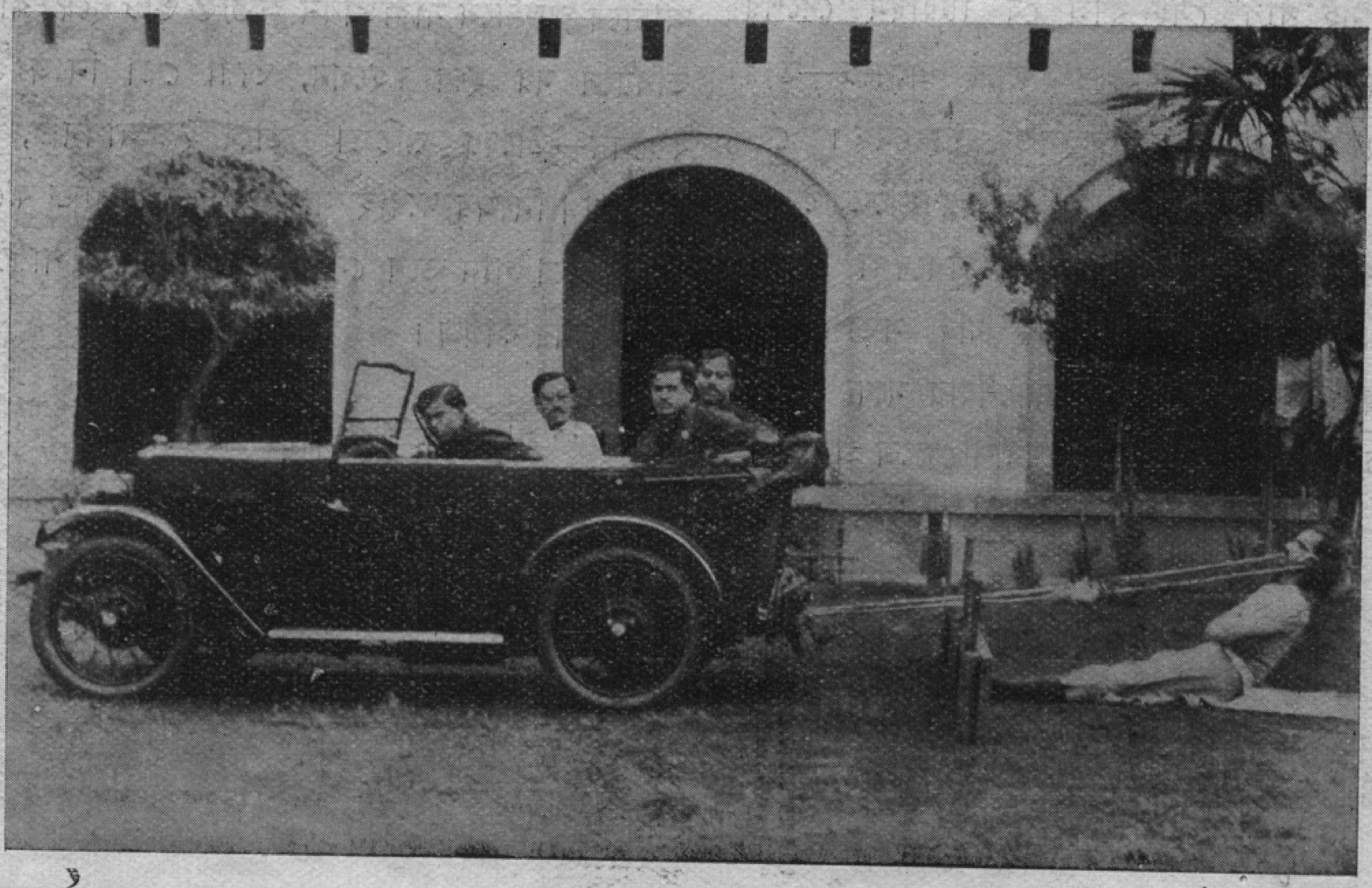
[শ্রীযুক্ত মণি ধর চুল ও দাঁতের জোর দেখাইবার জন্য নানা প্রকার কৌশল দেখাইয়া থাকেন। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি কৌশলের চিত্র দেওয়া গেল।]



শ্রীযুক্ত মণি ধর



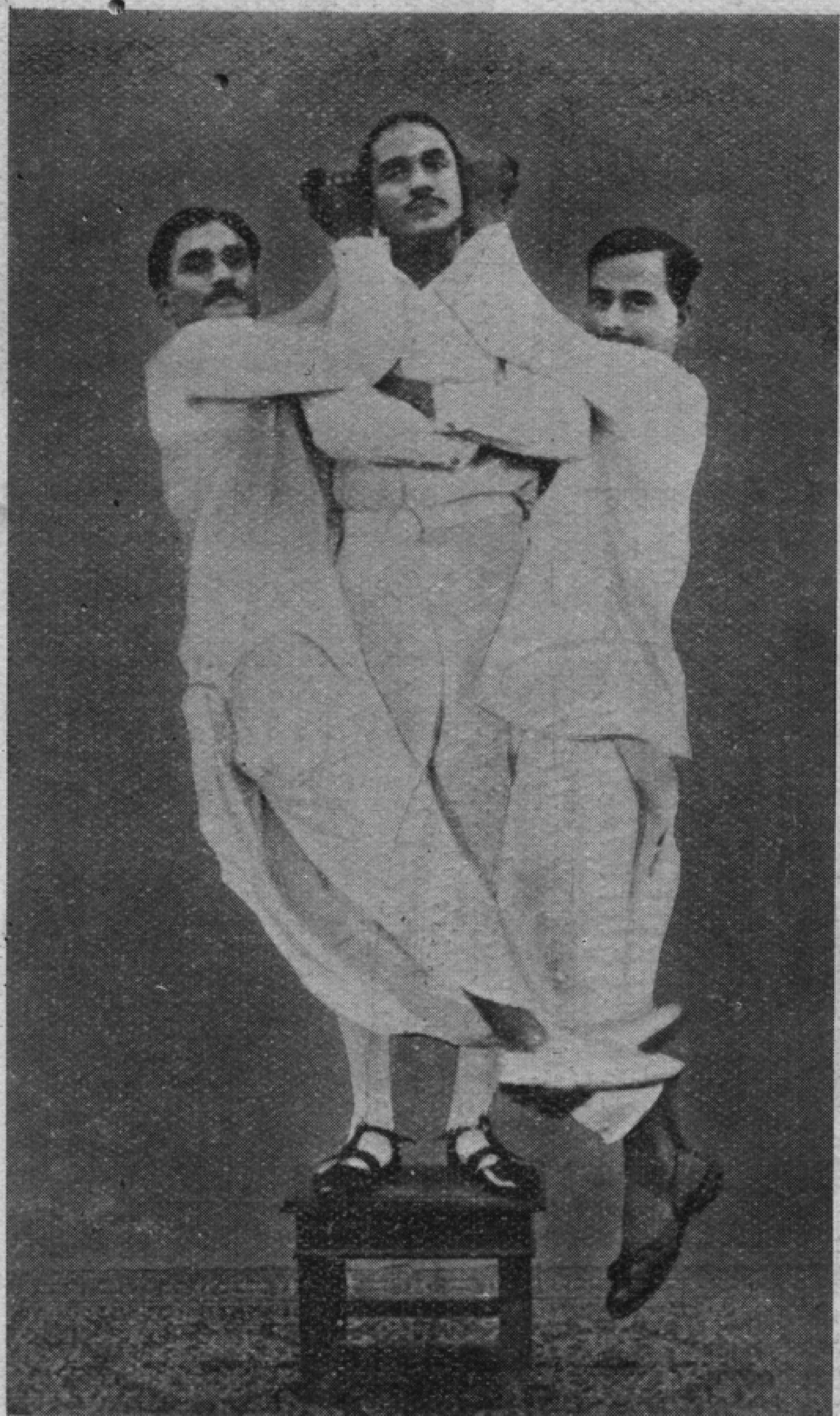
ব্যায়ামের পোষাকে শ্রীযুক্ত মণি ধর



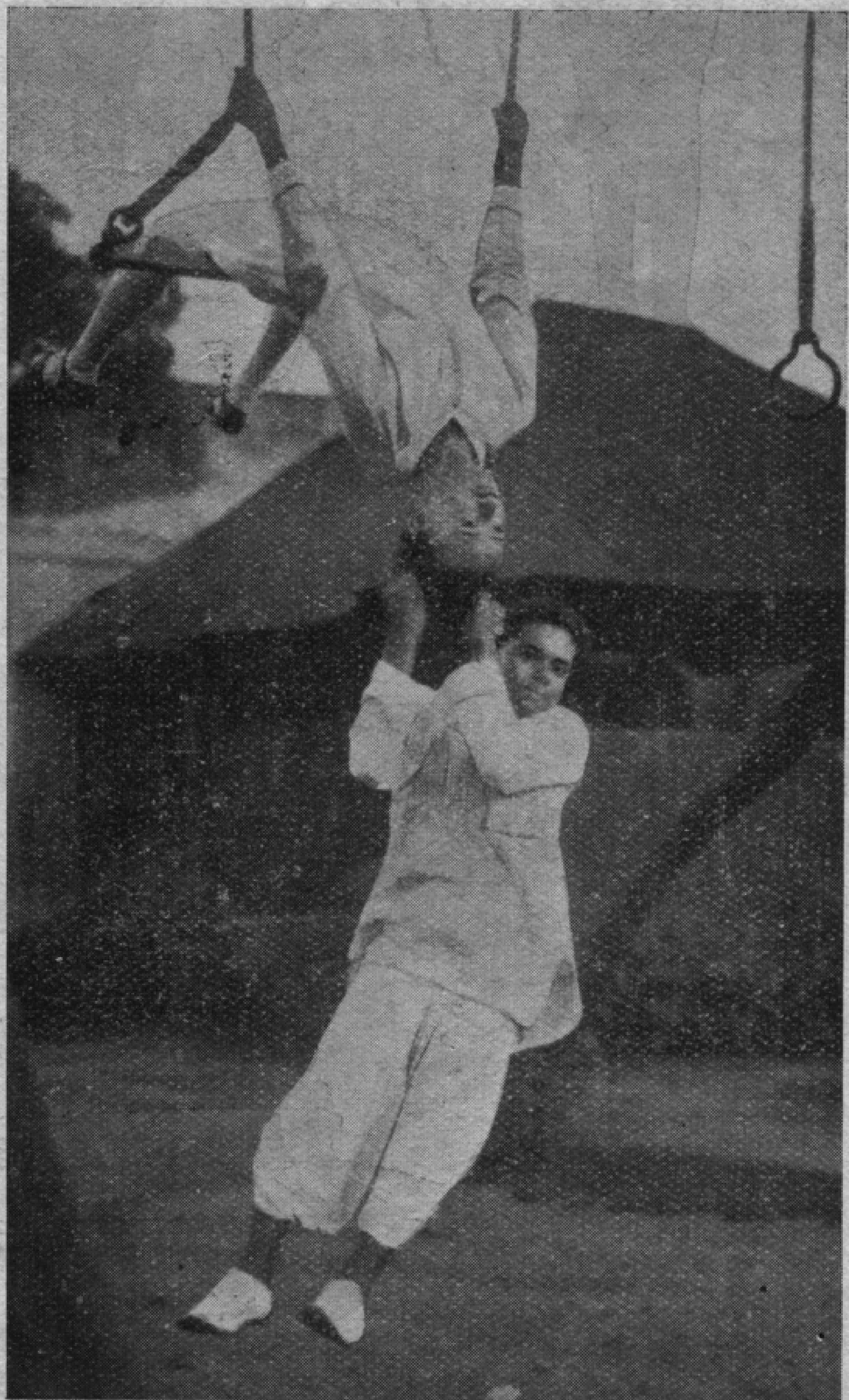
মণিবাবু চুলে দড়ি বাঁধিয়া মোটর-কার আটকাইতেছেন



চুলের দ্বারা গাড়ী টানা



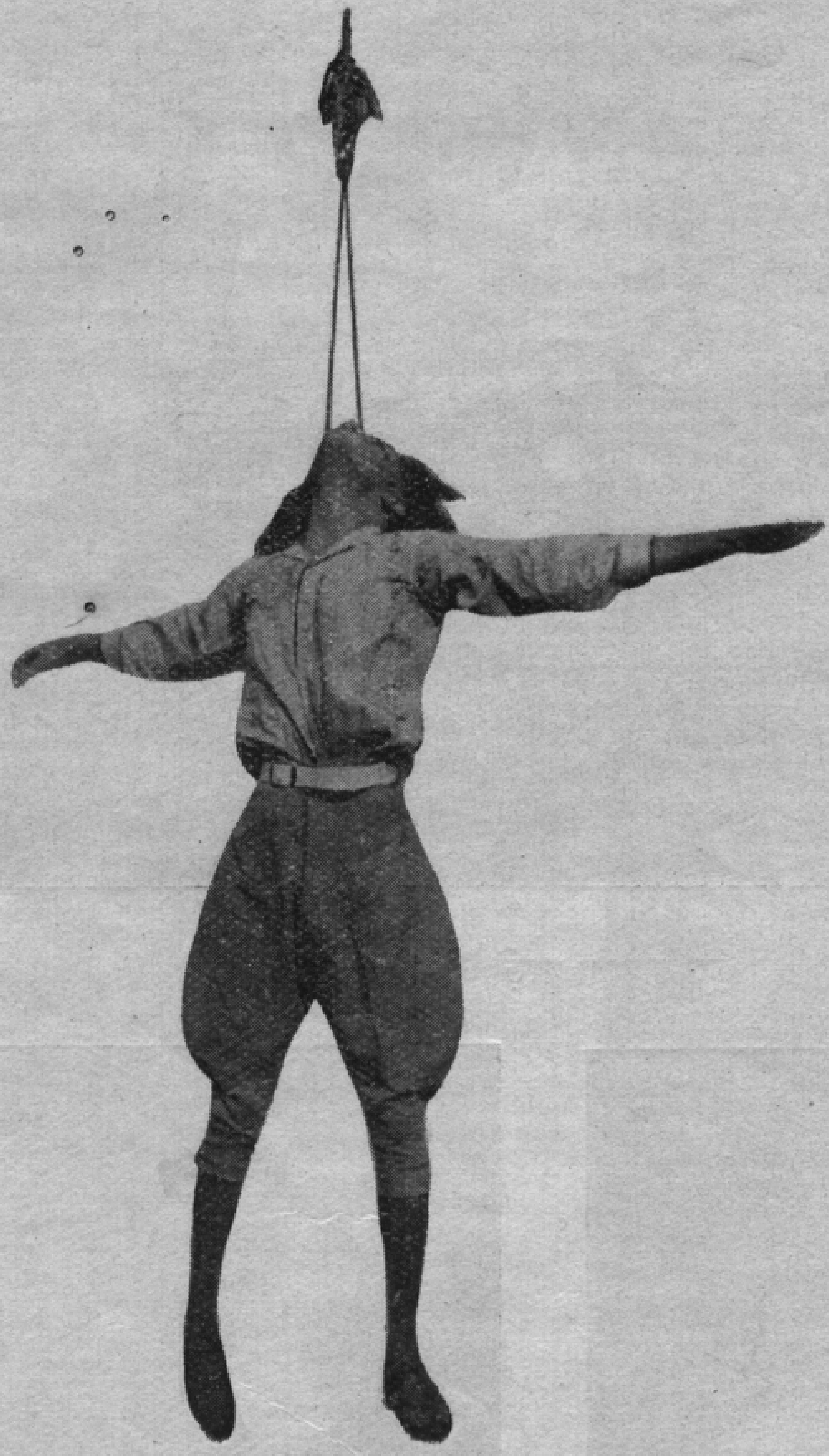
মণিবাবু চুলের দ্বারা দুইটি মানুষের ভার বহন করিতেছেন



মণিবাবুর চুল ধরিয়া একটি মানুষ ঝুলিয়া আছে



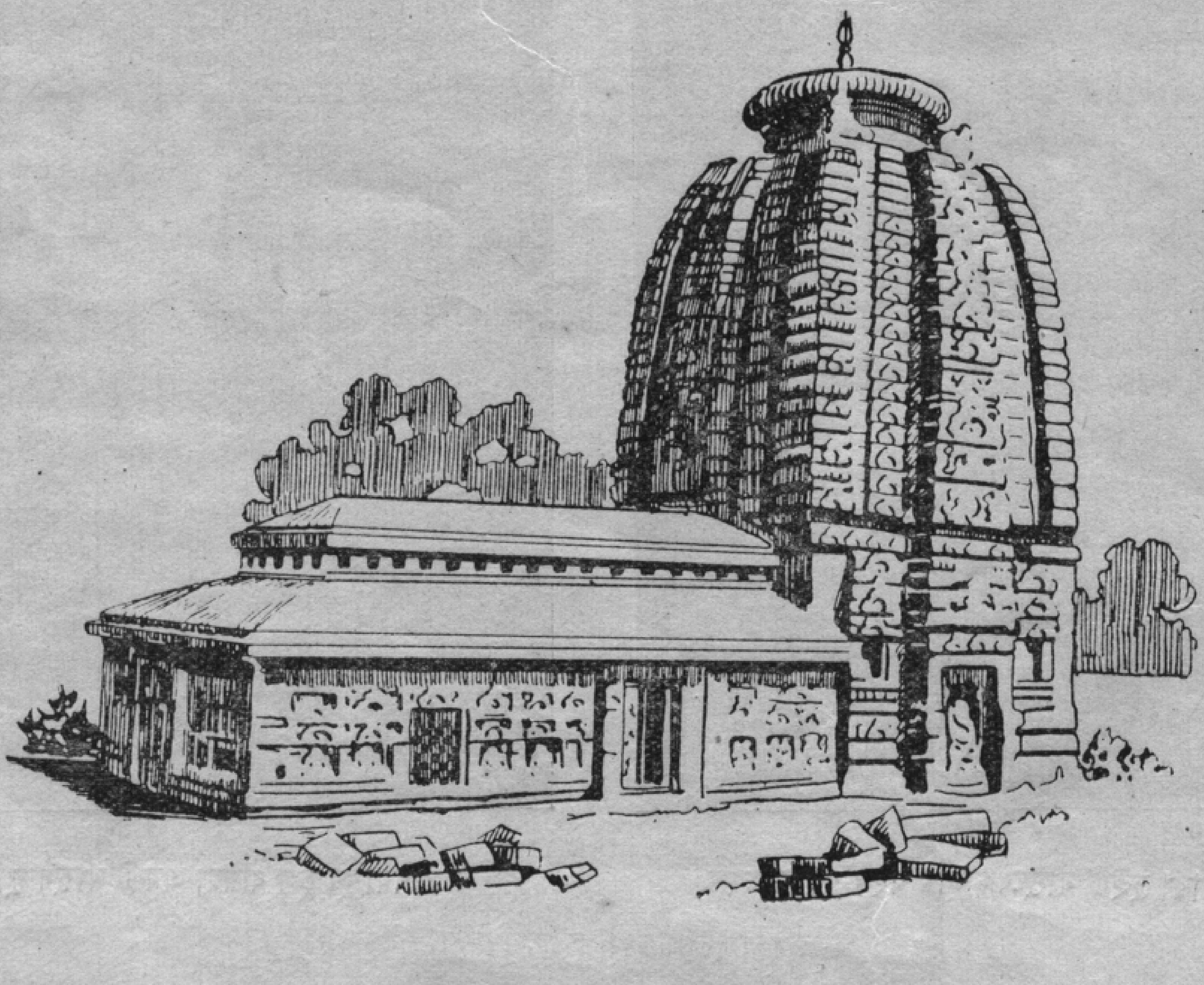
মণিবাবু চুলে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছেন



মণিবাবু দাঁতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছেন



দাঁতে দড়ি আটকাইয়া মানুষের ভার বহন



কামরূপরাজমালা*

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী কামরূপ, মিথিলা, মগধ, উৎকল, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের প্রাচীন কালের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস না থাকিলেও ইতিহাসের উপাদানের অভাব নাই। এই সকল উপাদান ইংরেজী ভাষার যোগে নানা পত্রে প্রকাশিত হইয়া বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী জানেন এমন অনেক লোকের পক্ষেও এই সকল পত্র সুলভ নহে। অথচ ইতিহাসের উপাদানগুলি সুলভ না হইলে জনসমাজে ইতিহাসের যথোচিত অনুশীলন সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উদ্যোগীরা বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা শাখার মূল উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার যোগে কয়েকখানি আকরগ্রন্থ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই পর্য্যায়ের একখানি মাত্র গ্রন্থ, ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্কলিত "গৌড়লেখমালা", প্রথম খণ্ড, বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এত কাল পরে এই শ্রেণীর আর একখানি গ্রন্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "কামরূপ-শাসনাবলী" পাইয়া বঙ্গসাহিত্যানুরাগী এবং ইতিহাসানুরাগী বাঙ্গালী মাত্রই মাথায় তুলিয়া লইবেন। বাঙ্গালার যে ভাগ করতোয়া নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত তাহা প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। কামরূপের ইতিহাস না বুঝিলে বাঙ্গালার ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে না।

প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকের উপাদান আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠার ফলে সূচনা হইতেই ভাগ্যবিধাতাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। পূর্ব্বপ্রকাশিত বলবর্ম্মার মূল তাম্রশাসন লইয়া তাঁহার হাতেখড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রকাশিত ধর্ম্মপালের (পুষ্পভদ্রা) শাসন তাঁহার হস্তগত হয়। ভাস্করবর্ম্মার সুদীর্ঘ শাসনের ছয়খানি ফলকের আবিষ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। হর্জ্জরবর্ম্মার তাম্রশাসনের একখানি ফলক লাভও কম সৌভাগ্যসূচক নহে। ভরসা করি এই শাসনের অপর দুইখানি ফলক আর বেশী দিন তাঁহার আকর্ষণ এড়াইতে পারিবে না, এবং তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া আরও অনেক শাসন আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত করিয়া যাইবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি (ধর্ম্মপালের শুভঙ্কর পাটক শাসন) ভিন্ন আর সকল শাসনই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। "কামরূপরাজাবলী" নামক ভূমিকাটিও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল প্রবন্ধ সংশোধিত হইয়া গ্রন্থাকারে একত্র প্রকাশিত হওয়ায় ইহাদের মূল্য অনেক বাড়িয়াছে। যাহা বাড়ির সকলে, পাড়ার সকলে, পড়িতে উৎসুক এমনতর বাঙ্গালা মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্র সঞ্চয় করিয়া রাখা সহজ নহে। সুতরাং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাম্রশাসন সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের অগোচর থাকিয়া যাইত।

"কামরূপশাসনাবলী"তে গ্রন্থকার পদে পদে লিপি-পাঠে দক্ষতা, পাণ্ডিত্য, এবং বিচারকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্রেণীর নিবন্ধ সহজপাঠ্য হইতে পারে না। যিনি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করিবেন তিনি ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়াও নানা প্রকারে উপকার লাভ করিবেন। এই পুস্তকে সংগৃহীত শাসনগুলির মধ্যে কয়েকখানি গদ্যপদ্যময় সুন্দর সংস্কৃত কাব্য। স্ত্রী-পুরুষের নদ-নদীর এবং গ্রাম-নগরের নামের মধ্যে ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন। অধিকাংশ কামরূপশাসনাবলীর মধ্যে রাজবংশের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে শাসন গৃহীতা ব্রাহ্মণের বংশের প্রশস্তিও আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, এই উপাদেয় পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। আশা করি স্বদেশের সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। একবার মাত্র পাঠ করিলে এইরূপ পুস্তকের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না। ইহা পুনঃপুনঃ পাঠ করা আবশ্যক। বিশেষবিদেরা এই পুস্তকে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পুনর্বিচারের অনেক উপাদান পাইবেন। আমি এই প্রস্তাবে কামরূপের ইতিহাস-সম্পর্কীয় দুইটি বিষয়ের পুনরালোচনা করিব। আমার আলোচ্য একটি বিষয়, মহাভারতোক্ত প্রাগ্জ্যোতিষ এবং কামরূপ ভিন্ন দেশ না অভিন্ন দেশ; দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়, কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা কখনও স্থায়িভাবে কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন কি না।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, এই বর্ম্মণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভাস্করবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ পুষ্যবর্ম্মা। পুষ্যবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে—

"সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধরণেচ্ছু কপট বরাহরূপী চক্রপাণির (বিষ্ণুর) নরক (নামক) রাজশ্রেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। সেই অদৃষ্টনরক (অর্থাৎ নরকের সহিত অপরিচিত) নরক হইতে ইন্দ্রের সখা ভগদত্ত জাত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনকেও তিনি যুদ্ধে (স্পর্দ্ধা-সহকারে) আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই শত্রুহন্তা রাজার বজ্রগতি (অর্থাৎ বিদ্যুৎগতি) বজ্রদত্ত নামা পুত্র ছিলেন; তাঁহার সৈন্যগতি অপ্রতিহত ছিল; তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধে ইন্দ্রকেও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয় নৃপতিগণ তিন হাজার বৎসর রাজপদ অধিকার করিয়া দেবসাযুজ্য লাভ করিলে পুষ্যবর্ম্মা ক্ষিতিপতি হইয়াছিলেন" (কামরূপ-শাসনাবলী, ২৮ পৃঃ)।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে (সপ্তম উচ্ছ্বাসে)ও আছে পুরাকল্পে বরাহের সংসর্গে নরকে গর্ভবতী পৃথিবীর নরক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত লোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার বংশীয় ভগদত্ত পুষ্পদত্ত বজ্রদত্ত প্রভৃতি মেরুপর্ব্বতের তুল্য মহান্ বহুতর মহীপাল রাজত্ব করিবার পর ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ

---

* কামরূপশাসনাবলী ভূমিকা কামরূপরাজাবলী সমন্বিত। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। ১৩৩৮ সাল। মূল্য ছয় টাকা।

ভূতিবর্ম্মা অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। শাসনোক্ত পুষ্যবর্ম্মা ভূতিবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ। বাণের এবং ভাস্করবর্ম্মার সমসময়ের চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ্গ নরকের আখ্যান শুনিয়াছিলেন, এবং তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা নারায়ণ দেবের বংশধর।

ভাস্করবর্ম্মার প্রশস্তিকায় যে মহাভারত হইতে নরক-ভগদত্ত-বজ্রদত্তের আখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ অর্জ্জুনের উল্লেখ। বাণ এবং য়ুয়ান চোয়াঙ্গ কামরূপী পুরাবৃত্তবেত্তাদিগের কথাই আবৃত্তি করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, নরক এবং ভগদত্তকে কামরূপে টানিয়া আনা কি প্রাচীন প্রমাণসঙ্গত, না রাজবংশপ্রশস্তিকারের স্বকপোলকল্পিত? বাল্মিকীর রামায়ণের ভৌগোলিক বিবরণ সম্ভবতঃ মহাভারতের ভৌগোলিক বিবরণ অপেক্ষা কতকটা প্রাচীনতর। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪০ হইতে ৪৩ অধ্যায়ে সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বানরগণকে পাঠাইতে উদ্যত সুগ্রীবের মুখে চতুর্ভাগের ভুবিবরণ দেওয়া হইয়াছে।* সুগ্রীব (৪০শ সর্গে) পূর্ব্বদিকে এই সকল প্রাচ্যদেশের নাম করিয়াছেন—

"ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোসলান্।
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাং স্ত্যঙ্গাং স্তথৈব চ॥"

এখানে কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের নাম নাই এবং বঙ্গেরও নাম নাই। পশ্চিম দিকের বর্ণনায় পশ্চিম সমুদ্রের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ৪২।৩০-৩২):—

যোজনানি চতুঃষষ্টি র্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥

"অগাধ সমুদ্রে ৬৪ যোজন বিস্তৃত সুবর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহ নামক সুমহান্ পর্ব্বত আছে। তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক সুবর্ণময় নগর আছে। এই নগরে নরক নামক দুষ্ট দানব বাস করে।"

রামায়ণের এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং নরক কবি-কল্পনার সৃষ্টি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে চতুর্ভাগের জনপদ-সকলের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই দিগ্বিজয় ব্যাপারে চতুর্ভাগের মধ্যে উত্তরভাগ জয়ের ভার পড়িয়াছিল অর্জ্জুনের উপর এবং পূর্ব্বভাগ জয়ের ভার পড়িয়াছিল ভীমের উপর। ভীমের বিজয় বৃত্তান্তে, অঙ্গরাজ কর্ণের এবং মোদাগিরির (মুদ্গাগিরি বা মুঙ্গেরের?) রাজার পরাজয় বৃত্তান্তের পরে, বলা হইয়াছে (২৯, ১০৯৫-১১০০)+:—

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসং॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাযৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তাঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগর-বাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ॥
এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগদ্‌বলী॥
স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছ নৃপতীন সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহরয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ॥

অর্থাৎ ভীম পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে এবং কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারপর ভীম সমুদ্রসেন, রাজা চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটরাজ, সুহ্মরাজ, সাগরতীরের অধিবাসিগণ এবং ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুদেশ জয় করিয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে ধন লইয়া পবননন্দন (ভীম) লৌহিত্য (নদীর তীর পর্য্যন্ত) গমন করিয়াছিলেন। তিনি সাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছনৃপতিগণের নিকট হইতে কর এবং নানাবিধ রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বভাগের এই লৌহিত্য অবশ্যই লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ। এখানে লৌহিত্যনদের তীরবর্ত্তী প্রাগ্‌জ্যোতিষের বা কামরূপের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে, সেখানে যে তৎকালে এইরূপ নামধেয় জনপদ বা পুর ছিল তাহা মহাভারতকারের জানা ছিল না। কিন্তু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরভাগ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে (সভাপর্ব্ব, ২৫) মহাভারতকার প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে অর্জ্জুনের উত্তরভাগ বিজয়ের বিবরণ স্মরণ করা আবশ্যক। কুলিন্দবিষয় জয় করিয়া অর্জ্জুন উত্তর দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তার পর আনর্ত্ত, কালকূট এবং কুলিন্দ জনপদ এবং সুমণ্ডল নামক রাজাকে জয় করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া—

বিজিগ্যে শাকলং দ্বীপং প্রতিবিন্ধ্যঞ্চ পার্থিবং॥
শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেষু যে নৃপাঃ।
অর্জ্জুনস্য চ সৈন্যৈস্তৈর্বিগ্রহস্তুমুলোঽভবৎ॥
স তানপি মহেষ্বাসান্ বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ॥
তত্ররাজা মহানাসীদ্ ভগদত্তো বিশাম্পতে।
তেনাসীৎ সুমহদ্‌যুদ্ধং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ॥
স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চবৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥
(২৫।৯৯৮-১০০২)

"শাকলদ্বীপ এবং রাজা প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিয়াছিলেন। সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত শাকলদ্বীপে যে সকল নরপতি বাস করিতেন তাঁহাদের সহিত অর্জ্জুনের সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্, প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্ত নামক মহান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। কিরাতগণ, চীনগণ এবং সাগরতীরবাসী অন্য অনেক যোদ্ধৃগণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন।"

ভগদত্তকে বশীভূত করিয়া অর্জ্জুন উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং অন্তর্গিরি, বহির্গিরি এবং উপগিরি জয় করিয়াছিলেন। তারপর যথাক্রমে উলূক রাজ্য, রাজা সেনাবিন্দুর রাজ্য, দেবপ্রস্থ-নগর, মোদাপুর, বামদেব, সুদামন, সুসঙ্কুল, উত্তরউলূক, পুরুবংশীয় রাজা বিশ্বগশ্বের রাজ্য জয় করিয়া এবং পর্ব্বতবাসী দস্যুগণকে দমন করিয়া—

* হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংশোধিত সটীক রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে (শকাব্দ ১৭৯৬) বচন প্রমাণ তোলা হইল।

+ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি মহাভারতের যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন তাহা হইতে বচন প্রমাণ তোলা হইল।

গণানুৎসবসঙ্কেতানজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ।
ততঃ কাশ্মীরকান্‌বীরান্‌ ক্ষত্রিয়ান ক্ষত্রিয়র্ষভঃ॥ (২৬।১০২৫)

"পাণ্ডুপুত্র (অর্জ্জুন) উৎসবসঙ্কেত নামক সপ্ত গণকে জয় করিয়াছিলেন; তারপর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ (অর্জ্জুন) কাশ্মীর দেশীয় বীর ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়াছিলেন।"

কাশ্মীরের পর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যে-সকল জনপদ জয়ের কথা আছে তন্মধ্যে ত্রিগর্ত্ত, বাহ্লীক, দরদ, কাম্বোজ উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিজিত দেশের মধ্যে যে শাকলদ্বীপ বা শাকদ্বীপের কথা আছে তাহার যদি কোন ভৌগোলিক ভিত্তি থাকে তবে তাহা মধ্য-এশিয়ার মালভূমির পশ্চিম ভাগ, যেখানে স্মরণাতীতকাল হইতে শকজাতি বাস করিত এবং যে দেশ গ্রীকদিগের নিকট সিথীয় নামে পরিচিত ছিল। শাকলদ্বীপের নৃপতিগণকে লইয়া অর্জ্জুনের যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আক্রমণের কথা আছে সে দেশ কোথায়? মাত্র একশত শ্লোকের পরে মহাভারতকার ভীমের পূর্ব্ব দিগ্‌বিজয়প্রসঙ্গে পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুহ্মের পরে যে লৌহিত্য নদের উল্লেখ করিয়াছেন অর্জ্জুনের আক্রান্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ তাহার তীরবর্ত্তী দেশ হইতে পারে না। সিথিয়ার বা শকভূমির পূর্ব্বদিকে মধ্য-এশিয়ায় এই প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান নির্দ্দেশ না করিলে মহাভারতের সভাপর্ব্বের অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ের বিবরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

কালিদাসের রঘুবংশকাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়ের বিবরণে লৌহিত্যনদের তীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। এই বিবরণে কথিত হইয়াছে, রঘু দিগ্বিজয়ার্থ প্রথম পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিয়া ("স যযৌ প্রথমং প্রাচীং") সুহ্ম এবং বঙ্গ জয় করিয়া "উৎকলাদর্শিত পথে" দক্ষিণে কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকের জনপদের মধ্যে কালিদাস কেবল পাণ্ড্যের ও কেরলের নাম করিয়াছেন।

দক্ষিণ দিক্‌ জয় করিয়া রঘু পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। পশ্চিমভাগের জনপদের মধ্যে কালিদাস পারসীকগণের এবং যবনগণের নাম করিয়াছেন। তারপর রঘু উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া হূণ এবং কাম্বোজ দেশ জয় করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে ("গৌরীগুরুশৈল) আরোহণ করিয়াছিলেন। হিমালয় প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে কালিদাস কিরাতগণের নাম করিয়াছেন এবং তারপর—

"শরৈর্‌=উৎবসসংকেতান্‌ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্‌" (৪।৭৮)

"শর নিক্ষেপ করিয়া উৎসবসংকেত নামক জনগণকে উৎসবশূন্য করিয়া"

অর্থাৎ উৎসবসঙ্কেতগণকে জয় করিয়া—

"চকম্পে তীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্‌ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর।" (৪।৮১)

"রঘু লৌহিত্যনদ পার হওয়ায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা কম্পিত হইয়াছিলেন।"

এক শ্লোক পরেই কালিদাস "প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরকে" "ঈশ কামরূপাণাম্‌", এবং তার পরের শ্লোকে "কামরূপেশ্বর" বলিয়াছেন। উপরে মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্বিজয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে অর্জ্জুন প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তকে পরাজিত করিবার পর অনেক জনপদ অতিক্রম করিয়া তবে সপ্ত উৎসবসঙ্কেতগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কালিদাস উৎসবসঙ্কেতগণের পরাজয়ের পর রঘুর প্রাগ্‌জ্যোতিষ-আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যতিক্রমের, প্রাগ্‌জ্যোতিষকে লৌহিত্যের তীরে কামরূপে টানিয়া আনিবার কারণ, কালিদাসের সময় কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে পরিচিত হইয়াছিল। কালিকাপুরাণেও আছে, বিষ্ণু নরককে এবং পৃথিবীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং—

"নিমজ্য ক্ষণমাত্রেণ প্রাগজ্যোতিষপুরং গতঃ।
মধ্যগং কামরূপস্য কামাখ্যা যত্র নায়িকা॥" (৩৮।৯৫)*

"ডুব দিয়া ক্ষণমাত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (প্রাগজ্যোতিষপুর) কামরূপের অন্তর্গত এবং কামাখ্যা দেবী সেখানকার নায়িকা।"

বর্ত্তমানে প্রাগজ্যোতিষের এবং কামরূপের অভিন্নতা সম্বন্ধীয় সংস্কার আমাদের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদের সহজে মনে হয় রামায়ণে এবং মহাভারতে যেখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্যরূপ সংস্থান সূচিত হইয়াছে সেখানে ভুল আছে, কিন্তু এই প্রকার সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যেখানে কামরূপের নাম নাই সেখানেই প্রাগ্‌জ্যোতিষের সংস্থান অন্যরূপ। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয়, যাঁহারা কামরূপের সহিত অপরিচিত ছিলেন তাঁহাদের প্রাগ্‌জ্যোতিষ স্বতন্ত্র জনপদ ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরক পৌরাণিক কল্পনার সৃষ্টি। সমসময়ের বিবরণমূলক স্বতন্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে নরকের পুত্র এবং ইন্দ্রের সখা ভগদত্তের ঐতিহাসিকতাও স্বীকার করা কঠিন। মহাভারত অবশ্য ইতিহাস নামে কথিত হয়। কিন্তু এই ইতিহাস শব্দের অর্থ লোকপরম্পরাগত উপদেশপ্রদ আখ্যায়িকা। এরূপ আখ্যায়িকায় হিষ্টরি-বাচক ইতিহাস থাকিতেও পারে, নাও পারে। মহাভারতে পশুপক্ষীর গল্প ও "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌" বলিয়া সূচিত হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণের সহায়তায় বিচার না করিয়া মহাভারতের কোন লৌকিক আখ্যানকেও হিষ্টরি-বাচক ইতিহাস বলা যায় না। আমার অনুমান হয়, পুষ্যবর্ম্মা-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বংশাবলী প্রস্তুত করিবার সময় এই বংশের মহিমা-বৃদ্ধির জন্য বংশপ্রশস্তিকার বংশলতার মূলকে পৌরাণিক প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরক-ভগদত্ত-বজ্রদত্তের বংশের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই সূত্রে কামরূপের এবং প্রাগ্‌জোতিষের অভিন্নতা সম্পাদিত হইয়াছিল।

ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে শাসনখানির এই প্রকার ইতিহাস আছে—

"(ঈদৃশ) মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীভাস্করবর্ম্মদেব চন্দ্রপুরি বিষয়ে (স্থিত) বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়পতিগণ ও বিচারালয়সমূহ প্রতি আদেশ করিতেছেন, আপনারা বিদিত হউন, এই বিষয়ান্তঃপাতি ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র যাহা নরপতি ভূতিবর্ম্মা কর্ত্তৃক তাম্রপট্টদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা এই তাম্রপট্টের অভাব বশতঃ করদ হইয়া পড়ায় মহারাজ জ্যেষ্ঠ ভদ্রদিগকে জ্ঞাপন করিয়া পুনশ্চ পট্ট করণার্থে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য পৃথিবীর সমকাল কোনও কিছু (কর) গ্রহণ যাহাতে না হয় সেই ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে পূর্ব্বে ভোগকারী ব্রাহ্মণদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অগ্রহার ক্ষেত্র) প্রদান করিলেন" (৩৩ পৃঃ)।

এই শাসনের রাজবংশ প্রশস্তিতে দেখা যায় মহাভূতবর্ম্মা ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। বাণের "হর্ষচরিতে" (৭ম উচ্ছ্বাস) ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহকে ভূতিবর্ম্মই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাম্র-

* পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত) "কালিকাপুরাণ" হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইল।

শাসনের দানের বিবরণের উল্লিখিত ভূতিবর্ম্মা এবং রাজবংশপ্রশস্তিতে উক্ত মহাভূতবর্ম্মা যে অভিন্ন এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের রাজবংশ প্রশস্তিতে পুষ্যবর্ম্মা হইতে ভাস্কর-বর্ম্মার অগ্রজ সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা পর্য্যন্ত এই বার জন রাজার যে বিবরণ আছে তাহাতে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নাই। শাসনদাতা ভাস্করবর্ম্মার সুদীর্ঘ প্রশস্তি হইতেও কোন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা অসাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" এবং য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং জীবনচরিতে ভাস্করবর্ম্মার ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। ভাস্করবর্ম্মা সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লিখিয়াছেন—

"হর্ষচরিতে আছে, হর্ষবর্দ্ধন, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়াই গৌড় অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই ভাস্কর-বর্ম্মার দূত হংসবেগ আসিয়া উপহার প্রদান পূর্ব্বক হর্ষের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের প্রস্তাব করিলেন।...ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার (গৌড়াধিপ শশাঙ্কের)ই ভয়ে অভিভূত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযানকারী হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে ঐরূপ মূল্যবান উপহারাদি প্রদান পূর্ব্বক মৈত্রীস্থাপন করিবার জন্য হংসবেগকে প্রেরণ করেন।...যাহা হউক, হর্ষবর্দ্ধন মৈত্রী স্বীকার করিয়া প্রত্যুপঢৌকন সহ নিজের প্রধান দূত পাঠাইয়া ভাস্কর-বর্ম্মাকে সম্মানিত করিলেন। অতঃপর ভাস্করের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই—ভাস্কর "মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসম্পত্ত্যুপাত্ত জয়শব্দান্বর্থস্কন্ধবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ" শাসনাদেশ করিয়াছেন। এই শাসনপ্রদান সময়ে কর্ণসুবর্ণ যে ভাস্করের অধীন ছিল এ কথা ঠিক বলিতে পারা যায় না; সম্ভবতঃ যখন দুই মিত্রে মিলিয়া প্রবল অমিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বিজিত রাজধানীতে থাকিয়া শত্রুবিজয়ে উৎসবানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন—তখন এই তাম্রশাসন আদিষ্ট হইয়াছিল।" (১৪-১৬ পৃঃ)

পাদটীকায় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অপিচ, ঐ আলোচনায় (৯ম পৃঃ) বলা হইয়াছে, এই শাসন ভাস্করের রাজত্বের প্রথম ভাগেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে গুপ্ত ৩০০ (খৃঃ ৬১৯-২০) অব্দে সম্পাদিত গঞ্জামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে (*Epigraphia Indica*, vol. VI, p. 140 etc.) শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন; তাহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে, তদানীং হর্ষ ও ভাস্কর কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণের বিজয় স্থায়ী হয় নাই; শশাঙ্ক ইহা পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। বোধ হয় শশাঙ্কের মৃত্যু (আনুমানিক ৬২৫ খৃঃ) হইলে পর ইহা হর্ষের সম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।" (১৬ পৃঃ পাদটীকা ২)

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা হর্ষের এবং শশাঙ্কের বিরোধের ইতিহাস যে আকারে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে গিয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মূল প্রমাণ অবলম্বনে পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাক এই সিদ্ধান্ত কতদূর বিচারসহ।

প্রভাকরবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠ নামক জনপদের রাজা ছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানীশ্বর (বর্ত্তমান আম্বালা জেলার অন্তর্গত থানেশ্বর নগর) এই জনপদের রাজধানী ছিল। প্রভাকরবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন হূণগণের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন যখন স্থানীশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন তখন সংবাদ পাইলেন, "যেদিন প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে সেইদিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বধ করিয়া তাঁহার পত্নী (রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নী) রাজ্যশ্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।" এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া মালব-রাজের দণ্ডবিধান করিতে যাত্রা করিলেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের কান্যকুব্জ অভিযানের কিছুকাল পরে তাঁহার অশ্বারোহী সেনাপতি কুন্তল আসিয়া তাঁহার অনুজ হর্ষবর্দ্ধনকে সংবাদ দিল, রাজ্যবর্দ্ধন অতি সহজে মালবসেনা পরাজিত করিয়া থাকিলেও বিশ্বাসঘাতক গৌড়াধিপের দ্বারা তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই অবশ্য হর্ষ গৌড়াধিপাধম চণ্ডালকে "ধ্বংস করিবার," "গৌড়াধমের চিতাধূম" দেখিবার, মেদিনী 'নির্গৌড়া' করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং হস্তীসেনার অধিনায়ককে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তারপর কিছুদিন অতীত হইলে (ব্যতীতেষ চ কেষুচিদ্দিবসেষু) শুভদিনে হর্ষ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে শিবিরে আসিয়া কামরূপরাজদূত হংসবেগ হর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপর পরাজিত মালবরাজের সেনাবল লইয়া ভণ্ডি আসিয়া হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিলিত হইল। হর্ষ ভণ্ডির নিকট শুনিতে পাইলেন, রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যার পর গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি কান্যকুব্জ অধিকার করিলে হর্ষের ভগ্নী রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। হর্ষ ভণ্ডিকে বলিলেন, "আমি স্বয়ং রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে যাইতেছি; আপনিও সেনা লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করুন।" অষ্টম উচ্ছ্বাসে হর্ষ কর্ত্তৃক রাজ্যশ্রীর উদ্ধার এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী শিবিরে পুনরাগমন বর্ণিত হইয়াছে, এবং এইখানেই হর্ষচরিত সমাপ্ত হইয়াছে।

হর্ষচরিতে গৌড় শব্দ জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, গৌড়াধিপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই যুদ্ধযাত্রার ফলে হর্ষ যে গৌড়দেশ (বাঙ্গালা) পর্য্যন্ত পহুঁছিয়া কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া-ছিলেন এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। শশাঙ্ক রাজ্য-বর্দ্ধনকে কান্যকুব্জে বা কান্যকুব্জের নিকটে কোথাও হত্যা করিয়া-ছিলেন, এবং তারপর গুপ্ত নামক যে ব্যক্তি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই গৌড়াধিপের অনুগত ছিলেন। রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যার পর হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়াই যে শশাঙ্ক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া কর্ণসুবর্ণে আসিয়া হর্ষের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক এত দুর্ব্বল হইলে হূণবিজয়ী রাজ্যবর্দ্ধন কখনই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন না। শশাঙ্ক অবশ্য তীর্থ-দর্শনের জন্য গিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করেন নাই, তাঁহার সঙ্গে কান্যকুব্জ-বিজয়ের উপযোগী সেনাবল ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার পর হর্ষের সহিত গৌড়াধিপের যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা খুব সম্ভব কান্যকুব্জ রাজ্য লইয়া। বাণভট্ট এই যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের দিগ্বিজয়ের ইতিহাসের আকর য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণ। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণের গোড়ায় একটা মস্ত গলদ আছে। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, কান্যকুব্জ হর্ষবর্দ্ধনের পৈত্রিক রাজ্যের রাজধানী ছিল, এবং রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার পরই হর্ষ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"Hereupon the statesmen of Kanauj, on the advice of their leading man Bani, invited Harshavardhana, the younger brother of the murdered king, to become their sovereign." (Watters)

"হর্ষচরিত" পাঠে জানা যায়, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সময় হর্ষ স্থানীশ্বরে ছিলেন এবং তাঁহার পিতার মিত্র বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদ তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ হর্ষের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"As soon as Siladitya (Harsha) became ruler he got together a great army, and set out to avenge his brother's murder and to reduce the neighbouring countries to subjection. Proceeding eastwards he invaded the states which had refused allegiance, and waged incessant warfare until in six years he had *fought* the five Indias, (or brought the Five Indias under allegiance)" (Watters).

৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া পশ্চিম দিকের অন্যান্য জনপদ পর্য্যটন করিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ যখন কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার অনেক পূর্ব্বেই সেইখানে হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ক্ষুদ্র রাজ্য শ্রীকণ্ঠের কথা এবং স্থানীশ্বরে রাজধানীর কথা হয়ত সাধারণ লোকে এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে থানেশ্বরের যে বিবরণ আছে তাহাতে থানেশ্বর যে বর্দ্ধন-বংশের আদি রাজধানী ছিল এ কথার কোন উল্লেখ নাই। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের জীবনচরিতে থানেশ্বরের নাম মাত্র আছে, আর কোন কথা নাই। ইহাতে মনে হয় পরিব্রাজক নিজে থানেশ্বরে যান নাই, অথবা গেলেও সেখানকার আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন খবর জানিতে পারেন নাই।

হর্ষবর্দ্ধনের কান্যকুব্জ অধিকারের পূর্ব্ব সময়ের ইতিহাসের কোন বিবরণই যে য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ পান নাই তাহার অন্য প্রমাণও আছে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ কান্যকুব্জ-বিবরণে লিখিয়াছেন, হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছয় বৎসর দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর ত্রিশ বৎসর কাল অস্ত্রধারণ না করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানে হর্ষবর্দ্ধনের ছত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বের হিসাব মাত্র পাওয়া যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে, এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-রচনা সাঙ্গ করিয়াছিলেন ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে। চীনদেশের ইতিহাসের মতে হর্ষবর্দ্ধন ঐ সালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মাত্র ৩৬ বৎসর তাঁহার রাজত্বকাল ধরিলে ৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যলাভ দাঁড়ায়। আর একদিকে হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যলাভ হইতে গণিত হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হইয়াছে ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ ৬০৬ হইতে ৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের হর্ষবর্দ্ধনের কার্য্যকলাপের কোন খবরই দিতে পারেন নাই। অনুমান হয় গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সহিত এই ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ এবং মধ্যদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন কখন?

কঙ্গোদের রাজা শৈলোদ্ভব বংশীয় দ্বিতীয় মাধবরাজের ৩০০ শত গুপ্তাব্দের (৬১৯ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের উল্লেখ আছে। গঞ্জাম জেলা কঙ্গোদ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন ৬১৯ খৃষ্টাব্দে যিনি কঙ্গোদের অধিরাজ ছিলেন এই শশাঙ্ক এবং গৌড়াধিপ শশাঙ্ক অভিন্ন ব্যক্তি। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখিয়া গিয়াছেন, এই ৬১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।* শশাঙ্কের পক্ষে ৬০৬ হইতে ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূল রাজ্য এবং রাজধানীভ্রষ্ট হইয়াও ৬১৯ খৃষ্টাব্দে সুদূর কঙ্গোদ পর্য্যন্ত অধিরাজ্য রক্ষা একেবারে অসম্ভব না হইলেও এরূপ ঘটনা সামান্যতঃ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বলবৎ প্রমাণের অভাবে এইরূপ অনুমান করা অসাধ্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বলেন, "তদানীং (ভাস্করের রাজত্বের প্রথম ভাগে) হর্ষ ও ভাস্কর কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণের বিজয় স্থায়ী হয় নাই; শশাঙ্ক ইহা পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন", এই অনুমানও সঙ্গত মনে হয় না। শশাঙ্কের পক্ষে কর্ণসুবর্ণ ভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ তাঁহার মূল রাজ্য গৌড়ভ্রষ্ট হওয়া। গৌড়রাজ্য একবার অপ্রতিহত প্রভাব হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইলে আবার যে অস্তমিতপ্রভাব শশাঙ্ক তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা কঠিন। যদি মনে করা যায়, ৬১২ খৃষ্টাব্দের পর ছয় বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে রত থাকিয়া হর্ষবর্দ্ধন দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং ৬১৯ খৃষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত পরে গৌড় জয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণের সহিত কঙ্গোদ-রাজের ৬১৯ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসনের প্রমাণের অনেকটা সামঞ্জস্য হইতে পারে।

হর্ষবর্দ্ধন যে সময়েই স্থায়িভাবে গৌড় অধিকার করিয়া থাকুন, এ ব্যাপারে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা যে তাঁহার সহকারী ছিলেন এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে স্থানীশ্বর হইতে হর্ষের রাজধানী যেমন কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেইরূপ কামরূপ হইতে ভাস্করবর্ম্মার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব নহে। হর্ষের এবং ভাস্করের মিত্রতার মূল উভয়ের লক্ষ্যের ঐক্য, গৌড়াধিপ শশাঙ্কের ধ্বংসসাধন। উভয়ের চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হইয়াছিল তখন শশাঙ্কের বিস্তীর্ণ রাজ্যের পূর্ব্বাংশ ভাস্করবর্ম্মার ভাগে পড়া অসম্ভব নহে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের জীবনচরিতের পঞ্চম অধ্যায়ের এক স্থানে ভাস্করবর্ম্মাকে Kumar-raja of Eastern India, প্রাচ্য ভারতের কুমার রাজা, বলা হইয়াছে। আনুমানিক ৬৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্ম্মার অনুরোধমত নালন্দার বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্গকে ভাস্করবর্ম্মার নিকট পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন তখন ভাস্করবর্ম্মা ভয় দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন, "প্রয়োজন হইলে আমি সৈন্য এবং হাতী লইয়া গিয়া নালন্দার মঠ ধূলিসাৎ করিব।" ভাস্করবর্ম্মা যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্গকে লইয়া হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন তখন ৩০,০০০ নৌকা প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের জীবনচরিতে আছে—

"Then embarking with the Master of the Law (য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ) they passed up the Ganges togther in order to reach the place where Siladitya-raja (হর্ষবর্দ্ধন) was residing।" (Beal.)

হর্ষবর্দ্ধন তখন শশাঙ্কের সাম্রাজ্যাবশেষ কঙ্গোদ বশীভূত করিয়া কান্যকুব্জে ফিরিবার পথে বাঙ্গালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা যদি কামরূপের খাস রাজধানী হইতে নৌকা যাত্রা করিতেন তবে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া নৌকায় উঠিতে হইত। ভাস্করবর্ম্মা যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজককে লইয়া গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠিয়াছিলেন তখন মনে করিতে হইবে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন নগর হইতে, খুব সম্ভবত কর্ণসুবর্ণ হইতে, তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন অবশ্য সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন এবং ভাস্করবর্ম্মা অনুগত মিত্ররাজা ছিলেন। ভাস্করবর্ম্মার কর্ণসুবর্ণ রাজ্যলাভ

* R. D. Banerji, *History of Orissa*, Vol. I, Calcutta, 1930, p. 129.

হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য গড়ন বিধির বিরোধী নহে। কান্যকুব্জে যখন হর্ষবর্দ্ধনের আহূত বৌদ্ধ মহাসভা মিলিত হইয়াছিল, তখন ভাস্করবর্ম্মা ছাড়া সেখানে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের আরও আঠারজন নরপতি উপস্থিত ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলির শাসনভার তাঁহার নিজের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত ছিল না, যথাসম্ভব পূর্ব্ব রাজাদের হস্তেই ছিল। কালিদাস রঘুবংশে (৪।৩৭) রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই ভাষায় বলা যাইতে পারে, হর্ষ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জনপদের নরপতিগণকে "উৎখাত প্রতিরোপিত" করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম রাজ্যচ্যুত করিয়া, পরে অধীনতা স্বীকার করিলে, পুনঃ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সম্বন্ধে অবশ্য এই রীতির অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ভাস্করবর্ম্মার সহায়তায় কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া হর্ষ খুব সম্ভব তাঁহাকেই সেই রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে স্কন্ধাবার কর্ণসুবর্ণবাসক হইতে ভাস্করবর্ম্মার ভূমিদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে পাওয়া যায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের দ্বিতীয় পাদে গৌড়দেশ কামরূপ-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটি মহামূল্য তথ্য পাওয়া যায়। কুলজ্ঞগণের সংগৃহীত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীর গোড়ায় গল্প আছে, রাজা বল্লালসেনের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে আদিশূর নামক রাজা বাঙ্গালার মোট ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে যাগযজ্ঞ করিবার উপযুক্ত লোক না পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালের সমস্ত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই পাঁচজনের বংশধর বলিয়া পরিচিত। "গৌড়রাজমালা"য় মত প্রকাশ করা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থের এই গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতের মূলে যে বিচাররীতি আছে তাহা এ দেশের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এখনও সম্যক্ সমাদর লাভ করে নাই। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকাশিত কর্ণসুবর্ণে সম্পাদিত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে দুই শতের অধিক প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, আদিশূর যদি ভাস্করবর্ম্মার অথবা শাসনের মূলদাতা ভূতিবর্ম্মার পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন তবে তাঁহার যজ্ঞ করিবার জন্য সুদূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আমদানি করিবার কোন দরকার ছিল না। করতোয়ার পূর্ব্ব পারে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অনেক ছিলেন এবং পশ্চিম পারেও নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাব তখন ছিল না। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তখন যে ছিল না, এবং রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় যে পঞ্চগোত্রের কথা আছে ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্করের শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।" (৯ পৃঃ, টীকা ২)

ভাস্করবর্ম্মার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই বোধ হয় এই প্রথম বর্ম্মণ-বংশ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং শালস্তম্ভ নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শালস্তম্ভের উত্তরাধিকারীরাও আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত পাল-বংশের রাজাদিগের বংশপ্রশস্তিতে শালস্তম্ভকে বলা হইয়াছে "ম্লেচ্ছাধিপতি", এবং পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মপালকে বলা হইয়াছে নরক-ভগদত্তের বংশধর। নেপালের ৭৫৯ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ নামক রাজাকে "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গকোশলপতি" বলা হইয়াছে। এই হর্ষ সম্ভবতঃ শালস্তম্ভ-বংশীয় হর্ষবর্ম্মা (২৩ পৃঃ)। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দে উড়িষ্যায় ভৌম অর্থাৎ নরক-বংশীয় ক্ষেমঙ্করদেব, শিবকারদেব, শুভকরদেব এবং দ্বিতীয় শিবকরদেব নামক চারিজন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়।* ক্ষেমঙ্কর দেব বোধ হয় কামরূপরাজ ওড্রবিজয়ী হর্ষবর্ম্মার জ্ঞাতি এবং অনুচর ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উড়িষ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে গোপাল দেব কর্ত্তৃক গৌড়ে পরাক্রান্ত পাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তারপর কামরূপাধিপতিদিগের পক্ষে করতোয়া পার হইয়া গৌড় আক্রমণ বা দিগ্বিজয় সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে বোধ হয় গৌড়ের পালনরপালগণের অনুগত থাকিতে হইয়াছিল।

এই যে কয়টি বিষয় এই প্রস্তাবে আলোচিত হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে "কামরূপশাসনাবলী" ইতিহাসসেবকের হিসাবে অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। এই পুস্তক বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায় নবশক্তি সঞ্চারিত করিবে। আশা করি, অন্যান্য পণ্ডিতেরা পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মাতৃভাষার যোগে ইতিহাসের আকরগ্রন্থ সঙ্কলনে ব্রতী হইবেন।

* *Epigraphia Indica*, Vol. XV, pp. 1–6; R. D. Banerji, *History of Orissa*, Vol. I., p. 147.

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সেকালে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার বিশেষ সমাদর ছিল না। চৈতন্যের যুগে ও তাহার পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার যে কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাব ছিল সে-কথা অধিকাংশ লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত সাহিত্যে বা অন্য সমাজে বৈষ্ণব কবিতার চর্চ্চা হইত না। বাঙালী কবিদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঘরে ঘরে, দোকানে হাটে পঠিত হইত। বৈষ্ণব কবিতা শুনিতে পাওয়া যাইত কেবল সংকীর্ত্তনে, হরিবাসরে ও বৈষ্ণব সভায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কাব্য রচনায় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পঠিত ও গীত হইত, কিন্তু তাঁহার রচনা সংস্কৃত ভাষায় এবং ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত নয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে বাংলা সাহিত্যে আর এক যুগের আরম্ভ। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার কোন আভাস নাই। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে কাশীরাম দাস, কীর্ত্তিবাস (কৃত্তিবাসের রূপান্তরিত নাম), জয়দেব, কালিদাস ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব ব্যতীত আর কোন বৈষ্ণব কবির নাম করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে শিক্ষানবিশি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে; প্রথম প্রথম তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে কবিতা লিখিতেন। বৈষ্ণব কবিতা যে তিনি পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার রচিত দুই চারিটি গান হইতে বুঝিতে পারা যায়।

> ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ।
> কাঁহা মোরে কান্ত বরণ কাঁহা রাজবেশ॥

ইহা বৈষ্ণব কবিতার ব্রজবুলির অনুকরণ। বঙ্গদর্শনে বহুমুখী সাহিত্যের অবতারণা হয়। কাব্য ও সাহিত্য সমালোচনা বঙ্গদর্শনের একটি প্রধান অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক, তাঁহার তুল্য সমালোচক এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় আর কেহ হয় নাই। কিন্তু তিনি অথবা বঙ্গদর্শনের আর কোন লেখক কোন বৈষ্ণব কবির রচনা সমালোচন করেন নাই। তথাপি বঙ্গদর্শনে একজন প্রধান বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে সংশয় নিরাকৃত হইয়াছিল। বিদ্যাপতিকে সকলে বঙ্গবাসী বলিয়া জানিত, কোন কোন পুস্তকে তাঁহার উপাধি ভট্টাচার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রিয়ার্সনের সহায়তায় ও স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ও তাঁহার পদাবলী মৈথিল ভাষায় রচিত।

যে-বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন সে-কালে বটতলা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা আর কোথাও পাওয়া যাইত না। বটতলার ছাপা ভুলে ভরা, কিন্তু কেবল বটতলার প্রসাদে পদকল্পতরুর ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লুপ্ত হয় নাই। অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস নামধারী সকল কবি ও বিদ্যাপতির রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, অপর কোন বৈষ্ণব কবির পদাবলী সন্নিবেশিত হয় নাই। বঙ্গদর্শনের যুগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের মধ্যে কে মিল্টন, কে বায়রণ সেই কথার আলোচনা হইত। সমসাময়িক সকল শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির গ্রন্থাদি সমালোচিত হইত না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরচিত স্বপ্নপ্রয়াণের ন্যায় অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়াছিল এরূপ স্মরণ হয় না। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কোন কবিতা কখনও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় নাই, কেবল ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

বৈষ্ণব কবিতার যে শুধু সমাদর ছিল না এমন নহে তাচ্ছিল্য ভাবও লক্ষিত হইত। একজন খ্যাতনামা কবি,

ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মহাজন পদাবলী, রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি। ললিত লবঙ্গ লতা, গোস্বামী খুড়োর মাথা।" বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় গীতিকবিতা যে জগতে বিরল এ কথা কেহ মনে করিত না। বটতলার নিকৃষ্ট পুস্তকালয়ে, বৈষ্ণব ভিক্ষুকের কণ্ঠে ও ভাবুক ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণব কাব্য আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বাঙালী কবিদের মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার গূঢ় মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিশোর বয়সে, তাঁহার প্রতিভার উন্মেষের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বটতলার পুঁথি লইয়াই তিনি পদকল্পতরু পড়িতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন দত্ত "মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে" পাইয়া ইংরেজী রচনার "ভিক্ষাবৃত্তি" পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের জহুরি। তিনি চিনিয়াছিলেন খনির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি বৈষ্ণব কবিতা।

বৈষ্ণব কবিতা দুইটি স্বতন্ত্র ভাষায় রচিত। এক মৈথিল, দ্বিতীয় বাংলা। বিদ্যাপতির পূর্ব্বে মিথিলায় কেহ কখনও মৈথিল ভাষায় কিছু রচনা করেন নাই। মিথিলার পণ্ডিতেরা মৈথিল ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন; বাংলা দেশেও পণ্ডিতেরা "ভাষা"কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বিদ্যাপতি যেমন মিথিলার আদি কবি, চণ্ডীদাসও সেইরূপ বাংলার আদি কবি। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে দুই জন মিথিলাবাসী, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস ঝা, যাঁহাকে আমরা কবিরাজ গোবিন্দ দাস বলিয়া জানি। ইঁহাদের কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিল ভাষায় রচিত। লিপিকরের অজ্ঞতায় বিকৃত হইয়াছে। ইঁহাদের অনুকরণে মিশ্র ভাষায় যে-সকল পদ রচিত হইয়াছে তাহাই ব্রজবুলি।

গীতিকবিতার সকল শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মহাজন পদাবলীতে বিদ্যমান। ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গীতে, শব্দের কোমলতায়, ছন্দের তরলতায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, মর্ম্মবেদনার তীব্রতায়, হৃদয়ের আবেগে বৈষ্ণব কবিতার তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ গীতিকবিতায়। বৈষ্ণব কবিতা তিনি কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিরচিত ভানুসিংহের পদাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল কবিতা তাঁহার কিশোর বয়সের রচনা। বৈষ্ণব কাব্যযুগের পর কোন বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রজবুলির মধুমাখা ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার শৈশব ও কিশোর বয়সের রচনায় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়; কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব অনেক অধিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দমাধুর্য্য একমাত্র বৈষ্ণব কবিতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কালে তাঁহার প্রতিভা শতদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইয়া চারিদিকে পরিমল বিকীর্ণ করে। সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছিলেন জ্ঞানদাসও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। জ্ঞানদাসের বিরচিত পদের এক পংক্তি অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় স্থানলাভ করিয়াছে। জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন, "প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর"। রবীন্দ্রনাথের লেখা, "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।" ইহাতে কবির যশ ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং গৌরবান্বিত হয়।

বঙ্গদর্শনের যুগে বাঙালী কবিকে ইংরেজ কবির সহিত তুলনা করা হইত বলিয়াছি। আর একটা বিশ্বাস ছিল মহাকবি হইতে হইলে মহাকাব্য লিখিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করিতেন, সুকবি বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। সমবেত সভার মধ্যে নিজের কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া তরুণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে গীতিকবিতার অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন্ তোমার কাঁকন—
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ।

বাংলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বৈষ্ণব কবিতাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য উদ্ধৃত করি।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?

*   *   *

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি' কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার।

মহাকাব্য রচনা করা রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কি না জগতের সকল সাহিত্যে, সকল ভাষায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

শিল্পী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পাল

তোমরা মুছিয়া যাও একে একে রৌদ্র দিনগুলি
সাথে সাথে এঁকে যাও ঝিলিমিলি অনন্ত বিজুলী
মৃত্যুর তিমির নভে। শরতের প্রভাতের মত
তোমরা খসায়ে যাও শুভ্র মুগ্ধ পুষ্প শত শত
সাথে সাথে এঁকে দাও দুগ্ধ আলিপনা
মরণের শ্যামতৃণে। জীবনের যা কিছু বেদনা
সেথায় ফুটায়ে তোল জীবনের দীপ্ততম ছবি!
মরণের কেহ নহ তোমরা জীবন, শিল্পী, কবি।
আমরা হারাই শুধু। মুছে যাই ধুয়ে যাই সব
জীবনের রক্ত, নীল, শুভ্র, পীত, অনন্ত বৈভব
শিথিল মলিন হাতে। মরণের কণাগুলি লয়ে
আমরা গড়েছি হায় মরণের জয় যাত্রা বয়ে
জীবনের অঙ্কে অঙ্কে। জীবনেও মরণের ডোর
জড়ায়ে জড়ায়ে রচে রৌদ্রহীন কুহেলীর ঘোর।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১

শরতের প্রভাত। মৃদুস্নিগ্ধ বাতাসে রহিয়া রহিয়া শস্যসমৃদ্ধ প্রান্তরের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে।

বহু কণ্ঠের সমবেত গুঞ্জন।

নিরামিষ রন্ধনশালার প্রশস্ত বারান্দায় এক ঝলক রোদ আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নীলাকাশের নিজস্ব যে নির্ম্মল নীল আলো তাহা আজ কোনও দিকে কোনও বারণ মানিতেছে না।

ভিতরে মুগডাল সিদ্ধ হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার সুগন্ধ পল্লীলক্ষ্মীর অদৃশ্য অঞ্চল গন্ধের সঙ্গে মিশিতেছে। নিস্তার বড় বড় চারিটি ঝুড়ি হইতে তরকারী বাছিয়া নামাইতেছে। নিস্তার কৃশকায়া শ্যামাঙ্গী রূপসী। ক্ষেন্তি রূপসী নহে, চটুলা, তাহারও গায়ের বর্ণ শ্যাম, সে পরিপূর্ণদেহা। বাছা তরকারী-গুলিকে সে ভাগে ভাগে তিনটি বঁটির মুখে আগাইয়া দিতেছে। বেগুন, পেঁপে, বাঁধাকপি, শসা, ডাঁটা, লাউ-ডগা, জলপাই;—হালকা গভীর নানাস্তরের সবুজ, ফিকে এবং গাঢ় লাল, বেগুনী, হলদে, সাদা, নানারঙের কোটা তরকারী থাক্ থাক্ হইয়া ভাগে ভাগে জমিতেছে। বাবুদের জন্য এক ভাগ, কাছারীবাড়ির আমলাদের জন্য এক ভাগ, ঝি-চাকরদের জন্য এক ভাগ, এই তিন ভাগে রান্না, ইহার উপর রাধা-গোবিন্দজীর ভোগের এক ভাগ আছে। ভোর না হইতে সুরু হইয়াছে, এক প্রহর বেলা বহিয়া গেল, তবু বঁটি চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলিতেছে।

অন্যদিন ডাকহাঁক করিয়া কথা চলে, উপস্থিত অনুপস্থিত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোককে লইয়া সোৎসাহ আলোচনা। আজ মুখ চলিতেছে, কিন্তু গলা তেমন করিয়া খুলিতেছে না। শানবাঁধানো প্রকাণ্ড উঠান পার হইয়া [illegible] উপরের সমস্তগুলি জানালার সার্সি খড়খড়ি বন্ধ, তবু সকলেরই মুখেচোখে কেমন একটু সন্ত্রস্ত ভাব; এদিক্ ওদিক্ সচকিত চাওয়া-চাওয়ি, ইসারা-ইঙ্গিতের আদানপ্রদান চলিতেছে। বঁটি লইয়া যাহারা বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তোর-পিসি সেকেলে মানুষ; ক্ষেন্তি যখনই একটু বেসামাল হইবার উপক্রম করিতেছে, বৃদ্ধা তাহাকে চাপাগলায় শাসন করিয়া থামাইয়া দিতেছে। তারপর ক্ষেন্তিরই কথার ধুয়া ধরিয়া গলার স্বর যথাসম্ভব মৃদু করিয়া নিজেই বারবার বলিতেছে, "মুখে ঝাড় মার্‌তে হয় বৈকি, মুড়ো ঝাঁটা, মুড়ো ঝাঁটা, পোড়া কপাল আবাগীর—"

একরাশ তরকারির খোসা জমিয়াছিল। শ্রোত্রীদেরও ঔৎসুক্য অপেক্ষা উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া কালো কস্তাপাড় শাড়ীর আঁচলটি কোমরে জড়াইতে জড়াইতে ক্ষেন্তি উঠিয়া পড়িল। খোসাগুলিকে স্তূপাকার করিয়া চাপিয়া একটা বারকোসে উঠাইয়া লইয়া সেটাকে বাঁ হাতের তেলোয় চাপাইয়া সে অন্দরের দীঘির ওপারে গোয়ালঘরের দিকে চলিল। খিড়কির কাছে একটা কুকুর খাবারের থালা মনে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, সেটাকে লক্ষ্য করিয়া একটা লাথি ছুঁড়িয়া তারপর দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পশ্চিমের ঘাটে সরকারদের একটি বউ জল লইতে আসিয়াছে, ক্ষেন্তিকে দেখিয়া দু-হাত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইল। এ-গ্রামে ক্ষেন্তির সম্মানিত স্থান প্রায় কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর পরেই। ক্ষেন্তি দাঁড়াইল না, বউটির দিকে একবার মাত্র চাহিয়া "এত বেলা করে জল নিতে এসেছ কেন গা," বলিতে বলিতে দীঘির কোণ পার হইয়া গেল।

মূলতানী ও দো-আঁসলা মন্থর রোমন্থনরত গুটি ছয়েক গাই আর ছটফটে তেজীয়ান দুইটি ষাঁড় ঘরের দুই দিকে দুই সার করিয়া বাঁধা। এক কোণে বাঁশের তৈয়ারী খোঁয়াড়ের মধ্যে ছোটবড় নানা রঙের কতকগুলি বাছুরের

ভিড়। উদ্‌গ্রীব হইয়া সেগুলি বেড়ার উপর মাথা জাগাইয়া আছে। একটি খয়ের রঙের বাছুর বাহিরে; বংশীধর এক হাতে তার গলার দড়ি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছে এবং অপর হাতে গামছা নাড়িয়া ডাঁশ তাড়াইতেছে। দুই হাঁটুর মধ্যে বাল্‌তি চাপিয়া বসিয়া অপর্ত্ত কালো চাঁদকপালে গাইটাকে দুহিতেছে। বাছুরটা মাঝে মাঝে আচমকা দড়ি ছাড়াইবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইতেছে, বংশীধর নানা প্রকার আত্মীয়-সম্ভাষণে তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছে, কখনও বা কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাও করিতেছে। গাইটা হুম্ হুম্ শব্দে আপত্তি জানাইতেছে।

চাঁদকপালে গাইটাকে ক্ষেন্তি দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না। এই গাইটা দুধ দিত আর-সব গাই হইতে বেশী, কিন্তু ফাঁক পাইলেই তেঁতুল-তলার ছোট মাঠটি পার হইয়া ক্ষেন্তির বড় আদরের তরকারীর বাগানে গিয়া ঢুকিত, তারপর নির্দ্দয়ভাবে লাউমাচা ভাঙিয়া, কপির চারা মাড়াইয়া, ডাঁটা-ক্ষেত নির্ম্মূল করিয়া রাখিয়া আসিত। তদুপরি ক্ষেন্তিকে সে ভয় ত করিতই না, দেখিতে পাইলেই উন্টিয়া শিঙ বাগাইয়া গুঁতাইতে আসিত। তাই তরকারীর খোসা, বাড়তি ভাত, ভাতের ফেন প্রভৃতি উপরি খাবারগুলি অন্ততঃ ক্ষেন্তির হাতে চাঁদকপালীর চাঁদকপালে বড় একটা জুটিত না। আজ বারকোস-সুদ্ধ সমস্তগুলি সুখাদ্য তাহারই উৎসুক মুখের সম্মুখে ধপ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "শুনেছিস ?"

বংশীধর বাছুরটাকে টানিয়া লইয়া একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিল, অপর্ত্ত দুধ দোয়া না বন্ধ করিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "শুনলাম ত, কিন্তু কি ব্যাপার বল দেখিনি।"

ক্ষেন্তি বলিল, "সে কি আর এককথায় বলা যায় ? রাধাগোবিন্দজীর মনে যে এও ছিল কে জানত ?"

বংশীধর যে-হাতে গামছা নাড়িয়া ডাঁশ খেদাইতেছিল, সেই হাতে চট করিয়া একটা খালি বালতি উল্টাইয়া ক্ষেন্তির বসিবার ঠাঁই করিয়া দিল। আড়চোখে একবার বাহিরের দিকে দেখিয়া লইয়া ক্ষেন্তি কাপড়-চোপড় টানিয়া গুছাইয়া বসিল। কিন্তু যেই সে কথা সুরু করিতে যাইবে এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। আহারের সময় ক্ষেন্তির এত নিকট সান্নিধ্যে চাঁদকপালে গাইটার স্বস্থ বোধ না করিবার যথেষ্ট কারণ ত বিদ্যমান ছিলই, হঠাৎ ক্ষেন্তি অপর্ত্তের কানের কাছে মুখ লইয়া ঝুঁকিয়া বসিতেই সেটা মহা ভড়কাইয়া ঘাড় নীচু করিয়া ক্ষেন্তিকে ঢুঁ মারিতে গেল। বংশীধর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া যেই ক্ষেন্তিকে আড়াল করিতে যাইবে তাহার অসতর্ক হাত হইতে ছাড়া পাইয়া খয়ের রঙের বাছুরটা এক গোঁত্তায় অপর্ত্তের দুই হাঁটুর মধ্য হইতে দুধের বাল্‌তিটাকে উল্টাইয়া দিল। দুধে প্রায় স্নান করিয়া অপর্ত্ত উঠিয়া দাঁড়াইল; পাঁচ-ছ'সের দুধ, এখনই কোথাও হইতে জোগাড় না হইলে হয়ত রাধাগোবিন্দজীর ভোগ দেওয়াতেই বাধা ঘটিয়া যাইবে। খুব একটা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। অপর্ত্ত বলিল, "বাছুর ত নয়, নরপিচেশ। দেব না কি শালাকে এক ঘা ?" বলিয়া লাথি মারিতে পা উঠাইয়া চট্ করিয়া পা নামাইয়া লইল। মনে পড়িল, বাছুর হইলেও সে গরুরই জাত, দেবী ভগবতীর অংশ, দেবতা। কহিল, "দেখেছিস্ কি দশা হয়েছে আমার কাপড়টার, এ্যাঃ।"

ক্ষেন্তি কহিল, "দুধ যা নষ্ট করেছিস্ তাতে অমন দশ জোড়া কাপড় হয়, চুপ কর্ দেখি তুই।"

বকাবকি, চেঁচামেচি, পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ চলিতেছে, এমন সময় নিস্তার আসিয়া ক্ষেন্তিকে ডাক দিল। কহিল, "এতক্ষণ তোকে খুঁজতে পাইক-বরকন্দাজ বেরোল বোধ হয়। যা ওপরে, মা তোকে ডাকছেন।"

খালি বারকোসটা টান মারিয়া উঠাইয়া লইয়া শশব্যস্তে ক্ষেন্তি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। ভিতরের কাণ্ড দেখিয়া নিস্তার সেইখানে দাঁড়াইয়াই আর-এক পালা বকাবকি সুরু করিয়া দিল।

সরকার-বউ জল লইয়া কলসী-কাঁখে ফিরিয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রপ্লাবিত বাঁধা-ঘাটের কাছে তারিণী-খুড়ো হুঁকা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে ক্ষেন্তি, সত্যি ?"

ক্ষেন্তি না থামিয়াই বলিল, "দাঁড়াও বাপু, আমার এখন এত কথা বল্‌বার সময় নেই। মা কি জন্যে ডাকছেন দেখি আগে, তারপর যদি নিরালায় বাড়িতে এসো ত সব শুনবে এখন।"

তারিণীখুড়ো কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ-না একটা ব'লে যা না?"

ক্ষেন্তি যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া বলিল, "দেশ ছেড়ে ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না, মানে মানে ফিরে আসি আগে, তারপর শুনো।"

কিন্তু দেখা গেল, দেশ ছাড়িয়া যাওয়াই এখনকার মত তাহার ললাটের লিখন। গোবিন্দর-মা দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নামিয়া আসিতেছিল, ক্ষেন্তিকে দেখিবামাত্র বলিল, "এই যে ক্ষ্যান্ত, তোমাকে খুঁজে খুঁজে সব হায়রাণ। মার সঙ্গে কলকেতায় যাবে, শীগ্‌গির করে তৈরী হয়ে নাও গে।" তারপর ক্ষেন্তির কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "এ সংসারের অন্ন আর নয়, রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ পেয়ে নৌকোয় উঠবেন, ঠাকুরকে তাড়া দিতে যাচ্ছি।"

এমন যে ক্ষেন্তি সেও নীরবেই কপালে হাত ঠেকাইল, তারপর দ্বিরুক্তি না করিয়া ত্রস্তপদে সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

হেমবালার মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। ঠোঁটের কোণদুটা একটু শক্ত হইয়া আছে, তাও ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে ধরা শক্ত। একটিমাত্র খোলা জানলায় যে-রোদটুকু ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে সেটুকুকে পিঠে করিয়া একটা জলচৌকি লইয়া বসিয়া তিনি স্নানান্তে আর্দ্র চুলের রাশ শুকাইতেছিলেন। ক্ষেন্তি দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই চকিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "ভেতরে আয়।"

ক্ষেন্তি ভিতরে ঢুকিল মাত্রই; চৌকাঠের এপাশে কপাট ঘেঁষিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। হেমবালা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "তুই আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যেতে পার্‌বি ত ?"

ক্ষেন্তি কহিল, "কেন পারব না মা ? অবিশ্যি পারব। আপনার হুকুমের গোলাম। যেখানে যেতে বলবেন, যাব। সংসারে আমার আর কেই বা আছে, আপনার পা-দুটি আশ্রয় করেই বেঁচে আছি।"

হেমবালা আঙুল চালাইয়া ভিজা চুলের জট ভাঙিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তাহলে তোর জিনিষপত্র চট্‌ ক'রে সব গুছিয়ে নিগে যা। খাওয়া দাওয়া সেরেই নৌকোয় উঠব।"

ক্ষেন্তি পায়ের নখে পাথর-বাঁধানো মেঝে খুঁড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে অনভ্যস্ত মৃদু গলায় বলিতে লাগিল, "সেই কথাই ত বলছি মা, জিনিষপত্র কিই বা আমার আছে যে গোছাব ? দুটি বই কাপড় নেই। সেবারে কলকেতা থেকে ফিরে এসে সব ঝিদের একটা ক'রে কামিজ দিয়েছিলেন, সে ত কোন্‌কালে ছিঁড়ে গিয়েছে। শীত এসে পড়ল, একখানা গরম গায়ের-কাপড় নেই। হাজার হোক আমরা রাজবাড়ির ঝি চাকর, লোকের কাছে আমাদের মুখ রেখে চল্‌তে হয়ত মা ?"

হেমবালা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নে-নে, সে-সব কল্‌কাতায় গিয়ে হবে এখন। তুই যা ত, শীগ্‌গির ক'রে গিয়ে তৈরী হ।...আর দেখ, দেওয়ান্‌জীকে আগে একটু ডেকে দিয়ে যা।"

"আচ্ছা মা" বলিয়া ক্ষেন্তি বাহির হইয়া গেল।

পথে আবার তারিণীখুড়ো, গোবিন্দর-মা, মোক্ষদা, চাঁপা, নিস্তার, সরকারগিন্নি, মুক্তোর-পিসি। ক্ষেন্তি এবার আর তাহাদের হাত এড়াইবার কোনো চেষ্টাই করিল না। নীচে ভিতর-বারান্দার একপাশে সকলকে ডাকিয়া ভিড় জমাইয়া সবে বক্তৃতা সুরু করিবে এমন সময় উপরে সিঁড়ির মুখ হইতে হাঁক আসিল, "ক্ষ্যান্ত!"

আলগোছে সিঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "মা!"

"কি করছিস তুই ওখানে, যা শীগ্‌গির দেওয়ানজীর কাছে।"

"যাচ্ছি মা" বলিয়া ইসারায় অন্যদের কাছ হইতে ছুটি লইয়া ক্ষেন্তি এবার প্রায় ছুটিয়াই চলিয়া গেল।

কাছারীবাড়ির দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে ময়লা মসী-চিহ্নিত একটা ফরাসের উপরে স্তূপাকার খাতাপত্র লইয়া দেওয়ানজী বসিয়াছিলেন, ক্ষেন্তি আসিয়া একপাশে দাঁড়াইলে প্রথমে তাহার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর ক্রমান্বয়ে সে যে মানুষ, সে যে ক্ষেন্তি, সে যে রাণীমার খাস চাকরাণী এবং তাহার যে কিছু বক্তব্য থাকা সম্ভব এই উপলব্ধিগুলি রাশি রাশি ইজা-জের-



বধূবরণ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আদায়-ওয়াশীল-বকেয়া-বাকির কড়া পাহারা কাটাইয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিল। সহসা সচকিত হইয়া চোখ হইতে নিকেলের চশমাটি খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "কি ক্ষ্যান্ত ?"

ক্ষেন্তি বলিল, "রাণীমা কি বলতে চান, আপনি একবার আসুন।"

দেওয়ানজী বিপুল দেহভার লইয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া-পড়িলেন, ত্রস্তে চটিজুতায় পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে কহিলেন, "আমি যাচ্ছি যাচ্ছি, তুমি তাঁকে বলগে যাও।"

ভিতর-বারান্দার দিকের দরজার এপাশ হইতে দেওয়ানজী গলা খাঁকারী দিলে ওপাশ হইতে পরিষ্কার কণ্ঠে শোনা গেল, "আমার যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে ?"

"হাঁ মা, ব্যবস্থা সব করা হয়ে গিয়েছে। মাঝিরা কাল রাত্রেই রাণী-বজরা ধুয়ে মুছে ঠিক ক'রে রেখেছে, পাল-দুটো দু-এক্‌জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিল, সারিয়ে নিতে বলেছি, এতক্ষণ হয়ে গিয়ে থাকবে।"

হেমবালা কহিলেন, "বজরায় গেলে কাল রাত্রের আগে নাসিরগঞ্জে পৌছন যাবে না। আমি ভোরের ষ্টীমার ধরতে চাই, জমিদারী চালের চাইতে তাড়াতাড়ির চালটা আমার এখন বেশী দরকার।"

দেওয়ানজী একলা ঘরেই ঘামিয়া উঠিলেন, কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, "তাহলে কি করব মা ?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "সেও কি আমায় ব'লে দিতে হবে ? ঘাসি, ডিঙি, যাহোক একটা হলেই হবে, দু-একটা মাল্লা বেশী নিতে বলবেন।"

"আচ্ছা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি। খাওয়া-দাওয়ার পরেই কি বেরবেন ?"

"হাঁ, কিন্তু তার ত বেশী দেরী নেই ? আপনি নিজে তৈরী হয়ে নিয়েছেন ?"

"আমি ত তৈরীই, কেবল এই সদর খাজনার বাকী হিসাবটা বাবুকে বুঝিয়ে—"

"কল্‌কাতা থেকে ফিরে এসে বোঝাবেন।"

দেওয়ানজী নীরবে নতমস্তকে তাঁহার বিরল কেশে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিলেন। হেমবালা একটু পরে কহিলেন, "আমি উপরে যাচ্ছি, নৌকো এবং পাল্‌কির ব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমাকে খবর পাঠাবেন।"

এতক্ষণ হেমবালা অপরদের তাড়া দিয়াছেন, এবার মনে পড়িল, তাঁহার নিজেরই যাবার জোগাড় বিশেষ-কিছু এখনও করা হইয়া উঠে নাই। এ বাড়ি হইতে এক-কাপড়েই বাহির হইয়া যাইবেন, কাল সন্ধ্যা অবধি তাহাই ঠিক ছিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধতায় নিজের মনের সঙ্গে নূতন করিয়া তাঁহার বোঝাপড়া হইয়াছে। অনাবশ্যক রূঢ়তা-প্রকাশের দ্বারা নিজের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করা হইবে। মূল্যবান কিছুই লইবেন না, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা ব্যবহারের যাহা-কিছু সামগ্রী তাহা সঙ্গে লইতে কোনও দোষ নাই। তেইশ বৎসর আগে এ সংসারে যখন প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন শূন্যহাতে আসেন নাই ; তারপর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সংসারের কাছ হইতে গ্রাসাচ্ছাদন হিসাবে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের কর্ম্মনিষ্ঠায় কর্ম্মিষ্ঠতায় তাহার বহুগুণ মূল্য তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন ; আজ যখন স্বেচ্ছায় এই গৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবেন তখনই বা শূন্যহাতে তাঁহাকে কেন যাইতে হইবে ? লোক-জানাজানি যাহা হইবার তাহা হইবেই, কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার দেবোপম ভ্রাতার নিকট হইতে কথাটা যতদিন গোপন রাখা যায় রাখিবার চেষ্টা তিনি করিবেন, এ-সঙ্কল্পও তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার বয়স্থা কন্যা ঐন্দ্রিলা কলিকাতায় মামার কাছে থাকিয়া পড়াশোনা করে, মামী নাই, মেয়ের অভিভাবিকারূপে এখন কিছুদিন তাঁহারই সেখানে থাকা আবশ্যক, সেজন্যই তিনি আসিয়াছেন, কলিকাতায় ভাইকে এবং অন্যান্য সকলকে ইহাই তিনি বুঝিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন।

দূরে ঠাকুরদালানের পাশে আম্‌লকি গাছের নীচে খাস বৈঠকখানার বারান্দার কতকটা চোখে পড়িল। সবগুলি দরজা বন্ধ, মনে হইল সকাল হইতে বন্ধই আছে, চাকরবাকরদেরও কেহ সেদিক্ মাড়াইতেছে না। চকিতে চোখদুটাকে ফিরাইয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে শানবাঁধানো উঠান পার হইলেন। ঐন্দ্রিলা কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন ; ভোরে মায়ের ডাকে দরজা খুলিয়া দিয়া সেই

যে ফিরিয়া গিয়া নিজের বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া সে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, হেমবালা তাহাকে বাধা দেন নাই, কিন্তু তারপর মেয়ের কাছে একবারও আর তাঁহার যাওয়াও হয় নাই।

অন্দরের উঠান পার হইয়াই তাঁহার মনে হইল, উপরে তাঁহার শয়নঘরের পূবদিক্‌কার জানালাটা কে যেন বন্ধ করিয়া দিল। ভাবিলেন ঐন্দ্রিলা হইবে। কিন্তু সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে মন কেমন যেন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। যেন উপরে জুতার শব্দ অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। ভাবিলেন ফিরিয়া যাইবেন, এক মুহূর্ত্ত থামিলেনও, কিন্তু পরক্ষণেই মন স্থির করিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে এবং দৃঢ়পদে উপরে গিয়া উঠিলেন।

ভিতরে খাটের একপাশে চিরাভ্যস্ত স্থানটিতে নতমস্তকে নরেন্দ্রনারায়ণ বসিয়াছিলেন। হেমবালার বুকটা এক মুহূর্ত্ত দুর্‌দুর্ করিয়া উঠিল।

প্রশস্ত কক্ষের দূরতম কোণে মেহগনির বিশাল ড্রেসিং টেবিল। হেমবালা ছোট দেরাজ হইতে চাবির গোছা বাহির করিলেন। একদিক্‌কার দেরাজে কেশরচনার সরঞ্জাম, অপরদিকে নিজের এবং ঐন্দ্রিলার নানাপ্রকারের প্রসাধন-দ্রব্য; ব্রোচ দুল ইত্যাদি ছোটজাতীয় গহনা। নীচের দেরাজদুটিতে সর্ব্বদা ব্যবহারের কাপড়-চোপড়। এক এক করিয়া সেগুলি বাহির করিয়া একপাশে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

স্বামীর দিকে তিনি দৃক্‌পাত-মাত্র করেন নাই, নরেন্দ্রনারায়ণও বহুক্ষণ স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না। তারপর অকস্মাৎ এক সময় কম্পিতপদে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিলেন। হেমবালার অমনোযোগে বাধা পড়িল। পশ্চাৎ হইতে আয়নায় নরেন্দ্রের ছায়াপাত হইবামাত্র চকিতে নিজের মুখ তিনি নামাইয়া লইলেন। ফিরিয়া চাহিলেন না, কিন্তু তাঁহার জিনিস-গোছোনো বন্ধ হইয়া গেল।

নরেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি এই শেষবার তোমাকে বলতে এসেছি।"

হেমবালার ঠোঁটের কাছটা একটু কাঁপিয়া গেল। ঘরে ঢুকিবার সময় কিছু চিন্তা করিয়া আসেন নাই, এক মুহূর্ত্ত থামিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "বেশ, শেষবারই বল।"

"কিছুতেই কি আমার অপরাধের ক্ষমা নেই?"

"যে-সংসার থেকে তুমি আমাকে এনেছিলে সেখানে এ-ধরণের অপরাধ ক্ষমা করতে কেউ আমায় শেখায়নি।"

কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তিভরা নীরবতা, তারপর নরেন্দ্র আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "মেয়ের দিক্‌টাই না-হয় ভাব, আমাদের ঐ একমাত্র—"

হেমবালা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি যা কর্‌ছি, একমাত্র তার কথা ভেবেই কর্‌ছি। এখানকার আব-হাওয়া তার গায়ে কিছুতেই আমি আর লাগতে দিতে পারব না। নিজের কাছে কখনও তার মাথা হেঁট না হয় তাও অবশ্য আমি দেখব।"

নরেন্দ্র কেবল বলিলেন, "ও!" গভীর বেদনার ছায়ার সঙ্গে তাঁহার মুখে অস্ফুট করুণ একটু হাসি খেলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, তারপর হঠাৎ একসময় মুখ তুলিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যদি কথা দিই, জীবনে কখনও আর কোনো অপরাধ তোমার কাছে করব না?"

এবারে হেমবালা একটু হাসিলেন, তারপর কহিলেন, "তাতে লাভ হবে, কথা রাখতে না-পারার আরও একটা অপরাধ তোমার বাড়বে। কথা যে রাখতে পারে সে এমন অপরাধ করে না।"

নরেন্দ্র নতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন একথা সত্য। কথা যে রাখিতেই পারিবেন জোর করিয়া তাহা বলিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এ-জীবনে নিজেকে কতবার এ ধরণের কত কথা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি কথা রাখিতে পারেন নাই। তবু একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে কহিলেন, "যদি কথা রাখতে পারি, তুমি ফিরে আস্‌বে ব'লে যাও।"

হেমবালা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মেয়েমানুষ যখন যায়, ফেরবার পথ আর রেখে যায় না।"

কথাটা যুক্তির মত শুনাইল, কিন্তু কার্য্যকারণ-সম্পর্কের মধ্যে কোথায় কেমন যেন একটা অস্পষ্টতার শৈথিল্য রহিয়া গেল। অন্ততঃ বলিয়া হেমবালার মন খুশী হইল না।

চূড়ান্ত যুক্তি কিছু যেন আরও ছিল। নরেন্দ্রের গলা কাঁপিয়া গেল। বলিলেন, "কিন্তু ফিরে আস্‌বার কথা যদি কখনও তোমার মনে হয়, এ বাড়ির দরজা চিরদিন তোমার জন্যে খোলাই থাকবে।"

হেমবালা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কি বলিলেন তাহা শোনা গেল না।

"এই তাহলে শেষ ?"

"তুমি জান। আমি অনেক আগেই শেষ করেছি।"

"ঐন্দ্রিলা ?"

"সে আমার কাছেই থাকবে।"

"সে যদি আমাকে ক্ষমা করে ?"

"আমি বাধা দেব না, কিন্তু তার ওপর আমার শাসন যতদিন চল্‌বে, আমার কাছেই তাকে রাখব।"

"বাপকে দেখতে আসাও তার বারণ ?"

"আমি বারণই করব।"

নরেন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, ফিরিয়া গিয়া খাটের একদিক্‌টায় বসিলেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুমি জান এইখানটায় আমার জবরদস্তি চলে ?"

হেমবালা এবার চকিতে একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর কহিলেন, "জবরদস্তি আরও অনেক জায়গায় তোমার হয়ত চলে, কিন্তু খুব একটা লোক-জানা-জানি হলে তাতে তোমার কিছু লাভ হবে ? ইলু এখন অবধি কিছু জানে না, যখন জান্‌বে তোমার প্রতি ত'র প্রীতি কিছুমাত্র বাড়বে না।"

মুদ্রিতচক্ষে নরেন্দ্র দুই ভুরুর মাঝখানটা আঙুলে চাপিতে লাগিলেন। বলিবার বা শুনিবার আর কোনো কথাই অবশিষ্ট নাই। বাহির হইয়া যাইবার আগে নিত্যকার মত স্বাভাবিক গলা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে ?"

"দেওয়ানজীকে বলেছি, এতক্ষণ হয়ে গিয়ে থাক্‌বে।"

"টাকাকড়ি—"

"আমার হাতে যা আছে তাই যথেষ্ট। ইলুকে পড়াখরচ ব'লে কলকাতায় যা পাঠানো হত সেটা অবশ্য যাবে।"

"নাসিরগঞ্জ অবধি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব ?"

"দরকার হবে না।"

ধীরপদে নতমস্তকে নরেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। কঠিন পরীক্ষায় এত সহজে উত্তীর্ণ হইবেন, হেমবালা বুঝিতে পারেন নাই। মনে মনে অনেক কঠিন কথার মহড়া দিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমন করিয়া কিছু বলা হইল না বলিয়া কোথায় যেন একটু ক্ষোভও রহিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়াছিলেন, জিনিস গোছানোর কাজ অসমাপ্ত ফেলিয়া রাখিয়া ঐন্দ্রিলার সংবাদ লইতে প্রস্থান করিলেন।

নিজের ঘরে গোটা-দুই খোলা স্নুটকেসের সামনে মাদুরের উপর ঐন্দ্রিলা বসিয়াছিল। মায়ের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

ছুটির পর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ঐন্দ্রিলা চিরকালই অত্যন্ত দুঃখ পায়, কিন্তু কান্নাকাটি করা তাহার স্বভাবে নাই। নিজের কোনও দুর্ব্বলতাকে কোথাও প্রকাশ হইতে দিতে অতি শৈশব হইতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। আজ তাই তাহার অশ্রুপ্লাবিত চোখের দিকে চাহিয়া হেমবালার মনে হঠাৎ একটা বড়রকম দোলা লাগিল।…হেমবালার সহসা মনে পড়িল, মনে মনে এতদিন ঐন্দ্রিলাকে অকারণেই তিনি অপরিণতবুদ্ধি বালিকা কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন বাল্যের সীমা বহুকাল তার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালিকা বয়সেই কলিকাতায় মামার কাছে থাকিয়া সে পড়িতে গিয়াছিল। তাহাদের একমাত্র সন্তান বলিয়া, দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে পুত্রস্থানীয় করিয়া মানুষ করিবার এই ব্যবস্থাতে নরেন্দ্রনারায়ণ বাধা দেন নাই, উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর কখনও দুইবার, কখনও বা তিনবার দেশে পিতামাতার কাছে ঐন্দ্রিলা ছুটি কাটাইতে আসিয়াছে; স্বল্পস্থায়ী সেই মিলনোৎসবের দিনগুলিতে তাহার গভীরতর মনের কোনও পরিচয় লইবার সুযোগ হেমবালার হয় নাই। যে-বয়সে সে মায়ের কোল ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিল, মায়ের স্নেহান্ধ দৃষ্টিতে সেই বয়সটাই তাহার চিরন্তন হইয়া রহিয়া গিয়াছে। আজ ঐন্দ্রিলার চোখের দৃষ্টির মধ্যে তাকাইয়া হেমবালা হঠাৎ অনুভব করিলেন, কত বড় ভুল এতদিন তিনি করিয়াছেন। বুঝিলেন, এ আর বালিকা নহে, ইহার পরিণত মনের নিকট হইতে কোনও কথা লুকাইবার চেষ্টা করা

হয়ত বৃথা, হয়ত কেহ না বলিতেই সহজে সে সব বুঝিয়াছে।

বলিলেন, "তোর জিনিস গোছানো শেষ হয়ে গিয়েছে ইলু?"

"এই হয়ে গেল মা," বলিয়া ঐন্দ্রিলা পাট করা শাড়ী-জামাগুলি ক্ষিপ্রহস্তে স্যুট্‌কেসের মধ্যে ঠাসিয়া রাখিতে লাগিল। বাসন্তী-রঙের বেনারসীটি গত পূজায় তাহার বাবা তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেটিকে এক মুহূর্ত্ত কোলে লইয়া রহিল। এই কাশ্মীরী শালটি এবার জন্মদিনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পাওয়া, অন্যমনেই তাহার উপর সস্নেহে সে হাত বুলাইল। এই মুক্তার কণ্ঠী ম্যাট্রিকে বৃত্তি পাওয়ার পর পিতার পাঠানো পারিতোষিক। এই গোল্ডটিস্যুর শাড়ীটি সে যতবার পরে তাহার বাবা তাহাকে রাণী-মা বলিয়া ছাড়া সম্বোধন করেন না। এগুলিকে এতদিন যে স্নেহ-গর্ব্বিত আনন্দের চোখে সে দেখিয়াছে অতঃপর আর তাহা দেখিতে পাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে আবার ঐন্দ্রিলার চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ঠোঁটের কোণ-দুটা অবাধ্য হইয়া কাঁপিতে লাগিল, গলার কাছটা কিসে যেন চাপিয়া ধরিতেছে। হেমবালা দাঁড়াইয়াছিলেন, কন্যার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাহার জিনিস গোছানোতে সাহায্য করিবার ছলে নিজেও একটা স্যুট্‌কেস টানিয়া লইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। যেন কিছুই হয় নাই, এমনইভাবে কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, "হ্যাঁরে, কলকাতায় কি এখনই শীত প'ড়ে গিয়েছে?"

ঐন্দ্রিলা নিজেকে অনেকখানি সম্বরণ করিয়াছিল, মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

"পূজোর পরেও গরম থাকে?"

ঐন্দ্রিলা মাথা দুলাইয়া জানাইল, হ্যাঁ।

"কখন থেকে তা হ'লে শীত সুরু হয়?"

ঐন্দ্রিলা এ কথার কোনও জবাব দিল না। হেমবালা বলিলেন, "কথা বল্‌ছিস না কেন? কি হয়েছে তোর?"

একটা ঢোঁক গিলিয়া ঐন্দ্রিলা কষ্টে উচ্চারণ করিল, "কই কিছু ত হয়নি।"

"বীণা এখন আর কলেজে যায় না?"

"না।"

"মেয়েকে নিয়ে সময় পায় না বুঝি?"

"না।"

"কে মেয়েকে দেখে, ও নিজেই?"

"হুঁ, আয়াও আছে।"

"কি ব'লে ডাকে মেয়েটিকে? কতবার যে তুই বলেছিস্, কিন্তু কেমন ভুলে যাই।"

"মন্দিরা।"

"মন্দিরা, ঐটেই ওর আসল নাম ত নয়? ভাল নামটা যেন কি? অ—"

"অপর্ণা।"

"বীণা আবার কেন বিয়ে করে না? ওদের সমাজে ত বাধা নেই।"

"ঐন্দ্রিলা নীরব রহিল।

"তোর মামা ওর বিয়ের কথা কিছু বলেন না?"

"কখনও ত শুনিনি কিছু বল্‌তে।"

"ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কেউ আসে-টাসে? খোঁজ-খবর নেয়?"

"উঁহু।"

"বীণা যদি আবার বিয়ে করে, ওরা কেউ আপত্তি করবে না বোধ হয়?"

"ওরা কেন আপত্তি করতে যাবে?"

এমনই করিয়া ঐন্দ্রিলার স্যুট্‌কেস গোছানো শেষ হইতে হইতে অনেক কথাই হইল। শেষ অবধি ঐন্দ্রিলার মনের ভারটা অনেকটাই লঘু হইয়া গেল। তাহার কথার জড়তা কাটিয়া গেল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিজেও দুএকটা কথা সে বলিয়া ফেলিল। ইহাতে হেমবালা যতটা খুশী হইলেন সে নিজে তাহা হইতে কিছুমাত্র কম খুশী হইল না। কোনো জিনিস লইয়াই বাড়াবাড়ি করাটাকে সে আশৈশব অপছন্দ করে। আজ শেষ-অবধি অবাধ্য অশ্রুকে সে যে শাসন করিতে পারিল ইহাতে মনে মনে আরাম অনুভব না করিয়া পারিল না। হেমবালা কহিলেন, "আমি দেখছি ওদিকে কতদূর হ'ল, তুই চট ক'রে স্নানটা সেরে নে।"

ঐন্দ্রিলার স্নান শেষ না-হইতেই বড় বড় দুইটি রূপার

থালায় সারি সারি জয়পুরী বাটী ভরিয়া রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ আসিল। হেমবালা পায়সের বাটি হইতে দু-আঙুলের ডগায় করিয়া একটু পায়স লইয়া কপালের কাছে তুলিয়া জিভে ঠেকাইলেন, অসুখের ছল করিয়া কিছুই খাইলেন না। ঐন্দ্রিলাও আসনে আসিয়া বসিল মাত্রই, অন্ন তাহার গলায় বাধিয়া যাইতে লাগিল। শেষ অবধি সেও কিছুই প্রায় না-খাইয়া উঠিয়া-পড়িল। বাহিরের দেউড়িতে দেওয়ানজী অপেক্ষা করিতেছেন। জিনিসপত্র নদীর ঘাটে পাঠানো হইতেছে, ক্ষেন্তিও খাইয়া-দাইয়া তৈরী হইয়াছে। নীচে সিঁড়ির কাছে গ্রামের বর্ষীয়সী এবং অবিবাহিতা নারীদের ভিড়। উঠানের একপাশে দুইটি পাল্‌কি এবং একটি ডুলি অপেক্ষা করিতেছে। লাট্টু এবং লাটাই হাতে পাড়ার ছেলের দল সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছে। কেহ কেহ পাল্‌কির ভারা কাঁধে করিতে গিয়া বেহারাদের কাছে তাড়া খাইতেছে। অন্যেরা তাহাতে আমোদ পাইয়া হৈ-হৈ করিয়া উঠিতেছে।

ঐন্দ্রিলা নীচে নামিয়াই একবার চকিতের মত চারি-পাশটা দেখিয়া লইল। আর ত সময় নাই। প্রতি-বেশিনীরা তাহার মায়ের সিঁথিতে কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছে। পাল্‌কির মধ্যে বিছানা পাতা হইতেছে। হেমবালা ডাকিলেন, "ইলু, তোর কাতু-পিসিমাকে প্রণাম করেছিস্?"

জ্ঞাতিসম্পর্কে পিসি, খুড়ী, জ্যেঠী আরও কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন; সকলকে প্রণাম করিয়া, সম্পর্কে যাহারা ছোট তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল অবগুণ্ঠিতা হেমবালা একদল প্রতিবেশিনীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। লুকাইয়া ছুটিয়া গিয়া সে একবার উপরের সব-ক'টা ঘর দেখিয়া আসিল। নীচে নামিয়া অভ্যাগতদের কৌতুকদৃষ্টি বাঁচাইয়া একতলার ঘর-ক'টাও দেখিল। দ্রুতপদে উঠান অতিক্রম করিয়া কাছারীবাড়ির কাছাকাছি আসিতেই শুনিতে পাইল, পাল্‌কির খোলাদরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হেমবালা ডাকিতেছেন, "ইলু, কি কর্‌ছিস্ তুই?"

কলিকাতায় মামার সঙ্গে পরিচয় হইয়া অবধি ঐন্দ্রিলা রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে পারতপক্ষে যাইত না, আজ ঘটা করিয়া পূজা-দেউলের ভিত্তিগাত্রে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর ফিরিবার পথে নরেন্দ্রের বসিবার ঘরটায় একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া স্থিরপদে হেমবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাল্‌কি-দুটির দরজা খুলিল, বন্ধ হইল। ক্ষেন্তির ডুলির উপর মশারির কানাত পড়িল। বেহারারা পাল্‌কি ডুলি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইতেই স্ত্রীকণ্ঠে হুলুধ্বনি হইল, ছেলের দল কোলাহল করিয়া উঠিল।

এমন সময় আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকারে সমস্ত কোলাহলকে অতিক্রম করিয়া এক বৃদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত দেহে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্‌কির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল "রাণীমা গো, আমার ক্ষেতের এই আনাজ-ক'টি তোমায় নিতে হবে। আমি এই রোদ্দুরে তিনকোশ পথ হেঁটে এসেছি তোমার পায়ে নিবেদন ক'রে যাব ব'লে। তুমি 'না' বল্‌লে চলবে না।" বেহারারা থামিল না দেখিয়া সে আনাজের ঝুড়িটা উঠানে নামাইয়া রাখিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহারই পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "পায়ে পড়ি বাছা, পায়ে পড়ি। আমার এই আনাজ-ক'টি ওঁকে নিতে বল। মা আমার মুখ তুলে চেয়েছিল ব'লে আমার ছেলেটা সেবার কয়েদ হতে হতে ছাড়া পেল, আমি বড় সাধ ক'রে আমার জগদ্ধাত্রী মাকে দেব ব'লে নিয়ে এসেছি। সদরে শুন্‌লাম মা আমার রাজরাজত্ব ফেলে বনবাসে যাচ্ছেন, পড়ি কি মরি ছুটে এসেছি। আমাকে পায়ে ঠে'লে গেলে এ-জায়গা ছেড়ে নড়ব না, ধর্‌না দিয়ে প'ড়ে থাকব।" পাল্‌কি ততক্ষণ খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, বুড়ির শোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, স্বেদজলের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়া তাহার বিশীর্ণ গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই তাহাকে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে তিরস্কার করিল। অতঃপর সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া দুজন চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিতে যাইবে এমন সময় কাছারীবাড়ির ভিতর-

বারান্দা হইতে নরেন্দ্রনারায়ণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "না—না, ছেড়ে দে ওকে।" তারপর ত্বরিতে উঠানে নামিয়া আসিয়া কহিলেন, "ডুলিবেহারাদের থাম্‌তে বল, এ আনাজ নিয়ে যেতে হবে। তারপর এ তা'রা পথে ফেলে দিয়ে যাক্ বা আর-কিছু করুক সে তা'রা ভাববে।" চাকরদের একজন আনাজের ঝুড়িটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে খিড়কির দরজার দিকে ছুটিল। বুড়ী সেইখানেই নরেন্দ্রনারায়ণের পায়ের কাছে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "বাবা গো, দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমাকে রাজা করেছেন, আর কি আশীর্ব্বাদ তোমায় করব বাবা? আমি বড় সাধ ক'রে আমার ক্ষেতের পয়লা-প্রথম বেগুন যে-ক'টা পেয়েছি তুলে এনেছি। কলমী শাক, কুমড়ার-ফুল। লাউ একটা ছিল, বইতে পারব না বলে আর আনিনি। হ্যাঁ বাবা, তোমার জন্যে চারটি বেগুন ওরা তুলে রাখলে না?......"

নরেন্দ্রনারায়ণ ত্বরিত পদেই আবার উঠান অতিক্রম করিয়া কাছারীবাড়ির দরজা ঠেলিয়া ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বাড়ী হইতে নদীর ঘাট দেড়মাইল-টাক দূরে। খানিকটা পথ আসিয়া ঐন্দ্রিলা একবার পাল্‌কির দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই বিশেষ দেখিতে পাইল না। জেলেপাড়ার মধ্য দিয়া পাল্‌কি চলিতেছে, ঘরবাড়ী গাছপালার ভিড়ে পিছনের পথ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এক প্রৌঢ়া জেলেনী মলিন শতছিন্ন একখানি কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া বসিয়া আকসী-বাড়ি হাতে রোদে-ঝুলানো মাছ পাহারা দিতেছিল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া পথের পাশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পথের এক পাশে দুটি ছোট ছোট মেয়ে, পরনে গামছা, নাকে নোলক, একজনের কাঁখে প্রায় তার নিজেরই সমান ওজনের একটা উলঙ্গ ছেলে, ভয়কৌতুকভরা দৃষ্টি লইয়া গলাগলি জড়সড় তামাসা দেখিবার লোভে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাৎ হইতে কে-একজন চীৎকার করিয়া বলিল, গড় কর্, হতভাগীরা গড় কর্। মেয়ে দুটি থতমত খাইয়া কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, ততক্ষণে ঐন্দ্রিলার পাল্‌কি তাহাদের অতিক্রম করিয়া গেল।

নদীর ঘাটে আসিয়া পাল্‌কি নামিলে ঐন্দ্রিলা বাহির হইয়া প্রথমেই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ছোট মাঠটির ওপারে আম-জাম-কাঁটাল-জলপাই-লিচুগাছের নিবিড় যবনিকার উর্দ্ধে তাহাদের ভিতর মহলের দুতলার একটি দিক্ চোখে পড়িতেছে। শাদা চুণকামের উপর দুপুরের রোদ পড়িয়া জ্বলিতেছে, হঠাৎ চাহিলে চোখ ফিরাইয়া লইতে হয়, তবু আগ্রহভরা দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল। মা যখন ডাকিলেন তখন তাহার চমক ভাঙিল। তবু নৌকায় উঠিতে গিয়াও বারবার পশ্চাতে তাকাইল, পা ধুইতে অকারণেই ইচ্ছা করিয়া দেরি করিল; অবশেষে যখন উঠিল, অবাধ্য অশ্রু কিছুতেই আর বারণ মানিতেছে না। নিজের দুর্ব্বলতা পাছে কাহারও চোখে পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভার একটু লঘু হইলে অনুভব করিল, হেমবালা নীরবে আসিয়া পাশে বসিয়া তাহার গায়ে একটি হাত রাখিলেন। সে প্রাণপণে ক্রন্দনবেগ রোধ করিল, কিন্তু উঠিল না, মুখ তুলিয়া হেমবালার মুখের দিকে দেখিলও না। পাল তোলা হইতেছে, মাঝিমাল্লাদের কোলাহল। দেওয়ানজী চাকরবাকর লইয়া অপর একটি নৌকায় উঠিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। গম্ভীর গলায় মাঝিদের তিনি প্রতি পদে উপদেশ দিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেকটি কাজের সমালোচনা করিতেছেন। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অবহেলিত হইতেছে বলিয়া তাহারা মাঝে মাঝে তাড়া খাইতেছে। কিন্তু নিজেদের কাজ তাহারা দেওয়ানজী অপেক্ষা বেশী বোঝে, তাঁহার কোনও কোনও উপদেশ অমান্য না করিয়া তাহাদের উপায় নাই।

নীচে সহসা জলস্রোত অধীর উচ্ছ্বাসে কলকল করিয়া উঠিল। নৌকার মুখ ঘুরিয়া যাইতেছে, তীব্র গতিতে ঘুরিতেছে। ঠিক কতটা ঘুরিল ঐন্দ্রিলা অনুভব করিতে পারিল না, একবার মনে হইল মুখটা ঘুরিয়া ঠিক যেন

আবার আগেরই জায়গায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু থরথর গতিবেগের স্পন্দন সমস্ত দেহ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া সলিলস্পৃষ্ট স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে লাগিতেছে, নীচে নৌকার বাতায় প্রতিহত স্রোতোজলের একটানা কলকল শব্দ, অশ্রুভারাক্রান্ত মনের চিন্তায় নিস্পৃহতা, সমস্ত মিলিয়া ঐন্দ্রিলার চেতনার উপর একটি আর্দ্র করুণ তন্দ্রার যবনিকা রচনা করিয়া দিল।

যখন ঘুম ভাঙিল দেখিল হেমবালা একটা চাদর মুড়ি দিয়া বিছানার একপাশে জড়সড় হইয়া শুইয়া আছেন। বাহুর আড়ালে মুখটা ঢাকা পড়িয়াছে, তবু ঐন্দ্রিলার বোধ হইল তিনি জাগিয়া আছেন। মাকে ডাকিয়া সন্দেহের নিরসন করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। ধীরে ঝাপ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। আধখানা ঝাপকে আড় করিয়া বসাইয়া মাল্লাদের কৌতূহল-দৃষ্টি হইতে নিজেকে সে আড়াল করিল, তারপর সম্মুখে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

বাতাস পড়িয়া আসিয়াছে। পালে নামানো হয় নাই, কিন্তু দাঁড়ের টানে দমকে দমকে নৌকা অগ্রসর হইতেছে। দাঁড়ের ফলার আঘাতে আলোড়িত জলের আবর্ত্ত ঐন্দ্রিলার শূন্যতানিবদ্ধ অলস দৃষ্টির সম্মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। মনে মনে কখন সে একটি আবর্ত্তের সঙ্গে আর-একটির তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা সে জানে না। ক্রমে যেন সেই সূত্র ধরিয়াই চিন্তার আবর্ত্ত তাহার মনে ঘনাইয়া আসিল।

যাহা অপরিহার্য্য নির্বিরোধে তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লওয়াই তাহার চিরকালের স্বভাব ছিল, আজও সে তাহাই করিয়াছে। নচেৎ যদি ইচ্ছা করিত, বিরোধ করিয়া, গোল বাধাইয়া পিতাকে শেষ একবার দেখিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া আসা তাহার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু বিরোধ করিয়া অপ্রীতিকর অবস্থাটাকে আরও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা করে নাই। এই শেষ মুহূর্ত্তের অদর্শনের বেদনা কোনোদিন হয়ত সে ভুলিতে পারিবে না, কিন্তু এমন আরও কত বেদনাই ত তাহার হৃদয়ের গোপনে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, নিজ হাতে তাহাদের প্রতিকার-চেষ্টা কোনোদিন সে করে নাই। নিজেকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগে না। তাছাড়া পিতাকে দেখিতে বা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে কোনও বাধা আছে এমন কথা হেমবালা একবারও তাহাকে বলেন নাই। বিরোধ কাহার সঙ্গে সে করিবে? মায়ের ইচ্ছা মন দিয়া অনুভব করিয়া সে জানিয়াছে; বুঝিয়াছে, বাধা আছে, অতি দুস্তর বাধাই কিছু আছে। কেন বাধা, কিসের বাধা তাহা সে জানে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিতে কেন যেন তাহার ইচ্ছা হয় নাই। নিজের মনেও এ-রহস্যের সমাধানের চেষ্টা বেশীদূর অবধি সে করে নাই, অকারণেই তাঁহার অত্যন্ত ভয় ভয় করিয়াছে। সে কেবল ইহা বুঝিয়াছে, নরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং এবিষয়ে হেমবালার নির্দ্ধারণকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, গত দুই দিন তাঁহার পলাইয়া বেড়ানোর আর-কিছু অর্থ হয় না। একাকী পিতামাতার সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে কি করিবে?…শেষ মুহূর্ত্তে দৈবগতিকে পিতার সঙ্গে যে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যায় নাই ইহাতে তাহার খুশী হওয়া উচিত কি-না সে ভাবিতে লাগিল।

সহসা সম্মুখে একটি ছবি। একটি ধূসর বালুচর ঘেরিয়া নদীটি বাঁক ঘুরিয়া গিয়াছে। স্থির নীলজলের উপর চকিত ছায়া ফেলিয়া এক ঝাঁক গাঙচিল উড়িতেছে। যেন রূপালী আগুনের ফুল্‌কি। উপরে দিনের আলো ক্রমশঃ স্বর্ণময় হইয়া আসিতেছে। কেমন যেন করুণ ভারাতুর, যেন সোনার ভার বহিতে পারিতেছে না। দূরে তীরবনের ছায়ান্তরাল হইতে ঘুঘুর ডাক শোনা যাইতেছে। ঐন্দ্রিলা ছবি আঁকিত, সব-কিছু ভুলিয়া এই সৌন্দর্য্যের রসসমুদ্রে ক্রমে তাহার মন নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর গঞ্জের হাটে নৌকা ভিড়াইয়া আহারাদি করা হইল। পথে জেলে-নৌকা ধরিয়া মাছ আদায় হইয়াছিল, বুড়ির দেওয়া বেগুন, চালডাল সঙ্গে ছিল।— দেওয়ানজীর নৌকায় রান্না হইয়াছিল, ক্ষেন্তি দুজনের জন্যই খাবার আনিল। এবার স্বামীর সংসারের অন্ন ঠিক নয়, ক্ষেন্তিও অনেক সাধাসাধি করিল, তবু হেমবালা খাইতে

পারিলেন না। ঐন্দ্রিলার একটু ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল, নীরবে বসিয়া সামান্য-কিছু আহার করিল। আহারের পর মাঝিরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিল, গুয়াপান এবং এক ছিলিম তামাক খাইল, তারপর আর-এক ছিলিম খাইল। বাতাস একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, তাছাড়া গঞ্জের পাশেই বড় নদী, স্রোত কম, এবার দাঁড়ের টানের উপরই একমাত্র ভরসা। সমস্ত রাত আর বিশ্রাম মিলিবে না, সকলে প্রস্তুত হইয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় আঁটিয়া পরিয়া যে-যাহার স্থানে গেল। নৌকা বড় নদীতে পড়িবার মুখে গলুইয়ে জল দিয়া সকলে সমস্বরে বদর বদর করিয়া উঠিল।

পরের দিন ভোরে নাসিরগঞ্জ ষ্টীমারের ঘাট। দেওয়ানজীর নৌকা পিছনে পড়িয়াছিল, দণ্ডদুই অপেক্ষা করিবার পর তিনিও আসিয়া পড়িলেন। তখন তাড়াহুড়া করিয়া সকলে ডাঙায় উঠিল। ষ্টীমার আসিতে আর দেরী নাই, মাঝিরা যাত্রীদের কাছে খবর লইয়া জানিয়াছে, দূরে বহুক্ষণ আগেই ধোঁয়া দেখা গিয়াছে। ষ্টেশনের বারান্দার এক পাশে যেখানে মাঝিরা তাহাদের জিনিসপত্র স্তূপাকার করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে, সেখানে একটা স্যুট্‌কেসের উপর জায়গা করিয়া বসিতে গিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, একটু দূরে একটা লিচু গাছের নীচে ঘোড়ার লাগাম হাতে করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণের আর পথশ্রমের ক্লান্তি তাঁহার মুখে চোখে সুপরিস্ফুট। ঐন্দ্রিলাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহার দিকে চাহিতেছেন না, এই অভিমানটুকুর অধিকার তিনি ছাড়িতে পারেন নাই।

উদ্যত অশ্রু প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঐন্দ্রিলা তাঁহাকে প্রণাম করিল, নরেন্দ্র নীরবে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নরেন্দ্রের বলিবার মত কথা কিছুই ছিল না, পাছে অশ্রুর স্রোত বাধা না মানে এই ভয়ে ঐন্দ্রিলাও কোনো কথা কহিল না, নীরবে পিতার বুকের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমবালা আসিতে আসিতে সেদিকে একবারমাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রস্তপদে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন। ষ্টেশনঘর হইতে একটি মোড়া সংগ্রহ করিয়া সঙ্গের চাকরদের একজন তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটিয়া গেল। আর-একজন নরেন্দ্রের হাত হইতে সসম্ভ্রমে ঘোড়ার লাগামটা চাহিয়া লইল।

দেওয়ানজী পূর্ব্বেই নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। টিকিট করিয়া লিচুগাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পথে কি কি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, কলিকাতায় কতদিন থাকিবেন, হেমবালাদের পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া সেখানে আরও কি কি কাজ তাঁহার করিবার আছে, এই-সব বিষয়ে নরেন্দ্র তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জাহাজ আসিয়া পড়িল।

আবার হাঁকডাক হুল্লোড় তাড়াহুড়ার পালা। জাহাজ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না, চাকরবাকর ও মাঝি-মাল্লা মিলিয়া হাতাহাতি সব জিনিসপত্র উঠাইয়া ফেলিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ঐন্দ্রিলার সঙ্গে একটিও কথা কহেন নাই, বিদায়-মুহূর্ত্তেও কি কথা বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। "চিঠি লিখিও" এই চিরাভ্যস্ত কথাটি মুখের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া বাধিয়া গেল; কন্যার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলিবে কি-না পত্নীর সঙ্গে সে-বিষয়ে বোঝাপড়া করা হয় নাই। পিতাকে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঐন্দ্রিলার মাথাটার কেবলই দেরি হইতে লাগিল।

জাহাজের সিঁড়ি তুলিবার সময় হইয়াছে। সারেঙ দুতলার ছাতের পুল হইতে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া "পাসিন্দার"-দের তাড়াতাড়ি করিতে বলিতেছে।

ঐন্দ্রিলার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অবগুণ্ঠিতা হেমবালা জোড়াতক্তার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। দেওয়ানজী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের মন এই বিদায়কে একবারও শেষ বিদায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, তবু এই ক'দিনেই তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল। আজ তাঁহার এই বিরলভাষিণী কন্যার নিগূঢ়-তর বেদনা তাঁহার নিজের বেদনা হইতে বড় হইল। হেমবালার দিকে শেষ মুহূর্ত্তটিতে তিনি চাহিতে ভুলিলেন, কন্যাকে দুই হাতে করিয়া উঠাইলেন, বুকে টানিয়া নীরবে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হইল।

ক্ষেন্তির সঙ্গে ঐন্দ্রিলাও উঠিয়া পড়িয়াছে। নীচে কলঘরে টুর্‌বুর্‌বুং করিয়া সারেঙের ঘণ্টা বাজিতেছে। গম্ভীর সিটির শব্দের স্পন্দনে কাঠের ডেক থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ডেকের রেলিঙের উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া ঐন্দ্রিলা একদৃষ্টে পিতার দিকে চাহিয়া আছে।

অন্ধকার কেবিনটার মাঝখানে একাকী দাঁড়াইয়া সহসা হেমবালা উপলব্ধি করিলেন, এই শেষ! এ জীবনেই আর কখনও দেখা হইবে কি-না, কে জানে? চকিতের মত তাঁহার বিবাহিত-জীবনের বিগত তেইশটা বৎসর ছোটবড় সহস্র আনন্দবেদনা জয়-পরাজয় বিরহমিলনের স্মৃতি লইয়া তাঁহার মনের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া আসিল। নিজেকে লইয়া পলাইবার পথ একমুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হইল। দুইহাতে কেবিনের জানালা মেলিয়া ধরিয়া সাগ্রহ সোৎসুক দৃষ্টিকে তীরের দিকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, উদ্বেলিত অশ্রু আসিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিল

জাহাজ দ্রুতবেগে ঘুরিয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ

'পদ্মাবত' কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

বর্ত্তমান শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণায় কাব্য-নাটকের নায়িকাগুলির উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। আধুনিকেরা বলেন—ইহারা কাল্পনিক, ইতিহাসে তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; প্রাচীনেরা বলেন, ইহারা খাঁটি ঐতিহাসিক—কল্পনাপ্রসূত নহেন। ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "পদ্মিনী-উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আমি পদ্মিনী-উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রায়-মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, 'পদ্মাবত' একখানা ঐতিহাসিক কাব্য; পদ্মিনী, গোরা, বাদল, ডুলী-বেহারা, আলাউদ্দীনের কারাগার সবই ঐতিহাসিক। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলির পুনরায় বিচার করা প্রয়োজন। নিখিলবাবু কবি আলাওলের "পদ্যাবতি পুথি" অবলম্বন করিয়া মূল হিন্দী পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি "পদ্মাবতের" কোন হিন্দী সংস্করণ পড়িয়াছেন কি-না, প্রবন্ধ পাঠে বুঝা যায় না। তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশে মূল ও অনুবাদে যে ভুলগুলি দেখা যায়, রামচন্দ্র শুকুল সম্পাদিত ও নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত 'পদ্মাবতে'র (জ্যায়সী গ্রন্থাবলী) সাহায্যে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ, নিখিলবাবু বর্ত্তমান সময়ে রাজপুত ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার 'রাজপুতানেকা ইতিহাসে'র উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি শুধু টডের রাজস্থান, তারিখ-ই-ফিরিশতা, এবং পাথরে লেখা কল্পিত ঘটনা পূর্ণ 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যের সাহায্যে "পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা"র কথা লিখিয়াছেন। পদ্মিনী-উপাখ্যান-সম্পর্কে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তাহাও আমরা গৌরীশঙ্করজীর গবেষণামূলক হিন্দী ইতিহাস অবলম্বনে আলোচনা করিব। কোন অর্ব্বাচীন লেখকের কলমের এক খোঁচায় পদ্মিনীর মত নায়িকা ইতিহাস হইতে সরিয়া পড়িবেন, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। এ-সম্বন্ধে যত বিচার হয় ততই ভাল।

"পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধে নিখিলবাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন, পদ্মাবত ঐতিহাসিক কাব্য বটে কেন-না ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তি ও স্থান

লইয়াই লিখিত (পৃ. ৮১১)। উক্ত সংজ্ঞানুসারে কাব্য, উপন্যাস, কিংবা নাটকের 'ঐতিহাসিকতা' স্থির করিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা ক্ষীরোদ-বাবুর অধিকাংশ পুস্তককে 'ঐতিহাসিক' বলিয়া মানিয়া লইতে হয় না কি? ইতিহাসের নায়িকার অভাবই কবি এবং উপন্যাস-লেখক পূরণ করিয়া থাকেন। তবে কি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিংবা কাব্যের এ নায়িকাগুলিকে ঐতিহাসিক 'ফাউ' হিসাবে গ্রহণ করিবেন?

নিতান্ত সমসাময়িক না হইলে কোন কাব্যকে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা বড়ই বিপজ্জনক। মারাঠী 'শিবভারত'; সংস্কৃত 'রামচরিতম্', 'পৃথ্বিরাজ দিগ্বিজয়ম্', হিন্দী' সুজান-চরিত'(জাঠরাজা সুরজ মলের জীবনচরিত), 'রাজবিলাস' ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাব্য—কেন-না এগুলি দরবারী কবিরা রাজার আদেশে লিখিয়াছিলেন—চাটুবাদ-গুলি বাদ দিলে এইগুলি হইতে সত্য ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে। ঘটনার বহু বর্ষ পরে রচিত 'পদ্মাবতের' মত দার্শনিক allegory-র কথা দূরে থাকুক, সমসাময়িক কবির বংশধরেরা লিখিয়াছেন, এমন প্রামাণ্য 'পৃথ্বিরাজ-রাসো' হইতে ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। মেবার-পতি সমরসিংহ বীর পৃথ্বিরাজের ভগিনী পৃথা বাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর সহিত তিরোরীর দ্বিতীয় যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন—ইহা 'পৃথ্বিরাজ-রাসোর' প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং মহারাণা রাজসিংহের সময় রচিত 'রাজপ্রশস্তি'* কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। অথচ অজমের-চৌহানবংশে তিন জন পৃথ্বিরাজ ছিলেন; কোন্ পৃথ্বিরাজের ভগিনীকে সমরসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন? শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক রাজা ছিলেন সামন্ত সিংহ, সমরসিংহ নহেন। মেবার-রাজ রাজর্ষি সমরসিংহ ছিলেন পদ্মাবতের নায়ক রতনসিংহের পিতা। সমরসিংহের রাজত্বে একটি শিলালিপি চিতোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার দ্বারা প্রমাণ হয়, সমরসিংহ অন্ততঃ বি. সং ১৩৫৮, * অর্থাৎ ১৩০২ ইংরেজীর জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তিরোরীর যুদ্ধে সমরসিংহের মৃত্যু কেমন করিয়া সম্ভব? ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সমসাময়িক ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন কাব্যের নায়ক, বিশেষতঃ নায়িকাদিগকে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এইবার আমরা "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধের কয়েকটি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিব।

পদ্মাবতের রচনাকাল

নিখিলবাবু 'পদ্মাবতে'র রচনাকাল সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন এবং গ্রিয়ার্‌সন্ সাহেবের মত-সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য এক অদ্ভুত 'থিওরী' খাড়া করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৯২৭ হিজরীতে কাব্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন ৯৪৭ হিজরীতে বোধ হয় গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল। হিন্দী কাব্যের মুখবন্ধে "রাজস্তুতি" একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাব্য আরম্ভের সময় যিনি রাজা থাকেন তাঁহার যশই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহার সিংহাসনে বসিবার বৎসরেই কাব্য সমাপ্ত হইল তাঁহাকেই কাব্যে বন্দনা করা হইয়াছে,—প্রবন্ধ-লেখক এমন আর একটি উদাহরণ হিন্দী কাব্যে দেখাইতে পারেন কি? তাঁহার উদ্ধৃত হিন্দী দোঁহার শেষ চরণ "কথা-আরম্ভ যেন কবি কহে" বাংলা না হিন্দী? নাগরী-প্রচারিণী-সভা পদ্মাবতের অনেক পুথির সাহায্যে এই কাব্য সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে ৯৪৭ হিজরীতে কাব্য আরম্ভ করা হইয়াছিল :—

সন নব সৈ সৈঁতালিস অহা।
কথা-আরম্ভ বৈন কবি কহা॥
সিংঘল দীপ পদমিনী রাণী।
রতন সেন চিতউর গঢ় আনী॥
অলউদীন দেহলী সুলতানু।
রাঘৌ চেতন কীহ্ন বখানু॥
সুনা সাহি গঢ় ছেঁকা আই।
হিন্দু-তুরুকহু ভই লরাই॥
আদি অন্ত জস গাথা অহৈ।
লিখি ভাখা চোপাই কহৈ॥

---

* "ততঃ সমর সিংহাখ্যঃ পৃথ্বীরাজস্য ভূপতেঃ।
পৃথাখ্যায়া ভগিন্যাস্তু পতিরিত্যাতিহার্দতঃ॥
ভাষারাসা পুস্তকেস্য যুদ্ধস্যোক্তোস্তি বিস্তরঃ॥
রাজপ্রশস্তি, সর্গ ৩)

* ওঝা-কৃত 'রাজপুতানেকা ইতিহাস,' ২য় ভাগ, পৃ. ৪৫০-৪৫৮।

সন ৯৪৭ হিজরীতে কবি কথা-আরম্ভের "বাণী" (foreword) লিখিয়াছেন। সিংহল-দ্বীপের পদ্মিনী রাণীকে রতন সেন চিতোর-গড়ে আনিয়াছিলেন। রাঘবচেতন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মিনীর রূপের বাখান করাতে শাহ গড় আক্রমণ করিতে আসিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধ হইল। আন্তন্ত "গাথা" বা কাহিনীর ন্যায় "ভাষা" [হিন্দী ভাষা]তে চৌপদী ছন্দে কবি বলিতেছেন।

মালিক মহম্মদ জ্যায়সী শের শা'র যে প্রশংসা করিয়াছেন উহা আব্বাস সরবানী-কৃত 'তারিখ-ই শেরশাহী' (আকবরের রাজত্বকালে লিখিত) গ্রন্থে উক্ত সম্রাটের গুণাবলী বর্ণনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। অথচ 'পদ্মাবত' 'তারিখ-ই-শেরশাহী'র অনেক পূর্ব্বে লিখিত। এই হিসাবে এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ৯২৭ হিজরীতে (১৫২০ খৃঃ) কাব্য আরম্ভ করিলে জ্যায়সী ইব্রাহিম লোদীর প্রশংসা করিতেন— অজ্ঞাতনামা ফরিদের খ্যাতি তখনও গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে নাই। সে-কালে গ্রন্থকারগণ নিজেদের পুস্তকের ভূমিকা আজকালকার লেখকদের মত সকলের শেষে লিখিতেন না। শ্রীহরি কিংবা বিসমিল্লা লেখার মত দেবস্তুতি, রসুল-বন্দনা ও চারি খলিফার গুণবর্ণন, রাজ-প্রশংসা ইত্যাদি গ্রন্থারম্ভে না লেখা অশুভ বিবেচিত হইত। নিম্নলিখিত দোঁহা হইতে বুঝা যায় তিনি শের শা'র কার্য্য ও চরিত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

সের সাহি দেহলী সুলতানূ।
চারিউ খণ্ড তপা জস ভানূ॥
ওহী ছাজ ছাত ঔ পাটা।
সব রাজৈ ধরা লিলাটা॥
জাতি সুর ঔ খাঁড়ে সুরা।
ঔ বুধিবন্ত সবৈ গুন পুরা॥
... ...

অদল কহৌঁ পুহুমী জস হোই।
চাঁটা চলত ন দুখবৈ কোই॥
নৌসেরবাঁ জো আদিল কহা।
সাহি আদল সরি সৌউ ন অহা॥
অদল জো কীন্হ উমর কে নাই।
ভই 'অহা' সকল দুনিয়াই॥
পরী নাথ কোই ছুবৈ না পারা।
মারগ মানুষ সোন উছারা॥
গউ সিংহ রেগহি এক বাটা।
দুনৌহি পানি পিয় এক ঘাটা॥
নীর খীর ছানৈ দরবারা।
দুধ পানি সব করৈ নিরারা॥
ধরম নিয়াউ চলৈ, সত ভাখা।
দুবর বলী এক সম রাখা॥
... ...
পুনি দাতার দই জগ কীন্হা।
অস জগ দান ন কাহু দীন্হা॥
বলি বিক্রম দানী বড় কহে।
হাতিম করন তিয়াগী অহে॥
সের সাহি সরি পুজ ন কোউ
সমুদ্র সুমের ভণ্ডারী দোউ॥
... ...

এস দাঁনি জগ উপজা সেরসাহি সুলতান।
না অস ভয়েউ ন হোইহি না কোই দেই অস দান।
(পৃ. ৪-৬)

—দিল্লীশ্বর শের শাহ সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপে চারিদিক তাপিত করিতেছেন। রাজছত্র ও পাট তাঁহারই শোভা পায়। সমস্ত রাজারা তাঁহার কাছে আভূমি নত-ললাট। জাতিতে তিনি সুর এবং তাঁহার তরবারি ও শূরোচিত (পরাক্রমী)। তিনি ধীমান; সমস্ত গুণ পূর্ণভাবে তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে।...এইরূপ আদিল, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ রাজা পৃথিবীতে কোথায়? তাঁহার রাজ্যে পিপীলিকাকেও কেহ দুঃখ দিতে সাহসী হয় না। খসরু "আদিল" (ন্যায়পরায়ণ) বলিয়া পরিচিত হইলেও ন্যায়নিষ্ঠায় তিনিও শের শার সমকক্ষ নহেন। তিনি খলিফা ওমরের তুল্য ন্যায়বিচার করেন। সারা দুনিয়ায় তাঁহার "বাহবা" (প্রশংসা) হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের নাকের নথ ছুঁইতে (অর্থাৎ গায়ে হাত দিতে) কিংবা রাস্তায় সোনা ছড়াইয়া রাখিলেও কাহারও উঠাইবার সাধ্য নাই। গরু ও সিংহ এক রাস্তায় ধূলি উড়াইয়া চলে; একঘাটে জল খায়। তাঁহার দরবারীরা দুধ হইতে জল আলাদা (অতি সূক্ষ্মভাবে সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ) করিতে পারে। তিনি ধর্ম্মপথগামী এবং প্রিয়ভাষী; তিনি সবল দুর্ব্বলকে সমানভাবে (শাসনে) রাখিয়াছেন।... তিনি দাতা; জগতে তাঁহার ন্যায় দান কেহ দেয় নাই। বলিরাজ ও বিক্রমাদিত্য বড় দানী ছিলেন

বলিয়া লোকে বলে। হাতিম তাই (আরব দেশের) এবং কর্ণও ত্যাগী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শের শার সমান কেহ নয়; সমুদ্র ও সুমেরু তাঁহার ভাণ্ডার। ...জগতে এমন দানী সুলতান শের শাহ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার তুল্য কেহ হয় নাই এবং হইবে না, এবং এমন দানও কেহ দিবে না।"

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কবি শের শার রাজত্বে তাঁহার 'পদ্মাবত' রচনা আরম্ভ * করিয়াছিলেন—ইহার বিশ বৎসর পূর্ব্বে নয়।

পদ্মাবতী পুঁথির শ্রীজা ব্রাহ্মণ

শ্রীজা নামক ব্রাহ্মণের কোন উল্লেখ জ্যায়সীর পদ্মাবতে নাই। সুলতান আলাউদ্দীনের পত্র লইয়া সরজা নামে এক বীরপুরুষ চিতোরে গিয়াছিলেন। মূল পদ্মাবতে আছে—

সরজা বীরপুরুষ বরিয়ারু।
তাজন নাগ সিংহ অসবারু॥
দীহ্ন পত্র লিখি, বেগি চলাবা।
চিতউর-গঢ় রাজা পহঁ আবা॥ (পৃ. ২৪১)

বীরপুরুষের অগ্রণী সরজা সিংহের উপর চড়িলেন। তাঁহার হাতে সাপের চাবুক। তাঁহার হাতে পত্র দিয়া সুলতান আদেশ করিলেন যেন দ্রুত চলিয়া চিতোর-গড়ের রাজার কাছে পৌছে।

সরজা যে তুর্ক, অর্থাৎ মুসলমান, ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত দোঁহাতে পাওয়া যায়। রাজা রতন সেন দূতের ঘৃণ্য প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

তুরুক! জাই কহু মরে না ধাই।
হোইহি ইসকন্দর কে নাই॥
(পৃ. ২৪৩)

আলাউদ্দীন চিতোর অবরোধ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় সরজাকে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া রাজা রতনসেনের কাছে পাঠাইলেন। সরজা সিংহে চড়িয়া আবার রতনসেনের কাছে গেলেন।

"সরজা পলটি সিংহ চঢ়ি গাজা।
অজ্ঞা যহই কহো জঁহ রাজা॥
(পৃ. ২৬৪)

রতনসিংহকে উদ্ধার করিয়া বাদল চিতোর যাইতেছেন। গোরা মুসলমান সেনাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়ায় তুর্কী বীরগণ যুদ্ধে নামিলেন। কবি লিখিতেছেন—

"সরজা বীর সিংঘ চঢ়ি গাজা।
আই সৌহ গোরা সৌ বাজা॥
পহলবান সো বখানা বলী।
মদদ মীর হমজা ও অলী॥
লঁধউর ধরা দেব জস আদী।
ঔর কো বর বাঁধৈ কো বাদী?
মদদ অয়ুব সীস চঢ়ি কোপে।
মহা মাল জেই নাঁব অলোপে॥
ঔ তায়া সালার সো আএ
জেই কৌরব পাণ্ডব পিড পাএ॥ (পৃ. ৩২২)

বীর সরজা সিংহে চড়িয়া শপথ গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গোরার দিকে চলিলেন। তিনি বিখ্যাত পালোয়ান বীর—তাঁহার উপর মীর হামজা ও আলীর বর (মদদ) ছিল। তিনি পূর্ব্বে লঁধউরের ন্যায় রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন। আর কে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার শক্তি রাখে? তাঁহার সাহায্যার্থ আয়ুবও গর্ব্বিতভাবে যুদ্ধে চলিলেন। তিনি (আয়ুব) 'মহামালে'র নাম লোপ করিয়াছিলেন।

কৌরব-পাণ্ডবের ন্যায় (অর্থাৎ দুর্য্যোধনের ন্যায়) অভিমানী (পিড়=ফার্সি 'পিন্দার' শব্দের ঠেট্ হিন্দী অপভ্রংশ) তায়া সালারও (Salar of Tai tribe) আসরে নামিলেন। আমীর খসরু হইতে ফিরিশ্তা পর্য্যন্ত বরাঙ্গলের (Warangal) রাজার নাম Laddar Deo লেখা হইয়াছে। ইহা রুদ্রদেব নামের অপভ্রংশ। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে পরাজিত করেন। ইতিহাসে আলাউদ্দীনের সেনাপতিদের মধ্যে সরজা, আয়ুব কিংবা সালার তায়া নাম দেখা যায় না। ইতিহাসের মালিক কাফুরই উদ্ভট কবি-কল্পনায় সিংহের উপর সওয়ার, হাতে সাপের চাবুক বীর সরজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লা বাংলা পদ্মাবতী পুঁথির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য হিন্দী, উর্দ্দু, ও আরবী অক্ষরে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকাংশ পুঁথিতে ৯৪৭ হিজরী কাব্যারম্ভের তারিখ দেওয়া আছে।

গোরা ও "বাদিলা"

কবি আলাওলের বটতলার ছাপা 'পদ্মাবতী পুথি' আগাগোড়া পড়িলেও নিখিলবাবু 'বাদিলা'র পরিবর্ত্তে বাদল লিখিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পদ্মাবতীতে তাঁহারা দুই ভ্রাতা" (প্রবাসী, পৃ. ৮১৭)। জ্যায়সীর পদ্মাবতে গোরা বদলকে দুই ভাই কিংবা খুড়ো-ভাইপো (যেমন টড্ লিখিয়াছেন) বলা হয় নাই। কবি বলিতেছেন—

> "গোরা বাদল রাজা পাহঁা।
> রাবত দুবৌ দুবৌ জনু বাহঁা॥

রাজার কাছে গোরা ও বাদল ছিলেন। তাঁহারা দু-জনই "রাবত" (সামন্ত), এবং উভয়েই রাজার ডান হাত বাঁ-হাত।

গোরা ও বাদল রাজাকে আলাউদ্দীনের কারাগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া চিতোর যাইতেছেন। পথিমধ্যে মুসলমান-সেনাকর্ত্তৃক তাঁহারা আক্রান্ত হইলেন। যুদ্ধ ও মৃত্যু অনিবার্য্য দেখিয়া গোরা বাদলকে বলিতেছেন—

> তব অগমন হোই গোরা মিলা।
> তুই রাজহু লেই চলু বাদ্‌লা।
> পিতা মরৈ জো সঁকরে সাথা।
> মীচু ন দেই পুতকে মাথা॥

বাদ্‌লা! তুই রাজাকে নিয়ে যা। সঙ্কট-সময়ে বাপ বৃথা ছেলের মাথা কাটায় না।

সুতরাং জ্যায়সীর মূল পুস্তকে গোরা-বাদলের পিতা-পুত্র সম্বন্ধই পাওয়া যায়। জ্যায়সীর পদ্মাবতের ভূমিকায় সম্পাদক রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় বাদলকে গোরার পুত্রই বলিয়াছেন (পৃ. ২৩)।

তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা

মহম্মদ আবুল কাসেম ফিরিশ্‌তা দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-দরবারের আশ্রিত ঐতিহাসিক। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। ফিরিশ্‌তা অনেক দেশ বেড়াইয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি যেখানে যাহার কাছে কিছু শুনিতেন, বিনা-বিচারে নিজের পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। এগুলি অধিকাংশই প্রমাণহীন মিথ্যাগুজব, কিংবা কাল্পনিক কাহিনী। জ্ঞানের প্রসার কম থাকায় তিনি ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করিতে না পারিয়া নিজের পুস্তকে এমন অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন যাহার জন্য প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই তাঁহার ভাগ্যে বেশী মিলিয়াছে। যাঁহারা মুসলমান-যুগের ইতিহাসের আধুনিক গবেষণার সহিত সাধারণভাবেও পরিচিত, তাঁহারাই জানেন, অধিকাংশ স্থলে ফিরিশ্‌তার নাম উল্লেখ করা হয়—তাঁহার ভুল সংশোধনের জন্য। ফিরিশ্‌তাকে অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাপ্ত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের ইতিহাস হিসাবে ফিরিশ্‌তার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য নাই। হিন্দুস্থানের কথা দূরে থাক্, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেরও তিনি সঠিক খবর রাখিতেন না; মিথ্যা জনশ্রুতিগুলিকে প্রামাণ্য ইতিহাসের ছাপ দিয়া তিনি অনেক ঐতিহাসিককে ফাঁপরে ফেলিয়াছেন। বাহ্‌মনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ফিরিশ্‌তার মাহাত্ম্যেই ব্রাহ্মণ গঙ্গুর ভৃত্য বলিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পরিচিত ছিলেন। (Briggs, vol. II, pp. 284-285.)

মেবারের রাজা রতনসেন সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তা যাহা লিখিয়াছেন তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এক্ষণে বিচার করা প্রয়োজন। ৭০৩ হিজরীতে আলাউদ্দীনের চিতোর-জয়-সম্পর্কে ফিরিশ্‌তা মেবারের কোন রাজার নাম করেন নাই, কিংবা সুলতান রাজা রতনসিংহকে বন্দী করিয়া দিল্লী আনিয়াছিলেন এ-কথাও লেখেন নাই। (Brigg's Ferishta, i. 353.) কিন্তু ৭০৪ হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি ডুলীর গল্প ও রত্নসিংহের পলায়নের কথা যোগ করিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছেন, অথচ কখন এবং কি ভাবে রত্নসিংহ বন্দী হইলেন, এ-কথা ফিরিশ্‌তা লেখেন নাই। নিম্নলিখিত কারণে ফিরিশ্‌তার গল্প অবিশ্বাস্য :—

১। প্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু চিতোর-অবরোধের সময় আলাউদ্দীনের সঙ্গে বরাবর ছিলেন। তিনি রত্নসেন, পদ্মিনী, গোরা, বাদল কাহারও নাম শোনেন নাই। স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া যে এই যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও তিনি লেখেন নাই।

২। ফিরিশ্‌তার ইতিহাস-রচনার ২৫০ বৎসর

পূর্ব্বে জীয়াউদ্দীন বারণী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' লিখিয়াছিলেন। তিনি আলাউদ্দীনের রাজত্বের অনেক গল্প তাঁহার পিতৃব্য আলাওল মুলুকের (আলাউদ্দীনের সময়ে ইনি দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন) নিকট হইতে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আলাউদ্দীনের প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই বেশী করিয়াছেন। কিন্তু চিতোর-বিজয়-সম্পর্কে আমীর খসরুর চেয়ে বেশী কিছু বলেন নাই। ইহাতেও পদ্মিনী-উপাখ্যানের নামগন্ধ নাই।

৩। ফিরিশ্‌তার ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণা কুম্ভকর্ণের রাজত্বকালে লিখিত 'একলিঙ্গমাহাত্ম্যম্' গ্রন্থের রাজবর্ণন অধ্যায়ে লিখিত আছে—

স (=সমর সিংহঃ) রত্নসেনং তনয়ং নিযুজ্য
স্বচিত্রকূটাচলরক্ষণায়।
মহেশপূজাহতকল্মষৌঘঃ
ইলাপতির্স্বর্গপতির্বভূব।
খুঁ [খুঁ] মাণ বংশঃ [বংশ্যঃ] খলু লক্ষসিংহ---
তস্মিন্ গতে দুর্গবরং ররক্ষ।
কুলস্থিতিং কাপুরুষৈর্বিমুক্তাং
ন জাতু ধীরাঃ পুরুষাস্ত্যজন্তি॥ *

রতনসিংহের পিতা সমরসিংহ সম্বৎ ১৩৫৮ বিক্রম শতাব্দীর মাঘ মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৩৫৯ সম্বতের মাঘ মাসের তারিখ-যুক্ত রত্নসিংহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছয় মাস অবরোধের পর সোমবার, ১১ই মহরম, ৭০৩ হিঃ (বি. সং ১৩৬০ ভাদ্র শুক্লা-চতুর্দ্দশী=২৬এ আগষ্ট, ১৩০৩ খৃঃ) আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেন। সুতরাং রাবল রতনসিংহ এক বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাঁহারা "পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা" প্রমাণে উৎসাহী, তাঁহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে রতনসেনের সিংহল-যাত্রা, আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ, কারাবাস, মুক্তি ইত্যাদির সমাবেশ হয় কি-না বিবেচনা করিবেন। একলিঙ্গ-মাহাত্ম্যের শ্লোক হইতে বুঝা যায়, রতনসেন-পদ্মিনী-বিষয়ক উপাখ্যান তখন পর্য্যন্ত মেবারের মাটিতে গজায় নাই।

৪। ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছেন রাজা রতনসেন কারামুক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের রাজ্য লুটপাট করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া চিতোর-দুর্গ তাঁহার ভাগিনেয়কে দিয়াছিলেন। অথচ 'একলিঙ্গ-মাহাত্ম্যম্' হইতে প্রমাণ হয়, চিতোর-দুর্গ-পতনের পূর্ব্বে রতনসিংহ মারা গিয়াছিলেন। রতনসিংহের মৃত্যুতে গহ্‌লোত-বংশের "রাবল" শাখা নির্ম্মূল হওয়ায় শিশোদে-সামন্ত রাণা উপাধিধারী অপর শাখা মেবারের গদী পাইলেন। লাক্ষসিংহের পৌত্র হমীরই মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করাতে জালোর ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মালদেব সোন্‌গরাকে সুলতান চিতোর-দুর্গ দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মেবার-ইতিহাস সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার সাধারণ জ্ঞানও ছিল না।

'পদ্মাবত', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', এবং টডের রাজস্থানোক্ত পদ্মিনী-উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজীর মতামত ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সংক্ষেপে উহার পুনরুক্তি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"কর্ণেল টড এই কথা [পদ্মিনী-উপাখ্যান] মেবারের ভাটদের উপর নির্ভর করিয়া [আধার পর] লিখিয়াছেন এবং ভাটেরা উহা 'পদ্মাবত' হইতে লইয়াছে।... ... ... 'পদ্মাবত', 'তারিখ-ই-ফিরিশতা', এবং টডের রাজস্থানের বর্ণনার যদি কোন মূল থাকে তবে তাহা এ-টুকু—আলাউদ্দীন ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর-দুর্গ দখল করেন। চিতোরের রাজা রতনসিংহ লক্ষ্মণসিংহ প্রভৃতি অনেক সামন্তের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান। তাঁহার রাণী পদ্মিনী বহু স্ত্রীগণের সহিত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। এই প্রকারে চিতোর-দুর্গে অল্প দিনের জন্য মুসলমান-অধিকার স্থাপিত হয়—বাকী সমস্ত কথা বহুধা কল্পনামূলক।" ('প্রবাসী', পৃ. ৮১৪-৮১৫)

এখন যে 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যকে নিখিলবাবু পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাক্।

আওরংজেবের সমসাময়িক মহারাণা রাজসিংহের "রাজসমুদ্র" সরোবরের বাঁধে পঁচিশখানি শিলাখণ্ডের উপর এই প্রশস্তি খোদিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা পুরোহিত গরীবদাসের পুত্র রণছোড়দাস এবং রচনাকাল বি.

* মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা-কৃত "রাজপুতানেকা ইতিহাস", ২য় ভাগ, ৪৮৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

সম্বত ১৭৩২. (জানুয়ারি, ১৬৭৩ খৃ.)। নিখিলবাবু বলিয়াছেন, "রাণা-বংশের অনুমতিক্রমে লিখিত হওয়ায় তাহারই কথা বিশ্বাসযোগ্য" (পৃ. ৮১৬)। এটি শুধু অনুমান। গৌরীশঙ্করজী এই প্রশস্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার চেয়ে এই প্রশস্তির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কাহারও আছে কি-না সন্দেহ। ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে তিনি ইহা উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চয় বিচার করিতেন। কিন্তু পদ্মিনী-উপাখ্যান-সম্পর্কে ইনি কোথাও রাজপ্রশস্তির উল্লেখও আবশ্যক মনে করেন নাই। ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে গৌরীশঙ্করজী লিখিয়াছেন—"প্রারম্ভের কয়েকটি সর্গে মেবারের যে প্রাচীন ইতিহাস লেখা হইয়াছে উহা ভাটদের • খ্যাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হওয়ায় অধিক বিশ্বাসযোগ্য নয়…" (ঐ, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৮৭)।

মেবারের সকল প্রশস্তি ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া লিখিত হইত না। তিন শত সত্তর বৎসর পরে রচিত একটি কাব্যকে আমীর খসরু-কৃত সমসাময়িক ইতিহাস 'তারিখ-ই-আলাই', এবং জীয়াউদ্দীন বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী'র চেয়ে অধিকতর প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত কি-না সুধীমণ্ডলী বিচার করিবেন। আলাউদ্দীনের সময়ের কথা দূরে থাক, আকবরের সমকালীন মহারাণা প্রতাপের ইতিহাস সম্বন্ধেও রাজপ্রশস্তিকার ভুল করিয়াছেন। প্রশস্তি-রচনার এক শত বৎসর পূর্ব্বে হলদীঘাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধ-বর্ণনায় প্রতাপের পলায়ন, খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকের পশ্চাৎ অনুসরণ, "খোরাসানী মুলতানীকা অর্গল" শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষার কথা লিখিত হইয়াছে। অথচ শক্তসিংহ হলদীঘাটের যুদ্ধে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না, এবং বদায়ুনী—যিনি স্বয়ং মোগলপক্ষে লড়াই করিয়াছিলেন—লিখিয়া গিয়াছেন, যুদ্ধেশেষে সারাদিন মোগলেরা রাণার গুপ্ত আক্রমণের ভয়ে আড়ষ্ট ছিল; রাণাকে অনুসরণ করিবার মত শক্তি মোগলদের ছিল না। ইহার চেয়ে অমার্জ্জনীয় ভুল—রাজপ্রশস্তিকার লিখিয়াছেন, প্রতাপ "সেখু" অর্থাৎ কুমার সেলিমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, অথচ মোগল-দরবারের ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ হয় কুমার সেলিম প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযান করেন নাই; প্রতাপের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে কুমার সেলিম মহারাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবত-উপাখ্যানের জন্য রাজপ্রশস্তির প্রামাণিকতা কতটুকু, ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

টডের 'রাজস্থান' (১৮২৯)

মহামতি টড সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজস্থানের ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রাজপুতানার ইতিহাস অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভাট-চারণেরা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কল্পনা-মূলক "খ্যাত" ইত্যাদি গান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এই খ্যাতগুলিতে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল প্রভৃতির উপন্যাস-নাটকের চেয়েও প্রকৃত ইতিহাসের ভাগ কম ছিল। টড সাহেব আঁধারে হাতড়াইয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজ হইতে মনগড়া কিছু লিখেন নাই; কিন্তু ভাট ও কবিদের মনগড়া কথায় তাঁহার ইতিহাস ভর্ত্তি করিয়াছেন। এটা ঐতিহাসিকের আপদ্ধর্ম—"মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা। ধরুন আজ হইতে দুই শত বৎসর পরে কোন রাজনৈতিক কিংবা প্রাকৃতিক বিপ্লবে আমাদের দেশ হইতে আকবর, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস এবং স্যর যদুনাথ ইত্যাদির গবেষণামূলক ইতিহাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের উপন্যাস ও নাটকগুলি রহিয়া গেল। এ অবস্থায় আমেরিকার কোন পণ্ডিত যদি এদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন এবং উপন্যাস ও নাটকগুলির চুম্বক-কথা ইতিহাসের আকারে লিখিয়া যান, উহা যেরূপ ইতিহাস দাঁড়াইবে টডের ইতিহাসও প্রায় সেই রকম দাঁড়াইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় চল্লিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজপুতানার ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া টডের রাজস্থানের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ-কাজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি ছাড়িয়া দিয়াছেন; কারণ তিনি দেখিলেন,

শুদ্ধ করিতে গেলে খোল-নলিচা দুই-ই বদলাইতে হয়। সেইজন্য তিনি হিন্দীতে "রাজপুতানেকা ইতিহাস" লিখিয়া মহামতি টডকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার তিন খণ্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে।

টডের রাজস্থানের ভুল সংশোধন এবং নূতন আলোক-পাত করিয়া এই শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত যেমন গবেষণা চলিয়াছে, ভবিষ্যতে সেরূপ গৌরীশঙ্করজীর ইতিহাসকে আধার করিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চলিবে। এ-সম্বন্ধে আমরা গৌরীশঙ্করজীর মত উদ্ধৃত করিতেছি—"রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় উদয়পুর-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসও এখন পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। কর্ণেল টড প্রমুখ পণ্ডিতেরা গুহিল হইতে সমরসিংহ কিংবা রত্নসিংহ পর্য্যন্ত রাজাদের যে-কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন উহা প্রায় কিছু না-লেখার মত [নহীঁ-সা] এবং বিশেষতঃ, ভাটদের খ্যাত অবলম্বন করিয়া লিখিত হওয়ার দরুণ অধিক প্রামাণ্য নহে।" (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৫১৫)

আমাদের মনে হয়, পদ্মিনী-উপাখ্যানের উৎপত্তিস্থান মেবারভূমি নয়, অযোধ্যা প্রদেশ—যেখানে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সী এই কাব্য রচনা করেন। 'জ্যায়সী গ্রন্থাবলী'র সম্পাদক মহাশয় বলেন, পদ্মাবতের পূর্ব্বার্দ্ধ জ্যায়সী অযোধ্যায় প্রচলিত কাহিনী হইতে লইয়া মনোরম কল্পনা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ অযোধ্যায়, "পদ্মিনীরাণী এবং হীরামন তোতা"র গল্প আজ পর্য্যন্ত প্রায় ঐ রকমই বলা হয় যেমন জ্যায়সী উহার বর্ণনা করিয়াছেন। জ্যায়সী ইতিহাসবিজ্ঞ ছিলেন; এই জন্য উনি রতনসেন, আলাউদ্দীন প্রভৃতির নাম দিয়াছেন; কিন্তু কাহিনী-কথকেরা বলে, "এক রাজা ছিল" "দিল্লীর এক পাদ্‌শা ছিলেন" ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দু-এক পদ গাহিয়া গাহিয়া ইহারা গল্প বলে।...এই প্রকার "বালা-লখন দেব" ইত্যাদি আরও রসাত্মক কাহিনী প্রচলিত আছে।" (পৃ. ৩০)

ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে নেপালের সেন-রাজগণের এক বংশাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃতে লিখিত; রচয়িতা ভবদত্ত; পুঁথির নাম "রত্নসেন-কুলবংশাবলী"; রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ইহাতে লেখা আছে

রত্নসেন

নাগ সেন | কমল সেন | মনোহর সেন | জালিম সেন

(নাগ সেন →) তোথারায় সেন

কুলপ্রতিষ্ঠাতা রত্নসেন অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বংশের আদিস্থান ছিল "চিতউর"। তাঁহার পুত্র নাগ-সেন (?) এলাহাবাদে রাজা হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তোথারায় সেন মধ্যদেশ বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া উত্তরাপথের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋদ্ধি-কোটায় রাজ্যস্থাপন করেন। (Indian Historical Records Commission Proceedings, vol. XII, p. 64.)। এই চিতোর কি রাজপুতানার চিতোর? রাবল রতনসীর কোন সন্তানাদির উল্লেখ রাজপুত-ইতিহাসে নাই। তবে গৌরীশঙ্করজী লিখিয়াছেন, রতন সিংহের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ হইতে নেপাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বলে। (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৪৮৩)

আমাদের মনে হয়, মধ্যদেশের রতনসেন নামে কোন রাজার পদ্মিনী-স্ত্রীবিষয়ক কোন কাহিনী অযোধ্যায় প্রচলিত ছিল। মুসলমান কবি উহাকে মুসলমান ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদের কাঠামো নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। তবে জ্যায়সী "ঐতিহাসিক কাব্য" লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। যদি তাহাই হইত, হীরামন তোতা, রাঘবচেতন, সাত সমুদ্রের পারে সোনার সিংহল, সিংহের উপর সওয়ার 'সরজা' বীর ইত্যাদি ইহাতে স্থান পাইত না। পাছে লোকে তাঁহার কাব্যকে ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করে সেজন্য তিনি উপসংহারে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, 'পদ্মাবত' একটি allegorical poem; রতন-সেন মন-স্বরূপ—আমাদের দেহরূপী চিতোরের রাজা, ইনি মেবার-রাজ সমরসিংহের পুত্র নহেন। হৃদয়-রূপ সিংহল দ্বীপে 'বুদ্ধি'-রূপা পদ্মিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইতিহাসে পদ্মিনী রাণীকে খোঁজা বৃথা।

কষ্টিপাথর

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া কালনার একটু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস।...

বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান। শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ীশ্রেণীর বড় বড় কুলীনকে একত্র করিয়া তাহাদের মেলবন্ধন করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাসতুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড় কুলীন, দেবীবর শ্রোত্রিয়, সেই জন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসীর বাড়ী ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত চটিয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেগুলি প্রচার করিয়া দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়া সভা করেন। সভায় সব বড় বড় কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা হয় গুরু শোভাকরের বাড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কালনা হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক একটি মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এদিক্ ওদিক্ করিতে পারিবে না। সে সকল দোষ নানা রকম। সে সব পুরাণো কাশুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই। এইরূপে ছত্রিশটি মেলের উৎপত্তি হয়। বড় দোষে বড় মেল হয়।...

শোভাকরের বংশ আয়দার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।...

শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বিচারকালে তাঁহাকে সিংহের মত বলিয়া মনে হইত; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাঁহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র; তাঁহার খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গলিয়া যায়, বজ্রও শিরীষফুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাঁহার বিদ্যায় যশঃ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

বাণেশ্বর ছেলেবেলায় খুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, বড় দুষ্টও ছিলেন। পিতা রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—কালে বাণুও পণ্ডিত হবে। হইয়াছিলও তাই। বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ার লোকের মত সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। টোলের পড়া শেষ করিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কি রসিকতা করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কোপে পড়েন। তাই তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হন। খ্রীষ্টিয় ১৬৯৬ সালে বরদা পরগণার রাজা শোভাসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত মিলিয়া রাঢ়দেশে মহা উৎপাত আরম্ভ করেন তখন রাজা কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানের রাজা। তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিয়া কিরূপে শোভাসিংহ সেই কন্যার হাতে প্রাণ হারান, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের খুব নাম হইয়াছিল। তাঁহার পর চিত্রসেন রাজা হন। চিত্রসেন রাজার সময় রাঢ়ে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। রাজা চিত্রসেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে গুপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়া আপনার সভাপণ্ডিত করেন এবং তাঁহাকে চিত্রচম্পূ নামে আপনার এক জীবনচরিত লিখিতে বলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে যখন বর্গীর হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে চিত্রচম্পূ লেখা হয়। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত হইয়া যে কাব্য হয়, তাহার নাম চম্পূ। বাণেশ্বরের এই চম্পূ বাঙ্গালার এক অপূর্ব্ব কাব্য। এখন ইহার পুথি বড় পাওয়া যায় না। কোলব্রুক সাহেব একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসে দিয়াছেন। আর একখানি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় আছে। ইহা হইতে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার অনেক কথা জানিতে পারি।...

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরাণ পড়িয়া শুনাইতেন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাণেশ্বর সকল সময়ই ইংরাজদের সহায়তা করিতেন। ইংরাজেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাঁহারই কাছে লইতেন। কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। তিনি ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

বাণেশ্বর অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চাকরী করিতেন না, মাইনে লইতেন না, কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকিতেন না। তবে কথাই আছে—'অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ'; সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা একজন না একজনকে ধরিয়া থাকিতেন। পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় ছিল। যে যেমন পড়াইতে পারিত, তাহার তেমনি বিদায়-আদায় বেশী হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্দ্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন এবং তাঁহার দেওয়া জমীতে কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করেন।

তিনি সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয় কালে অবগাহন স্নান করিয়া, তান্ত্রিক এবং বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে সোনা ও রূপার পাত্রে নানাবিধ পূজার উপকরণ সাজান থাকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, বঞ্জুল, কেতক, কেতকী, কর্মল, কৈরব, চম্পক, কুরুবক, বক, ফোটা মুচুকুন্দ, কুন্দ, করবীর, কাঞ্চন, পলাশ, কদম্ব, কহ্লার, রক্তপদ্ম, কঙ্কেলি, মালতী, মহুয়া, মাধবী, পুন্নাগ, নাগকেশর, যূথী, জাতী প্রভৃতি পুষ্প রাশি রাশি থাকিত; মন্দিরটি তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। সেখানে কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, বেণা, গুগ্‌গুলু এবং নানা রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত মিশিয়া যাইত। পানিশঙ্খের উপর অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সাজান থাকিত। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, নানারূপ মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিঠে, লাড়ু এবং তিপ্পান্ন ব্যঞ্জন দিয়া ভোগ উপস্থিত করিয়া দিতেন। রাজা তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন।

সেই সকল ভোজ্য বস্তু দ্বারা পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। রাজা সোনার আসনে বসিয়া, সোনার অলঙ্কার পরিয়া, দুইখানি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবমতে আচমন করিতেন। তাহার পর সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, দ্বারদেবতা ও গুরুপরম্পরাকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন। পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিতর ও বাহিরে সংহারমাতৃকান্যাস করিতেন। পরে আটত্রিশ ও পঞ্চাশ কলা কেশবাদিমাতৃকা, শ্রীকণ্ঠ, কেশব, কীর্ত্তি প্রভৃতি ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতেন। তার পর পীঠমন্ত্র, ঋষ্যাদিমন্ত্র পড়িয়া ও সর্ব্বাঙ্গে ছাপা দিয়া 'মুদ্রারচিতমূর্ত্তিপঞ্জরকিরীটেন্দ্রিয়ব্যাপকন্যাসো ধ্যাত্বা' বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ভ করিতেন।...

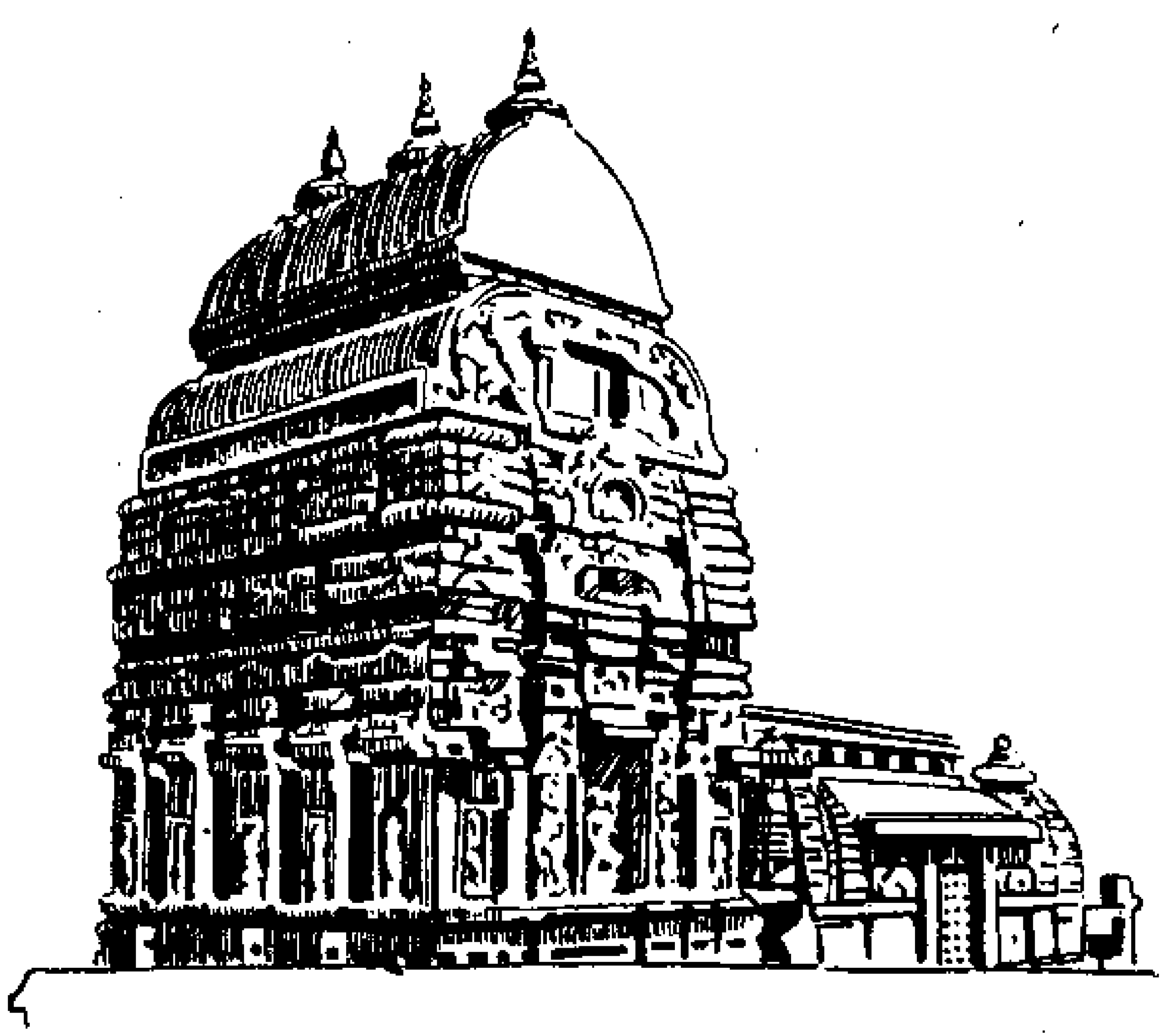
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা একরকম বাঙ্গালার মালিক হইয়া উঠিলেন। সে সময়ের কৃষ্ণনগরের রাজা ইংরাজদের একজন প্রধান সহায়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। সুতরাং বাণেশ্বরও ইংরাজদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা দেশের কর্ত্তা হইলেন।...১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—আমি দাওয়ান হইয়া দাঁড়াইতে চাই। সুতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরী গেল। কোম্পানী দেওয়ানী লইলেন। কিন্তু দেওয়ানী লইলে দেওয়ানী মোকদ্দমা ত করিতে হইবে। মুসলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল, সেই মতে কাজ চলিতে লাগিল। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান মোকদ্দমার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্ম্ম কি জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়া দিতেন ও তজ্জন্য তৌলবট পাইতেন। মুসলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিয়া আসিত। হেষ্টিংস উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—কোড চাই, সংহিতা চাই। তখন ইংরাজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন না; মুসলমানদের মধ্যে অতি অল্প লোকে জানে। সুতরাং বাঙ্গালী বন্ধুদিগের সহযোগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এগার জন বড় বড় পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন। এই এগার জনের প্রথমেরই নাম হইতেছে—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাহার পর পশপুরের কৃপারাম; তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ীর দুই পণ্ডিত—একজনের নাম রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিঙ্কর। আর সাত জনের কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম সীতারাম ভাট। ইঁহারা এগার জনে একত্র হইয়া, দেওয়ানী আদালতের বহু দিনের নজীর দেখিয়া একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম—বিবাদার্ণবসেতু। হেষ্টিংস একজন সংস্কৃত-জানা মৌলবীকে দিয়া উহা পারসীতে তর্জ্জমা করাইয়া লন এবং হ্যালহেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়া সেই পারসী হইতে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয়—হ্যাল্‌হেড্‌স্ জেণ্টু ল। পণ্ডিত মহাশয়েরা যত দিন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের টোল খরচের জন্য রোজ একটি করিয়া টাকা পাইতেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলেও তাঁহারা সকলেই যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, একটি করিয়া টাকা রোজ পাইতেন। কেহ বা তাঁহাদের বাড়ীতে টোল থাকা পর্য্যন্ত সে টাকা পাইয়াছিলেন।

এই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনিই যে সকলকে চালাইয়া লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরসা ছিল। তার পর সার উইলিয়ম জোন্‌স্ আসেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে দিয়া বিবাদভঙ্গার্ণব নামে একটি নূতন কোড তৈয়ারী করিয়া লন।

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে শুধুই কবিতা লিখিয়া, চম্পূ লিখিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরাজের হাতে হিন্দু ল'এর ব্যবস্থা দিবার ভার তুলিয়া দিবার তিনিই একজন প্রধান হেতু। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে এখন সব হারাইয়া বসিয়া আছেন।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮)



পুস্তক পরিচয়

ভাতুড়ী-মশাই—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ক্রাউন ১৬ পেজী, ৩২১ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য আড়াই টাকা।

হাস্যরস আর করুণরস সহজে মিশ খায় না, যেমন তেল আর জল। কিন্তু কেদারবাবু এই দুই বিভিন্নধর্ম্মী রস মন্থন করিয়া উপাদেয় অবলেহ বানাইয়াছেন। সামান্য নর-নারীর দোষ গুণ সুখ দুঃখের কথা স্নিগ্ধ কৌতুকের যোগে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, বিদ্বেষ নাই, অতিকারুণ্য নাই, অরুচিকর মিষ্টতাও নাই। মধুপুর-নিবাসী snob-বৃন্দ, জামাই ধরিবার জন্য খেল্লোয়াড় গৃহিণার জাল-বিস্তার, শান্ত দিবার উপর দুরন্ত ভগিনীর কৌতুককর উপদ্রব এবং মাতার বাক্যবাণ হইতে পিতাকে রক্ষা করিবার নিরন্তর চেষ্টা—ইত্যাদি চিত্র অতি উপভোগ্য।

রা. ব.

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড—সতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ সম্পাদিত এবং কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীরাম-কমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন আট পেজী ৮+৫৮+২৫৬+১১৮ পৃষ্ঠা, দাম সাধারণের পক্ষে ১৷০।

পদকল্পতরু ক্ষণদা-গীত চিন্তামণি, গীত-চন্দ্রোদয়, পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের অন্যতম পুঁথি। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের মাঝামাঝি বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন) উহার সঙ্কলন সম্পূর্ণ করেন বলা হয়। পদের সংখ্যা তিন হাজারের কিছু উপর। পদকল্পতরু ব্যতীত বৈষ্ণব পদাবলীর এত বড় পুস্তক এ যাবৎ মুদ্রিত হয় নাই। উৎকৃষ্ট পদের সমাবেশ হেতু বইখানার আদরও যথেষ্ট। বিগত ১৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে সতীশ বাবুর সম্পাদকতায় পদকল্পতরু খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। চারি খণ্ডে মূলাংশ শেষ হয়। মূলে প্রতি পদের নীচে পাঠান্তরাদি এবং আবশ্যক টীকা সংযোজিত হইয়াছে। পাঠ-নির্ণয়াদি ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতাই সূচিত করে। পদকল্পতরুর ৫ম খণ্ড উল্লিখিত চারি খণ্ডের পরিশিষ্ট আকারে রচিত। ইহাতে পদ-সূচী, পদকর্ত্তৃ-সূচী, সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং একটি শব্দার্থসূচী আছে। ভূমিকাভাগে পদ-সংগ্রহ পুঁথির পরিচয়, ন্যূনাধিক দেড় শত পদকর্ত্তার বিবরণ ও তৎসহ পদ-নির্ব্বাচন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার-কবিত্ব ও বিশেষত্ব ইত্যাদির বিবিধ বিষয় যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পদাবলী ও পদ-কর্ত্তা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিবার আছে। রায় মহাশয় গত ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের গভীরভাবে অনুশীলন করিয়া আসিতেছিলেন। এবং তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার ফল আমাদিগকে পদকল্পতরু উপলক্ষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে সতীশ বাবুর অভিপ্রায় সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, আমরা সর্ব্বত্র তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। অবশ্য এতটা আশাও করিতে নাই।

পদকল্পতরু বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটা সংস্করণের নাম করা যাইতে পারে; (১) স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সংস্করণ, (২) ভারত-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতির সংস্করণ (১৩০৪)। কিন্তু পদকল্পতরুর এরূপ সুন্দর সংস্করণ ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই, তাহা অসঙ্কোচে বলা চলে। মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

আপন-পর—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বীণা লাইব্রেরী, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বইখানি এত না বাড়াইয়া দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিলে তাঁর বক্তব্যটি অধিকতর স্পষ্ট ভাবে ফুটিত—বইখানি শেষ করিয়া এই কথাই মনে হয়। যে illusionটুকু সৃষ্টি করার উপর উপন্যাসের রসবস্তু জমাট বাঁধিয়া ওঠে, লেখক তাহা করিতে পারেন নাই। কারখানার কথা ও ইব্রাহিম মিস্ত্রিকে অনাবশ্যকরূপে আনিয়া ফেলিবার হেতু কি বুঝিতে পারিলাম না। Side characterগুলি ভাল করিয়া ফুটাইতে না পারিলে উপন্যাসের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে লেখক একথা নিশ্চয়ত জানেন, তবু তিনি কেন এই সকল অনাবশ্যক চরিত্রের ভারে গল্পাংশকে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন, বোঝা কঠিন। তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার প্রমাণ আছে অণিমার চরিত্রে। বেশ সবল ও স্বাভাবিক অঙ্কন। কিন্তু সুরবালার চরিত্র আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করে না। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারত—কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক রচিত; শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; মূল্য পাঁচ টাকা।

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান', কিন্তু এইরূপ পুণ্যবান্ এই যুগে অনেক আছেন যাঁহারা কাশীরাম দাসের কথা শোনেন নাই ও শুনিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। বাংলা দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে বৃদ্ধ কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের স্থান নাই; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের আসন স্থায়ী, বাঙালীর চিত্তলোকে তাঁহাদের প্রেরণা এখনও কাজ করিতেছে, এবং বাঙালীর চিন্তাজগৎ যতই প্রসারিত হোক তাঁহাদের সত্যকারের প্রভাব তাহার উপর চিরদিনই থাকিবে। তথাপি ইঁহাদের সঙ্গে পরিচয় না রাখিয়াও আধুনিক বাঙালী শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত এই মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতে দেখিয়া তাই একটু বিস্মিত হইতে হয়। এই সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষাও চিত্র বেশী সংযোজিত হইয়াছে। মোট চিত্র-সংখ্যা ৬৬, বহুচিত্রই রঙীন, প্রায় সবগুলিই প্রাচীন বা আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ও বাংলা মহাভারত সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'যবদ্বীপে মহাভারত' নামক যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক

নিবদ্ধ এইবার সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্ববিধ পাঠকের নিকটেই গ্রন্থখানার গৌরববৃদ্ধি হইবার কথা। আশা করা যায়, মহাভারতের এই সংস্করণটি যথাযোগ্য আদৃত হইবে।

চটকল—শ্রীনীহারকুমার পাল চৌধুরী। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ লইয়া লিখিত একখানি তিন অঙ্কের নাটক।—চাহি বা না চাহি, এ কঠিন সমস্যা অন্য দেশের মত আমাদের দেশেও দেখা দিতেছে, অন্য দেশের মত আমাদের দেশেও তাই উহা লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। এই শ্রেণীর লেখা রসোদ্বোধন অপেক্ষা প্রচারকেই বড় করিয়া ফেলে। সে দোষ হইতে এই নাটকখানাও মুক্ত নয়;—ইহাতে এই সমস্যামূলক নাটকের সাধারণ ফাঁকি বা ক্লেপ-ট্রেপ আছে; কথা-বার্ত্তায়ও ঝাঁঝ আছে; চরিত্রগুলিও যেন বড়ই ফ্রেমে বাঁধা। কিন্তু—এই কিন্তুটিই আশার কথা;—এই সব দোষ ও শেষদিককার পশুগন্ধী উৎকটতা সত্ত্বেও নাট্যকারের নাটক রচনার হাত আছে, তাহা বুঝা যায়। অবশ্যই ইহার প্রমাণস্থল রঙ্গমঞ্চ; কিন্তু মিঃ রয় ও দীপ্তি-বিদ্যুতের সংঘাত-মূলক দৃশ্যটি ও নাটকের পরিসমাপ্তি পাঠকের চিত্তকে চঞ্চল করে; এবং এই শ্রেণীর লেখার স্বাভাবিক ঝাঁঝ ও লেখকের উৎকট বীভৎসতা অঙ্কনের অস্বাভাবিক ঝোঁক সত্ত্বেও নাটকখানা পাঠকের মনকে বেশ নাড়া দেয়।

শ্রীগোপাল হালদার

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়—ডাক্তার শ্রীশচীকান্ত সেন। ৪৯।১।এ, হরিশ মুখুজ্যে রোড, কলিকাতা। মূল্য ৴১০।

এই ছোট বইখানি সোজা ভাষায় একজন যোগ্য ডাক্তারের লেখা। প্রসূতিদের কাজে লাগিবে।

চ.

চিকিৎসা সোপান—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্-এ প্রণীত। মিহিজাম পোঃ, ই-আই-আর হইতে মেসার্স আর, সি, দষি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২২ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

এখানি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা পুস্তক। লেখক চিকিৎসক নহেন, তবে তাঁহার মাতুল একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁহার সহিত সাত বৎসর বহু রোগী দেখিয়া লেখক ঔষধ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এ পুস্তকে বিশেষ সাহায্য হইবে না। তবে যেখানে চিকিৎসকের অভাব, সেখানকার লোকেরা এই পুস্তক দেখিয়া অল্পস্বল্প রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। সাধারণ রোগসমূহের লক্ষণ ও কোন্ অবস্থায় কি ঔষধ দিতে হয়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। বায়োকেমিক চিকিৎসার বিবরণও এক অধ্যায়ে দেওয়া আছে। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রস চিকিৎসা—প্রথম খণ্ড, রাজবৈদ্য শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম্-এ. প্রণীত ও প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১৬৪। মূল্য পাঁচসিকা।

পুস্তকখানিতে বিভিন্ন রসগ্রন্থ হইতে রসাদি ধাতুর জারণ-মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা আরও সরল হওয়া উচিত ছিল। শুধু অনুবাদ না করিয়া রাজবৈদ্য মহাশয় যদি স্বাধীনভাবে নিজ গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে পুস্তকের গৌরব বাড়িত। নূতন শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এরূপ আশা করা যায়।

জীবন-বৈচিত্র্য—উপন্যাস, শ্রীনিস্তারিণী দেবী 'সরস্বতী প্রণীত। পত্রাঙ্ক ১৬৯, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক রায়-সাহেব সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সান্ন্যাল, বেনারস সিটি।

গল্পাংশ মন্দ নহে। চরিত্রাঙ্কনের অনেক দোষ ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও লেখিকার বর্ণনাভঙ্গি ভাল। উপন্যাস লিখিয়া ভবিষ্যতে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

শান্তি সমাধি—উপন্যাস, শ্রীতরুলতা ঘোষ প্রণীত ও মেসর্স বসু ব্রাদার্স, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১১৬, মূল্য এক টাকা।

ভূমিকায় লেখা আছে দেবরকে আশ্চর্য্য করিতে লেখিকা কলম ধরিয়াছিলেন। সেদিকে হয়ত তিনি সফলতা লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। লেখিকার প্রথম উদ্যম হিসাবে বইখানি মন্দ হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ভারতীয় নারী—স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০ মাত্র। পৌষ, ১৩৩৮।

ভারতীয় নারী সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন উক্তি তাঁহার বাংলা ও ইংরেজী পত্র, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কথা হইতে সংগ্রহ করিয়া একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। নারী সম্বন্ধে স্বামীজী যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও তাহাদের মূল্য কমে নাই, ভারতের সাধনার পথে আজও সে সমস্ত উক্তি মন্ত্রের মত কাজ করিবে। প্রকৃত পথের সন্ধান বলিয়া দিবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং এই গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

তবে গ্রন্থের সম্পাদন বিষয়ে কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বামীজীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সুষ্ঠ হইবে, ইহাই আমরা বরাবর দেখিয়াও আসিয়াছি এবং আশাও করি। আলোচ্য পুস্তকে 'মিশনরী বাংলার' মত কিছু কিছু ত্রুটি আছে; না থাকিলেই ভাল হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ "ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ ও সমস্যা সমাধান"এর উল্লেখ করি। "আমি বারংবার পৃষ্ট হইয়াছি" (৭৯ পৃঃ), "তুমি কি ভগবান নাকি? তফাৎ!" এবং "আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও" (৭৫ পৃঃ)। যিনি অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহাকে এ-কথাও মনে করাইয়া দিতে হয় যে 'নিষ্ঠুর রাক্ষসী(?) ভাব' (১০৩ পৃঃ) আমাদের কোনও বন্ধুর 'রাগাত্মিকা পদে'র মতই অচল। ইহা ছাড়া মুদ্রাকর-প্রমাদও আছে, এবং পাদটীকায়, একটি স্থলে অন্ততঃ, প্রকৃত অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই; ৭৮ পৃঃ পাদটীকায় princess সম্বন্ধে যে মন্তব্য দেওয়া আছে তাহা নিতান্ত অর্দ্ধসমাপ্ত এবং তাহাতে নারীসমস্যায় টেনিসনের মত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা।

আশা করি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লিখিত ত্রুটি আর থাকিবে না। স্বামীজীর উক্তিগুলি কোথা হইতে গৃহীত হইল ভূমিকায় তাহার আরও বিস্তারিত উল্লেখ থাকিলে সুবিধা হইত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৭

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে চাকরবাকর হইতে মিহির পর্য্যন্ত সকলকেই ভোরে উঠিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ইহাতে কেহ আপত্তি করে না, তবে শীতকালে মিহিরকে রোদ উঠিবার আগে বিছানা হইতে তোলা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানদা ভিন্ন কেহ এ কাজে অগ্রসর হইতেও সাহস করে না। যামিনী বলে, "ও বাঁদরের সঙ্গে কে পারবে? যত বাজে কথা শুন্‌বার জন্যে আমি যেতে পারব না।" ঝি চাকর কেহ গিয়া কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা জানা কথা, সেইজন্য তাহাদের পাঠানও হয় না। একমাত্র জ্ঞানদার কাছেই মিহির হার মানে, সুতরাং সকালে তিনিই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

আজ কিন্তু সকালের রোদ জানালার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া মিহিরের ঘরের মেঝেতে প্লাবন বাধাইয়া দিয়াছে, তবু জ্ঞানদার দেখা নাই। অভ্যাসমত মিহিরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু লেপের মায়া ত্যাগ করিয়া উঠিবার সে কোনোই চেষ্টা করে নাই। মা আসিয়া শাণিত বকুনি ঝাড়িবেন, কান ধরিয়া তুলিতে চাহিবেন, তবে সে উঠিবে। আজ এতক্ষণ কেন যে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহার কোনো কারণই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। রবিবার সারাদিন ছুটি উপভোগ করে বলিয়া, সোমবারে বরং বেশী কড়াকড়ি হয়, আজ তাহার উল্টা ব্যবস্থা কেন?

নীচে চায়ের ঘণ্টাও বাজিয়া উঠিল। আর শুইয়া থাকা চলে না, তাহা হইলে চা খাওয়াটাই বাদ যাইবে। জ্ঞানদার নিয়ম, সময়মত খাওয়ার ঘরে উপস্থিত হইতে না পারিলে, পরে আর কিছু পাইবার উপায় থাকে না। একমাত্র কর্ত্তার সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। মিহির অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে লেপটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া, খাটের উপর উঠিয়া বসিল। জুতার একপাটি টানিয়া লইয়া তাহাতে পা ঢুকাইয়া খানিকক্ষণ আলস্য উপভোগ করিল। তাহার পর মনস্থির করিয়া, কাপড় এবং জুতা পরা শেষ করিয়া, হাতমুখ ধুইয়া, লাফাইতে লাফাইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

খাবার ঘরে শুধু বাবা আর দিদি, মা নাই। বাবা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, দিদি পাউরুটির টোষ্টে মাখন মাখাইতেছে। মিহির ঘরে ঢুকিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের কি হ'ল আবার?"

যামিনী বলিল, "গলা ত নয় যেন কাঁসর।"

মিহির বলিল, "থাক, আমার গলা আমারই আছে, তোমায় তার ভাবনা ভাবতে হবে না।" যামিনীর গলা সম্বন্ধেও একটা তীব্র মন্তব্য করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতা নিকটে বসিয়া থাকায় সুবিধা হইল না।

নৃপেন্দ্রবাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তোমার মায়ের মাথা ধরেছে ব'লে তিনি উঠ্‌তে পারছেন না। ভাই বোনে ঝগড়া ক'রে তাঁকে মোটে বিরক্ত করবে না। আমি ত একঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে যাব।"

যামিনীর সুগঠিত নাসিকাটি একটু কুঞ্চিত হইল, তবে বাপ-মায়ের কোনো কথার উত্তর করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে কোনো কথা বলিল না। নীরবে সকলকে ডিম, রুটি, চা পরিবেশন করিতে লাগিল। আয়া মাঝে আসিয়া গৃহিণীর প্রাতরাশ উপরে লইয়া গেল। যামিনীও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। খাবার ঘরে বসিয়া নৃপেন্দ্রবাবু একমনে কাগজ পড়িতে লাগিলেন এবং মিহির বসিয়া প্লেটের উপর ছুরি-কাঁটা বাজাইতে লাগিল। জ্ঞানদা থাকিলে তখনই বকুনি খাইত, নৃপেন্দ্রবাবু এ সব দিকে মোটে খেয়াল করেন না, কাজেই সে কোনো বাধা পাইল না।

যামিনী মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনি তখনও

বিছানা ছাড়িয়া উঠেন নাই। খাটের পাশে টিপয়ের উপর খাবার সাজানো, চায়ের পেয়ালাটা শুধু খালি, আর কিছু তিনি স্পর্শও করেন নাই। আয়া মাথার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার কপাল টিপিয়া দিতেছে। যামিনী ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার মাথা বেশী ধরেছে না কি?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে। মাথাটায় কে যেন একতাল সীসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, এমন ভার মনে হচ্ছে। চোখগুলোও কেমন যেন করছে। কিছু ত মুখেও দিতে পারলাম না। এগুলো ডুলিতে বন্ধ ক'রে রেখে এস।"

যামিনী ডুলির চাবি লইয়া ডিম, রুটি তুলিয়া রাখিতে চলিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "চাকরদের চায়ের চিনি আর দুধ বার ক'রে দিস্।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাঁড়ার কি বার করতে হবে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "না, সে আমি কাল সন্ধ্যাতেই দিয়ে রেখেছি। তুমি চিনি দুধ দিয়ে গিয়ে পিয়ানো প্র্যাক্‌টিস্ কর গে। আমি শুয়েছি ব'লে যেন ঘরের সব কাজ বিশৃঙ্খল না হয়। ও রকম কাণ্ড আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। খোকাটা কি করছে? উঠেছে, না এখনও নাক ডাকাচ্ছে?"

যামিনী বলিল, "না, উঠে খেয়েছে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তাকেও পড়তে বসিয়ে দিগে যা। এ বেলা উঠতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু স্কুলে যেন ঠিক সময়ে যায়। ভজুকে তাড়া দিয়ে রাখ। মাছ যদি ঠিক সময় মত না আসে, খোকাকে যেন একটা ডিম ভেজে দেয়।"

যামিনীর গৃহিণীপনা করিতে মন্দ লাগিত না, তবে তাহার অবসর তাহার ভাগ্যে কমই জুটিত। পড়াশুনা, গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন শিক্ষা প্রভৃতির ফাঁকে যেটুকু সময় সে পাইত, নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া বসিত। ঘরের কাজ একটু-আধটু না শিখিলে চলে না, তাহা জ্ঞানদা মুখে স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু যামিনীকে সে-সব শিখাইবার কোনো ব্যবস্থা তিনি কোনো দিন করেন নাই। কবে কোন্ দিন আলু কুটিয়া যামিনীর চম্পকাঙ্গুলিতে কি একটা বাহির হইয়াছিল, ইহাতে তিনি ভয় পাইয়া তরকারী কোটা তাহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রান্না-বান্না একটু-আধটু সে মাঝে মাঝে করিত বটে, তবে এত সাবধানে যে, কেহ সে-দৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইত। চামচ দিয়া মশলা নুন তোলা, হাতায় করিয়া কড়ায় কোটা তরকারি ঢালা প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার ক্লান্তি ধরিয়া যাইত, কিন্তু মায়ের কাছে নিষ্কৃতি ছিল না। যামিনীর বড় ইচ্ছা করিত, পাশের গলির রায়দের বাড়ির বউয়ের মত সে খালি পায়ে আল্‌তা পরিয়া ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়ায়, বঁটি পাতিয়া বসিয়া তরকারী কোটে, মাছ কোটে। এমন কি মশলা বাঁটা, কয়লা ভাঙা প্রভৃতিও তাহার বৈচিত্র্যের খাতিরে মাঝে মাঝে করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইত। মেয়েটির কোমল আঙুলে হলুদের দাগ, চুন-খয়েরের দাগসুদ্ধ তাহার ভাল লাগিত। কিন্তু জ্ঞানদার কাছে এ সবের নাম করিবার জো ছিল না। প্রথম জীবনে, সংসারচক্রের নিষ্পেষণে তাহার মনে যে বিরাগ জমা হইয়াছিল, কালের প্রভাবে তাহা কিছুমাত্র কমে নাই। যামিনীকে সকল দিক দিয়া নিজের আদর্শমতে গড়িয়া তুলিয়া, তিনি নিজের বাল্য ও যৌবনের সকল ক্ষোভ মিটাইতে চাহিতেন। নিজে বিশেষ সুন্দরী কোনো দিনই ছিলেন না, কন্যা কপালগুণে রূপসীও হইয়াছে। সুতরাং সে যাহাতে পরকেও সুখী করে, এবং নিজেও সকল দিক দিয়া সুখে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে যামিনীর মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

যামিনী ভাঁড়ারের কাজ সারিয়া, ড্রয়িং-রুমে গিয়া ঢুকিল। পিয়ানোটি চাবি বন্ধ থাকে, না-হইলে মিহির তাহার উপর যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করে, তাহাতে বাড়ির লোকের কান এবং পিয়ানো দুইই অত্যন্ত বেশী রকম জখম হয়। চাবি খুলিয়া যামিনী বাজাইতে বসিয়া গেল। গান-বাজনায় তাহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল, বাজাইতে বাজাইতে সে যেন নিজের সৃষ্ট সুর-সাগরে নিজেই ডুবিয়া গেল। একেবারে আত্মহারা হইয়া বাজাইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার কানের কাছে কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমার শার্টের বোতাম কে লাগিয়ে দেবে শুনি? যা ত চমৎকার ধোপা জুটিয়েছ, কাপড় পরিষ্কার যত করুক

বা নাই করুক; কোট শার্টের সব ক'টা বোতাম বেশ নিয়ম-মত ভেঙে রেখে দেয়।"

যামিনী বাজনা থামাইয়া বলিল, "ধোপাটা আমি জুটইনি। তোমার ষাঁড়ের মত গলা জাহির করবার আর কি জায়গা ছিল না?"

মিহির বলিল, "কোথায় যাব শুনি? মায়ের ঘরে ত প্রবেশ নিষেধ, তাঁর পেত্নীর মত আয়াটি পথ আগ্‌লে বসে আছে। আর তুমি এদিকে এমন বিকট আওয়াজ করছ যে, আকাশ ফাটিয়ে না চেঁচালে কোনো কথা শোনানই যায় না। স্কুলে যেতে হ'লে শার্টগুলোর বোতাম ত লাগান দরকার?"

যামিনী বিরক্তভাবে বাজনা বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। নিজের ঘর হইতে স্‌চ স্থতা আনিয়া মিহিরের শার্ট কোলে করিয়া বোতাম লাগাইতে বসিল। একটা বোতামও নাই। সমস্ত কৃতিত্বটা ধোপার বলিয়া তাহার মনে হইল না, কিন্তু মিহিরের সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি; একটা কথা বলিতে গেলে একশ'টা আসিয়া পড়িবে। স্থতরাং নীরবে কাজ শেষ করিয়া মিহিরের শার্ট মিহিরকে ফিরাইয়া দিয়া, সে আবার পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিল। কিন্তু মন হইতে সঙ্গীতের আবেগ তাহার একেবারে বিদায় হইয়া গিয়াছিল, কিছুতেই আর বাজাইতে ইচ্ছা করিল না। সে উঠিয়া পড়িয়া রান্নাঘরে চলিল। বাবার এবং মিহিরের খাবার জোগাড় ঠিক মত হইয়াছে কি না দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। মায়ের ঘরের কাছে আসিয়া আধখোলা দরজার পথে একবার ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল। মা পিছন ফিরিয়া শুইয়া আছেন, একেবারে নিশ্চল ভাবে। হয়ত ঘুমাইতেছেন, মনে করিয়া যামিনী আর ঘরে ঢুকিল না। নিজের ঘরে গিয়া, চুল খুলিয়া, স্নানের আয়োজন করিতে লাগিল। দোতলার স্নানের ঘরে দশটা বাজিবার আগেই জল বন্ধ হইয়া যায়। তোলা জলে স্নান করিতে যামিনীর মোটেই ভাল লাগে না। স্থতরাং শীতগ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে সে স্নানটা দশটার মধ্যেই সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। যামিনী বুঝিল পিতা কার্য্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেছেন। তাঁহার খাবার সময় একবার কাছে বসিতে হইত, পত্নী বা কন্যা একজন কেহ কাছে বসিয়া না থাকিলে নৃপেন্দ্রবাবুর খাওয়াই ভাল করিয়া হয় না। তিনি এ সকল বিষয়ে এত অন্যমনস্ক যে চাকরবাকর শুধু নুন ভাত দিয়া গেলেও, বিনা আপত্তিতে খাইয়া চলিয়া যান। কিন্তু যামিনী তখন তেল মাখিয়া ফেলিয়াছে, নীচে যাইবার মত অবস্থায় আর নাই, স্থতরাং তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া সে স্নানের ঘরেই চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়াই নীচের খাবার ঘরে মিহিরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিছু একটা গোলমাল ঘটিয়াছে, তাহাই লইয়া সে পাচক এবং ছোট্টুর উপর মহা তর্জ্জন-গর্জ্জন স্থরু করিয়াছে। পাছে মা জাগিয়া ওঠেন এই ভয়ে যামিনী আবার তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই মিহির আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "একটা পচা ডিমকে এত ঘটা ক'রে ভাজবার কি দরকার ছিল শুনি? এই দিয়ে মানুষ কখনও খেতে পারে?" যামিনী দেখিল ডিমটার চেহারা সত্যই স্থবিধাজনক নহে। অন্য কিছু তৈয়ারি করিয়া দিবার সময়ও আর নাই। অগত্যা বলিল, "কি আর করা যাবে বল? এখন ত সময়ও নেই যে আর কিছু ক'রে দেবে? মায়ের অস্থখ হয়ে সবই গোলমাল হয়ে গেল।"

যামিনী নরম হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মিহির ঝগড়া বাধাইবার বিশেষ স্থবিধা করিতে পারিল না। স্কুলের সময়ও হইয়া যাইতেছে। হাঁড়ি-মুখ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "কি যে কাজের মানুষই তুমি তৈরি হচ্ছ! একদিন মায়ের অস্থখ হ'লে বুঝি বাড়িসুদ্ধ খেতে পাবে না?"

যামিনী উত্তর দিল না। মিহিরও বাহির হইয়া চলিয়া গেল। খাইবার লোক একমাত্র সে-ই বাকী আছে, মা সম্ভবতঃ আজ কিছুই খাইবেন না। রান্নার চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, "আমাকেও যা হয়েছে দিয়ে দাও, শুধু শুধু একগাদা আর কার জন্যে রাঁধছ? আয়াকে ডেকে মায়ের ভাত উপরে পাঠিয়ে দিও। মাছটাছ যা বাজার থেকে আস্‌বে, ভেজে ওবেলার জন্যে রেখে দিও।"

চাকরের কোন আপত্তি ছিল না। গৃহিণী সচরাচর একটা বাজিবার পর তাহাদের ছাড়েন, আজ দশটার মধ্যেই কাজ চুকিয়া গেল দেখিয়া, সে খুশী বই দুঃখিত হইল না।

যামিনী খাওয়া সারিয়া মায়ের ঘরের কাছে গিয়া আয়াকে ডাকিল। আয়ার কাছে খবর পাইল জ্ঞানদা তখনও ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে জাগাইতে মানা করিয়া এবং তাঁহার ভাত উপরে আনিয়া ঢাকা দিয়া রাখিতে বলিয়া যামিনী নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সবুজ সতেজ পত্রগুচ্ছের ভিতর অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত এই সুসজ্জিত ঘরখানিতে যামিনীকে যেন অধিকতর সুন্দর লাগিত। একখানা বই হাতে করিয়া সে খাটের উপর একটু বিশ্রামের চেষ্টায় গিয়া বসিল। একটু শীত শীত করিতে লাগিল বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা ধূসর রঙের শাল টানিয়া পা দুখানা চাপা দিল। বই পড়িতে পড়িতে কখন যে ঘুমের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল, তাহা নিজেই জানিতে পারিল না।

জাগিয়া দেখিল বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল, "ওমা, খুব এক ঘুম দিলাম যা হোক, আজ আর রাত্রে আমাকে ঘুমতে হবে না। মা খেলেন কি না কে জানে।"

কিন্তু মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ, কাজেই সে ফিরিয়া আসিল। ল্যাণ্ডিঙে কিস্‌মতিয়া বিপুল নাসিকা গর্জ্জন সহকারে ঘুমাইতেছে। মিহির আর আধঘণ্টা খানিক পরে আসিয়া জুটিবে, তখন আর বুড়ীকে ঘুমাইতে হইবে না। আয়ার পিছনে লাগা মিহিরের বড় প্রিয় কাজ।

যামিনী ছোট্টুকে ডাকিয়া মিহিরের জলখাবারের জোগাড় করিতে বলিল। সকালে ভাল করিয়া খাইয়া যায় নাই, বিকালেও যদি খাইতে না পায় তাহা হইলে সে আর কাহাকেও টিকিতে দিবে না। মা যদি তাহার গোলমাল শুনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিবে না। বাড়ির আর সকলের মত যামিনীও মায়ের বিরক্তির ভাবনাটা সবার আগে ভাবিত।

পড়িতেই মিহির স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর বইয়ের গাদা সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "শীগ্‌গির খেতে দাও, এক্ষুনি ত মাষ্টার এসে হাজির হবে।"

যামিনী বলিল, "মাষ্টার কি তোমার দরোয়ান যে ওরকম ক'রে কথা বল্‌ছ ?"

মিহির বলিল, "আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। মায়ের হয়ে অন্য কাজগুলো করতে পার বা নাই পার, তাঁর হয়ে লেক্‌চার বেশ দিতে পার।"

ছোট্টু এই সময় খাবার আনিয়া হাজির করাতে, মিহিরের লেক্‌চারও থামিয়া গেল। তাহার প্রিয় খাবার দুই-চার রকম প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া তাহার মনটাও একটু খুশী হইল। সে বসিয়া বসিয়া আরাম করিয়া খাইতে লাগিল। যামিনী আবার উপরে চলিয়া গেল। তাহার তখনও চুলবাঁধা, গা-ধোওয়া কিছু হয় নাই। গরম জলের জন্য একবার ভৃত্যকে তাগিদ দিয়া গেল।

প্রতাপের কোনোদিন পড়াইতে আসিতে দেরি হইত না। আজ বরং সে দু-তিন মিনিট আগেই আসিয়া পড়িয়াছিল। ছোট্টু তাহাকে বসাইয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া মিহিরকে খবর দিল, "খোকাবাবু, মাষ্টারবাবু ত আ গিয়া।"

মিহির তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার প্লেটে তখনও বড় এক টুকরা পুডিং সশরীরে বিরাজ করিতেছে, সেটার সদ্গতি না করিয়া সে যায় কি করিয়া ? কিন্তু জ্ঞানদার বক্তৃতা উদায়াস্ত শুনিয়া তাহার কোনোই উপকার হয় নাই, তাহা বলা যায় না। একমুখ খাবার লইয়াই সে ছুটিয়া গিয়া একবার প্রতাপকে দেখা দিয়া আসিল। বলিল, "আমার এখনি হয়ে যাবে স্যার, দু-মিনিটের মধ্যে আস্‌ছি।"

প্রতাপ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, ধীরে সুস্থে খাও কোনো তাড়া নেই।" মিহির আবার খাবার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রতাপ বসিয়া একখানা পুরাতন ম্যাগাজিন্ উল্টাইতে লাগিল। বাড়িতে চারিদিকে পদধ্বনি উঠিতেছে,

তাহার? অহর্নিশি নিজের হৃদয়ের ভিতর যাহা সে শুনিতে পাইতেছে, বাহিরের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাহা শুনিবার সৌভাগ্য কি তাহার হইবে না? যামিনীকে সেই একবার মাত্র সে দেখিয়াছে, তাহাতেই তাহার মূর্ত্তি প্রতাপের জীবনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, স্বপ্নে, জাগরণে প্রতাপ কোনো সময়েই যামিনীর সম্বন্ধে অচেতন থাকে না। কোনো আশা তাহার মনে রূপ ধরিয়া উঠিতে সাহস করে না, কিন্তু আশা নাই ইহা ভাবিবার সাহসও তাহার নাই।

কেমন একটা সুমধুর তন্দ্রা তাহাকে ঘেরিয়া ধরিতেছিল। চোখের সম্মুখে নাই, তবু এই বাড়িতেই সে আছে। এই বাতাসে সেও নিঃশ্বাস লইতেছে, এই আলোকে তাহার দৃষ্টিও নিমজ্জিত হইয়াছে। আড়ালে থাকিয়াও সে যে একান্তই নিকটে আছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত প্রতাপ শিহরিয়া উঠিল। একটা তীব্র চীৎকার তাহার কর্ণকুহরকে এবং হৃদয়কেও যেন বিদীর্ণ করিয়া মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িময় সাড়া পড়িয়া গেল। মিহির খাবার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, চাকর দুই জন দৌড়িয়া উপরে গেল। উপর হইতে হিন্দি বাংলা মেশান ভাষায় কোন একজন স্ত্রীলোক ক্রমাগত বিলাপ করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে বোধ হইতে লাগিল। কি ব্যাপার?

প্রতাপ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ির গোড়ায় মিহিরকে দেখিয়া সে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছে এমন সময় নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া যামিনী তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মিহিরের কাঁধ ধরিয়া একটা নাড়া দিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও খোকা, মায়ের কি হ'ল? মা কি আর নেই?"

মিহির ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কেন কি হয়েছে?"

যামিনী বলিল, "বাথরুমের সামনে কেমন ক'রে পড়ে আছেন, দেখ গিয়ে। ওমা গো, এ কি হ'ল?" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। একজন অপরিচিত যুবক সামনে দাঁড়াইয়া আছে, সে জ্ঞান আর তাহার তখন ছিল

প্রতাপ দেখিল বাড়ির সকলেরই এমন অবস্থা যে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। গৃহস্বামী এখনও ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে বাড়ি আসিবেন না। সে যখন উপস্থিত আছে তখন তাহার উচিত যথাসাধ্য সাহায্য করা। তাহার আচরণ হয়ত সাহেবী নিয়মানুযায়ী হইবে না, কিন্তু সে কথা ভাবিবার এখন সময় নাই। যামিনীকেই উদ্দেশ করিয়া, তবে মিহিরের মুখের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "অত ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আসছি। কাছেই একজন ভাল ডাক্তার আছেন। তোমার মাকে নড়ানাড়ি করবার চেষ্টা ক'রো না, যেখানে শুয়ে আছেন, তেমনি থাকুন।"

প্রতাপের জীবনে এত অল্প সময়ে এতখানি পথ বোধ হয় সে কখনও অতিক্রম করে নাই। কপাল-গুণে ডাক্তারকে সে বাড়িতেই পাইল। ইঁহার সঙ্গে কস্মিনকালে তাহার আলাপ নাই। তবে যাওয়া-আসার পথে তাহার লাল রঙের বাড়িটা সর্ব্বদাই প্রতাপের চোখে পড়ে, তাঁহার ডিগ্রীর অক্ষরগুলি তাহার চোখের উপর নাচিয়া যায়।

ডাক্তার নন্দী নীচের ঘরেই ছিলেন। প্রতাপের দারুণ ব্যস্তভাব দেখিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে? আপনি যে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছেন।"

প্রতাপ যতটা জানে, ততটা বলিল। ডাক্তার আর দেরি না করিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। তিনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নীচে নামিয়াছিলেন, গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিয়াই ছিল।

কয়েক মিনিটের ভিতরই তাহারা নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। নীচের তলায় কেহ নাই; সবাই বোধ হয় উপরে গিয়া ভীড় জমাইয়াছে। প্রতাপ ভাবিল, "এদের কাণ্ডই এক রকম। এদিকে ডাকাতি হয়ে গেলেও কেউ দেখবে না।"

কিন্তু ডাক্তারকে লইয়া নীচে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ত চলে না? প্রতাপ তাঁহাকে লইয়া উপরেই চলিল। উত্তেজনার প্রাবল্যে তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। এ যে দেবীমন্দিরে অনধিকারপ্রবেশ! এত পুণ্যফল তাহার নাই যে নিজের অধিকারে

নিয়তির হাতে ক্রীড়নকের মত সে অগ্রসর হইতেছে, আবার তাঁহারই নিষ্ঠুর লীলায় যখন তাহাকে বিদায় হইতে হইবে, তখন নিজের কিছু বলিবার থাকিবে না।

উপরের তলায় আসিয়া পৌঁছিতেই যামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা এইখানে আছেন।" তাহার বিশাল চোখ ছুটি জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অবাধ্য অধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এমন দুঃসময়েও প্রতাপ না ভাবিয়া পারিল না যে, কি আশ্চর্য্য সুন্দর এই তরুণী। ডাক্তারও যে একবার এই আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুসজলনেত্রা মেয়েটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহাও প্রতাপের চোখ এড়াইল না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে হইল, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।"

জ্ঞানদা শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া স্নানের ঘরের দিকে যাইতেছিলেন, বোধ হয় মাঝপথেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। প্রতাপের কথামত তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইবার চেষ্টা কেহ করে নাই। আয়া তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বিলাপ করিতেছে, মিহির পায়ের কাছে বসিয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া আছে। চাকরবাকর-গুলিও সব এধারে-ওধারে দাঁড়াইয়া আছে।

ডাক্তার মাটিতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জ্ঞানদাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যামিনীর ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি প্রতাপের বুকে ছুরির খোঁচার মত বিঁধিতে লাগিল। কোনো উপায়ে কি ইহাকে একটু আশ্বাস দেওয়া যায় না। সে ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "বেশী ভয় পাবেন না। তেমন কিছু হয়নি বোধ হয়।"

যামিনী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল, কোনো কথা বলিল না।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "একে ঘরে নিয়ে গেলে ভাল হয়, এরকম ক'রে থাকতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।" যামিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খুব বেশী ব্যস্ত হবেন না, সামলে উঠবেন বলেই বোধ হচ্ছে।"

যামিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। আয়া, প্রতাপ, মিহির এবং ডাক্তার ধরাধরি করিয়া গৃহিণীকে ঘরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইল। ডাক্তার চেয়ার টানিয়া লইয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিতে বসিলেন। তাঁহার উপদেশ-মত জ্ঞানদার মাথায় বরফ দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

তখনকার মত কি কি করিতে হইবে, সব বলিয়া, এবং দরকার হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ খবর দিতে বলিয়া ডাক্তার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন। যামিনী মিহিরের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ডাক্তারকে ত ফীস্ দেওয়া হ'ল না খোকা?"

মিহির প্রতাপের কাছে ছুটিল। প্রতাপ হাসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "ভাবনা নেই, উনি এই পাড়ারই লোক, পরে দিলেই চল্‌বে।" ডাক্তারকে বিদায় করিয়া প্রতাপ আবার উপরে উঠিয়া আসিল। হয়ত না আসিলেও চলিত, কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

মিহির একটু কাতরভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকেও কি আমাকে পড়াবেন স্যার?"

প্রতাপ বলিল, "না। আমি ভাবছি, তোমার বাবাকে গিয়ে খবর দিয়ে আসব। তাঁর আপিসের ঠিকানাটা কি?"

মিহির ঠিকানা বলিয়া দিয়া, মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। প্রতাপ একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কোথাও সে আছে কি না। তাহার অনুসন্ধান বিফল হইল না, নিজের শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে যামিনী দাঁড়াইয়া ছিল। প্রতাপকে নীচে যাইতে উদ্যত দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বাবা আপিসে না থাকলেও আপনি খোঁজ ক'রে তাঁকে একেবারে নিয়ে আসবেন। আমাদের বড় ভয় করছে।"

প্রতাপ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। যামিনী যদি দুরন্ত ভাষায় তাহাকে ধন্যবাদ জানাইত, সেটাকে এতখানি মূল্য প্রতাপ দিত না। সে ত শুধু ভদ্রতা মাত্র। কিন্তু এইটুকু অনুরোধ করিয়া যামিনী যেন তাহাকে পরিচিতের দলে, এমন কি আত্মীয়ের দলে টানিয়া লইল। এতখানি সৌভাগ্য যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা কি হতভাগ্য প্রতাপ আজ ঘুম ভাঙিয়া কল্পনাও করিয়াছিল?

জ্ঞানদার পীড়াতে দুঃখিত হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রেমিকের মন সর্ব্বদা দয়াধর্ম্মকে মানিয়া চলে না। প্রতাপ

নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হইল, তবু হৃদয়ের ভাবকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। জ্ঞানদা সে যাত্রা অনেক কষ্টে সাম্‌লাইয়া গেলেন। দিন-কয়েক তাঁহার নিজের এবং বাড়ির সকলের দুর্ভোগের সীমা রহিল না, কিন্তু ক্রমে অবস্থা ভালর দিকে গড়াইতে লাগিল, আত্মীয়-স্বজন সকলে একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল। রোগিণীর সেবা করিতে করিতে সকলেরই শরীর মনের ক্লান্তি একেবারে চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, আর কিছু দিন চালাইতে হইলে, কাহারও আর সাধ্যে কুলাইত না।

নৃপেন্দ্রবাবুর বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না, কিন্তু আত্মীয় বলিতে কলিকাতায় কেহ ছিল না। দেশেও যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা আত্মীয়তার সুবিধাটুকু প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিতে চাহিতেন, কিন্তু আত্মীয়তার কোনো দায় ঘাড়ে করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। জ্ঞানদার আত্মীয়দের সঙ্গে কোন যোগই ছিল না, দ্বিতীয় বার বিবাহ করার অপরাধে কেহ আর তাঁহার নামই মুখে আনিত না, সুতরাং তাহাদের নিকটে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিত না। অথচ সাহায্যের এখন একান্ত প্রয়োজন। নৃপেন্দ্রবাবুর পক্ষে একলা পারিয়া ওঠা অসম্ভব। যামিনী এ সকল কার্য্যে একেবারে অনভ্যস্ত, একলা রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেও তাহার ভয় ভয় করে, আর মিহির ত সকল কাজের বাহির। আয়া কিসমতিয়া খাটিতে খুব পারে, রাত জাগিতেও তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে একজনকে থাকিতে হয়, কারণ সে ঔষধপত্রের নাম পড়িতে পারে না, ঘড়িও নির্ভুল ভাবে দেখিতে পারে না।

প্রথম দু-একদিনের মধ্যেই নৃপেন্দ্রবাবু হায়রান হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ বিকালে পড়াইতে আসিত, সম্ভব হইলে সকালেও একবার আসিয়া গৃহিণীর খোঁজ লইয়া যাইত। যামিনীকে দেখিতে পাইত, তবে কথা বলিবার সুযোগ ঘটিত না। কিন্তু এই চোখে দেখিতে পাওয়াটুকুর অপার আনন্দ কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। হয়ত ভাষায় ইহা বুঝাইয়া দিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে ইহা অনুভব করিয়াছে, সে-ই শুধু বুঝিতে পারিবে, প্রথম যৌবনে প্রথম ভালবাসার পাত্রীকে শুধু চোখে দেখিতে পাওয়াই কতখানি। ঐটুকুর ভিতর দিয়া কি অপূর্ব্ব সার্থকতা যে জীবনকে প্লাবিত করিয়া দেয়, আকাশ বাতাস আলোককে কি মধুময় করিয়া তোলে, তুচ্ছতম মানুষের জীবনকেও কি মহিমময় বলিয়া বোধ করায়, তাহা বুঝাইবার ভাষা আজও কি সৃষ্ট হইয়াছে? প্রতাপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত, শিরায় শিরায় তাহার আনন্দের প্লাবন বহিয়া যাইত।

জ্ঞানদার অসুখের তৃতীয় দিনে সকালে আসিয়া দেখিল, নীচের খাইবার ঘরে নৃপেন্দ্রবাবু চা খাইতেছেন, যামিনী পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে চা ঢালিয়া দিতেছে। বেলা তখন সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

ছোট্টুর পিছন পিছন প্রতাপকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই যে আসুন, বসুন।"

প্রতাপ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "উনি কেমন ছিলেন রাত্রে?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মন্দ না, আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস্ করছেন, তবে শুশ্রূষা ঠিক-মত হওয়া একান্ত দরকার, পান থেকে চুন খসলেই মহা বিপদ। আমার ত তিন দিন রাত জেগে যা অবস্থা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় একটি এমন মানুষ নেই যার উপর এ রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আমি দিতে পারি।"

যামিনীর গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। মায়ের সেবা যে তাহাকে দিয়া বিশেষ কিছু হইতেছে না ইহাতে সে অত্যন্তই লজ্জিত ছিল, কিন্তু এ ত্রুটির সংশোধন তাহার নিজের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভয়ে সত্যই তাহার হাত-পা কাঁপিত, জ্ঞানদার মুখের দিকে তাকাইতে-সুদ্ধ তাহার ভরসা হইত না। কেবলই মনে হইত এখনই কি একটা বিপদ তাহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। সে নীরবে চা ঢালিয়াই চলিল, নৃপেন্দ্রবাবুর পেয়ালা দ্বিতীয়বার ভরিয়া দিয়া আর এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া নীরবেই প্রতাপের দিকে ঠেলিয়া দিল।

প্রতাপ চম্‌কাইয়া উঠিল। সৌভাগ্যক্রমে পিতাপুত্রী কেহই তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন না, না-হইলে

তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। যামিনীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কি না সে ভাবিয়াই পাইল না। এমন অবস্থায় কি করা উচিত, কিছুই তাহার জানা ছিল না, সুতরাং পেয়ালাটি টানিয়া লইয়া সে নতমস্তকে পান করিতে লাগিল। মনের ভিতর তাহার যে-সঙ্গীত বাজিতে লাগিল বাহিরের চেহারায় তাহা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না।

নৃপেন্দ্রবাবু চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "অবশেষে নর্স ই আন্‌তে হবে। তারাও সব সময়ে যে খুব রিলায়েবল্ হয় তা নয়, যদিও খরচান্ত হয়। হয়ত আমরা ঘুমচ্ছি দেখে, সেও দিবি ঘুম দেবে। এসব কেসে এতটা 'রীস্ক' নেওয়াও শক্ত।" প্রতাপ বলিল, "সে ত ঠিক। নিজের আত্মীয় কেউ হলেই সব চেয়ে ভাল হয়।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা আর পাচ্ছি কই? বিপদের সময় সাহায্য করবে এমন আত্মীয় আমার কেউই নেই।"

প্রতাপ একটুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে করতে রাজী আছি। রাত্রে হলেই আমার পক্ষে ভাল, কারণ দিনে আমার অনেক কাজ থাকে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি সারাদিন এত খাটেন, কতটুকু মাত্র আপনার বিশ্রামের সময়, সেটাও কেড়ে নিলে আপনার উপর বড় অবিচার করা হবে।"

প্রতাপ বলিল, "কিছুমাত্র না। রাত-জাগা অভ্যাস আমার খুব বেশীরকমই আছে। দু-ঘণ্টা ঘুমুতে পেলেই আমার ঢের হবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু একটু থামিয়া বলিলেন, "যদি আপনার বেশী কষ্ট না হয়, তাহ'লে আসবেন আজকেই। খোকাকে পড়াতে আসবার সময়ই বাড়িতে ব'লে আসবেন যে, রাত্রে এখানে থাকবেন আর খাবেন। বাড়ির ওঁদের কোনো অসুবিধা হবে না ত?"

কাহাদের কথা মনে করিয়া ভদ্রলোক এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রতাপ তাহা আন্দাজ করিয়াই শীতের দিনেও ঘামিয়া উঠিল। নতমস্তকে বলিল, "আমি কলকাতায় একলাই থাকি, আমার পিসিমার বাড়িতে। আমার মা ভাই, বোন, সকলে দেশে থাকেন।"

এত কথা বলিবার তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যামিনীও যদি নৃপেন্দ্রবাবু যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিয়া থাকে? সর্ব্বনাশ! কিন্তু এ কথা প্রতাপের মনে আসিল না যে যামিনী যাহাই ভাবুক, প্রতাপের ভাগ্যের তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ জগতে আশা অবিনাশী, বিশেষ করিয়া প্রেমিকের মনে।

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবে আজ রাত্রে আপনাকে একটু খাটাব। একটু রেস্ট্ না নিয়ে আর পারছি না। আয়া থাকবে আপনার সঙ্গে। ও বেশ চালাক চতুর, সব কাজই করতে পারে, খালি একজন চালিয়ে নেবার লোক থাকা দরকার।"

প্রতাপ বলিল, "বেশ। আজ শুধু কেন, যে-ক'দিন দরকার আমি আসতে পারব।"

নৃপেন্দ্রবাবু চা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন "খুকি, মনে রাখিস্ প্রতাপবাবু আজ রাত্রে এখানে খাবেন। দেখিস্, ভুলে যাস্‌নে যেন। তোর যা ভোলা মন।"

যামিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, ভুলব কেন? কাজের কথা আমি কবে ভুলি?"

প্রতাপকেও বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল। নৃপেন্দ্রবাবু উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে আর কি করিয়া বসিয়া থাকে? তাহা ছাড়া স্কুলেরও তাহার বেলা হইয়া যাইতেছিল।

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে প্রতাপ ভাবিতে লাগিল, এই কয়টা দিনের ভিতরে তাহার জীবনের কি আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যাহারা আগে তাহার জগৎ জুড়িয়া ছিল, তাহারা কেমন করিয়া, কখন যে তাহার নিজেরই অগোচরে পিছনে সরিয়া গিয়াছে, তাহা প্রতাপ বুঝিতেই পারে নাই। নবাগতা মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীকে যেন সকলে সভয়ে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রতাপের মনোজগতে যামিনী ভিন্ন এখন আর কাহারও স্থান নাই, তাহার চিন্তা ভিন্ন আর কোনো চিন্তা নাই। এই যে অতি মধুর ধ্যান তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কয়েকটামাত্র দিন আগে ইহার সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। যাহা কিছুর জন্য সে এতদিন সংগ্রাম করিয়াছে, সে সব এখন চেষ্টা করিয়া তাহাকে মনে আনিতে

হয়। নিজের ভবিষ্যৎটাও একেবারে ভিন্নমূর্তিতে তাহার কাছে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ভিতর আর সে দরিদ্র পল্লীর মৃৎকুটীর নাই, মাঠ ঘাট বনের অজস্র শ্যামশোভা নাই। মলিনবসনা মাত, শীর্ণ শুষ্ক মুখ ভ্রাতা ভগিনীগুলির ভাবনা এখন গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি অপূর্ব ইন্দ্রলোকের স্বপ্ন এখন তাহার সমস্ত চৈতন্য মগ্ন হইয়া থাকে! সে জানে ইহা মূর্খতা, ইহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র, কিন্তু তবু কিছুতেই সে নিজেকে সংযত করিতে পারে না। মনে হয় এই আশা যদি তাহাকে ছাড়িতে হয়, তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার কোনো উদ্দেশ্য, কোনো অবলম্বন থাকিবে না। যে-মায়া-অঞ্জনমাখা দৃষ্টিতে এখন সে জগতের দিকে তাকাইতেছে, সে-দৃষ্টি যদি হারায় তাহা হইলে আর কি চাহিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে? জগতের কি মূর্ত্তি তখন তাহার চোখে পড়িবে কে জানে? তলার কঙ্কালটাই হয়ত বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, উপরের সকল শোভা, সকল সৌন্দর্য্য নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। উঃ, এই সুখস্বপ্ন হইতে, সে কি ভীষণ, কি নিদারুণ জাগরণ! তাহাই কি বিধাতা প্রতাপের অদৃষ্টে লিখিয়াছেন। সে ত শুকাইয়া মরিতেই ছিল, হঠাৎ এই মায়া-মরীচিকা কেনই বা তাহার দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে আবির্ভূত হইল।

বাড়ি আসিয়া আর ভাবনার অবকাশ রহিল না, তাড়াতাড়ি খাইয়া স্কুলে দৌড়িল। আজ আর তাহার মন কিছুতেই কাজে বসিল না, কতক্ষণে ক্লাস শেষ হইবে তাহারই আশায় প্রতাপ ঘন ঘন ঘড়ি দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। বাড়ি পৌছিয়া, সামান্য একটু জলযোগ করিতেও যেন তাহার আর তর সহিতেছিল না। পিসীমাকে বলিল, "পিসীমা, আজরাত্রে আমি বাড়িতে খাবো না।"

বৌদিদি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় নেমন্তন্ন হ'ল ঠাকুরপো?"

প্রতাপ একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "নেমন্তন্ন ঠিক নয়। আজ ওঁদের ওখানেই থাকতে হবে, নিহিরের মায়ের শুশ্রূষার জন্য, তাই সেখানেই খেতে বলেছেন।"

পিসীমা বিরক্তভাবে বলিলেন, "বড়লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। নিয়ে গেল ছেলে পড়াতে, এখন জুতো-সেলাই চণ্ডীপাঠ সব করিয়ে নিক।"

প্রতাপের কানে কথাটা বড়ই রূঢ় শুনাইল, সে আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

বাংলার রসকলা-সম্পদ

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

"আত্মানং বিদ্ধি"—"আপনার আত্মাকে চিনিয়া লও"—এই সারগর্ভ অনুশাসনের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যটি ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযোজ্য; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন এক একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও আপনার একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে। যে-ব্যক্তি নিজের আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে সমন্বয় রাখিয়া জীবন গঠন না করে, সে জীবনে কখনও চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। তেমনি আবার যে-জাতি আপনার নিজস্ব আত্মার সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন করিয়া ও তাহার সহিত অবিরত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রাখিয়া চলিতে না পারে, সেই জাতির জীবন যে কেবল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং বিশ্ব-মানবের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে সেই জাতি যে বিশেষ কোন মূল্যবান দান করিতে পারে না তাহা নহে, সেই দুর্ভাগ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের জীবনও মানুষের আত্মার চরম পরিণতির দিক দিয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং তাহারা শুধু অন্য কোন সুসংস্কৃষ্ট জাতির আধ্যাত্মিক দাস-মাত্র হইয়া কালাতিপাত করে।

ব্যক্তির এবং জাতির তাহাদের স্বকীয় আত্মার সঙ্গে

এই যে পরিচয় ও সমন্বয়ের কথা বলা হইল, ইহা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানসিক যুক্তির প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া সম্ভব হয় না। জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিতর দিয়া ইহা কতকটা সম্ভবপর হয় বটে; কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট পথ জাতীয় রসকলার ভিতর দিয়া। ব্যক্তির ও জাতির আত্মা আত্মপ্রকাশ করে সব চেয়ে সহজ, সরল ও স্পষ্টভাবে—তাহার রসকলা (art)-পদ্ধতির ভিতর দিয়া। প্রত্যেক জাতির রসকলা সেই জাতির আত্মার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের ভাষাস্বরূপ।

জাতীয় রসকলা একদিকে যেমন জাতির আত্মার অভিব্যক্তি-স্বরূপ, তেমনি আবার ইহা জাতির প্রতিভা এবং শক্তির প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণবিকাশের প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। নানা যুগে যে-সকল ব্যক্তি মহাপুরুষের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বমানবের প্রাণে নব-প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা তাহা করিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের আপন আপন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারার সহায়তায় আত্মার বিকাশ ও শক্তি বর্দ্ধন করিয়া। বিশ্বের নানা দেশ হইতে প্রেরণার আহরণ যে জীবনের পূর্ণ-বিকাশের বিশেষ সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বৃক্ষ যেমন আপন উৎপত্তি-ভূমির সুগভীর তলদেশে শিকড় প্রোথিত করিয়া তথা হইতে প্রতিনিয়ত জীবনী-রস আহরণ ব্যতীত স্বাস্থ্যবান্, শক্তিমান ও ফুলে-ফলে সুশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইতে পারে না, তেমনি যে-ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র ও মনোবৃত্তি আপন দেশের ও জাতির আত্মার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অথবা সেই বৈশিষ্ট্যধারা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত নয়, সেই ব্যক্তি ও জাতি কখনও জীবনে চরম উৎকর্ষ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না; পরন্তু তাহারা অন্যান্য জাতির আধ্যাত্মিক দাস হইয়া আত্মনিকৃষ্টতা-বিশ্বাসের গভীর লজ্জায় অবনত-মস্তক ও বিশ্বমানবের কৃপার পাত্র স্বরূপ হইয়া থাকে।

মানুষের পরিকল্পিত যাবতীয় রসকলায়, প্রতিভা-কত দূর উচ্চে, তাহার উপলব্ধি বাংলার বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীরও নাই।

এই ত গেল আধুনিক শহুরে ও শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব ও অবস্থা। অপরদিকে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যাহারা প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টিপ্রসূত সমুজ্জ্বল রসকলা-প্রতিভার ধারা যুগের পর যুগ সন্তর্পণে চর্চ্চা করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা আধুনিক শহুরে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর কাছে অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত ও পদ-দলিত হইয়া এত কষ্টে অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করিতেছে, অথবা অনশনে প্রতি বৎসর এত দ্রুত গতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে যে, বাংলার যে গৌরবময় অমূল্য জাতীয় সম্পদের তাহারা বাহক, তাহার সহিত যদি আধুনিক ভ্রান্তশিক্ষা-বিমূঢ় বাঙালী অবিলম্বে শ্রদ্ধানত মস্তকে পরিচয় স্থাপন না করিয়াও এই সম্পদের বাহক অপূর্ব্ব প্রতিভাবান জাতীয় রসশিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক দুঃখদৈন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষকের আসনে বরণ করিয়া জাতির আত্মার সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন না করে, তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে তাহার আপন আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে।

কাব্যরসকলার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণবকবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাশালী রসশিল্পীদের গৌরবের বলে বাঙালী আজ কতকটা মাথা তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কি স্থপতিকলায়, কি ভাস্কর্য্যে, কি চিত্রকলায়, কি সঙ্গীতে, বাংলার নিজস্ব প্রতিভা-প্রসূত রসসম্পদ কিছু আছে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী আজকাল স্বপ্নেও ভাবে না।

অথচ ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ক্ষেত্রে, বাঙালী প্রাচীন যুগে যে কেবল উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী যাহাদের নিকট হইতে 'ভারতীয় রসকলা' অথবা 'প্রাচ্য-রসকলা' শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের অনেকেই প্রাচীন যুগে বাঙালীর কাছে এই সকল রসকলার শিক্ষা গ্রহণ

বহু শত বৎসরের উপেক্ষা ও অবজ্ঞাসত্ত্বেও আজ পর্য্যন্তও এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের দীনদরিদ্র পল্লীশিল্পিগণ সেই গৌরবময় জাতীয় প্রতিভার ধারা অল্পাধিকভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অবশেষে আজ তাহা বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর কাছে উপযুক্ত আদর ও উৎসাহের অভাবে অনেকস্থলেই নির্ম্মূলপ্রায় হইয়া যাইতেছে।

আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী যদি আপন জাতির আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিযুক্ত হইয়া বেঁড়াইতে না চায়, তবে এখন এই জাতীয় প্রতিভা-সম্পদকে ও তাহার দীনদরিদ্র বাহকদিগকে অবিলম্বে চিনিয়া লইয়া সামাজিক ও আর্থিক লাঞ্ছনা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করুক ও জাতির শিল্পশিক্ষার পদে বরণ করুক। নতুবা চিরদিনের জন্য বাঙালীর আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা ও আত্মবৈশিষ্ট্য-হীনতা স্থির নিশ্চয়।

বাঙালীকে ইহা বুঝিতে হইবে যে, যদিও বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যতম একটি অঙ্গ এবং যদিও বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের যুক্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি অংশ স্বরূপ এবং অন্যতম উপাদান ও শাখা স্বরূপ, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, বাংলার একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যাহা সে ভারতের যুক্ত সংস্কৃতিতে দান করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অথচ তাহাদের থেকে পৃথক এবং যাহা বাংলার জাতীয় আত্মার প্রকৃতির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি স্বরূপ ও পরিচায়ক এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বাংলার নিজের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের, চরিত্রের ও জীবনের বিকাশের দিক হইতে এবং ভারতের সংস্কৃতি পূর্ণবিকাশের দিক হইতে বাংলাকে তাহার স্বকীয় আত্মার এই নিজস্ব প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে এবং সগর্ব্বে মানিয়া ও চিনিয়া লইতে হইবে এবং বাঙালীকে ইহা হইতে তাহার প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনা আহরণ করিতে হইবে। তবেই বাঙালীর আপন সৃজনী-শক্তির বিকাশ হইবে। তবেই বাঙালী আপন জীবনের ও চরিত্রের যুক্ত সংস্কৃতিতে এবং বিশ্বমানবের বিশাল সংস্কৃতিতে আপনার বিশিষ্ট দান দিয়া সার্থক ও ধন্য হইতে পারিবে।

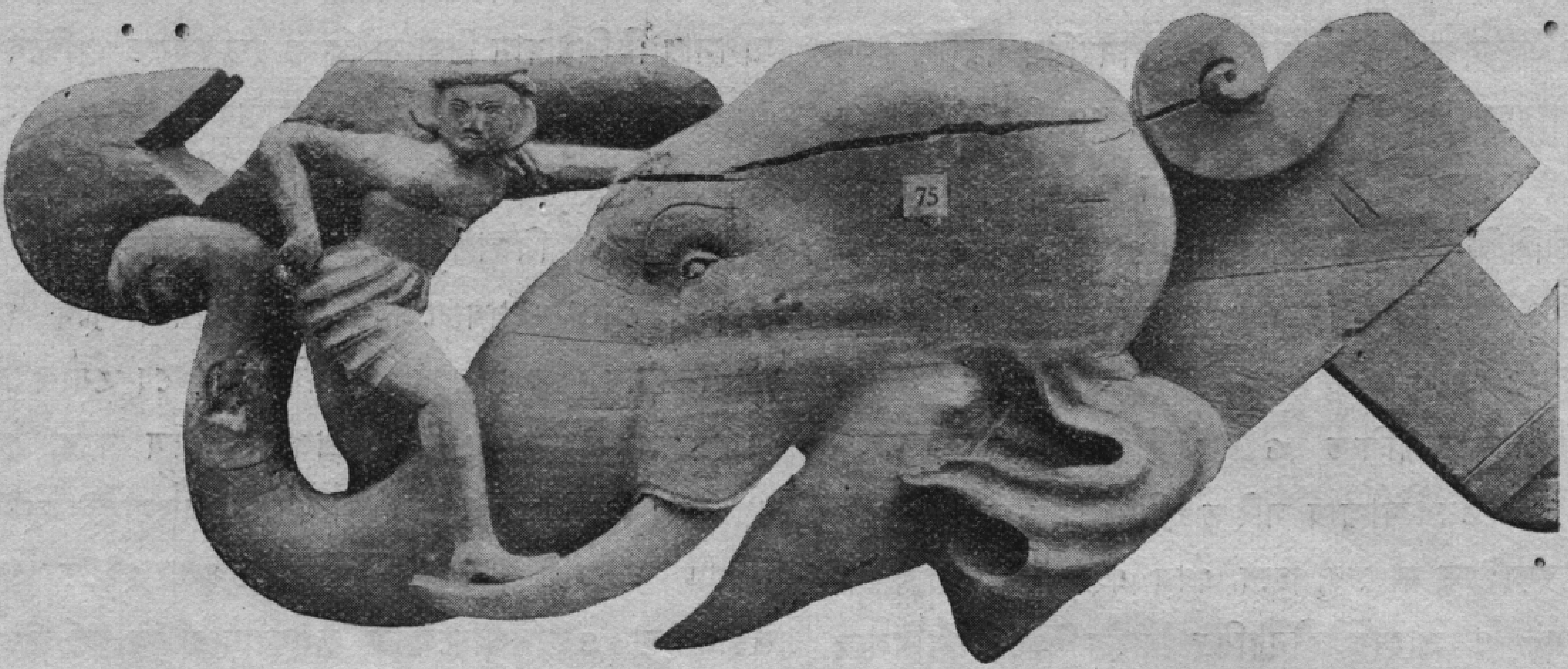
প্রথমে স্থপতিকলার কথা ধরা যাউক।

অশোক-যুগের সাঁচি ও ভারহুতের, মুসলমান-যুগে দক্ষিণ-ভারতে বিজাপুরের ও উত্তর-ভারতে দিল্লী ও আগরার মোগল-প্রাসাদশ্রেণীর এবং বর্ত্তমান যুগে সুদূর রাজপুতানার বাস্তুগৃহের স্থপতিগণের যে সৌন্দর্য্যময় নির্ম্মাণ-কলা আজ আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করে, সেই স্থপতিগণ যে প্রাচীন যুগে আমাদের বাংলারই কুটীর-শিল্পের উদ্ভাবিত, সুমধুর স্থপতিকলা হইতে প্রচুর অনুপ্রাণনা ও নির্ম্মাণক্ষেত্রে রূপকল্পনার আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে।* তথাপি আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে আজ বাংলার বনিয়াদী কুটীর-নির্ম্মাণ-পদ্ধতিকুশল স্থপতিগণ ও তাহাদের অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা বাংলা দেশ হইতে দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখিতে পাই? যে-রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের অনুপম প্রতিভা-গৌরবে ও সৌন্দর্য্যে আজ জগৎবাসী ও বঙ্গবাসী মুগ্ধ তাঁহার সেই গীতিকাব্যের অনুপ্রাণনার মূল উৎস যে আমাদের বাংলার শতসহস্র লোক-সঙ্গীত-বিশারদ পল্লীবাসিগণ, তাহাদিগের কাছে শিক্ষিত বাঙালী তাহার অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিতে যাওয়া লজ্জাজনক ও হেয় জ্ঞান করে, তাহাদের অনুপম লোক-সঙ্গীত-কলা-প্রতিভা রীতিমত ভাবে শিক্ষা করিবার ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোন চেষ্টা অথবা তাহাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দীনতা দূর করিবার জন্য কোন চেষ্টা শিক্ষিত বাঙালী করে না, এবং ইহার ফলে এই অনুপম জাতীয় সম্পদও দেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে।

বৎসরেক কাল পূর্ব্বে বাংলার প্রাচীন গৌরবময় রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণের উন্মাদনাময় রণতাণ্ডব রায়বেঁশে-নৃত্যের আবিষ্কার না-হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষিত

* *Indian Architecture* by E. B. Havell, pp. 92,



মাহুত ও হাতী
বাংলার দারুশিল্প

বাঙালী বিশ্বাস করিত যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব কোন পদ্ধতি বা দান নাই।

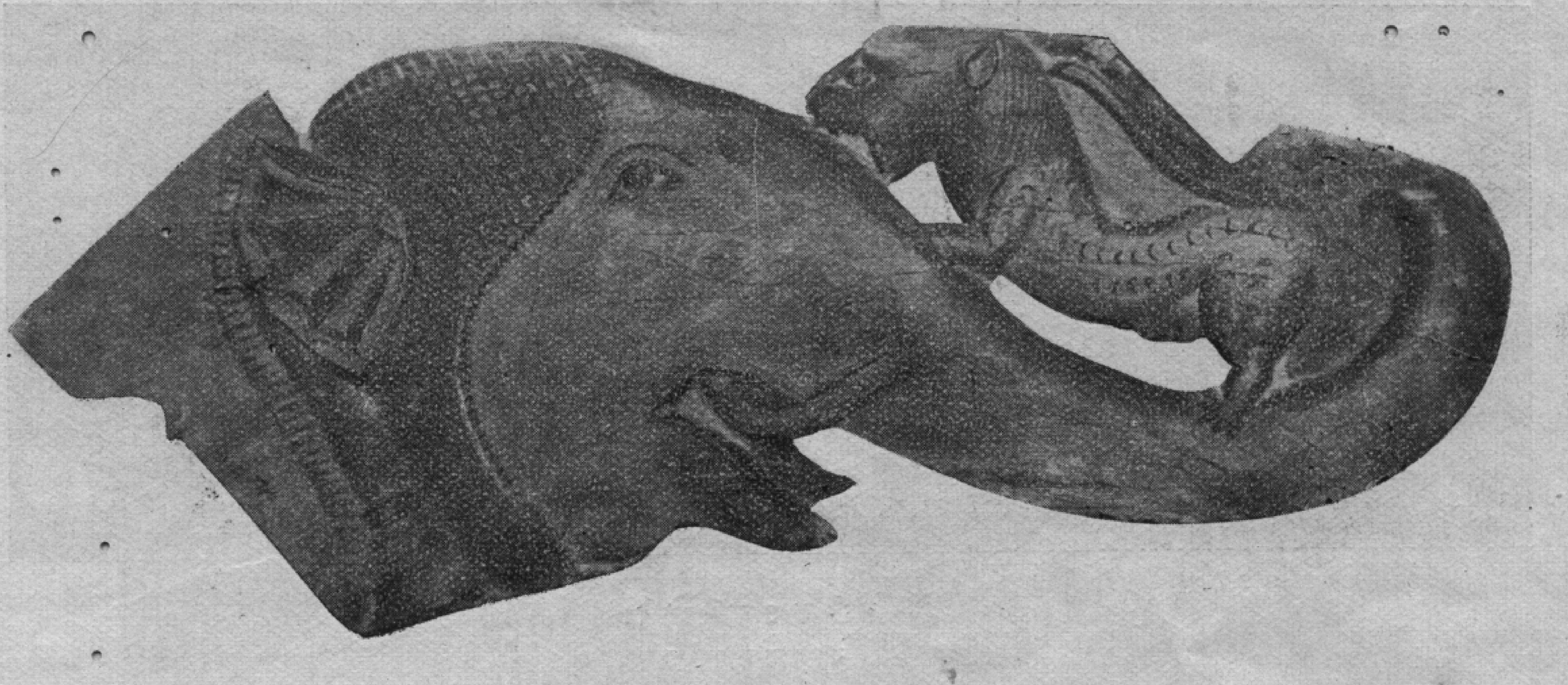
বিগত বৎসরেক কালমধ্যে আমাদের ইহা প্রমাণ করিবার সুযোগ হইয়াছে যে, বাংলার নিজস্ব রায়বেঁশে বীর-নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, জারি-নৃত্য, বাউল-নৃত্য, কীর্ত্তন-নৃত্য, ও ধূপ-নৃত্য ইত্যাদিতে তাণ্ডব ও মধুর উভয় প্রকার নৃত্যের আদর্শেরই এমন সুন্দর ভাণ্ডার রহিয়াছে যে, নৃত্যকলা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালীর আর অন্যত্র যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মেয়েলী ব্রত-নৃত্য ও লাস্য নৃত্যেরও নানাবিধ সুন্দর এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি বাংলা দেশের পল্লীতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। সুতরাং কি পুরুষদের কি মেয়েদের নৃত্য বিষয়ে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালীর বাংলার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ত নাই ই; পরন্তু ইহাদিগের বিশুদ্ধ ও সুন্দর পদ্ধতিগুলি অন্যত্র হইতে আমদানী নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভেজাল হইয়া না দাঁড়ায় এবং তাহাদের নিজস্ব সরল সুন্দর ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি না হারায়, তৎসম্বন্ধে সকল বাঙালীর সবিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভাস্কর্য্য কলায় বাংলার পল্লীভাস্করদের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব। এখানে প্রথমে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বাংলা দেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণ বশতঃ পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীর ভাগ পাথরের পরিবর্ত্তে কাঠের ও মাটির উপরে

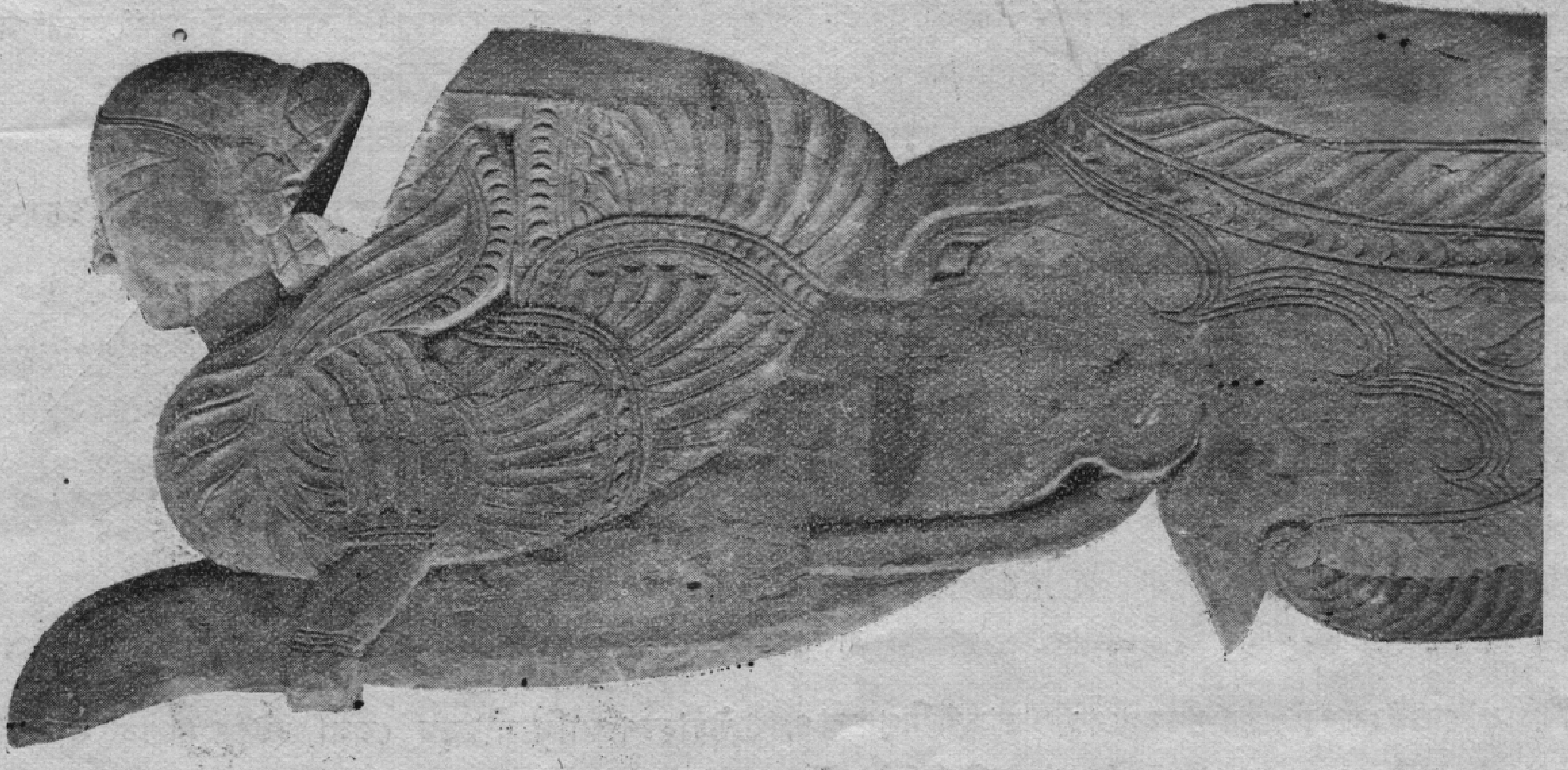


দোলনায়
বাংলার দারুশিল্প

তাঁহাদের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের ভাস্কর্য্য কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও



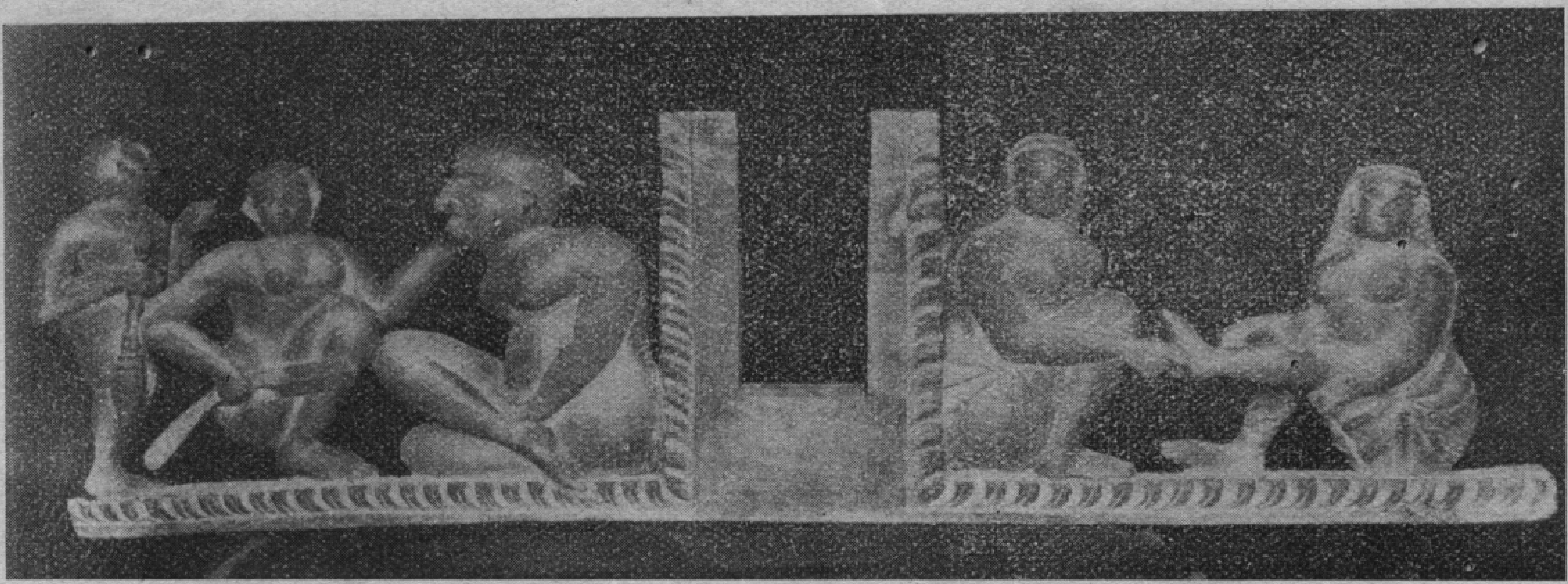
বাঘ ও হাতী
বাংলার দারুশিল্প



পরী ও হাতী
বাংলার দারুশিল্প

গৌরবহানি বর্ত্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যে সুনিপুণ ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাঁহার শিল্পকৌশল ষোল আনা মাত্রায় প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সুদূর অতীতে অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্কর্য্য শিল্পিগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।* পাথরের কাজেও বাংলার ভাস্করগণ পাল-যুগের সুবিখ্যাত ভাস্কর্য্যে অনুপম কলা-কৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শহুরে ও সমৃদ্ধ বাঙালীর কাছে উৎসাহের

* *Introduction to Indian Art* by Ananda K. Coomarswamy' p. 24.



নাপিত ও নাপিতানী
বাংলার দারুশিল্প

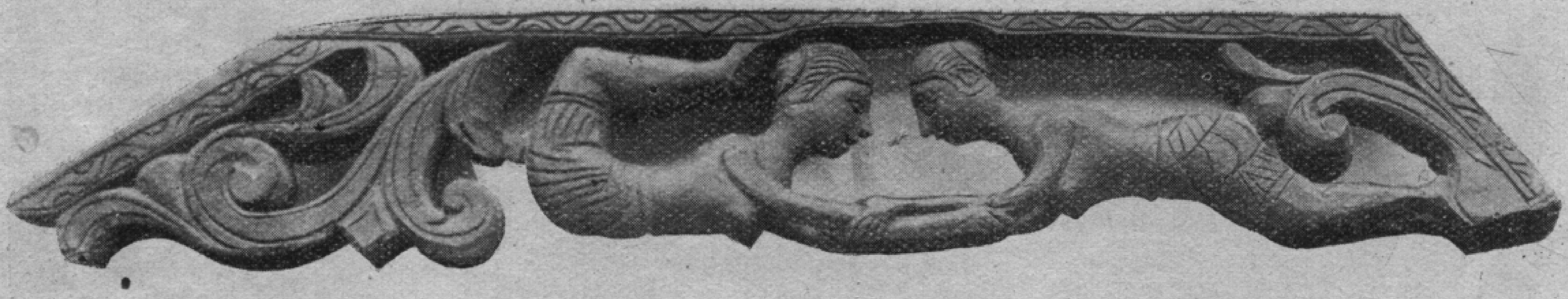
অভাবে বাংলার জাতীয় ভাস্করগণ পল্লীর কুটীরে স্থপতি-কলার আনুষঙ্গিক কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যেই প্রধানতঃ তাহাদের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। শহুরে, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাঙালীর কাছে এ-সব কাজ প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিলেও পশ্চিম-বাংলার পল্লীগ্রামে বনিয়াদী কুটীরগুলিতে ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর ও সুনিপুণ কলা-কৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, এবং আমার

(বেশীর ভাগ ব্র্যাকেটগুলি হাতীর শুঁড়ের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত বলিয়া এইগুলিকে সাধারণতঃ "শুঁড়ো" বলিয়া অভিহিত করা হয়);

(২) চালার বরগা ইত্যাদির উপর "বোঠে" নামক আলঙ্কারিক কাষ্ঠনির্ম্মিত আকৃতিগুলিতে; এবং

(৩) দরজার চৌকাঠের পাটায়।

ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অনেকগুলি চমৎকার



ব্যায়ামরতা নারী
বাংলার দারুশিল্প

বিশ্বাস যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাস্কর্য্যনিপুণতাও, বাংলার প্রাচীন যুগের স্থপতিদের স্থাপত্যশিল্প-নিপুণতার ন্যায়, অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্করদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বাংলার এই বর্ত্তমান পল্লীভাস্কর্য্য-কলা বাংলার সাধারণ পল্লীজীবনের সঙ্গে রসকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার উদাহরণ প্রধানতঃ পাওয়া যায় তিন প্রকার কাজে:—

(১) কার্ণিশের ব্র্যাকেট বা "শুঁড়ো"গুলিতে;

উদাহরণ আমি বীরভূম জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এইগুলির শিল্পকৌশল এত সুনিপুণ ও মনোমুগ্ধকর যে, পৃথিবীর কোন দেশের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে নিপুণতার তুলনায় ইহাদের হার হইবে না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে-সকল চীন-দেশীয় মিস্ত্রীর দল আজকাল কলিকাতা শহরে কাঠের কাজে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা আমাদের দেশের ধনকুবেরদের কাছে লম্বা লম্বা মাহিনা পাইতেছে, তাহাদের চেয়ে আমাদের বাংলার পল্লী-



রাধার প্রসাধন
প্রাচীন পট

ভাস্করগণ শিল্পনিপুণতার দিক দিয়া এবং ভাস্কর্য্য-রসকলায় প্রতিভার দিক দিয়া কোন অংশে ন্যূন ত নহেই, বরং শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি কাঠের 'শুঁড়ো'র, কয়েকটি কাঠের 'পরী' প্রতিকৃতি যুক্ত ব্র্যাকেটের, এবং কয়েকটি আলঙ্কারিক 'বোঠের' ছবি এখানে দেওয়া হইল। পরিকল্পনার নিখুঁত নির্ম্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবিড় অভিব্যঞ্জনায়, কারুকার্য্যের সুনিপুণ ছন্দে, এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এইগুলি জগতের ভাস্কর্য্য-শিল্পে যে অতি উচ্চ স্থান অর্জ্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রাম্য নাপিত কর্তৃক ভুঁড়িওয়ালা পণ্ডিত-মহাশয়ের ক্ষৌরকর্ম্ম, ও নাপিতানী কর্তৃক শুচিবাইগ্রস্তা পণ্ডিত-জায়ার পায়ে আলতা-পরানোর ভাস্কর্য্যটি অনুপম রসাভিব্যঞ্জনায় ও শিল্পনিপুণতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিষ্প্রয়োজনীয় গুটিকয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রদ্যাঁ (Rodin) প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের নিপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চ-প্রতিভা-মূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লীভাস্করগণ ও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের শিল্পকৌশল অতি শীঘ্রই বাংলা দেশ হইতে

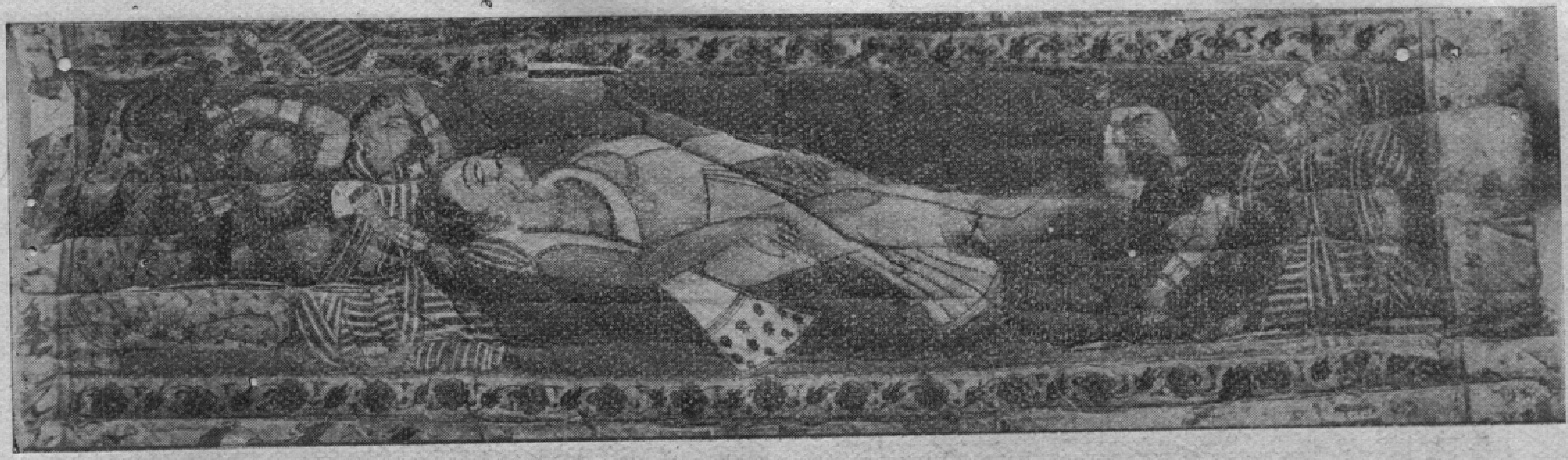


রামচন্দ্র ও গুহক
যতীন্দ্র পটুয়ার অঙ্কিত পটের এক অংশ

সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে ইহাদিগকে অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

সর্ব্বশেষে এখন চিত্রশিল্পের কথা বলি। বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামের দৈনন্দিন জীবনে চিত্রকলার যে-সকল ব্যবহার সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাহা তিন-ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—প্রথমতঃ, 'পটুয়া'-জাতীয় লোকের পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে অঙ্কিত লম্বা লম্বা চিত্রপট ; দ্বিতীয়তঃ, পল্লীগ্রামের মেয়েদের অঙ্কিত আলিম্পনা ও প্রাচীরচিত্র ; এবং তৃতীয়তঃ, মাটির ঘোড়া ও পুতুল এবং কাঠের পুতুল ইত্যাদির উপর চিত্রাঙ্কন।

এই তিন প্রকার চিত্রের দৈনন্দিন অজস্র ব্যবহারে বাংলার পল্লীজীবন এককালে কি অতুল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং বর্ত্তমান বাংলার শহরের ভ্রান্তশিক্ষা-প্রসূত কৃত্রিম ও প্রাণহীন আদর্শ এখনও যে-সকল সুদূর পল্লীতে পৌছিতে পারে নাই, সেখানে পল্লীজীবন এখনও যে কি অতুল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ আছে, তাহা শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীর অভিজ্ঞতা ও ধারণার অতীত। বাংলার নিরক্ষর সরল পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের অন্তরে বিশ্বের সৃষ্টির আনন্দরসের নিবিড় দৈনন্দিন অনুভূতি ও তাহাদের অন্তরে অনুভূত পরব্রহ্মের সেই সহজ নির্ম্মল আনন্দের সহজ সরল অভিব্যক্তি এই বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ বর্ণ-সন্নিবেশরূপে বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে এখনও যে-পরিমাণে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সেরূপটি নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 'বর্ণ-সঙ্গীতে'র (colour music) এই অসাধারণ প্রতিভা বাংলার পল্লীর স্ত্রীপুরুষের চরিত্রকে যুগের পর যুগ সুমার্জ্জিত করিয়া বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিকে একটি অতুলনীয় মধুর ও গৌরবময় রূপ দিতে



দশরথের মৃত্যু
প্রাচীন পট



গোষ্ঠলীলা
প্রাচীন পট

সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান শহরের ভ্রান্ত-শিক্ষা ও বর্ব্বরতামূলক আদর্শের প্রাণহীন প্রভাবের ক্রম-বিস্তারের ফলে বাঙালীর এই অতুল ও অবলীলাময় রসানুভূতির এবং রসাভিব্যক্তির স্বভাব-জাত প্রতিভাস্বরূপ অমূল্য জাতীয় সম্পদ্ একেবারে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

মাটিতে ও পিঁড়ি ইত্যাদিতে হাতের আঙুল দিয়া আলিম্পন দিবার যে সুন্দর প্রথা বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে এখনও আছে, তাহার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মেয়েদের তূলিকার লীলাময় ব্যবহার দ্বারা নানাবর্ণে শোভিত প্রাচীর-চিত্র অঙ্কিত করিয়া



শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াই বুড়ি
প্রাচীন পট

আপন আপন বাড়ি-ঘরকে প্রতি বৎসর সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিবার যে অতুলনীয় প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য এক বৎসরকাল পূর্ব্বে আমার হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মেয়েদের হস্তাঙ্কিত এই প্রাচীর চিত্রকলার সৌন্দর্য্যের গৌরবের ফলে পশ্চিম-বাংলার সুদূর নিভৃত প্রদেশের এক একটি গ্রামকে এখনও এক একটি ছোটখাটো রকমের 'জীবন্ত অজন্তা' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাংলার পল্লীচিত্র-শিল্পের যে তিন প্রকার পদ্ধতির কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে গ্রাম্য 'পটুয়া'দের অঙ্কিত লম্বা চিত্রপটগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের চিত্র-রসকলা। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির পরিবর্ত্তনে এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায়ও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম ও গৌরবময় সম্পদ, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে বাংলা দেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে দীনদরিদ্র গ্রাম্য ও পটুয়া শ্রেণীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে-কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহাতে বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়া শ্রেণীর চিত্রশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা এই সকল পট

বাড়িতে বাড়িতে দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলাপটের, কৃষ্ণলীলাপটের, শক্তি পটের ও যমপটের কাহিনী স্বরচিত গীতি-কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা আবৃত্তি করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং ইহার গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্নসংস্থান হওয়াও দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখান ব্যবসা ছাড়িয়া জনমজুরের ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনে হিন্দুর শিল্প-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেবদেবীর ছবি আঁকার ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজ করায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং এই দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সীমান্তপ্রদেশে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্যময় ও দীনতাময় জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা ইহাদের যে পুরুষানুক্রমিক রসকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চ্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয় এবং জগতের রসকলার আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের রসকলা-পদ্ধতি অতি প্রাচীন ভারতের প্রাগ-বৌদ্ধ-যুগের আদিম রসকলা-পদ্ধতির অবিকল-প্রবাহিত বিশুদ্ধ পরম্পরার অভ্রষ্ট ও অপরিবর্ত্তিত রূপ-ধারা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি প্রাচীন প্রাগ-বৌদ্ধযুগের চিত্রকলা-পরম্পরা তাহার আদিম ধারার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী

'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে 'চিত্রলেখা' গুলির ও যমপট ইত্যাদি চিত্রপটের ও তাহাদিগের 'চিত্রকর' ও প্রদর্শকদিগের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই চিত্রকরগণ যে ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এবং সেই সকল চিত্রলেখা ও চিত্রপট যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদেরই তুলিকাসৃষ্ট অতুল রূপ-সমৃদ্ধিতে বিভূষিত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না এবং পাল-যুগে বিখ্যাত 'নাগ'-পদ্ধতি-পন্থী চিত্রকর ধীমান ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কারণ এখনও ইহারা পটে নাগচিত্র-সুশোভিত মনসাদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত। আজ-কাল সাধারণ লোকে ইহাদিগকে "পটুয়া" নামে অভিহিত করিলেও ইহারা আপনাদিগকে প্রাচীন সংস্কৃত 'চিত্রকর' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতের 'চিত্রলেখা' অঙ্কনকারী চিত্রকরদের বংশসম্ভূত, ইহার একটি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও চিত্র আঁকার প্রক্রিয়াকে 'লেখা' নামে অভিহিত করিবার প্রথা যদিও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে তথাপি এই চিত্রকরগণ এই সূত্রে কখনও 'অঙ্কন' অথবা 'আঁকা' কথা ব্যবহার করে না। পরন্তু সর্ব্বদাই সেই অতি প্রাচীন 'লেখা' কথাটিই আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। চিত্রশিল্পকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিও ইহারা যুগের পর যুগ সযত্নে বহন করিয়া আসিতেছে।

এতদিন আমরা অজন্তার সুবিখ্যাত চিত্রকলা-পদ্ধতি-কেই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির একমাত্র অবশিষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম; কিন্তু এখন হইতে বাংলার এই নিজস্ব চিত্রকলাই সেই গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির আরও যে-কয়েকটি গৌরবময় বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাকে বিশ্বের চিত্রকলার সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দেশবিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতিমার্জ্জিত চিত্র-

আদিম যুগের সহজ সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরলতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। একদিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জ্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা ততোধিক ভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলঙ্কারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রাদোষের অথবা কোনরূপ আড়ষ্টতা দোষের ছাপ পড়ে নাই। বাংলার এই অপূর্ব্ব চিত্রকলা একদিকে যেমন চিরপ্রাচীন তেমনি অপরদিকে আবার ইহা চিরনূতন। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর স্থাপন করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলো-ছায়ার খেলাধূলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতি শোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপ-কল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রস-প্রাচুর্য্যে ভরপূর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাব পরিপূর্ণ। একদিকে বাংলার এই পল্লী-শিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপরদিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা একমাত্র তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের ক্ষমতাও জগতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। বৃক্ষলতাদি প্রভৃতির অঙ্কনের অতি চমৎকার ও

চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষ আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যাসের ও ভাব-ব্যঞ্জনার আদর্শে যে অস্বাভাবিকতা, দুর্ব্বলতা, কৃত্রিমতা ও অতি-কবিভাব লক্ষিত হয়, বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতিতে সেই সকল দুর্ব্বলতা ও দোষ নাই। এই সকল চিত্রপটে একদিকে পুরুষদেহের বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ভাব-ভঙ্গীর অঙ্কন-প্রণালী ও অপরদিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণমূলক অঙ্কনবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোন রকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতি-পরিস্ফুটভাবে কাহিনী বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলা-পদ্ধতি ভারতের আদিম যুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্ম্মযোগমূলক পৌরুষকাহিনীর ইতি-হাস ও প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবন-প্রণালী শক্তি-পটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিকের সত্য এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক 'রমান্তিকতা' (romanticism)র ভাব-তরঙ্গ বাংলার এই সকল প্রাচীন শিল্পিগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে তাহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক ও অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি বাংলার পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য্য-রসে এই সকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্রশিল্পিগণ রসকলার সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যান নাই এবং তাহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্র-গুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যম-

পরাজয়ের কাহিনী অতি জলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলা-রূপসীর আত্মা আজ তাহার বহু যুগের পুঞ্জীভূত বিলাসবেশভূষার জটিলতার ভারে প্রপীড়িত হইয়া পরিপ্রেক্ষিতের ভেল্কিবাজী ও আলোছায়াপাতের মরীচিকাময় বেড়াজালের আবেষ্টনের পীড়নে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া সহজ সরল আত্মপ্রকাশের আগ্রহে তাহার বিলাস হর্ম্ম্যরাজি পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বনজঙ্গলে মানবজাতির আদিম লালিত্যহীন সরলতার মধ্যে সহজ সরল আত্মপ্রকাশের উপযোগী যে-চিত্রভাষার অনুসন্ধানে ব্যর্থপ্রয়াসে উন্মাদের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বাংলার পল্লীর সুমধুর চিত্রলেখা-লক্ষ্মী আজ তাঁহার সলজ্জ অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া সেই অতি-বাঞ্ছিত অনুপম ও একাধারে প্রাঞ্জল অথচ শক্তিময়, লাবণ্যময়, প্রাণময়, কৃত্রিমতাবিহীন এবং ভাবব্যঞ্জনায় ও রসব্যঞ্জনায় ভরপুর চিত্রভাষার সন্ধান বিশ্বমানবকে মিলাইয়া দিবে।

ট্রেনে এক রাত্রি

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

পূজোর ছুটিতে রাঁচি থেকে কলকাতা চলেছি—থার্ডক্লাস গাড়ীতে। ইচ্ছে ছিল আর একটু উপরের কোঠায় উঠি, কিন্তু টাকার থলিটা অনেক ঝেড়েঝুড়েও ইণ্টারমিডিয়েটের পয়সা বেরুল না।

মুরী জংসনে ছোট গাড়ী থেকে বড় গাড়ীতে বদল করতে হয়, সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে গাড়ীর ভিতর খানিকটা জায়গা দখল করা গেল—বসবার মত নয়, কোনও রকমে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মত।

গাড়ী চড়া নয় ত যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করা। ভিতরের নিরীহ যাত্রীরা ছাতি, লাঠি, হুঁকোর নল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র জানালা দিয়ে বার ক'রে বসে আছে, যেন এক একটি মেশিন-গান্ মুখ বার ক'রে রয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা শিখ ও একটা মাড়োয়ারী দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে যাত্রী এসে দরজার ওপর আঘাত করছে—'এই যানে দেও'। তারা কিন্তু নির্ব্বিকার। নেহাৎ বিরক্ত করলে অনিচ্ছাসত্ত্বে ঠোঁট দুটি নেড়ে বলে,—আরে ভাগো, দুসরা গাড়ীমে যাও। যেন প্লাটফরমের এই যাত্রীতরঙ্গের যাওয়া-আসার সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। তাদের পৌঁছে দেওয়া ছাড়া এই এত বড় এঞ্জিনসুদ্ধ গাড়ীটারও যেন আর কোন প্রয়োজনই নেই।

আমরা যখন পাঁচ ছয়জন মিলে গাড়ীটাকে আক্রমণ করলুম তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াল। শিখ ও মাড়োয়ারী দুজনের শক্তিতে কুলোল না। আরও দু-এক জন তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। বাকী লোকগুলো বিভিন্ন ভাষায় অথচ একস্বরে আমাদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করলে। যতগুলি লোক স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় গাড়ীর ভিতর স্থানলাভ করেছে তারা যেন সব এখন একদেশের লোক অন্যদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

কিন্তু জয় আমাদেরই হ'ল। সজোরে দরজা ঠেলে হুড়মুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়লাম, ভিতরের অধিবাসীবৃন্দ আমাদের মোটেই ভালভাবে অভ্যর্থনা করলে না। একটি মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক—বোধ হয় দ্বাররক্ষক মাড়োয়ারী প্রভুটির স্ত্রী হবেন—বেঞ্চির উপরে স্থানাভাবে দুটো বেঞ্চির মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বিছানা পেতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ দৃঢ়ভাবে জায়গাটা দখল

ক'রে বসে আছেন। লজ্জাধিক্যবশতঃ মুখ ছাড়িয়েও অনেকখানি অবধি ঘোমটা টানা। হাতের মোটা বালা দুটোর ওজন বোধ হয় সাধারণ দাঁড়িপাল্লায় করা যায় না।

তিনি তারস্বরে এই মৎস্যাহারী, দুর্দ্দান্ত 'বাঙগালী' ছেলেদের সম্বন্ধে নানারূপ কটূক্তি করতে লাগলেন। ঘোমটাটা কিন্তু টানাই আছে, শুধু প্রচণ্ডবেগে এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্য্যন্ত দুল্‌ছে।

মাছের ওপর মাড়োয়ারীদের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার কারণ আমি ভেবে পেয়েছি। গরু, শূয়োর, ঘোড়া, গাধা, সাপ, ব্যাঙ্ সব জন্তুর চর্ব্বিই ঘিয়ের সঙ্গে মেশান যায়। কিন্তু মাছের মত এমন একটা সহজলভ্য জীব যে ঘি-প্রস্তুতের কোনও কাজেই লাগে না এইটেই বোধ হয় ওদের সব চেয়ে বিক্ষোভের কারণ।

কিন্তু এই মৎস্যভুক্ জীবগুলি তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না। ঠেলে-ঠুলে আমরা খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা করে নিলুম।

গাড়ীর দেয়ালে একটা ফ্রেমে আঁটা বাংলা অক্ষরে লেখা আছে,—'মাত্র ১৮ জন বসিবেক'। স্বভাবতঃ আমার কৌতূহল হ'ল। গুণে দেখলাম আমাকে নিয়ে সর্ব্বসুদ্ধ একচল্লিশটি নরনারী গাড়ীর মধ্যে অধিষ্ঠান করছেন। কোম্পানীর প্রভুরা যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তা আজ নিঃসংশয়ে অনুভব করলুম। আরও একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করলুম যে, ঘরে পয়সা এলে তাঁদেরই তৈরি করা আইন যাত্রীরা লঙ্ঘন করলেও তাঁরা অসন্তুষ্টই হন না।

মনে পড়ে গেল কলকাতার রাস্তার ধারে সার্জ্জেণ্টরা কি রকম ভাবে বাজের মত তীব্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে—কোথায় বাসে নির্দ্দিষ্টের চেয়ে একটা বেশী লোক যাচ্ছে তাই ধরবার জন্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায়, একই নিয়মের শাসন-পদ্ধতির কি অদ্ভুত পার্থক্য তা মনে ক'রে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

গাড়ীটা বেশী বড় নয়। যাত্রীরা বেশীর ভাগই দাঁড়িয়ে আছে। যারা বসে আছে তাদেরও পা-দুটি ছাড়া শ্রেণীর মাঝখানকার জায়গাগুলি সবই বিছানায় ভরা। দরজার সামনে দুটো বড় বড় ট্রাঙ্ক দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে পড়ে আছে। দুজন লোক তার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। একটি মেয়ে আবক্ষ ঘোমটা টেনে এককোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বস্ত্রাবাসের ভিতরে যে একটা সত্যিকার জীবন্ত মানুষ অবস্থান করছে, বাইরে থেকে তা কারুর বুঝবার জো নেই। উপরের বাক্সগুলি বিচিত্র আসবাবে ভর্ত্তি। স্থানাভাবে একটার উপর একটা, তার উপর আর একটা এই রকম ভাবে রাখা হয়েছে। গাড়ীর দোলায় তারা যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য নীচের দিকে নেমে আসে, তবে গভীর রাতে আধঘুমন্ত যাত্রীরা যে প্রীত হবে না তা বলাই বাহুল্য। বাক্সের সেই অদ্ভুত স্থানাভাবের মধ্যেও একটি ভদ্রলোক অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বিশাল ভুঁড়ি ও সুবৃহৎ গুম্ফরাজি নিয়ে উপরে একটি বিছানা ক'রে দিব্যি সটান শুয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণার সহিত নীচের স্তূপাকার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখছেন।

গাড়ী ছাড়তে তখনও দেরি আছে। ভেবে দেখলুম যে একবার যখন গাড়ীর উপর চড়া গেছে তখন এই কামরাতেই ভ্রমণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এখন নেমে প্লাটফরমের ওপর খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ালে বোধ হয় ক্ষতি হবে না। নেমে পড়লুম। ষ্টেশনের গলায় আলোর মালা দুল্‌ছে। নানাদেশের নানাজাতির কালো সাদা লোক উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। দূরে সীমাহীন প্রান্তর অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে,—আর তারই বুকের ওপর সুদীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী অস্পষ্ট মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যেন জমাট বাঁধা অন্ধকারের এক একটা বিরাট স্তূপ।

একটা ফার্ষ্টক্লাস কামরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ছোট্ট কুঠ্‌রিটি,—বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় ঘরের উড্ডনশীল জিনিষগুলি চঞ্চল। জানালার দিকে বেঞ্চে একটি শ্বেতচর্ম্মা তরুণী, দেখে আমেরিকান বলে বোধ হ'ল—রূপে চারিদিক আলো ক'রে বসে আছেন। তাঁর

পুরুষ গুঞ্জ ধ্বনি করছে। তিনিও সকলের ওপর নিরপেক্ষ ভাবে হাস্যে, স্পর্শে, কটাক্ষে মধুবর্ষণ করছেন।

তন্ময় হয়ে দেখছিলাম,—এমন সময় বাধা পড়ল। একটা খাবারের গাড়ী পিছন দিক থেকে ঘড় ঘড় ক'রে এসে আমার কাছেই থাম্‌ল। গাড়ীটার কাচের জানলা ভেদ ক'রে লুচিগুলির রুক্ষ কঠিন চেহারা চোখে পড়ছে,—যেন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের মত। মনে হচ্ছে কত যুগ যুগান্তর ধ'রে ওরা ওখানে অপেক্ষা করছে। বাইরে আসবার জন্যে যেন ওদের আকুলতার অবধি নেই। এই খাবারওয়ালারা কোম্পানীর লাইসেন্স পাওয়া লোক, সুতরাং ওরা যা-কিছু বিক্রী করে সবই অতি উৎকৃষ্ট এবং আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর।

আবার চল্‌তে আরম্ভ করলুম। এটা ইণ্টার ক্লাস, নাগরা-পরা একটি একুশ বাইশ বছরের মেয়ে স্বামীর সঙ্গে-অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চলেছে। কুলীদের ধমক দিয়ে জিনিষ-পত্রগুলি গাড়ীতে তুল্‌তে সে-ই যেন বেশী তৎপর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুটি লোক আরোহণ-উৎসুক দরিদ্র যাত্রীদের দেড়া ভাড়ার সম্বন্ধে সচেতন করছে।

আর একটি ছোট্ট গাড়ী,—থার্ডক্লাস। দরজায় লেখা আছে—'সার্ভেণ্টস্'। দুটি মাত্র লোক হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে, আরামে, নির্ব্বিবাদে। প্রভুর পরিচয় তারা সগৌরবে বহন করছে পেটের ওপর বাঁধা ক্ষুদ্র একখণ্ড পিতলের চাক্তিতে।

তারপর একখানা গরাদ দেওয়া গাড়ী। মাত্র একটি কুক্কুর-দম্পতি এই কুঠরীটির যাত্রী। কুকুরটি অতি আদরে তার সঙ্গিনীর মুখ চেটে দিচ্ছে। এত জনসমাগমেও ওদের মিলনের সঙ্কোচ নেই। ওরা যেন ও-দেশের প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মনে হ'ল দরিদ্র দেশের তৃতীয় শ্রেণীর ভদ্র যাত্রীদের চেয়ে সাহেবের খানসামা ও জীব বিশেষ অনেক সুখী।

গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা বাজল। যাত্রীসঙ্ঘ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চা-ওয়ালারা যাদের ধারে চা দিয়েছে করছে। এক ভদ্রলোক খাবারওয়ালার কাছ থেকে লুচি মিষ্টি খেয়েছেন, পয়সা দেবার সময় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গাড়ীর শেষ ঘণ্টা পড়ল। দলে দলে যাত্রী ব্যাকুল হ'য়ে দরজায় দরজায় ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু প্রবেশ-পথ অত্যন্ত দুর্গম। ও-পাশ থেকে একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক একটি ঘোমটা-টানা জড়পদার্থের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে আসছেন।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। এঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় আকাশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমে গাড়ী প্লাটফরম্ ছাড়িয়ে গেল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক এখনও পাগলের মত ছুটছেন।

গাড়ী ছুটে চলেছে—উল্কার মত। এঞ্জিনের সামনের সার্চ্চলাইট্‌টা অন্ধকারের পাহাড়গুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন মহাশূন্যে মৃত্যুর অভিসারে ছুটে চলেছি। বাইরের দিগন্তবিস্তৃত, নিরাবরণ প্রান্তর ও তমসাচ্ছন্ন বৃক্ষশ্রেণী তন্ময় হয়ে আমাদের এ নৈশ অভিযানের দিকে চেয়ে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে ঘুমোবার অভ্যাস আমার আছে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখলুম দূরে আকাশের বুকে যেন আগুনের হোলিখেলা চলেছে। বুঝলুম টাটানগরের কাছে এসে পৌঁছেচি। গাড়ী আরও এগিয়ে চল্‌ল। কারখানার ব্লাষ্ট-ফার্ণেসের গহ্বর থেকে অগ্নির লক্ষ লক্ষ ফণা বাতাসে ছোবল মারছে। ষ্টেশনে যেন দীপালির উৎসব চলেছে।

গাড়ী প্লাটফরমে এসে থামল। ওঠা-নামায় যাত্রীদের মধ্যে রীতিমত একটা সংঘর্ষ বেধে গেল। আমাদের দরজার কাছে বেজায় ভিড়। বাঙ্কের ওপরের গজোদর, বৃহৎগুম্ফ ভদ্রলোকটি এতক্ষণে অনেক চেষ্টার পর গাড়ীর মেঝেতে পদার্পণ করলেন। তারপর তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে দরজা আটক ক'রে দাঁড়ালেন।

গাড়ী যখন প্রায় ছাড়ে তখন একটি কুড়ি একুশ বছরের ফর্সা ছেলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছে এসে

হাতে শুধু একটা চামড়ার ব্যাগ, ছেলেটি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল,—যেতে দিন।

ভদ্রলোক মুখ বিকৃত ক'রে বল্‌লেন,—যাও যাও, অন্য গাড়ী দেখগে। এখানে জায়গা নেই।

ছেলেটি শান্ত স্বরে বল্‌লে,—সে সম্বন্ধে ত আপনার কাছে কোনও উপদেশ চাইনি। জায়গা থাক্ বা না থাক্ আমি এই গাড়ীতেই যাব।

ভদ্রলোক রাগে লাফিয়ে, ভুঁড়ি দুলিয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লেন,—ওঃ, লাটসাহেব আর কি! এই গাড়ীতেই যাব। যাও ত তোমার ঘাড়ে কটা মাথা দেখি। বলে তিনি দরজাটা আরও জুড়ে দাঁড়ালেন।

ব্যাপার দেখে আমরা ছেলেটির সাহায্যের জন্য ভিড় ঠেলে এগুচ্ছি এমন সময় সে বললে,—আচ্ছা, never mind. গাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌বার আরও অনেক রাস্তা আছে। দেখি আপনি কি করে আট্‌কান। বলে ছেলেটি মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা জানালার কাছে এগিয়ে এল। তারপর ব্যাগটা ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, জানালায় দুহাত লাগিয়ে, অদ্ভুত কৌশলে ভিতরে এসে ঢুকল। কেউ কোনও রকম বাধা দেবার পর্য্যন্ত অবসর পেল না। গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু করেছে। ভদ্রলোক তাঁর ব্যর্থ কৌশল ও বৃথা দর্পের কথা স্মরণ ক'রে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছেন।

গাড়ীর বেগ বাড়ছে,—ভদ্রলোক এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটি এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের হাতখানা ধরে ফেললে। বললে,—রাগ করতে আছে কি দাদা? আমি আপনার ছোট ভাইটির মত। গাড়ীতে যদি উঠতে না পেতাম আপনিই পরে দুঃখ পেতেন।

ভদ্রলোক এ কথাগুলিকে বিদ্রূপ মনে করে আরও বেশী জলতে লাগলেন। কথার কোনও উত্তর দিলেন না, কিন্তু চোখ দিয়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হ'তে লাগল।

ছেলেটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললে,—আপনাকে এমন রাগ ক'রে থাক্‌তে আমি কিছুতেই দিতে পারি না। আসুন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্, নইলে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হবে না। মার হাতের তৈরি চমৎকার ফুলকো

রকম জোর করে টেনে এনে, মেঝেতে পাতা একটা বিছানার ওপর বসিয়ে দিলে। তারপর তাঁর পাশে বসে এমন করে গল্প সুরু করে দিলে যেন কতকালের পরিচিত বন্ধু। বিছানাটা যে অপরের এবং এর মালিকের যে এ রকম অনধিকার উপবেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকতে পারে তা যেন তার ভাববার প্রয়োজনই নেই। ভদ্রলোক ক্রমে নরম হয়ে এলেন।

ক্রমে সেই চামড়ার ব্যাগটা খুলে গেল ও তার ভিতরের একটা পিতলের চৌকো কৌটা থেকে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ভদ্রলোক প্রসারিত খাদ্যদ্রব্যের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমরা?

ছেলেটি ঈষৎ হাসলে। তারপর সার্টের ভেতর থেকে শুভ্র যজ্ঞোপবীতের গোছাটি টেনে নিয়ে দেখাল। ভদ্রলোক লুচিসুদ্ধ হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে শশব্যস্তে বল্‌লেন,—'ব্রাহ্মণ'! তারপর বিনা দ্বিধায় লুচির সঙ্গে ডিমভাজা সংযোগ ক'রে চর্ব্বণ করতে আরম্ভ করলেন।

ভোজন-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। গাড়ী তখন পুরো বেগে ছুটছে। বেশীর ভাগ যাত্রীই ঘুমের ঘোরে নানা ছন্দে দুলছে। শুধু গাড়ীর এক প্রান্তে অপর একজনের বিছানা অধিকার করে, এক প্রৌঢ় সগুম্ফ ভদ্রলোকের সঙ্গে এক গুম্ফশ্মশ্রুহীন যুবকের সুখদুঃখের আলোচনা নিবিড় হয়ে উঠেছে।

খানিকক্ষণ পরে বোধ হয় ভদ্রলোকটিরও নিদ্রাকর্ষণ হ'ল; যুবকটির উদ্দেশ্যে বল্‌লেন,—আচ্ছা ভায়া, এবারে একটু শোবার যোগাড় করা যাক। আমি ত বাঙ্কের ওপর একটু জায়গা করে নিয়েছি, কিন্তু তোমারও ত একটু গড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হত।

ছেলেটি হেসে বল্‌লে—বিলক্ষণ, আমার আবার ঘুম। সেই সাত বছর বয়স থেকে ট্রাভেল্ করছি কিন্তু গাড়ীতে কখন ঘুমোতে পারি না। এই ধরুণ না কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে কালকা গেলুম, কটা রাত ঠায় বসে, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত বুজিনি।

বিস্ময়ের আবেগে ভদ্রলোকের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত

তোমাদের কথাই আলাদা। কিন্তু আমাদের বয়সটাও ত অনেকটা গড়িয়ে এল। তাহলে তুমি বস, আমি একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই।

ভদ্রলোক বাঙ্কের ওপর চড়বার পথ খুঁজতে লাগলেন। বেঞ্চের ওপরে-ঘেঁষাঘেষি ভাবে সার বেঁধে যাত্রীরা ঘুমের ঘোরে গাড়ী চলার তালে তালে মাথা নাড়ছে। কোথায় একটু চরণস্থাপন করে ওপরে ওঠবার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। আরোহণকালে লোকগুলির শ্রীঅঙ্গে পাদস্পর্শ হলে তারা তাঁকে কি ভাবে যে আপ্যায়িত করবে, সে কথা মনে করে তিনি অতি সন্তর্পণে ওপরে উঠবার জন্যে নানারকম কসরৎ করতে লাগলেন। অনেক কষ্টে খানিকটা উঠেছে এমন সময় একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি শুনতে পেলুম, দেখলুম ছেলেটি মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে দুই হাতে বুক চেপে ধরে আর্ত্তনাদ করছে, ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, কি হয়েছে দেখবার জন্যে। ভদ্রলোকটির বিশাল পদযুগলের একটি তখন অনেক কষ্টে ওপরে স্থান লাভ করেচে এবং আর একটি তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তিনি ছেলেটার অবস্থা দেখে উঠবেন কি নেমে আসবেন, এই ভাবতেই ভাবতেই বোধ হয় সেই অবস্থায় ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগলেন ?

আমি ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েছে।

সে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বল্লে—বুকে হঠাৎ কি রকম একটা pain হচ্ছে।

ভদ্রলোক তখনও ঝুলছেন, বল্লেন—ফিক ব্যথা, না কলিক ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বিরক্তস্বরে বলে উঠল,—নেমে দেখুন না মশায় কি হয়েছে। খাবার বেলায় ওর মুখের জিনিষ নিয়ে খুব ত বাগিয়ে খেলেন।

অগত্যা ভদ্রলোককে নামতে হ'ল। নামা কি সোজা ? অনেক কষ্টে যখন অবতরণ কার্য্য সমাপ্ত হ'ল তখন পরিশ্রমের আতিশয্যে তিনি হাঁপাচ্ছেন। সকলের চেষ্টায় ছেলেটি যখন একটু সামলে উঠল তখন আমরা প্রস্তাব করলাম যে, ওকে একটু শোবার জায়গা করে দেওয়া হোক। এ রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে আর বসে যাওয়া চলে না।

কিন্তু শোবার জায়গা কোথায় ? মেঝেতে যারা বিছানা পেতে শুয়েছিল, তারা আত্মত্যাগের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাবার সুযোগ পেয়েও রাজী হ'ল না, অবশেষে স্থির হ'ল যে, ভদ্রলোকের বিছানাতেই ওকে তুলে দেওয়া হোক।

এ-রকমটা যে ঘটতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। যাত্রার প্রারম্ভে অনেক কৌশলে তিনি সুনিদ্রার আয়োজন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দৈবের পরিহাস দেখে তিনি সত্যিই আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু উপায় নেই। কিছু আগেই ওই অসুস্থ মানুষটির অনেক ভালমন্দ দ্রব্য উদরসাৎ করেছেন। চক্ষুলজ্জাও ত আছে। তিনি কেবল নিরুপায়ের মত মাথা চুলকে বল্তে লাগলেন, তাই ত আমি মোটা মানুষ, কিন্তু তাঁর মৃদু আপত্তিতে কেউ কান দিলে না। ধরাধরি করে ছেলেটিকে বাঙ্কের ওপরে তুলে দেওয়া হ'ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার যে যার জায়গা অধিকার ক'রে ঢুলুনির পুনরভিনয় আরম্ভ করলে—গাড়ী চলেছে একটানা অশ্রান্ত। বাঙ্কের শিকলগুলি ঝন্ ঝন্ করে তার চলার ছন্দে তাল দিচ্ছে। বাইরের অন্ধকার, রাত ক'রে ওঠা একফালি চাঁদের আলোয় ফিকে হয়ে এসেছে, আর ভেতরের বৈদ্যুতিক আলোটা মাতালের চক্ষুর মত স্তিমিত দেখাচ্ছে।

সারারাত ধ'রে গাড়ী চলল, মাঝে মাঝে ষ্টেশন,—যেন তন্দ্রাঘোরে ঝিমুচ্ছে। কচিৎ দু-একটা লোক নেমে যাচ্ছিল। ছেলেটি বোধ হয় এখন ভাল আছে, বেশ শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, ভদ্রলোকের কিন্তু সত্যই বড় কষ্ট হয়েছে, দেখলে দুঃখও হয়। শরীরের অপরিমিত মাংসস্তূপগুলিকে রাখবার জায়গা যেন বেচারা পাচ্ছে না।

ভোরের আলোয় রাতের অন্ধকার যখন গলে যেতে সুরু হয়েছে, তখন গাড়ী এসে সাঁতরাগাছিতে পৌছল। এখানে টিকিট কালেক্ট করে, সুতরাং গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

একটি বাবুগো... লোক বোধ হয় টিকিটের হাঙ্গামা করেন নি, তিনি গা... ছোট ঘরটায় ঢুকে দোর দিয়েছেন।

সুবৃহৎ ষ্টেশনের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এই নিস্তেজ আলোয় এখনও ঠিক চেনা যাচ্ছে না। ক্রমে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্য অন্য লাইনে আরও কয়েকটা ট্রেন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন কাকেদের কনফারেন্স বসেছে, তাদের কলধ্বনিতে তার আভাস পাচ্ছি।

বাঙ্কের উপরে ছেলেটি এতক্ষণে উঠে বসল। তার মুখের উপরে সুনিদ্রার তৃপ্তির চিহ্ন। নীচে নেমে সে ব্যাগটি তুলে নিলে, তারপর ভদ্রলোকটিকে একটি ছোট্ট নমস্কার করে বললে,—আচ্ছা দাদা, তাহলে আসি। আমাকে এইখানেই নামতে হবে, বলে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক যেন একটু মুখভারী ক'রে বললেন, তোমার বুকের ব্যথা সারল?

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেসে ফেললে। বললে দেখুন ইয়ে—কি বলে বুকের ব্যথা আমার কোনওদিনই নেই, কালও হয় নি। কিন্তু আপনার দয়ায় কাল দিব্যি ঘুমোনো গেছে, সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

আমরা যেন সব আকাশ থেকে পড়লুম, ভদ্রলোক লুচির স্বাদ ভুলে গেলেন। তার জাগরণক্লান্ত চিত্ত যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেললে। তিনি চীৎকার ক'রে বললেন,—তবে রে ছোটলোক চামার, ক্রোধের অতিশয্যে বাকি কথাগুলি তাঁর মুখ দিয়ে আর বেরুল না।

ছেলেটি কিন্তু রাগ করলে না। বললে—নেহাৎ মিথ্যে বলেন-নি দাদা। চামার না হলেও তার কাছাকাছি বটে, আমি জাতে নমঃশূদ্র।

ভদ্রলোক যেন আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার মুখ ছায়ের মত সাদা হয়ে গেল।

ছেলেটি আবার একটু হাসলে। বললে কিছু মনে করবেন না, পৈতেটা সঙ্গে সঙ্গে রাখি—সময়ে অনেক কাজ দেয়, বলে সে উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করলে, দেখতে দেখতে গেটের ভিতর দিয়ে তার দীর্ঘ দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ীময় তখন হাসির রোল উঠেছে। কিন্তু ভদ্রলোক নির্ব্বাক হয়ে বসেই রইলেন। গাড়ী আবার চলতে সুরু করল।

নারী সমবায় ভাণ্ডার

শ্রীঅবলা বসু

চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে বোম্বাইয়ের নারীগণ প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী দোকানের সহিত কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে প্রতিষ্ঠিত নারী সমবায় ভাণ্ডারের তুলনা করিয়াছেন। তিনি যে নিন্দাচ্ছলে লেখেন নাই তাহা জানি, তথাপি প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য নারী সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যের সফলতার বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়।

তিন বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বোম্বাইয়ে উক্ত স্বদেশী দোকান দেখিবার সুযোগ পাই। ইয়োরোপে থাকিতেই খবর পাই যে, বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত মহিলারা এমন কি পার্শী মহিলারাও খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার পরিচিত ধনী বংশের একটি বাঙালী মহিলা ইয়োরোপে আমাকে বলিলেন যে বোম্বাই হইতে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে উপহারের জন্য ইয়োরোপ হইতে বস্ত্রাদি লইতে বারণ করিয়াছেন, কারণ বোম্বাইয়ে কেহ আর বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করেন না। বোম্বাই পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, পার্শী গুজরাটী মারহাট্টী মহিলারা পালা করিয়া উক্ত দোকানে বিক্রেতার কার্য্য করিতেছেন, যে-গৃহে দোকানটি অবস্থিত তাহার মাসিক ভাড়া ২০০০৲। গৃহের মালিক নাকি এক বৎসরের জন্য উক্ত গৃহ স্বদেশী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনা ভাড়াতে দিয়াছেন। বস্ত্রব্যবসায়ীরা বিনা-সর্ত্তে বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়াছেন এবং দোকানের ব্যবসায়ের দিক্‌টা বস্ত্রব্যবসায়ীদের দ্বারাই পরিচালিত। বলিতে গেলে স্বদেশী দোকানটি বস্ত্রব্যবসায়ীদের উৎসাহে মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, ইহাতে মহিলাদের লাভ-লোকসান ছিল না, তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও শ্রম দিয়া সাহায্য করিতেছিলেন; ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরাই গৃহকর্ম্ম সমাধান করিয়া পালা

করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসিমুখে বিক্রেতার কাজ করিতেছিলেন, কাপড় মাপিতেছেন, পার্সেল বাঁধিতেছেন এবং মূল্য লইতেছেন। বোম্বাই শহরে পর্দা নাই তাহা সকলেই জানেন, সেখানে মেয়েরা অবাধে ট্রামে ও পদব্রজে যাতায়াত করেন। তথাপি এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য দোকানে ক্রেতার খুব ভিড় ছিল, সেজন্য মেয়েদের পরিশ্রমেরও শেষ ছিল না। আমি যখন দোকানে যাই তখন নানা রকমের কাপড় ছাড়া দোকানে অন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল না। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী দেখিয়া আসিয়াছেন বোম্বাইয়ের মিলে কত রকমের কত রঙ্গের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং সেখানে অবস্থাপন্ন ধনী লোকেরাও স্বদেশী ছাড়া বিদেশী ব্যবহার করেন না।

বাঙালা দেশে অর্থসাহায্য পাওয়া কঠিন, এখানকার যে দু-একটি দেশীয় মিল আছে তাহাদের আবার উদ্ভাবনী শক্তি কম। উত্তর-কলিকাতাবাসী কয়েকটি মহিলার এক স্থানে স্বদেশে উৎপন্ন সমুদয় জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নারীদের জন্য একটি দোকান খুলিবার আগ্রহ হইল। ১৯৩০ সালে আমার ইয়োরোপে যাইবার প্রাক্কালে নারী-শিক্ষা-সমিতি হইতে নারী সমবায় মণ্ডলী বলিয়া একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। উহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সকল অভাবগ্রস্তা নারী নারী-শিক্ষা-সমিতিতে শিক্ষা পাইয়া গৃহে বসিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে চান, তাঁহারা মণ্ডলীর অংশীদার হইয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ পাঠাইতে পারিবেন।

আমরা স্থির করিলাম, দু-এক জনের মুখাপেক্ষা না করিয়া নারী শিক্ষা সমবায় মণ্ডলীর শেয়ার বিক্রী করিয়া একটি স্বদেশী দোকান খোলা যাউক যাহাতে মহিলাদের প্রস্তুত জিনিষও থাকিবে এবং কাপড় প্রভৃতি নানা রকম স্বদেশী নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও থাকিবে। নারীশিক্ষা-সমিতির, বার্ষিক চাঁদা ৫৲। কিন্তু মণ্ডলীর সভ্যদের জন্য আমরা বার্ষিক চাঁদা ১৲ এবং প্রতিশেয়ার ৫৲ করিয়া স্থির করিলাম।

এইরূপ একটি দোকানের বিশেষ অভাব আছে দেখিয়া আমাদের কয়েকজন উৎসাহী মহিলা সভ্য উৎসাহের সহিত শেয়ার বিক্রী করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের এই প্রথম উদ্যম, আমরা কখনও এরূপ কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হই নাই সেজন্য যাঁহাদের নিকট আমরা শেয়ার বিক্রী করিয়াছি তাঁহাদের বলা হইয়াছে যে, কৃতকার্য্য হই বা না হই তাঁহারা যেন মেয়েদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া শেয়ার-ক্রয়ের টাকা দান-স্বরূপ মনে করেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ হইলে ৭২ বি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে নারী সমবায় ভাণ্ডার নাম দিয়া দোকানটি খোলা হইল।

এই দোকানটি যে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে তাহা শ্রীযুক্তা কিরণময়ী বসুর (স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পুত্রবধূর) অক্লান্ত পরিশ্রমে। তিনি প্রাণমন দিয়া ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সময় ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা চারুবালা মিত্র, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন, শ্রীযুক্তা ব্রহ্মকুমারী রায়, শ্রীযুক্তা সুরীতি বসু, শ্রীযুক্তা সুরমা সেন, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেনগুপ্ত এই কয়টি মহিলা পরিশ্রম করিয়া ভাণ্ডারটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কোথায় মাসিক দুই হাজার টাকা ভাড়া, কোথায় আমাদের মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়া; কোথায় বস্ত্রব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ও সাহায্য, কোথায় আমাদের ব্যবসায়ীদের কথা দূরে থাকুক বঙ্গীয় জনসাধারণের উদাসীনতা!

আমাদের মধ্যে একতা নাই। মেয়েদের অনুষ্ঠান, সুতরাং মেয়েরা এখানে ক্রয় করিয়া দোকানের সাহায্য করিব সে ভাব আমাদের নাই। কিন্তু যদি বা কখনও অন্য দোকান হইতে দু-এক আনা দামের পার্থক্য হয়, তাহা হইলে নিন্দার শেষ নাই। ভাণ্ডারটি কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে—ইহা লোকে মনে রাখেন না, যদি লাভ হয় তবে অংশীদাররাই তাহা পাইবেন এবং মেয়েরাই ইহার অংশীদার। দোকানে প্রত্যেক জিনিষ বিক্রয়ের কমিশন একমাত্র লাভ, দোকানের নিজস্ব জিনিষও নাই যাহা বেশী দামে বিক্রয় হইতে পারে, তবে ইহা হইতে পারে, যে, বাজার-দর সর্ব্বদা বদলায়, সেজন্য দু-এক সময় দামের তারতম্য হইয়াছে, কিন্তু মাত্র এক বৎসর দোকানটি প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিকাদিগকে ব্যবসায় শিখিতেও সময় লাগে। অন্ততঃ নারীগণ যদি নারীদের প্রতিষ্ঠিত দোকান বলিয়া সেখান হইতে তাঁহাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করেন তাহা হইলে দোকানটি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে নিশ্চয়। বোম্বাইয়ের সহিত আমাদের কোন বিষয়েই তুলনা করা যায় না তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু গৌরবের সহিত মুক্তকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিব, যে, কয়েকটি মহিলা প্রাণপণে এই দোকানটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নারীশক্তির জয় হইবেই। বঙ্গদেশের নারীরা কলিকাতায় বেড়াইতে আসিলে একবার ভাণ্ডারটি দেখিয়া পরিচালিকাগণকে উৎসাহিত করেন এই তাঁহাদের নিকট নিবেদন। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদেশপ্রত্যাগত বাঙালী পুরুষকর্ম্মীদের নিকট আমরা সব সময়ে উৎসাহ পাইয়াছি। তাঁহারা যেন পত্নীদের সহিত ভাণ্ডারে আগমন করিয়া আমাদের সাহায্য করেন।



ভারতবর্ষ

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব—

ব্রিটিশ ভারতের ফেব্রুয়ারী মাসের আমদানী রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে, জানুয়ারী মাসের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসে ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের তুলনায় ৯৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানির পরিমাণ ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ জানুয়ারীর তুলনায় ৮২ লক্ষ টাকা কম।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীর তুলনায় এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং তামাকের আমদানী ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কারখানাজাত পণ্যের আমদানী ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার এবং কাঁচা মালের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

চিনি, খাদ্য, শস্য, ময়দা, মদ্য এবং সিগারেট প্রভৃতির আমদানী হ্রাস পাওয়ার ফলেই খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির খাতে আমদানী এত কম হইয়াছে।

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় ৯৬ হাজার টন জাভা চিনি আসিয়াছিল। এ বৎসর আসিয়াছে ৪৯ লক্ষ টাকায় ৩৮ হাজার টন। বীট চিনিও মূল্য হিসাবে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ওজনে ২২ হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে।

সিগারেটের আমদানী ওজনে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউণ্ড হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৯ হাজার পাউণ্ডে এবং মূল্যে ১৩ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া মাত্র ২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

মদ্যের আমদানী পরিমাণে ৮ লক্ষ ১২ হাজার গ্যালন হইতে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার গ্যালনে এবং মূল্য হিসাবে ৪২ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৭ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিনের আমদানী ৪০ লক্ষ টাকা হইতে ৬৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে।

কারখানাজাত মালের মধ্যে সূতা ও সূতী জিনিষের আমদানী ২২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটর গাড়ীর আমদানী ২৬ লক্ষ টাকা এবং মোটর-বাসের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন হইতে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টনে—মূল্য হিসাবে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। গম ও চায়ের রপ্তানি

তুলার রপ্তানি পরিমাণে ৪৮ হাজার টন এবং মূল্যে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

পাটের রপ্তানি ৪৮ লক্ষ টাকায় ৫০ হাজার টন হইতে ৪৪ লক্ষ টাকায় ২১ হাজার টনে নামিয়াছে।

ভারতবাসীর দৈনিক আয়—

জনপ্রতি দৈনিক আয়—ভারতবর্ষে ৵১০, জার্ম্মানীতে ২৲, ইংলণ্ডে ২/৪ পাই, আমেরিকায় ৩৲ টাকা।

—

বাংলা

চিনির কারখানা ও ইক্ষুর চাষ—

ইদানীং বিদেশী বস্ত্রের ন্যায় বিদেশী চিনিও বর্জ্জন করিতে লোকেরা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বহু স্থানে চা'য়ে পর্য্যন্ত চিনির পরিবর্ত্তে গুড় ব্যবহৃত হইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ চিনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। এখন পুনরায় চেষ্টা করিলে চিনি যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন হইতে পারে। সহযোগী '২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ' বলেন—

ভারতের ৪৪টা চিনির কারখানা হইতে ৩০ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ৪৪টা চিনির কারখানার মধ্যে ৩০টা কারখানায় ইক্ষু রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই চিনির কারখানা আছে। কারখানা ব্যতীতও দেশী উপায়ে সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৪ লক্ষ মণ চিনি হয়। মোট ৮৪ লক্ষ মণ চিনি ভারতে উৎপন্ন হয়। বিদেশে চিনি আমদানী হয় ২৭০ লক্ষ মণ। দেশীয় প্রথায় চিনি উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে কেন-না তাহা ব্যয় সাধ্য।

আগামী ৭ বৎসরের জন্ম চিনির উপর শতকরা ৭০ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাংলা দেশে অনেকগুলি ছোট কারখানা স্থাপন করা সম্ভব। আমরা আশা করি বাঙালী যুবকগণ চিনিরসায়নজ্ঞ লোকের সাহায্য লইয়া ও ব্যবসায়ীর সহিত সহযোগিতা করিয়া চিনির কারখানা স্থাপন করিবেন।

কর-প্রদানে হিন্দু-মুসলমান—

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়হিসাবে কতজন ও কি পরিমাণে কর সরকারকে প্রদান করেন নিম্নের হিসাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে। হিসাবটি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

গ্রামের বিবরণ

	মুসলমান	অমুসলমান	মোট
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সদাতা	৩৩৭১৬০৭	২২০২২৬৬	৫৫৭৩৮৭৩
ইউনিয়ন কমিটিতে ট্যাক্স-দাতার সংখ্যা	১৩৮১	১৮১২৭	২৯৫০৮



ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কলিকাতা ব্যতীত সহর			
কলিকাতা, হাওড়া ও দার্জ্জিলিং ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটী-সমূহের ট্যাক্সদাতা	৯৩১৮৩	২৬২৭২৭	৩৫৫৯১০

কৃতী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন রায়—

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত নরোত্তমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন রায় দ্বাদশ বৎসর কাল বিলাতে থাকিয়া হিসাব পরীক্ষা কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সংপ্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের হিসাব-পরীক্ষক বোর্ড (Scottish Board) হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম। অবনী-বাবু ষোল বৎসর ব্রহ্ম-সরকারের অধীন কর্ম্ম করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে গমন করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও উৎসাহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্রী—

শ্রীমতী কমলরাণী সিংহ ১৯৩১ সনে এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয়ের ডি গ্রুপে অর্থাৎ বেদান্তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং সকল পাঠ্যসমষ্টির ফলের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছেন। কমলরাণী সোণামণি ও হেমচন্দ্র গোস্বামী পদকও লাভ করিয়াছেন।

অমৃত সমাজ—

যুগে যুগে সমাজে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়া থাকে। যাহারা নূতনকে অভিনন্দন করিয়া লইতে অক্ষম তাহারা মৃতপ্রায়। হিন্দুর সমাজ নূতনকে গ্রহণ করিবার শক্তি হারাইয়াছে বলিয়াই আজ তাহার এই দুর্গতি। এই দুরবস্থায় যুগধর্ম্মের শিক্ষানুযায়ী যাঁহারা ইহার সংস্কারেচ্ছু তাঁহারা বাস্তবিকই সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ। অমৃত সমাজ এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। ইহা হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমাজদেহের বিবিধ কলঙ্ক ও ক্ষত অপনোদন করিয়া ইহাকে সুস্থ করিতে বদ্ধপরিকর। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এবং অস্পৃশ্যগণের শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, বাল্যবিবাহ বর্জ্জন, বিধবাবিবাহ সমর্থন ও প্রচলন, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সৎশিক্ষা প্রদান অমৃত সমাজের কর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন প্রমুখ কর্ম্মিগণের চেষ্টায় কয়েকটি বিদ্যালয়-ও স্থাপিত হইয়াছে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ৫।১ওলাইচণ্ডী রোডস্থ পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে সাধারণ বিদ্যা ছাড়া বিবিধ কারুশিল্পও ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১০ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটেও কলিকাতা হিন্দু একাডেমি নামে আর একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমাজের অনুকূল্যে এ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। অনাথা ও নিরাশ্রয়াদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠারও সঙ্কল্প সমাজের আছে। ৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা অথবা পি২১৬, বালিগঞ্জ এভিনিউ, কলিকাতা—ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে অমৃত সমাজ সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া যাইবে।

—

বিদেশ

আয়ার্লণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-প্রচেষ্টা—

আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা বহুমুখী ও বহু শতাব্দী ব্যাপী। বহু শতাব্দীর জীবনান্তকর চেষ্টার পর ১৯২১ সনের ৬ই ডিসেম্বর আয়ার্লণ্ডের ও ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে বোঝাপড়া হইয়া যায় তাহার ফলে আয়ার্লণ্ড-বাসীরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ক্যানাডার মত আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ প্রয়াসী আয়ার্লণ্ডের অত্যগ্রসর দল ও তাঁহাদের নেতা শ্রীযুক্ত ডি ভ্যালেরা এইটুকু আত্মকর্তৃত্বলাভে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আত্মকর্তৃত্ব প্রাপ্ত আয়ার্লণ্ড-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই স্বরাজের আমলেও ডি ভ্যালেরা একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। সাধারণতন্ত্র স্থাপনপ্রয়াসী সেনারাও দলে দলে কারাগার পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে ডি ভ্যালেরা বুঝিতে পারিলেন যে, স্বদেশীয়গণ পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহার সংশোধনার্থ নিয়মানুগ আন্দোলন চালানই শ্রেয়, কারণ তাহা অধিকতর ও আশু কার্য্যকরী। এই হেতু ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রীদল আয়ার্লণ্ডের পার্লামেণ্টে স্বাধিকার বিস্তার করিতে মনস্থ করিলেন। বিগত কয়েক বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে এ-বৎসর সাধারণতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন এবং নেতা ডি ভ্যালেরা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সন্ধির সর্ত্তের যে-যে দফায় সাধারণতন্ত্রীদের ঘোর আপত্তি ছিল ডি ভ্যালেরা সভাপতি পদে বৃত হইয়াই তাহা বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বংশপরম্পরায় আয়ার্লণ্ড কর্তৃক ইংরেজ রাজের আনুগত্য স্বীকার সন্ধিপত্রের এরূপ একটি আপত্তিজনক দফা। দফাটি ইংরেজীতে এইরূপ,—

I...do solemnly swear true faith and allegiance to the constitution of the Irish Free State as by law established and that I will be faithful to H. M. King George V., his heirs and successors by law, in virtue of the common citizenthip of Ireland with Great Britain and her adherence to and membership of the group of nations forming the British commonwealth of nations.

শপথের তিনটি অংশ,—(১) আয়ার্লণ্ড-সরকারকে মানিয়া চলা, (২) ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করা, এবং (৩) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকা।

ডি ভ্যালেরা আরও একটি বিষয় রদ করিতে মানস করিয়াছেন। সন্ধির সর্ত্তের মধ্যে স্থান না পাইলেও ইংরেজ-সরকারকে আয়ার্লণ্ডের বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট হারে সেলামী দেওয়া তখন স্থির হইয়াছিল। ডি ভ্যালেরা এই অপমানকর প্রথাটিও তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর।

আইরিশ নেতার এই স্পষ্ট উক্তিতে ইংরেজ-সরকারের টনক নড়িয়াছে। বিলাতে একদল লোক ডি ভ্যালেরার প্রস্তাবের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লোপের বীজ উপ্ত দেখিয়া সাজ সাজ রবে দেশবাসী তথা সরকারকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, আয়ার্লণ্ডকে আশু প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিলে ভারতবাসীরাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীষণ অনর্থ ঘটাইবে। আয়ার্লণ্ডকে সায়েস্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও 'লৌহ শাসন' চালানো তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত।

আয়ার্লণ্ডের শান্তিপূর্ণ এই স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় পরাধীন দেশের সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা না থাকিলেও আজ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাকামী লোকেরা তাহার এই সাধু প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছে।

আলোচনা

"দেশের পথে"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের 'দেশের পথে' গল্পটিতে অসহায় উৎকলীয় মজুরের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা পরিস্ফুট। কিন্তু গল্পটির উদ্দেশ্য, সমবেদনা প্রকাশ করা কি একটা সমগ্র জাতি বা সমাজকে ব্যঙ্গ করা বোঝা কঠিন।

শ্রীভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী।

গল্পটিতে এরূপ কোন অসৎ অভিপ্রায় নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

—

বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘ

মাঘ মাসের প্রবাসীর ৬০৪ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিয়াছেন, "বর্ণাশ্রমীদের কন্‌ফারেন্সও হইয়াছিল। ... ইঁহারা বর্ণাশ্রমবিহিত স্বরাজ চান। ...। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বরাজটি কি প্রকার চীজ হইবে তাহা বোধাতীত।"

এই কন্‌ফারেন্স্‌ যে "বর্ণাশ্রম বিহিত স্বরাজ" চান, এই তথ্য আপনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ?* এই শব্দগুলি কন্‌ফারেন্সের কোন মন্তব্য বা প্রচারপত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। আমি এই পত্রের সহিত ঐ কন্‌ফারেন্সের স্বাগতকারিণী সভার ছাপা বিবৃতি * একখণ্ড পাঠাইলাম। ইহার তৃতীয় প্যারাগ্রাফে দেখিতে পাইবেন।

"এই বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘের মূল উদ্দেশ্য,—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত চিরন্তন সদাচারসম্মত সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধন, এবং সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ্যলাভ ও তদনুকূল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করণ।"

আপনি নিজ-কল্পিত* কয়েকটি শব্দকে এই সভার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু সভার উদ্যোগিগণ যাহাকে সভার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। *

আপনি লিখিয়াছেন, "ইঁহারা বংশাৎ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি চান। সুতরাং ইঁহাদের এ যুগের পরিবর্ত্তে অতীত কোনও একটা সময় বাছিয়া লইয়া তাহাতে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল।"

কিন্তু কোনও বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করা কি ইঁহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে ? ভগবানের ইচ্ছায় ইঁহারা এ যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে ভগবানের এই কার্য্য আপনার মনঃপূত হয় নাই। †

আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু আপনার শ্লেষবাক্যের কি ইহাই অর্থ নহে যে, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত হিন্দুধর্ম্মে যাঁহারা আস্থাবান,—যথা রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ,—যথা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺বালগঙ্গাধর তিলক,—তাঁহারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী, অতএব এখনকার এই সভ্যযুগে বাঁচিয়া থাকিবার তাঁহারা অধিকারী নহেন ? সনাতন পন্থীদিগকে আপনি ভ্রান্ত বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যে-মত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা প্রচার করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, এ কথা যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে অন্ধ গোঁড়ামীর অভিযোগ আনা যায় না কি ?‡

আপনি বলিয়াছেন, "বংশাৎ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য" এই সভার উদ্দেশ্য। ইহাও আপনার কল্পিত। * সভায় উদ্যোগিগণ কোথাও এ-কথা বলেন নাই। এই সভা মনুর স্মৃতির সমর্থক, কিন্তু ইঁহাদের মতে মনু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারাও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি সকল ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগকে ভগবান-জ্ঞানে পূজা করেন। অধিকন্তু এই সভা কেবল ব্রাহ্মণদের সভা নহে। সকল বর্ণের হিন্দু ইহাতে যোগদান করিয়াছেন।‡‡

আপনি বাল্যবিবাহের কথা বলিয়াছেন। আপনার মতে বাল্য-বিবাহের বহু দোষ, শাস্ত্রকারগণের মতে বালিকার অল্পবয়সে বিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, বিলম্বে বিবাহের বহু দোষ। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিবে, কিন্তু অসহিষ্ণুতা কেন ?** ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক একত্র থাকে, তাহাদের সামাজিক আচার বিভিন্ন, এখানে পরমত-সহিষ্ণুতা না থাকিলে সকলের একত্র শান্তিতে বাস করা কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সহজ সত্যের উল্লেখ করিতে আমি লজ্জিত হইতেছি।

আমি এরূপ আশা করি না যে, আপনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বাল্যবিবাহ সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমি কি ইহা আশা করিতে পারি না যে, আপনি এই সকল বিষয় সহিষ্ণুভাবে আলোচনা করিবেন ?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* কোন কোন দৈনিক কাগজে প্রকাশিত বৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সভার বিবৃতি সভার উদ্যোক্তারা আমাকে পাঠান নাই। কল্পনা করিয়া কিছু লেখা আমার অভ্যাসবিরুদ্ধ। পুরাকালে যেরূপ বর্ণাশ্রম ছিল এখন তাহা নাই, উহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব, এবং বর্ণাশ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরাজ্য স্থাপন অসম্ভব—ইহা এখনও আমার মত।—প্রবাসীর সম্পাদক।

† লেখক পরিহাসের গম্ভীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভগবান্ যাঁহাদিগকে যে যুগে পাঠান, তাঁহাদের সেই যুগের উপযোগী কাজ করা উচিত।—প্রবাসীর সম্পাদক।

‡ এই সকল প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। লেখক যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্ণাশ্রমের সমর্থক ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহাদের জীবিতকালে "বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘ" নামক খিচুড়ীর সৃষ্টি না-হওয়ায় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতপ্রকাশের সুযোগ হয় নাই।

কাহারও বিশ্বাসানুযায়ী মতপ্রকাশে আমি কখনও বাধা দিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু সকলের মতের আলোচনা করিবার অধিকার আমার আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

* কল্পনা নহে, অনুমান।—প্রবাসীর সম্পাদক।

‡‡ যত হিন্দুই ইহাতে যোগদান করুন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম মানিলে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্যও মানিতে হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

** অসহিষ্ণুতা নাই; যাহা অনেক প্রাচীনতম শাস্ত্রের মতেও অনিষ্টকর তাহাকে অনিষ্টকর বলিবার অধিকার আমার আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তারা

চৈত্রের 'প্রবাসী'তে "তারা" শীর্ষক প্রস্তাবের শেষভাগে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ে তারা যে মদ্যপান করিয়াছিলেন এবং রাম যে সীতাকে আদর করিয়া মৈরেয়ক মদ্য পান করাইয়াছিলেন তাহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক তারা এবং সীতার চরিত্রকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রজনীবাবুর এই মন্তব্যে আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভারতবর্ষে এমন লোক কখনই ছিল না যে সীতার চরিত্র হেয় করিতে ইচ্ছা করিতে পারে। আর দেশের প্রথা অনুসারে রাম যদি একটু মদ্যপান করিতেনই এবং সীতাকেও একটু পান করাইতেন অথচ যখন তাঁহারা মত্ত হইতেন না তখন তাঁহাদের চরিত্র হেয়ই বা কেন হইবে? মদ্যপান করা যে সেকালে অত্যধিকরূপে প্রচলিত ছিল তাহা রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ এবং কালিদাসের কাব্য পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। রাম যে সীতাকে মদ্য পান করাইয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু ইহা যে তদানীন্তন দেশ-প্রচলিত প্রথার প্রতীক ইহা মনে করা যাইতে পারে। যে-কার্য্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, যাহাতে স্বাস্থ্য হানি হয় না, যাহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না এমন কার্য্যে দোষ ধরা উচিত নহে।*

তারার প্রতি এই অভিমত আরও অধিকরূপে প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন একটি অনার্য্য-জাতীয় নারী। তাঁহার সমাজে মদ্যপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তিনি নূতন স্বামী সুগ্রীবের সহিত মদ্যপান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহারা রামলক্ষ্মণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণ অতিমাত্রায় কুপিত হইয়া সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তারাই বিলাস ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। লক্ষ্মণকে প্রসন্ন বা বশ করাই অবশ্য তারার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে-ভাবে সজ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া রামায়ণে বর্ণনা আছে তাহাতে রামায়ণকারের মনুষ্য-চরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। এমন আচরণে বিশেষত একজন অনার্য্য-জাতীয় নারীর হেয় হইবার কি থাকিতে পারে?

ভালমন্দ নির্ণয় করিবার মানদণ্ড সকল সমাজের এবং সকল মানুষের একরূপ নহে। আমি যে, কার্য্য দুষ্ট বলিয়া মনে করি এবং ঐতিহাসিক কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির চরিত্রে যদি সেই কার্য্যের আরোপ দেখি, তাহা হইলে সেই আরোপ মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু সেই ভক্তিভাজন ব্যক্তির মানদণ্ডে হয়ত সেই কার্য্য মোটেই দোষাবহ ছিল না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

* মদ্যপানে স্বাস্থ্যহানি বা কাহারও অনিষ্ট হয় না, ইহা সত্য নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তিনশো পঁয়ষট্টির এক

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

কয়েক দিন যাবৎ বিষম গুমট পড়িয়াছে। রাত্রিতে ঘুমাইবার উপায় নাই, সারারাত্রি পাখা-হাতে এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইতে হয়; তন্দ্রাঘোরে পাখাটা হাত হইতে পড়িয়া গেলে ঘামে সারা গা ভিজিয়া যায়, তন্দ্রাও ভাঙিয়া যায়। এর উপর মশার উপদ্রবও বাড়িয়া গিয়াছে। রাত্রি এইভাবে কাটাইয়া ভোরে উঠিয়া রাইচরণ দাওয়ার উপরে হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিল। স্ত্রী নিত্যকালী সম্মার্জ্জনীর কাজ শেষ করিয়া এঁটো বাসন লইয়া ঘাটে গিয়াছে; ছেলেমেয়েরা সারারাত্রি উপদ্রব করিয়া ভোরের বাতাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে রাইচরণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন তাহার বাড়িটা তিনতলা-দালান হইয়া গিয়াছে, ছাদের উপর নিত্যকালী ছেলেমেয়েদের লইয়া ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়া একথালা পান্তা বসিয়া সব দেখিতেছে। তিনকড়ি চক্কোত্তি টাকার তাগাদায় আসিয়া হতভম্ব হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, বাঁশের উপর তাহাকে দেখিয়া ঢিল ছুঁড়িতেছে, কিন্তু ঢিল অতদূর পৌছিতেছে না। অশ্বিনী শীল তামাক খাইতে খাইতে আসিয়া তিনকড়ি চক্কোত্তিকে হুঁকা বাড়াইয়া দিয়া বলিতেছে, খুড়ো তামাক খাও। রাইচরণের বিষম ভাবনা হইল, চক্কোত্তি-মশায় অশ্বিনী শীলের হুঁকায় তামাক খাইবে কি করিয়া? এমন সময় অশ্বিনী আবার বলিল, খুড়ো তামাক খাও। চরণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, দেখিল অশ্বিনী শীল তাহাকেই বলিতেছে, খুড়ো আগুনটা যে গেল, টেনে খাও।

চরণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, বলিল, অশ্বিনী যে, এত সকালে যাচ্ছ কোথায়?

টানিতে কহিল, আর খুড়ো আমার কি একদণ্ড বসে থাকবার উপায় আছে? আজ হাট-বার, চলেছি ও-পাড়ায় তাগাদায়; বেটারা বাপু-বাছা ব'লে নেবার সময় ত নেয়, তারপর আর চিৎহাত উপুড় করবার নাম করে না। তা খুড়ো, তোমার পয়সা ক'টা আজ দিয়ে ফেল না? কালত শুনলাম ঘোষেদের ওখানে কিছু পেয়েছ।

—আর ভাই সে কথা বল কেন? ধনীই বল আর গরিবই বল্ কারু হাত দিয়ে আজকাল কিছু গলে না। তোমার পয়সাটার জন্যই ঘোষেদের ওখানে গায়ে জর নিয়েও খাটলাম, তা আজ-কাল ব'লে কেবল ভাঁড়াচ্ছে। আর কটা দিন সবুর কর, হাতে পয়সা হ'লে আমি নিজেই দিয়ে আসব, তোমার আসতে হবে না।

—হাঁ, তা না আর কিছু। তিন বেলা হেঁটেই যা পাচ্ছি! তা পয়সা দিতে পারবে না অত খাওয়ার সখ যায় কেন? মঙ্গলবারের মধ্যে আমার পয়সা চাই-ই, কোন ওজর শুনব না। হুঁ খুড়ো,—এও দিন দিন নয়, মনে থাকে যেন।—অশ্বিনী রাগিতে রাগিতে চলিয়া গেল।

চরণ তামাকটা শেষ করিয়া কাপড়ের খুঁট খুলিয়া একটাকা সওয়া-ন-আনা পয়সা গণিয়া কাছায় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিল; তারপর গা মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া পড়িল। গোয়াল হইতে গরু কয়টা বাহির করিয়া তাদের জাব দিল, পরে গাড়ু লইয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

নিত্যকালী বাসন কয়খানা ধুইয়া এক ঘড়া জল লইয়া ঘাট হইতে আসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে মেজ ছেলে হারু উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহার আজ দেড়মাস যাবৎ জর হইতেছে, পিলেও বাড়িয়া গিয়াছে। ছোট মেয়েটা কয়েক দিন হইল এই রোগেই মারা গিয়াছে। তাহাকে তবু যদু কবরেজের দুইটা বড়ি খাওয়ান হইয়াছিল। সেই পয়সাই কবরেজকে দেওয়া হয় নাই, সে কি আর অষুধ দিবে? দুই দিন হইল ছেলেটার জরের বড় বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। আজ শনিবার, শমসের কবরেজকে ডাকিয়া একটা ঝাড়া দেওয়াতে পারলে ভাল হয়।

মেয়েদের জাগাইয়া দিল, পরে বিছানার মাদুরখানা উঠাইয়া ঘরটা ঝাঁট দিয়া ফেলিল। রোগা ছেলেটা ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল, ঘুম হইতে উঠিয়া আর দুটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিল; বড় মেয়েটি গোবর-জল আর মাটি লইয়া রান্নাঘর লেপিতে লাগিয়া গেল।

চরণ মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল। হাত মুখ ধুইয়া রোগা ছেলেটার গায়ে হাত দিয়া দেখিল জর আছে কি না। জর খুবই আছে, ভোরের দিকে বোধ হয় একটু বেশী হইয়া আসিয়াছে। সোয়া-পাঁচ আনার গান্ধী-মাদুলীতে দেখা যাইতেছে কোন ফলই হইল না। ছেলে-গুলিকে কাঁদিতে দেখিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, ও পেঁচীর মা, ওদের কিছু খেতে দাও'না, দুটো মুড়ি থাকে ত হারুকে দাও। পেঁচীর মা ওরফে নিত্যকালী বিড়বিড় করিয়া আপন মনে বকিতেছিল, এইবার মুখ ছুটাইবার একটা সুযোগ পাইল। ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আছে বাসি আকার ছাই, তাই খাও অখন। তিন দিন ধরে বল্‌ছি চাল বাড়ন্ত, তা মিনসের কানেই ওঠে না। কেবল রাতদিন বসে বসে তামাক গাঁজা খাওয়া। ছেলেটা এদিকে বাঁচে না। আমার মরণ নাই, মড়ার যম আমাকে দেখে না।

চরণ আজ ছয় দিন হইল একটান গাঁজাও টানিতে পারে নাই, গাঁজার দোকানে জোর পিকেটিং চলিতেছে। গাঁজার অভাবে তাহার পেট ফুলিয়া গিয়াছে, অনিদ্রার তাহাও একটি কারণ। গাঁজা খাওয়ার উল্লেখ মাত্র আগুনে ঘি পড়িল, "কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, সকাল-বেলা উঠেই গাল মন্দ। চৌদ্দ হাত কাপড়ে কাছা নাই তাদের আবার জোর গলায় কথা।" নিত্যকালীর চুলের মুঠি ধরিয়া চরণ পিঠে বেশ দু-ঘা বসাইয়া দিল, সে সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ছেলে তিনটার কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

চরণ মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, কি রে পেঁচী, কিছু আছে? পেঁচী বলিল, আছে বাবা, তুমি ওদের নিয়ে বস, আমি দিচ্ছি। চরণ ছেলেদের লইয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। পেঁচীর ঘরলেপা হইয়া গিয়াছিল, সে হাত

কচুর শাক লইয়া আসিয়া বাপের সম্মুখে রাখিয়া দিল। চরণ কহিল, তোদের আছে? পেঁচী বলিল, কিছু শাক আছে, ভাত আর নাই। চরণ কিছু ভাত উঠাইয়া লইতে বলিল, পেঁচী সম্মত হইল না, যে চারিটি ভাত, বাবার এবং ভাইদের উহাতেই কিছু হইবে না অগত্যা চরণ কিছু শাক উঠাইয়া পেঁচীর হাতে দিল। অসুস্থ ছেলেটাকে শাক এবং পান্তার জল দেওয়া যায় না, তাহাকে শুধু চারিটি ভাত জল ছাড়াইয়া নুন দিয়া দেওয়া হইল, সে শাকের জন্য কিছু কান্নাকাটি করিয়া অগত্যা তাহাই খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পর চরণ রোগা ছেলেটার হাত ধুইয়া দিল, পেঁচী আর দুটি ভাইকে আঁচাইয়া দিয়া এঁটো লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল। চরণ দাওয়ায় উঠিয়া আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইল। নিত্যকালীর কান্না সমানেই চলিতেছিল। একখানা দা হাতে নীলু মণ্ডল আসিয়া ডাক দিল, "কি হে চরণ, কাজে যাবে না, বড় যে তামাক খাচ্ছ? চরণ হুঁকা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে কহিল, না দাদা, আজ সকাল সকাল একটু হাটে যাব ভাবছি। ও-পাড়ায় কটা পয়সা পাব, দেখি আদায় করতে পারি কি না।

তামাক খাইয়া নীলু চলিয়া গেল, চরণও একখানা গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পেঁচী বলিল, বাবা, চাল বাড়ন্ত, চাল আনবে তবে ভাত হবে। চরণ কহিল, আচ্ছা, এ বেলার মত চাল কিনে আনব, তার পর হাট থেকে ধানই আনব এক টাকার। চরণ চলিয়া গেলে পেঁচী মাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দুইজনে সেই শাকটুকু খাইয়া জল খাইল, তারপর মিত্রদের বাড়ি হইতে দুই কাঠা ধান লইয়া আসিল, চাল করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে কিছু পাওয়া যাইবে।

চরণ হন হন করিয়া চলিতেছিল, সকালে না গেলে বেণী কামারকে ধরা যাইবে না, পয়সাও আদায় হইবে না। কালীতলা পার হইয়া যেই মাঠে পড়িবে অমনি দেখে রহমৎ কাবুলী সেইদিকে আসিতেছে। সে ধাঁ করিয়া বাঁ-দিকের বটগাছটার আড়ালে গা ঢাকা দিল; ভাগ্যে হইতে চরণ তের টাকায় নিজের একখান আলোয়ান ও দশ টাকায় ছেলেদের দুইটা কোট কিনিয়াছিল। সেদিন টাকার জন্যে বিশেষ তম্বি করিয়া গিয়াছে, আজ দেবার তারিখ, দেখিতে পাইলে আর রক্ষা নাই। যাহা হউক রহমৎ পাশ দিয়া চলিয়া গেল, চরণ বলির পাঁঠার মত কাঁপিতেছিল ও দুর্গানাম জপিতেছিল। কাবুলী চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়া এক রকম দৌড়াইয়াই মাঠ পার হইয়া গেল।

বেণীকে বাড়ি পাওয়া গেল না। দু-সের চাল কিনিয়া গামছায় বাঁধিয়া চরণ নিলু মণ্ডলের বাড়ি গিয়া বসিয়া রহিল, কি জানি রহমৎ হয়ত এখনও বসিয়াই আছে। বাস্তবিক রহমৎ বসিয়াই ছিল। অন্যান্য কয়েক বাড়ি টাকার তাগিদ দিয়া রহমৎ চরণের বাড়ি আসিয়া সে বাড়ি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল, পেঁচী জানাইল বাড়ি নাই। কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করাতে পেঁচী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার মা চোখ টিপিয়া নিষেধ করিল। তখন পেঁচী বলিল, কোথায় গিয়াছে তাহা তাহারা জানে না, শীঘ্র ফিরিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি রহমৎ বাহিরে আমগাছতলায় বসিয়া রহিল। বেলা পড়িয়া গেল, চরণের দেখা নাই। তখন রহমৎ উঠিয়া চরণের সহিত নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিয়া গেল, সে বলিয়া গেল আগামী শনিবার আসিবে, টাকা যেন পায়, নাহ'লে সে চরণকে খুন করিবে এবং বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিবে।

এদিকে ধানভানা হইয়া গেল। চাল নাই, চরণেরও দেখা নাই, রান্নার উপায় কি? আর একটু পরেই ছেলেরা খাইতে চাহিবে, নিজেদেরও যথেষ্ট ক্ষুধা পাইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া মিত্রদের চাল হইতে দেড় সের লইয়া পেঁচী রাঁধিতে বসিল, নিত্যকালী চাল লইয়া মিত্রদের বাড়ি গেল। সেখানে ইঁদুরের উপদ্রব এবং এখনকার ধানে চাল কত কম হয় ইত্যাদি বলিয়া মিত্রদের বউকে চাল বুঝাইয়া দিয়া আসিল, ভাগ্যে গিন্নী বাড়ি ছিলেন না।

পেঁচী রান্না করিতেছিল, এদিক-ওদিক চাহিয়া চরণ বাড়ি আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রহমৎ

টাকা না পাইলে চরণকে খুন করিবে। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদ ত কাটিয়া গিয়াছে, খুন করিলেই হইল, মগের মুল্লুক কিনা, হুঁ। স্নান করিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া চরণ হাটে চলিয়া গেল; তামাকটুকু খাওয়ার অবসর পাইল না, বেলা পড়িয়া গিয়াছে।

হারুর জ্বর খুব বাড়িয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। হারুর কাছে পেঁচীকে বসাইয়া নিত্যকালী ছেলে দুটিকে খাওয়াইল। পরে নিজে ছেলের কাছে বসিল, পেঁচী ভাত লইয়া খাইল। ভাত বেশী ছিল না, যাহা ছিল পেঁচী কিছু খাইয়া কিছু মার জন্য রাখিল। পেঁচী খাইয়া যাই ঘাটে গিয়াছে অমনি হারুর ফিট হইল। নিত্যকালী একটু অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ চাহিয়া দেখে ছেলের এই অবস্থা। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার অনেকে আসিয়া পড়িল। হাট-বার, পুরুষ মানুষ কেউ বাড়ি ছিল না, মেয়েরা আসিয়া কেবল কোলাহল করিতে লাগিল। নিত্যকালী উঠানে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। একজন দৌড়িয়া গিয়া মহেশের মাকে ডাকিয়া আনিল। মহেশের মা ঝাড়ায়, জলপড়ায় টোটকা ঔষধে সিদ্ধহস্ত, কত রোগী সে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সে আসিয়া প্রথমে একটা 'ঝাড়া' দিল, তাহাতে উপকার না হওয়ায় কিছু জলপড়িয়া হারুর মুখে চোখে ঝাপটা দিল, ক্রমে হারুর চোখ নামিল ও দাঁত ছাড়িল, তাহার ফিট ছাড়িয়া গেল। নিত্যকালী উঠিয়া তাহাকে কোলে লইল। রমণীবৃন্দ যে যাহার মত নিত্যকালীকে উপদেশ দিয়া মহেশের মার প্রশংসা করিতে করিতে ক্রমে প্রস্থান করিল। নিত্যকালী ছেলেকে আর কোল হইতে নামাইতে সাহস করিল না, তাহার খাওয়াও আর হইল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পেঁচী উঠিয়া ঘরে, তুলসী তলায়, প্রদীপ দেখাইল। রন্ধন করিবার কিছু নাই, যে-কয়টা ভাত ছিল তাহা ভাইদের খাওয়াইয়া তাহাদিগকে শোয়াইল; তারপর মায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাইচরণ জোর পা চালাইয়া হাটের দিকে যাইতে- তাহার কল্কেতে কয়েকটা টান দিয়া লইল। পাশের বাড়ির মালী-বৌ পথে দেখিয়া চরণকে ডাকিয়া একটা টাকা দিয়া দিল তাহার জন্য এক টাকার ধান কিনিয়া আনিতে।

হাটে পৌঁছিয়া চরণ প্রথমেই গাঁজার দোকানের ওদিকে গেল, যদি কোন রকমে কিছু কিনিতে পারা যায়। দেখিল কয়েক জন ভলান্টিয়ার সার বাঁধিয়া শুইয়া আছে, গাঁজা পাইবার কোন উপায় নাই। অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। দুই এক জন ভলান্টিয়ারদের মাড়াইয়াই যাইতে চেষ্টা করিয়াছে, আর সকলে তাহাদের থামাইয়া দিতেছে, চরণ দেখিল গাঁজা পাইবার কোন উপায় নাই। সে অন্য দিকে যাইতে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় হাটের উত্তর দিকে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে হাট লুট হইতেছিল; ভলান্টিয়ারগণ উঠিয়া সেই দিকে ছুটিল, অনেক লোকও সেই দিকে ছুটিল, অনেকে আবার পৈতৃক প্রাণ লইয়া উল্টা দিকে ছুট দিল। চরণ এবং তাহারই মত বুদ্ধিমান অন্য কয়েক জন লোক ভাবিল এই ত সুযোগ; তাহারা গাঁজার দোকানের জানালায় উপস্থিত হইল। চরণ ভাবিল গাঁজা কিনিবার এমন সুযোগ আর মিলিবে না। ধান ত সব সময়েই পাওয়া যাইবে, সে এক টাকার গাঁজা কিনিয়া ফেলিল।

তাড়াতাড়ি গাঁজা কিনিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে এমন সময় এক ষণ্ডামর্ক-গোছের লোক দরজা ভাঙিয়া দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া দোকানদার বাধা দিতে চেষ্টা করিতেই তাহাকে এক পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া যতটুকু গাঁজা ছিল সব কোঁচড়ে লইয়া লোকটা দুই লাফে বাহির হইয়া গেল। সকলে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দাঙ্গা নিবারণের জন্য হাটে পুলিস মোতায়েন ছিল। গুণ্ডা পলাইবার পর যখন চরণের দল বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন পুলিস আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। কয়েক জন দৌড়িয়া পলাইয়া গেল, চরণেরা সাত জন ধরা পড়িল, সকলের নিকট হইতেই কিছু কিছু গাঁজা বাহির হইয়া পড়ায় তাহারাই যে অপরাধী

দারের সাক্ষ্যেও প্রকাশ পাইল তাহারা কয়েক জনে দরজা ভাঙিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে মারধোর করিয়া গাঁজা ছিনাইয়া লইয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, হালদার সাহেব ছিলেন খুব দয়ালু লোক, গাঁজার মর্জ্জাদাও বিশেষ বুঝিতেন। বিস্তর কান্নাকাটি করিয়া এক টাকারগাঁজা ও এক টাকা সওয়া-ন-আনা পয়সা তাঁহাকে পান খাইতে দিয়া রাত্রি প্রায় ১০টার সময় রাইচরণ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলিল। ভাগ্যে মালী-বউ ধান কিনিতে টাকাটা দিয়াছিল!

শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী

শ্রীশান্তা দেবী

গত জানুয়ারী মাসে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের গৃহে চিত্রপ্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রদর্শনী তাহারও মাসাধিক পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসে খোলা হইয়াছিল। সামান্য তিনখানি ঘর শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দুইখানি ঘরে দেওয়ালের উপরদিকে যামিনী-বাবুর নিজ অঙ্কিত নানাবর্ণের সুদীর্ঘ পটগুলি ফ্রেস্কোর মত চারিধার জুড়িয়া লম্বা করিয়া বসানো হইয়াছিল। তাহার নীচে এক একখানি স্বতন্ত্র বড় ছবি। ছবির নীচে ছোট ছোট কাঠের পিঁড়িতে মাটির পিলসুজে প্রদীপ জলিতেছে ও ধুনুচিতে ধুনা। মেঝেগুলিতে আলিপনার চিত্র; বসিবার আসনও চেয়ার নয়, একেবারে স্বদেশী আসন। চিত্রগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি বাংলার পট-অঙ্কনের পদ্ধতির মত। তাই এই সম্পূর্ণ বাংলা গৃহসজ্জা। তাহার সহিত মিলিয়া কলিকাতা শহরের পুরাতন পাড়ার বাংলার পল্লীর স্নিগ্ধরূপ ও প্রাকৃতিক বর্ণসুষমা ঘরের কোণেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কোন্ জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনী কি করিয়া সাজাইতে হয়, শিল্পী তাহা অধিকাংশের অপেক্ষাও ভাল দেখাইয়াছেন।

যামিনীবাবু পুরাতন শিল্পী। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টে তাঁহার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা অনেক ছবি দেখিয়াছি। তিনি তৈলচিত্রে বড় বড় প্রতিকৃতি আঁকিতেন। তাহার পর তাঁহার আঁকা বাঙালা



একখানি পুরাতন পট
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোক



একখানি পুরাতন পট
জমিদার-গৃহিণী

ইহার সাদৃশ্য আছে। পাশাপাশি উপবিষ্টা দুই সখীর একটি চিত্র অনেকটা এই রকম। বালক কৃষ্ণ-বলরামের সুন্দর চিত্রটি ঠিক এই রকম না হইলেও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষার পরিচয় ইহাতেও পাওয়া যায়। তবু এই চিত্রগুলির ভিতর শিল্পীর বাঙালী প্রাণ আপনাকে অনেকখানি প্রকাশ করিয়াছে। বাঙালী পুরাতন পটুয়াদের ছবির নকল তিনি করেন নাই। নিজের শক্তির স্বাভাবিক বিকাশে যে রীতিতে তিনি পৌঁছিয়াছেন, তাহার সহিত পটের সাদৃশ্য আছে মাত্র।

ঘরোয়া ছবিও দেখিয়াছি। তবে সেগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিল না।

গত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে তিনি পুরাতন পাশ্চাত্য পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পদ্ধতিতে আঁকার পরীক্ষা করিতেছেন।

তিনি বলেন, তৈলচিত্র আঁকিতে আঁকিতে তাঁহার মনে হয়, রঙের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া শুধু রেখার ভাষার সাহায্যেই চিত্রকরের মনের ভাব ব্যক্ত হওয়া উচিত। তাই রং ছাড়িয়া শুধু সাদা পটের উপর কালো তুলির রেখার সাহায্যেই তিনি কিছুদিন ছবি আঁকেন। এই ছবিগুলি সম্পূর্ণ বাংলা ধরণের নয়, খানিকটা আধুনিক পাশ্চাত্য ইম্প্রেস্যনিষ্ট রেখাচিত্রের সহিত



একখানি পুরাতন পট
এই পটে বিশ্রামরত একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালীকে চিত্রিত করা হইয়াছে।
তিনি মালাজপ করিতেছেন।

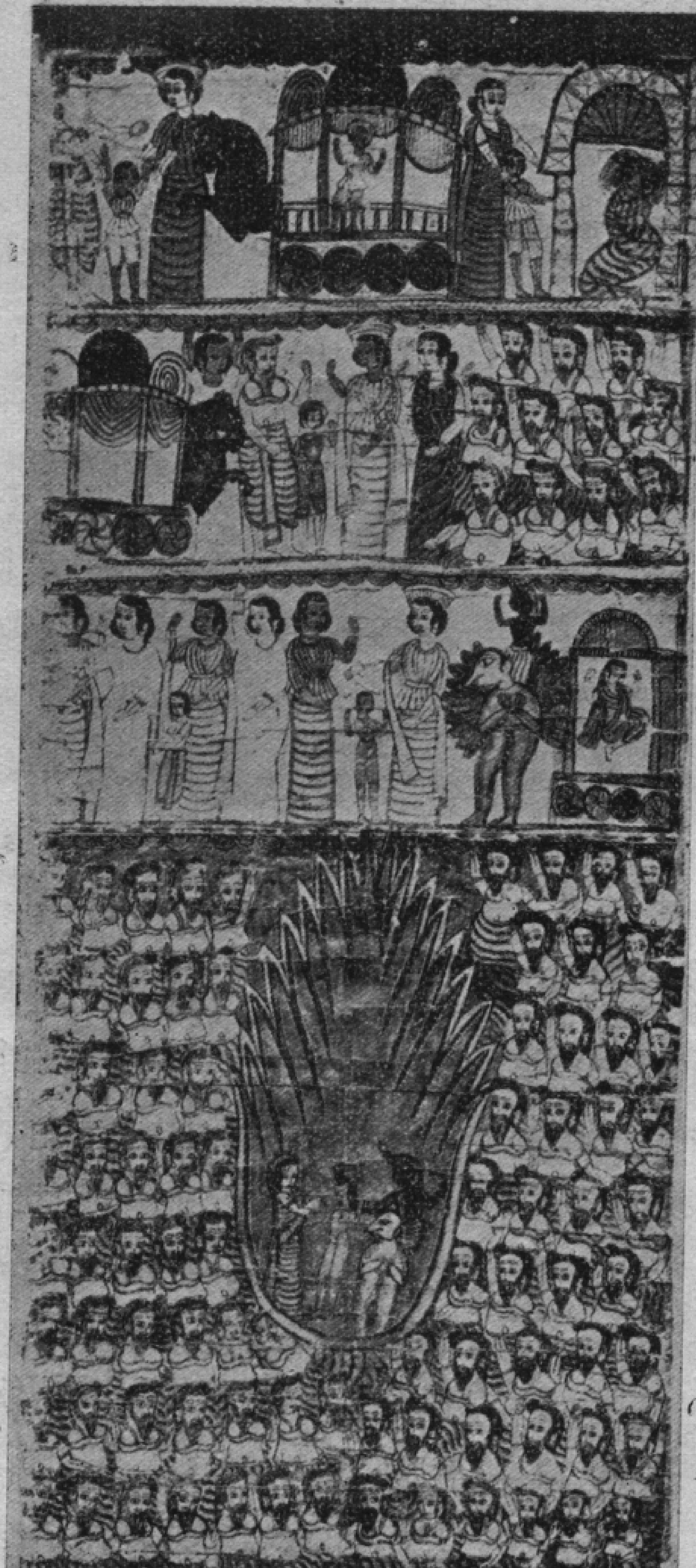


প্রাচীন পট

সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও তাঁহার পত্নী—দুইজনেরই হাতে একটি করিয়া পানের খিলি।

তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলা চিত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিয়াছেন। কালীঘাট হইতে সুরু করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় প্রভৃতি নানা গ্রামে তিনি যে-সকল পুরাতন পট সংগ্রহ করেন তাহাও তাঁহার প্রদর্শনীর একটি ঘরে সজ্জিত দেখিলাম। তিনি দেখিলেন বাঙালী পটুয়ারাও প্রধানতঃ রেখার সাহায্যেই তাহাদের মনের কথা আশ্চর্য্য নিপুণ ভঙ্গীতে বলিয়া গিয়াছে। ইহারা শুধু যে শিবপার্ব্বতী, দশানন, বালী-সুগ্রীব, লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবিই আঁকিয়াছে তাহা নয়, তাহাদের চোখে-দেখা এই বাংলা দেশের নানা ছবিও তাহারা এই তুলির কালো রেখার স্বচ্ছন্দ ও শক্তিশালী ভাষায় বলিয়া গিয়াছে। প্রসাধনশেষে সুন্দরী কবরীতে স্বহস্তে ফুল পরাইয়া দিতেছেন, তাঁহার আনত মুখ, দেহযষ্টিতে বেষ্টিত বস্ত্রাঞ্চল, উর্দ্ধে উত্থিত বাহুলতা, আঙলের ডগায় সযত্ন স্পর্শে ফুলধরার ভঙ্গী—সব যেন পটুয়া একটি রেখারই বহুমুখী গতির সাহায্যে আঁকিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলধারা যেমন মাটির উপর দিয়া ডালপালার ভঙ্গীতে স্বাভাবিক ভাবে গড়াইয়া চলিয়া যায়, পটুয়াদের এই রেখাগুলিও যেন তুলির মুখ হইতে তেমনি সহজে বাহির হইয়া ছবির রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ধনী হুঁকা-হাতে তামাক খাইতে বসিয়াছেন, প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে সপ্রেম-স্পর্শে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তরুণী দীর্ঘকেশ রোদে শুখাইতেছে, বিড়াল প্রকাণ্ড চিংড়ি মাছ ধরিয়া খাইতেছে—এইরূপ নানা বিষয়ই দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী পটুয়ারা তুলির বাঁকা টানে আঁকিয়া গিয়াছে। বাংলার গ্রামের ঘর হইতে এই রেখাচিত্রগুলি এবং রঙীন পটগুলি সংগ্রহ করিতে করিতে যামিনীবাবুর মনে হয়, বাংলার চিত্রশিল্পকে পুনর্জ্জীবন দান করিতে হইলে অজন্তা রাজপুত কিংবা মোগল-পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া চলিলেই হইবে না। এগুলি ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা ভাষা যেমন বাঙালীর নিজস্ব ভাষা, তেমনি বাংলার পট বাঙালীর একান্ত নিজস্ব চিত্র। বাঙালী শিল্পীকে এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে এবং সেই

পথে তিনি আপনা হইতেই, বিনা অনুকরণে, অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙালী শিল্পী রাজপুত কি অজন্টা চিত্রপদ্ধতির সাহায্যে চিত্তকমলের সকল দলগুলি মেলিয়া ধরিতে

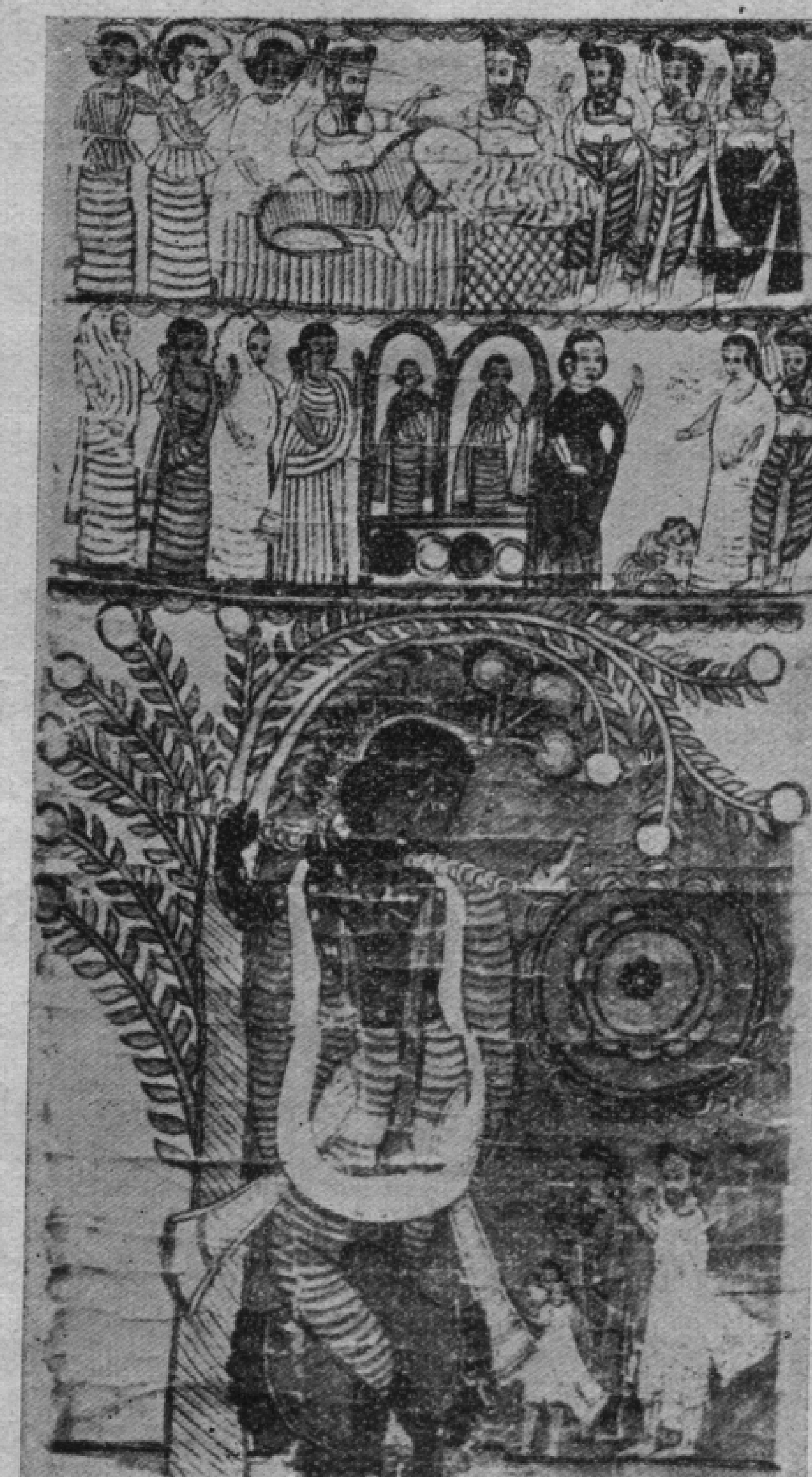


পুরাতন পট

নরমেধ যজ্ঞ (উর্দ্ধাংশ)

পারিবেন না। যে ভাষা নিজের ভাষা নয় তাহা আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে বলিয়া তাহাকে সৃষ্টির উপায় করিয়া তোলা যায় না।

যামিনীবাবুর রঙীন পটগুলির অধিকাংশই মণ্ডন-শিল্পের ধরণের। বিশেষ কোনো বিষয় লইয়া আঁকা একক চিত্র অথবা কাহিনীর চিত্রাবলী সেগুলি নয়। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের চিত্রটি মণ্ডনশিল্পের মত হইলেও বিশেষ একটি বিষয় লইয়া আঁকা। বাল্মীকি ও কুশ লব, সীতা ও লবকুশ ইত্যাদি ছোট ছোট কয়েকটি কাহিনীমূলক ছবি আছে। বাকী বড় চিত্রগুলি নানাভঙ্গীতে উপবিষ্টা, অর্ঘ্যহস্তে দাঁড়াইয়া অথবা পূজা-নিবেদন-ভঙ্গীতে আনতা রমণী মূর্ত্তিগুলিকে মোটিফ হিসাবে ব্যবহার করিয়া নানা



নরমেধ যজ্ঞ (নিম্নাংশ)

[রবীন্দ্র-জয়ন্তী চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একটি পুরাতন পট। এই চিত্রটির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। বর্ত্তমানে উঁহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্তা ষ্টেলা ক্রামরিশ। এই চিত্রটি বেশী দীর্ঘ বলিয়া দুই ভাগ করিয়া মুদ্রিত করিতে হইয়াছে]

রঙে পটগুলি সাজানো হইয়াছে। এই ছবিগুলির বর্ণ-সুষমা ও স্বচ্ছন্দ রেখাপাত দেখিয়া মন স্নিগ্ধতায় ভরিয়া যায়। রংগুলি সবই বাংলা পটের সকল রকম মাটির রং। তবে আমরা আজকালকার চিত্রপ্রদর্শনীতে যে পটগুলি দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা যামিনীবাবুর নিজের আঁকা চিত্রের বর্ণসুষমা চক্ষুকে বেশী আনন্দ দেয়।

যামিনীবাবু মাতৃমূর্ত্তি এবং আরও দুই একটি নারী-চিত্রে



কৃষ্ণ রাজা
শ্রীযামিনী রায়

রং ও রেখা দুইয়েরই বাহুল্য যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া বড় সাদা জমির উপর দুই চারিটি রঙের মোটা টান দিয়া ছবির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অলঙ্কারবাহুল্যবর্জ্জিত এই প্রকার রিক্ত ছবির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের সাধনা এখন তিনি করিতেছেন। এই ছবিগুলির মধ্যে সামান্য যা অঙ্কন-রীতির প্রকাশ আছে তাহা বাংলারই। তবে যামিনীবাবু নিজের ইচ্ছামত সেগুলিকে আরও সাদাসিধা করিয়া তুলিয়াছেন।

যামিনীবাবু নানাপদ্ধতিতে বহুদিন ছবি আঁকিয়া একের পর একেকটিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সুতরাং চিত্রাঙ্কনের নানা নিয়মই তাঁহার জানা আছে। কোন্ পদ্ধতি বাঙালী শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পথ, তাহা বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। বাংলার চিত্র-পদ্ধতির ভিতর নানা শক্তির ও প্রকাশ-ভঙ্গিমার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইহা যদি অজন্টা কি রাজপুতনার মত ঐশ্বর্য্যশালী না হয়, তাই বলিয়া ইহাকে পিছনে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা, ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। বাঙালী শিল্পীর দানে এই চিত্রাঙ্কন-রীতিকে যদি সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে তাহা বাংলার প্রতিভারই পরিচয় হইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয় বাংলা পুঁথির পাটার চিত্রের পদ্ধতিতে দশরথ ও রামচন্দ্র, কৌশল্যা ও রামচন্দ্র, অহল্যা ও রামচন্দ্র, শবরী ও রামচন্দ্র, প্রভৃতি কতকগুলি ছবি আঁকিয়াছিলেন। প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রামায়ণে তাহা আছে। ছবিগুলিতে অজন্টার প্রভাব আছে। তবু ইহাতে বাংলার ঐতিহের প্রভাবও যথেষ্ট। মায়ামৃগবধ ও সীতার ছবিতে শিল্পীর বাঙালীত্ব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও কয়েক বৎসর পরে নন্দলালবাবুর 'নবকুমার' নামে একটি মা ও শিশুর ছবি বাংলা পটের ধরণে আঁকা দেখিয়াছি মনে হইতেছে। সম্প্রতি কয়েকটি ঋতুর চিত্রও এই জাতীয় মনে হইয়াছিল। ছবিগুলি একটিও আমার কাছে নাই। আমার মনে যেটুকু ছাপ আছে তাহা হইতেই লিখিতেছি, তবে নন্দলালবাবুর সৃজনীশক্তি অদ্ভুত, সুতরাং তাঁহার কোনো ছবিকে নির্দ্দিষ্ট একটা পদ্ধতির গণ্ডীর ভিতর ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মত সামান্যজ্ঞান লইয়া না করাই উচিত। তাঁহার প্রতিভা-বলে তিনি নিজস্ব নানা পদ্ধতিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের মা-যশোদার গোদোহন প্রভৃতি দুই একটি পটের ধরণের ছবি দেখিয়াছি মনে হইতেছে। শ্রীযুক্তা সুনয়নী দেবীর চিত্রেও বাংলার নিজস্ব চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

যাহা হউক বাংলার চিত্রপদ্ধতি লইয়া আলোচনা এবং ইহাকেই বাংলার প্রকাশভঙ্গী করিবার চেষ্টা যামিনীবাবু অনেকদিন হইতে চিত্রপ্রদর্শনাদি দ্বারা এবং একান্ত ইহারই সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া করিতেছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এইরূপ প্রদর্শনী একটি করিয়া-



বাল্মীকি ও লবকুশ
শ্রীযামিনী রায়

ছিলেন; তাহার পর ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসে করিয়াছিলেন; আবার সম্প্রতি গত পৌষে এইটি করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় গতমাসে এইরূপ একটি প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গীয় পুরাতন দারুশিল্পও প্রদর্শিত হইয়াছিল। দত্ত-মহাশয়ের প্রদর্শনীতে দেবদেবীরও পৌরাণিক চিত্র বিস্তর ছিল। রায়-মহাশয়ের প্রদর্শনীতে নানা সামাজিক, সাংসারিক ও ঘরোয়া ছবিও ছিল। পুরাতন রেখা-চিত্র রায়-মহাশয়ের সংগ্রহে অনেক ছিল, দত্ত-মহাশয়ের সংগ্রহে রঙীন দীর্ঘ চিত্রাবলীতে পৌরাণিক গল্প বলার ছবিই অধিকাংশ। প্রদর্শনীগুলি দেখিয়া যাহা মনে আছে, তাহাই লিখিলাম। তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এই প্রকার প্রদর্শনী দ্বারা বাংলার শিল্পসংগ্রহ সমৃদ্ধ এবং শিল্পীদের দৃষ্টি বাংলা অঙ্কন-পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হইলে উদ্যোক্তাদের চেষ্টা সার্থক হইবে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত কোন কোন ছবি পরে প্রকাশিত হইতে পারে।

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার এমন একদিন ছিল যখন বঙ্গবাসী মুসলমান বাংলা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে গিয়া খাঁটি বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিতেন। "ও-ভাষা হিন্দুদের, অতএব বর্জ্জনীয়",—এ-রকম বিদ্বেষবুদ্ধি তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। তখন এ-দেশের রাজা আরব কি কি তুর্কী বংশজাত মুসলমান; তথাপি পরাগল খাঁর মহাভারত, কি দরাফ খাঁর গঙ্গা-স্তোত্রে জোর করিয়া বঙ্গভাষা ও সংস্কৃত ভাষার অঙ্গে আরবীর ছাপ দেওয়ার কষ্টকৃত ও হাস্যকর চেষ্টা দেখা যায় নাই। সে চেষ্টা হইতেছে এখন, অর্থাৎ মুসলমানগণ এদেশে প্রায় হাজার বৎসর বাস করিবার পর। যে-মনোবৃত্তি মক্তব-মাদ্রাসা হইতে ভারতের অতীত ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তাহারই ফলে হিন্দু-বিদ্বেষের বহ্নিতে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাইবার জন্য ঐ সকল বিদ্যালয়ে এক অদ্ভুত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজ সরকার ও তদনুগত এক শ্রেণীর মুসলমান ইহার নাম রাখিয়াছেন—"মুসলমানী বাংলা"। ভাষার ঐক্য জাতীয়তার জন্য অপরিহার্য্য। যে-জাতির মাতৃভাষাকেও সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে বিভক্ত করার চেষ্টা সম্ভব হয়, সে-জাতির রাষ্ট্রীয় একতা সুদূরপরাহত। বাংলা দেশ এই বিষয়ে ভারতের অন্য প্রদেশগুলির চেয়ে সৌভাগ্যবান্ ছিল। অন্য প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের বর্ণমালা ও ভাষা হিন্দুদের বর্ণমালা ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু বাংলায় এ পার্থক্য, হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। বঙ্গবিভাগের সময় হইতে এই কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া উহাকে চিরস্থায়িত্ব দান করিবার প্রবল প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গ-বিভাগ রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর মাতৃ-ভাষা-বিভাগ ইংরেজ সরকার ও এক শ্রেণীর মুসলমান পূর্ণ উদ্যমে চালাইতেছেন। দেশহিতকামী বাঙালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এই জাতীয়তাবিরোধী চেষ্টায় বাধা দেওয়া। নতুবা বাংলার কৃষ্টি রক্ষা করা পরিণামে একেবারে অসম্ভবও হইতে পারে।

আরবী-পদাশ্রিতা "মুসলমানী বাংলা" নামক ভাষার বিস্তৃত এবং নিয়মিত প্রচার হইতেছে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মক্তব-মাদ্রাসার মধ্য দিয়া। যদিও সাধারণ মুসলমানগণের জন্য লিখিত এমন অনেক "কিতাব" দেখা যায় যাহাদের অন্ধ আরবী অনুকরণের ফলে ঐগুলি এমন করিয়া ছাপা, যে পড়িতে গেলে শেষ দিক হইতে "আরম্ভ" করিতে হয়, এবং গোড়ায় আসিয়া "শেষ" করিতে হয়। যাহা হউক, বঙ্গদেশের প্রায় সাতাইশ হাজার মক্তব-মাদ্রাসায়, সরকারী পাঠ্যপুস্তক সভার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা কি প্রকারের "বঙ্গ-ভাষা"র পঠনপাঠন হইতেছে তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি পুস্তক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য অ-মুসলমানের বাংলা পুস্তক মক্তব-মাদ্রাসায় অপাঠ্য।

"মোহাম্মদ মোবারক আলি প্রণীত মক্তব মাদ্রাসা সাহিত্য, প্রথম ভাগ" প্রথম শ্রেণীর বালকদের পাঠ্য। প্রকাশক এই গ্রন্থকারের রচিত মক্তব পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্বন্ধে "১৯৩১ সালের নূতন পাঠ্য তালিকা"য় বলিতেছেন :—

> "বাজারে প্রকাশিত এই শ্রেণীর পুস্তকগুলিতে জাতীয় শব্দ, জাতীয় ভাব ও জাতীয় বিষয়ের অভাব দেখিয়া আমরা তাহা দূর করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি।"

পুস্তকে ২২টি গল্প আছে। প্রথমেই "মোনাজাত" (=প্রার্থনা) নামক পদ্য। "খোরাক", ও "পানি"র সঙ্গে সঙ্গে "শিশুর প্রার্থনা" "শিশুর সাধনা" এবং "বিদ্যা"ও আছে। "শিশুর অর্চ্চনা" কবিতার শেষ ৪ লাইন এই :—

"পালিব খোদার আজ্ঞা সদা প্রাণপণে,
সেবিব ওস্তাদ আর যত গুরুজনে।"

"ফেরেস্তা, জিন, বেহেস্ত, দোজখ, আসমান, জমীন, চন্দ্রসূর্য্য, আগুন, পানি, মানুষ, গরু,—সবই তিনি পয়দা করিয়াছেন।" (৩ পৃঃ)

"যে-মেহেরবান্ আল্লাহতালার দয়ায় আমরা পাইয়াছি,—একমাত্র তাঁহাকেই সেজ্দা (=সাষ্টাঙ্গ প্রণাম্) করিবে এবং তাঁহারই এবাদৎ (=আরাধনা) করিবে।" (৪ পৃঃ)

পূর্ব্বোদ্ধৃত রূপ মুসলমানী "বাংলা" শব্দ মক্তব-মাদ্রাসায় যে-শিশুরা পড়ে তাহাদের পক্ষেও অসহ্য মনে করিয়াই বোধ হয় লেখক ঐ গল্পের শেষে "শব্দার্থ" দিয়াছেন :—

পয়দা-সৃষ্টি, দোজখ-নরক, বেহেস্ত-স্বর্গ, আসমান-আকাশ।

"যাঁহারা খোদাতালাকে এক জানিয়া তাঁহার এবাদৎ(=আরাধনা) না করিবে, তাহারা গোনাহগার [=পাপী] হইবে এবং আখেরে খোদার গজবে [=ক্রোধে] পড়িয়া দোজখের আগুনে জ্বলিতে থাকিবে।(১২পৃঃ)

"পাক [=পবিত্র] কোরাণের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম।...কোরাণ শরীফ পড়িলে সওয়াব [=পুণ্য] হয়, মন পবিত্র থাকে ও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। বাটীতে কোর্-আন শরীফ পাঠ করিলে শয়তান পলাইয়া যায় এবং বালা মসিবত [=আপদ-বিপদ] কাটিয়া যায়। প্রত্যেহ পাক সাফ [=পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন] হইয়া কোরাণ শরীফ পাঠ করা উচিত।" [১২ পৃঃ]

"হজরতমুসা এলেমে কিমিয়া [=রসায়নবিদ্যা] জানিতেন।"[৪৪পৃঃ]

"তুমি মালদার [=ধনী] হইয়াছ" [ঐ]। আবার—"সে খুব ধনী হইল।" [ঐ]

"কিন্তু সে বড়ই কৃপণ ছিল। এতিম্ [=পিতৃহীন] মিস্কিন্ [=ভিক্ষুক], গরীব, ফকীর কাহাকেও এক পয়সা খয়রাত [=দান] করিত না।" [৪৪ পৃঃ]

"বখীলের [=কৃপণের] মাল [=ধন] কোন কাজে লাগে না।" [৪৫ পৃঃ]

"আফ্‌তাব [=সূর্য্য] উঠিবার পূর্ব্বে নিয়েত [=সংকল্প] করিয়া আফ্‌তাব ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত উপবাস করাকে রোজা বলে।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলি দেখিয়া পাঠক স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উহা কি বাংলা ভাষা, না বাংলা অক্ষরের সাহায্যে আরবী শিক্ষার চেষ্টা? "পাক কোরাণ" না বলিয়া "পবিত্র কোরাণ" বলিলে, অথবা "সওয়াব হয়" এর পরিবর্ত্তে "পুণ্য হয়"। অথবা "পাকসাফ" না বলিয়া "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন" বলিলে বোধ হয় ভাষাটা "হিঁদুর বাংলা", অতএব মুসলমানের অপাঠ্য, হইয়া পড়িবে। অথচ শিক্ষিত মুসলমানেরা "হিঁদুর বাংলা" সম্বন্ধ একেবারে অজ্ঞ, এ-কথা যে সত্য নহে তাহার প্রমাণ এই পুস্তকেই অনেক আছে। "খোরাক" প্রবন্ধে—"আমরা যাহা আহার করি", "রোগীর খাদ্য", "ভাল খাদ্য", "সুখাদ্য", "খোরাক"। দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধের মধ্যে "খোরাক" কথাটি মাত্র দুইবার এবং "খাদ্য" পাঁচ বার ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐরূপ :—"তিনি ফজরে উঠিয়া" (৩৫ পৃঃ); আবার "সকালে উঠিয়া আমি" (৩৪ পৃঃ), এবং "এই ভাবিয়া তিনি ...প্রাতে" (৩৬ পৃঃ)। "এইরূপ খাব দেখিলেন" (৩৫ পৃঃ), তিন লাইন পরে—"আবার স্বপ্ন হইল"। "কাবা শরীফ" প্রবন্ধে—"**তীর্থ স্থান**", "**পবিত্র** কাবাগৃহ", "**পবিত্র** জমজম", "খোদাতায়ালার **দয়ায়**।" বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি আরবী ভাষায় না দেওয়ায় ভাষা নিশ্চয়ই অশুদ্ধ কি অনিষ্টকর হয় নাই। জোর করিয়া অনাবশ্যক পরিমাণে আরবী শব্দ ঢুকাইবার চেষ্টার ফলে বহু স্থানে সংস্কৃতমূলক শব্দের সহিত আরবী ফার্সী শব্দের হাস্যকর সমাবেশ হইয়াছে। যথা :—

"পানির নাম জীবন হইল কেন?" [৪১ পৃঃ]
"এই পানি পান করিলে রোগ জন্মিবে।" [৪২ পৃঃ]
"মেহেরবান্ আল্লাহতায়ালার দয়ায়।" [৪ পৃঃ]

"কোরাণ শরীফ" প্রবন্ধে :—"পবিত্র কেতাব কোরাণ শরীফ" এবং "পাক (=পবিত্র) কোরাণ, "পাপ পুণ্য" ও "শেরেক বেদাৎ (=ভালমন্দ) এবং "সওয়াব" (=পুণ্য) হয়। ১১ পৃষ্ঠায় "খুনজখম করিয়া কাটাইত" বাক্যে "খুন-জখম' কথাটি প্রচলিত বাংলা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ১৭ পৃঃ "শব্দার্থে"—"রক্ত—খুন", এইরূপ আছে। আর এক স্থানে :—"ছেলের একটি পশমও কাটে নাই।" (৩৭ পৃঃ)। আমাদের ভাষায় মানুষের চুলকে পশম বলে না—কোন কোন পশুর লোমকে পশম বলে।

মক্তব-মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর বাঙালী শিশুগণকে বাঙালীর বাংলা সম্বন্ধে যথাসম্ভব অজ্ঞ রাখিয়া বাংলা অক্ষরের সাহায্যে আরবী-ফার্সীতে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার প্রবল প্রয়াস সম্বন্ধে যাঁহারা ইহার পরও সন্দিহান, তাঁহারা নিম্নলিখিত "শব্দার্থ"গুলি লক্ষ্য করুন :—

"প্রদীপ—চেরাগ [৯পৃঃ]; অহঙ্কারে—দেমাকে [১০ পৃঃ]; মাংস—গোস্ত [২২ পৃঃ]; গুরুজন—মুরুব্বিগণ [৩৪ পৃঃ]; ধার্ম্মিক—দীনদার [৩৮ পৃঃ]; স্বপ্ন—খাব [ঐ]; বিদ্যা—এলেম [৩৯ পৃঃ]; স্নান—গোসল [৪৩পৃঃ]; কৃপণ—বখীল [৪৬পৃঃ]; ধনী—মালদার।"

এইরূপ অ-স্বাভাবিক উপায়ে অ-বাঙালা শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্য আর কিছুই

বিদ্যালয়ে সরকারী অর্থসাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে "মুসলমানদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থার" ন্যায়, বাংলা ভাষার সম্বন্ধেও "একটা পৃথক্ ব্যবস্থা" পাকা করা। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের বগী বিন্দি যেমন স্বামীকে বঁটি দিয়া কাটিয়া ভাগ করিয়া লইতে গিয়াছিল, মাতৃভাষাকে ভাগ করিয়া লওয়ার এই মনোবৃত্তিও কি সেইরূপ নহে? স্বাভাবিক নিয়মে জনসাধারণ কর্ত্তৃক বহুকাল ব্যবহারে যে-সকল বিদেশী শব্দ সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, উদার বাংলা ভাষার অঙ্কে তাহারা সাদরে স্থান পাইয়াছে। যে সকল বিদেশী শব্দের বাংলা হয় না, তাহাতেও আপত্তি নাই। "আমি এক কাপ চা খাইব" চলিতে পারে; কিন্তু "আমি ওয়ান্ কাপ চা ড্রিঙ্ক করি" ইহা অসহ্য। তেমনি পূর্ব্বোক্ত কষ্টপ্রয়াস দ্বারা আনীত বিদেশী (আরবী-ফার্সী) শব্দগুলি যেন নিমন্ত্রণ-সভায় অনাহূতের মত অ-শোভন, ভাতের মধ্যে কাঁকরের মত পীড়াদায়ক।

অথচ সুশিক্ষিত শিষ্টভাষাপটু মুসলমান লেখককেও, হিন্দুবিদ্বেষ ও আরবী অনুকরণেচ্ছা রূপ সমাজের দূষিত মনোবৃত্তির সন্তোষসাধনার্থ ঐ "খিঁচুড়ি" ভাষাই ব্যবহার করিতে হইয়াছে; স্বভাবতঃ ও সহজেই যে-ভাষা আসিয়া পড়ে, অকারণ মাঝে মাঝে দু-একটা বিকট আরবী ফার্সী কথা মিশাইয়া, সেই ভাষাকে একটু কুৎসিত করিয়া, তবে একশ্রেণীর লোকের আদরণীয় করিতে হইয়াছে। "ডক্টর পণ্ডিত" মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা ২য় ভাগ" তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ঐ পুস্তকের প্রথম গল্প "প্রভাত" (ফজর নহে); "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে" বেশ কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "পূর্ব্বদিকে আসমানের লম্বা লম্বা শাদা রেখা দেখা যাইতেছে।" তবু ভাগ্য, যে "সফেদ রেখা" না বলিয়া "শাদা রেখা" বলা হইয়াছে। কিন্তু "আসমানের" পরিবর্ত্তে "আকাশের" কি মুসলমান বালকগণের পক্ষে একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইত? "ঈমান" গল্পে—"তিনি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে সৃষ্টি করে নাই। তিনি দয়াময়"—নিখুঁত বাংলা। কিন্তু

স্বরূপ "তাহারা সকলে বে-গোনাহ" (নিষ্পাপ) লেখা হইয়াছে। "মুহম্মদের উপর কুর্-আন অবতীর্ণ হইয়াছে।" কিন্তু "অন্যান্য পয়গম্বরগণের উপরও কিতাব নাযেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল"। "পরলোকের উপর ঈমান আনিবে" (বিশ্বাস করিবে) আবার "তক্দীরে"র (ভাগ্যের) উপর "ঈমান" আনিবে, "আখেরাতের (পরকালের) উপর ঈমান আনিবে।"

"পানি" গল্পে:—"জলকে মুসলমানেরা পানি বলে, পানির কোন আকৃতি, রং, গন্ধ অথবা আস্বাদ নাই। পানি তরল পদার্থ (চীজ নহে?)। পানি না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না। এইজন্য সাধুভাষায় পানির এক নাম জীবন।" এই গল্পে—"পানি" ও "সাফ" এই দুইটি কথার বদলে "জল" ও "পরিষ্কার" বসাইলে কোন হিন্দু লেখকের রচনার সহিত ইহার পার্থক্য থাকে না। উচ্চশিক্ষিত মুসলমান লেখক বোধ হয় ঐ ভয়েই দুইটি খুঁত ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

"বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা", "পিওর ওয়াটারের প্রয়োজনীয়তা"র মতই কতকটা শুনায় না কি? এই গল্পে—"আমাদের শরীরে জলীয় ("পানীয়", বলিলেই বা ঠেকায় কে?) অংশ আছে", "শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, সেইরূপ পানিরও দরকার"; "গোসল করে" লিখিয়া আবার "স্নানাদি কার্য্য সাধিবে", "খাওয়ার পানির" মত "পানীয় (কোন্ শব্দের বিশেষণ?) জলও" আছে।

"হজরতের অতিথি সেবা" গল্পে—"মেহমানদারী" (=অতিথি সেবা) ১ বার, ও "অতিথি সেবা" ২ বার, "মেহমান্" (=অতিথি) ১ বার, "অতিথি" ২ বার ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই লেখকের "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা" (তৃতীয় ভাগ নামক পুস্তকেও ঐরূপ ভাষা। "মদিনাতেই তিনি এন্তেকাল করেন" (=মৃত্যু হয়) আবার "আল্লাহ তা আলার উপাসনা (এবাদত নহে?) করিতেছিলেন।" (প্রথম গল্প)। "মহাসাগরের পানি" এবং "নীলবারি-রাশি" দুইই আছে। "দয়াস্বরূপ", "করুণাময়" (মেহেরবান

ক্ষতি হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় "গরমীকালে ফল খেতে কত মজা", আবার অন্যত্র মজা = আস্বাদ। "হজরত ইয়সুফ" গল্পে পিতা পুত্রকে হিন্দুর মতই "বাছা" বলিতেছেন, কিন্তু পুত্র পিতাকে "আব্বাজান" বলিতেছে, "স্বপ্ন" আছে, "খাব" নাই। কিন্তু পাছে মুসলমান পাঠকেরা মনে করেন লেখকের আরবী-ফার্সীর প্রতি "দরদ" কম, বোধ হয় সেই আশঙ্কা এড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত রূপে বাংলা শব্দের "অর্থ" দেওয়া হইয়াছে :—কৃতজ্ঞতা = শোকরগুযারি (২৯ পৃঃ), মাহাত্ম্য = বোযর্গী (৩৮ পৃঃ), মহাপাপ = কবীরাহ, গোনাহ (৫৭ পৃঃ)। একস্থানে হত্যা = খুন, অন্যত্র, খুন = রক্ত (৬ পৃঃ)। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে যে "শব্দার্থ" দেওয়া আছে তাহার কয়েকটি এই :—সৃষ্টি = পয়দা, নিষ্পাপ = বে-গুনাহ (৬ পৃঃ), পাপপুণ্য = নেকিবদি (৭ পৃঃ), আশ্রয় = পানাহ (৮ পৃঃ), আস্বাদ = মজা (১১ পৃঃ), মূর্চ্ছা = আহেস্তা (২০পৃঃ), স্বপ্নাদেশ = খাবের হুকুম (২৫পৃঃ) দুরাত্মা = গরীব (২৫পৃঃ) (অতএব দরিদ্রেরাও "দুরাত্মা" !), ইতরপ্রাণী = মানুষ ভিন্ন অন্য জানোয়ার (৬৮ পৃঃ) — তাহা হইলে, মানুষও একরকম "জানোয়ার" !) পূজ্য = মাবুদ (৭৬ পৃঃ)।

একটু উচ্চ শ্রেণীর বাংলা লিখিতে গিয়া "মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য" (চতুর্থভাগ) পুস্তকের রচয়িতাও বহুস্থানে হাস্যকর শব্দ-সমাবেশ করিয়াছেন। যথা :—"জননীও জান্নাৎবাসিনী হয়েন (= পরলোক গমন করেন", "মেহেরবান্ খোদাতায়ালার অপার করুণায়" ; "তুমি রহমান, সর্ব্ব-শক্তিমান" ; "অর্ণবপোতাদির আবিষ্কার হওয়াতে **পানিপথে** বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে"—ইত্যাদি। (ইহা যুদ্ধের পানিপথ নহে) অথচ। এই পুস্তকেই মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতা "বঙ্গভাষা"ও স্থান পাইয়াছে। মাতৃ-ভাষার প্রতি অনাবিল ভক্তিপূর্ণ এই কবিতাকে বিদ্রূপ করা সঙ্কলনকারীর উদ্দেশ্য নহে ত? এই শ্রেণীর মুসলমান লেখক যদি মধুসূদনের মত নিজেদের বদ্ধমূল বিজাতীয়তার মোহ একেবারে এড়াইতে পারিতেন তবে বাংলার অনেক দুঃখ দূর হইত।

পর্য্যন্ত আরবীতে না করিয়া মাতৃভাষায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে যুগে ভারতীয় পরাধীন মুসলমানদের অন্ধ বিজাতীয় অনুকরণ নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তা ও পৌরুষের বিষয় নহে।

সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়াও এ-কথা বিবেচনা করা উচিত। অনুকরণ দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না, সাহিত্য রচনা ত নিশ্চয়ই না। শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানের লেখা বাংলা কেন এক রকম হইবে না, হিন্দুবিদ্বেষ ও প্যান্-ইস্লামিজম্ ভিন্ন তাহার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। প্রথমে যখন এ দেশীয় লোকেরা খৃষ্টিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনেকেই মনে করিত তাহারা "রাজার জাতি"। গ্রাম্য প্রবাদানুসারে তেলাপোকা যেমন কাঁচপোকার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়, তেমনই হিন্দু খৃষ্টিয়ান হইয়া ভাবিত ক্রমে ক্রমে সে ইংরেজ হইয়া যাইবে। দেশীয় খৃষ্টান সমাজের সে মোহ এখন গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সমাজে সেই "কাঁচ-পোকা" হইবার আশা এখনও খুব প্রবল। ইংরাজ সরকারের ইঙ্গিতে এবং প্যান্-ইস্লামিজমের "খ্বাবের" ঘোরে তাঁহাদের অনেকে মনে করেন তাঁহারা প্রচ্ছন্ন আরব কি তাতার। খৃষ্টপ্রচারসমিতির চেষ্টায় এখন বিশুদ্ধ বাংলায় খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার হইতেছে, ইংরাজি ভাষার অ-স্বাভাবিক প্রেম ত্যাগ করিয়া ভূতপূর্ব্ব "নকল ইংরেজ"গণ এখন আসল ভারতীয় হইয়া খাঁটি ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। অপরপক্ষে, এক শ্রেণীর মুসলমান খাঁটি বাংলাকে বিকৃত করিয়া লিখিয়া মনে করিতেছেন যে, তাঁহারা আরব ও পারস্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন।

মুসলমান সমাজে সু-লেখকের অভাব নাই। যে-সমাজে "বিষাদসিন্ধু", "মহর্ষি মনসুর" প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ রচনা হইতে পারে, যে-সমাজে মিঃ ওয়াজেদ আলি, কাজি নজরুল, কাজি আবুল হোসেন, মৌলানা আক্রম খাঁ প্রভৃতি লেখক এবং শ্রীমতী ফাতেমা খানম্, শ্রীমতী বেগম সুফিয়া হোসেন, শ্রীমতী সুফিয়া খাতুন প্রভৃতি লেখিকা

লেখকগণের সহিত সুস্থ সবল প্রতিযোগিতা ক্রমে বৃদ্ধি না পাইবার কোন কারণই নাই। সাম্প্রদায়িকতা ও প্যান্-ইস্‌লামিজম্-এর ধাঁধা কাটিয়া গেলে, হিন্দুর বাংলা ও মুসলমানের বাংলায় কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন আপত্তি যুক্তিসহ নহে; গোঁড়া হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম্মমতের প্রভেদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন। মুসলমানকর্ত্তৃক যে সকল সাময়িক পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই প্রকাশিত, তাহাতেও সুন্দর সুন্দর বিশুদ্ধ বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে—"মাসিক মোহাম্মদী", "সওগাত", "সাপ্তাহিক মোহাম্মদী", "হানাফি", "আল-মুস্‌লিম" প্রভৃতি পত্রিকা তাহার প্রমাণ। তথাপি মক্তব-মাদ্রাসায় পূর্ব্বোক্তরূপ অনর্থ চেষ্টা কেন?

শুনা যায়, ঢাকা সেকেণ্ডারী বোর্ড "মুসলমানী বাংলা"য় লিখিত পুস্তকসকল হিন্দু-মুসলমান সকল ছাত্রের জন্যই অবশ্যপাঠ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙালী সাবধান!

চীন-জাপান যুদ্ধ

[নিম্নে চীন-জাপান যুদ্ধের যে চিত্র-গুলি প্রকাশিত হইল, সে-গুলি আমাদের সাংহাইস্থিত সংবাদদাতার প্রেরিত নিজস্ব চিত্র।]

জাপানী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা

সাংহাই আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ হইতে জাপানী বাহিনীর যুদ্ধাভিযান। চিত্রটির ডানদিকে সাংহাইএর ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত দুইটি শিখ পুলিশ লক্ষ্য করিবার বিষয়।





বিদ্ধস্ত সাংহাই

গোলাবর্ষণের পর সাংহাই-এর এক অংশ। এই অংশে চীনারা বাস করিত।

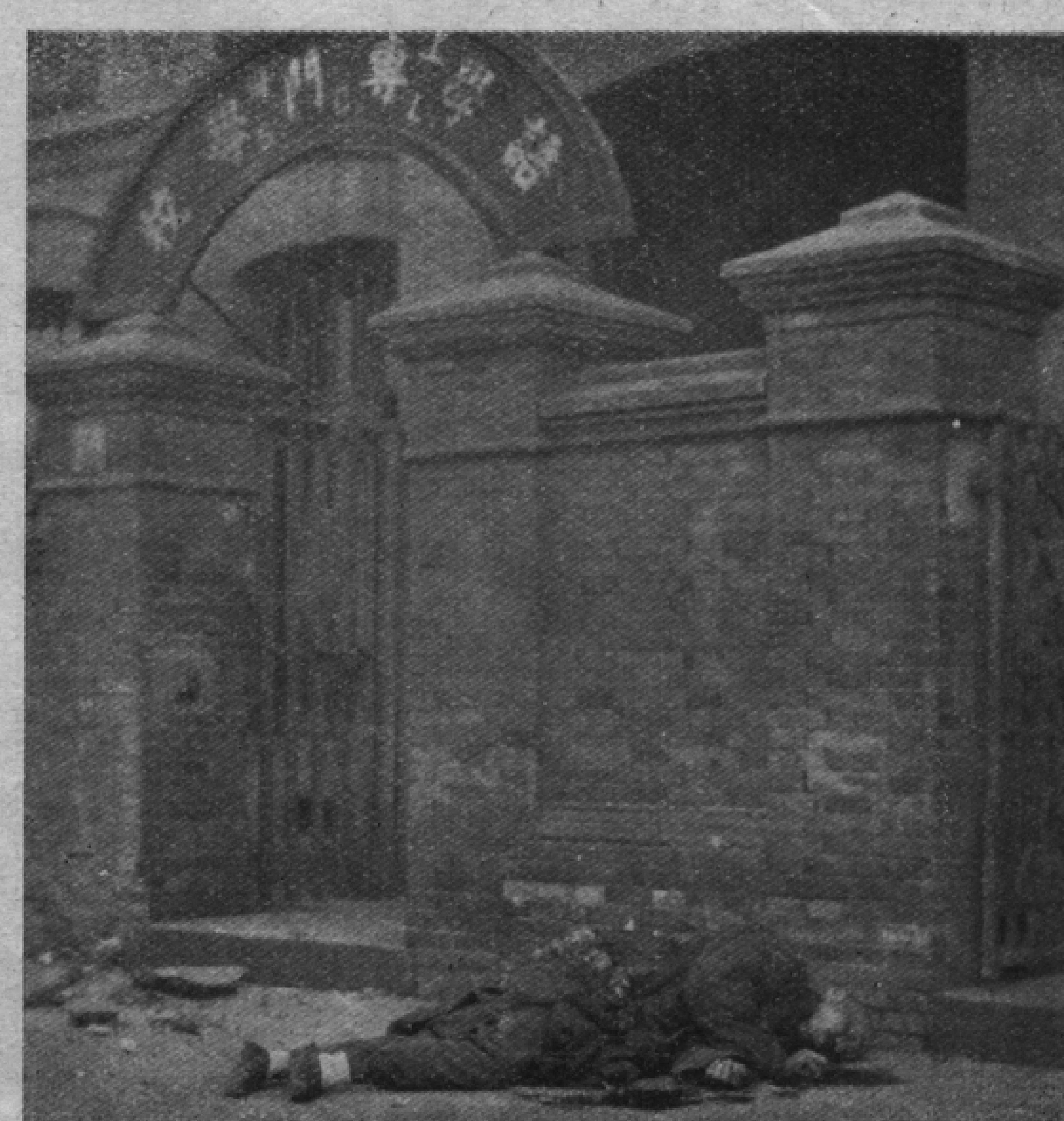
চীনের হল্‌দিঘাট



সাংহাই-এর যুদ্ধে যে চীন বাহিনী মৃত্যুপণ করিয়া জাপানী আক্রমণকে বাধা দেয়, সেই ১৯ নং বাহিনীর কয়েকটি সৈন্য। জাপানী সৈন্যদের তুলনায় ইহাদের অস্ত্র-অস্ত্র, সাজসজ্জা ও শিক্ষা যে অনেক নিকৃষ্ট তাহা এই চিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়



১৯ নং চীনবাহিনার প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার সহকারীগণ।



জাপানীদের দ্বারা নিহত একটি চীনা। এ-ব্যক্তি সৈন্য নহে ও জাপানীদের কোন শত্রুতাচরণ করে নাই। এরূপ দৃশ্য সাংহাই-এর রাজপথে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

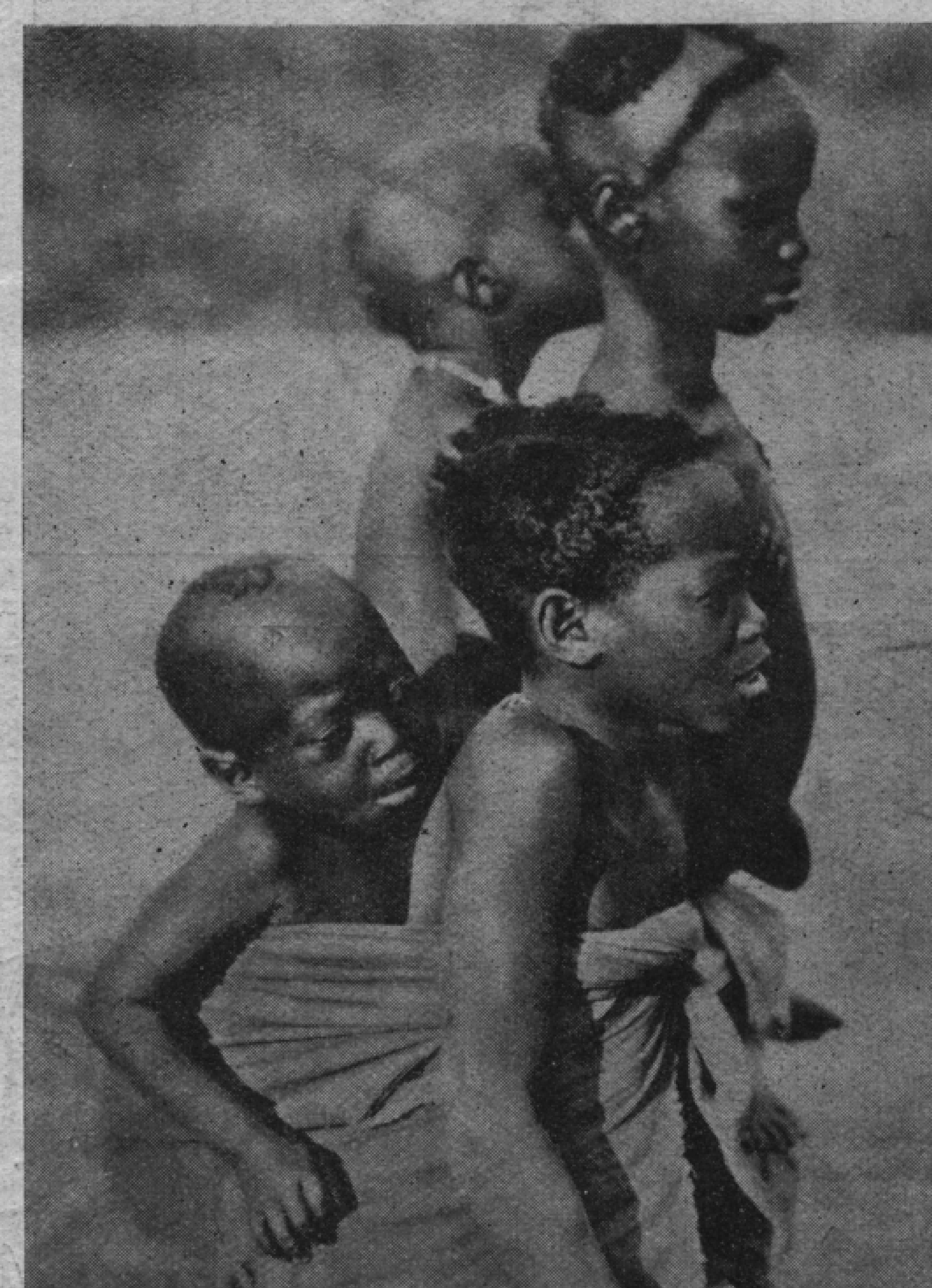
পাঁচমিশালি

পশ্চিম-আফ্রিকার 'অ্যামাজন' নিগ্রো রমণী—



নিগ্রো নর্ত্তকী—পশ্চিম-আফ্রিকার অ্যামাজন নর্ত্তকী। উহার শিরোভূষণটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। একমাত্র পুরুষ যোদ্ধারাই উহা পরিতে পায়।

সম্প্রতি একটি জার্ম্মান অভিযান পশ্চিম-আফ্রিকায় নৃতত্ত্বের তথ্য আবিষ্কার করিতে গিয়াছিল। উহা সে-অঞ্চলের নিগ্রোদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। এই অভিযানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি জার্ম্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই নিগ্রোদের দুইটি ছবি দেওয়া গেল।



দুইটি নিগ্রো বালক তাহাদের ছোট ভাইদের পিঠে বাঁধিয়া লইয়াছে। এই জাতীয় নিগ্রোদের মধ্যে শিশুকে বহন করিবার প্রথা এইরূপ। আমাদের দেশেও পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে এইরূপে শিশু বহন করিবার রেওয়াজ আছে।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান শিশু—

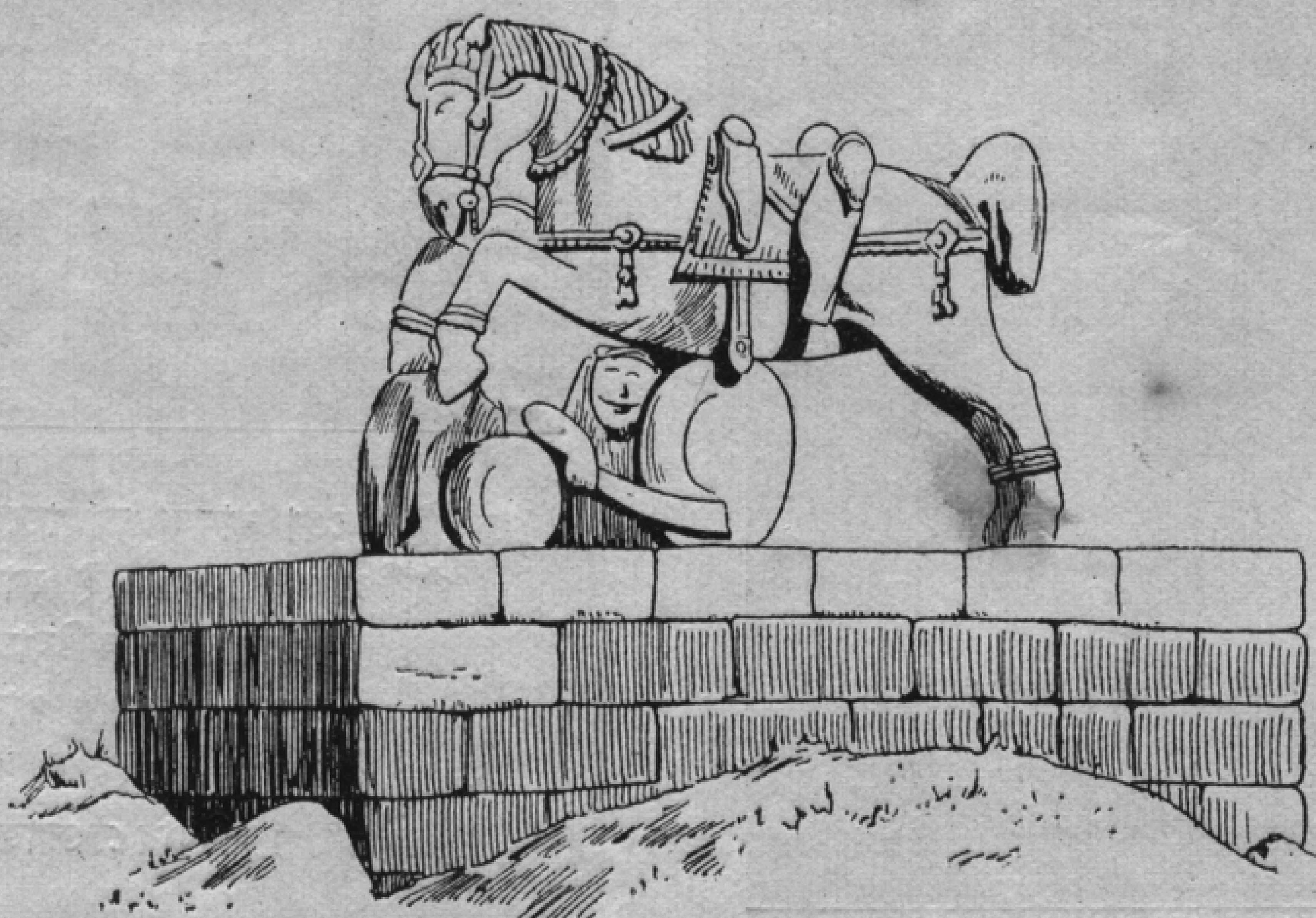
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা সম্পূর্ণ অসভ্য ও ভীষণদর্শন বলিয়া আমাদের ধারণা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতি সভ্যতায় বেশ উন্নত ছিল এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ ভাল। পেরু ও মেক্সিকোর আদিম সভ্যতার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যে সকল জাতি বেশ উন্নত ছিল, পুয়েব্লোরা তাহাদের একটি। এই সঙ্গে পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান শিশুর দুইটি চিত্র দেওয়া গেল। ইহা হইতে তাহাদের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ কি রূপ ছিল, তাহার ধারণা করা যাইতে পারিবে।

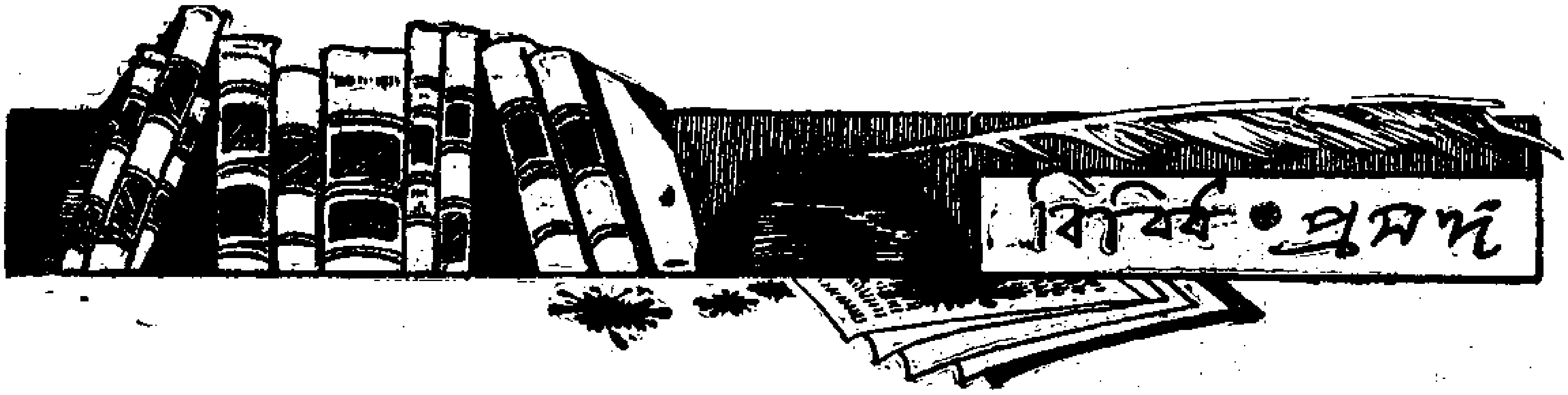


একটি পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান বালক



তিনটি পুয়েব্লো শিশু





ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা অদূরে

ব্রিটেনের ব্যবস্থাপক সভার নাম যেমন পার্লেমেণ্ট, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রমণ্ডলের ব্যবস্থাপক সভার নাম তেমনি কংগ্রেস। এই কংগ্রেস দুই চেম্বার বা কক্ষে বিভক্ত ;—প্রতিনিধি-সভা (House of Representatives) এবং সেনেট। কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে কংগ্রেসের দুই চেম্বারে পাস হইবার পর প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ দেশনায়কের দ্বারা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে স্পেনের অধীন ছিল। তেত্রিশ বৎসর হইল উহা আমেরিকার দখলে আসিয়াছে। আমেরিকার শাসন আরম্ভ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার দাবি করিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ও বেসরকারী কোন কোন আমেরিকান নেতা তাহাদের এই দাবির সমর্থনও করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার জন্য আইন-প্রণয়ন ইতিপূর্ব্বে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। গত ৪ঠা এপ্রিল ২২শে চৈত্র তারিখে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-সভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আট বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকার আইন পাস হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুসংবাদ। কারণ, যদিও এখনও বিলটির সেনেটে পাস হইয়া প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষর পাইতে বাকী আছে, তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন যে প্রারম্ভিক পরীক্ষা, তাহাতে উহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা ইহা ধরিয়া লইয়া এই সব মন্তব্য করিতেছি, যে, খাঁটি স্বাধীনতা ফিলিপিনেরা পাইবে। কারণ ফিলিপিনো নেতা ডাঃ হিলারিও সি মোন্‌কাডো নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে লিখিয়াছিলেন, আইনে সর্ত্ত থাকিবে, যে, আমেরিকা ফিলিপাইন্সে আপন সৈন্যদল ও রণতরীর ঘাঁটি বা আড্‌ডা রাখিতে পারিবে, এবং ফিলিপাইন্ সাধারণতন্ত্রের মূল রাষ্ট্রবিধি আমেরিকার কংগ্রেস ও প্রেসিডেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। এরূপ সর্ত্ত-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকিবে না।

আমেরিকার কৃষকেরা ফিলিপাইন-স্বাধীনতা অঙ্গীকারে খুশী হইয়াছে। এখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকারই অংশ বলিয়া ফিলিপাইন্সে উৎপন্ন শস্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য বিনাশুল্কে আমেরিকায় আমদানী হইয়া তথাকার শস্যাদির সহিত প্রতিযোগিতা করে। ফিলিপাইন্স স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া গেলে আমেরিকা অন্যান্য স্বাধীন বিদেশের জিনিষের উপর যেমন তেমনি ফিলিপাইন্সে উৎপন্ন দ্রব্যজাতের উপরও শুল্ক বসাইয়া আমেরিকার বাজারে তৎসমুদয়কে আমেরিকার জিনিষপত্রের চেয়ে দুর্মূল্য করিতে পারিবে। কিছুকাল হইতে অনেক ফিলিপিনো আমেরিকায় গিয়া স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে তথায় বসবাস করিতেছে। তাহাতে আমেরিকার শ্বেতকায়দের সামাজিক অসুবিধা ও অনিষ্ট হইতেছে এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। অথচ ফিলিপাইন্স আমেরিকার শাসনাধীন থাকিতে অন্যান্য এশিয়াবাসীদের মত ফিলিপিনোদেরও আমেরিকায় বসবাসে বাধা দেওয়া চলে না। ফিলিপাইন্স স্বাধীন হইয়া গেলে বাধা দেওয়া চলিবে।

আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারী মিঃ ষ্টিমসন একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন, ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলে সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন-জাপান প্রভৃতি দেশে আমেরিকার প্রেস্‌টিজ্ বা প্রতিপত্তি গুরুতর রকমে কমিয়া যাইবে, এবং তাহাদের স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে,

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কোন বিদেশী শক্তির—সম্ভবতঃ জাপানের কিংবা চীনের—প্রভুত্বের অধীন হইয়া পড়িবে।

আমেরিকার প্রতিপত্তি কমিবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকাকে হারাইয়া দিয়া আমেরিকার অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিত, তাহা হইলে এ-কথা উঠিতে পারিত বটে, যে, আমেরিকার সামরিক শক্তি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাবের কারণ যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় নহে। তাহাদিগকে স্বাধীনতাদান ন্যায়সঙ্গত এবং আমেরিকার পক্ষেও হিতকর ও সুবিধাজনক বুঝিয়া আমেরিকার বর্ত্তমানে প্রবল রাজনৈতিক দল আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে ঐ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি হ্রাস না পাইয়া বরং বাড়িবে।

ফিলিপিনোরা স্বাধীন হইলে, পরে তাহাদের দেশ জাপান বা চীনের দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রবল দেশের দ্বারা কবলিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও পরদেশ-জয়ের প্রথাটা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা সত্য—জাপানকর্ত্তৃক চীন জয় করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা সত্য। সুতরাং আমেরিকা ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দিলেও আর কেহ তাহাদের দেশ দখল করিবেই, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলা যায় না। তদ্ভিন্ন, "যেহেতু কোন-না-কোন জাতি ফিলিপিনোদের উপর দস্যুতা করিয়া তাহাদের দেশ দখল করিবেই, অতএব আমরা দস্যুতালব্ধ পরদেশ ফিলিপাইন্স ছাড়িয়া দিব না," ইহা চোরডাকাতের মুখে শোভা পাইতে পারে, সভ্যতাভিমানী জাতির মুখে শোভা পায় না। ন্যায়সঙ্গত যাহা তাহা তোমরা কর, অন্যেরা ভবিষ্যতে কি করিবে তাহার জন্য তোমাদের অতিরিক্ত মাথাব্যথা ভণ্ডতার লক্ষণ। পাছে ফিলিপিনোরা অন্য কোন জাতির অধীন হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহাদের প্রতি দয়াবশতঃ এই আশঙ্কায় আমেরিকা ফিলিপাইন্সের উপর আধিপত্য রক্ষা করিতেছে, ইহা নিছক মিথ্যা কথা। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে প্রবল আমেরিকান রাজনৈতিক দল পরোক্ষভাবেও এরূপ কোন মিথ্যা কথার প্রশ্রয় দিতে চান না।

ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন্স

ফিলিপিনোরা স্বাধীন হইলে তাহাতে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষেরও হিত হইবে।

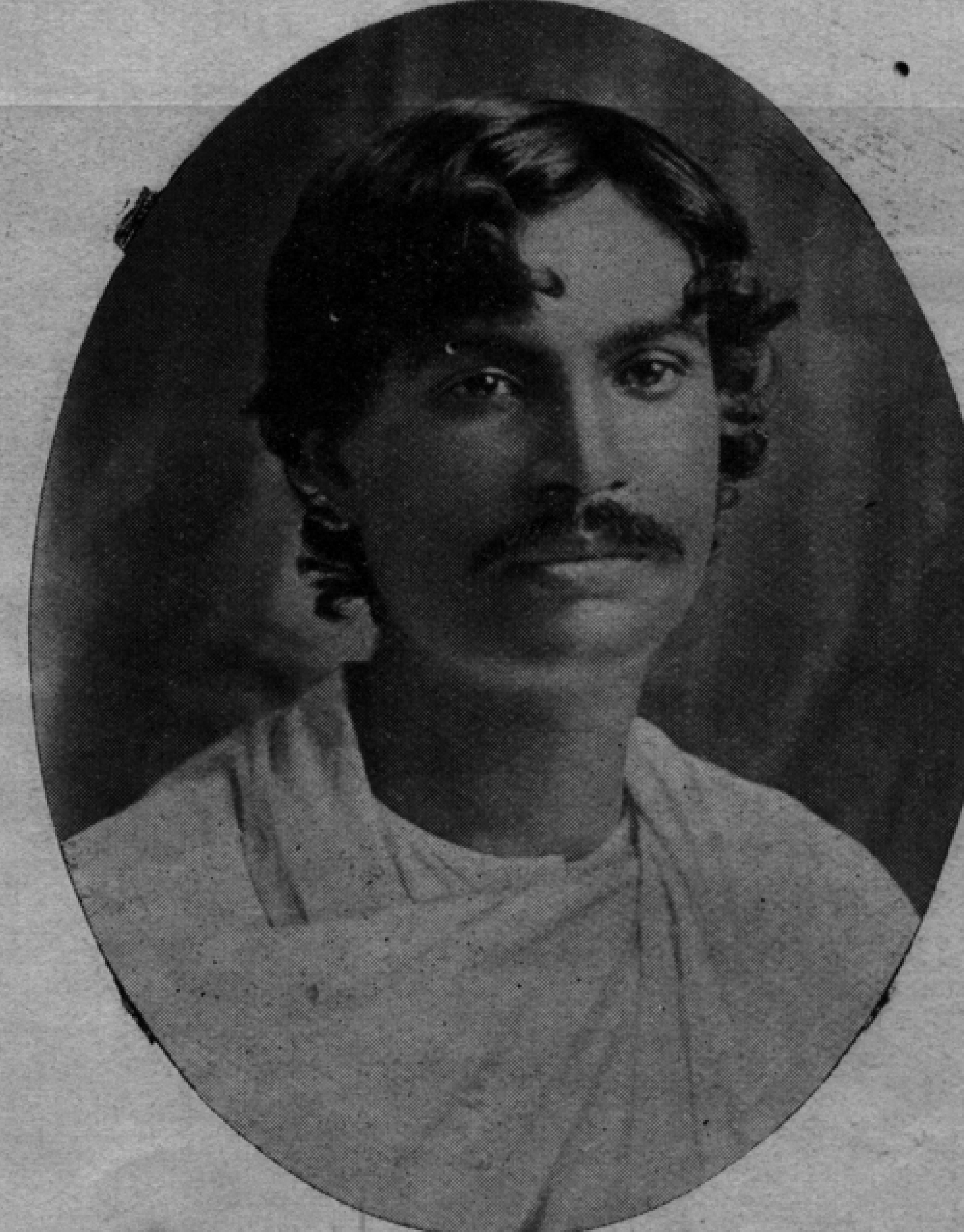
অনেক ইংরেজ আছে—যেমন ভূতপূর্ব্ব রেভারেণ্ড ও বর্ত্তমানে মিস্টার এডোয়ার্ড টমসন—যাহারা বলে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের সমালোচনা করিবার অধিকার আমেরিকানদের নাই, কেন-না তাহারাও পরদেশ নিজেদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। ফিলিপাইন্স স্বাধীন হইয়া গেলে এই ইংরেজদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু ফিলিপিনোরা আমেরিকার অধীন থাকিতে কেন যে রেভারেণ্ড ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের মত আমেরিকান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে দু-কথা বলিতে পারিবেন না, তাহা বুঝা কঠিন। আমেরিকান গবর্ন্মেণ্ট বা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট অন্যায়কারী হইলে ব্যক্তিগত ভাবে একজন আমেরিকান বা একজন ইংরেজ ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে কেন অনধিকারী হইবেন? ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব ফিলিপিনোদিগকে আমেরিকার অধীন রাখার বিরুদ্ধেও লিখিয়াছেন।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তেত্রিশ বৎসর হইল আমেরিকার অধীন হইয়াছে, ভারতবর্ষের কোন-না-কোন অংশ ইংরেজদের অধীন হইয়াছে প্রায় দুই শত বৎসর। সিপাহী-বিদ্রোহকে যদি কোন ইংরেজ স্বাধীনতার যুদ্ধ মনে করে এবং সেই যুদ্ধে ইংরেজদের জয় ও মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তির শেষ দৃঢ় গাঁথুনী মনে করে, তাহা হইলে তাহাও চুরাশি বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। যেদিক দিয়াই দেখা যাক, ফিলিপিনোরা যতদিন আমেরিকানদের অধীন আছে, ভারতীয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশী দিন ইংরেজদের অধীন আছে। কিন্তু অল্পতর সময়ের মধ্যে আমেরিকানরা ফিলিপিনোদিগকে ভারতীয়দের চেয়ে বেশী রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা দিয়াছে, এবং তাহাদের দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা শিক্ষার অধিকতর বিস্তার সাধন করিয়াছে। অতএব ইহা

বিবেচনা করিলেও আমেরিকানরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সমালোচনা করিতে অধিকারী।

—



শ্রীসারদাচরণ উকিল

লণ্ডনে প্রদর্শিত বাঙালী চিত্রকরের ছবি

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে আমরা লণ্ডনে দিল্লী-প্রবাসী বাঙালী চিত্রকর সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের কতকগুলি ছবির প্রদর্শনীর বিষয় লিখিয়াছিলাম। ছবিগুলি বিলাতী চিত্রসমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছিলাম। চিত্রকর মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা তাঁহার প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে তিনটির ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার ভ্রাতা বরদাচরণ উকীলের উপর প্রদর্শনীর ভার ছিল। আর এক ভাই রণদাচরণ উকীলও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহাদের ও



ঝান্সীর রাণী



আলমগীর



বুদ্ধ, জননী ও মৃত শিশু

বিলাতে প্রশংসাপ্রাপ্ত অন্য কয়েকজন বাঙালী চিত্রকরের ফোটোগ্রাফ পরে প্রকাশিত হইবে।

—

অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু

বিহারের বিহার-শরীফ নামক ছোট শহরে স্থিত নালন্দা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ বসুর অকালমৃত্যুতে বিহার প্রদেশ ও ভারতবর্ষ একজন সুশিক্ষকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক-জ্ঞানবিস্তারকল্পে তিনি যে মূল্যবান্ কাজ করিতেছিলেন, তাহার অবসানও দুঃখের বিষয় হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পূর্ণ ছত্রিশ বৎসরও হয় নাই। এই অল্প বয়সে তিনি অধ্যাপকের কাজে যশ এবং তাঁহার ছাত্রদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পীড়ার সময় তাঁহার ছাত্রেরা দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। তিনি প্রথমে বিশ্বভারতীতে পাঁচ ছয় বৎসর ইতিহাসের অধ্যাপকতা করেন। সেখানে থাকিতে তিনি পণ্ডিত বিধুশেখর



পরলোকগত ফণীন্দ্রনাথ বসু

শাস্ত্রী, অধ্যাপক সিল্‌ভাঁ লেভি, অধ্যাপক ভিণ্টারনিজ্‌ প্রভৃতি বিদ্বান্‌ লোকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তিব্বতী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি অল্পভাষী, মিতভাষী, মিষ্টভাষী, শান্ত ও ধীরস্বভাব এবং পরিশ্রমী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে অল্প বা দীর্ঘকালের জন্য আমরা গেলে দেখিতাম, তিনি প্রায়ই পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। ইহা ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় প্রায় সব সময়েই তিনি কোন-না-কোন কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ শ্রমশীলতার অভ্যাসবশতঃ অল্প বয়সেই তিনি অনেক বাংলা ও ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ ব্যতিরেকে অনেকগুলি বহি লিখিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। কতক এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কয়েকখানি অসম্পূর্ণ আছে। তাঁহার মুদ্রিত পুস্তকগুলির নাম—

Indian Teachers of Buddhist Universities, Indian Teachers in China, The Indian Colony of Champa, The Indian Colony of Siam, The Hindu Colony of Cambodia, The Principles of Indian Silpa-Sastra, Lives of Sir Asutosh Mukerji and Sir P. C. Roy, An English Translation of Bankim Chandra's "The Twin Rings", English Translation of the Itinerary of the Chinese Pilgrim U-Kong (in the Press), A Hundred Years of the Bengali Press.

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রতিমা-মান-লক্ষণের একটি সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেন। ইহা তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত মিলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। নালন্দা সম্বন্ধে তিনি একটি বহি প্রায় সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকের দ্বারা সম্পূর্ণ করাইয়া মুদ্রিত করিলে ঐতিহাসিক সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। নালন্দা সম্বন্ধে তাঁহার একটি ছোট বহি আগেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলায় তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দুটি জীবনচরিত, কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসের বহি, এবং নালন্দা ও বিক্রমশিলা সম্বন্ধে দুটি ছোট বহি লিখিয়াছেন। মীরাবাঈ সম্বন্ধে একখানি বহি এবং রবীন্দ্রনাথের একখানি জীবনচরিতও তিনি লিখিতেছিলেন। স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে ও মেজর মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে ফণীবাবু ও অন্য এক জন অধ্যাপক সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একটি বিস্তারিত ইংরেজী ইতিহাস লেখেন। তাহা প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। মেজর বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণবের ইংরেজী জীবন-চরিতও ফণীবাবু লিখিয়াছেন। তাহাও মুদ্রিত হইবে।

তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহার মত ব্যায়াম ও বিশ্রাম করিতেন না। আহারও যেমন হওয়া উচিত, তাহা করিতেন না—অনেকটা তপস্বীর মত থাকিতেন। তাঁহার অকালমৃত্যু পীড়ার পর হইয়াছে বটে কিন্তু সে পীড়া সাংঘাতিক নহে। এই জন্য মনে হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বিশ্রামের অল্পতা এবং পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্য আহার না করা তাঁহার অল্পায়ু হওয়ার কারণ।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া ব্রসেল্‌সের একটি বিদ্যাপীঠের (Universite Philotechnique-এর) নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত বিদ্যাপীঠ তাঁহাকে পিএইচ-ডি উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার মত ইতিহাস ও শিল্পশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এরূপ উপাধি লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তিনি এরূপ নম্রস্বভাব ছিলেন, যে, নিজের উপাধির কথা সুপরিচিত লোক-দিগকেও জানিতে দেন নাই। বস্তুতঃ তিনি নিজের ঢাক নিজে পিটাইতে পারিতেন না বলিয়া এবং তাঁহার মুরুব্বির জোর ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার গুণের ও জ্ঞানের উপযুক্ত কোন প্রথম শ্রেণীর কলেজের বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা লাভ করিতে পারেন নাই। দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত অনুমান করিতে হইতেছে, সম্ভবতঃ এই কারণে কঠোর জীবন-সংগ্রাম তাঁহার আয়ুহ্রাসের কারণ হইয়া থাকিবে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে না পারিলেও জ্ঞান অর্জ্জন ও জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের একমাত্র সান্ত্বনা।

—

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊনষাট বৎসর দুই মাস বয়সে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রায় এক বৎসর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে ছোট গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন।

আমরা যতদূর জানি, মাসিকপত্রে তাঁহার লেখা প্রবাসী-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "দাসী" পত্রিকায় প্রথমে বাহির হইয়াছিল। তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তাঁহার লেখা দিলদারনগর হইতে আসিত। তাঁহার সেকালের একটি লেখার কথা এখন মনে পড়িতেছে। উহা "একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত," ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের "দাসী" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাহার পর প্রবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক যখন "প্রদীপ" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতেও প্রভাতবাবু লিখিতেন। প্রবাসী-সম্পাদকের সম্পাদিত "প্রদীপে" তাঁহার অনেকগুলি কবিতা (সেকালে তিনি কবিতা লিখিতেন) এবং সিমলা শৈলের একটি সচিত্র বর্ণনা বাহির হইয়াছিল। তাঁহার একটি কবিতার নাম এখনও মনে আছে—"আকাশ কেন নীল?" উহা প্রদীপে বা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, মনে নাই। উহা শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ বলিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, এই রূপ মনে পড়িতেছে। প্রবাসী বাহির হইবার পর প্রভাতবাবু তাহাতে অনেক ছোট গল্প এবং একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। আমাদের ধারণা, উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী। তিনি ইংরেজীতেও গল্পের অনুবাদ উত্তমরূপে করিতে পারিতেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিস্তর গদ্য ও পদ্য রচনার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সকলের আগে যে অনুবাদটি ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে উক্ত পত্রিকায় বাহির হয় তাহা প্রভাতবাবুর কৃত। উহা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্পের অনুবাদ, নাম "দি রিড্‌ল্ সল্‌ভ্‌ড্।" প্রভাতবাবুর নিজের দু-একটি ছোট গল্পের অনুবাদও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, ও প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন তিনি অনেক বৎসর নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদকতা



পরলোকগত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর তিনি গয়া ও অন্য দু-এক জায়গায় ব্যবহারাজীবের কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কাজে তাঁহার মন বসিত না। সেই জন্য তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার সহিত আইনের এই সম্পর্ক ছিল, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপক ছিলেন, যদিও পীড়াবশতঃ দীর্ঘকাল ছুটিতে ছিলেন।

প্রভাতবাবু সাধারণ যে-সব চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহাতেও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত।

—

মোহেন্‌জো-দাড়ো ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহেন্‌জো-দাড়ো এবং তাহার প্রাচীনত্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসম্ভব চাপা দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব-গৌরব কমাইবার চেষ্টা তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও হইয়াছে। এখন সেই চেষ্টার অবসান হওয়া উচিত। কয়েক মাস হইল, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর-জেনার‍্যাল স্যর জন মার্শ্যাল সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত ও অংশতঃ লিখিত মোহেন্‌জো-দাড়ো সম্বন্ধে বৃহৎ সচিত্র ও বহুমূল্য পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহাতে রাখালবাবুর কাজ সম্বন্ধে মার্শ্যাল সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে রাখালবাবুর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মার্শ্যাল সাহেবের নিজের লেখা কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"The site [of Mohenjo-daro] had long been known to district officials in Sind, and had been visited more than once by local archaeological officers, but it was not until 1922, when Mr. R. D. Banerji started to dig there, that the prehistoric character of its remains was revealed...Mr. Banerji himself was quick to appreciate the value of his discovery and lost no time in following it up......The few structural remains of that [Indus] civilization which he unearthed were built of bricks identical with those used in the Buddhist Stupa and Monastery, and bore so close a resemblance to the latter that even now it is not always easy to discriminate between them. Nevertheless, Mr. Banerji divined, and rightly divined, that these earlier remains must have antidated the Buddhist structures, which were only a foot or two above them, by some two or three thousand years. That was no small achievement !" *Mohenjo-daro and the Indus Civilization*, vol. I, pp. 10-11.

মার্শ্যাল সাহেব অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

"Three other scholars whose names I cannot pass over in silence, are the late Mr. R. D Banerji, to whom belongs the credit of having discovered, if not Mohenjo-daro itself, at any rate its high antiquity...."—*Ibid.*, vol i, page x.

মার্শ্যাল সাহেবের পুস্তকখানির প্রকাশক—আর্থার প্রব্‌স্থেন লণ্ডন; মূল্য বার গিনি—১৬৮৲ টাকা। আমরা উহা সমালোচনার্থ প্রকাশকের নিকট হইতে পাইয়াছি বলিয়া উহা হইতে পরে নানা তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব—ক্রয় করা সহজ হইত না।

—

চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক দিন হইল চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকিতেন। "শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ," "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন", প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি ছবির রঙীন প্রতিলিপির বাজারে কাট্‌তি আছে। তিনি দীর্ঘকাল বাংলা দেশের বাহিরে বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের বৃত্তান্তে তাঁহার সম্বন্ধেও কিছু লিখিয়াছেন।

—

জাপানী কুসংস্কার

সভ্য অসভ্য সকল দেশের লোকেরই কতকগুলা কুসংস্কার আছে। জাপানীদের একটা কুসংস্কার এই, যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার বৎসর ১৯৩২ এবং জাপানী পঞ্জিকার বৎসর ২৫৯২ বর্ত্তমান নানা উপদ্রব ও বিপদাপদের জন্য দায়ী। জাপানী ভাষায় ১৯৩২কে "ই কু সা নী" বলা হয়। তাহার মানে "যুদ্ধের অভিমুখে"। জাপানী বৎসর ২৫৯২কে "জি গো কু নী" অর্থাৎ "নরকের দিকে" বলা হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ জাপানীদিগকে নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে বটে।

—

বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিন্যান্সের দৌড়

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ ডেলী মেল এক খানি মডারেট দৈনিক। অর্ডিন্যান্সগুলি অনুসারে কাজ সরকার পক্ষ হইতে কি ভাবে করা হইতেছে, সেই বিষয়ে উহাতে কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সেই মন্তব্য বোম্বাই গবন্মেণ্ট আপত্তিকর মনে করিয়া ঐ কাগজটির নিকট হইতে কয়েক হাজার টাকা জামীন চান। তাহার বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল হাইকোর্টে আপীল করেন। তিন জন জজের কাছে বিচার হয়, তাহার মধ্যে প্রধান বিচারপতি এক জন। তাঁহারা আপীল নামঞ্জুর করেন। প্রধান বিচারপতি রায় ও অন্য দু-জন জজ তাহাতে

সায় দেন। রায় হইতে বুঝা যায়, যে, বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিন্যান্স ইণ্ডিয়ান পীন্যাল কোডের (ফৌজদারী দণ্ডবিধির) চেয়ে এবং ১৯১০ সালের যে প্রেস-আইন অনেক চেষ্টার পর ১৯২২ সালে রদ হয়, তাহা অপেক্ষা খুব কঠোর, ব্যাপক ও স্থিতিস্থাপক।

ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কি না, সরকারী য়্যাডভোকেট-জেনার‍্যালের মতে, তাহা বিচার্য্য নহে; বিচার্য্য এই, যে, লিখিত মন্তব্য দ্বারা পাঠকদের মনে গবর্মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা জন্মিয়াছে কি না বা তাহাতে উহা জন্মিবার টেণ্ডেন্সি অর্থাৎ প্রবণতা আছে কি না। টেণ্ডেন্সি নাই প্রমাণ করা দুঃসাধ্য—অসাধ্য বলিলেও চলে।

মৌলানা ~~মোহাম্মদ আলীর পরিচালিত~~ কমরেড কাগজ সম্পর্কে বহু বৎসর পূর্ব্বে একটি মোকদ্দমা হয়, যে, তাঁহার লিখিত একটি পুস্তিকা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা জন্মিতে পারে। এই মোকদ্দমার আপীলের রায়ে কলিকাতা হাইকোর্টের স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স বলিয়াছিলেন, যে, পুস্তিকাটির লেখা দ্বারা কোন শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই, হইতে পারে না—এই "না" প্রমাণ করা অসম্ভব। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি,

And what is this negative ? It is not enough for the applicant to show that the words of the pamphlet are not likely to bring into hatred or contempt any class or section of His Majesty's subjects in British India, or that they have not a tendency in fact to bring about that result. But he must go further and show that it is impossible for them to have that tendency either directly or indirectly, and whether by way of inference, suggestion, allusion, metaphor or implication. Nor is that all ; for we find that the Legislature has added to this that all-embracing phrase 'or otherwise'.

আলোচ্য বোম্বাইয়ের মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে তথাকার চীফ জষ্টিসের রায়ে আছে :—

It really comes to this, that there is no check on the Government as to the persons they may regard as suspects, that orders may be passed affecting drastically the conduct of such persons, that heavy punishments may be imposed for breach of any such order, that the right of appeal or application in revision, which can normally be [illegible] by such persons is largely curtailed.

যে-কোন লোককে সন্দেহভাজন মনে করতে কোনই বাধা নাই, সন্দেহভাজন লোকদের সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট খুব কড়া ও ব্যাপক হুকুম জারি করতে পারেন, এ রকম হুকুম না মান্‌লে গুরুতর শাস্তি হ'তে পারে, এবং এরূপে দণ্ডিত লোকদের সাধারণতঃ আপীল করবার যে অধিকার আছে, তা খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রায়ের আর এক জায়গায় আছে :—

We have no evidence whether the facts asserted in the articles on which the charges or some of them are based are true or false. The Advocate-General has argued the case on the basis that truth is immaterial. I think that contention right. There is no exception in Section 4 of the Press Act as amended by the Ordinance, making truth and public policy an answer to a charge under that section. As in the case of excepton 1 to section 499, I. P. C., this Court is not concerned with the wisdom or lack of wisdom of the criticism of unlawful or unjust acts of the Government. We merely apply the law as we find it. The effect of the Ordinance seems to me to bring within section 4 of the Press Act every charge of misconduct of the Government, whether such a charge is well-founded or ill-founded.

বোম্বাই হাইকোর্টের মতে বর্ত্তমান প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্স অনুসারে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যাহা লেখা হয়, তাহা সত্য কি না বিচার করা অনাবশ্যক; গবর্মেণ্টের অসদাচরণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখিত প্রত্যেক অভিযোগ, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বর্ত্তমান প্রেস আইনের চতুর্থধারা অনুসারে দণ্ডনীয়।

বোম্বাই হাইকোর্ট প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্সের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা কি না বলিতে পারি না। উহা ঠিক হইলে, তাহা হইতে ইহাই অনুমান করিতে হয়, যে, গবর্মেণ্ট বা গবর্মেণ্টের কোন কর্ম্মচারী কোন অন্যায় কাজ করিলে তাহা গবর্মেণ্টকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার পাত্র করে না, কিন্তু যে খবরের কাগজ ঐ অন্যায় কাজের বিবরণ বা তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে, সেই কাগজ গবর্মেণ্টকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার পাত্র করে। বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যাখ্যা ঠিক হইলে গবর্মেণ্টের কোন সমালোচনাই করা চলে না। অথচ গত ১লা মার্চ্চ ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোর পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন,

"The action taken against the Indian Press had been taken for one purpose only, namely, to stop incentives to disorder and terrorism and not to stifle expression of public opinion."

"ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে যেরূপ ব্যবস্থা

সরকারী লোকদের ভয়োৎপাদক কাজের প্ররোচনা বা উত্তেজনা বন্ধ করা—জনমতপ্রকাশ বন্ধ করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

—

মুস্লিম সাহিত্যসমাজ

মুস্লিম সাহিত্যসমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহ্‌মদ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে :—

কবি বলিয়াছেন—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এই সেবা দ্বারাই জীবনসমস্যা সমাধান করিতে হইবে এবং এই সেবার আদর্শে জীবনযাত্রাই মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেবার অর্থ ইহা নহে যে, একজনকে দুইটি পয়সা দিয়া তাহার কর্ম্মশক্তিকে বিনাশ করিয়া দিতে হইবে। সেবার প্রকৃত অর্থ মানুষের বিবিধমত অভাবমোচন। সেবার প্রেরণারই মানব আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি তত উন্নত যে যত বেশী লোকের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে; সেই জাতিই উন্নতিশীল যে আপনার সেবার মহিমায় অন্যের অভাব অভিযোগের সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। বেতারযন্ত্র, উড়ো জাহাজ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ যাহা জগৎবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে তাহা সকলই কি এই সেবার প্রেরণার ফল নয়? এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি কোরানবিশ্বাসীগণের করা উচিত ছিল, এবং বাস্তবিকই একদিন কোরানবিশ্বাসীগণ জ্ঞানগরিমায় সমস্ত জগতের বরণীয় ছিলেন।

মুসলমান সমাজে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবার—ন্যূনকল্পে কেবল মুসলমানদের সেবার—প্রবৃত্তি জাগিলে প্রভূত কল্যাণ হইবে। তাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলেও উপকৃত হইবেন।

—

মুসলমান বাঙালীর অতীত গৌরব

বঙ্গীয় মুসলিম তরুণসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মৌলবী সেরাজ উল হক্ যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে অনেক খাঁটি কথা আছে। তাঁহার মুসলমান শ্রোতারাও যে তাহাতে সায় দিয়াছিলেন, ইহা আশাপ্রদ।

সমবেত তরুণ বন্ধুবর্গ! নিখিলের কেন্দ্রে জাগরণ-ভেরী নিনাদিত হওয়ায় সমস্ত দেশের সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত, প্রমত্ত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানগণ আজ নিজেদের অদূরদর্শিতা, গোঁড়ামী এবং অন্ধতার ফলে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ভ্রাতৃগণ! আজ তুরস্ক, ইরান, পারস্য প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের প্রাচীন স্মৃতি স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্বগৌরবের 'সংবোধ' ও 'সংবেদ' লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আরব আরবের ভাবে, পারস্য পারস্যের ভাবে, তুরস্ক তুরস্কের ভাবেই জাগিতেছে। পারস্য, তুরস্ক, আফগানীস্থান, আরব-গৌরবের কাণাকড়িও গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় অমুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের অতীত যুগের কীর্ত্তিকাহিনীর, গৌরবকাহিনীর, স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়া আধুনিক দুনিয়ার স্কেল কম্পাস হাতে পলিটিক্স ও পলিসির মারপেঁচ দেখিয়া দূরবীক্ষণ চোখে নূতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছে।

মহোদয়গণ! পারস্য আরবীয় যুগের বিজাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের জামশেদ, জোহাক, ফরিদুন, কায়কোবাদ, খশরু, এবং জাল ও রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন জেন্দাবেস্তার ধর্ম্ম বা আধুনিক কোরানের ধর্ম্ম এই জাতীয় গৌরবের আলোকপুঞ্জের পথে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুরস্কও তাহার বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গীস্, হালাকু, কুবলয় ও মঙ্গুর্খা প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবর্গের ছবি বা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। মোস্তফা কামাল পাশা আরবীয় পর্দ্দা ও বোরকা ঝাড়িয়া ফেলিয়াই আধুনিক তুর্কী রমণীদিগকে প্রাচীন তুর্কী রমণীদিগের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে ও গিরিশৃঙ্গে ধাবিত এবং সাগরতরঙ্গে দোলায়িত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ এই প্রকার স্বাধীনচেতা তেজস্বিনী রমণী ব্যতীত অরিনিসূদন বীর সন্তান লাভ করা অসম্ভব।—কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণই ভারতের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। (শুনুন, শুনুন)।

অতঃপর বক্তা বলিতেছেন—

বন্ধুগণ! যে-সকল মুসলমানের রক্তে এখনও হিন্দু রক্তের তাজা গন্ধ আছে, তাঁহারা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা এবং অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর্য্যমহিমার বাণী ভুলিয়া গিয়াছেন এবং সেই ভুলিয়া-যাওয়াটাকেই গৌরবকর বোধ করেন! (বিস্ময়কোলাহল)। মহোদয়গণ! যে মহাবীর ভীষ্ম, সত্যাব্রতার শ্রীরামচন্দ্র, সব্যসাচী অর্জ্জুন, শূরকুলসূর্য্য কর্ণ প্রভৃতি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিবংশীয়গণের অসাধারণ বীর্য্য-গরিমার জন্য কোন গৌরবই বোধ করে না এবং করাটাকেও কলঙ্কজনক মনে করে, অন্যদিকে সে আরব বা পারস্যের বীরপুরুষদিগের গৌরবের বড়াই করিলেও তাহাতে মনে কোন জোর পায় না, কারণ সে জানে যে, তাহাদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই। (করতালি-ধ্বনি)।

ইহার ফলও মৌলবী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—

ভ্রাতৃগণ! বিগত দশ বৎসর কাল প্রচারকার্য্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু সভাসমিতিতে যোগদানকরতঃ অনেক সময় বিশাল জনশ্রেণীকে উত্তেজিত করিবার ও গৌরবে মাতাইবার জন্য মুসলিম গৌরবগাথার প্রাণময়ী উদ্বোধিনী বাণী শুনাইয়াছি। তাহার ফলে মূর্খ লোকদের চেহারায় কোন প্রকার আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। বরং লজ্জায় অনেকের মুখ মলিন হইতেই দেখিয়াছি। (শোন! শোন!!) কারণ মিথ্যা গৌরবকে বরণ করিয়া লইতে মন বেচারা কোন প্রকারেই প্রস্তুত নহে। মহোদয়বৃন্দ!

সংখ্যক মোগল, পাঠান ও খাঁটী সৈয়দের সন্তান ব্যতীত আর কাহারও মনে স্বাধীনতার ভাব, আত্মমর্য্যাদা, আত্মগৌরব, আত্মবিশ্বাস, আত্মানুভূতি ও আত্মসম্ভ্রমশীলতা নাই। (হাঁ হাঁ)। ইহার ফলে অধুনা আমাদের শত শত যুবা গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডারগ্রাজুয়েট হইলেও আত্মানুভূতি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রমশীলতার অভাবে শ্রেষ্ঠবংশসম্ভূত উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানগরিমা ও গুণমহিমা তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। অথচ বাংলার এই লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুতের জ্যোতি ও তেজপূর্ণ রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। (শোন শোন) কিন্তু তাহারা কেহই সেই গৌরবের স্মৃতি সম্মুখে ধরিতে না পারায় নীচতা ও অন্ধকারেই ঘুরপাক খাইতেছে। কেহ কেহ কৃত্রিমভাবে আপনাদিগকে মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ বলিয়া দাবি করিলেও মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না। তার মানে, মনের কাছে কোন চালাকিই খাটিতে পারে না। বাংলার মুসলমানদের দুর্গতির ইহাই এক কারণ। (নিশ্চয় নিশ্চয়—বিস্ময়ধ্বনি)।

ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে প্রভেদ কি হইয়াছে, বক্তা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বন্ধুবর্গ! আজ যেখানে অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আর্য্য গৌরব-গরিমা-কাহিনীতে মাতিয়া উঠিতেছে এবং বুকের পাটা উঁচু করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পতাকা লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান যুবক গৌরব ও মহিমার পথে কিছুই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। (শোন শোন)। যখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীম, পার্থ, কর্ণ, প্রভৃতি বীরপুরুষগণ, কিম্বা কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি জগৎগুরু দার্শনিকগণ, অথবা ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, ভারবী, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভাস প্রভৃতি কবিগণ, বা চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ভিষকগণ, এবং ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী অথবা সতীকুলশিরোমণি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, প্রভৃতি মহাপুরুষ ও মহতী নারীবৃন্দের গৌরবের কথায় হিন্দু ছাত্র বা যুবকের বুক ফুলিয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের মন দমিয়া যায়। তাহারা চারিদিক হাতড়াইয়া গৌরবের কিছুই দেখিতে পায় না! কি ভীষণ ব্যবস্থা! (শোন শোন)। অথচ হিন্দু ছাত্র এবং সেই হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন ভারতের গৌরবের অধিকার সম্পূর্ণ তুল্য! (শোন শোন। করতালিধ্বনি)।

বক্তা মুসলমান বাঙালীদিগকে তাঁহার অনুরোধ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন।

তরুণমণ্ডলি! আজ বিশ্বের জাগরণ-দিনে আমাদের জাতীয় জীবনের গভীর দুর্দ্দিনে তরুণ ছাত্রবর্গকে মুসলমান নেতৃবৃন্দের আদেশ ও অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রাচীন ভারতের জ্বালাময় গৌরবের জন্য মুসলমানদিগকেও দাবীদার করিতে চেষ্টা করেন। অন্যথায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জীবনের অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হইয়াই থাকিবে।

তিনি বলেন,

মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুত, ও শিখ ছিল। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, কাব্য, মহাকাব্য ও দর্শন এবং বিজ্ঞান রচনায় জ্ঞানের যে গৌরব—সে গৌরবের কাছে প্রাচীন গ্রীক ব্যতীত প্রাচীন কালডিয়া, ট্রয়, ব্যাবিলে নিয়া ও পার্থিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত। অথচ সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতিঃ হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিলে মুসলমানেরা কখনও ভারত-বক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এজন্য হিন্দুকে শুধু আপনার মনে করিলে চলিবে না, তাহার সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে। (বিস্ময়, আনন্দ ও করতালিধ্বনি)

—

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি!

ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোর ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছেন, এদেশে রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইয়া আসিতেছে। অথচ গ্রেপ্তার, লাঠিপ্রয়োগ, সভার পর সভাকে বেআইনী ঘোষণা, স্থানে স্থানে গুলি-চালান এবং নূতন নূতন জেল নির্ম্মাণ চলিতেছে। দমদমায় দুটি জেল ছিল, রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য আর একটি ১০ই এপ্রিল হইতে খুলিবার কথা। তাহা প্রস্তুত হইয়া আছে।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্বাজাতিকতা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গত অধিবেশনে সভাপতি মৌলবী মুজিবর রহমানের বক্তৃতা এবং সম্পাদক ডাক্তার রাফিদীন আহ্‌মদের বক্তৃতায় ন্যাশন্যালিজম্ অর্থাৎ স্বাজাতিকতার প্রেরণা ছিল। তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিপথচালিত হন নাই। এই অধিবেশনে অনুমোদিত প্রস্তাবগুলিও স্বাজাতিকদিগের সমর্থনযোগ্য। মুস্লিম লীগের বঙ্গীয় সভ্যেরা মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা আলাদা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চান না। তাঁহারা ইহাও চান না, যে, মুসলমানেরা বঙ্গের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য অধিকাংশ সভ্যের পদ আইন দ্বারা রক্ষিত থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গের মুসলমান ও হিন্দু এই দুই বিষয়ে একমত। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সকলের চেয়ে বেশী মুসলমানের বাস। সুতরাং মুসলমান বাঙালীদের মত অগ্রাহ্য করিয়া কিছু করিলে গবর্ন্মেণ্ট বলিতে পারিবেন না, যে, মুসলমান জনমত অনুসারে তাহা করা হইয়াছে। লীগ সমুদয় সাবালক ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থাপক সভার

তাহা না হইলে আপাতত ভোটদানের যোগ্যতা তাঁহারা এরূপ করিতে বলেন, যাহাতে বঙ্গের সমুদয় অধিবাসীর শতকরা ২০ জন এই অধিকার পায়। ইহাতেও হিন্দুদের আপত্তি নাই। ত্রিপুরা জেলার হাসানাবাদে পুলিস গুলি ছোঁড়ায় এপর্য্যন্ত ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য উপদ্রবেরও সংবাদ ছড়াইয়াছে। লীগ হাসানাবাদের সব ঘটনা সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করিয়া ঠিকই করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রহার

শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ "নিউ ইরা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ চালাইতেন। মুন্‌শীগঞ্জে তাঁহার দু-বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়ায় তাঁহাকে হাতকড়ি দিয়া সেখান হইতে ঢাকা জেলে লইয়া আসা হইতেছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ প্রেণ্টিস্ স্বীকার করেন, যে, ধীরেশ বাবুকে যখন রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পথের পার্শ্বস্থিত থানা হইতে একজন ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহার বাম চক্ষের উপর আঘাত করে, এবং তাহাতে তাঁহার চশমা ভাঙিয়া যায়। মিঃ প্রেণ্টিস্ বলেন, গবর্ন্মেণ্ট এরূপ প্রহার অনুমোদন করেন না এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা (যাহা সরকারী-মতে বিরল) না-ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সরকার পক্ষ হইতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ধীরেশবাবু উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, সম্ভ্রান্ত ও অতি ভদ্র লোক, দাগী বদমায়েস নহেন। তাঁহার হাতে কড়া লাগান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক লাঞ্ছনা। তাঁহাকে প্রহার করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। মিঃ প্রেণ্টিস্ বলিয়াছেন, যে, প্রহারকর্ত্তা ইংরেজ কর্ম্মচারীর উত্তেজিত হইবার কারণ ছিল, কিন্তু সে কারণটা কি তাহা তিনি জানেন না। সম্ভবতঃ সেই তুচ্ছ বিষয়ে কোন খবর লওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। ধীরেশবাবু মান্দ্রাজের ডাঃ প্যাটনের মত ইংরেজ হইলে ভারতসচিব পর্য্যন্ত ক্ষমা চাহিতেন। ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারীকে ধীরেশ বাবু উত্তেজিত করিয়াছিলেন, না আর কেহ করিয়াছিল তাহাও জানা গেল না। পুলিস কর্ম্মচারী যে ধীরেশ বাবুর হাতে হাতকড়ি ছিল জানিত না এখবরটা তাহার সাফাইয়ের জন্য মিঃ প্রেণ্টিস লইতে পারিয়াছেন, কিন্তু উত্তেজনাটা কি প্রকার ও কে উত্তেজিত করিল তাহা তিনি জানিতে চেষ্টা করেন নাই! এই ব্যাপারের সরকারী গোপন তদন্তটা একতরফা হইয়াছিল; কারণ মিঃ প্রেণ্টিস্ স্বীকার করিয়াছেন, যে, ধীরেশবাবুর নিকট হইতে ঘটনাটার বৃত্তান্ত লওয়া হয় নাই। সুতরাং বুঝা যায়, মিঃ প্রেণ্টিস্ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে বৃত্তান্ত পাইয়াছেন তাহার সত্যতা পরীক্ষিত হয় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। যে-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সম্ভবতঃ তাহার কথা অনুযায়ী বৃত্তান্তই পাঠাইয়াছেন। মিঃ প্রেণ্টিস্ বলিয়াছেন, ঐ কর্ম্মচারী এখনও সরকারী চাকরি করিতেছে; তদন্ত চলিবার সময় তাহাকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে কি না এবং তাহার নাম ও পদ কি, তাহা বলিতে মিঃ প্রেণ্টিস্ প্রস্তুত নহেন বলিয়াছেন। প্রশ্ন উঠে, যে, সরকারী সভ্যেরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারেন কি না। সভাপতি রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বলেন, তিনি সরকারী সভ্যদিগকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারেন না। কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া-না-দেওয়া যদি সম্পূর্ণ রূপে সরকারী সভ্যদের মর্জ্জিসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার অধিকারটা তুলিয়া দেওয়াই ভাল। অবশ্য, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর না-দিবার অধিকার পার্লেমেণ্টেও সরকার পক্ষের আছে। কিন্তু একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে কিনা, এটা ইংলণ্ড ও আমেরিকা বা অন্য কোন দেশের সহিত সন্ধি বিগ্রহ আদির মত গুরুতর ব্যাপার নহে। পার্লেমেণ্টে উত্তর না-দেওয়া ও এদেশের ব্যবস্থাপক সভায় উত্তর না-দেওয়ার মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়া দেন। পার্লেমেণ্টে সরকারী কোন লোক অযথেষ্ট কারণে প্রশ্নের উত্তর না-দিলে সভ্যেরা তাহাকে ও তাহার

করিতে পারেন, এখানে সেরূপ চেষ্টার কোন অবসর নাই। ঐ কর্ম্মচারীর নাম ও পদ সম্ভবতঃ মিঃ প্রেন্টিস এই আশঙ্কায় বলেন নাই, যে, তাহা হইলে সে হয়ত কাহারও প্রতিহিংসাভাজন হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নটির উত্তর না-দেওয়ার সমালোচনা আমরা করিতেছি না।

—

জেলের বাহিরে ও ভিতরে অত্যাচারের অভিযোগ

লাহোরে অনেক দিন হইল কতকগুলা পুলিসের লোক দয়ানন্দ এংলোবেদিক কলেজে ঢুকিয়া একটি শ্রেণীর অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে প্রহার করে। অধ্যাপক দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। সম্প্রতি তিনি একজন ইংরেজ পুলিস্ কর্ম্মচারীর নিকট সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পাইয়াছেন। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাট থানার একজন হেড কনষ্টেবল ও চারিজন কন্‌ষ্টেবল কতকগুলি সত্যাগ্রহী মহিলার উপর দুর্ব্যবহার করায় সংবাদপত্রে এবং প্রকাশ্য সভায় তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। পুলিসের ঐ পাঁচজন লোকের বিচার হইবে। উৎপীড়িতা মহিলারা প্রকাশ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা সত্যাগ্রহী, প্রতিশোধ চান না। ইহা তাঁহাদের যোগ্য কাজ হইয়াছে।

অল্পসংখ্যক এইরূপ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হয়, কিন্তু অধিকাংশ অভিযোগের হয় না। কোন কোনটি সম্বন্ধে সরকারী কম্যুনিকে বা জ্ঞাপনীতে বলা হয়, ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিংবা তাহার একটা কিছু ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ প্রেন্টিস বলিয়াছেন, লোকে এইরূপ জ্ঞাপনী বিশ্বাস করে না। কেন করে না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, লোকদের মেণ্ট্যালিটি বা মনের ভাবগতিকই ঐ রকম। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে অন্য সব সৃষ্ট পদার্থের মত এদেশের মানুষদের মনের ভাবগতিকেরও একটা কারণ আছে। সেই কারণটা স্থির করা মিঃ প্রেন্টিসের মত লোকদের উচিত। দু-একটা কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি। বিস্তর লোকে দেখে, অনেক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লব্ধ জ্ঞান সরকারী রিপোর্টের সঙ্গে মিলে না। অথচ সরকারী লোকদিগকে অভ্রান্ত এবং বেসরকারী নিজেদের ও শ্রদ্ধেয় লোকদের চোখ-কানকে ভ্রান্ত মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। তাহার পর লোকে দেখিয়াছে, হিজলীর কাণ্ড সম্বন্ধে প্রথমে সরকারী যে-সব বৃত্তান্ত বাহির হয়, তাহা পরে সরকারী তদন্তেরই রিপোর্টে প্রধানতঃ অসত্য বলিয়া দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অরাজকতা সম্বন্ধে বেসরকারী লোকেরা যাহা বলিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় নেতারা অনুসন্ধানের পর যাহা বলিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে সরকারী অনুসন্ধান কমিটির কাজ অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়া থাকিলেও এবং রিপোর্টও দাখিল হইয়া থাকিলেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

—

দমনমূলক কার্য্যের সংবাদ বিলাত পৌঁছা

এদেশে সরকারী লোকদের দ্বারা যে-সব কাজ হইতেছে বলিয়া প্রকাশ্য খবরের কাগজে বা অপ্রকাশ্য কাগজে যে-সব সংবাদ বাহির হয়, কিংবা যে-সব গুজব রটে, তাহার সবগুলিই সত্য, বলিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কোন সরকারী লোক কোন বেআইনী কাজ বা অত্যাচার করিতেছে না, যত কিছু উপদ্রব সব কংগ্রেসওয়ালারা করিতেছে—বিলাতে এই রকম একটা বিশ্বাস, ভারতবর্ষ হইতে সত্য সংবাদসংগ্রহের চেষ্টা বিলাতী কাগজগুলা না-করায়, সত্য সংবাদ প্রেরণে বাধা থাকায়, এবং বিলাতী কাগজগুলার নিকট সত্য সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলেও অধিকাংশস্থলে তাহা মুদ্রিত না-হওয়ায়, নির্ব্বিবাদে লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। আগে মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসিত, অমুক বিলাতী কাগজে সত্য কথা বাহির হইয়াছে বা হইবে, অমুক ভারতবন্ধু সভায় অমুক অমুক অমুক বিখ্যাত লোক সত্য কথা বলিয়াছেন, সম্প্রতিও এরূপ খবর আসিয়াছে। যাঁহারা সত্য জানিয়াছেন, ছাপিয়াছেন, বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু বিলাতে ঐসব সংবাদ প্রচারের ফলে কেবল সত্য ও

পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এরূপ কোন মিথ্যা আশা আমরা পোষণ করি না, স্বদেশবাসীদিগকেও পোষণ করিতে বলি না।

—

ভারত-সম্বন্ধীয় বিলাতী খবর

পীটার ফ্রীম্যান নামক একজন ভূতপূর্ব্ব পার্লেমেণ্ট-সভ্য ভারতভ্রমণানন্তর লণ্ডনে এক সভায় একটা লাঠি ও একটি ভারতবর্ষীয় জাতীয় পতাকা সহযোগে নিজ ভারতীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষে যে-সব অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য এখনও সত্যাগ্রহীর অবিরাম স্রোত আগুয়ান হইয়া আসিতেছে। তিনি বক্তৃতায় বলেন, তিনি যাহা দেখিয়াছেন বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে তাহা বলায় বড়লাট বলেন, "ভারতবর্ষে কঠোর ব্যবস্থার দরকার।" বক্তার মতে ভারতবর্ষকে অনেক বৎসর আগে স্বরাজ দেওয়া উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন এই সভায় সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সংবাদের উপর সেন্সরগিরি আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতীয় সংবাদকে বয়কট করা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, যদিও সমুদয় সংবাদসরবরাহক এজেন্সীগুলিকে এবং প্রধান প্রধান প্রাদেশিক কাগজকে সভায় আসিতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তথাপি কেবল ভারতীয় খবরের কাগজের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভারতবর্ষের খবর জানিতে পর্য্যন্ত ইংরেজরা কৌতূহলী নয়।

জেনিভার অধ্যাপক এড্‌মণ্ড প্রিভা সস্ত্রীক মহাত্মাজীর সঙ্গে আসিয়া দুই মাস ভারত ভ্রমণ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি এক সভায় যাহা বলিয়াছেন, রয়টারের তারের খবরে তাহার এইরূপ চুম্বক দেওয়া হইয়াছে :—"ইংলণ্ডে খুব কম লোকই প্রকৃত ভারতীয় অবস্থা জানে, কিন্তু ভারতে বর্ত্তমান ব্রিটিশ-শাসনের জন্য প্রত্যেক ইংরেজের লজ্জিত হওয়া উচিত্। তিনি বলেন, বড়লাটের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে, নিরুপদ্রব অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিসের লাঠি চালানর কথা বড়লাট জানেন না। এইপ্রকার অজ্ঞতা বাস্তবিক কৃপার উদ্দীপক।" বড়লাট কি দেশী সম্পাদকদের পরিচালিত দু-একখানা ইংরেজী কাগজও দেখেন না?

অধ্যাপক প্রিভা আরও বলিয়াছেন, যে, অন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রস এসোসিয়েশ্যন ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কংগ্রেসের হাঁসপাতাল বন্ধ করা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং তিনি নিজে দুটি হাঁসপাতাল বন্ধ করা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। পার্লেমেণ্টের সভ্যদের সম্মুখে একটি বক্তৃতায় অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় অবস্থা এমন জীবন্ত ভাবে বর্ণনা করেন যেন ছবি দেখাইতেছেন। অধিকাংশ সভ্য ছিলেন রক্ষণশীল দলের। তাঁহারা তাঁহার উপর প্রশ্নরাশি বর্ষণ করেন এবং তিনি যথাসাধ্য উত্তর দেন। মিঃ বার্ণে নামক একজন যুবা উদারনৈতিক জিজ্ঞাসা করেন, অধ্যাপক মহাশয় ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে আগামী মূল রাষ্ট্রীয় বিধি (constitution) সমর্থন করিবার ইচ্ছুকতা দেখিয়াছেন কিনা। তিনি উত্তর করেন, কি প্রকাশ্য সভায় কি অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তায় তিনি এরূপ ইচ্ছার লেশ মাত্রও দেখিতে পান নাই। অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তায় লোকে অবশ্য মনের ভাব বেশী খুলিয়া প্রকাশ করিত।

বিলাতী টাইম্‌স্ কাগজের এখানকার সংবাদদাতা উহাতে খবর পাঠাইয়াছিলেন, যে, এখানে গবর্মেণ্ট ভারতীয় উদারনৈতিকদের সমর্থন পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। তাহার উত্তরে পোলাক সাহেব ঐ কাগজে লিখিয়াছেন, ভারতীয় উদারনৈতিকদেরও স্বাধীন মত ভারত-গবর্মেণ্ট সদ্ভাবে গ্রহণ করেন না। নেতৃস্থানীয় উদারনৈতিকেরা কংগ্রেস ও গবর্মেণ্টের বিরোধ উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা করিয়া থামাইবার যে সদভিপ্রায়প্রণোদিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সরকারী মহলে তাহা ভাল ভাবে গৃহীত হয় নাই। মিঃ পোলাক বলেন, ভারতীয় মডারেটরাও সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, গবর্মেণ্ট বাস্তবিক ভারতীয় রাষ্ট্র-সংঘবিষয়ক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চান কিনা। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে মডারেটদের সন্দেহ গবর্মেণ্ট অনবগত নহেন।

পোলাক সাহেব এক সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা

গান্ধীর চেলা ছিলেন এবং তথাকার ভারতীয় সত্যাগ্রহের সংস্রবে জেলে গিয়াছিলেন। স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা আছে।

৮ই এপ্রিলের বিলাতী "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান্‌ এণ্ড নেশ্যন" লিখিয়াছেন, যে, সেন্সরি সতর্কতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত দমনপ্রণালীর প্রামাণিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। ঐ কাগজ বলেন, "রিপোর্টগুলি এরূপ প্রমাণের সমষ্টি যে তাহার অস্তিত্ব উপেক্ষা করা চলিবে না। মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড যদি ভারতবর্ষে নিজের কোন প্রভাব বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে, দরকার হইলে, মন্ত্রীপরিষদে তাঁহার সঙ্গীদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াও, অবিলম্বে এবিষয়ে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিয়া তাহাতে দৃঢ় থাকিতে হইবে।" বিলাতী কাগজটির এই কথাগুলি পড়িয়া মনে হয়, উহার সম্পাদক মনে করেন ভারতবর্ষে এখনও মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডের কিছু প্রভাব অবশিষ্ট আছে, এবং তিনি ভারতবর্ষের লোকদের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার মূল্য বুঝেন ও তাহা গ্রাহ্য করেন, অধিকন্তু তিনি প্রধান মন্ত্রী থাকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে স্বীয় প্রভাব রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই তিনটি বিষয়েই আমাদের সন্দেহ আছে।

খালাসের পর আবার গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের মোকদ্দমায় ১৯ মাসব্যাপী বিচারের ফলে ১৬ জন আসামী বেকসুর খালাস পায়, কিন্তু পুলিস তাহাদিগকে আবার গ্রেপ্তার করে। তাহারা বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কাল বন্দী থাকিবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে মিঃ প্রেণ্টিস বলেন, গত ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪২ জন লোককে আদালতের বিচারে খালাস পাইবার পর আইন বা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ৭১৭ জন লোক বিনা বিচারে বন্দী হইয়া আছে। ৮ই এপ্রিল তারিখে, বেআইনী ভাবে গোপনে অস্ত্র আমদানী করার মোকদ্দমায়, কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে ১৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন। তাহাদের মধ্যে এগার জনকে পুলিস আবার গ্রেপ্তার করে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে বহুশত বাঙালী পুরুষ ও মহিলাকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ যে দোষী তাহা প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। পঞ্চাশ জনের বেশী লোকের বিচার হইয়াছে। তাহারা দোষী প্রমাণ না-হওয়ায় বা নির্দ্দোষ প্রমাণ হওয়ায় খালাস পাইয়াছে। অথচ তাহাদিগকেও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে!

বিনা-বিচারে বন্দীদের নির্ব্বাসন আইন

যাহাদিগকে বিনা বিচারে বন্দী করা হইয়াছে, তাহাদের দোষের বা নির্দ্দোষিতার প্রমাণ ঐরূপ! অথচ এই প্রকার লোকদিগকে শুধু বন্দী রাখিয়াই গবর্মেণ্ট সন্তুষ্ট নহেন। তাহাদিগকে বাংলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আজমীর প্রদেশে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৭০ মাইল দূরে স্থিত বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্য নির্ম্মিত একটা জেলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত একটা আইন পাস হইয়াছে। সরকার বাহাদুর এই প্রকারে বঙ্গীয় ত্রাসোৎপাদক দলের উচ্ছেদ সাধন করিবার আশা রাখেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ এই, যে, লোকগুলি যে ত্রাসোৎপাদক বা বিপ্লবাত্মক কোন অপরাধ করিয়াছে বা করিতে চায়, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। এই আইন সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলেন—

বিনা বিচারে আটক রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, এই নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা দ্বারাও হইবে না। জুলুম হইতে প্রতিশোধের ইচ্ছা জন্মে এবং তাহা হইতে আবার জুলুমের প্রবৃত্তি আসে। এই গোলকধাঁধার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ও বিপ্লবীরা ঘুরপাক খাইতেছেন। আমরা বিপ্লববাদের তীব্র নিন্দা করি। কিন্তু তাই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিভীষিকা উৎপাদনের সমর্থন করিতে পারি না। আমি এই সভাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, ১৯২৫ সালে স্যর হিউ ষ্টিফেনসন স্বীকার করিয়াছিলেন, ১৯০৮ সালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিকে বিপ্লববাদের জন্য আটক করা হয় নাই—তাঁহারা বয়কটের প্রচার কার্য্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই গবর্ণমেণ্ট কাজ করিয়া থাকেন।

দেওয়ান বাহাদুর এ রঙ্গস্বামী মুদালিয়ার অনেক বিজ্ঞ-জনোচিত কথা বলেন। যথা—

"যাঁহারা বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও ধীরবুদ্ধি, গবর্মেণ্ট তাঁহাদের পর্য্যন্ত সহানুভূতি হারাইতেছেন।" "নৈতিক সমর্থনের পোষকতা না থাকিলে কোন আইন কার্য্যকর হয় না; বোধ করি সেই জন্য বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের দ্বারা এত দিনেও বঙ্গের বিপ্লবপ্রয়াস লয় পায় নাই।"

শ্রীযুক্ত সি এস রঙ্গ আইয়ার বলেন—

আমি ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, রাজবন্দীরা সকলেই নির্দ্দোষ। বিপ্লববাদ দ্বারা যদি এদেশে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগকে আজমীরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহা অপেক্ষাও সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন।

স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বলেন, "আমি গবর্মেণ্টকে সাবধান করিয়া দিতেছি এই উপায়ে ভারতবর্ষ শাসন করা চলিবে না।"

মিঃ আর্থার মুর এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। নিয়োগী-মহাশয় তাহার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, মিঃ আর্থার মুরের শ্রেণীর লোকেরা যে, চট্টগ্রামে আয়ার্লাণ্ডের "ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান"দের মত অত্যাচার করিয়াছিল (যাহা নিয়োগী-মহাশয় প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলেন), সে বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য কি? মিঃ মুর তাহার জবাব না দিয়া কথাটা উল্টাইয়া দিবার বা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলেন, "মাননীয় সদস্য মহাশয় অন্য কথা তুলিতেছেন।"

এই আইনের কতকগুলি ধারা সংশোধনের এবং নূতন কোন কোন ধারা বসাইবার প্রস্তাব হয়। সবগুলিই না-মঞ্জুর হয়। কেবল, আইনটা যে তিন বৎসর মাত্র বলবৎ থাকিবে, এই সংশোধন গৃহীত হয়। তাহা কোন কাজের নয়। কারণ, তিন বৎসরের পর গবর্মেণ্ট আবার এইরূপ আইন বা অর্ডিন্যান্স করিতে পারিবেন। এই একটা মাত্র সংশোধন গ্রহণ করিয়া কেবল দেখাইবার চেষ্টা হইল, যে, গবর্মেণ্ট সম্পূর্ণ অবুঝ নহেন।

বন্দীদের সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের দেখা করা বহুব্যয়সাধ্য এবং অনেকের সাধ্যবহির্ভূত হইবে। এই জন্য প্রস্তাব হয়, যে, সাক্ষাৎকারপ্রার্থী আত্মীয়দের রাহাখরচ যেন গবর্মেণ্ট দেন। ইহা অগ্রাহ্য হয়। নির্ব্বাসিত বাঙালী বন্দীদের জন্য বাঙালী পাচক ও বাঙালীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়।

এই বিলের ৪র্থ ধারাটি তুলিয়া দেওয়ার জন্য আর এক প্রস্তাব করা হয়। চতুর্থ ধারাতে বলা হইয়াছে, যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৯১ ধারা অনুসারে বিনা-বিচারে আটক বন্দীদের আবেদন শুনিবার যে ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে তাহা রহিত করিতে হইবে, অর্থাৎ বাংলার অর্ডিন্যান্স-বন্দীদের অভিযোগ সম্পর্কে হাইকোর্ট কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যকে আজমীরের আটকখানার বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়।

মিঃ সীতারাম রাজু প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কাজ যদি করা হয়, তাহা হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৯১ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও না-মঞ্জুর হয়।

বিলটার বিরুদ্ধে ৩৭ এবং সপক্ষে ৫৪ ভোট হওয়ায় উহা পাস হয়। তাহার পর উহা কৌন্সিল অব্ ষ্টেটেও পাস হইয়াছে।

অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত লোকদের উপযুক্ত শাস্তিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বিনা বিচারে নির্দ্দোষ লোকদের শাস্তি নিন্দনীয় ত বটেই, নিষ্ফলও বটে; এবং উত্তেজনার ও অপরাধের উৎপাদকও হইতে পারে। ২৫ বৎসর ধরিয়া গবর্মেণ্ট বঙ্গের শত শত লোককে এই প্রকারে শাস্তি দিয়াছেন। তাহাতে অনেকে চিররুগ্ন হইয়াছে, অল্পায়ু হইয়াছে, কঠিন পীড়ায় মারা গিয়াছে, বিস্তর পরিবার বিপন্ন ও মর্ম্মাহত হইয়াছে; কিন্তু বিপ্লববাদ ও বিপ্লবপ্রয়াস নির্মূল হয় নাই। নির্ব্বাসনটা গোদের উপর বিষফোড়া মাত্র, বিপ্লববাদের ঔষধ নহে। কত জন মেরুদণ্ডহীন তোষামোদকারী অদূরদর্শী ভারতীয় সভ্য এই আইনের পক্ষে ভোট দিয়াছে, এখনও জানিতে পারি নাই।

—

নূন, কাগজ, চিনি

বাংলা দেশের জন্য আবশ্যক নূন, কাগজ ও চিনি যে বঙ্গে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা বলিবামাত্রই সকল বাঙালী স্বীকার করিবেন। তাহার অল্পাধিক সুযোগও হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সুযোগ এমন সময়ে হইয়াছে, যখন বঙ্গের অন্যতম সঙ্গতিপন্ন শ্রেণী জমিদারদের অর্থাভাব বশতঃ বহুশত মহল নীলামে বিক্রী হইয়া যাইতেছে ও তাহার কোন কোনটি গবর্ণমেণ্ট এক এক টাকা মূল্যে ডাকিয়া লইতেছেন। যখন বঙ্গের এরূপ দুর্দ্দশা থাকে না, তখনও অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার বেশী উৎসাহ আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সুযোগ ছাড়া উচিত হইবে না। নগদ টাকা অনেক ফেলিতে পারেন, এরূপ হাজার হাজার লোক বাঙালীদের মধ্যে এখনও আছেন। তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। কিন্তু আশা করি তাঁহারা ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন, অভিজ্ঞ এবং সৎ বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচন করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন।

—

বিস্তর মহল নীলাম

অনেক জেলায় যে বহু শত মহল খাজনার দায়ে নীলাম হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, যে, ঐসব মহলের মালিকদের আর্থিক অবস্থা বরাবর "অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ" ছিল, সঞ্চয়ের উপায় ছিল না, তাই প্রজারা এক বা দুই বৎসর খাজনা না-দেওয়ায় তাঁহারাও সরকারকে খাজনা দিতে পারেন নাই। অথবা এমনও হইতে পারে, যে, তাঁহাদের যাহা আয় ছিল তাহাতে সঞ্চয় হইতে পারিত, কিন্তু অমিতব্যয়িতা বশতঃ সঞ্চয় হয় নাই। সত্য কারণ যাহাই হউক, এত মহল বিক্রীতে বেকার সমস্যা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে।

তাহার উপর গবর্ন্মেণ্টের হাতে অনেক মহল গিয়া পড়িয়া খাসমহল বাড়িতেছে এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর প্রতি সরকারী পক্ষপাতিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের চেষ্টা

কিছুদিন হইল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারী জবাব পাওয়া যায়, যে, কংগ্রেস বেআইনী সভা নহে। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গবর্ন্মেণ্ট ভাঙিয়া দিয়াছেন, উহার সব সভ্য (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ছাড়া) কারারুদ্ধ হইয়াছেন। প্রাদেশিক, জেলা, ও গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটি সব ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের আপিস বন্ধ ও জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। এলাহাবাদে কংগ্রেসের সম্পত্তি স্বরাজভবন পুলিস দখল করিয়াছে, কংগ্রেসের বা কোন প্রাদেশিক বা জেলা বা গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটির টাকাকড়ির সন্ধান পাইবা মাত্র তাহা বাজেয়াপ্ত বা কংগ্রেসের কাজে তাহার ব্যয় নিষিদ্ধ হইতেছে, এবং কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট সত্যাগ্রহ পদ্ধতির অনুসরণ করায় অনেক হাজার লোক প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যে কংগ্রেস বেআইনী নহে, এই সরকারী ফতোয়া বুঝিতে হইলে চুলচেরা যুক্তির আবশ্যক।

যাহা হউক সরকারী উক্ত মত প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে হঠাৎ খবর বাহির হইল, দিল্লীতে বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের ৪৭শ অধিবেশন হইবে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাহার সভাপতি হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতির নামও বাহির হইল। কংগ্রেসের মণ্ডপাদি নির্ম্মাণের জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট জমী চাওয়া হইল। তখন দিল্লীর চীফ্ কমিশনার জবাব দিলেন, কংগ্রেস আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা চালাইতেছেন ইত্যাকার কারণে কংগ্রেসের অধিবেশন করিতে দেওয়া হইবে না, জমী দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। পরে আরও সরকারী উক্তি বাহির হইয়াছে, যে, যাহারা কংগ্রেসের অধিবেশনের যোগাড় করিবে বা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা হইবে, কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়া হইবে, ইত্যাদি।

এদিকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিতেছেন, বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এখন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তিনিও বলিতেছেন, কংগ্রেস বসিবে। ১০ই এপ্রিলের (২৮শে চৈত্রের) সকাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় এইরূপ খবর

পৌঁছিয়াছে। পরে কি ঘটে, তাহা দৈনিক কাগজে দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেস বসিবার সংবাদ কাগজে বাহির হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে সরোজিনী দেবী কাশী গিয়া মালবীয়-জীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন, ও দিল্লী ফিরিয়া যান। পরে মালবীয়জীও দিল্লী যান। এখন এই সব চলাফিরা ও কথাবার্ত্তার কারণ ও উদ্দেশ্য অনুমিত হইতেছে।

কংগ্রেস বসিবার সংবাদ বাহির হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর বাহির হয়, যে, সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন, যে, এই অধিবেশন সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন, এবং তাহা বসাইবার বা আহ্বান করিবার দায়িত্ব একমাত্র তাঁহারই। মালবীয় মহাশয়ও, তাঁহার উপর জাতির আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলিয়া, ভারতীয় জাতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিতজী অবশ্য "সর্ব্বসাধারণের" বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা দূরে থাক্, তাঁহার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশসূচক "বাণী" বাহির হইবার পূর্ব্বে "সর্ব্বসাধারণ" কংগ্রেস বসিবে বলিয়া স্বপ্নও দেখে নাই। সুতরাং এই ধন্যবাদপ্রদানাদি ব্যাপারের মধ্যে একটু হাস্যরস আছে তাহা পণ্ডিতও স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ ধন্যবাদ কাহারও প্রাপ্য থাকিলে তাহা সরোজিনী দেবীর এবং পণ্ডিতজীরও!

কংগ্রেসের বৈঠক হইবে, এমন একটা খবর বিলাত পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। একদিনের মধ্যেই এদেশে এই সংবাদ সম্বন্ধে বিলাতী কতকগুলা কাগজের মত তার-যোগে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার সার কথাটা এই, যে, এখনও মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার দলের লোকেরা জেলে, এই অবসরে কংগ্রেসের নরম দলের লোকেরা গান্ধীকে দলপতির আসন হইতে সরাইয়া আপনাদের নেতা মালবীয়জীকে সেই আসনে বসাইবে এবং কংগ্রেসের আইনলঙ্ঘনাদি চরম প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত নরম ও "বিজ্ঞোচিত" নীতির প্রবর্ত্তন করিবে, ও গবর্ন্মেণ্টের সহিত রফা করিবে। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি নাই বলা যায় না; আছে। গান্ধীর নেতৃত্ব কাহারও ঈর্ষ্যার বিষয় হইতে পারে না, পারেন না, ইহাও সত্য নহে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বৈঠকের উদ্দেশ্য যদি বাস্তবিক গান্ধীর দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং চরম পন্থার পরিবর্ত্তে নরম পন্থা প্রবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে তাহা গবর্ন্মেণ্টের অভিলষিত জিনিষই হইত এবং এরূপ বৈঠকে গবর্ন্মেণ্ট কোন বাধা না দিয়া বরং তাহার সহায়তাই করিতেন। কিন্তু বৈঠকের প্রতি সরকারী ভাবভঙ্গী ত সেরূপ নয়। সুতরাং বিলাতী কাগজ-গুলার মন্তব্য ঠিক বলিয়া মানিতে পারা যায় না। তবে, ব্যাপারটার মধ্যে গভীর চা'ল থাকাও অসম্ভব নহে।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস ডিক্টেটার বা অন্য প্রধান কংগ্রেসকর্ম্মীকে যে চিঠি পাঠান এবং যাহা ইংরাজী দৈনিক কাগজসমূহে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল—

> এখন এইরূপ স্থির আছে, যে, কংগ্রেসের আগামী বৈঠকে সভাপতির অভিভাষণ হইবে এবং তিনটি প্রস্তাব ধার্য্য করা হইবে। যথা, (১) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্যস্থল বলিয়া পুনর্ব্বার নিশ্চিতরূপে বলা, (২) নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন কোন কোন অবস্থার অধীন ভাবে পুনঃপ্রবর্ত্তনকল্পে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা, এবং (৩) নিশ্চিত করিয়া বলা যে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি, এবং তিনিই উহার মুখপাত্র।

যে বৈঠকে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হইবার কথা, গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে বাধা দিবেন না, এরূপ আশা সরোজিনী দেবী ও মালবীয়জী করিয়াছিলেন কিনা জানি না; কিন্তু উহা দুরাশা। হইতে পারে, যে, কংগ্রেস-বৈঠক করিবার প্রস্তাব এবং তাহাতে করণীয় কাজের তালিকা সম্বলিত শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর চিঠি, ইংরেজীতে যাহাকে কাইট-ফ্লাইং বলে, তাহাই; অর্থাৎ উহা ঐ সব বিষয়ে জনমত ও গবর্ন্মেণ্টের মত জানিবার একটা কৌশল। গবর্ন্মেণ্টও সম্ভবতঃ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন কখনই বৈঠক হইতে দিবেন না, এই অভিপ্রায়ে ও আশায়, যে, তাহা হইলে উহার উদ্যোক্তারা যদি নরম হইয়া কংগ্রেসের লক্ষ্য কিছু নীচু করিয়া গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে রফা করেন।

বিলাতী ডেলী মেল গবর্ন্মেণ্টের দৃঢ়তায় খুশী হইয়া বলিয়াছে, দুই-তিন বছর আগে এই রকম দৃঢ়তা দেখাইলে

আমরা কংগ্রেসের বর্ত্তমান উদ্যোক্তাদের পরামর্শের বাহিরে; সরকারী চা'লেরও কোন খবর রাখি না—কংগ্রেস বেআইনী নয় অথচ তাহার অধিবেশন হইতে পারিবে না, এ হেঁয়ালীর রহস্য উদ্ভেদও করিতে পারি নাই। শেষ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিবে, তাহা হইতে আমাদের জ্ঞান জন্মিবে। সুতরাং সংস্কৃত প্রবচন অনুসারে আমরা "বর্ব্বরাঃ"। প্রমাণ, যথা—

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং, ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ। পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন, ভূত্বে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥ রাজা চরের কথা কাণে শুনিয়া, পণ্ডিত বুদ্ধিদ্বারা এবং পশু গন্ধদ্বারা বুঝিতে পারে; কিন্তু বর্ব্বরেরা অর্থাৎ মূর্খেরা ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর পরিণাম দেখিয়া বুঝে।

—

জাপানে সেন্সরের কর্ম্ম

ভারতবর্ষের সব প্রদেশে এক এক জন সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাকে সেন্সর বলা হয়। খবরের কাগজে কিরূপ খবর ও মন্তব্য ছাপা নিষিদ্ধ তাহা জানান এবং কোন কাগজ সেরূপ কিছু ছাপিলে তাহাকে ধমক সহ সতর্ক করিয়া দেওয়া সেন্সরের কাজ। জাপানেও আজকাল এরূপ রীতি আছে—বরাবর ছিল কি না জানি না। তবে এখানে ও সেখানে একটু প্রভেদ আছে। এখানে দেশী সম্পাদকেরা অভিযোগ করেন, সেন্সরের জারিজুরি ও ধমক ইংরেজ সম্পাদকদের উপর খাটে না, দেশীদের উপরই খাটে। জাপানে ইংরেজ সম্পাদকেরা বলেন, উপদ্রব তাঁহাদের উপরই হয়, জাপানী সম্পাদকদের উপর হয় না। কোবে শহরের জাপান ক্রনিক্ল নামক ইংরেজী কাগজের ৩রা মার্চ্চের সাপ্তাহিক সংস্করণে সম্পাদক বলিতেছেন:—

২৪শে ফেব্রুয়ারীর জাপানী কাগজগুলিতে কিছু এরূপ সংবাদ ছিল যাহা দিনের বেলায় আমাদিগকে টেলিফোনে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যেন আমরা নিশ্চয়ই না-ছাপি। হুকুম হুকুমই, সুতরাং আমরা ঐ সব খবর ছাপিতে পারিলাম না। একবার আমরা কোবে আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে জাপানী সম্পাদক ও বিদেশী সম্পাদকদের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার-পার্থক্যের কথা জানাইলে উত্তরে তিনি বলেন, "বাস্তবিক কোন পার্থক্যই নাই। জাপানী কাগজগুলি যখন তাহাদের পাঠকদিগকে ঐসব খবর দিতে চায় তখন খবর দেয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ জরিমানাও দেয়।" ক্রনিক্লের পক্ষে সংবাদ ছাপিয়া জরিমানা দিবার এই প্রকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে; সুতরাং আমরা খুব দরকারী একটা বিষয়ে আমাদের পাঠকদিগকে অনবগত রাখিতে বাধ্য হইলাম। হয়ত ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কারণ ঐ বিষয়ের খবর সাধারণতঃ সুবিদিত।

জাপানী সম্পাদকের শেষ বাক্যটি অভিনিবেশযোগ্য। জাপানে যেমন এখানেও তেমনি, গবর্ন্মেণ্ট কোন কোন বিষয়ে যে-সব সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেন না, তাহা খুবই ছড়াইয়া পড়ে। প্রভেদ এই, যে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ছাপিতে দিলে অত্যুক্তি, আংশিক বা পূর্ণ মিথ্যাভাষণ প্রভৃতির প্রতিকার করা গবর্ন্মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত থাকে, কিন্তু নিষিদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্য যে-ভাবে ছড়ায় তাহার উপর খুব জবরদস্ত হাকিমেরও হুকুম চলে না। গুজব একেবারে নিরঙ্কুশ—কবিদের চেয়েও নিরঙ্কুশ।

টেলিফোন যোগে হুকুম দেওয়া এদেশেও চলিত আছে। ইহার সুবিধা এই, যে, হুকুম যদি তুমি না মান, তাহা হইলে তোমার শাস্তি হইবে; অন্যদিকে ওরূপ হুকুম সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উঠিলে সরকারী সভ্যবিশেষ বলিতে পারিবেন, ওরূপ হুকুমের কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে আমি প্রশ্নকর্ত্তাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। এরূপ চ্যালেঞ্জ খুব নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে করা যায়। কারণ টেলিফোনের কথাবার্ত্তার কোন স্বতোলিখিত দলিল (automatic record) থাকে না এবং এরূপ কথাবার্ত্তার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষীসাবুদও থাকে না বা হাজির করা অসম্ভব।

জাপানে ও এদেশে সেন্সরের কাজ ঘটিত আরও কিছু পার্থক্য আছে। তাহার কারণ জাপান স্বাধীন দেশ। সেখানে জাপানী সম্পাদকেরা যাহা ছাপিতে পারে, বিদেশী সম্পাদকেরা তাহা পারে না; এদেশে বিদেশী ইংরেজদের কাগজ যাহা ছাপিতে পারে আমরা তাহা পারি না। আরও একটা প্রভেদ এই, যে, জাপানী সম্পাদকেরা নিষিদ্ধ খবর ছাপিলে তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হয়; এদেশে ইংরেজদের কাগজে (দেশীদের জন্য) নিষিদ্ধ কিছু মুদ্রিত হইলে ইংরেজদের কাগজের কোন শাস্তি হয় না।

—

নিখিলভারতীয় মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স

নিখিল ভারতীয় মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার অভিভাষণে চিকিৎসকদের সম্মুখে তাঁহাদের কার্য্যের যে আদর্শ ধরিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ। তাঁহার মতে, ভাবে

চিন্তায় ও বাক্যে এক হইয়া সমগ্র জাতির প্রীতিপূর্ণ সেবায় প্রবৃত্ত হওয়াই চিকিৎসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। তাঁহার এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অভিভাষণে চিকিৎসকদের শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রাপ্তির পর কর্তব্যসম্পাদনের সুবিধার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সকল বিষয়েরই উল্লেখ ও আলোচনা আছে। এই কন্‌ফারেন্সের সদ্য সদ্য এই ফল দেখা গিয়াছে, যে, সরকারী মেডিক্যাল কৌন্সিল বিলের তাঁহাদের কড়া সমালোচনার এবং তৎসম্বন্ধে কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে গবন্মেণ্ট আপাততঃ ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিলের বিবেচনা ও আলোচনা স্থগিত রাখিয়াছেন।

—

রয়্যালিষ্টদের কীর্ত্তি

কলিকাতার ইউরোপীয়দের একটা দল বা সমিতি আছে, তাহাদের নাম "রয়্যালিষ্ট্‌স্"। উহার সভ্যদের অবগতির জন্য একটা গোপনীয় চিঠি বা সার্কুলার প্রচারিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দের অন্যতম প্রতিনিধি মিঃ বেন্থলের বিবৃতি অনুসারে ঐ দলিলটাতে লেখা ছিল, লণ্ডনে এখানকার ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, গান্ধীজীকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, এবং গোলটেবিল বৈঠক (ভারতীয়দের মতে) পণ্ড করিবার জন্য, কি কি কাজ করিয়াছিল ও চা'ল চালিয়াছিল। ঐ দলিলটা কলিকাতার 'য়্যাডভান্স' এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন' ছাপিয়া দেন। তাহার পর উহা লইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নানা প্রশ্ন হয়। তাহার সন্তোষজনক জবাব সরকারী উত্তরদাতা দিতে পারেন নাই। ঐ দলিলটা হইতে মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করিবার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ গান্ধীজী ভারতবর্ষে আসিবার আগেই আঁটা হইয়াছিল।

এখন মিঃ বেন্থল ও রয়্যালিষ্টরা বলিতেছেন, দলিলটা মোটেই গোপনীয় নহে। 'য়্যাডভান্স' কিন্তু লিখিয়া দিয়াছেন, যে, উহা "খুব গোপনীয়" ("Very ... নহে" ("Not for publication in any way") বলিয়া চিহ্নিত ছিল!

—

অটোয়া কন্‌ফারেন্স ও ভারতবর্ষ

কানাডার অটোয়া শহরে আগামী জুলাই মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক বাণিজ্যাদি-বিষয়ক কন্‌ফারেন্স বসিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সকল দেশ স্বশাসক, তাহারা নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইয়া নিজনিজ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে। ভারতবর্ষ আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারিবে না, তাহার নামে এখানকার ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট জনকয়েক লোককে পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের নাম—(দলপতি) স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; (সদস্য) শ্রীযুক্ত ষণ্মুখম্ চেট্টি, স্যর পত্নমজি জিনওয়ালা, হাজি আব্দল হারুন, সাহেবজাদা আব্দুস্ সমদ খাঁ, এবং স্যর জর্জ রেণী। ব্যক্তিগত সমালোচনা অপ্রীতিকর, কিন্তু দু-একটা কথা না-বলিলে কর্ত্তব্য করা হইবে না। স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব যোগ্য লোক। কিন্তু তিনি বরাবর গবর্ন্মেণ্টের চাকরি করায় তাঁহার মনের ভাবগতিক, হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই, ব্রিটিশানুকূল হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থে বিরোধ ঘটিলে ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ যাহা আবশ্যক তাহা কি তিনি ঠিক করিতে ও সমর্থন করিতে পারিবেন? স্যর জর্জ্জ রেণী ইংরেজ ও সরকারী চাকর। স্যর পত্নমজি জিনওয়ালা ভারতবর্ষের দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলির অনিষ্টকারী এংলো-সুইডিশ দিয়াশলাই কোম্পানীর চাকর, তাঁহার আপিস ষ্টক্‌হল্মে। ইঁহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষা হইবে না। বাকী সদস্যদের সম্বন্ধে কিছু জানি না। তবে, তাঁহারা একান্ত ভারত-কল্যাণকামী হইলে গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে মনোনীত করিতেন কিনা সন্দেহ। অটোয়া কন্‌ফারেন্সের আলোচ্য বিষয়গুলিও ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের পরস্পরের জিনিষকে সুবিধা দেওয়ার (imperial preferenceর) আলোচনা হইবে এবং ভারতবর্ষে অন্য বিদেশী জিনিষের উপর যে শুল্ক আছে, বিলাতী জিনিষের উপর তত উচ্চ শুল্ক বসান উচিত কিনা,

এইসব আলোচনা হইবে। এগুলি ভারতবর্ষে বিলাতী পণ্যদ্রব্যের কাট্‌তি বাড়াইবার ফিকির।

যশোহর জেলায় ও অন্যত্র নারীহরণ

বর্ত্তমান সংখ্যায় অনেক পৃষ্ঠা বেশী দিয়াও বিস্তর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু লিখিবার জায়গা পাইলাম না। কিন্তু নারীহরণের প্রাদুর্ভাবের এবং গুণ্ডাদের দুষ্কর্ম্মের যথোচিত প্রতিকারের চেষ্টা গবর্ন্মেণ্ট, মুসলমান সমাজ ও হিন্দুসমাজ করিতেছেন না, কেবল এই কথাটি লিখিতেছি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চারি জায়গায় নারীরা স্বয়ং বা তাহাদের অভিভাবক যে অস্ত্র চালাইয়া দুর্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিয়াছেন, সর্ব্বত্র সেই উপায় অবলম্বিত হইলে এই পৈশাচিকতার প্রতিকার হইত।

প্রবেশিকার একটি প্রশ্নপত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় ছাত্রীরা বাংলা যে প্রশ্নপত্রটির উত্তর দিতে বাধ্য, তাহার সব দোষ দেখাইবার স্থান নাই; কয়েকটির উল্লেখ করিব। যে-সব ভুল সংশোধন করিতে বলা হইয়াছে, তা ছাড়া উহাতে গুটি সাত আট ছাপার ভুল আছে। সপ্তম প্রশ্নে লেখা হইয়াছে "Translate any two of the following extracts," কিন্তু কোন্ ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে, বলা হয় নাই। সকলের চেয়ে গুরুতর দোষ হইয়াছে প্রথম প্রশ্নটিতে। তাহাতে যে-তিনটি বাক্যসমষ্টি ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে, তাহার প্রথমটি কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। বানানভুলগুলি প্রশ্নপত্রের।

যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামীসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোগ করে, এবং বিপত উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে নানাদোষে দূষিত, অধিক কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন-ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে।

উদ্ধৃত বাক্যগুলির অপকৃষ্ট বাংলা সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। আমরা কেবল প্রশ্নকর্ত্তার অমার্জ্জিত রুচি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার উল্লেখ করিতে চাই। কোন কোন পুরুষের চরিত্রের মত কোন কোন নারীর চরিত্রেরও একটা মলিন ঘৃণ্য দিক্ আছে। মানুষ বয়োবৃদ্ধিসহকারে ইহা জানিতে পারে। বিবেচক জ্ঞানী লোকেরা তাহা বালকবালিকাদিগকে তাড়াতাড়ি জানাইতে ব্যগ্র হন না। সে-রকম জিনিষ প্রশ্নপত্রে পর্য্যন্ত বালিকাদের সম্মুখে ধরিবার কী একান্তপ্রয়োজন ঘটিয়াছিল? "বসন-ভূষণে বশীভূত" হওয়াটা কি নারীচরিত্রের উচ্চ আদর্শ? না, সতীত্বের একটা লক্ষণ? কোন নারীকে অসতী বলিলে তাহার চরিত্রে অপকৃষ্টতম দোষ আরোপ করা হয়। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যে-সব দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সবগুলিই কি এইরূপ অপকৃষ্ট-তম দোষ? নীচে মুদ্রিত অদ্ভুত বাংলায় লেখা বাক্যগুলিও ছাত্রীদিগকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে বা ছেলের পক্ষে এগুলি অনুবাদ করা দুঃসাধ্য।

মনের মলা দুর না করিলে ভক্তি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শান্তি পাওয়া যাইবে না। তিনি হৃদয়ের ধন, অনেক কষ্ট সহিয়া একাগ্র হইয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, নিজের ভোগসুখের পদ্মে সংযমের কাঁটার বেড়া দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। মন একাগ্র না হইলে তাঁহার পায়ের নুপুরের শব্দশোনা যায় না। কিন্তু তিনি রোজই আসেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসেন, তাঁহার স্নেহের শিশুরা কি করিতেছে তাহা দেখিতে আসেন। তাহারা যদি নিজ সুখের ও স্বার্থের ঠুলি পরিয়া চক্ষু আঁধার করিয়া রাখে, তবে তাঁহার পাদপদ্ম দেখিবে কিরূপে?

যাঁহার পাদপদ্মের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাতে পিতৃত্ব না মাতৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে, জানি না। পিতা নূপুর পরেন না। ছোট মেয়েরা নূপুর পরে। যিনি বহু সন্তানের জননী হইয়াছেন এরূপ মহিলা সচরাচর নূপুর পরেন কি?

প্রশ্নপত্রটির পূরা নম্বর ১০০। তাহার মধ্যে বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য ৪৩ রাখা হইয়াছে। প্রশ্নপত্রটির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্রীদের বাংলা-জ্ঞান পরীক্ষা করা। কিন্তু এই প্রশ্নপত্রের অনুবাদগুলি করিতে বেশ ভাল রকম ইংরেজীজ্ঞান থাকা চাই। তাহা না-থাকিলে, যে ছাত্রী বেশ ভাল বাংলা জানেন তিনিও ৪৩ বা প্রায় ৪৩ নম্বর হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

অনুবাদের জন্য প্রদত্ত একটি বাক্য এইরূপ:— "পরিশ্রমের অগ্নি হৃদয়ে জলিয়া উঠিলে **অন্য** সকল কুপ্রবৃত্তি ভস্মে পরিণত হয়।" "পরিশ্রমের অগ্নি"ও তাহা হইলে একটা কুপ্রবৃত্তি?

১২০।২আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



দুয়ারে

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

২য় সংখ্যা

শান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
সেথা অন্তরলোকে,
সিন্ধুপারের প্রভাত আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নীচু॥

সিন্ধুতীরের শৈলতটের 'পরে
হিংসা-মুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে
কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহা লীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান
গর্জ্জন এসে তোমার মাঝারে
হ'ল ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হ'ল গত
সন্ধ্যা-মেঘের তিমির-রন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মত॥

১৪ই চৈত্র
১৩৩৮

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষুদে জ্বরে পেয়ে বসেছিল, তার বহর নিরনব্বইয়ের বেশী নয়, কিন্তু সেই জন্তেই ঝুঁটি ধরে তাকে বিদায় করা শক্ত হয়ে উঠেছিল। সংসারের সমস্ত ক্ষুদে শত্রুদের জোর ঐখানেই—চেপে ধরতে গেলেই এড়িয়ে যায়। কিছুই নয় ব'লে যতই অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করেছি ততই সে পাকা ক'রে বাসা বাঁধতে লেগে গেল। অবশেষে দেবতাত্মা নগাধিরাজের শরণ নিয়েছি। নিরনব্বইয়ের ধাক্কাটা এখানে এসে কেটেচে। আমার শরীরের জন্তে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না। ঘোরতর কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেচে—কুঁড়েমির দুর্গে আছি বললেই হয়—এমন কি ছবি আঁকার দুর্নিবার নেশাও আমাকে নাগাল পাচ্চে না।

২

হিমালয়-শিখরে অধিষ্ঠিত নির্ম্মল অবকাশ থেকে নেমে এসেছি শহরে—এখানে নিরন্তর লোকের ভিড়, কাজের ভিড়—চিত্তবিক্ষেপের হাওয়া এলোমেলো হয়ে বইচে চারিদিকে। এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—অতএব কাজ সারা হলেই যত শীঘ্র পারি পালাব শান্তিনিকেতনে। এখন থেকে আমার পত্র শীতকালের রিক্ত অরণ্যের মত বিরল হবে। এখন থেকে নানা লোকের নানা দাবি মেটাবার কাজে আমার সময়টাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কাল এসেচি—কিন্তু সময় পাইনি—আজও সময়ের দৈন্য ঘোচেনি। ইতি ২১শে আষাঢ় ১৩৩৮।

৩

আমার সাধনা সম্বন্ধে তোমার সুন্দর ভাষায় যা লিখেচ সেটি সত্য। মানবের পরিপূর্ণতার শাশ্বত আদর্শ শাশ্বত মানবের মধ্যে আছে,—যে-অংশে সেই পরিপূর্ণতা আমরা লাভ করি সেই অংশে পরিপূর্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন হয়। সেই মিলনে এত গভীর আনন্দ যে তার জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে পারে। এমনি করেই যুগে যুগে কত সাধকের ত্যাগের উপরেই মানবসভ্যতা প্রশস্ততর প্রতিষ্ঠা লাভ করচে। পূর্ণ মানুষের ডাক না শুনতে পেলে মানুষ বর্ব্বরতার অন্ধকূপে চিরদিনই পশুর মত পড়ে থাকত। আজও অনেক বধির আছে, কিন্তু যাদের মর্ম্মের মধ্যে পূর্ণের দাবি প্রবেশ করে এমন অল্পসংখ্যক লোকও যদি থাকে তা হলেই যথেষ্ট। বস্তুত তারাই অতি কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের সমস্ত ইতিহাসই হচ্চে সেই অভিসার। নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার রাত্রের এই অভিসারে মানুষ বারে-বারেই পথ হারিয়েছে, পিছিয়ে গেছে, কিন্তু একথাটা কখনই সে ভুলতে পারেনি যে তাকে চলতেই হবে, যেখানে আছে সেইখানেই তার চরম আশ্রয় এমন কথা বললেই মানুষ মরে, এমন কি যখন সে পিছিয়ে চলে তখনও চলার উপরে তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

আমি যাকে মানুষের সাধনার বিষয় বলি তার একটা বিশেষ দিক হয়ত তোমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। মানুষের পূর্ণতা শতদলপদ্মের মত, তার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব করে কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষ সাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ ব'লে আমি স্বীকার করিনে। অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টি যখন অন্ধ হয় তখন স্পর্শশক্তি অদ্ভুত রকম বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও বলতে হবে, দৃষ্টি ও স্পর্শের যোগেই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ সার্থকতা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে। পৃথিবীতে যাঁরা বিজ্ঞানের সাধনা করেন তাঁরাও মোহমুক্তির দিকে মানুষের একটা জানলা খুলে দিচ্চেন। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন অন্য জানলাগুলি বুজিয়ে দাও দেওয়াল গেঁথে, তাহলে সেই এক জান্‌লার পথে বিজ্ঞানের অতিতীব্র উপলব্ধি জন্মাতে পারে, তবু পূর্ণতার ঐশ্বর্য্যে মানুষ বঞ্চিত হবে। পেটুক বলতে পারে জল খেয়ে কেন পেট ভরাব, জঠরের সমস্ত গহ্বর সন্দেশ দিয়ে ঠাসাই ভোজের চরম আনন্দ, তেমনি মাতাল বলে খাবার খেতে শক্তির যে অপচয় হয় সেটা বন্ধ ক'রে একমাত্র মদ খেয়েই তৃপ্তির পূর্ণতা ঘটানো চাই। আপাতত যাই হোক পরিণামে উভয়েই বঞ্চিত হয়। সাধারণত যাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলা হয় তাকে যখন আমরা লোভের সামগ্রী ক'রে তুলি তখন আলো পাবার জন্যে একটি জানলা ছাড়া অন্য সব জানলায় দেওয়াল গাঁথবার উৎসাহ জাগে। এই রকম গুহাবাসের সন্ন্যাসকে আমি মানিনে; গুহার বাইরে বিরাট জগতকে আমি গুহার চেয়ে বেশী সত্য বলেই জানি। সেইজন্যেই, কোনো আধ্যাত্মিক নামধারী গুহার মধ্যে ঢুকলেই আমার পরমার্থ লাভ হবে এমন লোভ যদি কোনো খেয়ালে আমাকে পেয়ে বসে তবে ক্ষণকালের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে তার থেকে বেরিয়ে আসব সন্দেহ নেই। যদি বলো অনেকে তো নিজেকে অবরুদ্ধ করার সাধনায় শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে যায়। আমার উত্তর এই, মাড়োয়ারি মহাজন তো রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত আড়তের গদিতে রুদ্ধ থাকে, মুনফাও জমে। কোনো একটি জাতের মুনফাকেই একান্ত করে সেইটেকেই চরম লাভ বলা লোভের কথা। চলমান জগতে যা-কিছু চলচে সমস্তকেই অধিকার ক'রে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না, এই হ'ল ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়-সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি। এই হ'ল আমার নিজের কথা। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন লোকসেবা সব দিকেই নিজেকে মুক্তি দেওয়ার দ্বারাই পূর্ণকে উপলব্ধি করা চাই,—চিত্তে তাঁর বিচিত্র প্রকাশের পথকে সব জানলার যোগেই খুলে রেখে দিলে তবেই মনুষ্যত্ব সার্থক হবে। য়ুরোপের সাধকেরা যে মুক্তির পথে অসীম অধ্যবসায়ে মানুষের সহায়তা

করচে তাকে আমি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেচি, আবার ভারতীয় সাধকেরা আপনার মধ্যে আত্মজ্যোতি দর্শনের যে সাধনাকে গ্রহণ করেচেন তাকেও আমি প্রণাম ক'রে মেনে নিই। এই উভয়ের মধ্যে জাতি-ভেদ ঘটিয়ে যদি পংক্তি-বিভাগ করি, এবং এক পাশ ঘেঁষে সমস্ত জীবন কেবল শুচিবায়ুর চর্চ্চা করি তাহ'লে কৃপণের গতি লাভ করব।

কিন্তু একটি কথা মনে রেখো, চতুষ্পথে আমার চলা;— সম্প্রদায়ের দুর্গে রুদ্ধদ্বারের মধ্যে আমি বাঁচিনে। এই জন্যে যদিও আমি নিজের মত গোপন করিনে, তবু কাউকে ডাকাডাকি ক'রে কোনদিন বলিনে আমার মত গ্রহণ করো। তুমি নিজের পথে নিজের মতে চললে তোমার প্রতি আমার স্নেহ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে এমন শঙ্কা কোন দিন ক'রো না। স্বভাবতই তোমার চিত্তশক্তির একটি প্রসার আছে, এই রকম বেগবান চিত্তকে খোঁটায় বেঁধে বাঁধা খোরাকে পরিতৃপ্ত করা সহজ নয়। তোমার কঠিন দুঃখ হচ্চে দ্বিধা নিয়ে। তোমার সংস্কার এই যে, চিত্তকে পীড়িত ক'রে খর্ব্ব ক'রে তাকে বিশ্বের অধিকার থেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত ক'রে তবে সার্থকতা, অথচ তোমার প্রকৃতিতে যে-বুদ্ধিশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য আছে, সে অবারিত আকাশে আলো চায় হাওয়া চায় গতি চায়। সেই চাওয়াটাকে তুমি অপরাধ ব'লে ভয় পাও। পাখীকে খাঁচায় বন্দী ক'রে তাকে আকাশভীরু ক'রে তোলা হয়েচে। কিন্তু এই আকাশভীরুতা তার স্বভাব নয়, সে তার ডানা দেখেই টের পাওয়া যায়।

যাই হোক, আমাকে তোমার গুরু ব'লে গণ্য ক'রো না, আপনার লোক বলেই জেনো। বাইরের দিক থেকে তোমার পরিচয় অল্পই পেয়েচি তবুও তোমাকে স্নেহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েচে। তার কারণ তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে কোনোরকমের সংস্কারের বাধায় তাকে ছায়াবৃত করতে পারেনি, তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সকল রকম বাধার মধ্যেও তোমাকে মুক্ত রেখেচে। আমার সম্বন্ধে কঠোর বিরুদ্ধতা থাকাই তোমার পক্ষে স্বভাবসঙ্গত ছিল, আমার দেশের লোকের অনেকেরই তাই আছে। কিন্তু অভ্যাসের আচারের মতের নানাপ্রকার বাধা সত্ত্বেও সে-সমস্ত পার হয়েও তুমি আমার কাছে আসতে পেরেচ সে তোমার বুদ্ধির অসামান্য উদারতা-বশত। প্রকৃত আত্মীয়তার মিলনক্ষেত্র এই উদারতায়, মতের মিল প্রভৃতিতে নয়। চিঠিতে তোমাদের সাধনের কথা তুমি যেরূপ ক'রে প্রকাশ করেচ তাতে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি, তোমার নিজেকে সুনিপুণ ভাষায় সুস্পষ্ট ক'রে আমার গোচর করতে পেরেচ। মানুষের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য সেইখানেই যেখানে সে আমাদের কাছে অস্পষ্ট। যে হয়েচে সুপ্রত্যক্ষ তাকে আমরা অন্তরের মধ্যে অনায়াসে গ্রহণ করি। তুমি যে-পথেই চলো না কেন, সে-পথ আমার অধিকৃত না হলেও আমি লেশমাত্র ক্ষোভ ক'রব না, এ কথা নিশ্চিত জেনো। কিন্তু সে-পথ তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হয়, সে-পথে তোমার সম্যক চরিতার্থতা ঘটে, তুমি শান্তি পাও, এই আশা করি। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে সহজে নিজের জীবনকে গ্রন্থিমুক্ত ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও এই ইচ্ছামাত্র আমার মনে রইল।

ইতি ১১ শ্রাবণ ১৩৩৮

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সংগ্রহ ও প্রচার

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলা কাব্য বটতলার নিন্দিত ঘৃণিত মুদ্রাযন্ত্রসমূহ হইতে প্রথমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। যে-সময়কার কথা হইতেছে সে-সময় শিক্ষিত বাঙালী বলিতে ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য অথবা অকৃতবিদ্য বাঙালীকে বুঝাইত। তাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হয় উদাসীন না-হয় একেবারে অজ্ঞ। বটতলার পুস্তকসমূহ তাঁহারা কিনিতেন না, পড়িতেনও না। সে-সকল পুস্তক মুদি-পসারি, দোকানিরা পাঠ করিত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই সকল পুস্তক মুদ্রিত হইত। ছাপায় অসংখ্য ভুল, কাগজ সস্তা ও খারাপ, অতিসুলভ মূল্যে এই সকল পুস্তক বিক্রীত হইত। বৈষ্ণব কবিতার পুথি বৈষ্ণবদের ঘরে থাকিত, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিতেন ও সেই সকল গীত গান করিতেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাংলা ভাষার আদি কবি এ-কথা অনেকের জানা ছিল, কিন্তু বিদ্যাপতি যে আদৌ বাঙালী ছিলেন না, আর এক দেশের লোক, সে-কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। হাতে লেখা পুঁথির বহুল প্রচার অসম্ভব, বটতলার পুস্তকাদিও অল্পশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

যে-সকল ভক্ত, কবি ও শ্রদ্ধাবান বৈষ্ণবেরা এই সকল গীতি-কবিতা যত্নপূর্ব্বক বহু পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বাংলা সাহিত্যের ঋণের ইয়ত্তা নাই। প্রাচীন কবিদিগের স্বহস্তলিখিত কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া 'গীতকল্পতরু' অথবা 'পদকল্পতরু' নামক বিশাল-গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা বৈষ্ণব দাসের হস্তাক্ষর বা নিজের লেখা পুঁথি বর্ত্তমান নাই। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অপেক্ষাও প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার স্বহস্তলিখিত বৃহৎ ভাগবত গ্রন্থ তালপত্রের পুঁথির আকারে আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন পুঁথিসকল নকল করিবার সময় নানা পরিবর্ত্তন হইত। সকল লিপিকরেরা ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, লিখিবার সময় অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটিত, যদৃষ্টং তল্লিখিতম্ সকল সময় হইত না। ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে যাহা পাঠান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হয় লিপিপ্রমাদ কিংবা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তিত রচনা।

বাঙালীর উচ্চারণ

বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। বাঙালী অতি প্রাচীন অথবা আধুনিক জাতি, সে-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু বাঙালীর শব্দোচ্চারণ-প্রণালী যে ভারতবর্ষের আর সকল জাতি হইতে বিভিন্ন তাহাতে কোন সংশয় নাই। এরূপ কেন হইল, সে-প্রশ্ন এখন উত্থাপন করিব না। অন্য সকল জাতি তিনটি 'শ'য়ের (শ, ষ, স) ভিন্ন ভিন্ন রূপ উচ্চারণ করে, কেবল বিহার ও অযোধ্যা অঞ্চলে 'ষ'য়ের উচ্চারণ 'খ'য়ের মত। বাঙালীর মুখে 'শ' ছাড়া আর কোন 'শ'য়ের উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায় না। মৃচ্ছকটিক নাটকে বহুগুণধর রাজশ্যালক এক তালব্য 'শ' ছাড়া আর কোন 'শ' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এই জন্য তাঁহার নাম ছিল শকার। তাঁহার ভাষাতে ও প্রাচীন কাব্য ও ইতিবৃত্তের বিদ্যায় গলদ ছিল অনেক রকম। তাঁহার মুখ দিয়া মূৰ্দ্ধন্য 'ষ' ও দন্ত্য 'স' বাহির হইত না। বাঙালীরও সেই অবস্থা। বাংলা অথবা সংস্কৃত পাঠ করিবার সময়, মুখে কথা কহিবার সময় একমাত্র তালব্য 'শ' শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল কয়েকটি যুক্তঅক্ষরে 'স'য়ের উচ্চারণ হয়, যেমন আস্তে, স্থান, নচেৎ স্বতন্ত্র আকারে 'স' সর্ব্বত্র তালব্য 'শ'য়ের মত উচ্চারিত হয়। এইরূপ বর্গীয় ঙ

অন্তঃস্থ 'জ' ও 'য'য়ের একই উচ্চারণ। মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য 'ন'য়ের উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। প-বর্গের 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারণের সময় একই অক্ষর। যদি উচ্চারণের অনুসারে বাংলা বর্ণমালা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে মূর্দ্ধন্য 'ণ', অন্তঃস্থ 'য' ও 'ব' এবং মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য 'স'য়ের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। সংস্কৃত ও ও প্রাকৃত শব্দের উচ্চারণে অনেক প্রভেদ ছিল, মাগধী, পালি ও প্রাকৃতের উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ইহা ব্যতীত আদিম অনার্য্য ভাষা ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। বাঙালীর অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি অনুসন্ধানের বিষয়।

লিপি-প্রণালী

বাংলা দেশের মূল শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা অথবা সংক্ষেপে ভাষাকে অবহেলা করিতেন। তাহার পর যাঁহারা ইংরেজী শিখিলেন তাঁহারাও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধি করিতেন না, কিন্তু নিতান্ত পক্ষে বাংলা অথবা ভাষা লিখিতে হইলে, তাঁহারা কোনরূপ নিয়ম মানিতেন না। ইকার উকার যাহার যেমন ইচ্ছা লিখিত, দুই রকম 'জ'য়ের, দুই রকম 'ন'য়ের, দুই রকম 'ব'য়ের, তিন রকম 'শ'য়ের কোন বিচার ছিল না। লিখন-প্রণালীতে সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচার চলিত। শব্দের বানান যে যেমন ইচ্ছা করিত। একই পুঁথি ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছিল না, বাংলা শব্দ বানান করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। মৈথিল ভাষায় লিপি-প্রণালীর এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। মৈথিল কবি ও লিপিকরেরা শব্দের বানানে একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন ও সেই কারণে সকল মৈথিল পুঁথিতে সকল শব্দের বানান একই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সে লিপি-প্রণালী অনেকটা প্রাকৃতের অনুযায়ী।

এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার পরিবর্ত্তে বাংলা শব্দ-সমূহকে সংস্কৃত শব্দের অনুযায়ী বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। এই পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু এক প্রকার অনুমান করা যায়। কোন পুস্তক ছাপিবার সময় মুদ্রাযন্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা হইত। এখনও অনেক স্থানে সেইরূপ করা হয়। এই সকল পণ্ডিতেরা বাংলা শব্দের বানান সংস্কৃতের অনুযায়ী করিয়া দিতেন। ইদানীং বাঙালী লেখকেরাও সেইরূপ বানান আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখিত বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকাদি পড়িয়া যাঁহারা বাংলা শিখিতেন তাঁহারাও শুদ্ধ বানান লিখিতে শিখিলেন। এইরূপে সমস্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থের সকল শব্দের বানান আগাগোড়া সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে, লাভ হয় নাই। যেমন প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহ প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে শিক্ষা করা উচিত, সেইরূপ সে-কালের শব্দ ও বানানের পদ্ধতি আমাদের জানা উচিত। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস জানিতে হইলে বিবর্ত্তনের ক্রম উত্তমরূপে শিখিতে হয়। বাংলা ভাষায় তাহার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলী এখন যে আকারে দেখা যায় তাহাতে মূলের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটিয়াছে। কতকগুলি হিন্দী, মৈথিল ও অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া পদাবলীর আকার একেবারে আধুনিক, প্রাচীনত্ব কিছু নাই। তাহার উপর অপর দোষও ঘটিয়াছে। প্রাচীন লেখাতে এক দাঁড়ী ছাড়া আর কোন ছেদ কিংবা বিরামচিহ্ন ছিল না। কবিতা লিখিতে হইলে প্রথম শ্লোকার্দ্ধে এক দাঁড়ী, দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে দুই দাঁড়ী। পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া সংস্কৃত লেখায় আর কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইত না, প্রাচীন বাংলাতেও তাহাই। প্রাচীন রচনা যদি পূর্ব্বের আকারে না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিরুপায়, কিন্তু তাহার উপর কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ইংরেজী চিহ্ন যোগ করিয়া দিতে হইবে কেন? চণ্ডীদাসের কবিতাতে সঙ্কলনকারেরা তাহাও করিয়াছেন। প্রাচীন লেখার যেটুকু প্রাচীনত্ব রক্ষা করিতে পারা যায়, তাঁহারা তাহাও বিনষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী পণ্ডিত মিলিয়া প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে পদাবলী রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবান্তরিত হওয়া অসম্ভব। শব্দের বানানে, আকারে

অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক স্থলে প্রাচীন শব্দের স্থানে আধুনিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু মৌলিক ভাব যে কবির নিজের সে-বিষয়ে দ্বিধা করিতে পারা যায় না। যে-আকারে এই সকল পদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু যে ভাবে এই সকল কবিতা অনুপ্রাণিত তাহা কবি ব্যতীত আর কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না।

পদাবলীর সঙ্কলন

কীর্ত্তনীয়াদের মুখে চণ্ডীদাসের গান শুনিতে পাওয়া যাইত। তাহাদের কাছে ও বৈষ্ণবদের ঘরে বৈষ্ণবগানের ছোটখাট পুঁথি ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বাহিরে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নাম বড়-একটা কেহ জানিত না। বৈষ্ণব গ্রন্থ বটতলা ছাড়া আর কোথাও ছাপা হইত না। যাঁহারা অল্পস্বল্প বা অধিক ইংরেজী জানিতেন, তাঁহাদের স্থির ধারণা ছিল যে, প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্য সকল অশ্লীল, অপাঠ্য রচনা। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী' নামক কাব্যগ্রন্থে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া অথবা যে-কোন ভাবেই হউক লিখিয়াছিলেন,

> মহাজন পদাবলী
> রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি।
> ললিত লবঙ্গলতা
> গোস্বামী খুড়োর মাথা :

মহাজন পদাবলী তিনি নিজে পড়িয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। বটতলার পুস্তক শিক্ষিত লোকে পড়িত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শ্রুতিমধুর ও ভাবমধুর ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি জয়দেব, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিদ্যাপতি অথবা চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন কি-না সে-বিষয়ে সংশয় হয়। করিলে ঈশ্বর গুপ্তের অপেক্ষা চণ্ডীদাস যে কত বড় কবি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

মহাজন পদাবলীর প্রধান ও অমূল্য সঙ্কলন কবি বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু'। কত পরিশ্রম করিয়া, কত অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তিনি এই বিপুল মহাগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই গ্রন্থ না থাকিলে অনেক বৈষ্ণব কবির নাম কেহ জানিত না, অনেক বৈষ্ণব কবিতা লুপ্ত হইত। সে কালে নৌকা ও পদব্রজে গমন ছাড়া যাতায়াতের অন্য উপায় ছিল না। বৈষ্ণব দাস নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, প্রধান প্রধান বৈষ্ণবদের ঘরে গিয়া, উত্তম উত্তম পুঁথি বাছিয়া লইয়া স্বহস্তে সমস্ত পদ নকল করিয়া লইতেন। 'পদকল্পতরু'র প্রচার প্রথমে বটতলা হইতে হয়, কিন্তু নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের লোকেরা সে পথ মাড়াইত না। যে-কালে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দ লোকে আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিত ও ঐ গ্রন্থের অনুকরণে চারিদিক হইতে নানাবিধ প্রাণিবধ মহাকাব্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল, যে-কালে হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতা লোকে চীৎকার করিয়া আওড়াইত, তখন বৈষ্ণব কাব্যের কথা শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কয়জন জানিত? অন্ধকার খনির মধ্যে যেমন অমূল্য রত্ন লুকায়িত থাকে সেইরূপ এই সকল মহামূল্য গীতিকবিতা বটতলার পুস্তকালয়ে ও হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রচ্ছন্ন ছিল। বৈষ্ণব কাব্য যে যথার্থ গীতিকাব্যের আকর ও তাহাতে অক্ষয় অমৃতরাশি সঞ্চিত আছে এ-কথা সাধারণ সাহিত্যসমাজে প্রচার হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কালে ইংরেজী সাহিত্য ও কাব্যের প্রভাব প্রবল, কাব্য-রচনায় ইংরেজী কাব্যের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইত। বৈষ্ণব কাব্যের অতুলনীয় ভাষা, শব্দের বিচিত্র কমনীয় কোমলতা, ভাবের নিবিড় প্রগাঢ়তা ইংরেজী-শিক্ষিত লেখক ও পাঠকের অবিদিত ছিল। বৈষ্ণব কাব্যের সুধারসের আস্বাদনে অনেক বাঙালী বঞ্চিত ছিল।

বটতলা হইতেই চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রথমে স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্কলনের প্রধান অবলম্বন 'পদকল্পতরু'। কিন্তু ইহাতেও শিক্ষিত সমাজে চণ্ডীদাসের কবিতার সমাদর হইল না। যে-শ্রেণীর লোকেরা বটতলা হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর গ্রাহক ও পাঠক তাহারাই পাঠ করিত। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত,

প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তরুণ বয়সে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদাবলী, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী সঙ্কলিত হয়। এখন এই মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত, কিন্তু সে-বিষয়ে কাহারও কোন চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যে-কয়টি সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অক্ষয়-চন্দ্র সরকারের সংস্করণই উৎকৃষ্ট।

পদ-সংখ্যা

'পদকল্পতরু'তে চণ্ডীদাসের বিরচিত অনুমান ১১০টি পদ আছে। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্কলনে ২০০, সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত সংস্করণে ৮৩০। এই সকল সংখ্যা হইতে সহজ সিদ্ধান্ত এই যে, কবির রচিত অপ্রকাশিত পদাবলী অন্বেষণ করিয়া যিনি যত পাইয়াছেন প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা বলিলেই সমস্ত কথা বলা হয় না। বিচারের অনেক বিষয় আছে, সঙ্কলনকারদিগের যোগ্যতা ও বিবেচনাশক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হয়। কোন কবির অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হইলে তাহা কত দূর প্রামাণিক তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। নূতন প্রকাশিত কবিতায় কবির প্রতিভার বিশিষ্টতার নিদর্শন পাওয়া যায় কি-না, তাহার মধ্যে উত্তম কবিতা আছে কি-না বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়।

সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সঙ্কলন গ্রন্থ 'পদকল্পতরু'। এই গ্রন্থ না থাকিলে হয়ত বিচিত্র বৈষ্ণব কাব্য বিলুপ্ত হইত। এ-কথা কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্বতন্ত্র প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক আধুনিক অপর বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া যায় না কেন? বাঙালী কবিদিগের কবি। তাঁহার তুলনায় অপর বৈষ্ণব কবিগণকে বিশেষ প্রাচীন বলিতে পারা যায় না। ইঁহাদের কাহারও পদাবলীর স্বতন্ত্র পুঁথি কেহ কোথাও পাইয়াছেন? ইঁহাদের কাহারও রচনা কি অপ্রকাশিত নাই? যদি থাকে সেগুলি প্রকাশিত হয় না কেন? বিদ্যাপতি প্রায় চণ্ডীদাসের সমসাময়িক, বিদ্যাপতির পদাবলীর হস্তলিখিত পুঁথি বঙ্গদেশে কখনও কোথাও স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া গিয়াছে? গোবিন্দদাস নামে কয়জন কবি ছিলেন তাহাই কেহ জানে না। কবিরাজ গোবিন্দদাস অত বড় কবি, তাঁহার পদাবলীর পুঁথি কখনও কেহ দেখিয়াছে? রায় শেখর, কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, বংশীবদন, ইঁহারা সকলেই উত্তম কবি, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে কোথাও পাওয়া গিয়াছে? বৈষ্ণব দাস যদি 'পদকল্পতরু' সঙ্কলন করিয়া না রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলে এই সকল কবিদিগের রচনা কেহ দেখিতে পাইত না।

'পদকল্পতরু'ই সকল সঙ্কলন গ্রন্থের অপেক্ষা প্রামাণিক। ইহার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-কবি রাধামোহন ঠাকুর স্বরচিত সংস্কৃত টীকাসম্বলিত 'পদসমুদ্র' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে পদ-সংখ্যা অধিক নয়, সকল বৈষ্ণব কবিদিগের রচনাও উহাতে সংগৃহীত হয় নাই। একমাত্র 'পদকল্পতরু'ই বৈষ্ণব কবিদিগের যশের ভিত্তি। যে-কবির যতগুলি পদ ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় সেইগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'পদকল্পতরু'র তিন সহস্র পদ বৈষ্ণব দাস কেমন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থশেষে তিনি নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস স্বয়ং কবি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ তাঁহারই কল্পনা, এবং সে-সম্বন্ধে পদগুলি তাঁহারই রচনা। প্রকৃতপক্ষে, এই দুই কবিতে কোনকালে সাক্ষাৎ হয় নাই। বিদ্যাপতি বাংলা জানিতেন না, চণ্ডীদাসের যশ তাঁহার জীবিত অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই। বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন 'পদামৃতসমুদ্রে'র গীত গান করিয়া ঐরূপ গীত সংগ্রহ করিবার তাঁহার লোভ জন্মিল। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া প্রাচীন প্রাচীন পদ যত পাইলেন সংগ্রহ করিয়া

এখন 'পদকল্পতরু' নামে পরিচিত। বৈষ্ণব দাস সকল বৈষ্ণব কবির সমস্ত পদ যে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা না হইতে পারে, কিন্তু সাধ্যমত যে তিনি উৎকৃষ্ট পদসমূহ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

কবিতার সংখ্যায় অথবা রচনার প্রাচুর্য্যে কোন কবি অথবা লেখকের যশ হয় না। শত শত কবি রাশিরাশি কবিতা রচনা করিতেন, এখনও করেন, তাহার অধিকাংশই বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। কত লেখকেরা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করেন তাহার কয়টি থাকে? একটিমাত্র কবিতায় যদি অমৃতকণা থাকে, তাহা হইলে তাহাই অমর হয়, নহিলে স্তূপাকারে যেমন তেমন কবিতা সাজাইলে তাহা ভস্মরাশি মাত্র। 'গীতগোবিন্দে' জয়দেবের মোটে তেইশটি পদ আছে, কিন্তু এই অল্পসংখ্যক কবিতা হইতেই তাঁহার দেশদেশান্তরব্যাপী অক্ষয় যশ। 'গীতগোবিন্দে'র প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহার ভাষা ও শব্দ এবং ছন্দের ঝঙ্কার একেবারে অননুকরণীয়, যিনি অনুকরণের প্রয়াস করিয়াছেন তিনিই ব্যর্থচেষ্ট হইয়াছেন। অপর পক্ষে, চণ্ডীদাসের ন্যায় কবির ভাষা, ছন্দ ও রচনা অনুকরণ করা অত্যন্ত সহজ, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা না করিলে অনুকরণের কৃত্রিমতা বুঝিতে পারা যায় না। 'পদকল্পতরু'তে যে কয়টি পদ আছে, সেইগুলি হইতেই তাঁহার যশ, সেই কয়টি কবিতা হইতেই তিনি বাংলা ভাষার গীতিকাব্যে শীর্ষস্থানীয়। যদি আর একটিও কবিতা না পাওয়া যাইত তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের যশ যেমন তেমনি থাকিত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'পদকল্পতরু' ছাড়া অপর প্রাচীন পুঁথি হইতে আর কিছু পদ সংগ্রহ করেন। এগুলিও প্রামাণিক। হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। টীকা অনেক না থাকিলেও যাহা আছে তাহা উত্তম। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট যেমন আশা করা যাইতে পারে তাঁহার সংস্করণ সেইরূপ হইয়াছে।' এই দুইটি সঙ্কলন ছাড়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশিত হয়। ইহাতে একচল্লিশ জন পদকর্ত্তার পদ স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের আরও কতকগুলি উত্তম পদ আছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী বলিতে এই পদগুলিই বুঝায়। সাহিত্য পরিষদের সংস্করণে যে-সকল নূতন ও অপ্রকাশিত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে সেগুলি ইতিপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক যে গ্রন্থ কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পদাবলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

নিরুদ্দেশ

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

যদিও চট্‌কলের ধোঁয়ার কালিমা আমাদের গ্রামের আকাশ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছায়, তবুও আমাদের গঙ্গার দুই তীর ইষ্টকে প্রস্তরে বন্দী হয়ে পড়েনি। পর্ব্বত-দুহিতার স্বচ্ছন্দ সচল মূর্ত্তি সেখান পর্য্যন্তই বেশ সহজ ছিল। তার পরেই স্বচ্ছ সলিল শহরের পঙ্কিলতায় মলিন, তার পরেই দু-কূলের সবুজ শস্পাস্তরণ শহরের বিষস্পর্শে বিবর্ণ।

সেটা ছিল শিবরাত্রি। সে রাতের কথা ভোলবার নয়। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে ঠিক করেছি রাত জাগতে হবে। প্রথম প্রহরটা গান করেই কাটছিল বেশ। সুরতাল জ্ঞানহীনের এবং বায়সবিনিন্দিত কণ্ঠের গান আসলে জমে ভাল। একজন গাইবে অপর সকলে হাসির হুল্লোড় ছোটাবে তবে না গানের আসর! পাকা গাইয়ের নিখুঁত সঙ্গীতে শ্রোতারা নিঝুম হয়ে থাকে—বেঁচে আছে কি মরেই গেল তা বোঝবার জো থাকে না।

দ্বিতীয় প্রহরের নিস্তব্ধতি রাতের সঙ্গে কিন্তু আমাদের বে-পরোয়া গানের ছন্দটা যেন বড় বেমানান ঠেক্‌তে লাগল। বিশেষতঃ সন্ধ্যারাত্রে যে খানিক মেঘ জমেছিল, এখন একটু একটু ঝরতে সুরু করেছে। অমাবস্যা রাত্রের টিপ টিপ্ বৃষ্টি মনের মধ্যে একটা বিমর্ষতা এনে দেয়। প্রবল কোলাহল যেন এই মৃদু সজল ভাষণের তিরস্কারে লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

গদাই বললে—নেও এখন গাওনা ছাড় দিকিনি! কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তার চেয়ে কেউ একটা গল্প বল শোনা যাক্।

নিতাই উৎসাহিত হয়ে বললে—হ্যাঁ, একটা ভূতের গল্প!

স্বয়ম্ভু গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে বললে—না হে না, আজ এই শিবরাতের মুহূর্ত্তে শিবচরদের নিয়ে তামাসা করা ঠিক হবে না।

স্বয়ম্ভুর এই গাম্ভীর্য্যটা কপট, না, সত্যিই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগছিল তা নির্ণয় করবার পূর্ব্বেই দেখা গেল তার দুখানি পা দিব্যি ইজিচেয়ারের পাথার উপর তুলে দিয়ে নাক ডাকাচ্চে। তৎক্ষণাৎ কানে কোঁচার খোঁটের আর নাকে নস্যির টিপের দৌরাত্ম্যে তার সুখনিদ্রা নাক-কান দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বেরিয়ে গেল। আবার হাসির ধূম্!

হাসির ঢেউটা তখনও থিতিয়ে যায়নি—অকস্মাৎ বেণুগোপাল কোথা হ'তে ঝড়ের মত ছুটে ঘরে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—"প্রান্তকে তোরা কেউ দেখেছিস্?"

নিতাই বলে উঠল—"কই না! প্রান্ত ফিরেছে না কি?"

বেণুগোপাল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। আজকের আড্ডায় সে অনুপস্থিত ছিল।

স্বয়ম্ভু জিজ্ঞাসা করলে,—"প্রান্ত কি কারু নাম না কি?"

নিতাই বললে,—"তুমিই শুধু প্রান্তকে চেন না। সে ছিল আমাদের আড্ডার পাণ্ডা। তুমি তখনও আসনি। ওর আদত নাম হচ্চে 'প্রাণবন্ত'। আমরা বললাম অত বড় নাম ধরে ডাকার ধৈর্য্য হবে না। আর শুধু 'প্রাণ' ব'লে ডাকাটাও নিরাপদ নয়। তাই আগা-মাথা জুড়ে দিয়ে 'প্রান্ত' নামকরণ করা গেল। কিন্তু 'প্রাণবন্তই' ওর ঠিক নাম,—প্রতি কাজেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। সেই হাবড়া ষ্টেশনের কাণ্ডটার কথা মনে আছে?"

নিতাই আমার দিকে তাকালে। আমি হাসতে হাসতে বললাম—"তা আর মনে নেই!"

স্বয়ম্ভু বললে "কি, কি, বল না ভাই।"

নিতাই বলতে লাগল—সে ভারি মজা। আমরা যাচ্ছিলাম শিমুলতলায় পূজোর ছুটিতে বেড়াতে। ঝাঁ ঝাঁ

স্পেশাল্ দিয়েছে। ষ্টেশনে পৌঁছেই দেখি সময় বেশী নেই। প্রান্ত কিন্তু সময়-সংক্ষেপের জন্যে কিছুমাত্র ভাবছিল না। তার অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছিল—খাবার কিছু নেওয়া হ'ল না সঙ্গে। আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে চলেছি, সে সকলকে মাঝপথে আটকে টেনে নিয়ে গেল এনকোয়ারি আপিসে। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করলে কি—"মশাই, গরম কচুরি কোথায় পাওয়া যায়? গরম, গরম?"

আপিসের বাবু অবাক হয়ে প্রান্তর দিকে একবার, আমাদের দিকে আর একবার তাকিয়ে মেঠাইয়ের দোকানের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলেন শুধু। বোধ হয় কথা কইতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছিলেন না।

ওদিকে সময় সঙ্কীর্ণ। আমরা ছুটলাম আবার প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্রান্ত ছুটল মেঠাইয়ের দোকানপানে। আমাদের বলে গেল, "তোরা যা, আমি এই এলাম বলে।"

প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা—প্রান্তের দেখা নেই! স্পেশালের গার্ডসাহেব সগর্ব্বে সবুজ নিশান দুলিয়ে দিলেন। ট্রেনও মোশন্ দিয়েছে প্রান্তও প্ল্যাটফর্মপ্রান্তে দেখা দিয়েছে—ছুটতে ছুটতে আসছে। এক হাত খাবারের ঠোঙায় আঠার মত আটকে রয়েছে, অপর হস্ত দাঁড় বাইবার ভঙ্গীতে ঘন ঘন শূন্যে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা জোড়া জোড়া হাত নেড়ে চীৎকার করে প্রান্তকে ডাকতে লেগে গেলাম—সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে সরগরম ক'রে। কিন্তু বোধ হয় হিত করতে বিপরীত হ'ল। আমাদের চীৎকারে গার্ডের দৃষ্টি আমাদের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রান্তর দিকেও আকৃষ্ট হ'ল। প্রান্ত সবে খাবারের ঠোঙাটা আমাদের বিস্তৃত হাতের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে—নিজে যেই চলন্ত গাড়ীর পা-দানে পদপ্রদান করতে যাবে অমনি পেছন হ'তে গার্ডের প্রচণ্ড আকর্ষণে তাকে নিরস্ত হ'তে হ'ল। বেচারি থমকে দাঁড়িয়ে গার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। গার্ড তখন নিজের গাড়ী ধরবার জন্যে পেছনের দিকে চলেছে। প্রান্তও তার পিছে গুটি গুটি চলতে লাগল। এবার পাণ্টার পালা। গার্ড যেই যাবে ধরতে তার গাড়ীর হাতল, বিদ্যুৎ-বেগে প্রান্ত লাফিয়ে গিয়ে ধরলে গার্ডের কোমর জাপ্‌টে! তার পর দুইজনে ঝুটোপুটি।

গার্ড বলে—খবরদার!

প্রান্ত বলে—তোম্ খবরদার। চলন্ত গাড়ীতে ওঠবার নিয়ম আমার যেমন নেই তোমারও নেই। রেলের লোক হয়ে রেলের নিয়ম অমান্য কর!

ওদিকে ট্রেন এগিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গার্ডের গাড়ী হ'তে নিশান নাড়া দেখতে না পেয়ে গেল থেমে। গার্ড তখন প্রান্তর হাত হ'তে ছাড়া পেয়ে দৌড়ে গেল গাড়ী ধরতে, প্রান্তও উঠে পড়ল আমাদের কামরায়।

গদাই হাসতে হাসতে বললে—"তারপর সেই বিশাল-বপু লিঙ্কি' সাহেবের ভুঁড়িতে হাত বুলোবার গল্পটাও শুনিয়ে দাও না স্বয়ম্ভুকে।"

নিতাই আবার সুরু করতে যাবে এমন সময় বেণু-গোপাল হঠাৎ আবার এসে পড়ল। চোখ-দুটো দেখে মনে হচ্ছে—এ কি, ছেলেটা কি পাগল হয়ে ফিরল?

নিতাই ব'লে উঠ্‌ল—"কি হে বেণু, ব্যাপার কি? প্রান্ত ফিরেছে?"

বেণু জবাব দিলে—"না সে আড্ডায়ও নেই, তার আস্তানাতেও ফেরেনি, কিন্তু—"

—"কিন্তু কি? বল না ব্যাপার কি।"

তার দিকে অবাক হয়ে আমরা সকলে তাকিয়ে রইলাম।

বেণু আস্তে আস্তে বলতে লাগল—"আজ সন্ধ্যাটা যখন সবে ঘোর হয়ে আসছে, আমি আমাদের রক্‌টাতে বসে আছি, এমন সময় আমার পাশে এসে বস্‌ল প্রান্ত। তাকে দেখেই মনে হ'ল যেন তার কথাটাই সেই মুহূর্ত্তে ভাবছিলুম। সত্যি, তার কথা এই দু-মাস ধরে আমাদের মধ্যে কে না প্রায় সব সময়ই ভাব্‌ছে বল। সেই যে গেল সে গঙ্গাসাগরের মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আর ত ফেরেনি।"

"তাকে দেখেই মনটা আনন্দে চম্‌কে কি রকম বিহ্বল হয়ে গেল তা বুঝতেই পার। চোখে তার শান্ত মৃদু মৃদু হাসি। আমি মুগ্ধনেত্রে স্থির হয়ে সেই

জিজ্ঞাসা করলাম—"এতদিন ছিলে কোথায় ?"

বললে—"এই বেড়িয়ে এলাম একটু। দেখে এলাম নবকুমারের পথবিভ্রমের জায়গাটা, দেখলাম কাপালিকের নরকঙ্কালাকীর্ণ আশ্রম। সেই ভীষণ, সেই মধুর !"

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় কানে শব্দ এল—"রাম নাম সৎ হ্যায়।"

তাকিয়ে দেখি এক অভিনব ব্যাপার। দুইটিমাত্র লোক একটি মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। তারা খাট কাঁধে না ক'রে বাধ্য হয়ে মাথায় করেছে—একজন আগে অন্যে পেছনে। সঙ্গে অপর লোক নেই।

আমরা অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগলাম। তারা যেই আমাদের কাছ হ'তে একটু দূরে গিয়েছে অমনি প্রান্ত বললে—"যাবি ওদের সাহায্য করতে ?"

প্রান্তের সেই প্রশ্নে হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শ্মশানে যাবার আমন্ত্রণ আচম্‌কা এলে চম্‌কে উঠ্‌তেই হয়। বিশেষ ক'রে শ্মশানযাত্রীর সংখ্যা যদি বিরল হয়, উৎসাহও সবল হ'তে চায় না।

কিন্তু প্রান্তের প্রশ্ন ত সে নয়, সে যেন আদেশ! তার কথা, জানিস্ ত ভাই, ফেলা বড় শক্ত। যেতেই হ'ল। দৌড়ে গিয়ে শববাহীদ্বয়ের কাছে নিজেদের সাহায্য দিতে চাইলাম। তারা সাগ্রহে আমাদের দু-জনকে তাদের কাজে বাহাল ক'রে নিলে। খাটকে তখন চার জনে কাঁধে করা গেল।

রামের ভক্তদ্বয় এবার পরম উৎসাহে হাঁকতে লাগ্‌ল "রাম নাম সৎ হ্যায়"। কিন্তু সেই রামনাম-ধ্বনিতে আমরা যোগ না দেওয়াতে তারা বললে "বলিয়ে বাবুজী—রাম নাম সৎ হ্যায়।"

আমি ভাবছি তাদের সঙ্গে যোগ দিই, কিন্তু প্রান্তকে দেখে মনে হ'ল রাম-নামে সায় দিতে কোন উৎসাহ তার নেই। হিন্দুস্থানবাসীদ্বয় আবার চীৎকার ক'রে অনুরোধ করলে। প্রান্ত উত্তরে একটা হরিধ্বনি করলে। তারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। এবার বিষম বিরক্ত ও উৎকণ্ঠার কর্কশ স্বরে বললে—"নেহি, নেহি—রাম নাম লিজিয়ে জল্‌দি।"

বুঝতে পারলাম না। প্রান্ত পুনর্ব্বার হরিধ্বনি করলে। এবার আমিও তাতে যোগ দিলাম। তখন তারা বললে—"খাটিয়া জারা উতারিয়ে জী।"

খাট নামানো হ'ল। তখন হিজলীতলার ঝোপে এসেছি। তারা দুই জনে ঝোপেরই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আমরা তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—যায় কোথা! দশ-বারো পা এগিয়েই হঠাৎ দিল দৌড়! যেন প্রাণ নিয়ে পালাচ্চে। তাদের এই কাণ্ড দেখে মহা আশ্চর্য্য ও বিরক্ত বোধ হ'ল। প্রান্তকে বললাম—"দেখলে ত! যেচে পরের উপকার করতে যাওয়ার কি পুরস্কার!"

বস্তুতঃ, প্রান্তের 'উপরেই যেন আমার সব রাগটা এসে ভর ক'রে দাঁড়াল। প্রান্ত কিন্তু হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, "এখন আর রাগ ক'রে কি করবে বল। ওরা দুজনে যেমন ক'রে আগে বয়ে আনছিল এখন আমাদেরও তাই করতে হবে।"

দু-জনে মাথায় খাট বয়ে নিয়ে চললাম। প্রান্ত আগে রইল, আমি পেছনে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন আমি বলতে লাগলাম—"কার মড়া কে বয়—রামচন্দ্র!"

প্রান্ত হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠে বললে,—"এই নামটা তুমি এতক্ষণে করলে! তারা যখন চাইছিল তখন যদি ঐ নাম শোনাতে তাহ'লে ত এত কাণ্ড হ'ত না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কি, রাম-নাম ?"

প্রান্ত বলল,—"হ্যাঁ, ওরা কেন পালাল তা বুঝতে পারিস নি ? ওরা আমাদের কি মানুষ ভেবেছে, না আর কিছু ?"

আমার মাথায় এতক্ষণে বুদ্ধি যেন সুস্পষ্ট হয়ে এল। আমি ভয়ে বললাম, "ভূত ভেবেছে না কি ?—ওঃ, তাই বুঝি আমাদের মুখ দিয়ে 'রামনাম' বলিয়ে পরখ করতে চাচ্ছিল ?"

প্রান্ত বললে—"ঠিক তাই। অনাহূতভাবে মড়া বইতে প্রেতাত্মারাই এত চট ক'রে আসে।"

কথাটা ব'লে সে হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে লাগল। আমার কিন্তু গা-টা ছম ছম ক'রে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে—"আচ্ছা বেণুগোপাল! তোর মনে একবারও

কথাটা শুনে. আমার কণ্ঠরোধ হবার জোগাড় হ'ল। অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম—"কিসের সন্দেহ ?"

উত্তর পেলাম—"এই আমি সত্যিই—"

"এই অবধি শুনেছিলাম ভাই, তার পর আর কিছু জানি না।"

বেণুগোপাল হাঁপাতে লাগল। আমি বললাম—"জানিস্ না কি ? জ্ঞান হারিয়েছিলি না কি ? এখানে ত দিব্যি সজ্ঞানেই এলি !"

বেণু আমার কাঁধে একটু ভর ক'রে বললে—"দাঁড়া একটু জিরিয়ে নি।"

আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলতে লাগল—"প্রান্তর ঐ কথাটা পর্য্যন্ত শুনেই আমি খাটের পেছনের দিকটা দড়াম্ ক'রে দিলুম ছেড়ে। আর অমনি পেছন ফিরে দিলাম ছুট। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমার মাথার পেছনটাতে এমন একটা আঘাত পেলাম কি আর বলব। সে কি খাটিয়ার পায়াটাই উল্টে লাগল, না মড়ার ঠ্যাংই ঠিকরে এসে ঠেকল, না প্রান্তের প্রেতাত্মাটাই মারলে মাথায় চাঁটি, কে জানে !"

গদাই মহা ক্ষাপ্পা হয়ে বললে—"যাঃ যাঃ, প্রেতাত্মা ! কি যে বলিস্। তুই যে এত বড় কাওয়ার্ড তা জানতাম না। প্রান্তকে সেই তেপান্তরের মাঠে একলাটি ফেলে দিব্বি চলে এলি ! খোট্টারা তবু খাট নামিয়ে তবে পালিয়েছে, আর তুই কি-না মড়াশুদ্ধ খাটটা দড়াম্ ক'রে উল্টে দিয়ে এলি ! প্রান্ত হয়ত একলাই মৃতের সৎকার করছে। সে ত আর যেমন তেমন ছেলে নয়। চল্ আমরা যাই !"

আমরা অনেকেই "চল্ চল্" ব'লে উঠে পড়লাম। স্বয়ম্ভু গম্ভীর হয়ে বললে—'অত হঠকারী হয়ো না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা—"

"আরে ধ্যাৎ, অগ্রপশ্চাৎ—"

সকলেই ছুটলাম। বেণুকে ও স্বয়ম্ভুকে সকলের মাঝে রাখলাম। শ্মশান বলতে পাড়াগাঁয়ের শ্মশান। যাবার পথটা পর্য্যন্ত আতঙ্কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শিবতলার পথ বাঁয়ে রেখে, হাড়গিলে খালের ধার দিয়ে দয়ে খানিকটা গিয়ে হিজলীতলার ঝোপ ডাইনে ফেলে, পড়ল গিয়ে হলদি মাঠে। সেখান থেকে পশ্চিম পানে তাকালে দৈত্যদীঘির তালগাছের উচ্চ শিরের সারি এই অমাবস্যা রাতেও দেখা যায়! তালের দৈত্যেরা এই শ্মশানের পথে তাকিয়ে দেখে—আবার কে যায়। তারপর মাঠের রাস্তা অজগর সাপের মত প্রবেশ করেছে গিয়ে শেওড়া বনে। বনের মাঝে গাছের ডাল কোথাও হেলে, কোথাও বাতাসে নুয়ে প'ড়ে খাটের মড়ার কানে কানে কি যেন কথা কয়, আবার হরিধ্বনি দিতেই খাড়া হয়ে উঠে পড়ে। কোথাও পেঁচার গুরুগম্ভীর ধ্বনি।

বন পেরিয়েই ভাগীরথী-তীরে শিমুলতলায় শ্মশান-ঘাট। আমরা তাকিয়ে দেখলাম একটি মাত্র চিতা। তাতে আগুন সবে দাউ দাউ ধরে উঠ্‌ছে। লোকজন কোথাও কেউ নেই !

গদাই ব'লে উঠ্‌ল—" দেখলি, সেই হিজলী তলা থেকে প্রান্ত একলাই এতটা পথ মড়া বয়ে এনেছে, তার পর চিতা সাজিয়ে আগুন ধরিয়েছে।"

স্বয়ম্ভু ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—"তোরা কি পাগল হয়েছিস ? হিজলীতলা থেকে মড়া বয়ে এনে আগুন দেওয়া কি মানুষের কাজ ? ঐ বেণু যা সন্দেহ করেছে, বুঝলি না—"

গদাই বললে—"ধ্যাৎ !"

তারপর সকলে মিলে "প্রান্ত—প্রান্ত" ব'লে চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম। সে ডাক বনের প্রান্ত হ'তে ফিরে এসে ভাগীরথীর স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে গেল। কোন সাড়া এল না। যখন উপলব্ধি হ'ল সত্যিই জনহীন শ্মশানেই এই চিতা জ্বলছে তখন মনের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল। আমরা সকলেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মনে হ'ল আমরা এই মাত্র যে কণ্ঠস্বরের দূত পাঠালাম প্রান্তকে খুঁজবার জন্যে, সে যেন ঐ নিবিড় বনের অন্ধকারে, ঐ বিজনপ্রান্তরের বিস্তীর্ণতায় কাউকে হাতড়ে না পেয়ে হঠাৎ ভয়ে দিশেহারা বিহ্বল হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চলে গেল।

ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি মাথায় বয়ে সমস্তটা পথ গিয়েছি—সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছিল। অন্তরের রক্তও যেন

এখন জল হয়ে আসতে চাইল। হাত-পাগুলো আগুনে সেঁকে নিতে চিতাটার কাছে সকলে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ বেণু চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে বললে—'সর্ব্বনাশ !"

আমরা বললাম—"কি ?"

বেণু কাঁপতে কাঁপতে বললে—"চিতায় শুয়ে পুড়ছে কে ও ? প্রান্ত না ?"

আগুনের শিখার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমরা বললাম—"ধ্যাৎ।"

বেণুগোপালের দিকে ফিরে আমি বললুম—"তোর কি মাথা খারাপ হ'ল ?"

কিন্তু স্বয়ম্ভূ একটা রহস্তের সমাধানের স্বরে বললে—"হুঁ, বেতালপঞ্চবিংশতির বিধানে নিজের বিপন্ন মৃতদেহ নিজে বইতে পারে।"

গদাই আবার বললে—"ধ্যাৎ !"

শাল্মলীর উচ্চ শাখা হ'তে গম্ভীর প্রতিবাদ এল—"ভূৎভূতুম্—ভূৎভূতুম !!"

বাল্মীকি-রামায়ণের ভূমিকা

শ্রীদীননাথ সান্যাল

কাব্যারম্ভেই বাল্মীকি-নারদ-সংবাদ। ইহাই রামায়ণের ভূমিকা। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূমিকাটি এইরূপ ;—আদর্শ-মানব-চরিত্র অবলম্বনে কাব্য-রচনা-প্রয়াসী বাল্মীকি মুনি নারদের মুখে রাম চরিত্রাখ্যান শুনিয়া স্নানার্থ সশিষ্য তমসাভিমুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই পবিত্র তীরে এক ব্যাধ-কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধ-রূপ নৃশংস ব্যাপার দর্শনে এবং ক্রৌঞ্চীর কাতর বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহার হৃদয় করুণ-রসে আপ্লুত হওয়ায় অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের আকারে ঐ ব্যাধের প্রতি অভিশাপ-বাণী নির্গত হইল ;—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্ ॥"

রে নিষাদ! যেহেতু তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিলি, তোর প্রতিষ্ঠা চিরকাল অর্থাৎ বহুকাল থাকিবে না।

এই ক্রৌঞ্চবধ-ঘটনাটিকে একটি আকস্মিক ঘটনা-মাত্র বলিয়া ধরিলে, উহা দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত বাল্মীকির মুখ হইতে ছন্দোনিবদ্ধ "প্রথম-শ্লোক"-নিঃসৃতির একটা ঘটনা-মূলক উপলক্ষ পাওয়া যায় বটে, এবং তাহা ঐ শ্লোকের স্পষ্টার্থ হইলেও, আদি-কবি-রচিত একখানি

যখন বাল্মীকির মন নারদোক্ত অত্যাশ্চর্য্যজনক রাম-চরিতাখ্যান চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল)—এমন সময়ে তাঁহার সমক্ষে সংঘটিত ঐ ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপার এবং তদ্দর্শনে ব্যাধের প্রতি মুনির অভিশাপ-বাণী—এরূপ একটা ঘটনার সংঘটন—ভাবগ্রাহীর মন উহার স্পষ্টার্থ ছাড়া, উহার ভিতরে একটি গূঢ়ার্থের সন্ধান করিতে চায়, অর্থাৎ কাব্যাংশে ঐ ঘটনাটির মধ্যে যেন রামায়ণের নিষ্পীড়িত মর্ম্মটি নিহিত আছে, তাহারই সন্ধান করিতে চায়। সেই সন্ধানই এখানে আমার আলোচ্য বিষয়।

বাল্মীকি-রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত রামানুজও উক্ত ব্যাপারের কেবলমাত্র স্পষ্টার্থেই তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনিও ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারে নিষাদের প্রতি বাল্মীকির অভিশাপ-বাণীর গূঢ়ার্থ নিষ্কাষণের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখানে প্রথমে তাঁহার ব্যাখ্যার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি ঐ একই অভিশাপ-বাণীর দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—একটি ব্যাখ্যা রামপক্ষে; অপরটি রাবণ-পক্ষে।

রাম-পক্ষে,—হে মানিষাদ রাম! তুমি মন্দোদরী-

নিহত করিয়াছ ; এই হেতু বহুকাল অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর। *

পক্ষান্তরে অর্থাৎ রাবণ-পক্ষে,—(সর্ব্বদা দেবর্ষিগণ-সমেত ত্রিলোকের উৎপীড়ক) হে নিষাদ-রূপী রাবণ ! † (রাজ্যক্ষয় ও বনবাস নিবন্ধন ক্ষুদ্রত্বপ্রাপ্ত) রাম-সীতা-রূপ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে সীতাকে তুমি বধাধিক দুঃখ দিয়াছ, সেই হেতু তুমি (ব্রহ্মার নিকট লঙ্কা-রাজ্য ভোগ করিবার) যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছ, তাহা অধিক দিন থাকিবে না।

টীকাকার মহাশয় নিজেকে বাল্মীকি-স্থানীয় করিয়া কেবলমাত্র ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারের উপরেই দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং উহা হইতে রামায়ণের মর্ম্ম-কথা নিষ্কাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়াই উপরি-উক্তরূপে তাঁহাকে বৈয়াকরণিক ও অন্যরূপ কৌশল করিতে হইয়াছে ; কিন্তু তাহা করিয়াও সমগ্র রামায়ণের পিণ্ডিত মর্ম্মটি ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, রামায়ণের মত সুবিস্তৃত ও ঘটনাবহুল মহাকাব্যের দুই-একটি অবান্তর ঘটনার ভিতরে সমগ্র কাব্যখানির উদ্দিষ্ট মর্ম্মকথার সন্ধান পাওয়াও যেমন অসম্ভব, আবার ভূমিকায় কাব্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন-উদ্দেশ্যে সেই অবান্তর ঘটনার সঙ্কেত তেমনই অসঙ্গত ও অশোভন। রামানুজের মত সুপণ্ডিতও ইহা বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিয়াছেন ; তাই শ্লোকটির গূঢ়ার্থের সন্ধানে একবার রাম-পক্ষে জয়গান, আবার রাবণ-পক্ষে অভিশাপ —এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাকে বিষম বিব্রত হইতে হইয়াছে। রাম-পক্ষের ব্যাখ্যায় বাল্মীকি-প্রত্যক্ষ "নিষাদ"কে একেবারে উড়াইয়া দিয়া ব্যাকরণের সাহায্যে তাহার স্থলে রামকে "মানিষাদ" করিতে হইয়াছে ; কাজেই মন্দোদরী-রাবণ হইলেন "ক্রৌঞ্চমিথুন"।‡ এরূপ ব্যাখ্যার ফলে বুঝায় যেন ক্রৌঞ্চীরূপিণী মন্দোদরীর বিলাপই রামায়ণের গূঢ়ার্থ। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষ ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারের সহিত ক্রৌঞ্চীর সকরুণ বিলাপই বাল্মীকির চিত্তকে করুণার্দ্র করিয়াছিল। আবার রাবণ-পক্ষে ব্যাখ্যায় রাম-সীতাকে করিতে হইয়াছে 'ক্রৌঞ্চমিথুন' ; তন্মধ্যে সীতা হইয়াছেন "ক্রৌঞ্চ" (!) ; কাজেই রাম "ক্রৌঞ্চী" (!)। * এ ব্যাখ্যায় রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ ও তজ্জনিত রামের সাময়িক ও স্বাভাবিক বিলাপই যেন রামায়ণের মূল কথা, যাহা ভূমিকায় সমগ্র কাব্যখানির প্রতীক-রূপে প্রতিফলিত হইবার যোগ্য !

বস্তুতঃ বাল্মীকির দৃষ্টিতে নিষাদ কর্তৃক ক্রৌঞ্চবধ-মাত্র ঘটনাটিকে প্রতীকস্বরূপ রামায়ণে প্রয়োগ করিতে গেলে পণ্ডিতজীর পন্থা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা সত্য। আবার, ইহাও সত্য যে, রাবণ-বধে মন্দোদরীর বিলাপ বা সীতার হরণে রামের বিলাপ অথবা রামায়ণের অন্য কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মধ্যে নায়কের সমগ্র কার্য্যাবলীর প্রেরণা অর্থাৎ রামায়ণের বীজবস্তু বা মূলকথার সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এখন প্রশ্ন এই যে, তবে রামায়ণে ভূমিকোক্ত তমসা-তীরের ঘটনাটির গূঢ়ার্থ কি ?

এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রামায়ণ অন্ততঃ রামায়ণের ভূমিকাংশ প্রথম পুরুষের উক্তি-রূপে রচিত—উত্তম পুরুষের অর্থাৎ স্বয়ং বাল্মীকির উক্তি-রূপে নহে। †

এই প্রথম পুরুষ সম্ভবতঃ বাল্মীকিরই শিষ্য। রামায়ণের ভূমিকাতেই আছে, নারদের সহিত কথোপ-কথনের পরে বাল্মীকি স্নানার্থে সশিষ্যই তমসা-তীরে যাইতেছিলেন এবং সেখানে এক নিষাদের নৃশংস আচরণে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন। এই স্থলে বাল্মীকির সম্মুখে দৃশ্যটি—নিষাদ ও তৎকৃত নৃশংস আচরণ (ক্রৌঞ্চবধ) এই মাত্র। কিন্তু সেই স্থলেই শিষ্যের সম্মুখে দৃশ্যটি শুধু তাহাই নহে ;—নিষাদের প্রতি

* মা লক্ষ্মীঃ নিষিদতাস্মিন্ তৎসম্বোধনং মা নিষাদ।

† নিতরাং সদেবর্ষিগণং ত্রৈলোক্যমবসাদয়তি পীড়য়তীতি নিষাদঃ।

‡ "ক্রৌঞ্চ মিথুনাৎ মন্দোদরী-রাবণ-রূপাদ্ একং কামমোহিতং রাবণং।"

* "রাজ্যক্ষয়-বনবাসাদিদুঃখেন অত্যল্পীভূতং পরম কার্শ্যং গতং যৎ মিথুনং সীতারাম-রূপং তস্মাদ্ একং সীতারূপং যস্মাদ্ অবধীঃ বধাদধিকপীড়াং প্রাপিতবানসি।"

† রামায়ণের আরম্ভ এইরূপ :—

"তপস্বাধ্যায় নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।

মুনির শাসনও শিষ্যের পক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যাপার। সুতরাং প্রথম-পুরুষোক্ত (সম্ভবতঃ ঐ শিষ্যোক্ত) ভূমিকায় তমসা-তীরের ঘটনাটি কেবলমাত্র মুনিদৃষ্ট ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না; উঁহার সহিত নিষাদের প্রতি মুনির তীব্র শাসন-বাক্য সমেত ঐ ঘটনাটি বা কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, ঐ চিত্রটি সম্পূর্ণ। এই নিমিত্তই তমসা-তীরে মুনির সহিত একজন শিষ্য থাকার কাব্যগত সুন্দর সার্থকতা।

এদিকে, রামায়ণে বিশাল ভারতভূমি ও সমুদ্রপারে লঙ্কা পর্য্যন্ত রামের ভ্রমণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলীর ভিতর আদ্যন্ত যে একমাত্র অখণ্ড সূত্র লক্ষিত হয়, তাহা রাক্ষস-দমন। সেকালে আর্য্যাবর্ত্তে রাক্ষসদিগের বিষম, অকথ্য অত্যাচারে তপোবনস্থ মুনি-ঋষিগণ সবিশেষ উৎপীড়িত হইতেন; যাগযজ্ঞ করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণেও সে-কথা পাওয়া যায়। এমন কি, পঞ্চদশবর্ষীয় বালকদ্বয় রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র যে তাহাদের বৃদ্ধ পিতার বক্ষ হইতে এক প্রকার ছিন্ন করিয়াই লইয়া গেলেন, তাহা রাক্ষসদিগের উৎপাত হইতে তাঁহার যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্যই। বিশ্বামিত্রের কাছেই রাম লক্ষণ নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ বিষয়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাদের পরীক্ষা করিলেন ভীষণা তাড়কা-রাক্ষসীকে দিয়া।

রাম অনায়াসে তাড়কাকে বধ করিয়া বিশ্বামিত্রের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। ইহার পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞস্থলে, ঐ দুই বালককে রাক্ষসদের উৎপাত নিবারণার্থ প্রহরীস্বরূপে রাখায়, সেখানেও রাম রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজের বীর্য্যপটুতা ও গুরুর শিক্ষা সপ্রমাণ করিলেন। এই হইল রামায়ণে রাক্ষস-দমনের প্রথম বা উদ্যোগপর্ব্ব।

ইহার পরে চারি ভ্রাতা বিবাহিত হইয়া অযোধ্যায় আসিবার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ পিতার ইচ্ছা হইল জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; অযোধ্যার প্রজাবর্গের ইচ্ছাও তাহাই। মহাসমারোহে অভিষেকের আয়োজন হইলে কি হয়?—কবির ইচ্ছা অন্যরূপ। কবি রামকে দিয়া রাক্ষসদিগের অত্যাচার দমন করাইবেন। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সেই বিপুল আয়োজনের মধ্যে লক্ষ্মণ-সমেত সস্ত্রীক রামের বনবাস ঘটাইয়া কাব্য-রাজ্যে করুণ রসের এমন একটা অমর প্রস্রবণ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার তুলনা জগতে আর আছে বলিয়া আমার জানা নাই। সেই উদ্দেশ্যেই কবি কাব্যোচিত উপায়ে রামের যুবরাজত্ব নষ্ট করিলেন; তাঁহার সহায়তার জন্য বীর লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকিলেন এবং রাক্ষসদের মূলোৎপাটন পক্ষে কবির পরিকল্পনায় সীতারও প্রয়োজন—এইজন্য সতীত্ব-বিবেকের বিদ্যুত্তাপিত লৌহবেষ্টনী দ্বারা সীতাকে সংরক্ষিত করিয়া কবি তাঁহাকেও রামের অনুগমন করাইলেন। অযোধ্যা কাঁদিতে থাকিল; কিন্তু কবি নির্ব্বিকারচিত্তে ঐ তিনজনকে বনপথে লইয়া চলিলেন।

পথিমধ্যে রাত্রিবাসের জন্য রাম যে-আশ্রমেই আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইখানেই আশ্রম-মুনির মুখ দিয়া কবি রামকে রাক্ষসদিগের অত্যাচার কথা শুনাইতে-শুনাইতে তাঁহাকে দক্ষিণ-মুখে লইয়া যাইতে থাকিলেন। এইরূপ শুনিতে-শুনিতে রাক্ষস-দমন-কার্য্য যেন রামের মনে বনবাসের একমাত্র "মিশন্" হইয়া উঠিল। সীতাও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতার কথায় অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া বনবাস-কাল কাটাইতে হইলে কবি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তাই কবি রামের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, আর্ত্ত ঋষিদিগের বিপদে অস্ত্রধারণ ক্ষাত্রধর্ম্ম। তবে তিনি সীতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বৈর ভিন্ন তিনি রাক্ষস-হিংসা করিবেন না।

ক্রমে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসদিগের এক বিরাট্ বাহিনী আছে শুনিয়া রাম তন্নিকটস্থ পঞ্চবটী-বনে আশ্রম করিয়া সুখে তপোবন-বাস-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকে কবি সে-সুখ ভোগ করাইতে অযোধ্যার রাজত্ব ছাড়াইয়া বনে আনেন নাই। পঞ্চবটী বাস-কালে বৈর-সূত্রে রামকে জনস্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিতে হইল। ইহার পরে রাম নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু কবি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। খর-দূষণের সৈনাপত্যে জনস্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র সেনাবাহিনী ত রাবণ-মহাদ্রুমের একটি শাখা মাত্র। তাহা ছিন্নভিন্ন হইলেও লঙ্কায় সে মহাদ্রুম শির উচ্চ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিল। সমূলে তাহা উৎপাটিত না হইলে

রাক্ষস-দমন-কার্য্য শেষ হইল কই? কবিকে তখন লোক-চক্ষুতে এক প্রকার নির্ম্মম হইয়াই, কিন্তু কাব্য-চক্ষুতে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে রাবণকে দিয়া গুপ্তভাবে রামের আশ্রম-লক্ষ্মীকে হরণ করাইতে হইল। এই সীতা-হরণ ব্যাপার দ্বারাই কবি রামের অয়ন-পথের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাহাতেই রামায়ণের ঈপ্সিত কার্য্যের সম্পূর্ণরূপে সমাধান। এখন রাবণের শাস্তি ও সীতার উদ্ধার রামের একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। এই কর্ত্তব্যবোধের ভিতরই কবির উদ্দেশ্যসিদ্ধি নিহিত। ঐ কর্ত্তব্যবশেই কিষ্কিন্ধ্যায় গমনপূর্ব্বক অসংখ্য সেনা-সংগ্রহ, আরও দক্ষিণ মুখে সেই বিরাট কিষ্কিন্ধ্যা-বাহিনীর অভিযান, সাগরে সেতুবন্ধন; এই সকল উদ্যোগের পরে লঙ্কায় উপস্থিতি এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সবংশে রাবণকে সংহার। এইখানেই রামের অয়ন শেষ। ইহার পরে, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যভার-গ্রহণ।

এই হইল রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বিস্তৃত ও কবি-নির্দ্দিষ্ট অয়ন (adventures)।

অতি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতভাবে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত রামের কার্য্যাবলী যাহা বর্ণিত হইল, সে-সকলের প্রতি সমগ্র দৃষ্টিপাত (ইংরেজীতে যাহাকে বলে bird's-eye view বা পক্ষী-দৃষ্টিপাত) করিলে অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সব কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া রেখার মত যে একমাত্র প্রেরণা অযোধ্যা হইতে সুদূর লঙ্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা রাক্ষস-দমন। পবিত্র আর্য্যভূমে অনার্য্য রাক্ষসদিগের নৃশংস অত্যাচার উপদ্রব নিবারণই রামায়ণ-কাব্যের অন্তর্নিহিত বীজ, মজ্জা, মূল, বা মর্ম্ম-কথা এবং সবংশে রাবণবধে ঐ কার্য্য ও রামের অয়ন সমাপ্ত। রামায়ণের ভূমিকাতেও দেখা যায়, এই মহাকাব্যখানির নামান্তর রাবণ-বধ;—

> "রঘুবর-চরিতং মুনি-প্রণীতং।
> দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্॥

এখন রামের কার্য্যাবলী আদ্যন্ত মনে করিয়া তমসা-তীরের ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র সহজেই প্রতীতি হইবে যে, সমগ্র রামায়ণের মূলকথাটি তমসা-তীরের ঘটনা-রূপ সঙ্কেতে সুন্দর প্রতিফলিত। আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র তপোবনাদিতে অনার্য্য রাক্ষসদিগের নৃশংস অত্যাচার এবং আর্য্য রাম কর্ত্তৃক তাহার দমন—রামায়ণের এই মূলকথাটি ভূমিকার সাঙ্কেতিক চিত্রে চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে, পবিত্র তমসা-তীরে নিষাদ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধরূপ নৃশংস ব্যাপার সংঘটনে এবং তজ্জনিত আর্য্য বাল্মীকি কর্ত্তৃক নিষাদের প্রতি তীব্র ও ক্রুদ্ধ শাসনে। ইহাই তমসা-তীরের ঘটনার ও বাল্মীকির মুখ-নিঃসৃত অভিশাপ-বাণীর গূঢ়ার্থ, অর্থাৎ একটা ঘটনা দ্বারা কাব্যের মর্ম্ম-নির্দ্দেশ।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহার নাম সূক্ষ্মালঙ্কার, অর্থাৎ কোন-রূপ সঙ্কেত দ্বারা ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত করা। এখন দেখা গেল, তমসা-তীরে শিষ্য-দৃষ্ট ঘটনাটিকে রামায়ণের প্রতীক বা সঙ্কেত-স্বরূপে গ্রহণ করিলে, মুনির শাসন-বাক্যের ব্যাখ্যা সহজ ও সরল হইয়া পড়ে; উহার গূঢ়ার্থ নিষ্কাষণে নানাবিধ কৌশলের কিছুই করিতে হয় না; অথচ রামের সমগ্র কার্য্যাবলীর মর্ম্ম ঐ শ্লোকটির মধ্যে জাজ্বল্যমান্ রূপে ধরা পড়ে।

রাক্ষসদমনরূপ সূত্র ধরিয়া মুনিবর মুক্তাধিক সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট রত্নাদির যথাযথ সমাবেশেই এই অপূর্ব্ব মহাকাব্যখানি গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহার ঘটনাবলী এমন কাব্যোচিত নিপুণ ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহার পাত্রপাত্রীগণ এমন কালজয়ী আদর্শ স্বরূপ যে, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া এই মহাকাব্যখানি ভারতের অমূল্যনিধি-রূপে সমাদৃত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণের আদর্শ গুণেই ভারতের সর্ব্বত্র যুগে-যুগে কত কবিই যে উহার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কাব্যে, নাটকে, গানে, ভজনে, কথায়, গাথায়, গদ্যে পদ্যে এক রামায়ণ-অবলম্বনে ভারতময় যে কি সুবিপুল সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে হিন্দুজাতির লোক-শিক্ষায় যে কি অসীম উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তাহার তুলনা মিলে না। ক্ষুদ্রমতি আমি সেই আদি কবির রামায়ণ-কাব্যের ভূমিকাংশের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পণ্ডিত রামানুজের ভাষায় কবি-গুরুকে বন্দনা করিতেছি;—

> "কূজন্তং রাম-রামেতি মধুরম্ মধুরাক্ষরম্।
> আরুহ্য কবিতা-শাখাং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং॥"

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইতে পারে। গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পুরাতন ফাইল হইতে আমি ঢাকায় মাইকেলের সম্বর্দ্ধনার কথা আলোচনা করিয়াছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।* মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at nine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.+

সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে আছে :—

"You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorosanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!"

কিন্তু এই বাংলা বক্তৃতাটি তাঁহার চরিতকারদের কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—

"কালীপ্রসন্ন বাবুর অভ্যর্থনা মধুসূদনের প্রতিভার অতি গৌরবজনক পুরস্কার। সে দিনের ঘটনা চিত্রে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম।" *

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোমও লিখিয়াছেন—

"আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংবাদপত্রে মুদ্রিত এই অভিনন্দন-পত্র ও মধুসূদনের উত্তর সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" +

মাইকেলের বাংলা বক্তৃতাটি না পাইবার কারণ পুরাতন সংবাদপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ১৮৬১ সনের কতকগুলি 'সোমপ্রকাশ' আছে। সুখের বিষয়, যে-সংখ্যায় মাইকেলের বক্তৃতাটি মুদ্রিত

---

* ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার লিখিত "কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

+ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত এইরূপ একখানি পত্র গৌরদাস বসাক মহাশয়ের বাটীতে ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

* "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত," ৩য় সং, পৃ. ৪২৪ পাদটীকা।

+ 'মধুস্মৃতি, পৃ. ১৫৬।

হয় সেখানে সেই সংখ্যাটি আছে। আমার অনুরোধে শ্রীযুত জয়ন্তকুমার দাস-গুপ্ত বক্তৃতাটি বিলাত হইতে নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন। সমগ্র বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

"স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

"বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

"আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।", ('সোমপ্রকাশ', ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)

পুনা ও ভোর

শ্রীশান্তা দেবী

বোম্বাই হইতে অনেক রাত্রে পুনার একটা ট্রেন ছাড়ে। সেইটে সকালে পুনা পৌছিব মনে করিয়া আরামে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিলাম। ঘুম ভাঙিল অনেক লোকের ডাকাডাকিতে—পুনা আসিয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক বেলভালকার আমাদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বোম্বাই গিয়াছিলেন। সকালে দেখিলাম তাঁহার পুত্রকন্যারা গাড়ী লইয়া হাজির। অধ্যাপকের বাড়ি অতিথি হইতে হইবে।

বোম্বাই ও পুনায় আকাশপাতাল প্রভেদ। বোম্বাই একেবারে পাশ্চাত্য ধরণের শহর, পুনা খাঁটি মহারাষ্ট্র। মানুষের ব্যবহারে, পোষাকে, ঘরগৃহস্থালীতে, পথেঘাটে কোনো বিদেশী ভাব আমাদের চোখে পড়ে নাই। ভোর বেলা দুই দিক্ খোলা উঁচুনীচু পথের উপর দিয়া ছোট একটি নদীর সেতু পার হইয়া মোটরে চলিলাম। নদীর অল্পজলে পাল পাল মহিষ গা ভাসাইয়া পড়িয়া আছে। অনেক মানুষও সেইখানেই জল লইতেছে, কাপড় কাচিতেছে, স্নানও বোধ হয় করিতেছে। স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া এই প্রথাটি বিপজ্জনক সন্দেহ নাই, তবে চোখে দেখিতে মন্দ লাগে না।

শহরের বাহিরে উন্মুক্ত একটি প্রান্তরের মধ্যে অধ্যাপক বেলভালকার ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোকের বাড়ি। ভাণ্ডারকর রিসার্চ্চ ইনষ্টিট্যুটও তাহারই পাশে। বাড়ির কাছেই ছোট ছোট পাহাড়। ভোরবেলা স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা অনেকে বেড়াইতে আসিয়াছিল। বাঙালীরা অধিকাংশই এই ভাবে বেড়াইতে অভ্যস্ত নহেন। তাই বাঙালীর চোখে জিনিষটা নূতন লাগে, মনে হয় বুঝি কিছু একটা উৎসব এখানে আছে।

অধ্যাপক মহাশয় বিলাত প্রত্যাগত, কিন্তু তাঁহার বাড়ির ব্যবস্থা সবই দেশীয় ধরণের। দেখিতে বড় ভাল লাগিল। বাড়ির বারান্দায় মস্ত দোলনা ঝুলিতেছে,

তাহাতে বাড়ির মেয়েরা ও অভ্যাগতারা বসিয়া গল্প করেন। গৃহিণীর রান্নাঘর ও পূজার ঘর পাশাপাশি। তিনি আমাকে লইয়া সব দেখাইলেন। উঠানে তরিতরকারী ও ফুলগাছ গৃহিণী নিজ হাতে করিয়াছেন। ইঁহাদের খাওয়া দাওয়া সব নিরামিষ। মেঝের উপর দুটি পিড়ি পাতিয়া এবং একটি পিঁড়ি দেয়ালে ঠেসাইয়া আহারের স্থান হয়। প্রথম পিঁড়িটিতে রূপার থালায় ও ছোট ছোট রূপার বাটিতে ভাত ডাল, তরকারী, দই ইত্যাদি, মাঝেরটি বসিবার, পিছনে ঠেস দিবার একটি। গৃহিণী নিজের হাতে সরের ঘি করিয়া রাখেন, বাড়ির লোক এবং অতিথিদের ভাত ডাল লুচি ও তরকারিতে সেই ঘি প্রচুর ঢালিয়া দেওয়া হইল। মৎস্যভোজী বাঙালীরা এত ঘি কখনও খায় না। জলের জন্য প্রত্যেককে একটি গেলাস ছাড়া একটি রূপার ঢাকনা দেওয়া স্বতন্ত্র ঘটি দেওয়া হইল।

বাড়ির মেয়েরা কলেজে পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ নম্রতা, ভদ্রতা, আতিথ্য সবই স্বদেশী ধরণের। বোম্বাইয়ে মেয়েদের আতিথ্য, ভদ্রতা ইত্যাদি অনেকটা পাশ্চাত্য রকমের।

ভাণ্ডারকর রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিট্যুট দেখিতে গেলাম। মস্ত বড় বাড়িতে ঘরে ঘরে অসংখ্য মহাভারতের পুঁথি। বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া নানা হরফে লেখা পুঁথি। বাংলা পুঁথি দুই একখানি দেখিলাম। সকলের অপেক্ষা প্রাচীন পুঁথিখানি বোধ হয় কাশ্মীরের সারদা লিপিতে ভূর্জ্জপত্রে লেখা। ঘরে ঘরে পণ্ডিতরা পুঁথি লইয়া গবেষণার কাজে ব্যস্ত। পুঁথি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত অনেক গ্রন্থও এখানে রহিয়াছে। সেগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ইঁহাদের অনেক খরচ চলে। মহাভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু সুখতাঙ্কর মহাশয়ের সহিত এখানে পরিচয় হইল। নানাদেশীয় পণ্ডিতদের লইয়া ইনি সম্পাদন কার্য্যে ব্যস্ত।

অনেক দিন হইতে কার্ভের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার সখ ছিল। কিন্তু যখন পুনায় আসিলাম তখন দেওয়ালির ছুটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি দেখা যাইতে দেখিতে গেলাম। একটি উঁচু টিলার উপর লোকালয় হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে উদ্যানের ভিতর কলেজের মস্তবড় একতালা বাড়ি, তাহার পাশে ছাত্রীদের দুতলা বাসভবন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কার্ভে যে ক্ষুদ্রকুটীরে তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা-ব্রত আরম্ভ করেন, সেই কুটীরটি পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম। মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার বাড়ি দুইটি দুইলক্ষ টাকা খরচ করিয়া তৈরি করা হইয়াছে। কলেজভবন দাতার ইচ্ছামত করিয়া তৈয়ারী। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যর বিঠলদাস ঠাকুরসি মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা দান করেন। বৎসরে ইহার সুদ ৫২,৫০০৲ টাকা। তখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর ঠাকারসি "ইণ্ডিয়ান উইমেন্‌স্ ইউনিভারসিটী।" বিদ্যালয়ভবনে এই নামটি লিখিত আছে। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ইতিপূর্ব্বে কেহ এত টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। মাতার নামে স্যর বিঠলদাস এই বিপুল সম্পদ স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয় করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার যাহাতে অতি সহজে অথচ ব্যাপক ভাবে হয় তাই ইঁহারা ভারতীয় ভাষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান কার্য্য করেন। এখানে কোন একটি ভারতীয় ভাষা ছাড়া ইংরেজী, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, শিশুমনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় অবশ্য পাঠ্য। অঙ্ক, বিজ্ঞান, শিক্ষকতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা এগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে ইহার ভিতর ছাত্রীরা ইচ্ছামত বিষয় বাছিয়া লন। আমরা দেখিলাম শরীর-বিজ্ঞান শিখাইবার ঘরে বহু চিত্র, মূর্ত্তি এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির ছাঁচ, অনুবীক্ষণ ইত্যাদি রহিয়াছে। চিত্রকলার ঘরে অনেক ছবি দেখিলাম। তবে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ কিসে ছাত্রীদের জ্ঞান তাহাতে হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। চিত্রবিদ্যায় বাংলাদেশের, বিশেষত শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ভারতের অন্যান্য শিক্ষা নিকেতন হইতে শ্রেষ্ঠ। আজকাল অনেক স্থলে শান্তিনিকেতনের এবং কলিকাতার শিল্পীরা শিক্ষকতার ভার লওয়াতে সে-সব স্থলেও এই দেশের আদর্শ চলিতেছে। একটি ঘরে ছাত্রীদের নির্ম্মিত বেতার

নিপুণতার সহিত তৈয়ারী। এগুলি উচ্চ মূল্যে (৭০।৮০ ১০০৲) বিক্রীত হয়। বাংলা দেশে মেয়েদের দিয়া যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজ করাইলে ভাল হয়। কারণ মেয়েরা সচরাচর পুরুষ অপেক্ষা ধীরতার সহিত ও অধিক যত্নে কাজ করে।

এখানকার অধিবাসিনী ছাত্রীরা রন্ধনাদি সব কাজ স্বহস্তে করেন। ছাত্রীরা আসবাবপত্রের আড়ম্বরেও একেবারে বঞ্চিত। যাহা না হইলে নয় এমন দুই একটি জিনিষ মাত্র আছে। এই ছাত্রী আবাসটির জন্য বোম্বাইয়ের শেঠমূলরাজ খাটব ৩৫,০০০৲ টাকা দান করেন। এই-সব বড় বড় দান পাইবার পূর্ব্বে কার্ভে মহাশয়ের সহকর্ম্মী মিঃ গ্যাডগিল হিন্দু বিধবাশ্রমের (অধুনা বিশ্ব-বিদ্যালয়) জন্য সর্ব্ব প্রথম প্রতিবৎসর ১০০০৲ টাকা করিয়া দান করিতেন। ডাঃ লাণ্ডে নামক আর একজন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার সাউথ আফ্রিকার সমস্ত সম্পত্তি (৪০,০০০৲) কার্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া যান। এই ভদ্রলোক ধনী ছিলেন না, বহু পরিশ্রমে এই সম্পত্তি গড়িয়াছিলেন। দশবৎসর ধরিয়া আরও ষাটজন শিক্ষানুরাগী বৎসরে ১০০০৲ টাকা করিয়া এখানে দান করিয়া আসিয়াছেন। ছোটবড় আরও অনেক দান আছে, শুনিলে বিস্ময় ও আনন্দ হয়। (বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এমন বহু দাতার আবির্ভাব যেদিন হইবে সেদিনের আশায় আমরা উন্মুখ হইয়া আছি। অবশ্য দাতার আগে আরও বহু কর্ম্মীর আবির্ভাবের প্রয়োজন বেশী।)

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্কুল ইত্যাদি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উভয় স্থানেই আছে। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর উদ্যানবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আমরা আবার শহরের অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন রাস্তায় ঢুকিলাম। এইখানে শহরের মাঝখানে পুনার পুরাতন সেবাসদনের সারি সারি ছোট ছোট বাড়ি। ঘরগুলি অত্যন্ত ছোট এবং নীচু। একটির গায়ে আর একটি বাড়ি এলোমেলোভাবে লাগানো, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। দেখিয়া মনে হয় পাশাপাশি এই বাড়িগুলি পুরাকালে সম্পূর্ণ বিভিন্ন লোকের অর্থেও রুচিতে তৈয়ারী এগুলিকে কিনিয়া নিজেদের এলাকাভুক্ত করিয়াছেন। রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত সেবাদনেরই এই ছোট ছোট নীচু বাড়িগুলি। কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছি হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। সেবাসদনও মহিলাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে সর্ব্বজাতি ও ধর্ম্মের মেয়েদের বিশেষত দরিদ্র ও বিধবা মেয়েদের নর্স, ধাত্রী, লেডি ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, ইত্যাদির কার্য্যে তৈয়ারী করা হয়। ইহা ছাড়া মেয়েদের অর্থকরী আরও বহু কাজ শিখান হয়। মেয়েরা গান ও সেলাই শিখাইয়া উপার্জ্জন করিতে যেন পারে সেরূপ শিক্ষাও দেওয়া হয়।

কয়েকটি সদ্যপ্রসূত শিশু ও প্রসূতিদের সেবাশুশ্রূষা ও যত্ন আমাদের দেখান হইল। শিশুদের আহার ওজন ইত্যাদির যথার্থ মূল্য শিখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিশুপালন শিখাইবার অন্যান্য আয়োজনও দেখিলাম।

সেবাসদনে অস্পৃশ্য মেয়েদের জন্য একটি ছোট ছাপাখানা দেখিলাম। মেয়েরা কম্পোজ ইত্যাদি ত করেই, উপরন্তু হাতে করিয়া ছাপিবার কল চালায়। অতি অল্পপরিসর স্থানেই এই সব কাজ চলিতেছে।

মেয়েরা ধোপার কাজ করে, তাঁত বোনে, কলে সেলাই ইত্যাদি করে। তবে তাঁতের কাজের বেশী ভাগর বোধ হয় বাহিরের তাঁতি মাহিনা লইয়া কাজ করিয়া যায়। জিনিষগুলি বিক্রী করিয়া সেবাসদনের লাভ হয়। মেয়েদের তৈয়ারী কাপড়ের খেলনা, সেলাই, শাড়ীর পাড়, টুপি, মোজা জামা ইত্যাদি দেখিলাম। কাপড়ের খেলনা ও হাতের সেলাই বাঙালী মেয়েদের শিল্পভবনে ইহা অপেক্ষা ভাল দেখা যায়। মূল্যও বাংলা দেশের জিনিষেরই কম।

পুনা সেবাসদনের বাড়িগুলি সমস্ত তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এগুলির কত মূল্য জানি না কিন্তু বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাব দেখিলে মনে হয় ইহাদের প্রায় লক্ষ টাকার কাজ চলে। বাংলা দেশের বিধবা আশ্রমগুলির কোনটির এত বড় সম্পত্তি নাই।

সেবাসদনের জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য ইহাদের একটি ছোট নিজস্ব দোকান আছে। সেখানে যে কোন লোকই

নর্স ও চিকিৎসক তৈয়ারীর জন্য এখানে বড় বড় চিকিৎসকেরা আসিয়া নিয়মিত শিক্ষা দিয়া ও বক্তৃতা করিয়া যান। 'সূতিকা-গৃহ'গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষিত নর্স ও লেডি ডাক্তার আছেন। এখানে শিক্ষার্থিনী নর্স ও ধাত্রীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র নারীদের প্রসবের সময় সাহায্য করাও হয়। এখানকার প্রসূতি-মঙ্গল কার্য্য যে-সব লেডি ডাক্তার ও নর্সের সাহায্যে চলে তাঁহারা এইখানেই থাকেন। শহরের মাঝখানে বলিয়া মেয়েরা এখানে আসিয়া অনায়াসে নানা কাজ শিখিয়া যাইতে পারে। ইঁহারা বৎসরে ১২.৮২২৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট পান।

পুনা সেবাসদনের শাখা বরমতী, শোলাপুর, আমেদনগর, আলিবেগ, নাসিক, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে আছে।

ইঁহাদের স্বাস্থ্যশিক্ষালয়ে (Public Health School) অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিশু মনস্তত্ত্ব, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়। স্যর বিঠল দাস এই প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে মিসেস রাণাডে ছিলেন ইহার পৃষ্ঠপোষক।

সেবাসদনের অন্য বাড়িগুলি যেমন দরিদ্রের কুটীরের মত দেখিতে একটি বাড়ি তাহার সম্পূর্ণ উল্টা। এই বাড়িটি দোতালা চকমিলানো। ইহার থামগুলি কালো কাঠে কারুকার্য্যখচিত, দরজাগুলিও কালো কাঠের আগাগোড়া কারুকার্য্য খচিত। একতলার চারিদিকে বারাণ্ডা, মাঝখানে উঠান। মেয়েরা এখানে স্বপাকে রান্নাখাওয়া করেন। শুনিলাম কিছুদিন আগে ইহা ক্রয় করা হইয়াছে। ঠিক এই রকম গড়নের এবং এই জাতীয় কারুকার্য্যখচিত থাম ভোরের রাজপ্রাসাদে দেখিয়াছি। পুনাতেও দুই একটি পুরানো বাড়িতে কিছু কিছু এই প্রকার কাজ চোখে পড়িল। কাঠের কারুকার্য্যখচিত এই বাড়িগুলি পেশওয়া যুগের প্রথায় রচিত বলিয়া শুনিলাম।

সেবাসদনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জি, কে দেবধর মহাশয়ের সহিত এইখানে দেখা হইল। তিনি তাঁহার আপিস গৃহে আমাদের বসাইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা

প্রতিলিপি আছে। সেবাসদনে কিম্বা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবি চোখে পড়ে নাই।

পুনা শহরের বাড়িগুলি অধিকাংশই দেখিতে ভাল নয়। শহরের বাহিরে কতকগুলি চলনসই রকম ভাল বাড়ি আছে। ঐ দেশীয় প্রথায় ওখানে আজকাল আর কেহ বাড়ি করে না মনে হইল। পাশ্চাত্য সস্তা ধরণের বাড়ির উপরই মানুষের টান। বোম্বাইয়ের মত বড় বড় প্রাসাদ তুল্য বাড়ি এখানে চোখে পড়িল না। পথঘাটও বোম্বাইয়ের তুলনায় অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। তবে বোম্বাই ধন ও বাহ্য আড়ম্বরে বড় হইলেও পুনা মস্তিষ্ক ও হৃদয় সম্পদে বড়। প্রার্থনা সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ ও দেশহিতৈষী গোখলে রানাডে ভাণ্ডারকরের কর্ম্মভূমি পুনা। এখনও সেবাসদন, মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়, সার্ভেণ্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল, ভাণ্ডারকর রিসার্চ্চ ইনষ্টিট্যুট, ফার্গুসন কলেজ ইত্যাদিতে পুনা অলঙ্কৃত।

অধ্যাপক বেলভালকারের বাড়ির কাছেই মহামতি গোখলে প্রতিষ্ঠিত সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি। বাড়ি হইতে হাঁটিয়াই সেখানে গেলাম। পার্ব্বত্য দৃশ্যমালার নিকট সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে ইঁহাদের বাড়িগুলি। প্রায় সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভারত ভৃত্যদের ত্যাগের ইতিহাস ভারতহিতৈষী মাত্রই জানেন। ইঁহারা আজীবন এই কাজের ব্রত লইয়া সামান্য অর্থে আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন। সম্প্রতি ছাব্বিশ জন সভ্য এখানে ভারত সেবার কার্য্যে নিযুক্ত। বড় বাড়িটির দোতালায় ইঁহাদের লাইব্রেরী। এখানে অনেক অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সঙ্কলনের উপযোগী এত দলিলপত্র এবং পুস্তকাদি আর কোনও লাইব্রেরীতে নাই।

এই লাইব্রেরীতে ভারতের প্রায় সকল সুপরিচিত পত্রিকার পুরাতন ও চলতি সংখ্যার ফাইল আছে।

শ্রীযুক্ত দেবধর এই সভার সভাপতি। ইঁহাদের পরিচালিত ইংরেজী ও ভারতীয় পত্রিকাদি পরিচালন

ইহারা যুক্ত। ইহাদের সভ্যেরা ঐ প্রদেশের অনেক শ্রমজীবী সঙ্ঘ গঠন ও পরিচালন করেন, ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সহিতও ইহারা যুক্ত। পুনা সেবা-সদন, বোম্বাই ভগিনী সমাজ, ভগিনী সেবা সঙ্ঘ, লাহোর সেবা সদন, গুজরাটের ভীল সেবামণ্ডল, অন্ত্যজ সেবামণ্ডল, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও গ্রামের উন্নতি ইত্যাদি নানা রকম কাজ ভারত-ভৃত্য-সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ দেবধর এবং অন্যান্য সভ্যেরা করিয়া থাকেন।

সাতারার রাও বাহাদুর, আর. আর. কালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া এই সমিতির অধীনে Gokhale Institute of Politics and Economics প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রেরা এখানে গবেষণা করিতে পারে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের এম-এ পরীক্ষা দিবার অধিকার আছে। কোনো কোনো ছাত্র সমিতির বাড়িতেই থাকিতে পান। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এখানকার পুস্তকসম্পদে সম্পন্ন লাইব্রেরীটি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে পান। মিঃ ডি, আর গ্যাডগিল ইহার প্রিন্সিপ্যাল। ইনি আমাদের সযত্নে লাইব্রেরী দেখাইলেন।

দেশপূজ্য গোখলে মহাশয়ের আবাসগৃহ এই হাতার ভিতর। দেখিলাম ক্ষুদ্র দুই তিনখানি ঘর ও একটি বারান্দা। বিদেশীয় ও ভারতীয় বহু ভারতহিতৈষীর প্রতিকৃতি গোখলে মহাশয় ঘরের দেয়ালে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও সেইরূপ সাজানো আছে। এই বাড়িতে এখন শ্রীযুক্ত দেবধর কাজকর্ম্ম করেন।

পুনা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ছোট দেশীয় ষ্টেট আছে, তাহার নাম ভোর। ভারত ভৃত্যসমিতি দেখিতে দেখিতে শুনিলাম ভোর হইতে আমাদের লইবার জন্য চীফসাহেব (রাজা) গাড়ী পাঠাইয়াছেন। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, এখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভোর পুনা হইতে অনেকটা উঁচুতে পাহাড়ের উপর একটি সমতলক্ষেত্রে। আমরা একজন রাজকর্ম্মচারী ও অধ্যাপক বেলভালকারের সহিত গাড়ীতে চলিলাম। তাহার চারিপাশের পাহাড়গুলি সুন্দর দেখায়। পথে দলে দলে মেয়েরা বোঝা মাথায় কাজে চলিয়াছে। কুলি মজুর, তবু তাদের শাড়ীগুলি সুন্দর রঙীন, হাঁটাচলা সহজ শ্রীমণ্ডিত। পুনার পথে এক এক জায়গায় এত স্ত্রীলোক চলিয়াছে যে পুরুষ প্রায় চোখেই পড়ে না। পাহাড়ের উপরের পথে অসংখ্য বাঁক, ক্রমাগতই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গাড়ী বাঁশি বাজাইয়া মিনিটে মিনিটে পথিকদের সাবধান করিতে করিতে চলিল। পার্ব্বত্য দৃশ্যগুলি সুন্দর, কোথাও সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, কোথাও ঘন বন জঙ্গল, কোথাও বা ছোট গ্রাম। পাহাড়গুলি খুব উঁচু নয়, কিন্তু অসংখ্য আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার প্রাচীরের মত। অধ্যাপক মহাশয় শিবাজীর যুদ্ধক্ষেত্রের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নানা স্থান দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন। যুদ্ধের উপযুক্ত দেশ বটে, লুকাইয়া থাকিলে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, অকস্মাৎ আক্রমণ করিলে নিস্তার পাওয়াও কঠিন। এক একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট দুর্গের মত এখনও আছে। এই সব দুর্গ দখল করিয়া যে একবার বসিত তাহাকে সহজে কাবু করা যাইত না।

পথে এক জায়গায় একটি পুরাতন মন্দির আছে, বনেশ্বর মহাদেবের। ঘন পত্রবহুল বনানীর মধ্যে মন্দিরটি ভারী সুন্দর মানাইয়াছে, নামটিও ঠিক উপযুক্ত। একটি ছোট ঝরণা ঘিরিয়া মন্দিরটি গঠিত। বাহিরে কোথাও জল দেখা যায় না, কিন্তু মহাদেবের আসনের নীচ দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে পূজারী দেখাইল। এইখানে পথিকেরা পূজা দিয়া যায়। মন্দিরের গঠন বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতির মন্দিরের মত নহে।

সন্ধ্যায় রাজ অতিথিশালায় পৌছিলাম। যুবরাজ অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাদের থাকিবার সব ব্যবস্থা করিবার পর পন্ত সচিব মহাশয় (চীফ সাহেব) দেখা করিয়া গেলেন।

এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যটিতে ১৩০,৪২০ মানুষের বাস। কিন্তু ইহাতে চুয়াল্লটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুইটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

বেশী থাকিলে ভাল হইত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বেতন লাগে না। প্রতি বৎসর এই রাজ্যের চারিটি ছাত্র পুনার কলেজে বিনা বেতনে পড়িতে পায়—এই উদ্দেশ্যে পন্তসচিব মহাশয় ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভোরের পুস্তকালয়ের জন্য ইনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছেন। এই রাজ্যের মোট রাজস্ব (gross revenue) সাত লক্ষ টাকা।

ভোর রাজ্যটি পার্ব্বত্য প্রদেশে, রেল পথ হইতে বহু দূরে। তাই ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শহরের ছায়া পড়িয়া ভেজাল হইয়া উঠে নাই। ভোর সহরটি নীরা নদীর উপত্যকায়। ইহার চারিদিকে ঘনসবুজ বনাকীর্ণ পর্ব্বত-শ্রেণী, ছোট ছোট ঝরণা ও পার্ব্বত্য নদী, বন্ধুর অনুর্ব্বর পর্ব্বতমালা। শীতের সময় নানা ফুলেফলে শস্যে পর্ব্বত-গাত্র বিচিত্র হইয়া উঠে। আমরা শীতের আরম্ভেই গিয়াছিলাম, তাই দেশটির স্বাভাবিক বর্ণসুষমা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙিতেই দেখি কাচের জানালার ভিতর দিয়া বাগানের গাছপালা ও ভোরের স্নিগ্ধ আলো চোখে পড়িতেছে। বাড়িটি মস্ত বাগানের ভিতর, ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত যথাসাধ্য পাশ্চাত্য প্রথায় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শুনা যায় প্রাসাদে এতখানি পাশ্চাত্য ব্যবস্থা নাই।

খানিক পরে যুবরাজ তাঁহার পত্নীকে লইয়া দেখা করিতে আসিলেন। যুবরাণীর বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশভূষার বিশেষ আড়ম্বর নাই। দু-একটি মুক্তার গহনা ভিন্ন রাজবধূর মত আর কোনো মূল্যবান জিনিষ তাঁহার অঙ্গে নাই। ব্যবহার ভারি শান্ত ভদ্র ও নম্র, কিন্তু মহারাষ্ট্র-দুহিতার অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ গতিবিধিতে তাহার রাজশ্রীটুকুও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের মেয়েরা পরস্পরকে দেখিলে পুত্রকন্যা স্বামী পিতা মাতা সকলের কুশলাদির আদান প্রদান করেন, এবং সকলের বিষয় ছোটখাট খোঁজ খবরও লন। যুবরাণী আমার পিতা মাতা ও কন্যাদের খবর লইয়া তাঁহারও দুইটি কন্যা আছে এবং পিতা পুনায় থাকেন বলিলেন। তাহার পর আমাদের আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সখীর মত

সেদিনে ভোরের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করজী নারায়ণের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব ছিল। তাই যুবরাজ ও যুবরাণী আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশ করিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়া গেলেন। কিছু পরে সমাধিস্থানে সকলে মিছিল করিয়া যাইবে। আমরাও দেখিতে যাইব স্থির হইল। সে স্থানটি আরও নয় দশ মাইল দূরে। আমরা ভোর পৌঁছিবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত সেণ্ট নেহাল সিং এবং তাঁহার পত্নীও সেখানে অতিথি হইয়া আসিলেন। বহুকাল পরে তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মোগলেরা মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রায় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলে ছত্রপতি রাজারামের মন্ত্রীস্থানীয় শঙ্করজী নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন যোদ্ধা রাজ্য-রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে শঙ্করজীকে পন্তসচিব নিযুক্ত করিয়া রাজসম্মান ও জায়গীর দেওয়া হয়। পন্তসচিবের স্থান পেশওয়ার পরেই। শঙ্করজী যখন দ্বিতীয়বার শিবাজীর মাতা তারাবাঈ-এর অধীনে সচিবত্ব করিতেছিলেন তখন শিবাজীর পৌত্র সাহু তাঁহাকে তাঁহার দলে যোগ দিতে বলিলেন। শঙ্করজী তারাবাঈ-এর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন, কি প্রভুস্থানীয় সাহুর সঙ্গে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পঞ্চগঙ্গাতীর্থের নিকট একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের তলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মিথ্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। ইহাতে সাহু ও তারাবাঈ উভয়েই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শঙ্করজীর বংশধরগণ তখন হইতে সেই জায়গীর ভোগ করিয়া ও পন্তসচিব পদবী ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই ইতিহাস ভোররাজ্যের একটি মুদ্রিত পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত।

মোটরে করিয়া পর্ব্বতগাত্রের শস্যক্ষেত্র, গ্রাম, ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী, দূরের পর্ব্বতমালা ও ঘন বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমরা পঞ্চগঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম। এক জায়গায় ঝরণার জল সজোরে পড়িয়া নদীর মত বহিয়া চলিয়াছে। সেখানে গাড়ী চলে না। নামিয়া পাথরের উপর পাতা তক্তা দিয়া চলিলাম। একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় সমাধিমন্দির, তাহার কিছুদূরে পঞ্চগঙ্গার

ভিড়। সাধারণ লোক ছাড়া যুবরাজ যুবরাণী, ছোট তিনটি রাজকুমার ও কুমারী এবং যুবরাজের দুই শিশুকন্যা সকলে তীর্থস্থানে স্নানাদি করিয়া পূজা দিতে আসিয়াছেন। মন্দিরটি দেখিয়া বেশ প্রাচীন মনে হইল। তাহার পাশে সম্ভবত বহু প্রাচীন আর একটি মন্দির ছিল, এখন তাহার দেবমূর্তিখোদিত পাথরগুলি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। কোনোটি সিড়ির ধাপ, কোনোটি পাঁচিলের অংশ, কোনোটি পথিকের বিশ্রামের আসন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেলভালকার কুলির সাহায্যে এইরূপ একটি সুন্দর পাথরকে উদ্ধার করিয়া মন্দিরের কাছে রাখিলেন।

আজ স্নান পূজা ও দর্শনের খুব ভিড়। সকলে উৎসব-সজ্জায় সাজিয়াছে। হরিদ্রা ও কমলা রঙের রেশম বস্ত্রের উপর রোদ লাগিয়া বনশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এক জায়গায় ভূমি-আসনে সারি সারি মানুষ পাতা পাতিয়া খাইতে বসিয়াছে। রাজ-অতিথিদের জন্য তাঁবু খাটানো ও চায়ের ব্যবস্থা ইহারই মধ্যে কোনো রকমে করা হইল, যদিও তাহার প্রয়োজন ছিল না। সেণ্ট নেহাল সিংহ মহাশয় মন্দির, কুণ্ড ও যাত্রীদের কয়েকখানি ছবি তুলিলেন। যুবরাণীর এবং আমাদেরও মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া ছবি তোলা হইল। সমাধিস্থানটির অনেক নীচে পঞ্চগঙ্গাতীর্থ। তীর্থ দেখিয়া আমরা আবার অতিথিশালায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে শহরের ভিতর দিয়া গেলাম। ভিতরের পথগুলি গলির মত সরু সরু। এখানে বৈদ্যুতিক আলো এবং জল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা আছে শুনিলাম।

ভোরের দুই তিন মাইল দূরে Lloyd Dam নামক একটি প্রকাণ্ড বাঁধ আছে। নীরা প্রভৃতি দুই তিনটি নদীর জলকে বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া জল সরবরাহের জন্য একটি বিরাট হ্রদ করা হইয়াছে। আমরা বাঁধটি দেখিতে গিয়া লোহার শিক, কাঠের টুকরা প্রভৃতির অতি ক্ষণভঙ্গুর সেতু পার হইয়া কোনো রকমে বাঁধের কাছাকাছি আসিলাম। সেই সেতু হইতে জলে পড়িতে বেশী অসাবধান হইতে হয় না। বাঁধটি পাহাড়ের মত উঁচু, ঘাড় ফিরাইয়া উপর পর্য্যন্ত দেখা শক্ত। তাহার গা বাহিয়া অল্প অল্প জল ঝরিতেছে, উপরে ছোট রেল লাইন আছে। পাদদেশে রাজি হইলেন না। সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া বিশ্রাম আরম্ভ করিলেন। অগত্যা এতদূর আসিয়া হ্রদ দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম পৃথিবীতে এত বড় বাঁধ বেশী নাই। ইহা সেখানকার লোকদের মত।

আজ সন্ধ্যায় রাজদরবার। এখানে চারণদের গান, শঙ্করজীর কথা, বক্তৃতা ইত্যাদি হইবে। পুনা হইতে বহু গণ্যমান্য ঐতিহাসিক ইত্যাদি আসিয়াছেন। আমার সভায় যাইতে একটু দেরী হইয়াছিল। দ্বিতলে অন্তঃপুরের ভিতর দিয়া চলিলাম। বড় বড় হলের পর হল। একটি প্রকাণ্ড ঘরে পেশোয়া রীতিতে সারি সারি কালো কাঠের কারুকার্য্যখচিত থাম, তাহার গায়ে পন্থ সচিবদের এবং ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধিদের চিত্র। সেগুলি পার হইয়া বধূরাণীর মহলের নিকট গেলাম। বাঙালী মহিলাকে দেখিয়া অন্তঃপুরিকাদের ভিড় লাগিয়া গেল, ছোট ছোট বারান্দা, জানালা, দরজা সর্ব্বত্র মানুষের মুখ। বধূরাণী তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবার আগেই বিদায় করিয়া দিলেন। এই মহলে ছোট একটি বারান্দায় লেসের পরদার আড়ালে আমাদের বসিবার জায়গা। মিসেস্ সিংকেও এইখানে বসানো হইল। যুবরাণী মাথায় ঘোমটা দেন না এবং এদেশে পর্দ্দা-প্রথা নাই, তবু বোধ হয় রাজসম্মানের জন্য বারান্দায় পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছিল। নীচে প্রকাণ্ড দরবারপ্রাঙ্গণে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে সভা বসিয়াছে। মাটির উপর গদিও জরির আস্তরণ পাতিয়া চীফ সাহেব ও তাঁহার তিন পুত্র, পাশেই বিদেশীয় অতিথিরা। সভাস্থ কাহারও উচ্চাসন নাই, ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। দুই চারিজন অধ্যাপক পণ্ডিত ছাড়া সকলের মাথায় রঙীন মারাঠা জরিদার টুপি। টুপিগুলি বেশীর ভাগ লাল ও জরি দিয়া তৈয়ারী, দুই চারিটা হলুদ কি কমলা রঙের আছে। বেশভূষা অনেকের দীনজনোচিত, তবু তাহার উপর উজ্জ্বল লাল ও জরি দেওয়া টুপি পরায় সভাস্থ সকলেরই প্রায় শিরোভূষণ রাজোচিত দেখাইতেছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সকলেরই এক পোষাক। রাজপরিবারের সকলের মাথায় বড় বড় পাগ্ড়ি। সভার কাজ বেশ হইল।

সম্ভাষণাদির পর যুবরাণী সোনার থালায় সোনার হংস-গর্ভ কৌটায় সিন্দুর এবং অন্য স্বর্ণ পাত্রে চন্দন, ঘি, পান সুপারি মশলা ও সুগন্ধি ফুল দিয়া বরণ করার মত করিয়া আমাকে শুভ ইচ্ছা জানাইলেন, চন্দন সিন্দুর পরাইয়া হাতে একটি জরির চেলির কাপড় দিলেন, আতর দানে করিয়া আতর ছিটাইয়া দিলেন। এই দেশীয় প্রথাটি মনোরম লাগিল। সকল অতিথিকেই মশলা ও সুগন্ধি ফুল দেওয়া হইল। তারপর বাগানে আমাদের অনেক-গুলি ছবি তোলা হইল।

দ্বিপ্রহরে পুনায় আসিয়া বেলভালকার মহাশয়ের বাড়ি আহারাদি হইল। পুরণপুরী নামক পুর দেওয়া লুচি আশ্চর্য্য সুস্বাদু।

তারপর বাজারে শাড়ী, গহনা, খেলনা ইত্যাদির দোকান দেখিতে গেলাম। দোকানগুলি সাদাসিধা, এখানে সব শাড়ীই সুন্দর রঙীন এবং আঠারো হাত লম্বা। শাড়ীর দাম খুব সস্তা, গহনা বেশীর ভাগ বিলাতী ধরণের, কিছু কিছু দেশীও আছে। শাড়ীগুলি একেবারে স্বদেশী রীতির। দেশী খেলনা সবই প্রায় কাশীর।

পথে শিবাজীর প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধ দেখিলাম, বাগানের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে শিবাজীর সুন্দর মূর্ত্তি।

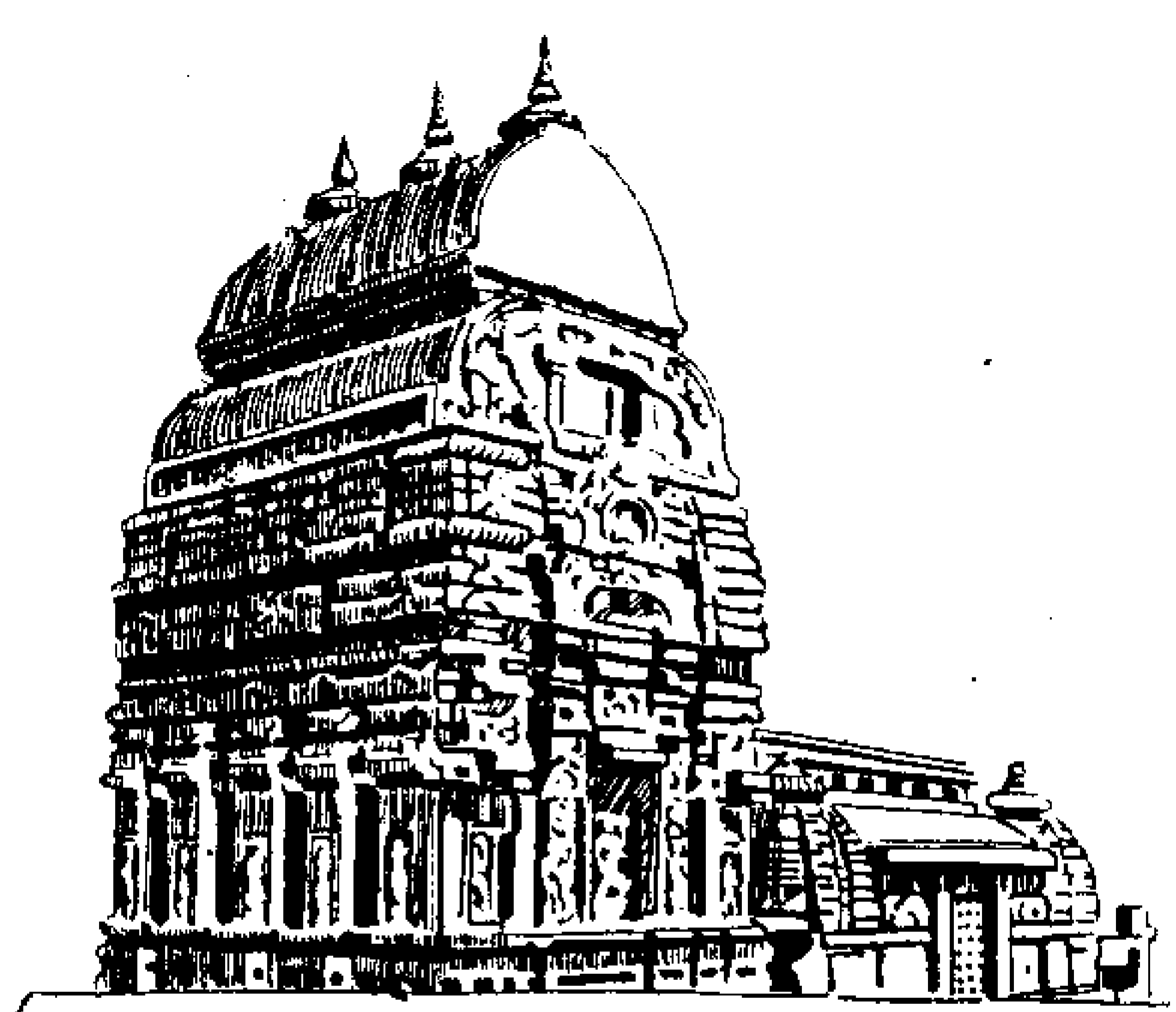
সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিদায় লইয়া বোম্বাই ফিরিতে হইবে। অধ্যাপক-গৃহিণীও দেশীয় প্রথায় সিন্দুর চন্দন বস্ত্রাদি উপহার দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

বৈদ্যুতিক ট্রেনে বোম্বাই চলিলাম। পুনা হইতে বোম্বাইয়ের পথ আশ্চর্য্য সুন্দর। পাহাড়ের ভিতর দিয়া কত বিরাট গম্ভীর অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। উন্নত গম্ভীর পর্ব্বতশিখরের পিছনে সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িল, আঁধারে আলোয় কোলাকুলি। অনেক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা বলেন, বোম্বে পুনার মধ্যবর্ত্তী পথের মত সুমহান পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য জগতে কোথাও দেখা যায় না। নিবিড় অন্ধকারের স্তূপের মত পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে যখন বহু দূরব্যাপী উদার আকাশের স্বচ্ছতা দেখা যায় তখন সে আশ্চর্য্য রূপের বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না।

ট্রেন ঝড়ের মত ছুটিতে লাগিল, স্থির হইয়া বসা যায় না। পাহাড়গুলির ভিতর এত সুড়ঙ্গ যে একটা দৃশ্য দেখিয়া শেষ করিতে না করিতে আর একটা সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িতে হয়।

আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি পার্শী সহযাত্রী ছিলেন। অনেকগুলি মেয়েই আশ্চর্য্য সুন্দরী। বাঙালীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের বড়ই অভাব।

এদিককার সব মন্দিরই পঞ্চগঙ্গার মন্দিরের মত দেখিতে। বোধ হয় পেশোয়ারীতিতে এইরূপ মন্দির হইত। রাত্রি ৯টায় বোম্বাই ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। আঠার দিনের পক্ষে ভারত ভ্রমণ নিতান্ত কম হয় নাই। অবশ্য দেখা খুবই ভাসা ভাসা হইল।



জৈন জল-মন্দির

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থাপত্যের ঐতিহাসিক ফাগু সন্ লিখিয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে গোবর্দ্ধনে একটি মন্দির-নির্ম্মাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই মন্দিরের ভারতীয় স্থপতির নিকট মধ্যযুগের শিল্প সম্বন্ধে যত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন, নানা (য়ুরোপীয়) পুস্তক পাঠ করিয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই। এদেশে ইংরেজশাসন প্রবর্ত্তনাবধি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সহ্য করিয়াও যে ভারতীয় স্থপতিবিদ্যা তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার মৌলিকতা ও সজীবতা এবং জাতির সভ্যতার সহিত তাহার স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই তাহার কারণ।

বিহারে পাওয়াপুরীতে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমাধিস্থানে সংস্কৃত জল-মন্দির দেখিলেও ইহাই মনে হয়। বারাণসীতে যেমন নদীর জলকূল হইতে ভিত্তি নির্ম্মিত করিয়া সৌধ নির্ম্মিত, তেমনই ভারতের নানা স্থানে কৃত্রিম জলাশয়-মধ্যে মন্দির বা সমাধিসৌধাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে অমৃতসরের শিখ মন্দির, উদয়পুরের প্রাসাদ ও সাসারামে শের শাহের সমাধি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতঃপর পাওয়াপুরীর জল-মন্দিরও যে সেইরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে জৈনধর্ম্মমতাবলম্বীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও ভারতের দর্শনে ও শিল্পে জৈন-প্রভাব বড় অল্প নহে। এক সময় এই ধর্ম্মমত বৌদ্ধমতের উপর প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করিয়াছিল এবং জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

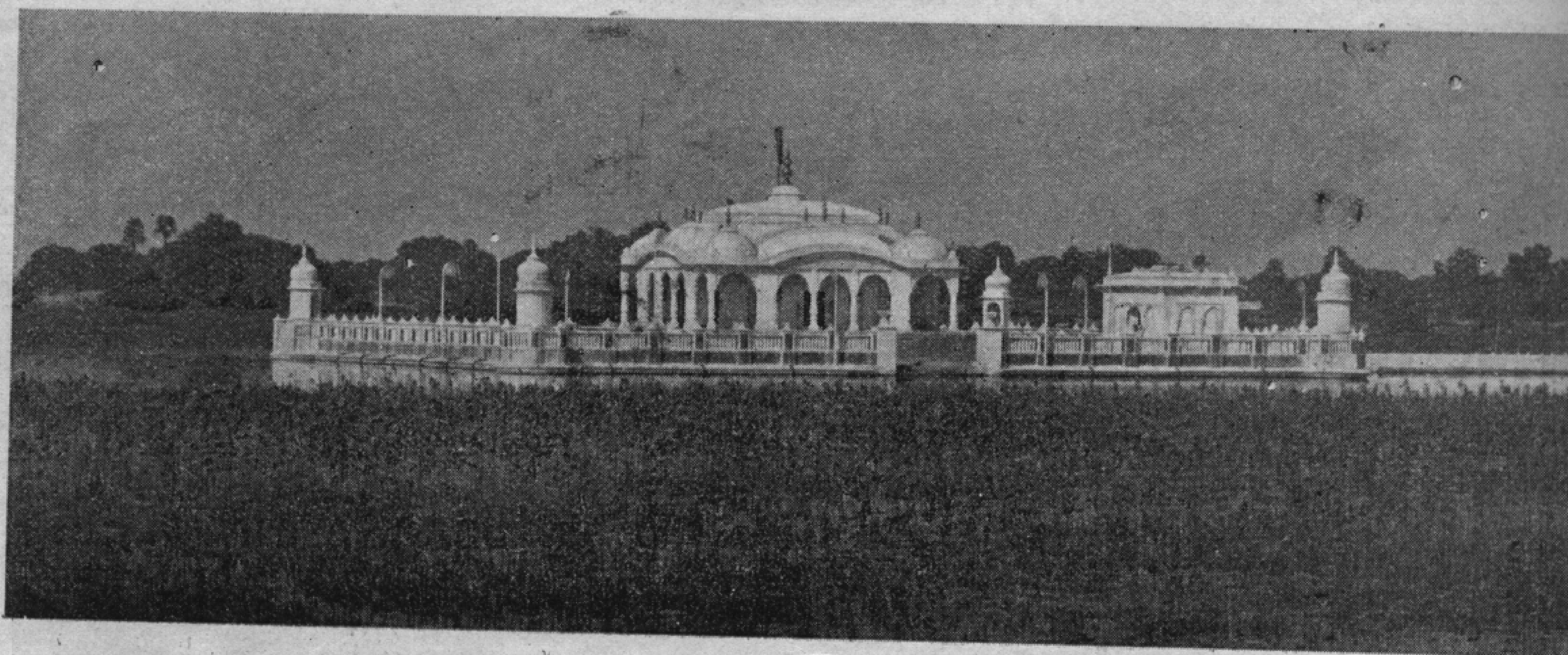
পাওয়াপুরীতে তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন এবং যে স্থানে জল-মন্দির প্রতিষ্ঠিত তথায় তাঁহার দেহ ভস্মাবশেষ হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতে জৈনদিগের তীর্থস্থানের সংখ্যা অল্প নহে। ইলোরায় ও ভুবনেশ্বরের নিকটে হিন্দু ও বুদ্ধ গুহামন্দিরের সঙ্গে জৈনদিগের গুহামন্দির বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন গোয়ালিয়রে, 'পরেশনাথে' ও অন্যান্য স্থানে জৈনদিগের কারুকার্য্যবহুল মন্দির আছে।



শ্রীযুক্ত পুনামচাঁদ শেঠিয়া

রাজপুতানায় আবুপর্ব্বতে ও পলিতানায় শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে মন্দিরগুলির অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য্য দর্শকের বিস্ময়



জৈন জল-মন্দির

আকৃষ্ট করে। বহু শিল্পসমালোচক এই সকল মন্দিরে প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আবু পর্ব্বতের মন্দির সম্বন্ধে লর্ড রোণাল্ডশে বলিয়াছেন, "মন্দিরের প্রস্তরগাত্রে খোদিত কারুকার্য্য দেখিলে স্বতঃই ভারতীয় কাননের লতাবেষ্টিত তরুকাণ্ড ও পত্ররচিত চন্দ্রাতপের কথা মনে হয়।"

পলিতানায় শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের জৈনমন্দিরগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ফার্গুসন্‌ লিখিয়াছিলেন—এক এক স্থানে বহু মন্দির নির্ম্মাণে জৈনগণ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিয়াছেন।

উত্তর-ভারতে জৈনতীর্থগুলির মধ্যে পাওয়াপুরী বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও এবং প্রতি বৎসর সর্ব্ব-সময়ে—বিশেষ দীপালীর সময় তথায় সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইলেও পাওয়াপুরীর মন্দির এতদিন শিল্পপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। তাহার কারণ, তথায় যে পুরাতন মন্দির ছিল, তাহার অবস্থান-স্থান সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইলেও মন্দিরটির শিল্পকার্য্য মনোরম ছিল না।

মহাবীরের জীবনান্ত-স্থান বলিয়া এই গ্রামটি অপাপপুরী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে তাহাই পাওয়া বা পাওয়াপুরী নামে পরিচিত। গ্রামের প্রান্তে সমবাহু চতুর্ভুজের আকারে কৃত্রিম হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে এক মাইলের প্রায় এক-চতুর্থভাগ। তাহারই মধ্যভাগে একশত চার বর্গ-ফিট দ্বীপের উপর মন্দির। ইহা জল-মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তর দিক হইতে সেতুপথে দ্বীপে গমন করা যায়।

হ্রদের জলে দলে দলে মৎস্য বিচরণ করে। জৈনরা জীবনাশের বিরোধী। যখন হ্রদের জলে কোন মৎস্য মরিয়া যায়, তখন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া কূলে সমাহিত করা হয়।

জৈন ইতিহাসে দেখা যায়, মহাবীর ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেন। দ্বীপে প্রথমে যে মন্দির ছিল, তাহা ক্ষুদ্র। জৈন কিংবদন্তী এই যে, মহাবীরের জীবনান্তের পাঁচ বৎসর পরে ইহা নন্দীবর্দ্ধন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নালন্দায় যে-সব পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, পাওয়া-পুরীর পুরাতন মন্দির সেইরূপ ইষ্টকে রচিত।

এই পুরাতন মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরে দুইখানি চরণচিহ্ন খোদিত আছে। প্রস্তর-ফলক মন্দির-প্রাচীরে নিবদ্ধ। মন্দিরটি শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের দ্বারা রচিত; কিন্তু ইহাকে দিগম্বর সম্প্রদায়েরও পূজা করিবার অধিকার আছে। সেই অধিকার লইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পাটনা আদালতে মামলা আরম্ভ হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাহা শেষ হয়।

প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠগণ পুরাতন মন্দিরে নূতন অংশ যোগ করিয়াছিলেন।

যদি হিন্দুদিগের কোন মন্দির বা মুসলমানদিগের কোন মস্‌জিদ সংস্কারাভাবে জীর্ণ হয়, তবে আর কেহ তাহার

সংস্কারসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করেন না; পরন্তু তাহার উপকরণ লইয়া মন্দির বা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এ বিষয়ে জৈনগণ খৃষ্টানদিগের প্রথাবলম্বী—কোন জৈন যদি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে না পারেন, তিনি পুরাতন মন্দির-সংস্কার পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

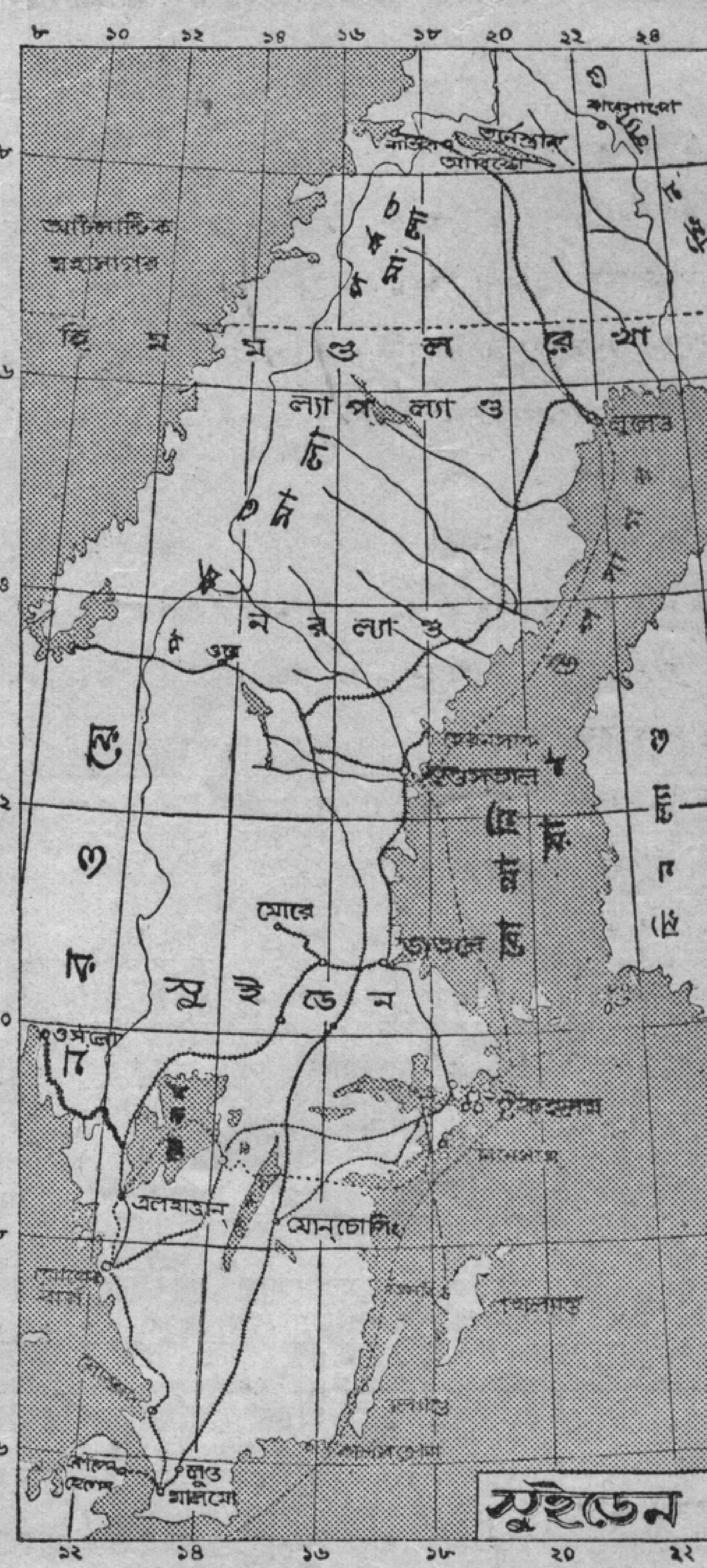
কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত পুনামচাঁদ শেঠিয়াও তাহাই করিয়াছেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া জল-মন্দির মর্ম্মরাস্তৃত করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যে ভারতীয় মর্ম্মর প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। হ্রদমধ্যে অবস্থিত অমল ধবল মর্ম্মরাস্তৃত এই মন্দির এখন শিল্পকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে অন্যান্য জৈন মন্দিরেরই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

সুইডেন

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান সুইডেন শিক্ষা ও সভ্যতায় আজ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সুইডেনবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস নানা যুদ্ধবিগ্রহ ও বীরত্বকাহিনীতে পূর্ণ। এক সময় তাহাদের প্রতাপে সমস্ত ইউরোপবাসী ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। কিন্তু সেই সুইডেনবাসী গত এক শত বৎসরের উপর অর্থাৎ ১৮১৪ সনের পর হইতে আর কোনও যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করে নাই। ইহার ফলে সুইডেনবাসীদের সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক দিক খুব একটা স্বাভাবিক ক্রমঅনুযায়ী গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং এই কারণেই বোধ হয় সুইডেন আজ অনেক বিষয়েই খুব অগ্রণী। এই দেশটি আয়তনে ইউরোপের অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা বড় হইলেও ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ষাট লক্ষের কিছু বেশী।

বর্ত্তমানে আমরা যে-সুইডেন দেখিতেছি ইহা বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা—এক কথায় মানবসভ্যতার সকল ক্ষেত্রেই অনেক প্রতিষ্ঠাবান মনীষী ও কৃতী সন্তানের জন্মদান করিয়াছে। তাহা ছাড়া শান্তি-আন্দোলনেও সুইডেনের আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যখনই অন্য কোন দেশের সঙ্গে কোনো প্রকার স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে তখনই সুইডেন সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া অন্য উপায়ে তাহার মীমাংসার পথ খুঁজিয়াছে। ১৯০৫ সনে সুইডেন এবং নরওয়ের মধ্যে যে-কলহের সৃষ্টি হয় বিনা রক্তপাতে তাহার মীমাংসা হইয়াছিল;



সুইডেনের মানচিত্র

এই জাতীয় অন্য ঘটনার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনেকেই ডিনামাইটের আবিষ্কার-কর্ত্তা সুইডেনবাসী নোবেল সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি-আন্দোলনে অগ্রণী ও প্রতিষ্ঠাবান লোকদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতি বৎসর সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে মহামতি নোবেল স্বীয় ধন সম্পত্তি উইল করিয়া রাখিয়া যান এবং ইহাই নবেল প্রাইজ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিচিত।



সেফটি ম্যাচের আবিষ্কারক ও দেশলাইয়ের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা লুণ্ডষ্ট্রম্



সুইডেনের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় আগষ্ট ষ্ট্রিন বের্গের প্রতিমূর্ত্তি

সুইডেন দেশটি তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিবার ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। ইউরোপের অন্য দেশবাসীদের তুলনায় যে সেখানকার জনসাধারণ অধিক পরিমাণে উন্নত ও সুখী একথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা চলে। যে-সব বিদেশী অন্য দেশ ও জাতির সম্বন্ধে জানিবার অনুসন্ধিৎসা লইয়া একবার সুইডেনে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তথাকার অধিবাসী-দের আন্তরিকতা, সততা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক বিভেদ নাই বলিলেও চলে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের কাছেই সমান ভাবে খোলা ও অবৈতনিক। জনতন্ত্র সেখানে নামে না থাকিলেও কার্য্যতঃ সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই গরিবদের যে অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ি দৃষ্ট হয় সুইডেনে তাহা মোটেই নাই। লৌহ, তামা, গাছপালা, পাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ সে দেশে যথেষ্ট পরিমাণ আছে বটে, কিন্তু সকলকেই যথেষ্ট খাটিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সেখানে জীবনযাত্রায় শীতের কঠোরতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সুইডেনের অধীনে অন্য কোনো দেশ বা উপনিবেশ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদে এবং একমাত্র দেশবাসীরই

কর্ম্মনিপুণতায় সুইডেন বর্ত্তমান শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইউরোপের অন্য দেশ ভ্রমণ করিবার কালে প্রায় সর্ব্বত্রই আমাকে নিজের জিনিষপত্র যাহাতে হারানো বা চুরি না-যায় সেজন্য সতর্ক থাকিতে হইত। সুইডেন

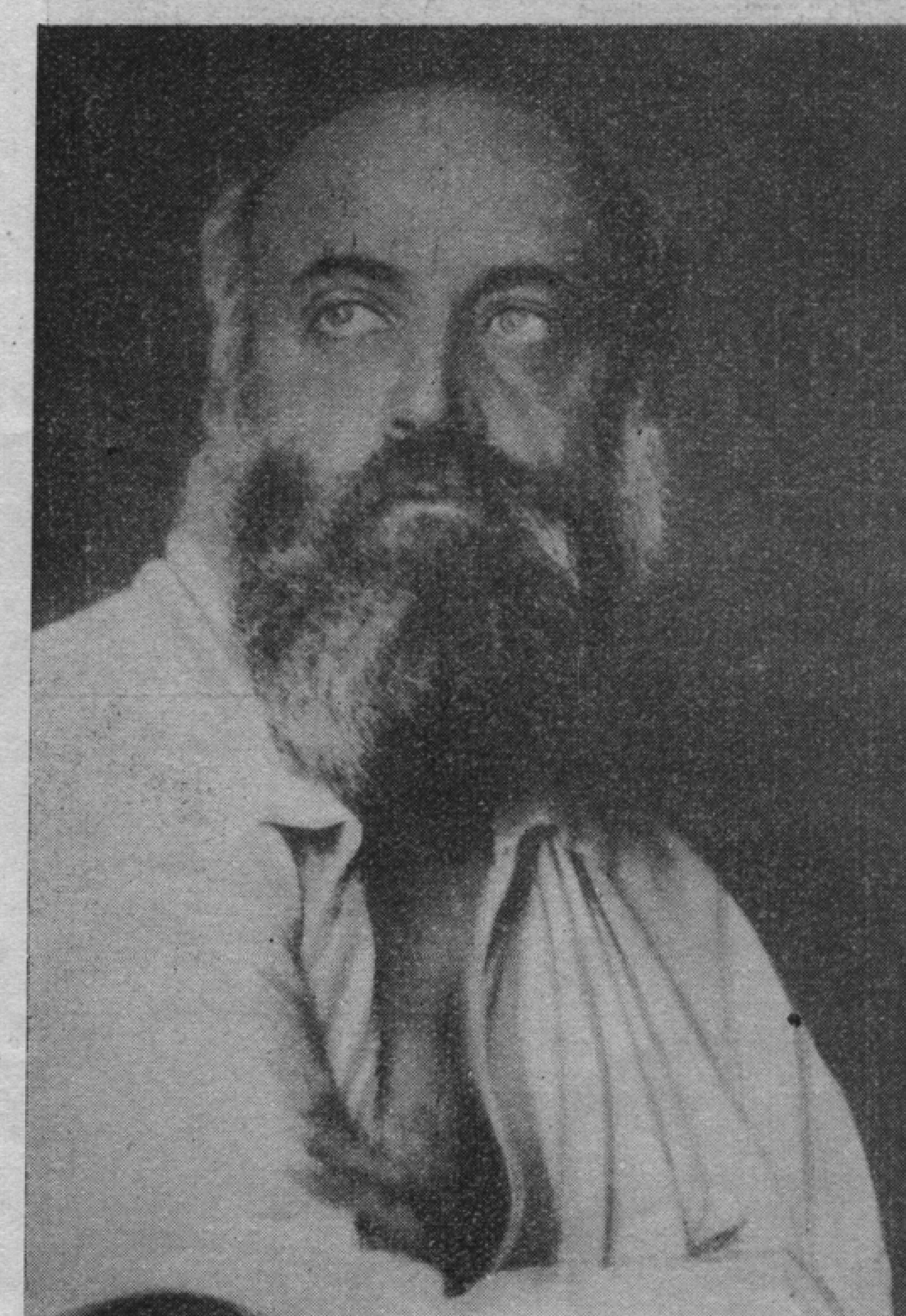


সুইডেনের বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা সেলমা লাগেরলফ।
ইনিও নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন

দেশটিতে আমি অল্পাধিক প্রায় বারো হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু নিজের অসাবধানতায় জিনিষপত্র হারাইয়াও অনেকবার ফেরত পাইয়াছি। ঘোরাফেরার সময়েও বাক্সে কোন দিন চাবি না দিয়াই জিনিষপত্র "বুক" করিয়াছি, কোন সময়েই বাক্সে চাবি দেওয়ার কারণ ঘটে নাই। সুইডেনবাসীদের নৈতিকজীবন যে কত উন্নত সে-সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিন বৎসরের মধ্যে কোনদিনই উল্লেখযোগ্য মারাত্মক অপরাধমূলক কোনো ব্যাপার ঘটিতে শুনি নাই। কি কারণে সুইডেন বিবদমান প্রতিবেশীদের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে,—তাহার উত্তর পাইতে হইলে এই দেশের ও জাতির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান উপদ্বীপের পশ্চিমভাগে নরওয়ে; উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগের কতক অংশ ফিন্‌ল্যাণ্ড ও কতক বোথানিয়ান্ উপসাগর; এতদুভয়ের মধ্যে সুইডেন অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বাল্টিক সাগর দ্বারা বিধৌত। উত্তর দিকের কতকটা অংশ হিম-মণ্ডল রেখার ভিতর পড়িয়াছে।

দেশটি আকৃতিতে মোটামুটি চতুষ্কোণ। উত্তর-দক্ষিণে ১,১০০ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে



সুইডেনের কবি স্বর্গীয় গুস্তাভ ফ্রয়োডিং। সেলমা এবং অন্য অনেক খ্যাতনামা সুইডেনবাসীর ন্যায় তিনিও ভ্যার্মল্যাণ্ড প্রদেশের লোক

বড় জোর ৩০০ মাইল প্রশস্ত। অর্থাৎ দেশটি আয়তনে গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড হইতে দেড়গুণ বড়। ইউরোপের ৪.৭ অংশ সুইডেনের ভাগে পড়িয়াছে।

গ্রীনিউজের হিসাবে ইহার ভৌগোলিক অবস্থিতি এইরূপ,—দেশটি ৫৫°২০´ হইতে ৬৯°৪´ অক্ষরেখা এবং ১০°৫৮´ হইতে ২৪°১০´ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। প্রায়



নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সুইডেনের প্রসিদ্ধ কারলিনা গ্রন্থের লেখক স্বর্গীয় হাইডেনষ্টাম্‌

সমস্ত দেশটিই পাহাড় পর্ব্বত এবং পাথরে আবৃত। এই দেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবরণ-পাঠে জানা যায়, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান্‌ উপদ্বীপ ও ফিনল্যাণ্ডের প্রথম ভূমিখণ্ড বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম আগ্নেয়গিরির উদ্গার সংজনিত এবং তুষার চাপা ভূমির সঙ্গে সুইডেনের প্রস্তরময় ভূমির সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। এই প্রস্তরের মধ্যে Gneiss Granulites-এর সংখ্যা খুব বেশী। কেম্ব্রিয়ান-সিল্যুরিয়ান্‌ যুগে বর্ত্তমান ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ সমুদ্রের নীচে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ঐ সব ভাগ কালে জলের উপর উঠিয়া যায়। ইহার ফলে সুইডেনের যে-অংশ সমুদ্রের নীচে ছিল সেই ভূমির ভাগ আজ খুব উর্ব্বরা। এই ভাবে সর্ব্বপ্রথমে দেশটি ক্রমশঃ আকার ধারণ করিতে থাকে। সিল্যুরিয়ান্‌ যুগের পরে পশ্চিম স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান্‌ পর্ব্বত-প্রদেশের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত পর্ব্বতমালা উত্তর-পশ্চিম দিকের প্রায় ৬০ মাইল চওড়া স্থান জুড়িয়া সুইডেন ও নরওয়ের মাঝখানে সীমান্ত প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া আছে।

বাল্‌টিক সাগরের জলপ্রদেশ এবং সুইডেনের অনেক জলভাগ,—মধ্য সুইডেনের বৃহৎ হ্রদগুলি এক সময় একত্র সংযোজিত ছিল। এ কথা মনে করিতে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, সেই অতীত যুগে দেশটি গ্রীষ্মপ্রধান ছিল।



অধ্যাপক স্বোয়েদবের্গ রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন

তারপরে কোন এক অজানা কারণে সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপ দ্রুত কমিয়া শীতল হইতে থাকে; ফলে কয়েক শত বৎসরের জন্য দেশটি একেবারে তুষারাবৃত

হইয়া যায়। সেই যুগকে 'তুষার-যুগ' বলা হইয়া থাকে। এই বিপুল তুষার-পর্ব্বত সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, রাশিয়ার অংশ-বিশেষ, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উপর এই তুষার-পর্ব্বত আনুমানিক ৩,২০০ ফিট পুরু হইয়াছিল। কিন্তু এই বরফের পাহাড়ও পরে গলিতে থাকে। ফলে, ৫০০০ পূর্ব্ব হইতে ১৫০০০ বৎসরের মধ্যে বরফ উত্তর দিকে পর্ব্বতমালাকারে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং পিছনে বড় বড় পাথরের সমষ্টি (moraine) রাখিয়া যায়। এই বরফ গলিয়া নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সুইডেনের অনেক ভূমির অংশ এক দক্ষিণ ভাগ ছাড়া সমুদ্রের নীচে নামিয়া পড়ে।

উত্তর-পশ্চিমের পর্ব্বতমালা হইতে বোথানিয়ান্ উপসাগর পর্য্যন্ত ভূমি ক্রমশঃ ঢালুভাবে নামিয়া আসিয়াছে। সেই প্রদেশের এখানে-ওখানে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই পাহাড়শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশিখর প্রায় ৭০০ ফিট উঁচু। উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালা হইতে অনেকগুলি ছোটবড় নদী ঐ প্রদেশকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া



নোবেল একেডেমির সেক্রেটারী ও কবি কার্লফেল্ড। মৃত্যুর অল্পদিন পরে এই বৎসর তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে। মৃত কবিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া এই প্রথম



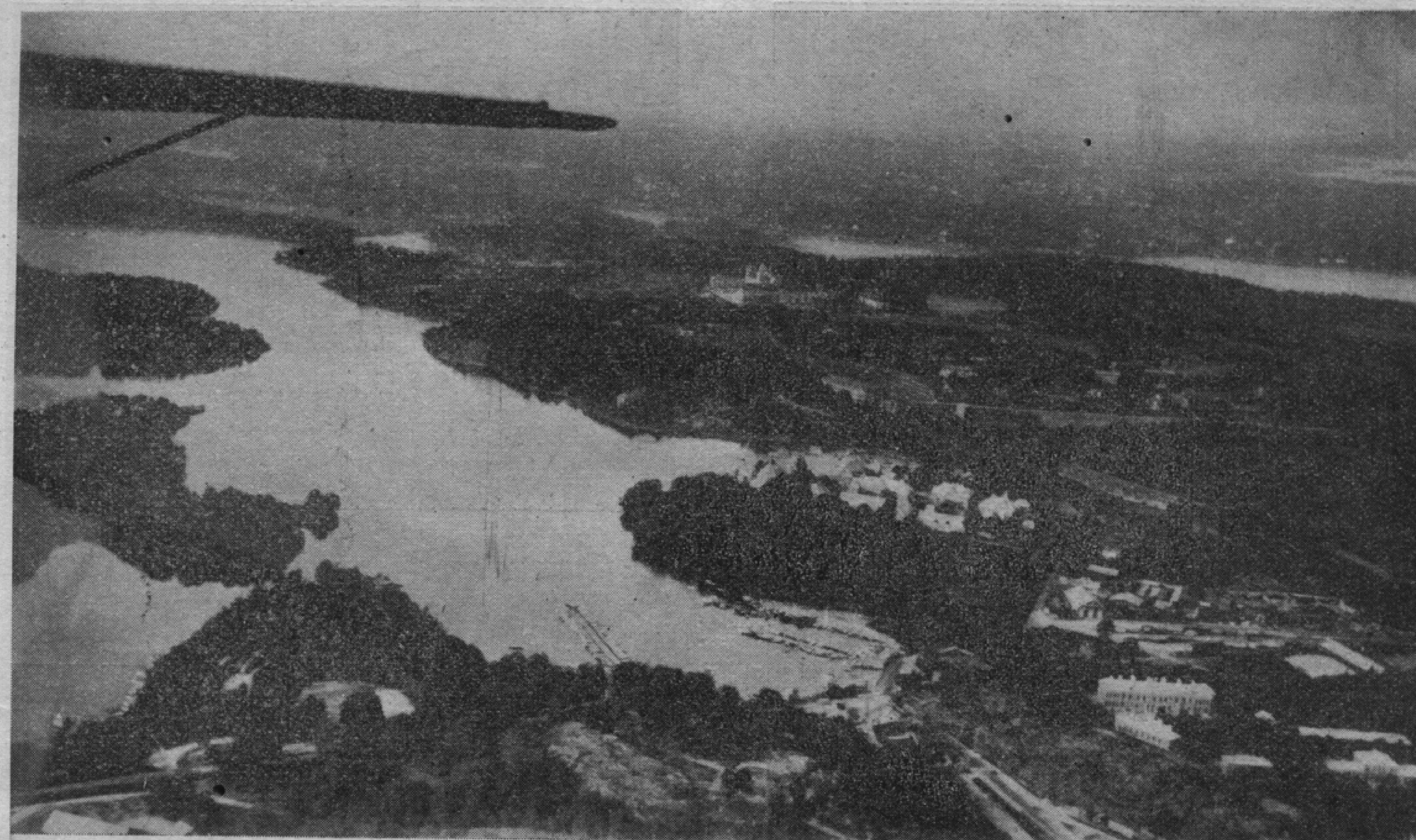
সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টক্‌হল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যানের এক অংশ



এরোপ্লেন হইতে তোলা ষ্টক্‌হল্‌মের দৃশ্য। মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদ



ষ্টক্‌হল্‌মের টাউন হল। স্থপতি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া নির্ম্মাণ সৌষ্ঠবের জন্য ইহা ইউরোপে বিশেষ বিখ্যাত



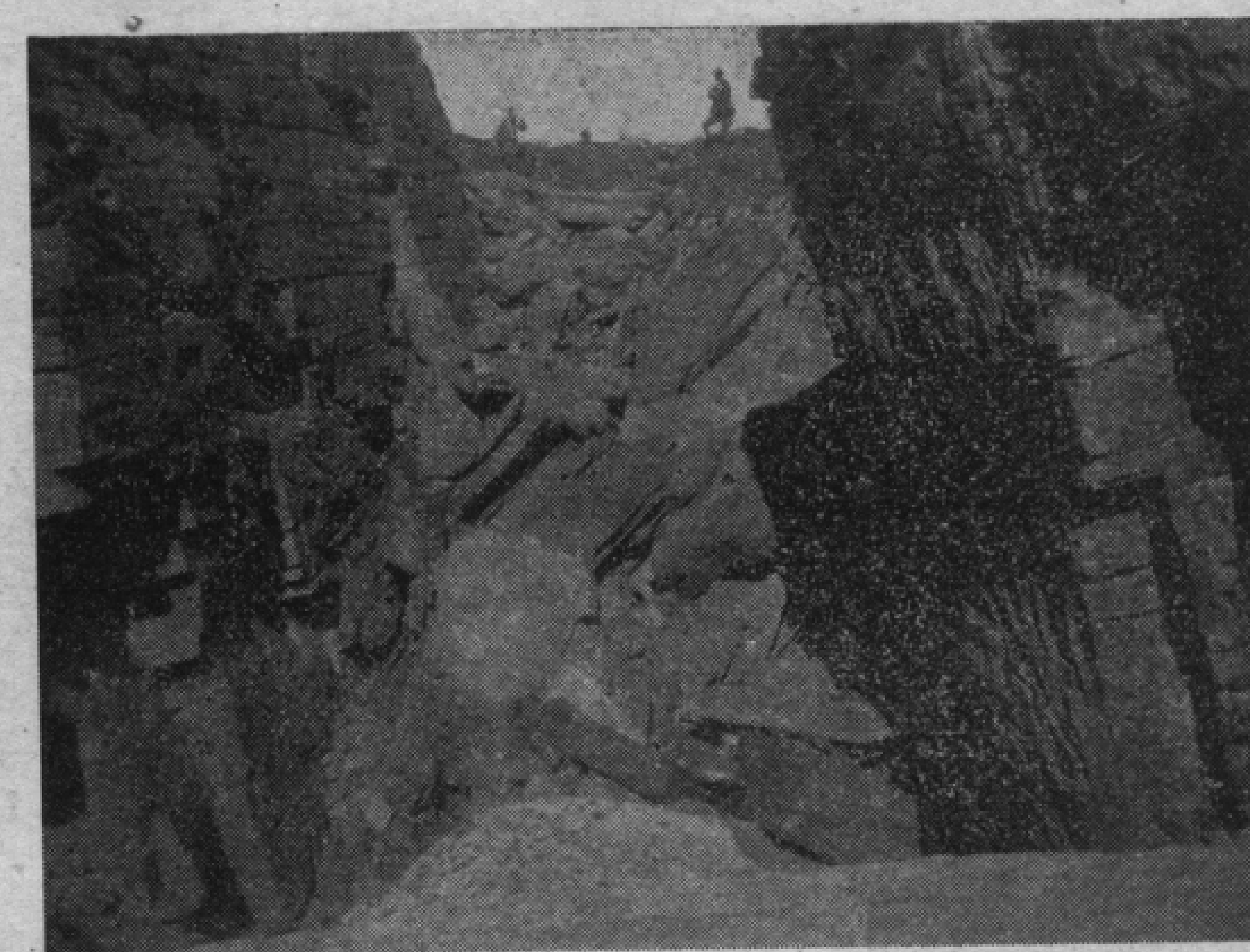
ষ্টক্‌হল্‌মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান



ষ্টক্‌হল্‌মের নৈশ-দৃশ্য



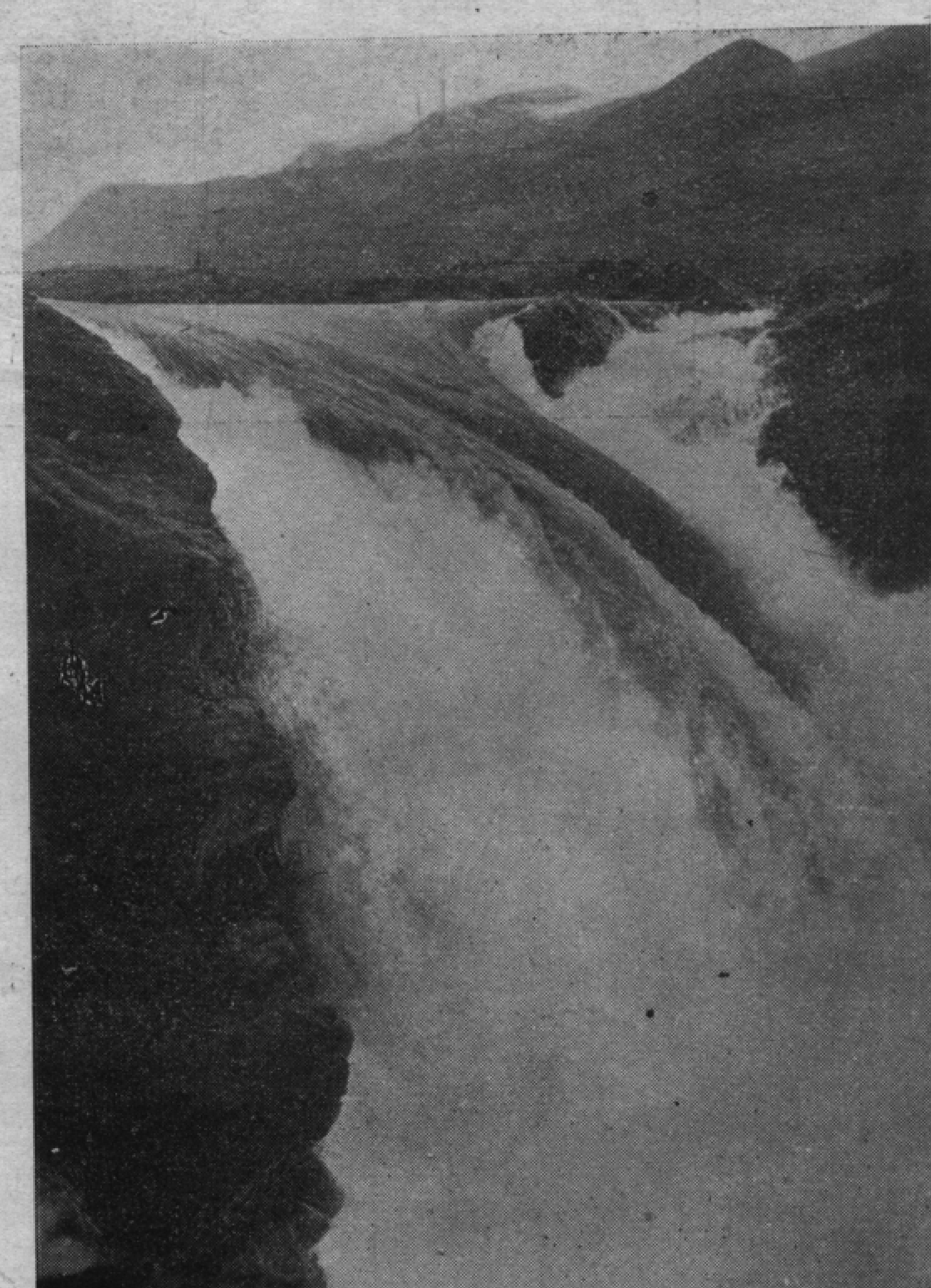
স্যুইডেনের উত্তরে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত পর্ব্বত 'কেব্‌নেকাইসের শিখর ভাগ। এখানে তুষারমালা এখনও বিরাজ করিতেছে



বিখ্যাত 'যম প্রপাত'। তুষার-যুগের পর পাথরের পর্ব্বত এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে



তব্‌নে ট্রাঙ্কের নিকটবর্ত্তী তুষারমালা



উত্তর প্রদেশের বৃহৎ জলপ্রপাত স্তোরা সোফালেৎ

বোথানিয়ান্‌ উপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। বোথানিয়ান্‌ উপসাগরের তীরভাগ কতকটা সমতল এবং নীচু। স্যুইডেন শীতপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই উপকূলভাগ স্যাঁৎসেঁতে বলিয়া যথেষ্ট মশার উপদ্রব হয়। ঐ প্রদেশে গ্রীষ্মকালে ঘুরিবার সময় এরূপ মশার কামড় সর্ব্বপ্রথমে খুব আশ্চর্য্যজনক মনে হইয়াছিল। কিন্তু চামড়ার উপর ক্ষত করা ভিন্ন ঐ জাতীয় মশার কামড়ে অন্য কোনো রোগ জন্মায় না। স্যুইডেনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত "কেব্‌নেকাইসে" (Kebnekaise) উত্তর দিকে অবস্থিত,



শীতকালে বরফ পড়িয়া গাছপালা এইরূপ আকার ধারণ করে

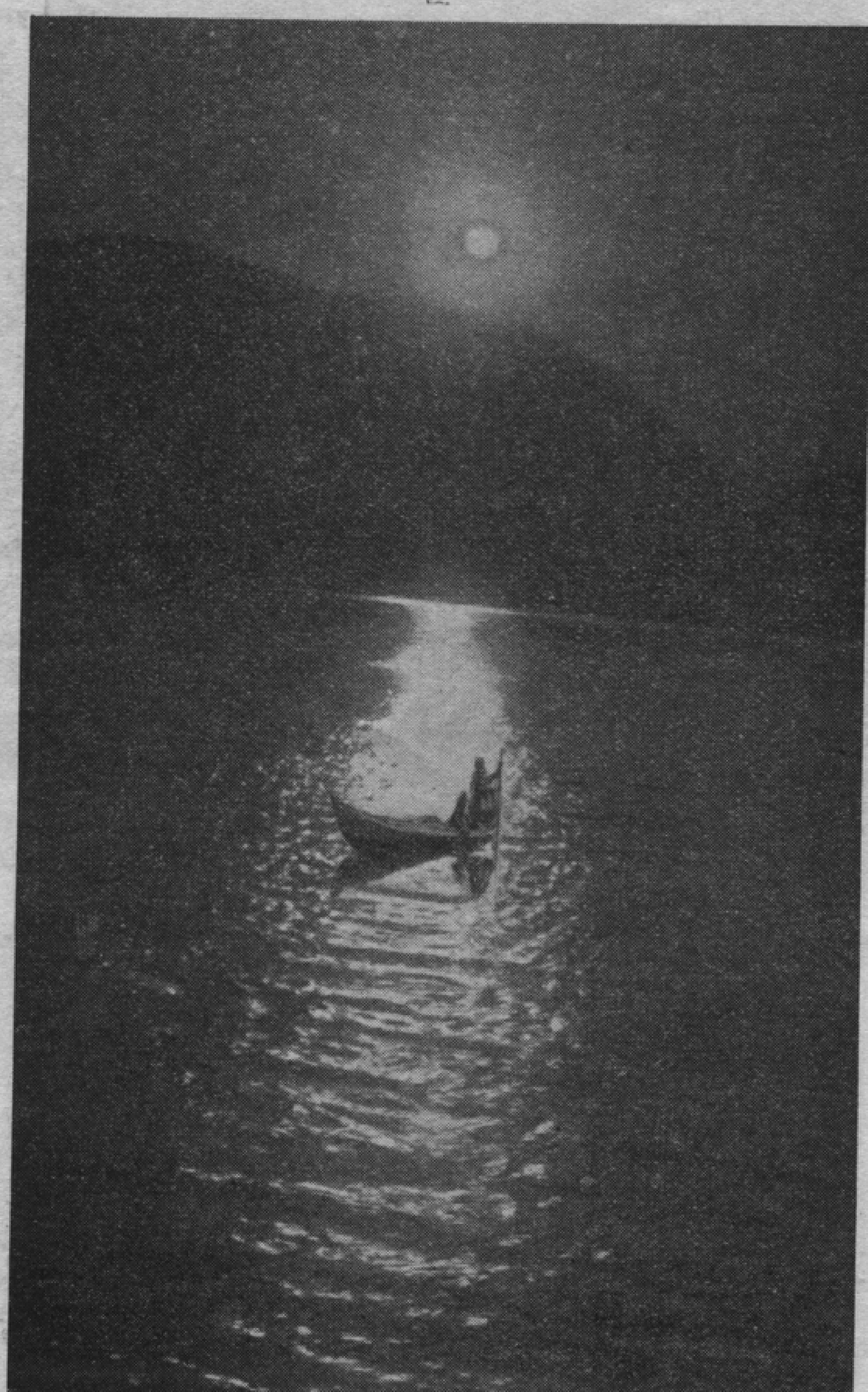
এবং ইহার চূড়া ৭০০০ ফিট উচ্চ। একই প্রদেশে সুইডেনের বৃহৎ জলপ্রপাত "স্তোরা সোফালেৎ" (Stora Sjofallet) অবস্থিত। এই জলপ্রপাত প্রস্থে ২২০০ ফিট্ এবং ইহার জলধারার উচ্চতা ১৩০ ফিট। একই প্রদেশে ছোটবড় আরও অনেকগুলি জলপ্রপাত রহিয়াছে। এই কঠোর শীতপ্রধান দেশে উক্ত জলপ্রপাত হইতে সুইডেনবাসীরা বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া অনেক কাজ চালাইয়া থাকে। একই প্রদেশে পাহাড়-পর্ব্বতের উপরে যে-সকল হ্রদ রহিয়াছে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও বৃহত্তম হ্রদের নাম "তর্নে ত্রাস্ক" (Torne Trask); ইহার পরিধি ৮২ বর্গ-মাইল। সেই প্রদেশে ২০০ খণ্ড গ্লেসিয়ারস্ রহিয়াছে।

তুষার-যুগের পরে যে বিপর্য্যয় ঘটে তাহাতে মধ্য-সুইডেনের আকৃতি একেবারে বদলাইয়া যায়। এখানে-সেখানে অসংখ্য পর্ব্বত-বক্ষে গাছপালা বিরাজ করিতেছে; এবং ইহাদের উচ্চতা ১৬০ ফিট্ হইতে ৩০০ ফিট্ পর্য্যন্ত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়ের যুগে এই মধ্যপ্রদেশের অনেক অংশ সামুদ্রিক 'লেভেলে'র নীচে পড়িয়া যায়; ফলে সেখানে বহুসংখ্যক হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি হ্রদ বিশেষভাবে বিখ্যাত। যথা—ভ্যেনের্ণ্ (Vanern) ২,১৫০ বর্গ-মাইল, ভ্যেত্তের্ণ্ (Vattern) ৭৩০ বর্গ-মাইল এবং মেলারেন্ (Malaren) ৪৪০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত। এই হ্রদসমূহের মধ্যে ভ্যেনের্ণ্ হ্রদের জল ইউরোপে খুব প্রসিদ্ধ। এই হ্রদের সঙ্গে জলমুখে ক্লারেল্‌ভেন্ হ্রদ যুক্ত হইয়া সুইডেনের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ শহর গোথেন্‌বার্গের কাছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

সুইডেনের দক্ষিণ অংশ, একেবারে দক্ষিণ প্রান্ত প্রদেশ ছাড়া বেশ উঁচু এবং উত্তর প্রদেশের বিশাল পর্ব্বত-

মালার সঙ্গে সংযুক্ত। শুধু মধ্যভাগে স্থানে স্থানে সমতলভূমি ও হ্রদগুলি এই পর্ব্বতমালাকে বিচ্ছিন্ন আকার দান করিয়াছে।

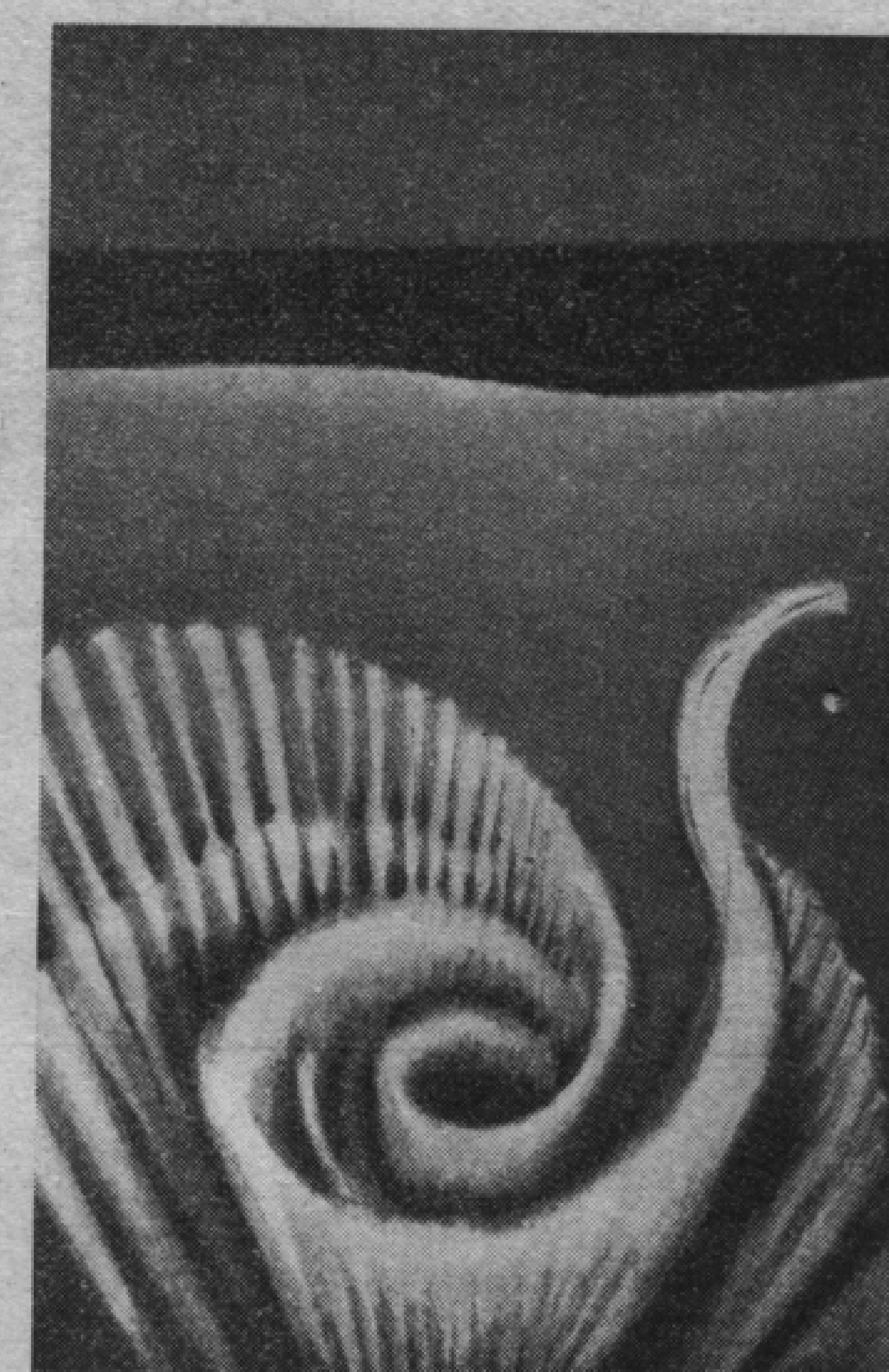
দক্ষিণ প্রান্ত প্রদেশকে "স্কোনে" (Skane) বা



মধ্যরাত্রির সূর্য্য। ২৮এ মে হইতে ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত সূর্য্যালোকে সকল সময়েই আবিস্কো শহর হইতে দৃষ্ট হয়

ইংরেজীতে স্কানিয়া বলা হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় একেবারে বিভিন্ন, এমন কি সেই প্রদেশবাসীদের ভাষার উচ্চারণেও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে।

জলমুখস্থিত সুইডেনের তীরভাগ অতি বিভিন্ন ধরণের এবং এই প্রকৃতির বিভিন্নতা সুইডেনকে এক অদ্ভুত রূপ দিয়াছে। কোন কোন স্থানে জলভাগ উপসাগরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং ইহাই Fjord বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল জলভাগ ছোটবড় অসংখ্য দ্বীপমালায় শোভিত এবং এই দ্বীপগুলিকে সুইডিস্ ভাষায় স্যারগোর্ড বলা হইয়া থাকে। (স্যার = দ্বীপ ; গোর্ড = বাগান)। বিখ্যাত দ্বীপোদ্যান সমূহের মধ্যে সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টক্হল্মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে সকলকেই আকৃষ্ট করে। সুইডেনের দ্বিতীয় শহর গোথেনবার্গের কাছে এরূপ দ্বীপোদ্যান রহিয়াছে। এই দ্বীপোদ্যানসমূহ সাধারণতঃ পাথরের সমষ্টি;



অরোরাবরিয়ালিস। মেরুপ্রদেশের আলোর নৃত্য

কদাচিৎ কোনো কোনোটায় বালি ও মাটির ভাগ দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও এই প্রস্তরময় ভূমির উপর নানা জাতীয় গাছপালা, বিশেষ করিয়া পাইন ও স্প্রুসের বন শোভা পাইতেছে। সুইডেনের তীরভাগের কোন কোন অংশ সমতল ও বালুকাময়—বিশেষ করিয়া স্কোনে প্রদেশে।

তাহা ছাড়াও সুইডেনের চারিদিকে অনেক দ্বীপপুঞ্জ রহিয়াছে। এগুলি আকৃতিতে অনেকটা দ্বীপোদ্যানের মত। কিন্তু দুইটি দ্বীপ—গথ্ল্যাণ্ড এবং ওল্যাণ্ড—সুইডেন হইতে একেবারে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাদের ইতিহাসও ঘটনাবহুল। প্রথমটি আকৃতিতে বেশ বড়, এবং ইহার



শীতকালে হ্রদের জল জমাট বাঁধিয়া যায়। তাহারই উপর স্কেটিং খেলা হয়। পালের সাহায্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্কেটিং করিতেছে

পরিধি ১১৪০ বর্গ-মাইল।* ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ হইতে জাহাজে করিয়া সেখানে যাইতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। দ্বিতীয়টির পরিধি ৭৭০ বর্গ-মাইল। ইহাই স্থইডেনের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থিতির মোটামুটি বিবরণ।

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এই দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অনেক অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক প্রভেদ যাহা স্থইডেন ও প্রতিবেশী নরওয়েকে বিশেষ রূপ ও খ্যাতি দান করিয়াছে তাহা হইল সেখানকার দিনরাত্রির প্রভেদ এবং দৃশ্যমান মধ্য-রাত্রির সূর্য্য। বৎসরে প্রায় নয় মাস শীত এবং সূর্য্যের আলোকের অভাব, আবার গ্রীষ্মের তিন মাসে দিনরাত্রি সকল সময়ই কম বেশী সূর্য্য ও সন্ধ্যালোক,—প্রকৃতির এই লীলা ও সেই দেশবাসীদের জীবনে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বর্ণনার আয়ত্তাধীন নহে। তাহা অনুভব করিবার জিনিষ।

* ইউরোপের সকল আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে গথল্যাণ্ড একটি। ইহাকে সাধারণতঃ 'ভগ্নাবশেষ ও গোলাপ ফুলের' দেশ বলা হইয়া থাকে।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৮

বিভিন্ন মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত

গীতায় যে-সকল সাধন-মার্গ বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উল্লেখ আছে, সেগুলি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

যজ্ঞ—শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যজ্ঞকার্য্যে নানারূপ তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকার্য্যে দোষ ও তাহা নিবারণের উপায় বলিয়াছেন। ৩, ৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৩য় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় যজ্ঞের বিশদ বিবরণ দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তখনকার লোকে যজ্ঞকে সৃষ্টিচক্রের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত ও যজ্ঞ অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্ঞের বিশেষ ভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ১৮।৫ শ্লোকে বলিতেছেন, যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহার অধিক যজ্ঞফল শ্রীকৃষ্ণ মানেন নাই। যজ্ঞের উপর তৎকালপ্রচলিত আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের একটা ব্যাপক অর্থ দিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার কার্য্যকে (২৩-৩৩ শ্লোক) যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেছেন। যজ্ঞের এই লক্ষণ মানিলে সাধারণে যজ্ঞকে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়াও নিঃসঙ্কোচে বৈদিক যজ্ঞ পরিহার করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞের প্রাধান্য দিয়াছেন। তামসিকতা নিবারণের জন্য ১৭শ অধ্যায়ে যজ্ঞের শ্রেণী-বিভাগ দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্যই বার-বার মুক্তসংজ্ঞ হইয়া যজ্ঞের আচরণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত মত পূর্ণভাবে মানেন নাই, পরিবর্ত্তিত আকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

সংন্যাস—গীতায় বহুস্থলে সংন্যাস-মার্গের বা কর্ম্ম-ত্যাগের উল্লেখ আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সংন্যাস-মার্গের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সংন্যাসী বলিলে সাধারণতঃ বুঝায় যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ও যিনি সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম্ম বন্ধনমূলক ও তাহা মোক্ষলাভের অন্তরায় এই ধারণার বশেই সাধক সংন্যাস-মার্গ অবলম্বন করেন। শরীরধারণের জন্য যেটুকু কর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক সংন্যাসী কেবল তাহারই আচরণ করেন। জ্ঞানচর্চ্চাই তাঁহার একমাত্র সাধনা। শ্রুতি, মনুস্মৃতি, শ্রীভাগবত ও পুরাণাদি নানা হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানোদয়ে সংন্যাস-মার্গ অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন পূর্ণ কর্ম্মসংন্যাস অসম্ভব। ইচ্ছা-করি আর না-করি শরীরযাত্রা সম্পর্কে নানাবিধ কর্ম্ম আমাদের করিতেই হয়, অতএব কর্ম্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মের ফলত্যাগই শ্রেয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণের মতে আসক্তি ও ফলত্যাগে কর্ম্মের বন্ধন হয় না; এই অবস্থায় শরীরই প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিতেছে এবং আত্মা নির্লিপ্তই আছে এই ধারণা জন্মে। জনকাদি কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও স্বধর্ম্মত্যাগের আবশ্যতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-সংন্যাসকে স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, কারণ তিনি কোনো মার্গের প্রতিই দ্বেষযুক্ত নহেন, কিন্তু তিনি কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সংন্যাসের এক অভিনব নির্বচন দিয়া তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। কর্ম্মত্যাগ করিলেই সংন্যাসী হয় না; যে কর্ম্মের আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ চিত্তে কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত সংন্যাসী। এইরূপ সংন্যাসই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধিযোগ কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। কর্ম্মপ্রধান সকল মার্গেই বুদ্ধিযোগ প্রযোজ্য। যে-

বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না তাহাই বুদ্ধিযোগ। কর্ম্মের ফল যখন আয়ত্ত নহে তখন ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গ চিত্তে কর্ম্ম করার নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যাত রাজবিদ্যার অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের মতে যে কাজই কর না কেন বুদ্ধিযুক্ত হইয়া করা উচিত। মানুষ সাধারণত যে-কাজ করে তাহা ফললাভের আশায় করিয়া থাকে। ফললাভের অনিশ্চয়তা তাহার মনে উঠে না। যে-কাজে ফললাভ হইতেও পারে না-ও পারে এরূপ মনে হয় সেখানে কর্ম্মে অনেকটা নির্লিপ্ত ভাব আসে; মানুষ কর্ত্তব্যবোধেই এরূপ কাজে সাধারণতঃ প্রবৃত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে নিরাশাজনিত কষ্ট ইত্যাদি মানুষকে পীড়িত করে না। কোন ব্যবসায়ীর বিল-সরকার টাকা-আদায়ের জন্য তাগিদ করিয়া বিফলমনোরথ হইলে নিরাশ হয় না; তাহার কর্ত্তব্য সে করিয়াছে, ফললাভ হয় নাই তাহাতে তাহার কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। বিল-সরকার কষ্ট না পাইলেও টাকা আদায় না হইলে তাহার ব্যবসায়ী মনিব কষ্ট পাইয়া থাকে, কারণ টাকা তাহার পাওয়া উচিত এবং সে তাহা পাইবেই এই ধারণার বশে সে তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। টাকার উপর আসক্তিই তাহার মনে এই প্রকার ধারণা জন্মাইয়াছে। আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা বিল-সরকারের মত প্রকৃতির দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছি এই বুদ্ধিতে ও কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে পারি তবে আমাদের কর্ম্মের বন্ধন হয় না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিযোগ। আধুনিক সম্ভাব্য গণিতের (theory of probability) সূত্র এই উপদেশই দেয়। কোন কার্য্যেই পূর্ণ নিশ্চয়তা নাই; কাল সূর্য্য উঠিবে ইহাও স্থিরনিশ্চয় বলিতে পারা যায় না, কেন-না কোন ব্যাপারেরই সমস্ত কারণগুলি আমরা জানিতে পারি না; কতকগুলি কারণ অদৃষ্ট (unknown factors) থাকিয়াই যায়। গীতায় ১৮।১৪ শ্লোকে এইরূপ কারণসমষ্টিকে দৈব বলা হইয়াছে। সম্ভাব্য গণিত বলিতে পারে কোন্ কার্য্যের ফললাভের সম্ভাবনা বেশী, কোন্ কার্য্যের কম। ফলাফলের নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভব নহে, কারণ কার্য্যের সকল কারণ আমাদের আয়ত্ত নহে। যে বিদ্বান সম্ভাব্য গণিতের সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনি বুদ্ধিযোগই অবলম্বন করেন। এরূপ ব্যক্তির কর্ম্মে নির্লিপ্তি বা অসঙ্গ জন্মে ও ফলাফল সম্বন্ধে তিনি ক্রমে উদাসীন হন।

প্রাণায়াম ও অন্যান্য যৌগিক সাধনা—মহাভারতের যুগে যোগসাধনা বহু অনুষ্ঠিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সাধনার বিচার করিয়াছেন। পাতঞ্জলযোগ এই মার্গের অন্তর্গত। গীতায় দুই প্রকার যোগের উল্লেখ আছে, এক শারীরিক ও অপরটি মানসিক। শ্রীকৃষ্ণের মতে এই দুই যোগের ফল একই প্রকার; তিনি আরও বলেন যে যাহা সংন্যাস বস্তুতঃ তাহাই যোগ। শারীরিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যোগী নির্ম্মল স্থানে স্থির অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম্ম ও বস্ত্র উপরি উপরি বিছাইয়া আপনার আসন স্থাপন করিবেন। সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ মস্তক গ্রীবা ঋজু ও স্থির রাখিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হইবেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগসাধনার অনুরূপ পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে। গীতায় কোন কষ্টকর যোগাসনের উল্লেখ নাই। অনেক যোগী বহু আয়াস-লব্ধ কষ্টকর আসনে যোগ অভ্যাস করেন ও নানা প্রকার কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার কঠোরতার বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন অতিভোজী এবং একান্ত অনাহারীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অতি-নিদ্রাশীল ও অতি-জাগ্রতেরও নয়। উপযুক্ত আহার-বিহারশীল, কর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টাসম্পন্ন ও উপযুক্ত নিদ্রা-জাগরণশীল পুরুষের যোগ দুঃখনাশক হয়। শ্রীকৃষ্ণ যোগের যে-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সকলেরই আয়ত্ত। মানসিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধৃতিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিবে; যে-যে বিষয়ে মন ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আপনার বশে আনিবে। এই উপায়ে সিদ্ধি হইবে। মানসিক যোগই ধ্যান। মানসিক যোগে কোন আসনের উল্লেখ নাই। এখনকার মত পুরাকালেও সাধারণের ধারণা ছিল যে,

একবার যোগসাধনা আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে বিচলিত হইলে বা সাধনায় ত্রুটি থাকিলে সাধকের নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যোগপদ্ধতিতে এরূপ কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য সাধন-মার্গের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ যোগের দোষ বর্জ্জন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ কঠোরতা পরিত্যক্ত হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যৌগিক মার্গের আলোচনা করিলেও প্রাণায়ামের কোন উল্লেখ করেন নাই। ৪র্থ অধ্যায়ে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ সাধনাকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেইখানে প্রাণায়ামের প্রথমোল্লেখ দেখা যায়। ৫ম অধ্যায়ের শেষে যেখানে সন্ন্যাসীদের কথা হইতে যতিদের কথা আসিয়াছে, সেইখানে তাঁহাদের সাধনা হিসাবে প্রাণায়ামের পুনরুল্লেখ হইয়াছে। ৪র্থ অধ্যায়েও যতিদের কথার পরেই প্রাণায়ামের উল্লেখ আছে। যতিদের পরেই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যোগীদের কথা আসিয়াছে। সেজন্য মনে হয় যে, প্রাণায়াম যতি নামক সাধকদিগের বিশেষ সাধনা-পদ্ধতি। যতি ও যোগী এক বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের পার্থক্য কি আমি তাহা জানি না। প্রাচীনতর কালে বৈদিক সময়ে যতি নামক এক পৃথক সম্প্রদায় ছিল। বেদে তাহার উল্লেখ আছে। যতিগণকে স্থানে স্থানে 'ব্রাত্য' ও 'অসংস্কৃত' বলা হইয়াছে। যতিগণের সাধনা সমূলে অনুমোদন করিতেন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। প্রাণায়াম যতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তীকালে তাহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদাভিজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা সঠিক সংবাদ বলিতে পারিবেন।

তপ বা তপস্যা—কোন বস্তু বা বরপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃচ্ছ্রসাধনের নাম তপ বা তপস্যা। ভারতবর্ষে বহু পুরাকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তপস্যার প্রচলন আছে। এখনও জৈন সাধুগণ নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনকে তপস্যা বলিয়াই অভিহিত করেন। গীতায় 'যজ্ঞ তপ ও দানে'র একত্র উল্লেখ বহুস্থানে আছে, যে-যে কর্ম্মে অনাচার ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ ১৭ অধ্যায়ে তাহাদের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন। যজ্ঞ তপ ও দান এই তিনেরই শ্রেণি-বিভাগ দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শরীরকে কষ্ট দিয়া উৎকট তপের পক্ষপাতী নহেন। শরীর উৎপীড়নপূর্ব্বক যে তপ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অসৎ বলিয়াছেন।

গীতায় যেখানে যেখানে তপের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই অন্য মার্গের তুলনায় তপকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ তপ দান—এই তিন কর্ম্মকে একই চক্ষে দেখিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যজ্ঞ দান তপ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই সত্য, কিন্তু এই তিনেরই ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়া আচরণের দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে, উপযুক্ত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এই তিন কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির হেতু। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের ন্যায় তপেরও নূতন নির্বচন দিয়াছেন এবং ইহার শারীরিক বাচসিক ও মানসিক শ্রেণি-বিভাগ করিয়াছেন। এই তিন বিভাগের কোনটিতেই শরীর ও মনের কষ্টদায়ক কোন পদ্ধতির কোন উল্লেখ করেন নাই। দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুভক্তি, শরীরের শুদ্ধি, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শ্রুতিমধুর বাক্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, অন্তঃকরণের পবিত্রতা ইত্যাদিকে শ্রীকৃষ্ণ তপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দান—গীতায় যজ্ঞ, তপ ও দানের একত্র উল্লেখ বার-বার পাওয়া যায় একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দানের একটা বিশেষ পুণ্যফল মানা হইত এবং এখনও হয়। পুণ্যকর্ম্ম হিসাবে এখনও বহুলোক দান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই যে দান সৎপাত্রে পড়ে তাহা নহে। অসৎপাত্রে দানে সামাজিক অনিষ্টের সম্ভাবনা এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ ও তপের ন্যায় দানেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণি-বিভাগ দেখাইয়াছেন। সাত্ত্বিক দানে চিত্তশুদ্ধি হয়।

অবতারবাদ—সময় সময় স্বয়ং ভগবান জীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষাকল্পে জন্মগ্রহণ করেন এই বিশ্বাস বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যে

জীবরূপে ভগবান আবির্ভূত হন তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলা হয়। ভগবানের অবতার সাধারণের পূজা পাইয়া থাকেন। রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার মানিয়া সাধারণে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়। তিনি স্বয়ং অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভগবান নিজে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তিনি কি করিয়া বদ্ধ জীবের আকার ধরিয়া নিজেকে বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"তিনি মায়াপ্রভাবে যেন দেহবান হন, যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যেন তিনি লোকনিবহের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন এইরূপে লোকে তাঁহাকে বুঝিয়া থাকে" (প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক অনূদিত)। শঙ্কর-ব্যাখ্যাই অবতার-বাদের সাধারণ প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা মানিলে বলিতে হয় তুমি আমি যেভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে জন্মেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার জন্মই হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহই ছিলেন না। ভগবানের বৈষ্ণবীমায়ার প্রভাবে মহাভারতের যুগের ব্যক্তি-গণের মনে হইত যেন বা শ্রীকৃষ্ণ আছেন যেন বা তিনি অর্জ্জুনের রথ চালাইতেছেন, যেন বা তিনি গীতার উপদেশ দিতেছেন ইত্যাদি। এরূপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি সন্দেহ মনে উঠিবে। অদ্বৈতবাদীর মতে পরব্রহ্মই একমাত্র সত্তা,তাঁহারই মায়াপ্রভাবে জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হয়। যখন জীবের মায়ানিবৃত্তি হয় তখন এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে চরাচর লীন হইয়া যায়। জীবের জন্মগ্রহণ মায়িক ব্যাপার মাত্র। সাধারণ জীবের জন্মগ্রহণে ও অবতারের জন্মগ্রহণে মায়িক পার্থক্য কোথায় শঙ্করের ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার যে অন্য জীবের জন্মব্যাপার হইতে ভিন্ন এমন বলেন নাই। ৪।৬ শ্লোকে বলিতেছেন "আমি অজ শাশ্বত ও ভূতসমূহের ঈশ্বর হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজমায়া অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করি।' ১৩।২ শ্লোকে বলিয়াছেন আমাকেই সমুদয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলিয়া পুরুষ পদার্থ-নিচয় ভোগ করেন ও জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এই দেহে থাকিলেও তিনি দেহ হইতে ভিন্ন। তিনি অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ৪।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যিনি আমার দিব্য জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই পান। ১৩ ও ৪ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলির আলোচনায় বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার ও অন্য জীবের জন্মব্যাপার একই ভাবে দেখিয়াছেন। ৪।৫ শ্লোকে বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার অনেকবার জন্ম হইয়াছে, কেবল পার্থক্য এই যে, তোমার তাহা মনে নাই আমার আছে। অবতার না হইলেও জাতিস্মরতা সম্ভব, কাজেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অর্জ্জুনের জন্মের অনুরূপ নহে প্রমাণিত হয় না বরং উভয়ের জন্মই একই প্রকারের ইহাই মনে হয়। গীতা-আলোচনায় মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ অবতারতত্ত্ব মানিতেন না। যিনি সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই অবতার বলিয়াছেন। ৪ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে ইহা পরিস্ফুট হইবে। অবতার তত্ত্বও তপ, যজ্ঞ ইত্যাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

কাপিল সাংখ্য—কাপিল সাংখ্যবাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অধুনা দার্শনিক তত্ত্ব বলিলে আমরা যাহা বুঝি গীতার বিজ্ঞান শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বিজ্ঞান মূলতঃ কাপিল সাংখ্যবাদ, কেবল প্রভেদ এই যে কৃষ্ণ পুরুষ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মের অন্তর্গত স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম উপনিষদের ব্রহ্ম। প্রকৃতি ও পুরুষ সমুদায় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়াশক্তি এবং প্রতিদেহস্থিত পুরুষ মূলতঃ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

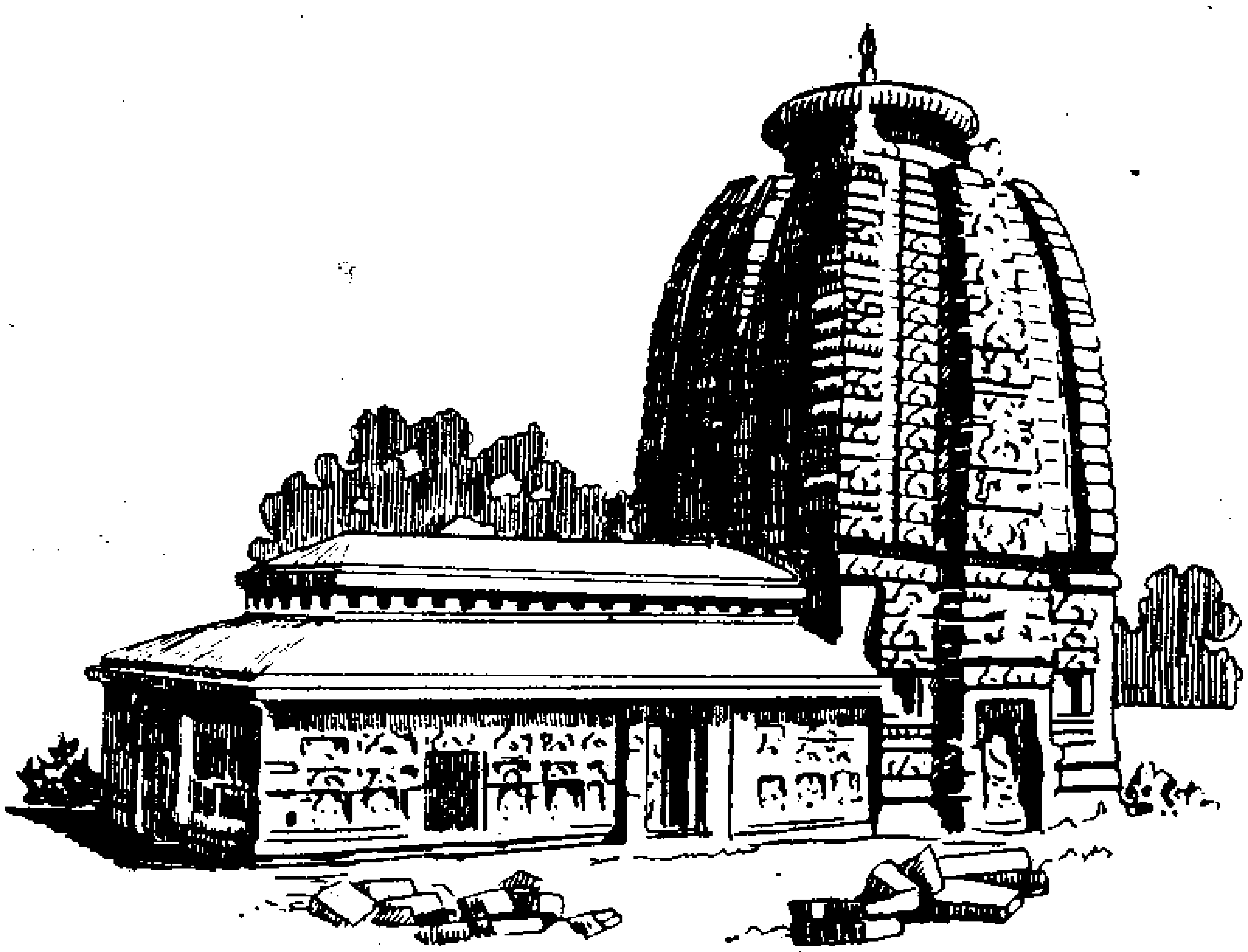
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০

অর্থাৎ, মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ী অর্থাৎ যাহা হইতে মায়ার উৎপত্তি, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহার অবয়ব দ্বারাই এই

কাপিল সাংখ্যবাদকে এই প্রকার পরিবর্ত্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের সহিত তাহার সমন্বয় করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের আলোচনা আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ব্রহ্মোৎপন্ন প্রকৃতির এই অষ্ট বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি। জীবাত্মা বা কাপিল সাংখ্যের পুরুষ সমষ্টি ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতিই পরম ব্রহ্মের মায়া-সম্ভূত। প্রকৃতির যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে সমস্ত বহির্জগৎ ও মানসিক ব্যাপারসমূহ তাহাদের অন্তর্গত। এই সমুদায় জড়পদার্থ। মন সূক্ষ্ম জড়বস্তুমাত্র, পুরুষই কেবল* চেতনাশীল এবং তাঁহারই চেতনায় এই সমস্ত উদ্ভাসিত হয়। তিলক মনে করেন, মূলপ্রকৃতির ভেদ দেখাইতে গেলে মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া তাহার অন্তর্গত পদার্থগুলি দেখাইতে হইবে এজন্য মহান, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি মাত্র ভেদ হয়, "কিন্তু এরূপ করিলে পরমেশ্বরের কনিষ্ঠস্বরূপ বা মূল প্রকৃতি সাত প্রকার বলিতে হয়। অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠস্বরূপ অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে (তিলক বাংলা অনুবাদ, ১৮৪ পৃঃ)। আমার মতে গীতায় ৭।৪ শ্লোকে এই যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে তাহা সাংখ্য বা বেদান্তানুযায়ী বর্গীকরণ নহে; প্রকৃতিজাত জড় জগতের বিভাগ মাত্র। এখানে পঞ্চ স্থূল ভূত ও মন, বুদ্ধি, অহংকার রূপ সূক্ষ্ম জড়পদার্থের কথাই বলা হইয়াছে, শঙ্কর ও তিলক প্রভৃতি টীকাকার উদ্দিষ্ট তন্মাত্রাদির কথা নহে। কেন একথা বলিতেছি সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে তাহার বিচার করিব। সাংখ্যোক্ত বর্গীকরণের কথা ১৩।৫ শ্লোকে আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বর্গীকরণ মানিয়া লইয়াছেন।

গুণত্রয় বিভাগ কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমের বিস্তারিত আলোচনা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে। এই গুণত্রয়কে ভিত্তি করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার করিয়াছেন। ত্রিগুণ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের কষ্টিপাথর। শ্রীকৃষ্ণ কাপিল সাংখ্যের দ্বারা যে সমধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।



মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৮

পথে চলিতে চলিতে প্রতাপ কত কথাই যে ভাবিয়া লইল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। চিন্তাকে লাগাম ছাড়িয়া দিতে তাহার নিজেরই ভয় করিত, কিন্তু যৌবনধর্ম্ম তাহাকে এই পথে নিত্যই লইয়া যাইত। অনেক কথা মনের দ্বারে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিত, প্রতাপ জোর করিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিত, আবার মাঝে মাঝে সুমধুর কল্পনার স্রোতে নিজেকে একেবারে ভাসাইয়া দিত। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইত, নির্ব্বোধ, মূর্খ বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিত, কিন্তু কল্পনাকে সংযত করিতে পারিত না।

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি পৌছিয়া দেখিল, মিহির সামনের রাস্তায় হকিষ্টিক্ হাতে ঘোরাঘুরি করিতেছে, ইটের টুকরার উপর দিয়া হাত পাকাইয়া, ঘরে বন্ধ থাকার দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, রাত্তির বেলা হঠাৎ হকি খেলার সখ হ'ল যে?"

মিহির ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কি করব? ঘরের ভিতর আর টিক্‌বার জো নেই। একটা আরশোলা উড়ে গেলেও সবাই হৈ হৈ ক'রে তেড়ে আসে, তাতেই নাকি মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে।"

প্রতাপ হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু আপিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, প্রতাপকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন, "আজ অনেকটা ভালই আছেন, আর কিছু করতে হবে না, শুধু ঠিক সময়ে আয়া যাতে ওষুধ-বিষুধ দেয়, সেইটুকু চোখ রাখলেই হবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু আবার নিজের কাজে ডুব দিলেন। প্রতাপ বসিয়া বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, কাঁহাতক এই রকম হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা যায়? উঠিয়া গিয়া মিহিরের

টুং টুং করিয়া একটা ঘণ্টা নীচেই কোথায় বাজিয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রবাবু চশমাটা চোখ হইতে খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "চলুন, খাবার দিয়েছে। আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। গিন্নি পড়ে অবধি সব কাজেরই বড় বিশৃঙ্খলা হয়েছে। মেয়েটারও পরীক্ষা, সে ভাল ক'রে কিছু দেখাশোনা করতে পারে না।"

প্রতাপ নিরুত্তর অবস্থাতেই তাঁহার পিছন পিছন খাবার-ঘরে উপস্থিত হইল। যামিনী তাহাদেরই সঙ্গে খাইতে বসিবে কি-না সেই চিন্তাতেই সে ব্যস্ত ছিল।

টেবিলে শুভ্র আচ্ছাদন, প্লেট, ছুরি, কাঁটা, চামচ সব ইংরেজী কায়দায় সজ্জিত। প্রতাপ একটু ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। এভাবে খাইতে সে কোনদিন অভ্যস্ত নয়, শেষে কি জিবটিব কাটিয়া একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করিবে? সর্ব্বনাশ, যামিনীর সম্মুখে এই রকম একটি ব্যাপার ঘটিলেই হইয়াছে আর কি? সে তাহা হইলে প্রতাপকে একটি আস্ত জানোয়ার ঠাওরাইবে। ভাবিতেই শীতের দিনে প্রতাপের কপাল ঘামিয়া উঠিল।

একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে নৃপেন্দ্রবাবুকে বলিল, "আমার কাঁটা চামচেয় খাওয়া কোনদিন অভ্যেস নেই। আমি হাতেই খাব।"

নৃপেন্দ্রবাবু টেবিলেও একখানা বই হাতে করিয়া হাজির হইয়াছিলেন। বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, বেশ ত, আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও যে হাতে খাই না, সেটা নিতান্ত দায়ে পড়েই। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার পেটই ভরত না।"

এমন সময় যামিনী আর মিহির আসিয়া ঘরে ঢুকিল। প্রতাপ একবার দরজার দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল। ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়িলে, অন্য দিকে

হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা করিতে এতখানি চেষ্টা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে করিতে হয় নাই। চোখ দুইটা যেন বন্যমৃগের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কোন শাসন না মানিয়া নিজের ইচ্ছা-মত ছুটিয়া যাইতে চায়। অধিকক্ষণ ভদ্রতারক্ষা করিতে সে পারিলও না, আর একবার যামিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল। যামিনী ঠিক তাহার সামনা-সামনি বসিয়াছে, চাকররা খাবার আনিতে আরম্ভ করিয়াছে, মৃদুকণ্ঠে তাহাদের কি সব উপদেশ দিতেছে।

মেয়েদের সাজসজ্জাও ইহার আগে প্রতাপ কোনদিন লক্ষ্য করে নাই। ইহা লইয়া মেসে অনেক সময় তাহাকে ঠাট্টা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু সকল দিকেই তাহার পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছিল। আজ সে বিশেষ করিয়াই দেখিল, যামিনী পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, এমন সুন্দর কবরী-রচনা প্রতাপ আগে যেন কোথাও দেখে নাই। একটি কচিপাতার রঙের ঢাকাই শাড়ী তাহার কোমল সুন্দর দেহটিকে যেন গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, গলায় একটি প্রবালের মালা দুলিতেছে। কানে বিলম্বিত দুইটি মুক্তার দুল যেন জলদেবীর অশ্রুবিন্দুর মত টল্‌টল্‌ করিতেছে। যামিনী এত সুসজ্জিতা কেন? নিজের ঘরে, নিত্যকার খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে এত সযত্ন সজ্জা কি সচরাচর কেহ করে? তাহার কান গরম হইয়া উঠিল, সে আসিবে জানিয়াই কি যামিনী এতটা করিয়াছে, ভাবিতেই যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল।

মূর্খ প্রতাপ জানিত না যে, ইহা এ বাড়ির নিত্য নিয়ম। দিনের বেলাতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইয়া খাইতে আসিলে জ্ঞানদার কাছে বকুনি খাইতে হইত। কিন্তু রাত্রির খাওয়াটার নাকি মর্য্যাদা বেশী, তাই এ সময়ে ফিট্‌ফাট্ হইয়া না আসিলে, জ্ঞানদা রাগ করিয়া ছেলে-মেয়েকে টেবিল হইতে তুলিয়া দিতেন, তাহাদের আবার গিয়া সাজসজ্জা ঠিক-মত করিয়া আসিতে হইত। কর্ত্তাও নিষ্কৃতি পাইতেন না, কাজেই এ সময়ে খানিকটা বেশভূষা করা সকলেরই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

মাছের 'ফ্রাই'টা এক টুকরা মুখে দিয়াই মিহির চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি বালি মাখিয়ে ভেজে নিয়ে এসেছে? এ যে গেলা যায় না।"

যামিনী বলিল, "এমন কিছু খারাপ হয় নি।"

মিহির বলিল, "তোমার মুখে ত কিছুই খারাপ লাগে না। নিজে কিছু দেখ না কি না?"

নৃপেন্দ্রবাবু ছেলেমেয়ের ঝগড়া থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "থাক থাক, যা হয়েছে তাই খাও। তোমার মা কিছু এখন দেখতে পারছেন না, একটু খারাপ ত হতেই পারে।"

প্রতাপ কি যে খাইতেছিল, সে বিষয়ে তাহার নিজের কোনো চেতনা ছিল না। মিহিরের কথায় তাহার জ্ঞান হইল যে সে মাছই খাইতেছে। এমন কি মন্দ হইয়াছে? মিহিরের উপর অকস্মাৎ সে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ছেলেটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে। একটু খাওয়ার গোলমাল হইলে এমন কি চণ্ডী অশুদ্ধ হইল যে, তাহা লইয়া এত গোলমাল করিতে হইবে? নিজে বাল্যে ও কৈশোরে যে এই অপরাধ কতবার করিয়াছে, তাহা প্রতাপ একেবারেই ভুলিয়া গেল।

খাওয়াটা তাহার নামমাত্রই হইত বোধ হয়, যদি না নৃপেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকিতেন। প্রতাপের অবাধ্য চক্ষু ও মন কিছুতেই খাবারের দিকে যাইতে চাহে না। সম্মুখে এমন মনোহারিণী একটি ছবি তাহার সমস্ত চিত্তকে ক্রমাগতই সেই দিকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার মত এমন একটা নিতান্ত স্থূল জিনিষ, তাহাও ইহাকে কি চমৎকার মানাইতেছে। তাহার পাশে বসিয়া মিহিরটা গিলিতেছে ঠিক যেন জানোয়ারের মত। মাষ্টার-মহাশয়ের মনে আজ ছাত্রের জন্য বিন্দুমাত্রও মমতা অবশিষ্ট ছিল না। নিজের খাইতেও তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল, যামিনীর সামনে বসিয়া সে গরুর মত মুখ নাড়িয়া খাইবে কেমন করিয়া? না-জানি তাহাকে কি কুৎসিতই দেখাইবে।

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না দেখি। রান্নাটা আজ সত্যিই ভাল হয়নি।"

প্রতাপ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "না রান্না বেশ ভালই হয়েছে। এত সকাল সকাল খাওয়া আমার অভ্যেস নেই কি না। আমি সচরাচর অনেক পরে খাই।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না না, ঐ অভ্যেসটি করবেন না। অনেক রাত্রে এক পেট খেয়েই ঝুপ্ ক'রে শুয়ে পড়া মানে ডিস্‌পেপসিয়া নেমন্তন্ন ক'রে আনা। এই নিয়ে আমি ভুগেছি কি কম? থাকতাম মেসে, আড্ডা ছেড়ে উঠতে মন যেত না, কাজেই খেতে দেরি হয়ে যেত, তারপর যা ভোগ সুরু হ'ল।"

নৃপেন্দ্রবাবু তাঁহার অজীর্ণ রোগের দীর্ঘ ইতিহাস অতি বিশদভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। মিহির একমনে খাইতে লাগিল, যামিনী এক টুকরা পুডিং লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং প্রতাপ লজ্জায় ও বিরক্তিতে অস্থির হইয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রবাবুরই বা কি আক্কেল? এই সব কথা এখন বলা কেন? যামিনী না জানি কত বিরক্ত হইতেছে। প্রতাপ এক জন অনাত্মীয় যুবক, প্রায় অপরিচিত বলিলেই হয়, তাহার সম্মুখে কেন এ সব আলোচনা? যামিনী যে একটা কথাও শোনে নাই, সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবিতেছে, তাহা বেচারা প্রতাপকে কেহ তখন দয়া করিয়া জানাইয়া দিলে তাহার অনেকখানি অকারণ মর্ম্মপীড়া বাঁচিয়া যাইত।

খাওয়া অবশেষে চুকিয়া গেল। যামিনী সর্ব্বাগ্রে টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল। প্রতাপের চোখের উপর ঘরটা যেন আঁধার হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত চিত্ত আকুল আগ্রহে ঐ অপস্রিয়মানা তরুণীর সঙ্গে ছুটিয়া যাইতে চাহিতে লাগিল। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া সে নৃপেন্দ্রবাবুর পিছন পিছন তাঁহাদের বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় সজ্জিত। জান্‌লার পরদা বা মেঝের কার্পেটটি পর্য্যন্তও বিদেশী। অন্য সময় হইলে প্রতাপের মনটা বিদ্রোহ করিত, সে এ সকল সাহেবীয়ানার অত্যন্ত বিরোধী ছিল, এবং এ বিষয়ে কথা উঠিলে সে সর্ব্বদাই নির্ম্মম সমালোচনা করিত, কিন্তু আজ সে এ সব দেখিয়াও দেখিল না। কোণের দিকে একটি জরির কাজ করা সবুজ আচ্ছাদনে আবৃত বড় পিয়ানো। এইখানে তাহার চক্ষু সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট হইল। মনে হইল এই প্রাণহীন বাদ্যযন্ত্রটা কি অসীম, কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের অধিকারী। নিত্য ইহার বক্ষে যে আলোকশিখার মত অঙ্গুলিগুলি নৃত্য করিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি সৃষ্টি করে, তাহার কোন মূল্যই ত ইহার কাছে নাই? এই বিস্ময়কর মানবজীবনের পরিবর্ত্তে কয়েক মিনিটের জন্যও যদি প্রতাপকে কেহ রূপান্তরিত করিয়া বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিত, তাহা হইলে সে নিজের সৃষ্টি-কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিত। কবে কোথায় গান শুনিয়াছিল,

"আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন আঙুলে।"

সেই গানের সুর আর কথা এতকাল পরে তাহার মনের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

মিহির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার-মশায়, আপনি বাজাতে পারেন?"

প্রতাপ চম্‌কাইয়া উঠিল যদিও প্রশ্নটা নিতান্তই সাধারণ। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "না ও সব শিখবার আর সময় হ'ল কখন? পড়াশুনো নিয়েই সব সময় কেটে গেছে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাদের দেশে গানবাজনাটা আর কেই-বা বেটাছেলেকে কষ্ট ক'রে শেখায়? ওটা যেন মেয়েদেরই একচেটে হয়ে উঠেছে। অথচ আমাদের দেশে কত বড় বড় ওস্তাদ জন্মগ্রহণ করে গেছেন, এখনও তাঁদের নামে লোকে নমস্কার করে। এটা একটা ফেলে দেবার জিনিষ নয়, কিন্তু মানুষে বোঝে না। আমার ছেলের গলা থাকলে, আমি তাকে শেখাতাম, কিন্তু ওর মোটে মিউজিকে টেষ্ট নেই।"

প্রতাপ দেখিল এখন গৃহস্বামীর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা না-বলিয়া উপায় নাই। তিনি আরাম করিয়া একটা বড় চেয়ারে বসিয়া, সবে পান চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং এখনই চট করিয়া উঠিবেন না। অগত্যা সেও একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এ সব শেখান ব্যয়-সাপেক্ষও বটে, সেই জন্যেও অনেককে পিছিয়ে যেতে হয়। যেটুকু না শেখালে ছেলে ক'রে খেতে পারবে না, নিতান্ত ততটুকুই লোকে কোনমতে শেখায়।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বটে, আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। কোনমতে মাথাগুঁজে থাকা, আর দুবেলা দুমুঠো খেতে

পাওয়া, এর বেশী আর কোন আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই। তার উপর যদি দু-একটি মেয়ে রইল, তাহ'লে আর ভাবনা কি? একেবারে আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবে মেয়ের বিয়ের ভাবনায়। সমাজ হয়েছে অতি অপকৃষ্ট। অন্য দেশের ভাল কিছু নেবে না, নিজের দেশের ভাল যা-কিছু ছিল, তা ভুলে গেছে, বাকি কতকগুলো কুপ্রথা আঁকড়ে খালি পড়ে আছে।"

প্রতাপ ভাবিল নৃপেন্দ্রবাবুর এ নিতান্তই অকারণ বলা কথা, কন্যাদায় কি জিনিষ তাহা তিনি জানেনও না এবং ইহজীবনে তাহা জানিবারও কোন সম্ভাবনা তাঁহার নাই। তাঁহার কন্যার জন্য কত মানুষে বরং আসিয়া তাঁহারই সাধ্যসাধনা করিবে। কাহার অদৃষ্টে সে অপূর্ব্ব রত্ন জুটিবে কে জানে? প্রতাপের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন সশব্দে আছাড় খাইতে লাগিল। পাগলের মত এ সব যা-তা ভাবিয়া তাহার লাভ কি? তবু নিজেকে কিছুতেই সে সংযত করিতে পারে না।

মিহির খানিকক্ষণ এধার-ওধার অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করিয়া, কখন এক সময় চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু নীরবে বসিয়া পান চিবাইতে লাগিলেন এবং প্রতাপ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। পাশের ঘরে চাকরেরা সশব্দে বাসনকোসন সরান, টেবিল পরিষ্কার করা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মগুলি করিয়া যাইতে লাগিল।

ছোট্টু আসিয়া খবর দিল, আয়া খাইবার জন্য নীচে আসিবে, এখন বাবুর একবার উপরে যাওয়া দরকার। নৃপেন্দ্রবাবু হাই তুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া প্রতাপকে বলিলেন, "চলুন, যাওয়া যাক। আজ রাত্রে আপনার একটু দুঃখভোগ আছে। সারা রাত জাগতে হবে না, শেষের দিকে আমি এসে আপনাকে রিলিভ করব-এখন।"

প্রতাপ বলিল, "তার কিছু দরকার নেই। একরাত জাগা আমার পক্ষে মোটেই বেশী কিছু নয়। মেসে, হোষ্টেলে যখন থেকেছি তখন কারও অসুখ-বিসুখ হ'লে আমি অন্যের পালাতে ইচ্ছে ক'রে নিজে জেগেছি। রাতে ঘুমই আমার কম। গরমকালে ত রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার ছাত্রটিকে যদি কম ঘুমনোর বিদ্যাটা একটু শিখিয়ে দেন ত মন্দ হয় না। বেশী ঘুমনোর জন্যে সে তার মায়ের কাছে প্রায়ই বকুনি খায়।"

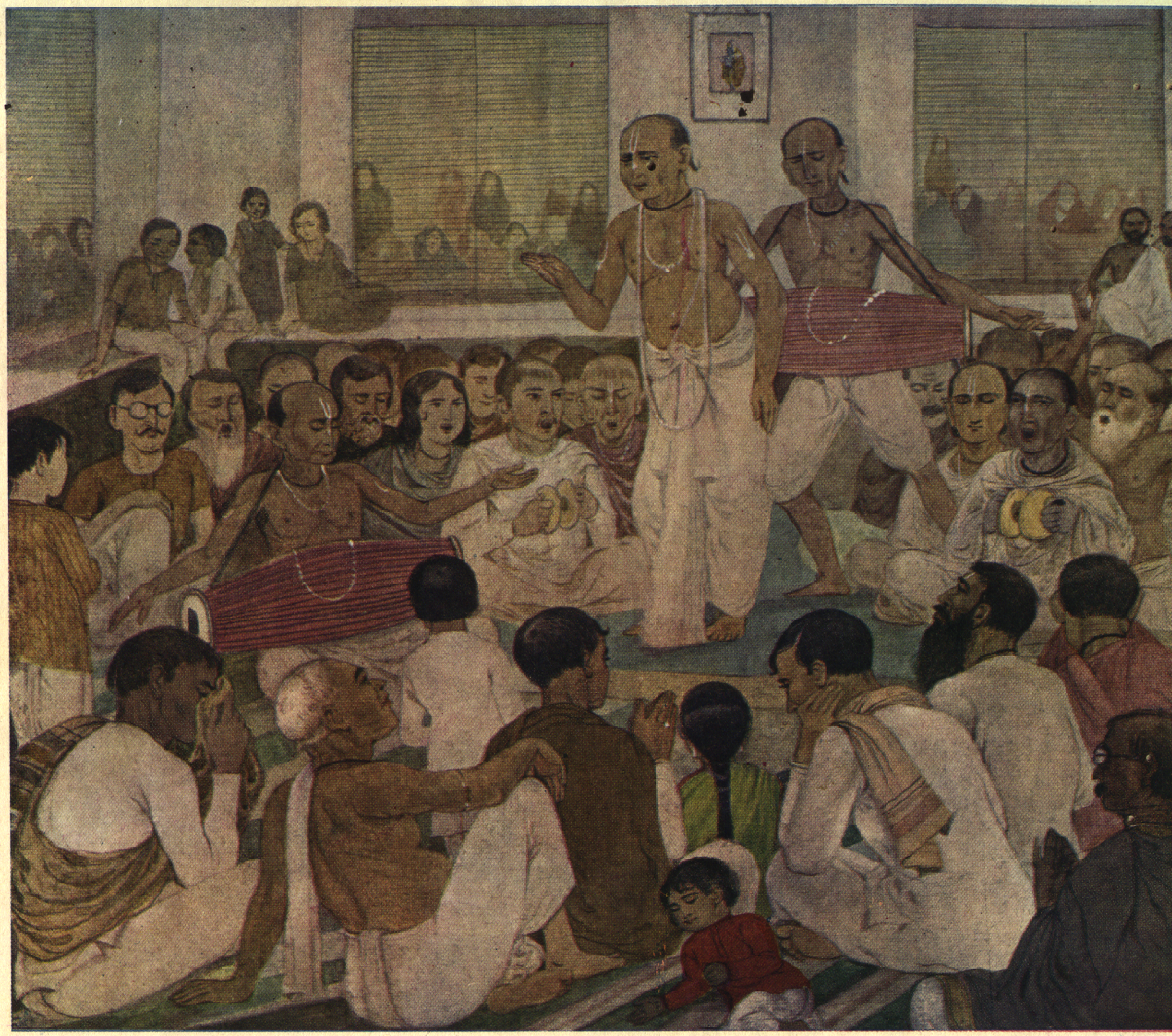
উপরতলায় দুজনে উঠিয়া আসিলেন। গৃহিণীর ঘরের দরজা খোলা, তবে রঙীন মোটা পর্দ্দায় আবৃত। আয়া কিসমতিয়া পরদাটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, নৃপেন্দ্র-বাবুকে দেখিয়াই পরদা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ল্যাণ্ডিঙে একটি ছোট টেবিল এবং তাহার সামনে একটি ইজিচেয়ার। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এইখানে বসে বিশ্রাম করুন, আয়া আধঘণ্টার মধ্যেই আসবে। এই কাগজটায় কখন কি দিতে হবে সব লেখা আছে, তাকে ব'লে ব'লে দিলেই সে সব ঠিক ক'রে যাবে। ঘুমিয়ে পড়ার উৎপাত ওর নেই, ভগবান ওকে ঘুম জিনিষটা দিতে একেবারেই ভুলে গেছেন। আপনাকে বই-টই কিছু পাঠিয়ে দেব?"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, কিছু দরকার নেই। পড়তে গেলেই বরং আমার বেশী ক'রে ঘুম পাবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমি খোকার ঘরে একটু শুয়ে পড়ি গে। দরকার হ'লেই আমাকে ডাকবেন।" তিনি মিহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

প্রতাপ ইজিচেয়ারে বসিয়া এধার-ওধার তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। আর একদিন সে উপরে উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার দারুণ উদ্বেগ ও উত্তেজনায় কোনদিকে আর তাকাইয়া দেখে নাই। তাহার পাশেই বড় ঘরখানি গৃহিণীর ঘর বুঝাই গেল, সামনে যেখানে নৃপেন্দ্রবাবু ঢুকিয়া গেলেন, তাহা মিহিরের ঘর। আর বাম দিকের ঐ যে ঘরখানি, যাহার রেশমী পরদার ভিতর দিয়া আলোর ধারা রঙীন হইয়া ল্যাণ্ডিঙে ছড়াইয়া পড়িতেছে, উহাই কি যামিনীর ঘর? কোন সাড়াশব্দ নাই, যামিনী কি জাগিয়া আছে না ঘুমাইতেছে? জাগিয়াই আছে বোধ হয়, না হইলে



কীর্ত্তন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তাহার ঘরের দরজা খোলা থাকিবে কেন? কিন্তু এত নীরবে সে কি করিতেছে? প্রতাপেরই মত বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছে হয়ত। বিশেষ কাহারও কথা সে ভাবিতেছে কি? এত সুন্দরী, এমন মনোহারিণী সুশিক্ষিতা তরুণী, এতদিন কি কেহ তাহার কাছে প্রণয়-নিবেদন করে নাই? যামিনীদের সমাজে পূর্ব্বরাগের চলনই আছে, সুতরাং করিয়া থাকাই সম্ভব। কে তাহারা? প্রতাপের মাথা দপ দপ করিতে লাগিল। না, না, এ সব ভাবিয়া হইবে কি? সে কি জানে না যে, যামিনীর মনোজগতে কোনদিনই তাহার স্থান হইবে না? কিন্তু হায়, বুদ্ধি দিয়া সে যাহা বোঝে, হৃদয় দিয়া তাহা বুঝিতে পারে কই? যত চোখ ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করে ততই যেন তাহা চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত ঐ আলোকোদ্ভাসিত কক্ষদ্বারের দিকে ছুটিয়া যায়, মন যত অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ততই তাহা মধুমত্ত মধুকরের মত একটি অতিপ্রিয় নামের চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া ফেরে। প্রতাপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অতি লঘুপদক্ষেপে সিঁড়ির মুখের কাছটাতে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(৯)

শীতের সকালে ঘুম সহজে কাহারও ভাঙিতে চাহে না, কিন্তু গৃহস্থের ঘরের বৌ-ঝির সে অধিকার নাই যে একটুখানি মধুর আলস্যচর্চ্চা করিবে। পিসিমা বৃদ্ধা তাঁহার আজন্মের অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না, কাক-কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া বসেন। অগত্যা বধূকেও তাহাই করিতে হয়, বুড়ী শাশুড়ী উঠিয়া পাট সুরু করিয়া দিবেন, আর সে আরাম করিয়া শুইয়া থাকিবে, তাহা ত হয় না? যদিও ইহার জন্য বিরক্তিও তাহার মনে অনেকখানি সঞ্চিত হইয়া আছে।

বধূ সবেমাত্র উঠিয়া মুখেচোখে জল দিতেছে, এমন সময় সদর দরজায় ঠুক্ ঠুক্ করিয়া শব্দ হইল। কে আবার এখনই মরিতে আসিল? নীচের ভাড়াটেদের কেহ নাকি? তাহারা ত দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে, এখন তাহাদেরও দরোয়ানী বেচারী ভদ্রলোকের মেয়ে তাহাকেই করিতে হইবে নাকি? অত্যন্ত বিরক্ত-ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়া বধূ হড়াৎ করিয়া দরজাটা একটান দিয়া খুলিয়াই দেখিল বাহিরে প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে। একটু অবাক হইয়া বলিল,"ওমা, ঠাকুরপো যে,এত সাততাড়াতাড়ি হাজির? সারারাত জেগে একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছ নাকি? সত্যি এ তাদের অন্যায় বাপু, এমন ক'রে মানুষকে পেয়ে বসতে নেই। ছেলে পড়াতে রেখেছে ব'লে ত মাথা কিনে নেয়নি?"

প্রতাপ অত্যন্ত ম্লানভাবে হাসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, "না, হয়রাণ হইনি, আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি, বসেই ছিলাম। তবে বাড়ির সকলেই উঠে পড়েছে, এখন আর আমার বসে থাকা ভাল দেখায় না, তাই চলে এলাম।" বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রাজুর তখনও মাঝরাত্রি, আপাদমস্তক মোটা লেপে ঢাকা,নাকের ডগাটুকু মাত্র দেখা যাইতেছে। প্রতাপ একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজের বিছানাটা টানিয়া পাতিয়া শুইয়া পড়িল। শরীর ত সর্ব্বদা মনের বশ নয়, ক্লান্তি তাহার খানিকটা হইয়াই ছিল। ঘুমাইবার তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মিনিট-দুইয়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল তাহার কানুর চীৎকারে। সকালে প্রায়ই দুধ খাওয়া লইয়া বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। কানু ষাঁড়ের মত গলা করিয়া চীৎকার করে, কানুর মা তাহার পৃষ্ঠে চড়চাপড় নির্ব্বিচারে বর্ষণ করেন এবং পিসিমা তাঁহাকে ক্রমাগত বকিয়া যান। কানু চেঁচাইতে গিয়াই কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, চীৎকারের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি দুধই তাহার পেটের ভিতর চলিয়া যায়।

প্রতাপ উঠিয়া পড়িল। বউদিদি চা আনিয়া দিয়া, ফিশ ফিশ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বড়লোকের বাড়ি কেমন নেমন্তন্ন খেলে, ঠাকুরপো?"

প্রতাপ বলিল, "মন্দ নয়, তবে চাকরবাকর কি আর তোমার মত রাঁধতে পারে?" বউদিদি মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজুর খবরের কাগজের বাতিক আছে। সকালে

কাগজখানা লইয়া আগে দুইভায়ে টানা-হেঁচড়া চলিত, এখন প্রতাপ তৃতীয় ভাগীদার জুটিয়াছে। আজ কিন্তু খবরের কাগজে তাহার মন ছিল না, কাগজখানা সামনে ধরিয়া সে গভীর চিন্তায় ডুবিয়া ছিল। গত রাত্রির মুহূর্ত্তগুলি আবার সে মানসপথে অতিক্রম করিতেছিল, তাহাদের সকল রস আবার পরিপূর্ণ করিয়া উপভোগ করিতেছিল। দেখিতে গেলে, রাত্রিটাতে কিছুই ঘটে নাই, কিন্তু প্রতাপের মনে হইতেছিল এমন রাত্রি তাহার জীবনে কখনও আসে নাই, আসিবেও না আর। যামিনীর এত কাছে আর কি সে কোনদিনও আসিতে পারিবে? সারারাত সে যেন প্রহরীর মত এই দেবী নিকেতনে জাগিয়া, তাহাকে সকল অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করিতেছিল। যে-কাজে সে আসিয়াছিল, তাহার কথা বহুচেষ্টায় তাহার মনে করিতে হইতেছিল। নিতান্ত আয়া অতিশয় সাবধান, না হইলে জ্ঞানদার সেবা-শুশ্রূষা কেমন যে হইত, তাহা বলিবার নয়।

যতক্ষণ যামিনীর ঘরে আলো জলিতেছিল, ততক্ষণ প্রতাপের চোখে পলক পড়ে নাই। আলো যখন নিবিয়া গেল, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ বসিয়া পড়িল। সম্মুখের দীর্ঘ রাত্রি কেমন করিয়া তাহার কাটিবে? এত দূরে এত কাছে থাকিয়াও? যামিনী একরকম প্রতাপের অপরিচিতা বলিলেও হয়, কয়টা কথা মাত্র সে দায়ে পড়িয়া একদিন তাহার সহিত বলিয়াছে। কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে তাহার চেয়ে অন্তরতম আত্মীয়া কেহ নাই। তাহার সমগ্র জীবনের সঙ্গে যামিনীর সত্তা যেন মিশিয়া গিয়াছে। নিজেকে অনুভব করিবার ক্ষমতা যতদিন প্রতাপের থাকিবে, ততদিন যামিনী এমনিভাবেই তাহার মধ্যে জাগিয়া থাকিবে। অথচ বাহিরের জগতে তাহারা হয়ত চিরদিন এমনি অপরিচিতই থাকিয়া যাইবে।

আয়া থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া প্রতাপকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সচেতন করিয়া যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় একটা যখন, তখন সে প্রতাপকে ঘণ্টা-দুই ঘুমাইতে অনুরোধ করিয়া গেল। "আপ্ থোড়া শো যাইয়ে বাবু, আভি কুছ কাম নেহি হ্যায়।"

প্রতাপ ঘুমাইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে সে সারারাত জাগিয়া থাকিবার কথা দিয়াছে, এভাবে ঘুমান তাহার উচিত হইবে না, যদিই কোন প্রয়োজন হয়? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই মাথাটা তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

একেবারে ঘুমাইয়া না পড়িলেও, খানিকটা তন্দ্রা তাহার আসিয়াইছিল। হঠাৎ ভয়ানক চমকিয়া সে সোজা হইয়া বসিল। স্বপ্নই দেখিল, না সত্য? মৃদু লঘু পদক্ষেপে কে ঐ তাহার সম্মুখ দিয়া শরতের লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়া গেল? যামিনীই কি, না প্রতাপের আকুল আগ্রহই এমন করিয়া তাহার দৃষ্টিকে ছলনা করিল? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার সংশয় ভঞ্জন হইল, ঘরের ভিতর ঐ ত যামিনীরই কণ্ঠ-স্বর, অতি মৃদুকণ্ঠে সে আয়ার সঙ্গে কথা বলিতেছে। জ্ঞানদার অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই ত? তাহা হইলে প্রতাপের অসাবধানতা কি অমার্জ্জনীয় হইবে না? যামিনী কি বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য প্রতাপ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু স্পষ্ট কোন কথা তাহার কানে আসিল না।

যামিনী আর আয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রতাপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ শোয়া নেহি বাবু?"

প্রতাপ একটু হাসিয়া মাথা নাড়িল। হিন্দী বলা তাহার অভ্যাস ছিল না, যামিনীর সামনে ভুল হিন্দী বলিয়া বোকা বনিবার মারাত্মক একটা আতঙ্ক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। যামিনী বলিল, "আপনি একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতেন, মা ভালই ছিলেন, এখন একটু নড়ছেন দেখলাম।"

যামিনী আবার যে তাহার সঙ্গে কথা বলিবে, ততটা আশা করিতে প্রতাপের ভরসা হয় নাই। মনে মনে সে নিজের অদৃষ্টকে সাধুবাদ করিতে লাগিল, ভাগ্যে সে ঘুমাইয়া পড়ে নাই। এমন স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইলে, এ জীবনে সে-দুঃখ আর সে ভুলিতে পারিত না। যামিনীর কথার উত্তরে বলিল, "না, না জাগতে আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, রাত-জাগা আমার অভ্যাস আছে।"

যামিনী আয়াকে মৃদু কণ্ঠে কি একটা বলিয়া, নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আয়াও তাহার সঙ্গে গেল। প্রতাপ আবার চেয়ারে বসিয়া নৃপেন্দ্রবাবুর দেওয়া কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। আরও ঘণ্টা-চার তাহাকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। একখানা বই কি মাসিক পত্র থাকিলে মন্দ হইত না, মাঝে মাঝে উল্‌টাইয়া দেখা যাইত। মিহিরের ঘরের দরজা খোলা, সেখানে গিয়া খোঁজ করা যায়, তবে নৃপেন্দ্রবাবুর ঘুম ভাঙিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

আয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে ধূমায়িত পেয়ালা। বিস্মিত প্রতাপের সামনে পেয়ালা পিরীচ নামাইয়া রাখিয়া সে বলিল, "মিস্ বাবা কফি ভেজ দিয়া" বলিয়া সে ফিরিয়া গৃহিণীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

প্রতাপের তখনকার মনোভাব অবর্ণনীয়। স্বয়ং ইন্দ্রানী অমৃতের পাত্রহস্তে আবির্ভূতা হইলেও সে এতখানি অভিভূত হইত কিনা সন্দেহ। পেয়ালাটি স্পর্শ করিতেও তাহার মন উঠিতেছিল না, চিরকাল যদি উহা রাখা যাইত, তাহা হইলে প্রতাপ উহা সযত্নে লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু তাহাও হইবার নয়। যামিনীর দানের অমর্য্যাদা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং কফি খাইতে একেবারেই অনভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে পেয়ালাটি তুলিয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগিল। কফি তাহার মুখে তিক্ত ও বিস্বাদ লাগিতে লাগিল, কিন্তু নিজের কাছেও নিজে সে তাহা স্বীকার করিল না। যামিনী তাহার কথা এতটুকুও যে স্মরণ করিয়াছে, তাহার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নিজে পরিশ্রম করিয়া কফি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছে, এই চিন্তাই তাহার সমস্ত দেহমনকে যেন অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। কি শুভক্ষণেই সে আজ রাত্রি জাগিতে আসিয়াছিল। কফির পেয়ালাটি শেষ করিতেই তাহার আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এখনও যেন উহাতে কাহার চম্পকাঙ্গুলির সুঘ্রাণ লাগিয়া আছে। প্রতাপের ইচ্ছা করিতে লাগিল, উহা বুকপকেটে লুকাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু জগতে ক'টা ইচ্ছাই বা পূর্ণ হয়? অগত্যা পেয়ালাটা নামাইয়া টেবিলেই রাখিয়া দিতে হইল।

বাকি রাত্রিটুকু আয়া ভিন্ন আর কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ সময় নৃপেন্দ্রবাবু সশব্দে গলা পরিষ্কার করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রতাপকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিলেন, "বসুন, বসুন, সারারাতটা ত ঠায় বসেই কাটিয়ে দিয়েছেন বোধ হয়? আপনাকে তাড়াতাড়ি একটু চা-টা করে দিক?"

প্রতাপ বলিল, "আজ্ঞে না, আমি বাড়িই যাই, একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠে তারপর চা-টা খাব। এত সকালে চা কোনদিনই ত খাই না।"

নৃপেন্দ্রবাবুকে আর ভদ্রতা করিবার অবসর না দিয়া সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পড়িল। যামিনীর ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, দ্বার তখনও বন্ধ। খবরের কাগজ হাতে প্রতাপের ধ্যান আর কতক্ষণ চলিত, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু রাজু কাগজখানায় একটান দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। বলিল, "একটা কলমের দিকে ঠিক আধঘণ্টা তাকিয়ে আছ যে দেখি? বসে বসেই ঘুমচ্ছ নাকি?"

প্রতাপ চমকিয়া উঠিয়া কাগজখানা রাজুর হাতে ছাড়িয়া দিল। বলিল, "সারারাত জেগে এখনও মাথাটা ভার হয়ে আছে, কিছু কি আর চোখে দেখতে পাচ্ছি? যাই, সকাল সকাল স্নানটা করে নিই।"

রাজু বলিল, "এই ঠাণ্ডায় স্নান? তোমার মাথাই খারাপ দেখ্‌ছি। নিতান্তই যদি স্নান কর, তাহ'লে বউদিকে বল একটু গরম জল করে দিতে।"

বউদিদির উপর অতখানি আবদার করিবার ভরসা প্রতাপের হইল না, সে নীচে নামিয়া গিয়া চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলই টিনে করিয়া মাথায় ঢালিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার মস্তিষ্কটা যেন জমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু মাথার ভারটা যেন কিছু কমিয়া গেল, তন্দ্রার ঘোরটাও ছুটিয়া গেল।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়াই পড়িল পিসিমার সামনে। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ও কিরে এই শীতের দিনে এত ভোরে চান করলি? অসুখ করবে যে?"

প্রতাপ বলিল, "না-ঘুমিয়ে কেমন মাথা ভার হয়েছিল, তাই ধুয়ে ফেললাম।"

পিসিমা বলিলেন, "হবে না? যত সব অনাছিষ্টি। কার-না-কার অসুখ, ছেলে চল্‌ল্‌ রাত জাগতে।"

প্রতাপ ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিলে পিসিমা হয়ত আরও অনেকগুলি অপ্রিয় সত্য কথা বলিবেন, যা শুনিতে প্রতাপের মোটেই ভাল লাগিবে না।

খাইয়া-দাইয়া সে তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া গেল। বাড়ি হইতে দিনকয়েক চিঠি পায় নাই, সে জন্য একটু চিন্তা ছিল, কিন্তু সে-চিন্তাকে পিছনে ঠেলিয়া গতরাত্রির কথাগুলিই তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল।

বিকালে মিহিরকে পড়াইতে গিয়া সে একবার গৃহিণীর খবর লইল। মিহির বলিল, "ভালই ত আছেন।" মায়ের অসুখের উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সকল দিকেই গোলযোগ, তাহার জোরে হাঁটা, জোরে কথা বলা প্রভৃতি সবই বারণ।

প্রতাপ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "যদি রাত্রে থাকবার আবার দরকার হয়, আমাকে বলো।"

মিহির অতি সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।" প্রতাপের মনটা একটু দমিয়া গেল। মিহির অমন ভাবে উত্তর দিল কেন? সে কি কিছু সন্দেহ করিতেছে? এতটুকু ছেলের পক্ষে প্রতাপের মনোভাব বুঝিতে পারা কি সম্ভব? হইতেও পারে।

সেদিন আর পড়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে ছাত্রের সঙ্গে কথাই বলিল না। নৃপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরের কয়েকদিন দেখাই হইল না, সুতরাং গৃহিণীর বিশেষ কোনো খবরই সে পাইল না এবং যামিনীকেও একটিবারও দেখিতে পাইল না।

ব্যর্থ আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠায় সে যখন প্রায় আবার মিহিরেরই শরণ লইতে উদ্যত, এমন সময় একদিন মিহির নিজে হইতেই বলিয়া বসিল, "জানেন মাষ্টার-মশায়, মা বোধ হয় চেঞ্জে চলে যাবেন, এখানে তাঁর শরীর কিছুতেই সারছে না।"

প্রতাপের হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিয়া হঠাৎ যেন নীরব হইয়া গেল। একটু পরে সে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে যাবেন এখন? এই শরীরে একলা যাওয়া ত অসম্ভব।"

মিহির বলিল, "কি জানি, বাবাই যাবেন হয়ত," বলিয়াই সে অন্য একটা কথা পাড়িয়া বসিল।

মিহিরের পড়া সেদিন যা চমৎকার হইল, তাহা আর বলিবার নয়। প্রতাপের মনে তখন যেন প্রলয় আসিয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানদা একলা যাইতে পারিবেন না, শুশ্রূষার জন্য একজন কেহ সঙ্গে যাইবেই। যামিনীই যাইবে সম্ভবতঃ। আর প্রতাপকে থাকিতে হইবে পিছনে পড়িয়া। নিত্য এই বাড়িটাকে তাহাকে চোখে দেখিতে হইবে। প্রিয়ের প্রাণহীন দেহের মত, ইহা কি নিদারুণই তাহার দৃষ্টিতে ঠেকিবে। প্রতাপ পাঁচ-দশ মিনিট আগেই পড়ান শেষ করিয়া সেদিন উঠিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

মহারাণা প্রতাপসিংহ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে আবহমানকাল হইতে বীরপূজা চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা অতিমানব, শৌর্য্য ত্যাগ ভক্তি প্রেম কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রাকৃত মানবের বহু উর্দ্ধে যাঁহাদের স্থান, মানস-মন্দিরে স্মৃতির অর্ঘ্যে মানুষ চিরকাল তাঁহাদের পূজা করিয়া আসিয়াছে এবং করিবেও; কেন-না ইহাতে মানুষের আত্মতৃপ্তি হয়, কর্ম্মে প্রেরণা আসে, ভাবোন্মাদনা দ্বারা ইহা তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। যতদিন ভারতবর্ষে বীরপূজা শাস্ত্রের বিধানে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, ততদিন ভারত-মাতা সত্যই বীর-প্রসবিনী ছিলেন। পৌত্তলিক হিন্দু শুধু ইট-পাথরের পূজা করিয়া প্রাচীন কালে অর্থ ও পরমার্থ লাভ করে নাই; সেকালে বীরপূজাই ছিল হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। অন্য কোন জাতির তুলনায় বীরের মাহাত্ম্য হিন্দু কম বুঝে নাই। যিনি বীর তিনি নিত্যমুক্ত; দেশ, ধর্ম্ম ও জাতির কল্যাণের জন্য শস্ত্রপূত হইয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি নিষ্প্রয়োজন; তিনি অপুত্রক হইলেও তাঁহার পুন্নাম নরকের ভয় নাই; তর্পণাদি লোপের আশঙ্কা নাই। তবে শাণিত তরবারিতে যাহারা পৃথিবীর বক্ষে রক্ত-গঙ্গা বহাইয়া শুধু নিজেদের বিজিগীষা ও সাম্রাজ্যতৃষ্ণা মিটাইয়াছে, হিন্দুর চক্ষে তাহারা বীর নহে,—দানব কিংবা রাক্ষস; হিন্দুধর্ম্মে তাহাদের পূজার বিধান নাই; থাকিলে আমরা রাবণ কিংবা জরাসন্ধের পূজা করিতাম। শান্তনু-পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যোদ্ধগণের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার পূজা করি না, অঙ্কগত রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান ও আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া ত্যাগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আদর্শ রাজভক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র জাতির হৃদয় জয় করিয়াছিলেন; এজন্যই হিন্দুর তর্পণ-বারিতে তাঁহার প্রথম অধিকার। কার্লাইলের সংজ্ঞানুসারে বীর-রাজ হিসাবে (hero as king) হিন্দুরা দশরথ-নন্দন রামের পূজা করে। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য ইত্যাদি ত্রিকাল-দর্শী, মন্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ আমাদের 'প্রফেট' বা পয়গম্বর-স্থানীয় বীর—এজন্য শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাও পূজ্য। নরমুণ্ডস্তূপ, অখণ্ড দিগ্বিজয় কিংবা সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার ভারতবর্ষে বীরত্বের পরিমাপক নহে—মহান্ ত্যাগই বীরত্বের মাপকাটি। যোদ্ধা, রাজা, ঋষি, কিংবা নীতিবিৎ—যিনিই হউন না কেন, যাঁহার ত্যাগ যত বড়, বীর-পর্য্যায়ে তাঁহার স্থান তত উচ্চে।

নব্য ভারত বীরপূজায় ব্রতী; সেকাল ও একালের পূজার বিধান এক নহে। এজন্য বীরগণের সাম্বৎসরিক জয়ন্তী ভারতবর্ষের নানা স্থানে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে; প্রতাপ-জয়ন্তী ইহারই অন্যতম। কিন্তু যাঁহারা ভাবের প্রেরণায় প্রতাপ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাটক, উপন্যাস অথবা উপন্যাসমূলক ইতিহাসের ভিতর দিয়া মহারাণা প্রতাপকে দেখিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় মহামতি টডের 'রাজস্থান'—যাহা এতদিন আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়াছি—উহার অধিকাংশ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে যে-সমস্ত কথা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি—যথা, প্রতাপ ও শক্তসিংহের বিরোধ, শক্তসিংহের নির্ব্বাসন, কুমার মানসিংহের অপমান, 'খোরাসানী মুলতানীকা অগ্‌গল', বীর শক্তসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, ভীলদের আশ্রয়ে সপরিবারে প্রতাপের গিরিগুহায় বাস, দারিদ্র্য-পীড়িত ভগ্নহৃদয় প্রতাপের মেবার-ত্যাগের সঙ্কল্প, চিতোর-উদ্ধারের জন্য প্রতাপের সন্ন্যাসব্রত ও শপথ ইত্যাদি—সেকালের ভাট চারণের কল্পনামূলক কাব্য নাটকের মনোরম শাখাপল্লব বলিয়া এখন আমাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ অশুদ্ধ হইলেও

রাম মিথ্যা হইতে পারে না; মহাভারত কাব্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হয়ত কাল্পনিক নহেন। মহামতি টডের 'রাজস্থান' ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব, স্বদেশাভিমান ও স্বাধীনতার উপাসনা সীমাহীন কল্পনা-প্রান্তরের সুদূর আলেয়া-ভ্রান্তি নহে। সমস্ত ভারতবর্ষ এতদিন মিথ্যার উপাসনা করে নাই; স্তাবকের ছন্দে কালের বাতাসে মহারাণা প্রতাপের মিথ্যা খ্যাতি কথায় কথায় পল্লবিত উঠে নাই—ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে; কারণ এ-যুগে রাজপুত-ইতিহাসে তিনিই গুরুস্থানীয়। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ। তবে কোন কোন স্থলে গৌরীশঙ্করজীর সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। মুসলমান-পক্ষের যে-সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ মহারাণা প্রতাপের অকীর্ত্তিজনক বলিয়া পণ্ডিতজীর ধারণা জন্মিয়াছে, তিনি সেগুলি সঙ্গত কারণ ছাড়া অবিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্রাট্ আকবর ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাস হিসাবে ঐতিহাসিক আবুল-ফজল রচিত 'আকবরনামা' অমূল্য গ্রন্থ। মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে ইহাতে যেটুকু লিখিত আছে তাহাই ইতিহাস। একমাত্র রাজপুত-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া টড্ সাহেব পদে পদে ভুল করিয়াছেন। আবুল-ফজলের 'আকবরনামা'য় সকল ঘটনার সঠিক বর্ণনা নাই বলিয়া আমরা আবুল-ফজলকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে দোষ আবুল-ফজলের নহে; তিনি মিথ্যাকথা গড়িয়া তুলেন নাই। 'আইন-ই-আকবরী' পাঠে জানা যায়, মোগল-দরবারের ঘটনা, বিভিন্ন কর্ম্মচারী ও মনসবদারগণের মৌখিক বিবৃতি ইত্যাদি কেরাণীরা যাহা দেখিত কিংবা শুনিত তাহার একবর্ণ ব্যতিক্রম না করিয়া লিখিয়া রাখিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অন্য কর্ম্মচারীরা এই লেখাগুলির সারাংশের কয়েকটি প্রতিলিপি তৈয়ার করিয়া উজীরের দপ্তরে দাখিল করিত। মোগল-দরবারের ইতিহাস—'আকবরনামা','বাদশানামা' ইত্যাদি—এই সমস্ত সংবাদলিপি (news sheets)-অবলম্বনে লিখিত। এখন যদি কুমার মানসিংহ প্রতাপসিংহের কাছে অপমানিত হইয়া সম্রাটের প্রকাশ্য দরবারে বলেন, 'জাঁহাপনা! প্রতাপসিংহ আমাকে খুব খাতির করিয়াছেন এবং হুজুরের খেলাৎ পরিধান করিয়া শাহান্‌শার তাজিম করিয়াছেন,' তাহা হইলে এই ঘটনার দশ-পনের বৎসর পরে ঐ তারিখের দরবারী সংবাদলিপি পড়িয়া ইহা অবিশ্বাস করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব কি?—বিশেষতঃ ইহার সত্যতা যাচাই করিবার যখন অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আবুল-ফজলকে কিংবা দরবারী সংবাদলিপিগুলিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

দ্বিতীয় কথা, মহারাণা প্রতাপের সমসাময়িক মোগল-দরবারের একাধিক ইতিহাস আছে; কিন্তু মেবারের কোন ইতিহাস নাই,—আছে শুধু ভাটের কাহিনী ও কবিতা। কাব্যকে যদি ইতিহাস-রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে মহারাণা প্রতাপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ইতিহাস প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের সময়ে লিখিত 'অমর-কাব্য'। দুঃখের বিষয়, উহার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এক্ষেত্রে মুসলমান-লেখকেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে উহাই গ্রহণ করা বিচারসম্মত; যেমন,আমরা বহুদিন হইতে টডের 'রাজস্থানে' পড়িয়া আসিতেছি যে, হলদীঘাটের যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের ঘোড়া "চৈতক [চেটক] মানসিংহের হাতীর মাথায় পা তুলিয়া দিয়াছিল"; অথচ ইহা টড সাহেব চাক্ষুষ দেখেন নাই, কিংবা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত কোনও বিবরণও সম্ভবতঃ তিনি দেখেন নাই। আকবরের দরবারী ইমাম-মুল্লা আব্দুল কাদের বদায়ূনী হলদীঘাটে প্রতাপের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-পাঠে মনে হয় হলদীঘাটে রাণা প্রতাপ এবং মানসিংহ—উভয়েরই মধ্যে আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; প্রতাপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন মানসিংহের বড় ভাই মাধোসিংহের সঙ্গে! এস্থলে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক চিতোর-দুর্গ অধিকারের পর মহারাণা উদয়সিংহ চার বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ ফেব্রুয়ারি গোগুন্দা গ্রামে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার বিশ জন রাণী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত পচিশটি পুত্র ও বিশটি কন্যা ছিল; তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন কুমার প্রতাপ-সিংহ। পলাতক উদয়-সিংহ কুম্ভলমীর বা কমলমীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে, মাড়বার-রাজ্যের অন্তর্গত পালির সামন্ত চৌহান্ অখৈরাজ সোনিগরার কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরে চৌহান কুমারীর গর্ভে—সম্ভবতঃ কুম্ভলমীর-দুর্গে প্রতাপসিংহের জন্ম হয়। প্রতাপের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।



মহারাণা প্রতাপসিংহ

মেবারের অপ্রকাশিত ইতিহাস 'বীর-বিনোদ'-প্রণেতা শ্যামলদাসজী প্রতাপের জন্ম ১৫৯৬ বিক্রম সম্বৎ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-ত্রয়োদশী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল অক্লান্তকর্ম্মা ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা আজমেরের চণ্ডু নামক এক জ্যোতিষীর কাছে রাণা প্রতাপের জন্ম-কোষ্ঠী আবিষ্কার করিয়াছেন। গৌরীশঙ্করজী ছাড়া অন্য কেহ একথা বলিলে আমরা ইহাকে 'ভৃগু-সংহিতা'র গণনার মত সন্দেহ করিতাম। এই কোষ্ঠী অনুসারে ১৫৯৭ বিঃ সঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-তৃতীয়া রবিবার (৯ই মে, ১৫৪০ খৃঃ) সূর্য্যোদয়ের ৪৭ দণ্ড ১৩ পল গতে কুমার প্রতাপসিংহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মহারাণা উদয়সিংহের রাজত্বকাল ঘটনাবহুল হইলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে কুমার প্রতাপ-সিংহ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়ার কোন সুযোগ লাভ করেন নাই। বস্তুতঃ প্রতাপের পূর্ব্বজীবনে এই বত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইডরের রাও নারায়ণদাস রাঠোরের কন্যার সহিত বিবাহ এবং এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথম পুত্র অমর-সিংহের জন্ম (১৬ই মার্চ্চ, ১৫৫৯ খৃঃ) ব্যতীত যেন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। মহারাণা উদয়-সিংহ কনিষ্ঠা ভট্টিরাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এই জন্য তিনি এই রাণীর গর্ভজাত জগ-মালকে তাঁহার উত্তরাধি-কারী নির্ব্বাচন করিয়া-ছিলেন। শিবাজী ও শের শার মত রাণা প্রতাপও বোধ হয় পূর্ব্বজীবনে পিতার অবিচার ও তাচ্ছিল্য এবং বিমাতার ঈর্ষায় অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া ছিলেন। মহারাণা উদয়সিংহের প্রতি অন্যান্য পুত্রগণ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। পিতার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ শক্তসিংহ মেবার ত্যাগ করিয়া সম্রাট আকবরের নিকট চলিয়া গেলেন (১৫৬০ খৃঃ); ইহাই আকবর-কর্ত্তৃক চিতোর-আক্রমণের অন্যতম কারণ।

মহারাণা উদয়সিংহের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়া

পর্য্যন্ত তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী জগমাল কয়েক ঘণ্টা গদীতে বসিয়াছিলেন। মহারাণার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জগমালকে অনুপস্থিত দেখিয়া গোয়ালিয়র-রাজ রাম শাহ্ তঁবর কুমার সগরজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জাগমাল কোথায় ?'

সগরজী বলিলেন, "কেন ? আপনি কি জানেন না স্বর্গীয় মহারাণা তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত * করিয়া গিয়াছেন।"

ইহাতে প্রতাপের মাতামহ অখৈরাজ সোন্‌গরা সলুঁবর (সালুম্ব্রা)-পতি রাবত বিষণদাস ও রাবত সাঁগাকে বলিলেন, "আপনারা চুণ্ডার বংশধর, অতএব এ কাজ আপনাদের সম্মতিক্রমে হওয়া উচিত ছিল। শিয়রে আকবরের মত প্রবল শত্রু; চিতোর হস্তচ্যুত; মেবার-রাজ্য ছারখার; এ অবস্থায় যদি ঘরোয়া বিবাদ বাড়িয়া যায় তবে রাজ্য-নাশ সুনিশ্চিত।"

রাবত কিষণদাস এবং সাঁগা বলিলেন,"জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রতাপসিংহ,—যিনি সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য, তিনি-ই মহারাণা হইবেন।" উদয়সিংহের দাহক্রিয়া হইতে ফিরিয়া গিয়া জগমালকে বলিলেন, "কুমার ! আপনার আসন গদীর সম্মুখে; ঐখানেই বসা আপনার উচিত।" এ-কথা শুনিয়া জগমাল সপরিবারে মেবার ত্যাগ করিলেন। সর্দ্দারেরা ঐ দিনই প্রতাপকে গদীতে বসাইয়া নজরানা দিলেন। (২৮-এ ফেব্রুয়ারি, ১৫৭২ খৃঃ)।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যারোহণের এই বর্ণনা অনেকটা নাটকীয় ব্যাপারের মত মনে হয়। শুধু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ-ভাবে একটা ওলট্-পালট্ হওয়া সম্ভব নয়, যদি ইহার পশ্চাতে কোন পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র না থাকে। প্রথম হইতেই বোধ হয়, প্রতাপের মাতামহ মেবারের গদীতে নিজের দৌহিত্রের জন্মগত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য মেবার-সামন্তগণের মধ্যে একটা দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এবং ইহারা যে বেশ প্রস্তুত হইয়া মহারাণা উদয়সিংহের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক প্রতাপ স্বয়ং কখনও তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। জগমালের সপক্ষে বোধ হয় বিশেষ

* রাজার উত্তরাধিকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় না যাওয়া মেবারের চির-

কেহ ছিল না। তিনি স্বেচ্ছায় মেবার ত্যাগ করিয়া আকবরের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ দেশদ্রোহী জগমালকে মোগলবিজিত মেবারের জাহাজপুর পরগণা জাগীর প্রদান করিয়া কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গোগুন্দায় গদীতে বসিবার কয়েক মাস পরে কুম্ভলমীর-দুর্গে প্রতাপের অভিষেকোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইল। প্রবল মোগলশক্তির সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য, কিন্তু বলসঞ্চয় করিবার জন্য মেবারের পক্ষে কিঞ্চিৎ অবসর নিতান্ত প্রয়োজন। আকবর যাহাতে সহসা মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান না করেন, সেজন্য প্রতাপ তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নীতি প্রয়োগ করিলেন।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যাভিষেকের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সম্রাট্ আকবর গুজরাট ও সুরাট-বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট রাজধানী ফতেপুর সিক্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় সিদ্ধপুর হইতে (আমেদাবাদের চৌষট্টি মাইল উত্তরে অবস্থিত) কুমার মানসিংহকে * কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান মনসব্‌দারের সহিত ইডরের পথে ডুঙ্গরপুরের দিকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রতি আদেশ ছিল যেন রাণা (প্রতাপ সিংহ) এবং নিকটস্থ ভূস্বামিগণকে রাজোচিত ব্যবহার ও অনুগ্রহে বশীভূত **করিয়া** বাদশাহী দরবারে কুর্ণিশ করিবার জন্য **সঙ্গে আনে** এবং যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে না তাহাদিগকে যেন দণ্ড দেওয়া হয়। (*Akbarnama*, Eng. trans. Beveridge, iii. 48.)

ইডরের রাও নারায়ণ রাঠোর মহারাণা প্রতাপের

* রাজা মানসিংহ ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও 'আকবর্‌নামা'র ইংরেজী অনুবাদক বেভারিজ সাহেবের অনবধানতায় তাঁহার বাপের নাম কোথাও ভগবান দাস, আবার কোথাও বা ভগবন্ত দাস লেখা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব দুজনকে একই ব্যক্তির নামের রূপান্তর মনে করিয়া বাপের পিণ্ড খুড়োকে দেওয়ার মত কাজ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ দাস ও ভগবন্ত দাস রাজা ভারমল বা বিহারী মলের দুই ছেলের নাম; রাজা ভারমলের উত্তরাধিকারী ভগবান দাস অপুত্রক হওয়ায় ভগবন্ত দাসের দ্বিতীয় পুত্র মানসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ভগবন্ত দাসও মোগলদরবারে চাকরি করিতেন এবং লোকের কাছে 'বাঁকা রাজা' (obstinate prince) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (মুন্সী দেবীপ্রসাদ রচিত প্রাচীন চিত্রাবলী;

শ্বশুর ; পরমবৈষ্ণব এবং তেজস্বী বীরপুরুষ। কথিত আছে, তিনি স্বহস্তে গো-সেবা করিয়া গোবরের সহিত যে ধান্যাদি বাহির হইত তাহার তণ্ডুল দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন। তিনিও বহুদিন আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ডুঙ্গরপুর-রাজ্যে (মেবারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরাবল্লীর উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত) গহলোৎ প্রধান শাখার বংশধর মহারাবল অস্‌করণও এ যাবৎ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মালব ও হাড়াবতী, উত্তরে আজমের মেরওয়াড়া, দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র, পশ্চিমে মারবাড় ও গুজরাট প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আরাবল্লীর দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বতশিখর হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ আশ্রয় হইয়া উঠিল।

আকবর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জানিতেন হাড়া, কচ্ছবাহ, রাঠোর শুধু বেতস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোগলশক্তির কাছে অবনত হইয়া আছে ; সুযোগ পাইলেই আবার মাথা তুলিবে ; সুতরাং জাতির মানসপট হইতে স্বাধীনতার আদর্শ মুছিয়া না ফেলিলে, রাজপুত-গৌরব ও স্বাধীনতার শেষ অগ্নিকণা না নিবিলে তাঁহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য নিরাপদ নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যতদিন মেবারের মুকুটমণি মোগল-সিংহাসনের পাদপীঠ স্পর্শ না করিবে ততদিন অন্যান্য রাজপুতের মস্তক নত হইলেও মন নুইয়া পড়িবে না ; রাজপুত জাতির মেরুদণ্ড অনমনীয়ই থাকিবে। এজন্যই ক্ষুদ্র মেবার-জয়ের জন্য মোগল-সম্রাটের এত বলবতী ইচ্ছা—এত আয়োজনের ঘটা।

কুমার মানসিংহ সিদ্ধপুর হইতে ইডরে আসিয়া রাও নারায়ণ দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মোগল-সম্রাটের সঙ্গে সহসা যুদ্ধ করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া তিনি মানসিংহকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং ভবিষ্যতে সুবিধামত বাদশার দরবারে হাজির হওয়ার মৌখিক ইচ্ছাও জানাইলেন। মোগল-সৈন্য সেখান হইতে ডুঙ্গরপুর পৌছিল। ডুঙ্গরপুরের মহারাবল অস্‌করণ মানসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতে পলাইয়া গেলেন। কুমার মানসিংহ ডুঙ্গরপুর (টড্-কথিত দাক্ষিণাত্যের শোলাপুর নয়) বিজয় করিয়া ঐ বৎসর (১৫৭৩ খৃঃ) আষাঢ় মাসে উদয়পুরে যাত্রা করিলেন। মহারাণা প্রতাপ কুম্ভলমীর হইতে উদয়পুর আসিয়া বিশিষ্ট অতিথিভাবে তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহার পর কি ঘটিয়াছিল এই সম্বন্ধে রাজপুত ও মোগল পক্ষের বিবরণে ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

টড-কথিত বর্ণনা অর্থাৎ উদয়-সাগর-তীরে কুমারের সম্মানার্থ ভোজের আয়োজন, মানসিংহের সহিত পংক্তি-ভোজনে রাণার অস্বীকৃতি, বিনাভোজনে মান-সিংহের প্রস্থান ; গমনকালে কুমারকে গালাগালি, এবং আবার মেবারে আসিবার সময় তাঁহার পিসা আকবরকে সঙ্গে আনিবার বিদ্রূপ ইত্যাদি রাজপুতানার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্যামলদাসজী এবং গৌরীশঙ্করজী মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে গৌরীশঙ্করজী বলেন, ভোজনের সময় রাণার অজুহাত ছিল মাথাধরা নয়—অগ্নিমান্দ্য, যেহেতু রামকবি-প্রণীত জয়সিংহ-চরিত্রে আছে :—

> কহী গরাণী কী কুঁবর ভই গরাণী জোহি।
> অটক নহী কর দেউংগো তুরণ চুরণ তোহি॥
> দিয়ো ঠেল কাংসো কুঁবর উঠে সহিত নিজ সাথ।
> চুলু আঁন ভরি হোঁ কহ্যৌ পোঁছ রুমালন হাথ॥

অর্থাৎ, কুমার বলিলেন 'গরাণী' যাহাই হউক না কেন আমি শীঘ্রই আপনাকে হজমী চূর্ণ দিতেছি। পশ্চাৎ কুমার কাঁসার থাল ঠেলিয়া ফেলিয়া সহযাত্রীগণের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রুমালে হাত মুছিয়া বলিলেন—আচমনের গণ্ডূষ আর একবার আসিয়া করিব।

ইহা ছাড়া 'রাজপ্রশস্তি'-কাব্যেও এই আখ্যানের ইঙ্গিত আছে—

> প্রতাপ সিংহোঽথ নৃপ কচ্ছবাহেন মানিনা।
> মানসিংহেন তস্যাসীদ্বৈমনস্যং ভুর্জেবিধৌ॥
> অকবরপ্রভোঃ পার্শ্বে মানসিংহস্ততো গতঃ
>
> (রাজপ্রশস্তি-কাব্য, সর্গ ৪)।

অর্থাৎ, মানী কচ্ছবাহ মানসিংহের সহিত ভোজনবিধি ব্যাপারে প্রতাপসিংহের সহিত বৈমনস্য ছিল। সে স্থান হইতে তিনি প্রভু আকবরের কাছে গমন করিলেন।

কিন্তু কুমার মানসিংহ উদয়পুর হইতে ফিরিয়া গিয়া

সম্রাট আকবরের কাছে মহারাণা প্রতাপের আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যরূপই বলিয়াছিলেন ; যথা :

"From there the army went...to Udaipur which is the native country of the Rana. The Rana came to welcome them, and received him with respect and put on the royal khilat. He brought Man Singh to his house as guest, but owing to his evil nature he proceeded to make excuses * (about going to court), alleging that 'his well-wishers would not suffer him to go.' He made promises about going to the sublime court, but raised objections, and gave Man Singh leave to depart, while he himself stayed and procrastinated." (*Akbarnama*. iii. 57).

গৌরীশঙ্করজী বলেন, প্রতাপসিংহ বাদশাহী খেলাৎ পরিধান করার কথা দূরে থাক আকবরকে বাদশাহ বলিতেন না, বলিতেন তুর্ক ; উক্ত বর্ণনা চাটুকার আবুল-ফজল বাদ্‌শাহর মহত্ব বাড়াইবার জন্য মিথ্যা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পণ্ডিতজীর নিরপেক্ষ বিচার অপেক্ষা উষ্মাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিচারের প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন, রাজপুত ও মোগল বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য ? প্রথম কথা, আবুল-ফজল একান্ত সমসাময়িক ঐতিহাসিক ; রাম কবির রচনা এবং রাজপ্রশস্তি-কাব্য নিতান্ত কমপক্ষে এই ঘটনার আশি-নব্বই বৎসর পরে লিখিত ; অধিকন্তু এই রচনাগুলি ইতিহাস নহে—কাব্য মাত্র। ঐতিহাসিক বিচারে হিন্দুরচিত কাব্যকে মুসলমান-লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাসের উপরে স্থান দেওয়া নিঃসন্দেহ অবিচার। দ্বিতীয়তঃ, "শক্তসিংহ কর্ত্তৃক খোরাসানী মুলতানীকে বধ করিয়া প্রতাপের জীবনরক্ষার কথা" রাজপ্রশস্তি-কাব্যে থাকিলেও গৌরীশঙ্করজী বলেন উহা বিশ্বাস্য নয়,—মিথ্যা জনশ্রুতিই ছন্দোবদ্ধ হইয়া রাজপ্রশস্তি-কাব্যে স্থান পাইয়াছে। মানসিংহের অপমান এবং হলদীঘাটের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন বৎসর, সুতরাং "খোরাসানী মুলতানীকা অগ্‌গল" মিথ্যা হওয়া সম্ভব হইলে, প্রতাপের পেটব্যথা বা মাথাধরাও মিথ্যা হওয়া বিচিত্র নয়। যদি বলা হয়, মেবারের লোকেরা না-হয় কচ্ছবাহদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এ গল্প সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু কচ্ছবাহ-কবির মানসিংহের অপমানের কথা চিরস্মরণীয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে ? রাম কবির বর্ণনায় মানসিংহের অপমান অপেক্ষা তেজ ও আত্মসম্মানই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে ; নিন্দা মানসিংহের নহে, নিন্দা মহারাণা প্রতাপের। টড সাহেব ইহা বুঝিয়াও বোঝেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

"Rajah Man was unwise to have risked this disgrace; and if the invitation went from Pratap, the insult was ungenerous as well as impolitic: but of this he is acquitted."

আমরা বুঝি না কেমন করিয়া প্রতাপ নিন্দার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মোট কথা, গৃহাগত অতিথিকে অপমানিত করিবার জন্য ভোজের আয়োজন, এবং প্রস্থানকালে মানসিংহ ও আকবরকে দু-দশটা গালাগালি দেওয়া নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা,—উপন্যাস মাত্র। যে চারণ এই মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়াছিল সে স্তাবক হইয়াও বুদ্ধির দোষে মহারাণা প্রতাপের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বৃথা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। তাহা মুছিতে হইলে ঐতিহাসিকগণকে বেগ পাইতে হইবে।

আমরা মনে করি, মানসিংহের নিমন্ত্রণ ও অপমানের ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা ; ইহাতে মানসিংহ ও প্রতাপের সাক্ষাৎকার ছাড়া অন্য একবর্ণও সত্য নয়। টড্ সাহেব হইতে গৌরীশঙ্করজী পর্য্যন্ত যে গল্পটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত কারণে তাহা আমরা ভিত্তিহীন কবিকল্পনা বলিয়া মনে করি।

১। মানসিংহ প্রতাপের সাক্ষাৎকারের মাত্র তিন মাস পরে রাজা ভগবান দাস (ভগবন্ত নয়) ইডরের পথে সম্রাটের আদেশে আবার মেবারে গিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপ গোগুন্দায় আসিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। মানসিংহ সত্যই যদি ঐ ভাবে অপমানিত

---

* এ স্থলে u*r শব্দকে *ghadr* পড়াতে এই ঘটনাটি ইলিয়টের (vol. VI. 42) অনুবাদে ভিন্নরূপ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যেন প্রতাপ মানসিংহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা দাগাবাজী করিতে

মধ্যে আবার মিত্রভাবে প্রতাপের সহিত দেখা করা কি সম্ভবপর ?*

পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী 'আকবরনামা' হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু উপরে বর্ণিত কথাগুলি ইচ্ছাক্রমে কিংবা অনবধানতাবশতঃ তিনি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। মহারাণা প্রতাপ যুবরাজ অমরসিংহকে রাজা ভগবান দাসের সহিত আকবরের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; কেন-না, আবুল-ফজলের সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দীন আহমদ্, কিংবা বদায়ূনী এ-কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা যদি সত্য হইত, তবে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনী বা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে মেবার-বিজয় প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই ইহার উল্লেখ করিতেন; এবং কুমার কর্ণসিংহের মোগল-দরবারে আগমনে বিজয়ের আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন না। স্বয়ং আবুল-ফজলও তাঁহার পুস্তকের আর কোন স্থানে অমরসিংহের মোগল-দরবারে আগমনের কথা লেখেন নাই। সুতরাং প্রতাপসিংহ পুত্রকে মোগল-দরবারে পাঠাইয়াছিলেন এ কথাটি মিথ্যা। তাহা হইলে হয়ত সকলে বলিবেন, উপরি উক্ত সব কথাই মিথ্যা—আবুল-ফজলের চাটুবাদ মাত্র।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, একজন রাজকুমার রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে সত্যই আকবরের দরবারে কুর্ণিশ করিতে আসিয়াছিলেন; রাজপুত্রের নাম অমরসিংহ হইতেও পারে; কিন্তু এ অমরসিংহ মহারাণা প্রতাপের পুত্র নহেন,—শ্যালক—ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোরের উত্তরাধিকারী। 'আকবরনামা'-অনুবাদক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের বিচার-বিভ্রাটে এই ভুলটি হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে অনুবাদের পাদটীকায় অমর-সিংহ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The Lucknow edition [of *Akbarnama*] has 'the son of the Zamindar', and Blochmann (333), calls him Amar, son of the Zamindar or Rana of Idar, but it seems that he really was the son of Rana Kika.—See Jarret, (269) where he is described as Pertab's successor" (*ibid.*, p. 92, foot-note).

লক্ষ্ণৌ সংস্করণের পাঠই এস্থলে শুদ্ধ ছিল; ওখানে অমরসিংহ নাম নাই। ব্লকম্যান 'আইন্-ই-আকবরী'র অনুবাদের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন, উহা হয়ত 'আকবরনামা'র অন্য কোন হস্তলিখিত পুঁথি কিংবা অন্য ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। কিন্তু যে অমরসিংহকে ব্লকম্যান্ সাহেব ইডরের রাজকুমার বলিয়াছেন তাহাকেই বেভারিজ সাহেব প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ সাজাইয়াছেন। ব্লকম্যান্ সাহেবের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া বেভারিজ নিজেই মহাভুল করিয়াছেন। উপরি উদ্ধৃত 'আকবরনামা'র অনুবাদে

"He sent along with him his son and heir...he too would soon come and do homage in person."

এই কথাগুলি ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোর সম্পর্কে বলা হইয়াছে; অনুবাদে এগুলি যথাস্থানে রাখা হয় নাই। এগুলি আসিবে "He presented suitable presents" এই পদের ঠিক পূর্ব্বে—পরে নয়।

যাহা হউক, কুমার মানসিংহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন

* বেভারিজ-কৃত 'আকবরনামা'র অনুবাদে নিম্নলিখিত কথা-গুলি পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী আদৌ আলোচনা করেন নাই। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই প্রতাপের উত্তরাধিকারী (অমরসিংহ) রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে আকবরের দরবারে গিয়াছিলেন—যথা:

"The brief account of the campaign of this victorious army is··· then proceeded towards Idar. The Zamindar thereof, Narain Das Rathor recognized the arrival of the imperial officers as a great honour and went forward to welcome them. He presented suitable gifts, and when the victorious army reached Goganda, which is the Rana's residence, Rana Kika expressed shame and repentance for his past conduct and prolonged deficiency in service, and by way of submission came and visited Rajah Bhagwant (? Bhagwan) Das. He also took to his house and treated him with respect and hospitality. He sent along with him his son and heir, and represented that by ill-fortune a feeling of desolation had taken possession of him, and that now he was presenting his petition through the Rajah and was sending his son as a mark of obedience. When his desolate (or savage) heart should become soothed by lapse of time, he too would come and do homage in person. After a little time Rajah Todar Mal also arrived from Gujrat and did homage...The Rana visited him on his way and displayed flattery and submissiveness." (*Akbarnama*, iii. 92-93).

করিবার তিন চার মাস পরেই রাজা ভগবান দাস গোগুন্দায় মহারাণা প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন —এটুকু অস্বীকার করিবার জো নাই। তাহা হইলেই প্রমাণিত হয় প্রতাপের মানসিংহকে অপমানিত করিবার কথাটা কাল্পনিক।

২। দ্বিতীয় কথা—হলদীঘাটের যুদ্ধের মাত্র চারি মাস পরে মানসিংহ দরবারে ফিরিয়া আসিবার পর প্রতাপের হিতৈষী বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আবুল-ফজল বলেন,—

"Tricksters and time-servers suggested to the royal ear that there had been slackness in extirpating the wretch, and officers [among whom Man Singh was one] were nearly incurring the king's displeasure" [*Akbarnama*, iii. 260.]

বদায়ুনী লিখিয়াছেন,—

"And at this time, when news arrived of the distressed state of the army at Gogunda [not Kokandah] the Emperor sent for Man Singh, Asaf Khan, and Qazi Khan to come alone from that place, and on account of certain faults which they had committed, he *excluded* Man Singh and Asaf Khan (who were associatated in *treachery*) *for some time from the Court.*..."—Lowe's translation of *Muntakhab-ut-tawarikh*, p. 247.

নিজাম-উদ্দীন বলেন, মানসিংহ এবং আসফ খাঁ রাণার রাজ্যে লুটতরাজ করিতে না দেওয়ায় মোগল-সৈন্যদের কষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছিল—এজন্যই সম্রাট তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা মানসিংহ ঘরে বাহিরে লাথি খাওয়ার পাত্র ছিলেন না। যদি মহারাণা প্রতাপ সত্যই তাঁহাকে ভোজন-ব্যাপারে অপমানিত করিতেন তাহা হইলে মেবার-রাজ্যের উপর এতখানি দরদ মানসিংহের থাকিত কি?

৩। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কুমার মানসিংহ ও রাজা ভগবান দাসের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার না হওয়ায় ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সুচতুর সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহ্‌বাজ খাঁ সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াই রাজা ভগবন্ত দাস পাঠাইয়া দিলেন, পাছে প্রতাপের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়

"...lest from their feelings as landholders there might be delay in inflicting retribution on that vain disturber."

৪। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে মনে হয় না মানসিংহ প্রতাপের অপমানিত-শত্রু; বরং ব্যাপারটা আমূল আলোচনা করিলে মনে হয় তাঁহারা রাণার হিতৈষী ছিলেন। প্রতাপের খেলাৎ-গ্রহণ, বশ্যতাস্বীকার, স্তোক-বাক্য ইত্যাদি সত্য না হইতে পারে। কিন্তু বাদশাহের দরবারে এগুলি না লিখিলে নিজেদের মুখ রক্ষা হয় না, প্রতাপকেও সম্রাটের কোপ হইতে বাঁচান যায় না, এই জন্য রাজা ভগবান দাস ও কুমার মানসিংহ এ সমস্ত কথা মোগল-দরবারে বলিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারা এই গল্পের কাল্পনিকতা প্রমাণিত হয়,—

১। 'বংশভাস্করে' লিখিত আছে, রাজা ভগবন্ত দাস (ভগবান দাস) মহারাণা উদয়সিংহের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ভোজন করিবার সময় কচ্ছবাহ-পতি মহারাণাকে বলিলেন—আপনিও আসুন। মহারাণা বলিলেন, আজ আমার একশণা ব্রত; আপনি অন্নগ্রহণ করুন। তবুও ভগবন্ত দাস মহারাণাকে ভোজন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন দেখিয়া নিজ কুলের দর্পাভিমানী শিশোদিয়া সামন্তেরা বলিয়া উঠিলেন,

তুম সংগ ভোজন হমহু ন করহিঁ দুর রাণ উদন্ত।
দিল্লীস কোঁ দুহিতা বিবাহ হো বড়ে কুল হন্ত॥

অর্থাৎ,—তুমি বড়ই কুলঘ্ন; দিল্লীশ্বরকে কন্যাদান করিয়াছ তুমি; রাণা উদয়সিংহের কথা দূরে থাক আমরাও তোমার সহিত ভোজন করি না। (বংশভাস্কর, পৃ. ১২৪১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই বিষয়টি মামুলী গল্প।

২। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে ভাটেরা এই গল্প সৃষ্টি করিয়া মোগলদের মেবার-আক্রমণের কারণ-স্বরূপ ইহা কখনও উদয়সিংহের নামে, কখনও-বা প্রতাপের নামে চালাইয়া দিয়াছে। মহারাণা উদয়সিংহের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযানের কারণগুলি—অর্থাৎ মালবপতি

সিংহের সহিত আকবরের সাক্ষাৎকার ও মোগল-শিবির হইতে কুমার শক্তসিংহের পলায়ন ইত্যাদি ঘটনা ভাটদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—স্বয়ং টড সাহেবও এ সমস্ত ঘটনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। সেইজন্য রাজশ্যালক ভগবন্ত দাসের অপমানের গল্পটাই আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণের কারণ-স্বরূপ প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে ইহা আরও পল্লবিত হইয়া মহারাণা প্রতাপের নামে প্রচলিত হইল। হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ ও মানসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রতাপের ঘোড়া 'চেটকে'র (চৈতক নয়) পা মানসিংহের হাতীর মাথায় তুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি এই গল্পের উপসংহার এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩। যে-সময়ে এ গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছিল সে-সময়ে সগরজী ও তাঁহার তথাকথিত ধর্ম্মত্যাগী পুত্র মহাবৎ খাঁ রাজপুতানায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; নতুবা মহাবৎ খাঁকে হলদীঘাটে টানিয়া আনিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মহাবৎ খাঁ নিজের বিশ্বস্ত রাজপুত সৈনিকদের সাহায্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়াছিলেন; সুতরাং মহাবৎ খাঁর* দেহে রাজপুত রক্ত থাকাই সম্ভব; এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসজ্ঞানহীন চারণ-কবি তাঁহাকে সগরজীর পুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মনে হয় সম্রাট শাহ্‌জাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই বোধ হয় উল্লিখিত গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, টড ও 'বীর-বিনোদ'-প্রণেতা শ্যামল-দাসজীর ন্যায় মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করজীর মত ঐতিহাসিকও প্রতাপ ও মানসিংহ সম্বন্ধীয় অনৈতিহাসিক গল্পটি মানসিংহের মেবার-অভিযানের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ এই ব্যাপার ও হলদীঘাটের যুদ্ধের মধ্যে পূর্ণ তিন বৎসরের ব্যবধান। উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যেকেই বিবেচনা করিবেন।

* মহাবৎ খাঁর জীবনী, 'তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী' এবং 'মাসির-উল্-উমারা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য; তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল জমানা বেগ; তিনি কাবুলবাসী ঘেউর বেগের পুত্র। মহাবৎ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর তিনি আশ্রিত মোল্লাদের দ্বারা কেতাব লেখাইয়া সৈয়দ হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যোগাযোগ *

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি না জানলে এর মধ্যে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে, এবং সেগুলি মীমাংসার দিকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা যাবে না। তাই আমরা সংক্ষেপে গল্পের প্লটটি বল্‌তে বল্‌তে প্রসঙ্গত সমস্যা মীমাংসা ও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব আলোচনা ক'রে যাব। আমার এই আলোচনা সমালোচনা নয়, কবিগুরুর অসংখ্য শ্রদ্ধান্বিত পাঠকের মধ্যে একজনের মনে এই উপন্যাসখানি কেমন লেগেছে, তারই পরিচয় 'প্রবাসী'র পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে এনে উপস্থিত করছি। তাঁরা অনেকেই এই বই পড়েছেন। কারণ এ বই ছাপা হয়েছে ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে, তার পর সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর অতীত হয়ে গেছে। যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে এর একরকম ছাপ পড়েছে, তাঁরা মিলিয়ে দেখতে পারবেন যে, একই বই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন ছাপ ফেলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—"কাব্যের একটা প্রধান গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজন-শক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহবা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব, সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতস-বাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতস-বাজি।" (পঞ্চভূত, কাব্যের তাৎপর্য্য)। আর যাঁরা এ বই এখনও পড়েন নি, তাঁরা আমার আলোচনা প'ড়ে যদি বইখানি পড়তে আগ্রহান্বিত হন তাহ'লে তাতেও আমার শ্রম সফল হবে।

এক গ্রামে দুই জমিদারের বাস ছিল, ঘোষাল-বংশ আর চাটুজ্জে-বংশ। উভয় বংশে রেষারেষি ছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা নিয়ে। "ঘোষালরা স্পর্দ্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল।" ঘোষালেরা রাতারাতি বিসর্জ্জনের রাস্তা জুড়ে তুললে এক তোরণ, তাতে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা গলে না। তার ফলে দু-পক্ষের অনেক লোকের মাথা ভাঙ্‌ল। কাজেই মামলা-মোকদ্দমা থেকে উভয় পক্ষই জেরবার হ'য়ে গেল, বিশেষ ক'রে ঘোষালেরা। শেষকালে তাদের বংশমর্য্যাদা উচ্চ নয় ব'লে তাদের সমাজেও হেয় করা হ'ল। তখন ঘোষালেরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে অন্য গ্রামে চ'লে গেল। সেই ঘোষাল-বংশের আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের

* যোগাযোগ—কবিসার্বভৌম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপান্ত উপন্যাস। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। পাইকা টাইপে পরিষ্কার ছাপা। ডবলক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা আকারে ৪৭১ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲; বাঁধাই ২৸৹।

মুহুরী হ'ল। তার ছেলে মধুসূদন ছেলে-বেলা থেকেই আড়তে মানুষ হ'য়ে ব্যবসার হাটহদ্দ জেনে নিলে, আর লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসায়ে ঢুকে ক্রমে মহারাজ হয়ে উঠল। মধুসূদন ছেলেবেলা থেকে হিসাবে দক্ষ, দৃঢ়স্বভাব, এক কথার মানুষ, যা ধরে বা বলে তা করে। সে অর্থসঞ্চয়ে এমন মন দিলে যে তার মা পুত্রবধূর মুখদর্শনের আশা ত্যাগ ক'রেই পরলোকে প্রস্থান করলেন। যখন মধুসূদন কারবার খুব ফলাও ক'রে তুলে রাজা মহারাজা খেতাব পেয়ে সমাজে লোকমান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন সে বললে এইবার বিবাহের ফুরসৎ হয়েছে।

নানা জায়গা থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসতে লাগল। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বললে—ঐ চাটুজ্জেদের মেয়ে চাই। মধুসূদন তার পূর্ব্বপুরুষের লাঞ্ছনার কথা এক দিনও ভোলেনি। যারা তাদের কুলের খোঁটা দিয়ে দেশছাড়া করেছিল, চাই তাদেরই ঘরের মেয়ে। মধুসূদন পণ করেছিল—টাকার জোরে সে চাটুজ্জেদের কুলগর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে ছাড়বে।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থাও এখন ভাল নয়, তাদের জমিদারী দেনায় জড়িয়েছে। তাদের পরিবারের মধ্যেও ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এক ভাগে আছে দুই ভাই বিপ্রদাস আর সুবোধ, আর পাঁচ বোন; চার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে,—তাদের বাপ মা বেঁচে থাকতেই তাঁরাই অনেক পণ দিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন; ছোট বোন কুমুদিনীর বিবাহ হবার আগেই তার বাবার অসচ্চরিত্রতার জন্য তার মা রাগ ক'রে বৃন্দাবনে চ'লে যান, সেই শোকে কুমুদিনীর বাবা অল্প দিনের মধ্যেই মারা যান, এবং তার অল্প দিন পরেই তার মাও স্বামীর সহগমন করেন। তখন তার রক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে তার বড়দাদা বিপ্রদাসের উপর। বিপ্রদাস বোনকে লেখাপড়া গান-বাজনা বন্দুক-ছোঁড়া প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুশিক্ষিতা ক'রে তোলেন। কুমুদিনীর বয়স হয়েছে উনিশ। এখন তার বিয়ে দিতে হবে। অথচ চাটুজ্জে-বংশের মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত পণের টাকার সঙ্গতি তখন বিপ্রদাসের নেই। এই সময় হঠাৎ বিপ্রদাসের মাড়োয়ারী মহাজন বিপ্রদাসকে টাকার তাগাদা দিয়ে বসল, এবং সেই সময়েই একজন বন্ধু অনেক দিন পরে হঠাৎ এসে বিপ্রদাসকে পরামর্শ দিলে যে, মহারাজা মধুসূদনের কাছ থেকে এক থোকে এগার লাখ টাকা ধার নিয়ে সে-সব খুচরা দেনা মিটিয়ে ফেলুক। বিপ্রদাস তাই করলে। ছোটভাই সুবোধ বললে এখন উপার্জ্জনের পথ দেখতে হবে, সে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। সে গেল বিলাত। মাড়োয়ারীর তাগাদা আর বিপ্রদাসের বন্ধুর অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়ত কৌশলী মধুসূদনের কৌটিল্যনীতিরই ফল।

কুমুদিনীর বিবাহের পণ জোটানো আর পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করতেই তার দাদা বিপ্রদাসের আতঙ্ক হয়। তাই কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সঙ্কুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে মনে মনে কেবল ভাবে—"কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাত রাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।"

কুমুদিনী "বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্ত্তব্য করতে পারছে না ব'লে ওর ভাইরাও বড় ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে।"

বিপ্রদাস সাবেক চাল বজায় রাখা কঠিন দেখে কুমুদিনীকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। দেশ ছেড়ে কুমুদিনীর মন খাঁ খাঁ করে। বিপ্রদাস বেশী ক'রে বোনকে সাহিত্য এসরাজ বন্দুক-ছোঁড়া শেখান, একসঙ্গে দাবা খেলেন। এখানে এসে ভাইবোন পরস্পরের সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কুমুদিনীর মনটা জন্ম-একলা। বিপ্রদাসও নানা চিন্তায় গম্ভীর প্রশান্ত।

কুমুদিনী "দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতন চিকণ গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব। এক রকমের সৌন্দর্য্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশী।...কুমুদিনী ঘরে লেখাপড়া করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরানো নূতন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।" তার দাদা তাকে দেখে ভাবেন—"ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে রেখেছে।"

আর "বিপ্রদাসের দেবতার মত রূপ, বীরের মত তেজস্বী মূর্ত্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। তাঁর মুখে সেই বিষাদ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া, ধৈর্য্যের আশ্চর্য্য গভীরতা। তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম্‌ তাঁর ধর্ম্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা তাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই তাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত ছিলেন।" অতি ক্রোধের সময়েও তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পেত না।

বিপ্রদাসের ভাই সুবোধ বিলাতে গিয়ে অপব্যয় করছে, আর ক্রমাগত দাদার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছে। বিপ্রদাস ভাইয়ের অবিবেচনায় বিব্রত ও ব্যথিত হয়, কিন্তু কষ্ট ক'রে টাকা পাঠায়। একবার সুবোধ একথোকে দেড়-শ পাউণ্ড চেয়ে পাঠালে। দাদাকে চিন্তিত দেখে কুমুদিনী ব্যাপার জানতে পারলে, এবং তার মায়ের গহনা বেচে ছোটদাদাকে টাকা পাঠাতে অনুরোধ করলে। কিন্তু সে-গহনা বিপ্রদাস কুমুদিনীর বিবাহের জন্য সম্বল ক'রে রেখেছিল। বিপ্রদাস টাকা পাঠাতে পারবেন না লেখাতে সুবোধ লিখলে তার অংশের জমিদারী বিক্রি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিতে। সুবোধের এই প্রস্তাব বিপ্রদাস আর কুমুদিনীর বুকে বাজল। বিপ্রদাস নিজের তালুক পত্তনী দিয়ে টাকা পাঠালেন।

এমন সময় এল মধুসূদনের ঘটক। বিপ্রদাস বেশী বয়সী পাত্রে বোন সম্প্রদান করতে নারাজ হলেন। কুমুদিনী ভাবে তার দিদিদের কথা তারা তো তাদের স্বামী বেছে নেয় নি, মেনে নিয়েছে, যেমন ক'রে মা মেনে নেয় ছেলেকে। কুমুদিনী ভাবে সতীসাধ্বীদের কথা যারা নির্বিচারে স্বামীর সব আচরণ সহ্য করে। সে ক'দিন ভেবে ভেবে অচেনা অদেখা মধুসূদনকেই পতিত্বে বরণ ক'রে ফেললে। সে দেবতার কাছে সঙ্কেত মানত ক'রে মনে করলে সে দৈবসঙ্কেতে তার মনোনয়নের সমর্থনই পেয়েছে। তার দাদা তার মত জিজ্ঞাসা করলে সে জোর দিয়ে বললে—সে মধুসূদনকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

সম্বন্ধ অগত্যা পাকা হ'ল। কুমুদিনী খুশী। তার অন্তরে বাহিরে যেন একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল।

কিন্তু মধুসূদন মহাসমারোহে নিজের লোকজন দিয়ে এক মধুপুরী নির্ম্মাণ করিয়ে ঐশ্বর্য্যের রাজসিক আড়ম্বরে চাটুজ্জেদের উপর টেক্কা দিতে লেগে গেল। সে বিপ্রদাসকে খাটো ক'রে নিজের বাহাদুরী নেবার যত রকম চেষ্টা করে তাতে কুমুদিনীর কষ্ট হয়। চাটুজ্জেরা যখন মধুসূদনের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারছিল না, তখন তারা মধুসূদনের বংশমর্য্যাদার হীনতা নিয়ে তাকে খোঁটা দিতে লাগ্‌ল, তবু কি পরাজয়ের গ্লানি মিটতে চায়? মধুসূদনের জাতকুলের কথাটাকে কুমুদিনী তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনের ধনের বড়াই ক'রে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভ'রে উঠ্‌ল। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যেন ওরই সব চেয়ে বেশী লজ্জা।

কুমুদিনী দাদার সাম্‌নে এসেই কেঁদে ফেল্‌লে, বিপ্রদাস বল্‌লেন—"কুমুদিনীর মনে যদি কোনও খট্‌কা থাকে, তবে তিনি বিয়ে এখনও ভেঙে দিতে পারেন।" কুমুদিনী বল্‌লে—"ছি ছি সে কি হয়।" এখন থেকে কুমুদিনী মনে মনে জোরের সঙ্গে জপ্‌তে লাগ্‌ল, তিনি ভালই হোন মন্দই হোন তিনি আমার পরম গতি।

কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহার ক্রমশঃই অভদ্র উদ্ধত হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। কুমুদিনীর ভাবে আর বাস্তবে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। বাল্যকালে যখন সে পতিকামনায় শিবের পূজা করেছে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শ রূপে সে আপন মাকেই জান্‌ত—কি স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য্য, যদিও তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি ছিল, চরিত্রের স্খলন ছিল। দময়ন্তীর মতন তারও মনের মধ্যে কি নিশ্চিত বার্ত্তা এসে পৌঁছেনি যে মধুসূদনকেই তার বরণ করতে হবে? বরণের আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনের মানুষের সঙ্গে বাহিরের মানুষের মিল হ'ল কই? রূপেতেও বাধে না, বয়সেও বাধে না, কিন্তু সত্যকার রাজা কোথায়?

বিবাহ হয়ে গেল। বিপ্রদাস অসুখে শয্যাগত, তিনি মধুসূদনের অভদ্র ব্যবহারের কোনও খবরই পেলেন না। কুমুদিনী শুভদৃষ্টির সময় ভাল ক'রে বরের দিকে চাইতেই পারলে না, মধুসূদনের ব্যবহারে তার কেমন ভয় ধ'রে গিয়েছে।

মধুসূদন দেখ্‌তে কুশ্রী নয়, কিন্তু বড় কঠিন। কালো মুখের মধ্যে মস্ত বড় বাঁকা নাক। প্রশস্ত কপাল, ঘন ভ্রূ। গোঁপদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী, কড়া চুল কাফ্রিদের মত কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁসে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ, দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই। মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হবে এমনতর বেশ—ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েষ্ট-কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নেকোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্ণিশ-করা কালো দরবারী জুতো, বড় বড় হীরেপান্নাওয়ালা আঙটিতে আঙুল ঝলমল করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন ক'রে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি সৌখীন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত।

প্রথম মিলনেই বরবধূর বিচ্ছেদ সুরু হ'ল। ফুলশয্যার রাত্রে কুমুদিনী লজ্জাকম্পিত কণ্ঠে স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালে তার দাদার অসুখ, আর দুটো দিন সে বাপের বাড়িতে থেকে যেতে চায়। তার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হ'ল। কল্‌কাতায় নেমেই এক গাড়ীতে যেতে যেতে মধুসূদন দেখ্‌লে কুমুদিনীর হাতে একটা নীলার আংটি। অমনি সে হুকুম করলে এ আংটি তার আর পরা চলবে না। মধুসূদন কেবল কুমুদিনীর আংটি খুলিয়েই নিরস্ত হ'ল না, তার দাদার দেওয়া আংটিটাকে সে কেড়ে নিলে।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে কেবলই হুকুম শোনে, প্রীতির পরিচয় পায় না। আর সে ভাবে—"যেমন ক'রে অভিসারে বেরোয় তেমনি ক'রেই বেরিয়েছি, অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার ব'লেই মনে হয় নি। আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কি দেখলুম, বাইরেই বা কী দেখ্‌ছি? এখন বছরের পর বছর, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটবে কি ক'রে?" এতদিন কুমু স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে কোনও চিন্তাই করে নি। সাধারণতঃ যে-ভালবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমুদিনী ভাবেও নি। এখন সে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না তা মনে হচ্ছে মহাপাপ, কিন্তু সে পাপেও তার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে ক'রে।

মধুসূদনের বাড়ির মেয়েদের কাছ থেকেও কুমুদিনী বিশেষ কোনও মমতা পেলে না, তারা সবাই তার কেবল সমালোচনাই করে। এই মেয়েলী সমালোচনার বিবরণটি চমৎকার, তা আর উদ্ধার করলাম না। সেই বাড়িতে কেবল মধুসূদনের ছোটভাই নবীন আর তার স্ত্রী মোতির মা কুমুদিনীর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝে তাকে শ্রদ্ধা যত্ন করতে লাগ্‌ল।

মোতির মা কিন্তু এইটুকু বুঝ্‌তে পারে না স্ত্রী হয়ে স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে বাধা কোথায় থাক্‌তে পারে। সে তো সেকেলে ধারণার বশীভূতা গৃহস্থ-বধূ।

মধুসূদনের পক্ষে কুমু হ'ল একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্য্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউ-ঝিদের মধ্যে। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে কর্ত্তাদের কটাক্ষ-চালিত মেয়েলী জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করবে, এর বেশী সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে তার, মধ্যেও যে একটা পাওয়া বা হারাবার কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাব-দক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের কোণে স্থান পায় নি। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুদিনীকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করতে লাগ্‌ল। কিন্তু মধুসূদনও স্বামীগিরির সেকেলে ধারণাই মনে পুষে এসেছে, আর তার উপরে আবার সে সকলের উপর প্রভুত্ব ক'রে অভ্যস্ত, সে স্বামী, সকলের উপরে, এ বোধ তার অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। তাই সে ভাব্‌লে—আমিই যে ওর একমাত্র, একথাটা যত শীঘ্র হোক কুমুদিনীকে জানান দেওয়া চাই।

স্বামীর ব্যবহারে কুমুদিনীর যে-পরিমাণ কষ্ট না হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী কষ্ট বোধ হচ্ছিল তার নিজের কাছে নিজের অপমানে। এই কষ্টটা বুঝতে পেরেছিল মোতির মা। সে ভাবলে—আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকী ছিলুম, মন ব'লে একটা বালাই ছিল না। কিন্তু কুমুদিনী বেশী বয়সে লেখাপড়া শিখে স্বামীর ঘর

করতে এসেছে, এ মেয়ের পক্ষে অপরিচিত একজন পুরুষকে অকস্মাৎ স্বামী ব'লে মেনে নেওয়া বিড়ম্বনা। বড়ঠাকুর এখনও ওর পর, আপন হ'তে অনেক সময় লাগে। ধন পেতে বড়ঠাকুরের কতকাল লাগ্‌ল, আর মন পেতে দু-দিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি ক'রে মরতে হয়েছে, আর এই লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাত্‌তে হবে না?

কুমুদিনী স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে মনে করলে এ বাড়িতে আমার যদি বধূর অধিকার না-ই থাকে, তবে আমি এ বাড়িতে থাকি কিসের সম্পর্কে? তাই সে বাড়ির দাসীপনা করতে নিযুক্ত হ'ল। সে আলো বাতি রাখার ময়লা ঘরের এক কোণে নিজের বাসস্থান ক'রে নিলে।

মধুসূদন কিন্তু মনে মনে কুমুদিনীর জন্য প্রতীক্ষা করে। রাত্রে উঠে চুপিচুপি যায় কুমুদিনীর ঘরে সে কি করছে দেখ্‌তে। সে গিয়ে একদিন দেখ্‌লে কুমুদিনী দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। মধুসূদনের মনে হ'ল যে তার যেমন ঘুম নেই কুমুদিনীরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল। কুমুদিনীর মুখের উপর লণ্ঠনের আলো পড়্‌তেই সে একটু নড়্‌ল। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন ক'রে পালায়, মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাল। তার ভয় হ'ল পাছে কুমুদিনী ওর পরাভব দেখে মনে মনে হাসে। মধুসূদন বুঝ্‌তে লাগ্‌ল যে, তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ ঘট্‌ছে, এই রাত্রি ছুটোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি ব'লে যখন কিছুই নেই, তখন কুমুদিনীর কাছে মনে মনে হারমানা তার কাছে অস্বীকৃত রইল না। কুমুদিনীকে কঠিনভাবে শাসন করার শক্তি মধুসূদন হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল চাটুজ্জেদের পরাজিত করবে ব'লে, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাক্‌তেই যার কাছে হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও ভাবে নি। অথচ এখন সে এ কথা বল্‌বারও জোর মনে পাচ্ছে না যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হ'লেই ভাল হ'ত যার উপর তার শাসন খাটত। একদিন সে কুমুদিনীর সামনে নবীন আর মোতির মাকে ডেকে ব'লে দিলে—"কাল থেকে বড়বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করলুম।" মধুসূদন কুমুকে বুঝিয়ে দিলে তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে হার মান্‌ছি।

এইবার আবার কুমুদিনীর পালা আরম্ভ হ'ল। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এর বদলে কি আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হ'লে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হ'তে চায় না।

মধুসূদন যে-দিন কুমুদিনীর আংটি হরণ করেছিল সেদিন ওর সাহস ছিল, সে মনে করেছিল কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতন সহজেই শাসনের অধীন হবে, কিন্তু সে এখন দেখ্‌ছে কুমুদিনী সহজ মেয়ে মোটেই নয়। এখন মধুসূদনের মনে হ'তে লাগ্‌ল—কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই এখন ওর মন ব্যগ্র।

কুমুদিনী যাকে ভালবাসেনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সঙ্কোচ বোধ করে, হোক না সে তার বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামী। কুমু করে বিদ্রোহ, আর দোষ পড়ে মোতির মার ঘাড়ে, কারণ মধুসূদন মনে করে মোতির মা যেহেতু কুমুদিনীকে আদর-যত্ন করে সেই হেতু কুমুদিনীকে বশ মানানো যাচ্ছে না, তার শাসন প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসছে। তাই সে মোতির মাকে বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দেবার কল্পনা করে, কিন্তু মনের মধ্যে জোর বাঁধ্‌তে পারে না। সে জানে যে তার সংসারে মোতির মার গৃহিণীপনা নিতান্ত অপরিহার্য্য। অথচ যে-বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম হয়ে থাকে এও তার সহ্য হচ্ছিল না। মধুসূদনের সকল কাজে শৈথিল্য আর অবহেলা দেখা দিতে লাগ্‌ল এবং সে নিজে আর অপর সকলে এই দেখে আশ্চর্য্য হ'তে লাগ্‌ল।

কুমুদিনী নিরন্তর তার অন্তরের ঠাকুরের কাছে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ চায়। মধুসূদন যেদিন ভাব্‌লে আমি নিজের মান খর্ব্ব ক'রে কুমুর মান ভাঙব, এবং তার হাতে ধ'রে মিনতি করলে, সেই দিন কুমুদিনী পড়ল মুস্কিলে। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা সহ্য করা কুমুদিনীর পক্ষে তত কঠিন নয়। কিন্তু আজ মধুসূদনের এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব্ব করা সম্বন্ধে কুমু যে কি করবে তা সে স্থির করতে পারে না। হৃদয়ের যে-দান নিয়ে সে এসেছিল তা তো স্খলিত হয়ে ধুলায় প'ড়ে গেছে। তথাপি কুমু স্বামীর হুকুম মানে, কিন্তু তার আন্তরিক সতীত্ব তাকে ধিক্কার দেয়, সে তার ঠাকুরের কাছে নালিশ করে তার ঠাকুরেরই বিরুদ্ধে, কেন তিনি তাকে এই অশুচিতা থেকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন না। তার মনে হচ্ছে একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জন্তু বাহির থেকে তাকে যেন গ্রাস করছে। যে-পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ সুগম্ভীর, মধুসূদনের তা নয়; যা লালায়িত, যার প্রেম বিষয়াশক্তিরই সজাতীয়, তারই ক্লেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। কুমুদিনী এই অশুচিতা থেকে পালাবার একমাত্র উপায় দেখে শিশু মোতির সংসর্গে। এই শিশু মোতি তার জেঠিমাকে পরিপূর্ণ ভাবে ভালবাসে।

কুমুদিনী মোতির সাহচর্য্যে নিজের অশুচিতা শোধন ক'রে নিতে চায় ব'লে মধুসূদন বালকটির উপরও রূঢ় ব্যবহার করে, আর তার সকল আঘাত গিয়ে লাগে কুমুদিনীকে, আর সে হয়ে উঠে আরও আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ। মধুসূদন বুঝ্‌তে পারে না যে সে যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই একটা মস্ত বাধা রয়েছে।

মধু যখন হুকুম ক'রে কুমুদিনীর প্রেম আদায় করতে চায়, তখন একদিন কুমুদিনী দেখ্‌লে নবীন আর মোতির মার মধ্যে প্রেমলীলা। তাদের সেই প্রেমলীলা কেমন সহজ আর সুশ্রী, আর তার পাশে মধুসূদনের ব্যবহার কি বিশ্রী কুৎসিত বীভৎস।

মধুসূদন দেখেছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে খাটো হয়ে থাকে, তাইতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরেও মধুসূদন জোর করতে পার্‌ছে না—আপন সংসারে যেখানে সব চেয়ে তার কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হ'টে গিয়েছে। এবং সেই জন্যেই কুমুর প্রতি তার রাগের বদলে আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে উঠছে, আর রাগ বাড়ছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের উপর, কারণ মধুসূদনের সন্দেহ যে বিপ্রদাসের আদর্শ আর শিক্ষাতেই কুমুদিনী এমন ভাবে গঠিত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ অমূলকও নয়।

মধুসূদন হিংস্র হয়ে বিপ্রদাসকে পীড়ন করতে লাগ্‌ল, তার মনে মনে এও ছিল যে, বিপ্রদাসকে শাস্তি দিলে কুমুদিনীকেও শাস্তি দেওয়া হবে। বিপ্রদাস শান্তভাবে মধুর সব কুব্যবহার সহ্য ক'রতে লাগলেন। বিপ্রদাস বনেদী ঘরের অভিজাত ভদ্রলোক, তাঁর কাছে হীনতা

কপটতার লেশ মাত্র ছিল না। তাঁর চরিত্র ঔদার্য্যে মহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তাঁর ছিল নিজেদের ক্ষতি ক'রেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহঙ্কার প্রচার নয়।

মধুসূদনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহ ভাবেই গরিব ছিল, সেই জন্যে পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্ব্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার-বার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যে। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহ-মনের ও ওর সংসারের অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলছে। স্বামীপূজার কর্ত্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু তার কত বড় হার হয়েছে তা এর আগে এমন ক'রে সে বোঝে নি।

মধুসূদন যখন কুমুদিনীর সঙ্গে মিলনটাকে সহজ ক'রে তুলতে কিছুতেই পারলে না, তখন সে মন দিলে অন্য দিকে। মধুসূদনের বাড়িতে তার দাদার এক বিধবা বৌ থাকত তার নাম শ্যামাসুন্দরী। শ্যামা ধনী ঠাকুরপোকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সদাই ব্যগ্র, কায়মনোবাক্যে সে তাকে সেবা করতে প্রস্তুত। মধুসূদন এতদিন তাকে আমল দেয়নি, প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু এখন কুমুকে শাস্তি দেবার জন্য মধু তার দারস্থ হ'ল। শ্যামা কৃতার্থ হয়ে গেল।

এই শ্যামাসুন্দরী পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা, মোটা নয় কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে যেন বেশ একটু ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ীর বেশী গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু এখনও জরা আক্রমণ করেনি। তার ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশী কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগল না ব'লে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা। যৌবনের যাদুমন্ত্রে সে মধুসূদনকে বশ ক'রে নেবে এমন দুরাশা তার অনেক দিন থেকেই ছিল, কিন্তু এতদিন মধুসূদনের মন মাঝে মাঝে টল্‌লেও হার মানে নি। শ্যামাও মধুর মনের ঝোঁকটা ধরতে পেরেছিল, কিন্তু কোনোদিন তার মনের ভয় আর ঘুচছিল না। শ্যামাসুন্দরী মনে মনে মধুসূদনকে ভালও বেসেছিল। তাই মধুসূদনের বিবাহের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। মধু যদি কুমুকে অন্য সাধারণ মেয়েরই মত অবজ্ঞা করত, তবেও বা সেটা একরকম সহ্য হ'ত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখ্‌লে যে এতদিন যে-মধু তাকে অবহেলা ক'রে এসেছে সে-ই এখন কুমুদিনীর মন পাবার জন্য তপস্যা করছে, তখন আর সে সহ্য করতে পারলে না। সে সাহস ক'রে এগিয়ে এসে দেখ্‌লে মধুসূদন তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

কিন্তু যখন মধু শ্যামার কাছে থাকে তখনও তার মনের মধ্যে জাগে কুমুদিনীর কথা। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশী আয়ত্তের মধ্যে যে তার ব্যবহার আছে কিন্তু মূল্য নেই। তাই ঈর্ষার পীড়নে শ্যামার মনে একটুও শান্তি নেই। সে মধুর পথ আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায়, তার মনে সদাই আশঙ্কা কবে কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে।

কুমুদিনী যেদিন প্রথম শ্যামাকে দেখেছিল সেইদিনই তার মনে হয়েছিল শ্যামা আর মধু যেন একই মাটিতে গড়া একই কুমারের চাকে। যখন শ্যামার আর মধুর আচরণে আর কোনও অপ্রকাশ্যতা থাক্‌ল না, তখন কুমুদিনী তার পীড়িত দাদার কাছে চ'লে গেছে, এবং সে খবর সেখানে তাদের কাছেও গিয়ে পৌঁচেছে।

শান্ত গম্ভীর বিপ্রদাস শ্যামার আর মধুর আচরণের সংবাদ পেয়ে ক্রোধে উগ্র হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি কুমুদিনীকে বল্‌লেন—"কুমু, অপমান সহ্য হয়ে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমার নিজের সম্মান তোমাকে দাবি করতে হবে, এতে সমাজে তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।" মোতির মা আর নবীন এলো কুমুদিনীকে নিয়ে যেতে, সে না গেলে যে তার স্বামী ঘরসংসার সব বেদখল হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বিপ্রদাস তাঁর বোনকে ঐ অশুচি বাড়িতে পাঠাতে অস্বীকার করলেন, কুমুদিনীও যেতে চাইলে না। বিপ্রদাস মোতির মাকেও বল্‌লেন—"স্ত্রী যদি সে অপমান মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে। এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে।"

এর পর মধু এল নিজে কুমুকে নিয়ে যেতে। সে যে শ্যামাকে হুকুম করে, শাসন করে, প্রহার করে, কিন্তু তাকে তো একদিনও সম্মান করতে পারে নি, সে তাকে চাকর দিয়ে নিজের শোবার ঘরে ডেকে পাঠাতেও দ্বিধা করে নি। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই মধুর মনে জেগেছে কুমুদিনীর দৃপ্ত নারীত্বের অসামান্য মহিমা। তাই সে তার কাছে পরাভব স্বীকার ক'রে নিজে তাকে নিতে এল। কিন্তু কুমু কিছুতেই যেতে সম্মত হ'ল না। তখন সে ক্রোধান্ধ হয়ে কুমুদিনীকে বল্‌লে—"জানো, তোমাকে আমি পুলিস দিয়ে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে যেতে পারি।" এখানেও তার সেই প্রভুত্বের ক্ষমতার দম্ভ।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করেছে জেনে বিপ্রদাসের পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কালু বিষম ভীত হয়ে যখন বল্‌লে—সর্ব্বনাশ! তখন বিপ্রদাস বল্‌লেন—সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।

মধুসূদন মনে করলে নবীন আর মোতির মার কাছে প্রশ্রয় পেয়েই কুমুদিনী তার বিরুদ্ধতা করতে সাহস করেছে। তাই সে তার ছোটভাই আর ভাইবৌকে বাড়ি থেকে তাড়াবে। তারা এল কুমুদিনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে। সেই সময় মোতির মা দেখ্‌লে যে কুমুদিনী গর্ভবতী। তারা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

যখন কুমুদিনীর গর্ভ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না, তখন বিপ্রদাস আর মধু দুজনেই শুন্‌লেন। বিপ্রদাস কুমুদিনীকে ডেকে বল্‌লেন—"এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?" কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করলে তবে কি আমাকে যেতে হবে দাদা? বিপ্রদাস কুমুকে বল্‌লেন, "তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার ঘরছাড়া করব কোন স্পর্দ্ধায়?"

কুমুদিনী বিনা আহ্বানে এবার নিজে যেচে স্বামীর বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় সে তার দাদাকে ব'লে গেল—কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, কোনদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন তোমাকে না দেখ্‌তে হয়। সে আমি সইতে পারব না।

তার পর কুমুদিনী আরও বল্‌লে যে যেদিন সে সন্তান প্রসব ক'রে মুক্ত হবে সেদিন সে স্বাধীন হয়ে তার দাদার কাছেই চলে আসবে,

কারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্তেও খোয়ানো যায় না।

কুমুদিনীকে বিদায় দিয়ে বিপ্রদাস নিতান্ত একাকী নিঃস্ব অসহায়। আর কুমু? কে জানে তার এর পরে কি ঘটেছিল। লেখক এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

এই উপন্যাসখানির মধ্যে তিনটি প্রধান আর তিনটি অপ্রধান চরিত্র আঁকা হয়েছে, আর কয়েকটি আছে আনুষঙ্গিক চরিত্র। সব কয়টিই জীবন্ত মানুষ হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ফুটেছে মধুসূদন, বিপ্রদাস, আর কুমুদিনী। নবীন, মোতির মা, শ্যামাও অল্পের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। আনুষঙ্গিক চরিত্রের মধ্যে আমাদের মনে ছাপ রাখে হাবলু বা মোতি, আর কালুদাদা।

মধুসূদনের চেহারা আর চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পূর্ব্বে দিয়েছি। কুমুদিনীরও পরিচয় আমরা পেয়েছি। এদের দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য লেখক অতি চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন, প্রতিদিন যে হুকুম ক'রে লোককে অবিশ্বাস ক'রে অভ্যস্ত, সেই মধুসূদনের কাছে কুমুর সহজ অথচ অনমনীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ অবোধ্য হয়ে যত বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। বিপ্রদাস আর নবীন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথচ খাঁটি মানুষ। কুমুদিনী তার এই দাদার হাতে তৈরি। বিদায়ের দিন সে তার দাদাকে বলেছিল—"সমস্ত গিয়েও তবু বাকী থাকে, সেই আমার অফুরানো সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তাহ'লে সেই গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ ব'লেই তবে এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি।" অতএব বিপ্রদাস ঠিক নাস্তিক ছিলেন বলা যায় না। তাঁর ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার, আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই উপন্যাসে হঠাৎ-ধনী আর বনিয়াদী অভিজাত ব্যক্তির চরিত্রের তারতম্য অতি সুন্দর ক'রে দেখানো হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে গত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ধনীগৃহের ছবি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে।

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার, গৃহে তার স্থান আর মর্য্যাদা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভৃতি বহু সমস্যার সমাধান এর মধ্যে পাওয়া যাবে। একদিকে জোর ক'রে শ্রদ্ধা প্রীতি আদায় করবার চেষ্টা, আর তার পাশেই অনায়াসে উৎসারিত শ্রদ্ধাভক্তির চিত্র চমৎকার হয়েছে।

বিপ্রদাস যেন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ উপন্যাস গোরার পরেশবাবুরই একটি প্রতিচ্ছবি। শান্ত, সমাহিত, অথচ দৃঢ়, বলিষ্ঠ প্রকৃতি, তাঁকে জানলেই শ্রদ্ধা করতে হয়, তাঁর কাছে মাথা আপনি নত হয়।

এই উপন্যাসের মূল কথাটি হচ্ছে যে লোকের হার-জিৎ বাইরে থেকে দেখা যায় না, তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে। জগতে যাঁরা 'মার্টার', যাঁরা বাস্তবিক বড়লোক, তাঁরা কালে কালে অযোগ্যের হাতে মার খেয়েই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ ক'রে গেছেন। যারা সামান্য সাময়িক পশুশক্তিতে বলবান তারা ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জানে বাইরে তাকেই মারে। এই জন্তে মধুসূদনের হাতে কুমুদিনীর লাঞ্ছনা, আর বিপ্রদাসের অপমান।

এই বইখানিকে অসমাপ্ত বলতে হবে। কুমুদিনী স্বামীর বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তার অভ্যর্থনা সেখানে কি রকম হয়েছিল, তার সন্তান হওয়ার পর সে কি করেছিল, আর সুবোধ—বিপ্রদাসের ছোট ভাই, কুমুদিনীর ছোটদাদা বিলাত থেকে ফিরে এলেই বা তাদের পরিবারে কি পরিবর্ত্তন ঘটল, এসব খবর লেখক আমাদের দেন নি। তা ছাড়া বইখানির আরম্ভ হয়েছে কুমুদিনীর পুত্র অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন উপলক্ষ্য ক'রে। তখন তার বয়স হয়েছে বত্রিশ। এই বত্রিশ বৎসরের ছেলে অবিনাশ পিতামাতার মাঝখানে থেকে তাদের জটপাকানো জীবনের জট কতখানি খুলেছে বা আরও পাকিয়ে তুলেছে তারও খবর আমরা কিছু জানতে পারি নি। আরম্ভেরও পূর্ব্বে যে আরম্ভ আছে তার কথাতেই এই বই সমাপ্ত হয়েছে, আসল গল্পের উপসংহার বাকী থেকে গেছে, অবিনাশের বয়সের বত্রিশ বৎসরের ইতিহাস ব্যক্ত হয় নি। সেই অপ্রকাশিত ইতিহাস জানবার জন্য মনের মধ্যে একটা আগ্রহ থেকে যায়, আর বইখানিকে অসমাপ্ত মনে হয়। আশা করি লেখক এর একটা উপসংহার লিখে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করবেন।

এই উপন্যাসের বিষয় হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা। সেই জন্য এর মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের আর অধিকারের অনেক ব্যাপার উপস্থিত করা হয়েছে, এবং সেগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমাধান করা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আমাদের বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এবং এই কর্ম্মে তাঁর অনন্য-সাধারণ দক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত।

নরনারীর আকর্ষণবিকর্ষণের তত্ত্ব সমাধানের জন্য এই উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীকে অবতারণ করতে হয়েছে, এবং সে যেন কুমুদিনীর চরিত্রের পটভূমিকা হয়ে কুমুর চরিত্র ও শুচিতা আরও ফুটিয়ে তুলেছে, এবং মধুসূদনেরও চরিত্রকে স্পষ্টতর করেছে। কিন্তু শ্যামার আচরণ এমন লালসাময় এবং কুশ্রী যে তার কথা পড়তে গেলে মনে জুগুপ্সা উদিত হয়। এইটি সমস্যার অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'লেও মনে হয় এই দৃশ্যটা না থাকলেই ভাল হ'ত।

উপন্যাসের আগাগোড়াই ঘাতপ্রতিঘাত আর সংঘাত, কাজেই মন ক্লান্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু লেখকের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যরস প্রায় সকল কথোপকথনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থেকে উপাখ্যানের কঠোরতাকে সরস করেছে। আর স্বার্থ মান অভিমান মর্য্যাদা সম্মান বৈষয়িকতা অবনিবনাও আর ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে বালক হাবলু বা মোতির সরল একাগ্র প্রীতি আর ভালবাসা সমস্ত বইখানিকে বিশুদ্ধ ক'রে রেখেছে। সর্ব্বোপরি বিরাজ করছে বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বিপ্রদাসের চরিত্র যেন মধুসূদনের সকল কলুষতা আর ক্ষুদ্রতা ডুবিয়ে দিয়ে সমস্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিশুদ্ধ ক'রে তুলেছে।

শেষের খেয়া

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

১

ঐ ত বাঁশ-ঝাড়ের লক্ষ লক্ষ সরু বহু-বিস্তৃত শিকড়গুলা ঘন জালেরই মত যেন দামোদরের পাড় ভাঙিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সকলে বলে, অত বড় বাঁশ-ঝাড়টি এইবারেই নাকি দামোদরের কুক্ষিগত হইবে। অথচ, এই সে-বছর ঐখান দিয়াই গোলাঘাট যাইবার রাস্তা ছিল। বেশ মনে পড়ে,—অধুনালুপ্ত সেই পথের ধারে, পাড়ের দিকে একটা নোনা-গাছের মোটা ডালে দড়ি বাঁধিয়া কতদিন সে আর মল্লিকদের রাজলক্ষ্মী আসিয়া দুলিয়াছে। আজ সে-গাছের চিহ্নমাত্রও নাই। বর্ষাকাল—আজ সেখানে জলের স্রোত।

আরও কতই-কি-না তাহার মনে পড়ে।

মনে পড়ে—আর একটু ঐদিকে—ঐ, ঐখানটিতেই হইবে বোধ হয়—সেবারে বর্দ্ধমান না কোথা হইতে একটা মহাজনী নৌকা আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছিল। রতন-জেলের দিগম্বর ছেলেটা—কি বেশ তাহার নামটি!—এক পা নৌকার ধারে আর এক পা নদের পাড়ের উপর রাখিয়া তাহারই সমবয়সী একটি ছেলের 'বন্দেমাতরম'-উক্তির প্রত্যুত্তরস্বরূপ, নাচিবার ভঙ্গীতে তালে তালে হাঁটু মুড়িয়া স্থর করিয়া বলিতেছিল—

"রোঁদে খেয়ে খেয়ে মাথা গরম —"

হঠাৎ মাটি ভাঙিয়া একটা পা তাহার স্থানচ্যুত হইতেই নৌকার ধারে জলকাদার উপর ছেলেটা ঝপাং করিয়া পড়িয়া যাইতেই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। আজও সে-কথা মনে করিতে তাহার হাসি পায়।

ঐ, ও-পারে—দূরে—ঘন-সন্নিবদ্ধ তালগাছগুলার নীচেই শুরে-কাল্‌নার শ্মশান। শুরে-কাল্‌নার সব মড়া ঐখানেই পোড়ানো হয়। তাহার দিদি ও ঠাকুমার সঙ্গে ঘাট সারিতে আসিয়া কতদিন সে মড়া পুড়িতে দেখিয়াছে। আগুন দেখা যায় না, শুধু ধুঁয়া—কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশের দিকে উঠিয়া যায়। কতকগুলা লোক বড় এক-একখণ্ড কাঁচা বাঁশ হাতে লইয়া আগুনের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি-সব করে। খুব স্পষ্ট দেখিতে না পাওয়া গেলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়—কেউ-বা গাছের ছায়ায় আড় হইয়া শুইয়া থাকে আর কেউ-কেউ বা হুঁকায় করিয়া তামাক খায়।

সে শুনিয়াছে—তখন নদীতে জল ছিল না, মৃত্যুর পর তাহার মা'কেও নাকি ঐখানেই লইয়া গিয়া দাহ করা হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা, তাহার তেমন মনেই পড়ে না।

শুধু মনে পড়ে—সুদূর বিদেশের এক কর্ম্মস্থল হইতে ঘরে আসিয়া তাহার বাবা প্রথমেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অঝোর-ধারায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে বটে, তাও খুব স্পষ্ট নয়।

গ্রামের পোষ্ট-আপিস। আপিস-ঘরের দক্ষিণ-চালায় আপার-প্রাইমারি স্কুল—ছেলেরা পড়ে, আর উত্তর চালায় বালিকা-বিদ্যালয়। পোষ্টমাষ্টারী আর এই উভয় স্কুলের স্কুল-মাষ্টারী একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। গ্রামের নাম—জ্যোৎশ্রীরাম।

দুর্ম্মদ দামোদর এই পোষ্ট্‌-আপিসের কোল ঘেঁষিয়া ছুটিয়া চলে।

দুই-একটা কালো পাখী 'চিক্ চিক্' করিয়া নদের উপর দিয়া উড়িয়া যায়, দামোদরের গেরুয়া-জল আবিল সমারোহে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া পাড়ে পাড়ে আসিয়া লাগে, আর বালিকা-বিদ্যালয়ের জানালার ধারে বসিয়া একটি বালিকা দূরদিগন্তে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া আত্ম-সমাহিত চিত্তে কতই-কি-না ভাবে।

ভাবিতে ভাবিতে দৃষ্টি তাহার বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া মনোজগতে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়।

তাহার বাবার জন্য তাহার বড়ই মন কেমন করে। সেই কবে ও-বছর দুর্গাপূজার সময় একবার তিনি বাড়ি আসিয়াছিলেন, তাহার পর আজ দুই বৎসর ঘুরিতে চলিল আসিবার আর নামই করেন না। অথচ আসিবার জন্য সে তাঁহাকে কতবারই-না তবু পত্র লিখিয়াছে। লিখিয়াছে—

আপনি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন। নিশ্চয়ই আসিবেন। আপনি না আসিলে আমার বড় মন কেমন করে। বড় কান্না পায়।···আরও কত-কি।

সে পত্র দিয়াছে আর প্রতিবারেই ভাবিয়াছে—এইবার তাহার বাবা নিশ্চয়ই আসিবেন। কিন্তু তিনি আসেন নাই।

একবার লিখিয়াছিলেন—কাজের ভিড়, সাহেবের নিকট ছুটি পাওয়া যায় না···

সাহেবকেও সে তাহার বাবার পত্রের ভিতর একবার পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল, যেন তিনি দয়া করিয়া তাহার বাবাকে অন্ততঃ দুই-তিন দিনের জন্যেও ছুটি দিয়া দেশে পাঠাইয়া দেন; তাহার বাবার জন্য তাহার বড্ড মন কেমন করে।···এই সব।

ইহা সত্ত্বেও তাহার বাবা আসেন নাই।

নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল, স্বচ্ছন্দ-গতি ফুটফুটে মেয়েটি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই হঠাৎ দেখিতে পায়, ঐ দামোদরের বুকে খেয়া নৌকাখানা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে স্রোতের অনুকূলে অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। এ খেয়া ডাকের খেয়া। ডাক-আপিসের পিয়ন কালীচরণ একটা লাঠিতে বাঁধা থলিতে করিয়া জামালপুর হইতে এই সময়ে চিঠিপত্র লইয়া আসে। ঐ ত, সে হালটার কাছে বসিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে—বেশ চেনা যায়, স্পষ্ট!

একটু পরেই সে থলিটা আনিয়া ঝপ্ করিয়া আপিস্-ঘরের সম্মুখের মেঝেয় ফেলিবে। মাষ্টার মহাশয় কালীচরণ ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ছুরিতে করিয়া গালা-মোহর ভাঙিয়া থলিটা উপুড় করিয়া ধরিতেই ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া চারিদিকে চিঠিপত্র ছড়াইয়া পড়িবে। তাহার পর মাষ্টার মহাশয় বাক্স খুলিয়া খাতাপত্র বাহির করিয়া কি-সব লিখিতে থাকিবেন আর কালীচরণ কতকগুলা চিঠি গুছাইয়া লইয়া ঝপাঝপ করিয়া মোহরের ছাপ দিতে থাকিবে।

সে কতদিন কালীচরণের একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে চিঠিপত্রে মোহরের ছাপ দিতে দেখিয়াছে।

২

কালীচরণ আসিয়া ডাকের থলি নামাইয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় তাহাদিগকে ছুটি দিতেই মেয়েটি তাহার পুঁথিপত্র এবং পেন্সিল, সূচ, সুতা ইত্যাদি সম্বলিত সাবানের বাক্সটি একত্র করিয়া বাঁধিয়া নদের ধারে পিটুলী গাছটার তলায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

সে প্রতিদিন ছুটির পর এই স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ডাকঘর হইতে কালীচরণ চিঠির তাড়া লইয়া বাহির হইলেই তাহার নিকট গিয়া সে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে—'চরণ-কা, চিঠি নেই?' কালীচরণ একবার মাত্র ঘাড় নাড়িয়া বলে—'না'।

প্রতিদিন সে জিজ্ঞাসা করে আর প্রতিদিনই কালীচরণ 'না' বলে এবং এই 'না' শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই তাহার কর্ণমূল কেমন যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে। তথাপি সে জিজ্ঞাসা করে এবং প্রতিকূল উত্তর সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিনই ম্লানমুখে সে বাড়ি ফিরিয়া যায়।

চিঠি যে কোনোদিনই থাকে না তা নয়, কখনও-সখনও হয়ত কালীচরণ তাহার হাতে একটি পোষ্ট কার্ড কিংবা খাম বাহির করিয়া দেয়, সে উপরের আঁকাবাঁকা বাংলা লেখা দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, মেজদি লিখিয়াছেন পলাশম হইতে।

পলাশমে তাহার দিদির বাড়ি। বেশ গাঁ-টি! তেঁতুল-তলায় উন্মুক্ত একটা গেড়ের পারেই তাহার

অর্জুন গাছগুলায় হনুমানেরা লাফালাফি করে, দক্ষিণ দিকে কদ্‌বেল-গাছটার ওদিকেই খুব বড় পদ্মপুকুর—জল দেখা যায় না, শুধু সবুজ বৃত্তাকার বড় বড় পাতাগুলাকে পাশ কাটাইয়া হাজার হাজার লাল পদ্ম আকাশের দিকে আপনাকে মেলিয়া ধরিয়াছে।

ভাল-লাগিলেও সে সেখানে বেশী দিন থাকিতে পারে না। তাহার কেবলই মনে হয়, যদি তাহার বাবা ইতিমধ্যে দেশে আসিয়া ফিরিয়া যান!

তাহার বাবার পত্রও সে বেশ চিনিতে পারে। খামের উপর ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা, তাহারও আগে পরিষ্কার বাংলা অক্ষর—'পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী, শ্রীচরণকমলেষু'—পড়িলেই বুক ঢিপ্ ঢিপ করিয়া ওঠে, বাবা তাহার পত্র দিয়াছেন।

কিন্তু কখনও-সখনও। দিতে তিনি পারেন চিঠি রোজই; রোজ না হউক চার-পাঁচ দিন পরে পরেও,—তা তিনি দেন না। লেখেন—কাজের চাপ, সময় অল্প, চিঠি লিখিতে আলস্য ধরে।

আর চিঠি দেন ও-বাড়ির দাদামশায়কে, জমিজমার সম্বন্ধে। দাদামশায় অর্থাৎ সইয়ের বাবা, দূর সুবাদে দাদামশায়; ভারী ভাল লাগে তাঁকে। কিন্তু তাঁহাকে ত আর জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই,—না জিজ্ঞাসা করিয়াই রক্ষা নাই বলে! অমনি তিনি যখন-তখন তাহাকে ডাকিয়া বলেন—'ও শ', তোমার বাবা যে ভাই আমায় চিঠি দিয়েছেন আজ!'

নাম তাহার শৈলবালা। তাহার নামের আদ্যক্ষর ধরিয়াই দাদামশায় তাহাকে ডাকিয়া থাকেন।

প্রথমটা সরল বিশ্বাসে সে হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে—'কি লিখেছেন বলুন না ভাই!' পরক্ষণে দাদামশায়ের কৌতুকোজ্জ্বল মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই শশব্যস্তে—'না, দরকার নেই, আমি শুনতে—চাইনে—' বলিতে বলিতে কখনও-বা হাত দিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিতে যায়, আর কখনও-বা নিজের কানে আঙুল টিপিয়া ধরে!

কিন্তু তা করিলে কি হয়, দাদামশায় ততক্ষণে প্রবল হাসিতে ঘর ফাটাইবার উপক্রম করিয়া পাড়াসুদ্ধ লোককে শুনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া দেন,—'খবর যে দিয়েচেন ভাই, সে এক চমৎকার!...একটি চুষিকাটি, একটি লাল টুকটুকে বর...'

—অসভ্য!

সে ছুটিয়া বাড়ি পলাইয়া যায়।

কালীচরণ বাহিরে আসিয়াছে।

চকিতে মেয়েটি একটু অগ্রসর হইয়া আসে—"চরণ-কা', আছে?" একটি মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় হেলাইয়া সে জিজ্ঞাসা করে।

কালীচরণ দাঁড়াইয়া চিঠির গোছা নাড়িতে থাকে, আর শৈলবালার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া ওঠে—যদি তাহার বাবার চিঠি হয়? আর যদি তাহাতে লেখা থাকে, যে, শীঘ্রই—

নাঃ, অত আশা করিতে নাই। একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব উদাসীনের ভাব বজায় রাখিয়া সে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়।

আশা বা নিরাশা মানুষের মনে। বাস্তব সেখানে পিছন ফিরিয়া থাকে। তাই সে তাহার হস্তস্থিত পত্রটির উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই একটি আনন্দোচ্ছ্বসিত অস্ফুট শব্দ করিয়া ওঠে...

তাহার বাবাই পত্র দিয়াছেন, এবং যাহা সে কিছুক্ষণ আগে আশা করিতেও ভয় পাইয়াছিল, পোষ্টকার্ডখানির বিষয়-পৃষ্ঠায় কয়েক ছত্র সুপরিচ্ছন্ন লেখার ভিতর দিয়া আশাতীত সম্ভাবনায় তাহাই মধুর ও প্রোজ্জ্বল সত্যে স্পষ্ট হইয়া ওঠে—

আপিসের কি এক কাজে আগামী শুক্রবার তিনি কলিকাতায় যাইবেন, ফিরিবার পথে শনিবার বৈকালে একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসিবেন ইচ্ছা আছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড়চোপড়ের প্রয়োজন থাকিলে পত্রপাঠ যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়।

দুই-তিন ছত্রই ত লেখা! কিন্তু তাহার মনে হয়, দুই-তিন বৎসর ধরিয়াও সে যেন তাহা পড়িয়া যাইতে পারে।

তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়, তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া ওঠে, সে চিঠিখানি তাহার পুঁথিপত্রের সাথে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বাড়ির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়।

ছুটিতে তাহার বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু সম্প্রতি তাহাকে পথেঘাটে ছুটিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া তাহারও কেমন যেন ছুটিতে আজকাল লজ্জা লজ্জা বোধ হয়।

সে এখন বাড়ি যাইবে, পথে কোথাও দাঁড়াইবে না—মরিয়া গেলেও না। বরাবর বাড়ি গিয়া তাহার বইপত্র যথাস্থানে রাখিয়াই গঙ্গাদের বাড়ি যাবার নাম করিয়া সে কুঠ্‌রী ঘরে গিয়া পত্রখানি পড়িতে বসিবে।

তাহারও আগে হয়ত ঠাকুমা তাহাকে জল খাইতে ডাকিবেন—তুইখানি রুটি আর একটু গুড়, কিংবা হয়ত মুড়ি।

মুড়ি চিবাইতে আরও দেরি হইয়া যায় — সে অসুস্থ হইবারই ভাণ করিবে।

ও-বাড়ির রোয়াক, সম্মুখেই একটু তৃণাচ্ছাদিত সব্‌জী, তাহার পরেই পথ। পথের ঠিক ও-দিকেই তাহাদের কুঠ্‌রী ঘর। ময়রা গেড়ের ধার দিয়া একটু ঘুরিয়া গেলেই তাহাদের বাড়ির নাচ-তুয়ার।

ও-বাড়ির রোয়াক ঘিরিয়া নারিকেল গাছের সারি, তাহারই ও-ধার হইতে হঠাৎ দাদামশায়ের গলা শুনিতে পাওয়া যায়—'ও ভাই শ, মূর্দ্ধন্য ষ, দন্ত্য স, হ —'

তাহার আনন্দ-চঞ্চল গতি সহসা থামে, সে রোয়াকের দিকে চকিতে ঘাড় ফিরায়, ফিরাইয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে—

'শনিবার দিন বাবা আসবেন দাদামশায়! এই চিঠি!'

দাদামশায় উৎসাহিত হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"সত্যি ভাই, তাই নাকি ভাই, কি লিখেছেন ভাই, কাকে ভাই?—'

'আমাকে ভাই!'

কথাটা মিথ্যা। পত্র দিয়াছেন তিনি তাঁহার মাকে—শৈলর ঠাকুমা।

তা, হউক মিথ্যা—ও মিথ্যাটুকু বলিতে আনন্দে ও গর্ব্বে যেন তাহার বুক ভরিয়া ওঠে—তাহার বাবা তাহাকে পত্র দিয়াছেন!

'না ভাই।'

এইবার সে সত্যই ছুটিয়া দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

৩

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ার সকলেই কথাটা জানিতে পারে। জানিতে পারে, যে, আগামী শনিবার বৈকালে শৈলর বাবা আসিবেন।

সে কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়া লক্ষ্য করে যে, যত উচ্ছ্বসিত হইয়া কথাটা সে সকলকে বলিয়া বেড়ায় সকলে যেন তাহা শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। কেউ বলিলেন—'বেশ!' কেউ বলিলেন—'কবে?' কেউ বলিলেন শুধু—'ও'।'

কেউ-বা আবার তাহার কথার কোন উত্তরই দিলেন না, কতকগুলি পেঁয়াজ আগাইয়া দিয়া হয়ত বলিলেন—'এ-গুলো ছাড়িয়ে দিয়ে যা ত' রে!'

তাহার বাবার আগমন-সম্বন্ধে সকলের এই অখণ্ড ঔদাসীন্য তাহার কোমল বালিকাচিত্তে কেমন যেন বেদনা বহিয়া আনে। তাহার গলায় কি যেন আট্‌কাইয়া যায়, চোখে-জল ভরিয়া আসে···সে বাড়ি না গিয়া দাদামশায়ের নিকট গিয়াই উপস্থিত হয়।

সেখানে দাদামশায়ের সঙ্গে নানা গল্প-কথার ভিতর দিয়া আবার কখন তাহার মন ফিরিয়া আসে, সে আবার হাসে, আবার তাহার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, দাদামশায়ের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া সে নিবিষ্ট চিত্তে সে-সকল গল্প-কথার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দেয়।

'তা হ'লে ভাই, এ-সুযোগ আর কোন মতেই ছাড়া উচিত নয়, কি বল?' দাদামশায় বলিতেছিলেন।

পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া সে বলিল, 'যান্ ও-সব বাজে কথার আমি কোন উত্তর দিইনে।'

কথাটা তাহার বিবাহের, আর সুযোগটা তাহার পিতার আগমন ও কলিকাতা হইতে আগত দিদিমার এক ভাইয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

নয়। তোমাকে ত ওর খুবই পছন্দ হয়েছে, শুধু তুমিই তাকে পছন্দ কর কি-না এতটুকু জানলেই……দাঁড়াও, ডাকাই যাক তাকে…অমল!'

অমলকে সে দেখিয়াছে। একটি সুন্দর-মত ছেলে; তাহার কথা কহিবার, দাঁড়াইবার, জামাকাপড় পরিবার ভঙ্গী—কেহ তাহার সহিত কথা কহিলেই তাহার বিনয়-পূর্ণ সস্মিত মুখভাব—অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা—সবই যেন কেমন নূতন-নূতন! গাঁয়ের কোন ছেলেরই সহিত তাহার কোনখানটিতেই যেন মিল নাই। কেমন যেন মিল নাই। কেমন যেন—সে ঠিক গুছাইয়া ভাবিতে পারে না—ভারী অদ্ভুত লাগে, কিন্তু ভারী ভাল লাগে সত্যি!

সে তাহাকে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু বড় শুভ মুহূর্তে নয়। সে-দিন সন্ধ্যায়—ভাবিতেও তাহার লজ্জা লাগে—গলা ছাড়িয়া অসভ্যের মত গান গাহিতে গাহিতে সে দাদামশায়ের নিকট আসিতেছিল। সদর-ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিতে পায়—একটি ছেলে তক্তপোষের উপর বিছান একটি ধপধপে চাদরের উপর বসিয়া কি পড়িতেছিল। পিছনে একটা সুটকেস পাশে একরাশ বই-কাগজ, গায়ে একটি অদ্ভুত ধরণের গেঞ্জী……

সদর-ঘরে একজন নূতন মানুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর সে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই সে মাঝের ঘরে পলাইয়া যায়।

না ছুটিলেই কিন্তু ভাল হইত—কিন্তু—যা হইবার তা…দাদামশায়ের ডাক শুনিয়া সে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'কি বলছেন?'

সে পলাইতে পারিল না, দাদামশায় তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

বলিলেন—'এই দেখ ভাই আমাদের শ অর্থাৎ শৈল, মানে শৈলবালা। এর বড় ইচ্ছে, যে, তুমি এর বর হও, শুধু তোমার একে পছন্দ হয়েছে কি-না জানতে পারলেই…'

শৈলবালা লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিয়া ওঠে—'যাঃ আমি…তাই বুঝি! নিজেই…ভারী ইয়ে—ছাড়ুন—'

লজ্জায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া ওঠে।

দিদিমার ভাই কোনো কথা না কহিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেলেন, আর সে হাস্যনিরত দাদামশায়ের কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া রান্নাঘরে দিদিমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল—

'কি লজ্জার কথা বলুন দিকি ভাই?'

'কি লজ্জার কথা, ভাই?' দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে বলে-"দাদামশায় আপনার ভাইকে ডেকে বললেন কি না, যে,—আমি—ইয়ে—'শ তোমাকে বিয়ে করবে বলেছে'—আমি বলেছি ও-কথা? বলতে পারি তা কখনও?"

'তাও কি বলতে পারা যায় ভাই? একটুও যদি আক্কেল আছে ওর!'

হাসি লুকাইবার জন্য দিদিমা মুখ ফিরাইলেন সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আপন মনেই কত কি কহিয়া সে বাড়ি যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

সদর-ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে শুনিতে পাইল—দাদামশায় দিদিমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন; সম্ভবতঃ তাহারই সম্বন্ধে। তাহার কানে ভাসিয়া আসিল—

"…ফুলের মত এতটুকু কচি মেয়ে ভাই, যখন ওর মা মারা যায়—"

দিদিমার ভাইয়ের উত্তরটুকু এবার সে কিন্তু কান পাতিয়া শুনিল—

"সত্যি! ভারী সুন্দর, ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি!—"

আনন্দ ও গৌরবে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল। অনেকেই তাহাকে ও-কথা বলে বটে, কিন্তু সে যে শুধু তাহাকে ঠাট্টা করিয়া রাগাইবার জন্য তাহা সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইনি ত ঠাট্টা করিয়া ও-কথা বলেন নাই!

নিশ্চয়ই সে লক্ষ্মী মেয়ে! দুষ্টু বলিলেই যদি মানুষ দুষ্টু হইয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না!

বাবা আসিলে তাহার লক্ষ্মীপনার প্রমাণস্বরূপ কি-ভাবে যে দিদিমার ভাইয়ের এই কথাগুলি সে তাঁহাকে

গুছাইয়া বলিবে, তাহারই মুসাবিদা করিতে-করিতে সে বাড়ি আসিয়া পৌছায়।

৪

দামোদর।

আয়তন তাহার গঙ্গার মত বিশাল নয় বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর! গঙ্গা ধীর, স্থির, আত্মসমাহিতা; দামোদর দুর্দ্দম ও চঞ্চল। স্বভাবে গঙ্গা গম্ভীরা, দামোদর ক্রূর ও অবিশ্বাসী। গ্রীষ্মের রুদ্র-স্তব্ধতায় নদ-বক্ষের তপ্ত বালুরেখায় আপনাকে কবে সে হারাইয়া ফেলে, বর্ষায় ক্ষণে ক্ষীণকায় ক্ষণে অতি স্ফীত হইয়া আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচিয়া ফেনিল উচ্ছ্বাসে সে গর্জ্জন করিয়া ছোটে! তাহার সে গর্জ্জায়মান ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির দিকে চাহিলে সত্যই মনে কেমন যেন এক আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

গভীর রাত্রে বিছানায় শুইয়া শৈলবালা সেই গর্জ্জন-শব্দে কান পাতিয়া দিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত বেড়িয়া সে বিশ্রব্ধ গর্জ্জন যেন হু হু শব্দে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে···

ঠিক যেন গ্রামে বৃষ্টি আসিতেছে! প্রথমে দূরে, পরে নিকটে, তাহার পর গ্রামের সীমান্তে আসিয়া বৃষ্টির সে-শব্দ যেন স্থির হইয়া দাঁড়ায়।

এই দামোদর পার হইয়াই তাহার বাবা আসিবেন। তখন নদীতে কত জল থাকিবে কে জানে! ধরা যাক্—জল কমই থাকিবে। বাবা তাহার নৌকায় উঠিবেন, নৌকা মাঝ-নদীতে আসিবে—এমন সময়—হঠাৎ যদি নদীতে 'হড়্‌কা' আসিয়া পড়ে!

হাজারিবাগ না কোথা হইতে, সে ঠিক বলিতে পারে না, ও-পারে টেলিগ্রাম আসে, ও-পারের লোকেরা চীৎকার করিয়া এ-পারের লোকেদের তাহা জানাইয়া দেয়—নদে এত ফুট জল নামিয়াছে।

অমনি সকলে সাবধান হইয়া যায়। বুঝিতে পারে—অচিরে নদীতে হড়্‌কা পড়িবে। হড়্‌কা পড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নদের দিকে চাহিয়া মাঝিরাও সে-কথা, কে জানে কেমন করিয়া বুঝিতে পারে।

কখনও-বা নদের প্রতিকূল দিকের বহুদূর হইতে কে বা কাহারা 'হড়্‌কা, হড়্‌কা' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে আর অমনি গ্রামের নদীতীর হইতে নদীর অনুকূল দিক উদ্দেশ করিয়া গ্রামের লোকেরাও 'হড়কা, হড়কা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। এমনি করিয়া স্রোতেরও আগে লোকের মুখে-মুখে সে-সংবাদ তীরবাসিগণকে সাবধান করিয়া দিয়া দামোদরের বুক বহিয়া যায়।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে প্রলয়-গর্জ্জনে নদ-বক্ষ স্ফীত হইয়া ওঠে, কত গাছ ভাঙিয়া, পাড় ভাঙিয়া অকস্মাৎ কোথা হইতে দামোদরের দুই কূল ভরিয়া গেরুয়া-জলের পর্য্যাপ্ত সমারোহ লাগিয়া যায়।

ভয়ে ভয়ে সে তাহার চিন্তাধারাকে ভিন্ন গতিগত করে।

কতদিন পরে আজ তাহার বাবা আসিতেছেন, কত না গল্প-কথা তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া ভিড় লাগাইয়া দিতেছে। বাবা হয়ত তাহার একটি কি দুইটি দিন মাত্র থাকিবেন, হয়ত তাহার সব কথা বলা হইবে না, হয়ত-বা দরকারী কথাগুলি বলিতে সে ভুলিয়াই যাইবে··· অতএব, একটি দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার মনোমত কথা ও ঘটনার নির্ব্বাচন করিতে বসে।

কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে একটি কৌতুক-কল্পনা আসিয়া তাহার চিত্ত অধিকার করে।

বাবা যখন তাহার বাড়িতে আসিবেন তখন সে চুপিচুপি দাদামশায়ের বাড়িতে গিয়া লুকাইয়া থাকিলে বেশ হয়,—সে এক ভারী মজা হয় কিন্তু! তাহার খোঁজ হইতে থাকিবে, বাবা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবেন, এমন সময় সে ছুটিয়া আসিয়া বাবার কণ্ঠলগ্ন হইয়া হাসিয়া উঠিবে।

বাবা আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিবেন হয়ত—পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া আগেকার দিনের মত বলিবেন হয়ত—'দুষ্টু মা আমার, পাজি মা আমার, চঞ্চলা লক্ষ্মী আমার!'

ভবিষ্য পুলকের পরিকল্পনায় তাহার বুক গুরু গুরু করিয়া উঠিল।

একদিন—তাহার মনে পড়িয়া গেল—সে তাহার

বাবার চোখে একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া তাঁহাকে 'কানামাছি' সাজাইয়াছিল। তাহার পিছনে-পিছনে ছুটিতে গিয়া বাবা তাহার হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। চঞ্চলা-দি বলিয়াছিলেন—'ধন্যি সোয়াগী মেয়েই হয়েছ মা তুমি! বুড়ো বাপকে পর্য্যন্ত নাচিয়ে নিয়ে ফিরচ—'

আর একদিন তাহারই 'গলার হার' আশালতা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বলিয়াছিল—'হাঁ করত!' তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—সে-ও একদিন এক মুঠো কিস্‌মিস লইয়া গিয়া 'গলার হার'কে হাঁ করিতে বলিয়াছিল। মনে পড়িতেই সে নিশ্চিন্ত মনে চোখ মুদিয়া হাঁ করিতে 'গলার হার' কি একটা ফল তাহার মুখের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। সে তাহা চিবাইতেই অতি কটু-বিস্বাদে মুখ বিকৃত করিয়া ফলটা বাহির করিয়া ফেলিতেই দেখে—সেটা পিটুলি ফল!

সখীর কৌতুক-হাস্য সেদিন, চঞ্চলাদি'র কথারই মত তীব্র বিদ্রূপের জটিল ইঙ্গিত লইয়া তাহার মর্ম্মে আসিয়া বাজিয়াছিল।

গভীর রাত্রে চক্ষে তাহার ঘুম নামিয়া আসিল, চিন্তার খেই হারাইয়া গেল।

৫

অবশেষে প্রতীক্ষার অন্তহীন দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, শনিবারও আসিয়া দেখা দিল—শৈলবালার বাবার আসিবার দিন।

সকালে উঠিয়াই স্নান সারিয়া লইল, কোথা হইতে একরাশ ধুতুরা ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্যদিনকার নিয়মানুযায়ী সে শিবপূজা করিতে বসিল, বসিয়া প্রথমেই সে প্রার্থনা করিল, হে ভগবান, বাবা যেন তাহার ভালয় ভালয় বাড়িতে আসিয়া পৌছান।

তাহার পর সে ও-বাড়ির দিদিমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রান্নাঘরে দাদামশায় ও দিদিমার ভাই তখন জলখাবার খাইতে বসিয়াছেন। সে দরজার পাশে গিয়া দাঁড়ায়।

দিদিমা দরজার গোড়াতেই বসিয়াছিলেন, অপাঙ্গে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—এলো চুল, মাথার বামে সিঁথি, তাহারও বামে একগোছা শ্বেত অপরাজিতা চুলের ফাঁসে আত্মদান করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়াছে, মুখখানি শরৎপ্রাতের শিশিরস্নাত ভিজা ফুলেরই মত সুন্দর! সুকুমার অঙ্গ বেড়িয়া পরিষ্কার একখানি শাড়ী, পরিধান করিবার ভঙ্গীতেও আজ যেন বিশেষত্ব আছে। হাসিয়া কহিলেন—'আজ এত সজ্জা কেন ভাই?'

দাদামশায় বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কহিয়া উঠিলেন—'বিদেশীর মন ভোলাতে!'

দিদিমার ভাই থালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, লজ্জায় শৈল'র মুখ আরক্তিম হইল। সে রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াতেই দিদিমা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন;—উঠিয়া লজ্জানতাননা শৈলবালার চিবুক ধরিয়া বড় স্নেহময় কণ্ঠে আদর করিয়া কহিলেন—'এত যার রূপ হয় ভাই, তার অদৃষ্টে কিন্তু কালো বর জোটে।'

সারাদিন তাহার অধীর প্রতীক্ষায় দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। বেলা থাকিতে সে একটি লণ্ঠন পরিষ্কার করিয়া তেল ঢালিয়া, তাহার দাদার হাতে দিয়া দাদাকে ওপারে পাঠাইয়া দিল। পাঠাইয়া দিয়া সে বাহিরে আসে, আসিয়া তাহাদেরই বাড়ির সদর-দরজার সম্মুখে নারিকেল গাছটার গোড়ায় সে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল।

দাদাকে লণ্ঠন হাতে করিয়া ময়রা গেড়ের ধার দিয়া চলিতে দেখিয়া ও-বাড়ির রোয়াক হইতে দাদামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও, বিরিঞ্চি! বলি এই বেলা ছুটোর সময় হ্যারিকেন আর লাঠি নিয়ে কোথায় চললে হে?'

দাদার পরিবর্ত্তে শৈলবালাই তাহার উত্তর দিল—'আ—হা, ন্যাকা!—জানেন না যেন কিছু!'

দাদামশায় উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ওঠেন, সে অন্যদিকে মুখ ফিরায়।

৬

ঘনায়মান সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে শৈলবালার মনেও শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। পোষ্ট-আপিসের ঘাট হইতে দাদা

মশায় কয়েকবারই খোঁজ লইয়া আসিলেন,—তাহার বাবা এখনও ওপারের ঘাটে আসিয়া পৌঁছান নাই। তাহার দাদা ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে ওপারে নদীর ধারে একা আসিয়া বসিয়া আছে। একে ত সন্ধ্যার আগে খেয়াই বন্ধ করিয়া দেওয়া নিয়ম, তাহার উপর মাঝিরা এখন হইতেই সুর ধরিয়াছে—নদীর অবস্থা ভাল নয়, তাহারা নৌকা খুলিতে পারিবে না।

দাদামশায় কহিলেন—'দাঁড়াও ভাই, দেখি গিয়ে, বাপু বাছা ক'রে যদি ব্যাটাদের রাজী করতে পারি।'

শৈলবালা দাদামশায়ের হাত ধরিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষেরই মত মিনতিমাখানো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'দাদামশায়, আমিও যাব!'

পথে কালু ময়রার দুইটি ছেলেকে মাছ ধরিবার ঘুনি আর সাবল লইয়া চলিতে দেখিয়া দাদামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মানার নীচে বুঝি ঘুনি পাততে চললি রে তোরা?'

একজনই উত্তর দিল, বলিল—'না গো কত্তা জল গড়িয়েচে গাঁয়ে।' অর্থাৎ গ্রামে জল ঢুকিতেছে।

শৈলবালার বুক ঢিপ করিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদামশায়, এই যে কিছুক্ষণ আগে দেখে গেলুম, নদী তিন-পো বইচে?'

দাদামশায় বলিলেন—'হড়কা পড়েচে ভাই।' সত্যই তিনি চিন্তিত হইয়া ওঠেন, চলিতে চলিতেই বলেন—'তাইত ভাই শ, এ-অবস্থায় ওপারে নৌকা পাঠানো ঠিক হবে না কিন্তু—'

এই ভাবে মল্লিকদের ধানভানা কলের নিকট আসিতে আসিতেই দুর্ম্মদ নদের গর্জ্জনোচ্ছ্বাস শ্রবণ-পথে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, খানিক অগ্রসর হইয়া সদর-পথের উপর আসিয়া পড়িতেই—

চমৎকার!

পোষ্ট-আপিসের সমুখ দিয়া জল সদর-রাস্তা ধরিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়া প্রচণ্ড শব্দে কাঁটাল গেড়েয় ঘুরিয়া পড়িতেছে,—সে-কলগর্জ্জনে কান পাতা দায়! সদর-রাস্তার উপর প্রায় একহাঁটু জল, নদ ও পথ একাকার! ডান দিকে আম-কাঁটালের বন। পোষ্ট-আপিসের সম্মুখে একখণ্ড দ্বীপভূমিরই মত যেন আসন্ন অন্ধকারে ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।

দাদামশায় তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, সে ফিরিয়া গেল না। দাদামশায়ের সঙ্গে জল ভাঙিয়াই পোষ্ট-আপিসের সম্মুখে রেশের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মাষ্টার মহাশয়, পাঁচু-খুড়া, মল্লিক-বাড়ির সর্ব্বজয় বাবু এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ওপারে নদের ধারে কাহারা যেন বসিয়া আছে—অন্ধকারে খুব অস্পষ্ট দেখা যায়।

সে শুনিল, ওপারে তাহার বাবা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি শুধু একা আসেন নাই, মল্লিক-বাড়ির সেজবাবুও বধূ ও তাঁহার এক নবজাতা কন্যাকে লইয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। মাঝিদিগকে অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাহারা নৌকা খুলিতে রাজী হয় নাই; দুইজন মাঝি না-কি ইতিমধ্যেই পলায়ন করিয়াছে।

যাহাই হউক, অবশেষে রাজী তাহারা হইলই কোথা হইতে আট-নয় জন কালো ষণ্ডাগোছের লোক আসিয়া নৌকার ধারে ধারে খণ্ড খণ্ড বাঁশ লাগাইয়া দাঁড় বাঁধিতে লাগিয়া গেল। দাদামশায় এবং সর্ব্বজয়-বাবু কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া বড় মাঝির হাতে দিলেন। গ্রামে সে-সময়ে জোর পিকেটীং চলা সত্ত্বেও কয়েক বোতল ধেনো মদ আসিয়া নৌকার খোলে আশ্রয় লইল।

দাদামশায় আর অপেক্ষা করিলেন না, নৌকা ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে। সর্ব্বজয়বাবুর হাতে লণ্ঠন ছিল, তাঁহারই পিছনে পিছনে জল ভাঙিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। এবারে কিন্তু জল ভাঙিতে গিয়া শৈলর কাপড় ভিজিয়া গেল। জল খুব দ্রুত বাড়িতেছে।

যথাসময়ে নৌকা আরোহী লইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। সে-ধ্বনি নিস্তব্ধ রাত্রির বক্ষ ভেদ করিয়া দামোদরের উচ্ছল কল-গর্জ্জনের উপর দিয়া শৈলবালার কানে ভাসিয়া আসিল—'বল হরি হরি বোল।' বহু কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি।

প্রথম কথা তিনটি শুনিতে পাওয়া যায় না, শেষের কথাটিই সে এক বিচিত্র সুরে নদের এপার-ওপার প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে।

তাহার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।—হে মা কালী, হে বাবা রাজরাজেশ্বর, বাবা যেন তাহার ভালয় ভালয় গ্রামে আসিয়া পৌঁছান।

৭

অবশেষে তাহার বাবা আসিয়া পৌঁছিলেন।

এ-আগমন কিন্তু শৈলবালার চঞ্চল মধুজীবনের চারিপাশে আর আনন্দ পুঞ্জীকৃত করিতে পারিল না, সে কেমন-যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব লজ্জা-সঙ্কোচের গুরু-ভারাবনত শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া শৈলবালার মধুশৈশবের শেষের দিকে বড় বেদনার ছেদ টানিয়া দিল।

যে-তুচ্ছ ঘটনাকয়টিকে অবলম্বন করিয়া বালিকাটির মধুজীবনে এত বড় একটি বিয়োগ নামিয়া আসিল তাহার বর্ণনাটিই বক্ষ্যমান আখ্যায়িকার পরিশেষ কথা।

কতই না সামান্য তাহা। কিন্তু অর্থ তাহার যেমনই গভীর তেমনি বৈচিত্র্যময়।

রাত্রির প্রথম প্রহর তখন উত্তীর্ণপ্রায়। গ্রামের নালা, ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে তখন বন্যার জল আসিয়া ঢুকিতেছে; রাত্রির ঝিল্লীরবমুখরিত গাঢ় অন্ধকারের চারিদিকে তখন কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ। সেই শব্দকেও ছাপাইয়া যথাসময়ে ও-ঘরের দাওয়ায় তাহার বাবার কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠিল, 'কই গো।'

জলভরা গাড়ুর উপর একখানি পাট-করা ভিজা গামছা, একজোড়া হারিকেন এবং তাহারই আলোয় সম্মুখের আসনের উপর আসীন তাহার বাবার সেই চিরপরিচিত শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি।

সে স্পন্দিতবক্ষে ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল। আগের মত পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দ মন লইয়া ছুটিয়া গিয়া আর বাবার কণ্ঠলগ্না হইতে পারিল না—কোথা হইতে কারণহীন লজ্জা আসিয়া তাহার সকল চিত্ত অধিকার করিয়া বসে।

সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে তাহার বাবাও মুখ তুলিয়া চাহেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সে যেন কেমন এক বিস্ময়ভরা অপরিচয়ের দৃষ্টি! সে-দৃষ্টির সম্মুখে শৈলবালা আরও কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ে—কোনও মতে বাবার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়।

আগের সে-সকল দিনের মত তাহার বাবা আর তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন না, মুখচুম্বন করিয়া মাথায় হাত দিয়া আগের দিনের মত আর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদও বর্ষণ করিলেন না; পরন্তু সে উঠিয়া যাইবার সময় ব্যথিত-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া লক্ষ্য করিল—বাবা তাহার মাথায় আঙুলের ডগা ঠেকাইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাহাকে বিরত করিলেন।

তাহার যেন ঠোঁট ফুলিয়া কান্না আসিল—সে ঘরে গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল,—বন্যার জল যেন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেছে। তৃণাচ্ছাদিত সবুজ ভূমির উপর গেরুয়া পলিমাটির স্তর, গাছে পাতায় সর্ব্বত্রই যেন গেরুয়া কাদার ছোপ, ষষ্ঠিতলায় সজিনাগাছের ডালে দুইটা জল-মেটুলী সাপ পরস্পরকে জড়াইয়া যেন কেবল দোল খাইতেছে…

সে ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ঠাকুমা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে শ্রীহরি দুর্গা, শ্রীহরি দুর্গা, বলিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

সকাল বেলায় বাবা কোথায় বাহির হইয়া গেলেন, দ্বিপ্রহরে বাড়ি ফিরিয়াই স্নানাহার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এখনই খেয়া ধরিতে না পারিলে ওপারে আবার মশাগ্রাম ষ্টেশন যাইবার বাস ধরিতে পারিবেন না।

বিদায়-বেলায় শৈলবালা পুনরায় আসিয়া তাহার বাবার পদতলে মাথা রাখিল, কিন্তু আর যেন তাহা উঠাইতে পারিল না। বুক-ভরা কত কথা তার কিছুই বাবাকে বলা হইল না, বাবা তাহাকে আর আগের দিনগুলির মত বুকে তুলিয়া লইলেন না, তাহার কেবলই কেমন-যেন মনে হইতে লাগিল—কি যেন তাহার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ

সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, জীবনে আর যাহা সে ফিরিয়া পাইবে না। বুক ফাটিয়া যেন কান্না আসে, কেবলই ভয় হয়—বাবার পা হইতে মাথা তুলিতে গেলেই হয়ত সে এখনই কাঁদিয়া ফেলিবে।

বাবা তাহার তখন নিতান্ত সংসারী মানুষটিরই মত ঠাকুমার প্রতি গৃহ-রক্ষাসম্বন্ধীয় গুটিকতক প্রয়োজনীয় উপদেশের কাজ সারিয়া লইতেছিলেন—

বিচালিগুলা উঠান হইতে সজিনা-তলায় যেন দেরি না করিয়া সরানো হয়—মেজ ছেলেটি তাঁহার জন্মান্ধ, তাহাকে যেন-না যখন-তখন ওপার পাঠান হয়—বিরিঞ্চির স্কুলের মাহিনা কিছু ধান বিক্রয় করিয়া দিলেই উপস্থিত চলিয়া যাইবে—এবং শৈলও ত বেশ বড়সড় হইয়া উঠিয়াছে, মেয়েছেলে নাই-বা বেশী লেখাপড়া করিল, অতএব স্কুলে পড়িতে তাহার আর না-যাওয়াই ভাল। আর—ইয়ে—পথেঘাটে যখন-তখন ঘুরিয়া বেড়ানোটাও…

সমস্বরে তাহার সমগ্র ব্যথিত চিত্ত যেন বারংবার বলিয়া উঠিল, তাহাই হইবে, তাহাই হইবে। সে আর স্কুল যাইবে না—সে আর লেখাপড়া করিবে না—সে আর ঘরের বাহির হইবে না—সে আর কাহারও সহিত কথা কহিবে না। সন্ধ্যায় সখীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দাদামশায়কে প্রণাম করিয়া নিশ্চয়ই বলিয়া আসিবে—তাঁহার শ' মরিয়া গিয়াছে।

বড় বেদনায়, বড় অভিমানে তাহার বড়বড় দু-চোখ ভরিয়া এইবার সত্যসত্যই জল গড়াইয়া পড়িল।

মেঝেরি

শ্রীগোপাললাল দে

মাঝের হিড়,
দুই পাশে ক্ষেত দু-হাজার বিঘে,
মাঝেতে একাকী তরুর শির,
উত্তরে গ্রাম 'কাকটিয়া' নাম
দখিনে 'পদ্মা' মাঠের শেষে,
দু'য়ে পাশাপাশি যেন প্রতিবেশী
এ উহারে হেরে প্রভাতে হেসে;
বৈশাখে যবে দু-পহর রোদে
ঘূর্ণী হাওয়ায় আগুন ভাসে,
ধেনুদল লয়ে রাখাল পলায়
ক্ষীরতরুছায় সলিল পাশে,
সে দাবদাহনে ক্লান্ত পথিক
ধুধু মাঠে পড়ি কর্ম্মফলে,
অনেক ভাগ্যে প্রাণ পেয়ে যায়
এই 'মেঝেরি'র খেজুরতলে।

বারি ঝর ঝরে প্রবল বেগে,
ঘন কালিমায় মাঠ ছেয়ে যায়
পশ্চিমাকাশে সরস মেঘে,
নীল হয়ে আসে দূরের বনানী
কাছে তরুবীথি আঁধিয়া-মাখা,
অশথ বটের পাতার আড়ালে
ঢেকে বসে পাখী সজল পাখা,
বিজলী কশায় দেয়া গরজায়
দিকে দিকে ভীত প্রতিধ্বনি,
খেজুর তালের পাতায় পাতায়
ঘুঙুর বাজায় রিনিক ঝিনি,
আধ-বাতায়নে কৌতুকী চোখে
চেয়ে থাকি যদি দূরের পানে,
এই 'মেঝেরি'র বনমন্দির
নব যৌবন স্বপন আনে।

*　　*　　*

কাছে 'কাঁদরে'র বিল,
বর্ষার শেষে এক হয়ে মেশে
অদূরে খালের নীল সলিল ;
ঘাসে ফোটে ফুল অযুত অতুল
জলে ফোটে শুঁদি শালুক ফুল,
'কৈ মাগুরের' মাছ ঘুরে ফিরে
'শোল'-শিশু নব জীবনাকুল।

আশ্বিনে ধানে ভর ভর মাঠে
হেথা দু-গাঁয়ের ছেলেরা আসে,
ছিপ ফেলে জলে দিন কেটে যায়
ছল করা মাছ ধরার আশে,
তারা দেখে ধানে আকাশের ছায়া,
বুনো হাঁস, বক, সারস মেলা,
ঘাসে ফেরে বোড়া শিওর চাঁদারা,
কাদা জলে করে ভেকেরা খেলা,
রাখালের বাঁশী কৃষকের হাসি,
ঘুঘু কপোতের কূজন শেষে,
দুপুর গড়ায় শুধু হাতে যায়
তবু ফিরে চায় মধুর হেসে।

আবার একদা সরিষা ফুলে,
ভরামাঠখানি আয়নার মত
সুখ-পরশন আলোয় দোলে,
মটরের ফুলে আঁখি মেলে থাকে
যব গম শীষে হরষ দোলা,
দুধমাঠে চায় চিরদুখী চাষা
জীবনের শত বেদনা ভোলা ;
বিকালের দিকে বধূদের মেলা,
ঘোমটা কোথায় খসিয়া পড়ে,
হেরি মেঝেরির সরু তরুটির
পুলক শিহরে শীর্ষ নড়ে।
দখিনা বায়,
রিক্ত ভূষণ খোলা মাঠখানি
থাকে যেন আধ-চেতনে হায় ;
তখন বিজন নিবিড় দুপুরে
ভরাসন্ধ্যায় নিশীথ ছায়,
কত প্রণয়ীর প্রেম নিবেদন
শুনেছে এ তরু প্রিয়ার পায়।
কত এর জানা শোনা,
দুইখানা গাঁয়ে কত ভাব আড়ি
নেওয়া দেওয়া আনাগোনা,
কত ওঠাপড়া দুখানা গাঁয়ের
কত অতীতের কান্নাহাসি,
কত শোকাবহ স্বজন-বিরহ
কত বিবাহের মিলন বাঁশি,
কত লুণ্ঠন খুন সুগোপন
অকালে মড়কে জীবন-হানি,
নীরবে দেখিয়া আঁখি মুছিয়াছে
এই খর্জ্জুর বিটপীখানি।
আজও সেথা এক ঠাঁই,
উঁচু হয়ে আছে কোন্‌কালে
বুঝি হাঙ্গামা বাধে তাই,
রাজাদের সাথে জলকাটা
নিয়ে প্রাণ দিল অবহেলে,
বিশ বছরের ছোকরা জোয়ান,
বিধবার এক ছেলে ;
এইখানে তার গোপন সমাধি ;
জননী মরিল কেঁদে,
মেঝেরির মাটি সে স্মৃতি
রেখেছে আজিও বুকেতে বেঁধে।

কষ্টিপাথর

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৬—১৮২২

১। বাঙ্গাল গেজেট

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ সালের পূর্ব্বে এদেশে কোন বাংলা সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।...

১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র।...

বাঙ্গাল গেজেট অল্পদিনই জীবিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয় ইহার নাম সাধারণের মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না।...

২। সমাচার দর্পণ

সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮, ২৩এ মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। প্রথম তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত।...

প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই প্রধানতঃ 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন।...

শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে সমাচার দর্পণকে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন।...

১৮৩২ সনে সমাচার দর্পণ দ্বিসাপ্তাহিকে পরিণত হয়।...সমাচার দর্পণের দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।...১৮৩৪, ৮ই নভেম্বর হইতে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল।

১৮৪১, ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় সমাচার দর্পণ শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল।...

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ বাহির করিয়াছিলেন ১২৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানদীপিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ভগবতী-চরণ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৫১, ৩ মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখে তৃতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল।...

'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া ১২৫৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একেবারে লুপ্ত হয়।

৩। সম্বাদ কৌমুদী

কলুটোলা-নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। প্রথম সংখ্যায় বঙ্গীয় জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে লেখা হইয়াছিল ঃ ... লক্ষ্য...দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।"

১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮) সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।...

সম্বাদ কৌমুদী প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। রাজা রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন। তিনি সম্বাদ কৌমুদীতে সহগমনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ধর্ম্মহানি এবং সমাজে মানহানির আশঙ্কা করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ইহার প্রথম ১৩ সংখ্যা পরিচালন করিয়াছিলেন মাত্র।

৪। সমাচার চন্দ্রিকা

সতীদাহ প্রথাকে উৎখাত করিবার জন্য রামমোহন রায়কে বদ্ধ-পরিকর দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুর দল চটিলেন। প্রধানতঃ এই প্রথার সপক্ষে আন্দোলন চালাইবার জন্যই তাঁহাদের পক্ষ হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হইল। সেখানি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ (২৩ ফাল্গুন ১২২৮) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।...

বাংলা মাসিকপত্র

১। দিগ্দর্শন।—১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা "দিগ্দর্শন অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ছাপার অক্ষরে ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র।

২। গস্পেল মাগাজীন।—এই মাসিক পত্রখানি দ্বিভাষিক ছিল। প্রত্যেক পাতার বাঁদিকে ইংরেজী, ডানদিকে তাহার বঙ্গানুবাদ। 'গস্পেল মাগাজীন'-এর প্রথম সংখ্যার তারিখ—ডিসেম্বর, ১৮১৯। ...এই কাগজখানিতে কেবল খৃষ্ট-তত্ত্ব আলোচিত হইত।

৩। ব্রাহ্মণ সেবধি।—রামমোহন রায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই নাম দিয়া ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'Brahmunical Magazine ও ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহারই সাহায্যে মিশনরীদের প্রচারিত হিন্দুশাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইত।

৪। পশ্বাবলী।—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক এই বাংলা মাসিক পুস্তকখানিপ্রকাশিত হয়। এক এক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর বিবরণ এবং পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই সেই জন্তুর ছবি থাকিত। 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—ফেব্রুয়ারি, ১৮২২।...

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি' পরিচালন করেন—শ্রীরামচন্দ্র মিত্র। ইহা ১৮৩২ সনে প্রকাশিত হয়।

by Ramchunder Mitter" প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালের শেষাশেষি।

উর্দ্দু সংবাদপত্র

সেকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই ইংরেজী জানিত, আর হিন্দী বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলি তখন পর্য্যন্ত এত সংস্কৃত-ঘেঁষা ও কঠিন ছিল যে সে-ভাষা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইলে তাহা কেহই সহজে পড়িতে পারিত না। অন্যান্য ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে উর্দ্দু ভাষার—অবশ্য চলিত কথাবার্ত্তায়—বহুল প্রচলন ছিল।

১। জাম-ই-জাহান-নুমা

প্রথম হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু সংবাদপত্রের নাম—জাম-ই-জাহান-নুমা, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যরাজ জমশেদ যে-পেয়ালাতে সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন। ইহা ১৮২২, ২৮এ মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ফার্সী সংবাদপত্র

চলিত কথাবার্ত্তায় উর্দ্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাকিলেও লেখ্য ভাষা হিসাবে ইহার তেমন চলন ছিল না। তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ছিল কম। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন তাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা আবার ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, কাজেই তাঁহাদের নিকট উর্দ্দু সংবাদপত্রের আদর ছিল না। সভ্যসমাজের ভাষাই ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত। কাজেই ফার্সী সংবাদপত্র পড়িবার ও পয়সা দিয়া কিনিবার মত গ্রাহক তখন এদেশের বড় বড় শহরে যথেষ্ট ছিল।

মীরাৎ-উল্-আখ্বার।—ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহন রায়ের। ইহার নাম—'মীরাৎ-উল্-আখ্বার,' বা সংবাদ-দর্পণ। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১৮২২ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২২৯) শুক্রবার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

অতীব কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কাগজখানি চালাইয়া রামমোহন ইহার প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩য় সংখ্যা)

প্রাচীন সাহিত্যে মহিলা-কবি ও বিদুষী

শ্রীমৃণাল দাশ-গুপ্তা

বৈদিক যুগে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে কেহ উদাসীন ছিলেন না। কারণ দেখা যায় বহু স্ত্রী-কবি ঋগ্বেদের বহু মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের উপর লিখিত সৌনকাচার্য্যের বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে সাতাশ জন স্ত্রী-ঋষির উল্লেখ আছে—কিন্তু ইহাদের ভিতর উর্ব্বশী, যমী, অদিতি প্রভৃতি কতকগুলি কল্পিত দেব-চরিত্র ছাড়িয়া দিলে, ঋক্-রচনাকারী মানবী স্ত্রী-কবি নয়জনের নাম পাওয়া যায়। এই নয়জনের নাম ঘোষা কাক্ষীবতী, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা অগস্ত্যভগিনী, লোপামুদ্রা, শশ্বতী, রোমশা এবং বাক্দেবী। এই সকল স্ত্রী-কবি রচিত মন্ত্রগুলি অন্যান্য ঋক্ মন্ত্রের মত শ্রুতি বলিয়া সমাদৃত হইত। সুতরাং বৈদিক যুগের অনেক নারীই যে উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন, তাহা তাঁহাদের ঋক্ বা মন্ত্র রচনার পারদর্শিতা হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

ঋগ্বেদের সময়ের স্ত্রীলোকদিগের বিষয়ে জানিতে হইলে তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত মন্ত্র রচনাগুলির সাহায্য ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই, কারণ প্রাচীনকালে জীবন-চরিত লিখিবার পদ্ধতি ছিল না বলিয়া কেহ ধারাবাহিক জীবনী লিখিয়া রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্তের (এক একটি সূক্তে কতকগুলি করিয়া ঋক্ বা মন্ত্র থাকে) সমস্ত ঋক্গুলিই ঘোষানাম্নী স্ত্রী-কবির রচিত। যে কয়টি নারী-ঋষির ঋক্ ঋগ্বেদে রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ঘোষার ন্যায় এতগুলি ঋক্ কেহই রচনা করেন নাই। ঘোষা উচ্চ বংশোদ্ভবা, বহু ঋক্ রচয়িতা দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কাক্ষীবৎ ঋষির কন্যা ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, ঘোষার সর্ব্বশরীর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল বলিয়া বয়স্থা হইয়াও পিতৃগৃহে অবিবাহিত-অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। পিতৃ-পিতামহ-আরাধিত দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিলে, পরে তিনি বিবাহিতা হইয়া সন্তানের জননী হন। তাঁহার প্রতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এতাদৃশী অনুকম্পা দর্শনে ঘোষা তাঁহাদের বন্দনা করিয়া মন্ত্রগুলি রচনা করেন। মন্ত্রগুলিতে তিনি সরলভাবে নিজের মনের নিগূঢ়তম আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অশ্বিনীদের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। ঘোষা বলিতেছেন—'হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল ব্যক্তি তোমাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান করে, তোমরা তাহাদের নিকটই গমন করিয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। কুমারী ঘোষা আমি, তোমাদের কাছে আমার এই কামনা জানাইতেছি যে, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত এরূপ একটি বলিষ্ঠ স্বামী আমাকে দান কর। আমি সেই স্বামীর প্রিয়া হইয়া ধন, পরিজন সহ সুখে তাঁহার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।' অশ্বিদ্বয় ঘোষার এ আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদিগের কৃপায় কুষ্ঠরোগ মুক্ত হইয়া ঘোষা বলিতেছেন—'আমি ঘোষা, আমি নারী লক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আসিয়াছে।' বলা বাহুল্য ঘোষা এক বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া সুহস্ত নামক পুত্রের জননী হন। ঘোষার পুত্র সুহস্ত ৪১ সূক্তের তিনটি ঋকেরই রচয়িতা ছিলেন।

নারী ঋক্-রচয়িতা গোধা মাত্র দেড়খানি ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করেন, সুতরাং ইহা হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

বিশ্ববারা অত্রিগোত্রজাতা নারীঋষি ছিলেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলটি সম্পূর্ণই এই অত্রিবংশের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিশ্ববারা অষ্টাবিংশ সূক্তের সর্ব্বশুদ্ধ ৬টি ঋক্ রচনা করেন এবং সে সমস্তই অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে রচিত। বিশ্ববারা যে কেবলমাত্র মন্ত্রই রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে—তিনি একজন ঋত্বিক্ও ছিলেন, তিনি স্বয়ং যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। ঋগ্বেদের সময়ে যজ্ঞেতেও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার ছিল, এবং তাঁহারা একাকী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন। প্রথম ঋক্টিতেই দেখিতে পাই দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নিকট গমন করিতেছেন। তিনি বিবাহিতা ছিলেন, কারণ পরবর্ত্তী ঋক্গুলিতে তিনি দাম্পত্য-সম্পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'হে অগ্নি! তুমি সম্যক্রূপে প্রজ্জ্বলিত হও। হে অগ্নি! আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।'

আত্রেয়ী বিশ্ববারা রচিত মন্ত্রগুলিতে ঋগ্বেদের সময়ে স্ত্রীলোকগণ গৃহে ও সমাজে কিরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ঋক্‌গুলিতে আরও জানা যায় যে, বিশ্ববারা বাহিরে উচ্চপদধারী মহীয়সী মহিলা ছিলেন সত্য ; কিন্তু গৃহে তিনি পতিপ্রাণা প্রেমময়ী নারীই ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী অপালা ঋষি অত্রিমুনির কন্যা ছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের ৭টি ঋক্ রচনা করিয়া ইন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। ঋষি অপালা ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। সোমরস ইন্দ্রের প্রিয় ও রুচিকর জানিতে পারিয়া অপালা সোমরস দান করিবার জন্য ইন্দ্রের স্তব করেন। পরে সোমপানে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বর দান করিতে সম্মত হন, এবং বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে অপালা কহিতেছেন—'হে ইন্দ্র, তুমি আমার পিতার মস্তক, তাঁহার ক্ষেত্র এবং ত্বক্‌রোগ-জনিত রোগযুক্ত আমার অঙ্গ—ইহাদের সকলকেই উৎপাদনশীল কর, এই আমার প্রার্থনা।' তখন ইন্দ্র প্রথম দুইটি প্রার্থনা পূরণ করিলেন এবং অপালার দেহ তাঁহার রথচক্রের নেমির অন্তরালে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তিনবার আকর্ষণ করিলেন। এইরূপে রোগমুক্ত করিয়া তাঁহার তিনটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। অপালা রোগমুক্ত হইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেছেন, 'হে শতক্রতু! তুমি তিনবার শোধন করিয়া অপালাকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল চর্ম্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে।'

দশম মণ্ডলের ৬০ সূক্তের ১২টি ঋকের মধ্যে ষষ্ঠ ঋক্‌টি নারী-ঋষি অগস্ত্য-ভগিনীর রচিত। ইঁহার চারিপুত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমাতির গৃহ-পুরোহিত ছিলেন। কোনও কারণে রাজা অসমাতি সেই পুত্র-দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থলে অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেন। নবনিযুক্ত পুরোহিতগণ সুবন্ধু নামক অগস্ত্যভগিনীর এক পুত্রকে নিহত করিলে, অন্য তিন পুত্র শত্রুদমন করিবার জন্য রাজা অসমাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ষষ্ঠ ঋকে দেখিতে পাই, অগস্ত্যভগিনী নিজ পুত্রের মঙ্গলার্থে রাজা অসমাতির সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন—'হে রাজন! অগস্ত্যের নপ্তাদিগের (দৌহিত্রদিগের) জন্য রথে লোহিত অশ্ব যোজনা করিয়া তাহাদের শত্রুবিনাশে অগ্রসর হও।' ইহার পরবর্ত্তী ঋক্‌গুলিতে সুবন্ধুর পুনর্জীবনের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।—'এই অগ্নি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ। হে সুবন্ধু, এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।'

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম দুইটি ঋক্ অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা কর্ত্তৃক কামদেবতা রতিদেবীর উদ্দেশে রচিত। যোগী, সংযমী, সম্ভোগস্পৃহাশূন্য ঋষি অগস্ত্য দিবারাত্রি যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সাধ্বী স্ত্রীর নিকট হইতে সর্ব্বদা নিজেকে দূরেই রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তপস্বী স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করিয়া লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে কঠোর সংযম ত্যাগ করিয়া রতিদেবীর সেবা করিতে অনুরোধ করিতেছেন—'হে অগস্ত্য, বহুবৎসরাবধি দিবারাত্রি তোমার সেবা করিয়া এখন আমি জরাপ্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন, সত্যবাদী, সংযমী বহু ঋষি যজ্ঞাদি কর্ম্মে রত থাকিয়াও গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিতেন—সুতরাং হে তপস্বী, তুমি আমার নিকট আগমন কর।' এই সূক্তেরই তৃতীয় ঋক্ দুইটি স্বয়ং অগস্ত্য ঋষির রচিত এবং তাহা হইতে জানা যায় যে পত্নীর বিনীত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সক্ষম না হওয়াতে তিনি গৃহধর্ম্ম এবং যজ্ঞ-ধ্যানাদি একই সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অগস্ত্য বলিতেছেন—'যদিও আমি তপস্যা ও সংযমে নিযুক্ত তথাপি আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। লোপামুদ্রা মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক।'

অঙ্গিরা ঋষির কন্যা এবং যাদব অসঙ্গের পত্নী শশ্বতী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের শেষ ঋক্‌টি রচনা করেন। রাজপুত্র অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া পুরুষত্ব বর্জ্জিত হন। স্বামীকে শাপমুক্ত করিবার জন্য শশ্বতী বহুবৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন। অসঙ্গ স্ত্রীর তপস্যার ফলে এবং মেধাতিথির প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইলে শশ্বতী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—'আর্য্য! তুমি শাপমুক্ত হইয়া, এক্ষণে জীবন উপভোগ করিতে সক্ষম হইলে।' ঋগ্বেদে শশ্বতীকে প্রকৃত নারী বলা হইয়াছে। তিনি স্বামীর দুঃখে দুঃখিতা, এবং তাঁহার আনন্দে আনন্দিতা হইতেন।

বৃহস্পতির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী রোমশা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋকের রচয়িতা। অসীম প্রতাপশালী রাজা ভাব্যস্বনয় ইঁহার স্বামী ছিলেন। রাজা ভাব্যস্বনয় অল্পবয়স্কা ও নিজের তুলনায় নিতান্ত অনুপযোগী বিবেচনায় পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। এই মন্ত্রটিতে রোমশা নিজ অঙ্গে প্রথমযৌবনের আগমন অনুভব করিয়া যুবতিসুলভ আনন্দে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'নিকটে আসিয়া দেখ, এক্ষণে আমি তোমার উপযুক্ত পত্নী হইয়াছি।' বলা বাহুল্য, রাজা ভাব্যস্বনয় স্ত্রী রোমশাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া ভোগসুখে লিপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্‌টি ভাব্যস্বনয়ের রচনা—তিনি পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'এই রমণী আমার সহিত পুনরায় সুখে মিলিত হইয়াছে।'

দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ৮টি ঋক্ অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা বাক্ নাম্নী স্ত্রীকবি-রচিত। এই মন্ত্রগুলি 'দেবীসূক্ত' নামে প্রচলিত। ইঁহার রচিত ঋক্‌গুলিতে বক্তা বিশ্বের সহিত নিজের একাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বনির্ম্মাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

এই সকল স্ত্রী-ঋক্‌রচয়িতাদিগের ঋক্ রচনা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, সে যুগে স্ত্রীলোকেরাও মন্ত্র লিখিতেন এবং সেই মন্ত্র বেদমন্ত্র বলিয়া সমাদৃত হইত, সে সমাজে নারীর স্থান যে অতি উচ্চে ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

(জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৩৯)

পুস্তক পরিচয়

নক্ষত্র-চেনা—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ইহার পৃষ্ঠাগুলি প্রবাসীর পৃষ্ঠার চেয়ে চৌড়ায় দু-আঙুল লম্বায় এক আঙুল বড়। পৃষ্ঠার সংখ্যা ৮০। ইহাতে বার মাসে আকাশে নক্ষত্রগুলির অবস্থিতি জানাইবার জন্য বারখানি বড় রঙীন পট বা ছবি দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া লেখার সঙ্গে ছাপা ১৫টি ছবি আছে। এতগুলি রঙীন ছবি নির্ভুল করিয়া আঁকাইতে এবং তাহার ব্লক প্রস্তুত করিয়া আর্টপেপারে ছাপিতে অনেক ব্যয় হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য ২॥০ টাকা হইবার ইহাই প্রধান কারণ। দাম বেশী নয়। মলাটের উপরও একটি রঙীন ছবি আছে।

অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয় বাংলা ভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক বহি লিখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সোজা ভাষায় সোজা করিয়া বুঝাইতে তিনি সুদক্ষ। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও তাঁহার এই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা তিনি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিয়াছেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধেরাও ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন।

প্রারম্ভিক কিছু বলিয়া তিনি পরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র ও নক্ষত্র-মণ্ডলের উদয়-অস্ত, আকাশ-পট, ধ্রুব তারা, সপ্তর্ষি ও লঘু সপ্তর্ষি-মণ্ডল, এবং নক্ষত্র-পটের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের দেশে ও প্রাচীন গ্রীসে যে-সব গল্প প্রচলিত ছিল তাহাও তাঁহার বহিতে স্থান পাইয়াছে। ইহার পর লেখক বার মাসের নক্ষত্র-পটের আলাদা আলাদা বর্ণনা করিয়াছেন। শেষে আমাদের জ্যোতিষ, বৎসর ও মাস গণনা, চান্দ্র-মাস ও চান্দ্র-বৎসর, তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহ-চেনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার অনেক তত্ত্ব ও সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বই পড়ে। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য তা ছাড়া আরও অনেক বহি পড়া এবং বহির নির্দেশ অনুসারে ও পরে স্বাধীন ভাবে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। জগদানন্দবাবুর বহিখানি অনুসারে ছেলেমেয়েরা রাত্রে নক্ষত্র চিনিতে শিখিলে আনন্দিত হইবে এবং তাহাদের জ্ঞান বাড়িবে। সমুদয় বিদ্যালয় ও পাঠশালায় ইহা রাখা উচিত, এবং যে-সব পিতামাতা ও অভিভাবকের সামর্থ্য আছে তাঁহাদের বাড়িতেও ইহা থাকা উচিত। ইহার ছাপা ও কাগজ ভাল, বাঁধাই মজবুত।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চরীকা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। চিত্রকর শ্রীচঞ্চল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। ফুল্‌স্কাপ ৮ পেজী, ১৯১ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

আটটি ব্যঙ্গচিত্রের সমষ্টি. প্রবীণ লেখকের পাকা হাতের নিপুণ রচনা। লেখক তাঁহার পাত্র-পাত্রীর উপর অপক্ষপাতে ব্যঙ্গের রঙ্গ লেপ করিয়াছেন, কিন্তু রচনার গুণে অস্বাভাবিকও স্বাভাবিক হইয়াছে। 'বোড়ের কিস্তি' গল্পটি সকলের সেরা। গোয়ালার ছেলে পাঁচু-ধনের তুলনা নাই, তাহার অজ্ঞানকৃত বজ্জাতিতে দুই জুয়াচোর নাজেহাল হইয়াছে। মামুলী ও অমামুলী প্রেমকাহিনীর অভাব আমাদের নাই, তাহার ফাঁকে ফাঁকে যদি দেবেন্দ্রবাবুর লঘু রচনা পাই তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি।

রা. ব.

সন্ধান—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকান, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০২+৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৸০।

গ্রন্থকার প্রবীণ, অভিজ্ঞ পণ্ডিত। জীবনের প্রতিদিন তিনি যে-যে বিষয় অধ্যয়ন করেন, যে-যে বিষয় চিন্তা করেন, যে-যে লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাদের সম্বন্ধে নিজের অভিমত তিনি ডায়ারিতে লিখে রাখেন। এই রকম লেখার সমষ্টি এর আগে একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তার নাম যুগমানব; এখানিও সেই রকম নানা বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার সম্বন্ধে লিখিত অভিমতের সমষ্টি। এতে ইউরোপের বহু লেখক ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যাপারের আলোচনা আছে, আর সেই সব অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের দেশের লেখক ও অবস্থার তুলনায় সমালোচনা আছে। বহুবিধ বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করা হয়েছে ব'লে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাও যায়। এতে কি কি বিষয় আলোচিত হয়েছে তার একটি নির্ঘণ্ট পরিশিষ্টে দেওয়াতে পাঠকের বিশেষ বিষয় খুঁজে বাহির ক'রে নেবার সুবিধা হয়েছে। অনেক উচ্চ ভাব ও চিন্তা এর মধ্যে সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। শিক্ষার উপাদান পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পুঞ্জীভূত আছে। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবার সময় তিনি রুষ লেখক টুটুস্কির রচনা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, এবং তার কথা লিখেই তাঁর রোজনামচা শেষ করেছেন। নিরীশ্বর ও অনাত্মবাদী ধর্ম্মমত আলোচনার ফলে কি না জানি না, তবে দেখি লেখকও নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক ও অনাত্মবাদী হয়ে উঠেছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শয়তানের সুমতি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ। শ্রীআশুতোষ ধর, প্রকাশক। ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু শিশু-সাহিত্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিও একখানা ছেলেদের গল্পের বই। ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও বয়োবৃদ্ধগণ ইহা হইতে যথেষ্ট রস পাইবেন। নিমাইয়ের মত সবল, সুস্থমন পল্লীবালকের ছবি সচরাচর শিশু-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাতেও তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে গ্রন্থকার তাঁহার শিশুপুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যে-উৎসর্গ-লিপি লিখিয়াছেন সেটি পড়িতে পড়িতে মানবতার

সহজ সৌন্দর্য্য মনকে রসসিক্ত করিয়া তোলে। পুস্তকের ছাপা, ছবি ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়; মূল্য ১৲ টাকা, পৃ. ৯৪।

বাঙালীর জাতীয়তা বিকাশে বাঙালীর কবির দান কি পরিমাণ ও কি রূপের, সে-সম্বন্ধে একখানি তৃপ্তিদায়ক গ্রন্থ বাংলা দেশে আজও লিখিত হয় নাই। এ বিষয়ে যে এক-আধখানা আলোচনা গ্রন্থ আছে তাহা পড়িলে হতাশ হইতে হয়। বর্ত্তমান লেখকের বইখানি ছোট; নিজের বক্তৃতায় ও টীকায় উহার কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া কবির কথাই উদ্ধৃত করিয়া লেখক কবির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিজে শুধু এই সকল উদ্ধৃতির মধ্যে যোগসূত্রটুকু জুড়িয়াছেন—ইহা তাঁহার সুবিবেচনার ও সুরুচির নিদর্শন। ইহা ছাড়াও তিনি আর একটি উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের যে-সকল পুরাতন প্রবন্ধ জাতীয় ভাবের ও জাতীয় চিন্তার পরিচায়ক—এতদিন মাসিক পত্রের পাতাতেই প্রায় আত্মগোপন করিয়া ছিল, তিনি অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করিয়াছেন; এবং তাহার উদ্ধৃতাংশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই ভাবধারা কত পূর্ব্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে তাহার বিশেষ রূপটি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আরও আনন্দের কথা এই যে, কর্ম্ম-কোলাহলের নানা বাধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট ও কল্পিত মূর্ত্তিই ধারণ করিতে চাহিয়াছে। ইহাও মনে পড়ে যে, ফাঁকি হয়ত আজ বাড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের জাতীয়তা আর সেদিনকার 'এজিটেশন'-পন্থী পেট্রিয়টিজম-এর মত অত ফাঁকা নয়। লেখক জাতীয় চেতনা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জাতীয় শিক্ষা ও ধন-বৈষম্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত যথাযথ সাজাইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। বিষয়বিন্যাস আরও ধারাবাহিক ও গ্রন্থখানি আরও বিশদ হইলে বোধ হয় পাঠক সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতেন; কারণ এ বিষয়ে পাঠকের দাবি ও ক্ষুধা একটু বেশী। আর একটি কথা—বইখানা যেরূপ উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট, এবং উহার বিষয়টি যেমন বাঙালী মাত্রেরই প্রিয় এবং আয়তন ও মুদ্রণে যখন ব্যয়বাহুল্য সূচিত হইতেছে না, তখন মূল্য আর একটু কম করিলে ভাল হইত।

শ্রীগোপাল হালদার

কাশ্মীর ভ্রমণ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২৫ নং চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১৩৬; মূল্য এক টাকা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কাশ্মীরকে অনেক স্থলে ভূস্বর্গ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সৌন্দর্য্যানুরাগী মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একজন বিশিষ্ট উপাসক ছিলেন। দুইটি অমর ছত্রে তিনি কাশ্মীরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপের বর্ণনা দিয়াছেন:—

আগর্ ফিরদৌস বাররুয়ে জমিন্ আস্ত্।
হামিন্ আস্ত্ ও হামিন্ আস্ত্ ও হামিন্ আস্ত্॥

এ পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তাহা এইখানে, তাহা এইখানে, তাহা এইখানে। গ্রন্থকার একাধিকবার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়াছেন; তাই তিনি কাশ্মীর প্রদেশের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু, কাহিনী প্রভৃতির যথাযথ বিবরণ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাওলপিণ্ডি, বরামুলা, ডাল্ ও উলার হ্রদ, হরিপর্ব্বত, ক্ষীর ভবানী, জুম্মা মসজিদ্, নাসিম্ বাগ, নিসাত্ বাগ, শালিমার, চশ্‌মা শাহী, পরীমহল, গুলমার্গ, জম্বু প্রভৃতি স্থানের ও তদ্দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহার, বাণিজ্য, শিক্ষা, জলবায়ু, পালা-পার্ব্বণের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কাশ্মীর-দর্শন অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; এই পুস্তক পাঠে ঘরে বসিয়া কাশ্মীরের স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

চিত্রালী—শ্রীজ্যোৎস্না মিত্র। সান্যাল বুক ষ্টোর। মূল্য আট আনা।

সূচীশিল্প বাংলার একটি নিজস্ব প্রাচীন শিল্প। সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিলাতীর মোহে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেও পল্লীর গৃহলক্ষ্মীরা এই শিল্প এতকাল জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ও সম্পন্ন সমাজের দৃষ্টি পুনরায় এদিকে পতিত হইয়াছে। শিক্ষিতা নারীরা স্বদেশী ও বিদেশী নানারূপ ডিজাইন সম্বলিত সূচী শিল্পের পুস্তকাদি রচনা করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছেন। "চিত্রালী" এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র "চিত্রালী" দ্বারা সত্যই সূচীশিল্প সাধনায় সাহায্য করিয়াছেন। সূচীশিল্পের চিত্রগুলি মনোরম।

দেশের কথা—শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি। ১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সকল জিনিষের জন্যই পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া এতকাল যেন আমরা মোহাবিষ্টের মত আলেয়ার পিছনে ছুটিয়াছি। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখীন হইয়াছে। আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে তৎপর হওয়ায় ইদানীং নানা কল-কারখানার উদ্ভব হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রধানতঃ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দেশী কারখানায় প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রকাশে একটা বিশেষ অভাব দূরীভূত হইল। গ্রন্থখানির ৩৬ পৃষ্ঠায় একটি ভুল নজরে পড়িল। কলিকাতা হর্ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ঠিকানা—১৮ বি, আনন্দ পালিত রোড। দেশী ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী প্রভৃতিরও তালিকা দিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার অবকাশ আছে। গ্রন্থখানির আয় স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে ব্যয়িত হইবে। প্রত্যেক নর-নারীর কাছে 'গাইড' বহি হিসাবে ইহার এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কাব্য-পরিমিতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত, এবং ১-সি, লেক রোড, কালীঘাট, রসচক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

শুধু ইংরেজীতে নয়, ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি নানা প্রতীচ্য ভাষায় যে বিচিত্র সমালোচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যেমনি বিপুল তেমনি উপভোগ্য। পাশ্চাত্য পাঠকেরা কাব্যের সহিত কাব্যালোচনাও যে সমানভাবে উপভোগ করে, ইহা তাহারই প্রমাণ। বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে সাহিত্যালোচনার চেষ্টা যে মাঝে

মাঝে দেখিতে পাওয়া যাইত না—এমন নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সহজপ্রাপ্য ইংরেজী পুস্তকের প্রতিধ্বনি মাত্র। সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর বাংলা মাসিক পত্রে কখনও কখনও যে দু-একটি সাহিত্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার সুর শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি সস্তা বিলাতী সমালোচনার নিকৃষ্ট নকল নয়। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে বাংলায় কাব্য সম্পর্কিত দুইখানি উৎকৃষ্ট এবং পরম-উপভোগ্য আলোচনা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সমালোচনার দৃষ্টি যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের দিকে ফিরিয়াছে, এই দুইখানি গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমখানি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা', দ্বিতীয়খানি আমাদের আলোচ্য 'কাব্য-পরিমিতি'। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবি। কাব্যের সম্বন্ধে কবির আলোচনা সকল সময়েই কৌতূহলোদ্দীপক। 'কাব্য-পরিমিতি'তে দেখা যায় গ্রন্থকার রসজ্ঞ সমালোচকও বটেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যে অলৌকিক শক্তি সাধারণ মানবচিত্তধারা হইতে কবিচিত্তকে পৃথক করিয়া ভাব হইতে তাহাকে রসে উঠিবার জন্য নিরন্তর উত্তেজিত করে, তাহাই কবি-প্রতিভা।' শুধু লেখায় নয়, রেখায় আঁকিয়া তিনি এই কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে গেলে যে সকল পরম অনুভূতি কবির মনে প্রকাশবেদনায় ব্যাকুল হইয়া কাব্যচ্ছন্দে অভিব্যক্ত হয়, সহৃদয়জনের সহকর্ম্মিতা না থাকিলে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। গ্রন্থের শেষার্দ্ধে গ্রন্থকার বাংলা কাব্য ও কবিতার দৃষ্টান্ত সাহায্যে সূত্রের প্রয়োগ ও তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে সুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংস্কৃতে কাব্যের রসকে ব্রহ্মস্বাদের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা রসতত্ত্বে মানবমনের মূলদেশে পৌঁছিয়াছিল। তাই অলঙ্কার শাস্ত্রে রসবিচারের মত গভীর তত্ত্বালোচনা সকল দেশের সকল সাহিত্যেই সুদুর্লভ। গ্রন্থকারের প্রকাশ ক্ষমতায় এই দুর্গম রসতত্ত্ব পাঠকের কাছে বহুল পরিমাণে সরল হইয়া উঠিয়াছে। 'কাব্য-পরিমিতি'র নামকরণ সার্থক হইয়াছে মনে করি। বইখানি রসজ্ঞ পাঠকের আদরের বস্তু হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নবমেঘদূত—শ্রীসুবোধ বসু। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুখবন্ধে বলা হইয়াছে—"বইটি একটি বর্ষার উপন্যাস"। এর নিবিড় ভাব-ব্যাকুলতার জন্য আমরা বইখানিকে একটি গদ্য-কাব্য বলিব। বর্ষার মধ্যে একটি চিরবিরহের সুর আছে। গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যেও কেমন একটি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া সে দুইটি হৃদয়ের মধ্যে ক্রন্দনের ব্যথা বহন করিয়া ফিরে। এই জন্য "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ"। যেখানে "মানুষের গড়া বিধানে" চিরকালের জন্য এক-অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গেল সেখানে বর্ষা যে কি ব্যথা আনে কে বুঝিবে?

এই বেদনাই বইখানিতে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার "মেঘৈর্মেদুর" মুহূর্ত্তগুলিতে দুইটি তরুণ-তরুণীর চিত্তের সুরের অঞ্জলি লইয়া পরস্পরের পানে নিত্যঅভিসার—যা ক্ষণিক ভ্রমের জন্য আর কখনই মিলনের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিতে পারিল না, পরন্তু দূরত্বকে চিরজন্মের মত অনতিক্রমণীয় করিয়াই রাখিল—এ তাহারই একটি অশ্রুসজল কাহিনী।

বইখানি নিজের উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে। এর পাতায় পাতায় বর্ষার পটভূমিকায় দুইটি মিলন-পিয়াসী-চিত্তের ব্যাকুলতা বেশ নিবিড়-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত চরিত্রগুলি,—এমন কি শিশু "কৃষ্ণ" পর্য্যন্ত এই সুরটিকে ফুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে "বীণা"কে বড়ই ভাল লাগিল। সে তাহার চঞ্চলতা, মুখরতা আর সহজ বেপরোয়াগিরি লইয়া বিজলীর মতই বইয়ের মেঘলা ভাবটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। পড়িবার সময় তাহাকে আর একটু বেশী করিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়।

এই রকম বই একঘেয়ে হইয়া পড়িবার ভয় থাকে; কিন্তু লেখক এ-বিষয়ে বেশ সতর্কতা দেখাইয়াছেন। কয়েক পাতা অন্তরই—কখনও কখনও আরও নিকটে নিকটে বর্ষার বর্ণনা করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বর্ণনাটিই ভাষায়, ভাবে রক্ষা করিয়া লেখাটিকে বরাবর সতেজ রাখিয়া গিয়াছে।

আমরা বর্ষার দেশে, বর্ষা-কবিদের দেশে বইখানি সাদরে অভিনন্দিত করিয়া লইলাম।

দুঃখের মধ্যে প্রকাশক বইখানির উপর তেমন সুবিচার করেন নাই। বিশেষ করিয়া মুদ্রাকরপ্রমাদ বড় বেশী থাকিয়া গিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শোক-সংবাদ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী স্যর এস্. এন্. গুপ্টা মৃত্যু-শয্যায়; সারা দেশে একটা উৎকণ্ঠা পড়িয়া গিয়াছে। এই বয়সে ডবল নিউমোনিয়া—আশা ত একেবারেই নাই। ডাক্তারদের এখন আর বিশেষ কাজ নাই; আর কতক্ষণ, শুধু এই লইয়াই তাঁহাদের মধ্যে বচসা চলিতেছে। স্যর শচীনের ক্রোরপতি মক্কেল দৌলতরাম গিরিধারী, মারোয়াড়ি মহলের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার রায় সাহেব গৌরহরি বসাককে অষ্ট প্রহরের জন্য মোতায়েন করিয়া দিয়াছেন। রায় সাহেব বলিয়াছেন—ভোর পাঁচটার পরে যদি রোগী বাঁচিয়া থাকে ত বুঝিবেন তাঁহার চল্লিশ বৎসরের চিকিৎসাই বৃথা গিয়াছে······

'সত্যপ্রকাশ'-এর সম্পাদক হলধরবাবু নিজের আপিসের চেয়ারটিতে বসিয়া এক-একবার উদ্বিগ্নভাবে ঘড়ির পানে চাহিতেছেন এবং এক-একবার টেলিফোনের মাউথপিসে মুখ লাগাইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—"কি খবর সিদুবাবু? আর কতক্ষণ মশাই?"

ব্যাপারটা এই। মৃত্যুর খবরটা সর্ব্বপ্রথমে বাজারে বাহির করিয়া 'সত্যপ্রকাশ' কিছু করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া সমস্ত রাত ধরিয়া স্যর শচীন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনী এবং ততোধিক দীর্ঘ মৃত্যুবিবরণী কম্পোজ করা হইয়াছে—মায় ব্লক সমেত। কাগজের অন্যান্য পত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে, এখন মৃত্যুসংবাদটি পাইলেই এ-সেটটাও প্রেসে চড়াইয়া দেওয়া হয়। হকারদের খুব সকাল সকাল আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিবা মাত্রই ইংরেজী বাংলা আর সব কাগজের পূর্ব্বেই যেন 'সত্যপ্রকাশ'-এর মারফৎ কলিকাতা এই জমকাল মৃত্যু-সংবাদটি পায়।

হলধরবাবু সবাইকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মরার সুবিধাটা আমরা শুধু গড়িমসি করিয়া হেলায় নষ্ট করেছি,—এবারে সে লোকসানটুকু পর্য্যন্ত তুলে নিতে হবে।···অমন জাঁদরেল লোক ত আর দেশে এবেলা-ওবেলা ম'রচে না—একটা সুযোগ গেল ত আবার হাঁ ক'রে ব'সে থাক···"

তাই নিজেও সমস্ত রাত জাগিয়া উদ্যোগী রহিয়াছেন।

গুপ্টা সাহেবের বাড়ির পাশেই একটি ডিস্‌পেন্‌সারির টেলিফোনযন্ত্রটি 'সত্যপ্রকাশ' আজ সমস্ত রাতের জন্য ভাড়া করিয়া লইয়াছে। যন্ত্রটির সামনে ষ্টাফের একজন-না-একজন কোন লোক বসিয়াই আছে। ঘটনাটি ঘটা কি খবরটি আপিসে পৌঁছাইয়া দেওয়া—সঙ্গে সঙ্গে ছাপা সুরু এবং হলধরবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে—"কাককোকিল টের পাওয়ার আগেই 'সত্যপ্রকাশ'-এর হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে বাজার ছেয়ে ফেলা···দেখি কে এগোয় আমাদের সামনে এবারে···"

মোটা কাল বর্ডার দেওয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ টাইপের বিজ্ঞাপনপত্রী ছাপা হইয়া গিয়াছে—

"বিনামেঘে বজ্রাঘাত—দেশব্যাপী হাহাকার—দেশবিখ্যাত মহাকর্ম্মী স্যর এস্. এন্. গুপ্টা, বার-এট্‌ল-র বৈকুণ্ঠযাত্রা—তাঁহার দুর্ভেদ্যরহস্য-জনক উইল—সত্যপ্রকাশের তিনপৃষ্ঠাব্যাপী শোকাঞ্জলি—লউন—পড়ুন—জাতীয় শোকে অশ্রুর তর্পণ করুন !!"

রাত্রি একটা থেকে সহকারী সম্পাদক সিদ্ধেশ্বরবাবুই ওদিকার টেলিফোনে বসিয়া আছেন; এখন সাড়ে তিনটা কি চারটা হইবে। সমস্ত দিন আর রাত প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত গুপ্টা সাহেবের জীবনী ও "মরণী" লেখা, প্রুফ্ দেখা এই সবে কাটিয়াছে; দুই ঘণ্টার মধ্যে আহারাদি ও নিদ্রা সারিয়া বসিয়াছেন। চায়ের চাড়া দিয়া ঘুম আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু সেকি মানে? আমেজে ঢুলিতে ঢুলিতে প্রায় যন্ত্রটির উপর মাথাটি লাগ-লাগ হইয়াছে এমন সময় 'কির্-কির্-ক্রিং-ক্রিং' করিয়া আওয়াজ হইল।

সিদ্ধুবাবু চকিত হইয়া উঠিলেন, আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে বলিলেন—"আঃ, লোকটা এ-রকম ধুকপুকুনির মধ্যে ফেলে আর কত জ্বালাবে ?"

টেলিফোন ধরিলেন—"হ্যাল্লো !"

"আর কত দেরি মশাই ? পনেরটি হাজার কপি ছাপতে হবে, তার খোঁজ রাখেন ? এদিকে রাত যে ফুরিয়ে এল !"

সিদ্ধেশ্বরবাবু উত্তর করিলেন—"কি করি বলুন ? এখনও রয়েচে টেকে। ঠেঙিয়ে ত মারতে পারি না। মাঝে একটু বাইরে গিয়েছিলাম—হঠাৎ কান্না উঠল। এসে তাড়াতাড়ি টেলিফোনটি ধরতে যাব—হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ ! এরা যেন দিব্যি এক খেলা পেয়ে গেছে…"

"তাই বটে, আর আমাদের এদিকে প্রাণ যায়। তা হ'লে একটা টাল গেচে বলুন ? আমি ত বলি—দিই না চড়িয়ে, আর টেঁকবে না ; আমাদের ছাপা হ'তে হ'তে সাবড়ে যাবে।"

"আর একটু দেখুন—একেবারে দৈব ব্যাপার কি না—না আঁচালে বিশ্বাস নেই।"

"—দুর্দৈব ! এ রকম তীর্থের কাকের মত আশায় আশায় ব'সে থাকা চাড্ডিখানি কথা মশাই ?"

"নয়ই ত। কিন্তু কে শুনচে বলুন ?"

"এ যেন সেই মাখন ভট্চাযের গঙ্গাযাত্রার মতন হ'ল। সাতটি দিন মাঘের শীতে গঙ্গার ধারে বসিয়ে রেখেছিল মশাই ! না পারি ফিরতে, না পারি…"

"থামুন, থামুন—ঐঃ, আবার কান্না উঠল !"

"সত্যি না কি ? জয় সিদ্ধিদাতা—তাহ'লে দি চড়িয়ে ?"

সিদ্ধুবাবু ত্বরিত ভাবে বলিলেন—"একটু সবুর করুন, দেখে আসি আসল কি মেকী" বলিয়া রিসিভারটা রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘস্বরে, নিরুৎসাহভাবে ডাকিলেন—"হ্যা—ল্লো !"

'কি সংবাদ ?"

"নাঃ, ভুয়ো। মুসৌরী থেকে এক মেয়ে এইমাত্র এসে পৌঁছল। 'বাবা গো ! কোথায় গেলে গো !' করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ওপরে উঠে গেল।…সব সয়, নেকামি সইতে পারিনে মশাই…ঐ ত বাবা জলজ্যান্ত রয়েছে রে বাপু !"

"আর এ-রকম ছিঁচকাঁদুনে ক'টি মেয়ে বাইরে রয়েছে খোঁজ নিলেন ? যত্তো সব…"

খুট্খুট্ করিয়া দুই তিনটা বিরতির আওয়াজ হইল। সিদ্ধুবাবুও রিসিভারটা টাঙাইয়া রাখিলেন। ডাকিলেন—"দাদা !—ও দাদা !"

'দাদা' বলিতে ডিস্পেন্সারির কম্পাউণ্ডার বাবু। এই ঘরটিতেই এক কোণে ক্যাম্প খাটে নিদ্রিত আছেন। ভালমানুষ গোবেচারী গোছের লোক। একটু বয়স হইয়াছে। কাজে অত্যন্ত নারাজ—গল্পে খুব দড়। কখনও হুঁকা আর চায়ে এলেন না। এই-সব মজলিসী গুণের সমাবেশে সরকারী দাদা হইয়া বসিয়াছেন।

আরও ছ-সাত বার ডাকাডাকির পর জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"এই যে জেগেই রয়েচি। যমের দোরে ধন্না দেওয়া এখনও শেষ হ'ল না ?—কি খবর ওদিকে ?"

"খবর সেই একঘেয়ে—মাঝে মাঝে শুধু দ্যাম্‌লা হচ্ছে।…আমি ত আর ঠায় ব'সে থাকতে পারিনে দাদা, চোখ জুড়ে আসচে।"

"এক এক কাপ হয়ে যাক্ না, ক্ষতি কি ?"

"সেই জন্যেই ত আপনাকে কষ্ট দেওয়া—আর স্পিরিট আছে ?"

"না। কেন, বোতলে ত অনেকখানিকটা ছিল—কি হ'ল ?"

"এর মধ্যে যে চারবার ষ্টোভ জ্বালা হয়ে গেছে ; আর বোতলগুলোর একটা দোষ লক্ষ্য করেচেন ? যতক্ষণ বেশ সাবধানে 'বাপু বাছা' ব'লে আস্তে আস্তে ঢালবার চেষ্টা করবেন—কিছুতেই পড়বে না।…তখন ভয়ানক রাগ ধরে—ধরে কি না বলুন না ?…স্পিরিট ত ছিল অনেকখানিই—এখন ত বোতলটা খালি !"

"তাহ'লে ?…দোকানের ষ্টক্ খালি, ব'লেই দিয়েছিলাম ; কাল না আনলে…"

"তবেই ত !—এক কাজ ক'রব না হয় ?"

"কি শুনি ?"

"মনে করছি একটু না হয় বাসায় চলে যাই। চা-

খাওয়া-কে চা-খাওয়া হবে—একটু বেড়ানও হবে; রাত্তিরটুকুর জন্যে তাহ'লে একরকম নিশ্চিন্দি।"

ইহার মানে এই যে তাঁহাকে গিয়া টেলিফোন্ ধরিতে হইবে। দাদা কোন উত্তর দিলেন না।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"আর এই ফ্ল্যাস্ক্‌টাও নিয়ে যাচ্ছি, আপনার জন্যেও কাপ্ দু-এক নিয়ে আসা যাবে'খন।"

"হ্যাঃ, ঘাড়ে ক'রে আবার চা ব'য়ে আনা। আর দু-কাপ কি হবে? সে ব'লতে গেলে ত ওতে চার কাপ এঁটে যায়—তাই ব'লে চার কাপ ভ'রে নিয়ে আসতে হবে?…মোদ্দা শীগগির আসা চাই—ঘুমকাতুরে লোক, জানই ত।"

"এই আধঘণ্টা লাগবে, তার বেশী নয়। অতবড় একটা ভাবনা লেগে রয়েচে, বুঝছেন না?"

"ভাবনা একটুখানি?—বলে—'যার বিয়ে তা'র মন নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।' আর কেন? সরে পড়্‌না বাপু। তিন দিন থেকে একটানা শ্বাস টেনে যাচ্ছিস্। কি আরাম পাচ্চিস্ এতে?—একটা সখ না কি?"

"সে কথা কে বলে বলুন?"

"তা আধ ঘণ্টা কোন রকমে চোখকান বুজে রয়েচি—মোদ্দা ঐ কথা, দেরি যেন না হয়"—বলিয়া দাদা বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন।

"চোখকান একটু সজাগ হয়েই বুজবেন তাহ'লে দাদা—আমি বলছিলাম একটা বই-টই কি কাগজ-টাগজ নিয়ে বসুন না, না হয়।"

"আরে না, না,—অত হালকা নয়। একটি ছিলিমের ওয়াস্তা,—সেই জোগাড়ই হচ্চে, দেখ না।… নাও বেরিয়ে পড়।"

২

দাদা তামাক সাজিলেন। কলিকার আগুনে টোকা দিতে দিতে নিজের মনে বিড়্‌বিড় করিতে লাগিলেন—"দিলে না বাঁচতে—নিশ্বেসে নিশ্বেসে মেরে ফেল্‌লে—

হুঁকার মুখটি মুছিয়া সাদরে মুখে লাগাইবেন, এমন সময় শব্দ হইল—"কির্‌-কির্‌-ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং…"

"তা জানি; বামনের কপাল কি না"—বলিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া রিসিভারটি তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হ্যাল্লো!"

"কি খবর, আছেন না গেছেন?"

"না, গেছেন। বোধ হয় আধঘণ্টাটাক…"

অত্যন্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে উত্তর হইল—"আধঘণ্টা! অথচ আমায় বলেন নি? আধঘণ্টায় কতটা কাজ…"

"না, আধ ঘণ্টা হয়নি এখনও; গেছেন ত এইমাত্র। বলছিলাম আধ…"

শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তর হইল—"তাই বলুন। সময়ের আন্দাজটা আপনার যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্চে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি? গলাটা ভারী ভারী ঠেক্‌চে।"

দাদা যে কখনও ঘুমান এটা বাহিরে স্বীকার করিতে চান না। বলিলেন—"নাঃ, এই ত আমরা দু'জনে দিব্যি গল্প করছিলাম—একটা সঙ্গী পেলে কি ঘুম আসে?"

সহাস্যে উত্তর হইল—"তা বটে; আপনার সাথীটি খুব গল্পপ্রিয়, না?"

দাদা এদিকে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমারও ওপরে যান।"

উত্তরস্বরূপ তারযোগে আবার একটু হাসি ভাসিয়া আসিল। প্রশ্ন হইল—"যাক, তাহ'লে কখন ও সুমতিটা হ'ল?"

দাদা আবার হাসিয়া বলিলেন—"সুমতি হওয়াই বটে, যা অবস্থা হয়ে এসেছিল মশাই! মানুষের শরীর ত, কতটা সয় বলুন?"

"তা বই কি। যাক্, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার ফুরসৎ নেই; কখন আসচেন তাহ'লে?"

"ঐ যে গোড়াতেই ব'ললাম—আর জোর আধঘণ্টাটাক লাগবে।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল, আর যা-যা সব জ্ঞাতব্য বিষয় আছে একটু জেনে নিয়ে আসাই ভাল, আবার যেন যেতে

দাদা ভাবিলেন—আবার জ্ঞাতব্য বিষয় কিরে বাবা! আছে বোধ হয় কিছু, মরুক্ গে। বলিলেন—"নাঃ, মেলা যাওয়া-আসা করবার দরকার কি?"

"তাহ'লে নির্ভাবনায় দিলাম চড়িয়ে—কতক্ষণ সাজা পড়ে রয়েচে···"

দাদা গনগনে কলিকাটির পানে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া রিসিভারটি টাঙাইয়া দিতে দিতে নিজের মনেই বলিলেন, "ওদিকে তাহ'লে দেখচি তাওয়া-দার কলকে—গড়গড়ার ব্যবস্থা···যাক, আমার গরিবের এই-ই মেওয়া"—বলিয়া হুঁকাটি তুলিয়া লইলেন।

ওদিকে প্রেসের কাজ সতেজে আরম্ভ হইয়া গেল। আর সব তৈয়ারই ছিল, শুধু মৃত্যুর সময়ের জন্য সেটুকু স্পেস্ খালি রাখা হইয়াছিল। সেটুকুতেই টাইপ বসাইয়া দেওয়া হইল। কালো বর্ডার এবং ললাটে বড় বড় টাইপের আর্ত্তনাদ লইয়া কাগজগুলা প্রেস হইতে একে একে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। সারাংশেরও সারাংশ এইরূপ—

বাংলায় হাহাকার!—পরলোকে স্তর এস্. এন্. গুপ্টা!! বাংলার ভাগ্যাকাশ হইতে আর একটি নক্ষত্র খসিল। বঙ্গজননীর অঙ্ক শূন্য হইল; মার নয়নাশ্রুর বন্যায় আবার প্রলয়ের প্লাবন নামিল।... সন্তানহারা অভাগিনী মা আমার, আজ কি বলিয়া তোকে সান্ত্বনা দিব? কোথায় পাব সান্ত্বনার স্নিগ্ধবাণী?...সান্ত্বনা ত দিতে চাই; কিন্তু আজ শোকজীর্ণ লেখনী দিয়া যে প্রবল ধারে অশ্রুর ধারাই নামিয়া আসিতেছে...এ নিদারুণ শোকে জড়ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার প্রাণ জড়বৎ নিশ্চয়...

বাংলার সুসন্তান, লক্ষ্মীর দুলাল, বাণীর বরপুত্র, কুবেরের কীর্ত্তিস্তম্ভ, কর্ম্মে অক্লান্ত, বাগ্মিতায় বার্ক, করুণায় দাতাকর্ণ, সত্যে যুধিষ্ঠির, দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী স্তর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টা আর ইহজগতে নাই। গতকল্য বুধবার রাত্রি চারি ঘটিকার সময় সমস্ত দেশকে হাহাকারে নিমগ্ন করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের বক্ষে নিদারুণ শেল হানিয়া স্তর শচীন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।...হায়, কি কঠিন কর্ত্তব্য আমাদের! দুই মাসও অতীত হয় নাই, বাংলার ঘরে ঘরে আমাদের স্বনামধন্য মহাপুরুষ রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে হইয়াছিল। দেশবাসীর কপোলে সে-অশ্রুধারা শুকাইবার পূর্ব্বেই আবার এই মর্ম্মভেদী দুঃসংবাদ...স্তর শচীন কয়েকদিন হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন; হঠাৎ বিগত সোমবার রাত্রি প্রথম প্রহর হইতেই নিউমোনিয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।...শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ সমবেত হ'ন..., মহাসমারোহে চিকিৎসা-যজ্ঞ আরব্ধ হয়... হায়, কে জানিত সে-মহাযজ্ঞে যে-হোমানল প্রজ্জলিত হইল তাহা এই মহাপ্রাণের আহুতি না লইয়া নির্ব্বাপিত হইবে না...চিকিৎসা-সাগর মথিত হইল; কিন্তু হে বৈরাগী, তোমার অঞ্জলি সুধার পরিবর্ত্তে গরলই পূর্ণ হইবে তাহা কে জানিত?

নিউমোনিয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমরা অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া স্তর শচীন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হই...বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে এক 'সত্যপ্রকাশ'-এরই সত্যনিষ্ঠায় অগাধ বিশ্বাস থাকায় আমরা বরাবরই এই পুরুষ-সিংহের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া আসিতেছি... তাঁহার প্রাসাদতুল্য আলয়ে অবাধ গতিবিধি থাকায় আমরা এ-কয় দিবস পাঠকবর্গকে প্রতিদিনের অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলাম...বড় আশা ছিল অচিরেই আরোগ্যের শুভসংবাদ দিয়া দেশবাসীর অশান্ত চিত্তে শান্তির সুশীতল সুধাসিঞ্চনে সমর্থ হইব; কিন্তু হায় 'কালস্য কুটিলা গতি'—আমাদের সে আশা সমূলেই নির্ম্মূল হইল..."

ইহার পরে সংক্ষিপ্ত জীবনী। জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত খবর জানিবার কোন রকম সুবিধা হয় নাই বলিয়া এই অংশে, সব কৃতী পুরুষের বেলাই মোটামুটি খাটে এমন কতকগুলি ভাসা-ভাসা কথার অবতারণা করা হইয়াছে। গুপ্টা সাহেবের অতি শৈশবের কয়েকটি রোমাঞ্চকর উদাহরণ দিয়া বাল্যে গুরুভক্তি, কৈশোরে জ্ঞানতৃষ্ণা, যৌবনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ, প্রৌঢ়ত্বে ত্যাগমহিমা এবং অবশেষে বার্দ্ধক্যে এই সমস্ত গুণরাজি একটা সহজ পরিণতি লাভ করিয়া কেমন ঈশ্বরানুমুখী ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল তাহা অতি নিপুণতার সহিত বিশদ ভাবে দেখান হইয়াছে। তথ্যের দৈন্য ভাষার সমৃদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সর্ব্বশেষে আছে—

"আজ ভারত একজন অক্লান্ত কর্ম্মী এবং অকপট সেবক হারাইল—বঙ্গভূমি তাহার শ্রেষ্ঠ নিধি হারাইল—আর 'সত্যপ্রকাশ'? সত্যপ্রকাশ যাহা হারাইল তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না...আজ সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান, কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে?...আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি...ঈশ্বর তাঁহাদের এই গুরু শোকভার বহন করিবার শক্তি দান করুন...

স্তর শচীন্দ্রের বিশাল সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল এখনও রহস্যাবৃতই রহিয়াছে।"

বেলা ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই ছাপার কাজ শেষ হইয়া গেল। আপিসের বাহিরে দলে দলে হকাররা আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে; অন্য লোকদেরও ভিড় ভয়ানক—হাতে হাতে অনেক কাগজ বিক্রী হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার এ-পল্লীটাতে মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। দু-এক জন, যাহাদের প্রকৃত সংবাদ জানা আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সন্দেহ প্রকাশ করিতে গিয়া এমন টিট্‌কারির ঝাপটা খাইল যে, তাহাদের আর মুখব্যাদান করিতে হইল না।

হকারেরা অন্যদিনের ডবল, তিনগুণ কাগজ লইয়া নিজ নিজ এলাকার পানে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বেলা সাতটা পর্য্যন্ত কলিকাতা শহরে খবরটা বেশ ভাল করিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

ততক্ষণে অন্য দু-একখানা ইংরেজী বাংলা মর্ণিং পেপারও আসরে নামিয়াছে।

৩

বেলা ছয়টা হইলে সিদ্ধেশ্বরবাবু হাতে থার্ম্মোফ্ল্যাস্কটা ঝুলাইয়া ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "আপনার চা।···তারপর খবর কি?"

"হ'ল তোমার আধ ঘণ্টা?···খবর ভাল নয়; বুঝি এ যাত্রাটা টিকেই গেল।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"না, না;—বেঁচে যান সেই ভাল, অতবড় লোকটা।···বেড়ান-টুকুতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল দাদা; সারারাত ঘুম হয়নি, তার ওপর শেষ রাত্তিরের মিঠে হাওয়া, বাড়ি পৌছতে পৌছতে চোখের পাতা পাহাড়ের মত ভারী হ'য়ে এল। বিছানায় এলিয়ে পড়ে বললাম—'নাও, শীগ্গীর পাঁচ কাপ চা,—এক্ষুনি বেরুতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। আপনার ভাদ্দর বউও আর প্রাণ ধরে তুলে দিতে পারে নি—হাজার হোক্, মেয়েমানুষের জাত ত?···দেড়টি ঘণ্টা কোথায় দিয়ে যে কেটে গেল।···তারপরে হঠাৎ সেই সর্ব্বনেশে—ক্রিং-ক্রিং ক্রিং···"

"সেখানেও টেলিফোন আছে নাকি?"

"টেলিফোন নয়। আপনার ভাদ্দর বউ চা তোয়ের করচে—বাসনের ঠোকাঠুকি, চুড়ির আওয়াজ;—তাতে ত ঘুমই আসে মশাই। কিন্তু ন্যাবা হ'লে সবই হলদে দেখে কি না?—আমার কানে বাজল—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। মনে যে একটা ভয়ঙ্কর ধুক্পুকুনি রয়েচে এদিকে—বুঝলেন না কথাটা?···

তখন একটু রাগও হ'ল;—কাজের সামনে পতিভক্তি-টক্তি বুঝি না বাবা,—একটা বুড়ো লোককে জাগিয়ে সেখানে বসিয়ে এসেচি।···একটু বকাবকি হ'য়ে গেল; মেয়েমানুষ, সহজে হটতে চায় না, জানেনই ত।··· তারপরে, এদিকে আপিসের খবর কি? ডাকটাক পড়েছিল?"

"গোড়ায় প্রায় তুমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছিল। লোকটি বেশ রসিক হে। অনেকক্ষণ কথা চলল, তারপর তামাক পুড়ে যাচ্ছে ব'লে বন্ধ করলেন। ভাল কথা, বাড়িতে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে গিয়েছিলে না কি? জিগ্যেস করতে আমি বললাম কি না—তুমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে; তাইতে বললেন—জ্ঞাতব্য বিষয় সব জেনে-শুনে আসাই ভাল।···যাক্, সে আমার শোনবার দরকার নেই; তবে কথাটা ভাল বুঝলাম না।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু একবার ওপর দিকে চাহিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কই, জ্ঞাতব্য আর কি?···এক ত এই 'জ্ঞাতব্যের' ফেরে পড়েছি,—দাঁড়ান, দেখি কি ব্যাপারটা।"

"হুঁ, বুঝুন একবার, আমি ততক্ষণ হয়ে আসি।"

দাদা বাহির হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু মাউথ্-পিস্টা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"০০০৯ বড়বাজার!"

এক্সচেঞ্জ হইতে জবাব আসিল—"এন্গেজ্ড।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু টেবিলের উপর একটু তবলা বাজাইলেন, ফ্ল্যাস্কের দিকে চাহিয়া দাদা চার কাপই একা সাবাড় করিয়া দিবে, কি একটু আক্কেল করিবে চিন্তা করিলেন; তাহার পর আবার যন্ত্রটা উঠাইয়া লইলেন।

কনেক্শন পাওয়া গেল; মন্থর ভাবে ডাকিলেন—"হাল্লো!—আমি সিদ্ধেশ্বর। কি খবর?—কি করবেন স্থির করলেন? এদিকে এখনও···"

"খবর ত খুব ভাল; পনের হাজার কাপির মধ্যে আর হদ্দ হাজার দু-এক প'ড়ে আছে—রেকর্ড ডিমাণ্ড। আপনার ফুরসৎ হ'ল? এ ঝোঁকে কত ছাপতে হবে একটা পরামর্শ করতে হবে যে। আর নতুন মালমসলা কি পেলেন? আধঘণ্টার জায়গায় ত দু-ঘণ্টা হয়ে গেল; খাঁটি খবরের জোগাড়ে আছেন ব'লে আর রিং-আপ-ও করিনি।"

কথাগুলো সিদ্ধেশ্বরবাবুর কানে যেন থাপছাড়া

খাপছাড়া বোধ হইল ; চিন্তিতভাবে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"কি বলচেন ঠিক বুঝতে পারচি না, আর একটু স্পষ্ট ক'রে···"

"আর টেলিফোনে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে না, আপনি চ'লে আসুন। টেলিফোনে ব'কে ব'কে সারা হয়ে গেছি। এই এক্ষুনি তিনটি লোকের সঙ্গে ত প্রায় ঝগড়াই হয়ে গেল। বলে—'আপনারা ঠিক জানেন? বেশ ভাল ক'রে খবর নিয়েচেন? খবরটা কন্‌ফারম করিয়ে নিয়েচেন যে তিনি মারা গেছেন?' বললাম—'হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ মশাই,—আমাদের নিজের লোক স্বয়ং সাব-এডিটার প্রায় শিয়রে ব'সে···না ম'লে তিনি উঠতেই পারেন না···"

শেষ করবার পূর্ব্বেই হলধরবাবুর কানে চীৎকারের স্বরে বিস্মিত আওয়াজ হইল—"সে কি !!"

হলধরবাবু একটু থমকিয়া গেলেন ; তাহার পর ভীত কণ্ঠে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেকি মানে?"

"সেকি' মানে—তিনি মারা গেছেন আপনাকে কে ব'ললে ?"

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ, পরে উত্তর আসিল—"আপনার কি রাতজেগে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, সিধুবাবু? তখন সময় নিয়েও একটা গোলমেলে কথা বললেন—একবার বললেন 'আধঘণ্টাটেক হবে'—শুধ্‌রে বললেন 'এক্ষুনি'। এখন আবার ব'লচেন—"আপনি খবর দেন নি !"

"সময় নিয়ে ত কোন কথাই হয় নি আপনার সঙ্গে!"

দাদা আসিয়া প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"আমার সঙ্গে একটু হয়েছিল বইকি ; তোমায় বললাম না?" জিজ্ঞাসা করলেন—"কখন স্নমতিটা হ'ল—তোমার বাড়ি যাওয়ার স্নমতিটা আর কি।···আমি বললাম···"

সিদ্ধেশ্বরবাবু মাউথ্‌পিস্‌টা মুখ থেকে একটু সরাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কি কি কথা হয়েছিল, এক এক করে বলুন ত—বোধ হয় সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।"

দাদা তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা যেমন যেমন হইয়াছিল বিবৃতি করিয়া যাইতে লাগিলেন···

ওদিকে টেবিলে রাখা মাউথপিসের ভিতর হইতে ঝলকে ঝলকে আগুনের হলকার মত বাহির হইতে লাগিল—"কথা কন না কেন?···জেরবার, শীগ্‌গীর চলে আসুন···সর্ব্বনাশ···ড্যামেজ···সব জেলে···"

সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রায় পাগলের মতই হইয়া গিয়াছিলেন ; সব কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন—"এর একটা কথাও যে আমার সম্বন্ধে নয় দাদা! উনি যে বরাবর রোগীর সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হচ্চে এইরকম বুঝে গেছেন।···আগেই কেন ব'লে দিলেন না যে আমি কথা কইছি না—গেল—সব গেল!"

—হন্তদন্ত হইয়া বাহিরের পানে চলিলেন। দাদা পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলেন—"তবে যে বল্‌লেন—'সাজা র'য়েচে, নিশ্চিন্দি হয়ে চড়িয়ে দেওয়া যাক?"

"সাজা যা রয়েচে তা ক'লকে নয়—ম্যাটার, অর্থাৎ সেট করা টাইপ প্রেসে চড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন। রসিকতা ক'রতে গিয়েই যে সর্ব্বনাশটি ক'রে বসেচেন সব।"

ফুটপাথে গিয়া ডাকিলেন—"এই ট্যাক্সি—জল্‌দি।"

হঠাৎ একটা কথা মনে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে একটু আশা···

গুপ্টা-সাহেবের বাড়ির দিকে প্রায় ছুটিলেন একরকম। সামনেই একজন ডাক্তারকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কত দেরি বুঝছেন?"

কথাটা নিজের কানেই বেয়াড়া শুনাইল।···ডাক্তার একবার মুখের দিকে চাহিয়া আশান্বিত ভাবেই বলিলেন—"না, একটা বেশ ফেবারেবল্‌ টারন্‌ নিয়েছে—এ যাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলেন।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু মুখের ভাবটা আর দেখিতে না দিয়া সরাসরি মোটরে গিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় বগলে একতাড়া কাগজ লইয়া একটা বাচ্চা হিন্দুস্থানী কাগজ-ফেরিওয়ালা চলতি ট্রাম হইতে টুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ট্যাক্সির দরজার কাছে আসিয়া হাঁকিল—"সত্য-প্রকাশ" লিন্‌ বাবু—সর্ব্বনেশে খবোর—সার শচীন্দর···"

সিদ্ধেশ্বরবাবু ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়া বলিলেন—"হাঁকাও—ফুলস্পিডে···"

৪

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। হলধরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, দু-একজন কেরাণী আপিসে বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। ক্বচিৎ দু-একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে। সিদ্ধেশ্বরবাবুর হাতে একটি কলম আছে; মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন।

দিনটা যেন একটা দুরন্ত ঝড়ের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। সারা শহরে সত্যপ্রকাশের একার খবর আর ওদিকে ইংরাজি বাংলা সমস্ত কাগজের খবর, দুইটি বিরুদ্ধ খবরের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছিল। আপিসের বাহিরে কানপাতা যায় না,—ইতর-ভদ্রের মিশ্রিত জনতার অবিমিশ্র গালাগালি। কান লইয়া ভিতরে বসিয়া থাকাও নিরাপদ নয়,—টেলিফোন্‌টা অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিং ক্রিং করিয়া সমস্ত দিন যেন 'যুদ্ধং দেহি' 'যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া গিয়াছে; যদি-বা অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লওয়া হইল ত কেবল—উৎকট বিদ্রূপ, কদর্য্য হিন্দীভাষা, কিংবা তীব্র হুমকীর উদ্গার!

তাহা ভিন্ন চিঠি যে কত আসিয়াছে তাহার আর লেখা-জোখা নাই। তাহার মধ্যে দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একখানি স্বয়ং গুপ্টা-সাহেবের বাড়ি হইতে—উকিলের সংযত ভাষায় প্রশ্ন—দেখান হোক, কেন অন্ততঃ পনের হাজার টাকার ড্যামেজ স্যুট্ 'সত্যপ্রকাশ'-এর বিরুদ্ধে আনা হইবে না।

আর একখানির নীচে, গুপ্টা-সাহেবকে দেখিতেছে এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারদের নাম-সহি। তাহাতে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাষায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—'সত্য-প্রকাশ'-এর সোমবার ১৩ই অক্টোবর ১৯২৭এর টাউন এডিশনে রোগশয্যাগত **ইহলোকবাসী** স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টার মৃত্যুবিবরণে পত্রসংখ্যা দুইয়ের ষষ্ঠ প্যারায়—"কে জানিত মহাযজ্ঞে যে হোমানল প্রজ্জ্বলিত করা হইল তাহা এই মহাপ্রাণের আহুতি না গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না" আবার পত্রসংখ্যা তিনের দ্বিতীয় প্যারায়—"চিকিৎসা-সাগর মথিত হইল, কিন্তু হে বৈরাগী,—তোমার অঞ্জলি সুধার পরিবর্ত্তে গরলেই পূর্ণ হইবে তাহা কে জানিত?" এইরূপ যে লেখা হইয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ কি? এই দুইটি বাক্যের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী চিকিৎসা-ব্যবসায়ী-দিগের পেশা এবং আত্মসম্মানে যে গুরুতর আঘাত করা হয় নাই, প্রয়োজন হইলে উক্ত 'সত্যপ্রকাশ'-এর এডিটার এবং প্রিণ্টার বিচারালয়ে এরূপ সপ্রমাণ করিতে রাজি আছেন কি না—ইত্যাদি

এই দুইখানা চিঠি লইয়া গুপ্টা-সাহেবের বাড়িতে গিয়া ধন্না দেওয়া, ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি গিয়া হাজিরা দেওয়া, এই করিয়া সমস্ত দিনটা পালা করিয়া এডিটার, সাব-এডিটার আর প্রিণ্টারের কাটিয়াছে। কাগজ-বিক্রয়ের লাভ ট্যাক্সি ভাড়ায় একরকম নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন টানা-পোড়েনের ফল এক জায়গায় একটু পাওয়া গিয়াছে—গুপ্টা-সাহেবের বাড়িতে; গুপ্টা-সাহেবের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের মনটা অনেকটা প্রসন্ন থাকার দরুণই এইটুকু সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা রোগীর কল্যাণ কামনায় ক্ষমা করিতে রাজি আছেন যদি অদ্যকার কাগজে সুদীর্ঘ এপলজি চাওয়া হয় এবং অঙ্গীকার করা হয় যে 'সত্যপ্রকাশ' কখনও কোনও ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিবে না, অন্ততঃ ঘটনার পরে একমাস না-যাওয়া পর্য্যন্ত; ইচ্ছা হয় ইহার পরে করিতে পারে।

ডাক্তাররা এখনও রাগিয়া আছে।

হলধরবাবু মনের ভাবটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাও যদি আজকের সকাল কিংবা দুপুর নাগাদ ম'রে যেত ত অনেকটা সামলে নেওয়া যেত।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু কাগজ হইতে কলমটা তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মরবে, ওর ব'য়ে গেছে। ডাক্তার গৌরহরি বসাক বলেছে 'যদি এ-যাত্রা না বাঁচে ত ডিগ্রি ছেড়ে দেব।"

হলধরবাবু ঝাঁঝিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আরে ছেড়ে দাও ওটার কথা; এই না বলেছিল পাঁচটার পরে না মরলে, ওর চল্লিশ বছরের চিকিৎসাই বৃথা?…ওরাই ত এই কাণ্ডটা বাধালে—যত সব বোগাস্…একৃতিয়ার থাকলে আমিই ত ডিগ্রি কেড়ে নিতাম— আজই।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু আরও দুই তিন লাইন লিখিয়া লেখাটি সমাপ্ত করিলেন। কাগজটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"এই হ'ল ক্ষমা—"

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গতকল্য 'সত্যপ্রকাশে' স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টার যে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুল।"

হলধরবাবু—"বেশ ত হয়েচে। হ্যাঁ, তারপর ?"

"এ সংসারে দুর্নিরীক্ষ্য একটি জীবাণুর দ্বারাও মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয়; সুতরাং কেমন করিয়া একটি অতি তুচ্ছ কারণে এই ভ্রমাত্মক সংবাদটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা না করিলেও আশা করি পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্জ্জনার প্রয়োজন স্যর এস্. এন্. গুপ্টার সেই আত্মীয়-স্বজনের নিকট যাঁহাদের এই সংবাদটি সকলের চেয়ে রূঢ় ভাবে আঘাত করিয়াছে। সান্ত্বনার কথা শুধু এই যে তাঁহারা বরাবরই খবরটি ভুল জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন।

কল্য প্রত্যুষ হইতে রোগ আরোগ্যের দিকে চলিয়াছে এবং আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার মারফৎ জানা গেল যে, সমস্ত দিন অপ্রতিহত ভাবে উপশান্ত হইয়া আসিয়াছে।

কেরাণী বামাচরণবাবু সিদ্ধেশ্বরবাবুর পানে মুখ তুলিয়া একটু চাহিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, বিশেষ সংবাদদাতা ওদিকে পা বাড়ালে হয় একবার; তার ঠ্যাঙের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে ছাড়বে।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু আবার পড়িতে লাগিলেন—

"চিকিৎসার জন্য যেরূপ ধন্বন্তরীদের সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে..."

হলধরবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না, ও ধন্বন্তরী-ফন্বন্তরী কাটুন—ভাববে ঠাট্টা করছে; ঐ নিয়ে আবার এক লম্বা চিঠি এসে হাজির হবে।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু কথাটা কাটিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লেখা যায় ?—'বিচক্ষণ চিকিৎসক ?"

হলধরবাবু মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"দি—ন লিখে।...বিচক্ষণ না হাতী।"

তাহাই লেখা হইল। পড়া চলিল—

"—চিকিৎসার জন্য যেরূপ বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে আমরা বরাবরই এইরূপ আশু উপশমের আশা করিয়া আসিতেছি এবং পাঠকবর্গকেও সেইরূপ ভরসা দিয়া আসিতেছি। ভগবান আমাদের আশা, এবং সেই আশার দ্বারা প্রণোদিত ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল করিলেন ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। চিকিৎসকেরা সমবেতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিধ বিপদের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া পড়িবেন।"

বামাচরণবাবু বলিলেন—"মানে ?"

"মানে—ঐ যাকে বলে ডেঞ্জার জোন (danger zone) পেরিয়ে যাওয়া আর কি।"

"ও!—আবার উল্টো মানেও হ'তে পারে কি না; তাই বলছিলাম।"

হলধরবাবু বলিলেন—"না—যখন বেঁচেই গেল, কেউ অত টেনে মানে করতে যাবে না।...পড়ুন।"

"—সুতরাং এ বিষয়ে আর চিন্তার কিছুই নাই। কারণ তাঁহাদের এই বাণীকে আমরা বেদবাণীর মতই অভ্রান্ত এবং অমোঘ বলিয়া মনে করি।

আজ এই মহাপুরুষকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়ায় আমরা যে স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি আমাদের সে ক্ষমতা নাই। যিনি আমাদের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি এই চরম কৃপা প্রকাশ করিলেন সেই পরম কারুণিক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে তিনি স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টাকে এই নবজীবনের সহিত দীর্ঘ পরমায়ু দান করিয়া তাঁহার কল্যাণ ব্রতকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন।"

বামাচরণ বাবু বলিলেন—"বেশ হয়েচে। ডাক্তার-গুলোকেও ত খুব আকাশে তুলে দেওয়া হ'ল।"

হলধরবাবু—"হ'ল না ?—এখন সেখান থেকে ওদের এক একটিকে ধ'রে কেউ আছাড় দিতে পারে, ত গায়ের রাগ মেটে..."

৫

কাগজ বাহির হইল।

আজও অসম্ভব কাটতি। লোকে সঠিক খবরের চেয়ে কৌতূহলেরই বেশী প্রিয়; 'সত্যপ্রকাশ' আজ আবার কি লেখে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। আজও খুব সকাল সকাল কাগজ বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে অতি অল্প সময়েই—অন্য কোন কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বেই 'সত্যপ্রকাশ' স্যর শচীনের 'নবজীবনের' সংবাদ ও 'পরমায়ুর' প্রার্থনা লইয়া শহরে বেশ চাড়াইয়া পড়িল।

তাহার পর যথাসময়ে দু-একখানা করিয়া ইংরেজী দৈনিক বাহির হইল। Stop Press স্তম্ভে সংক্ষিপ্ত ভাবে এসোসিয়েটেড প্রেসের খবর লেখা আছে।—

মঙ্গলবার ১৪ই অক্টোবর

অদ্য সকাল ছয় ঘটিকার সময় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও দেশসেবক স্যর এস্. এন্. গুপ্টা, বার-এট-ল'র নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছে। স্যর শচীন আট দিন হইল সামান্য ভাবে জ্বরাক্রান্ত হন; ক্রমে জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিন দিন হইল নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়। আক্রমণ এরূপ সাংঘাতিক হয় যে চিকিৎসকগণ বরাবরই

আশাশূন্য ছিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যে ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায় এবং মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

সমস্ত দিন মহানগরীর মুখখানি বিষাদে মলিন হইয়া রহিল। 'সত্যপ্রকাশ' কিন্তু তাহারই কথায় বরাবর একটু কৌতুকের হাসি ফুটাইয়া রাখিল—বাদ্‌লা মেঘের কোলে অস্পষ্ট রামধনুর মত।

*　　*　　*　　*

দুপুর হইয়া গিয়াছে। অস্নাত এবং অভুক্ত হলধরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, বামাচরণবাবু এবং কয়েকজন কম্পোজিটার বিষণ্ণ ভাবে আপিসে বসিয়া আছেন। কদাচিৎ দু-একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন—"না হয় একটা অতিরিক্ত সংখ্যা তাড়াতাড়ি বের ক'রে দেওয়া যাক্ না। পাঁচটা পর্য্যন্ত ত বেশই ছিল; হঠাৎ এ রকম ডিগবাজি খেয়ে ব'সবে কে জানত ?"

হলধরবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—"হ্যাঃ, ব'সে ব'সে ঐ করি আর কি। লোকটা সেই গেল তবে আমাদের সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার ক'রে গেল কেন বল দিকিন ?"

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার দুইটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির পূর্ব্বে মিথিলায় কেহ কখনও মৈথিল ভাষায় কিছু রচনা করেন নাই।"

এ-কথা কি সত্য ? খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমভাগে বিদ্যাপতির প্রায় ৭৫ কি ১০০ বৎসর আগে কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর তাঁহার 'বর্ণরত্নাকর' প্রণয়ন করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীর সরকারী সংগ্রহে গুপ্ত-মহাশয় 'বর্ণরত্নাকরে'র পাণ্ডুলিপি দেখিতে পাইবেন। 'বর্ণরত্নাকর' সম্বন্ধে প্রখ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সে যে নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে নগেন্দ্রবাবু কবিশেখরাচার্য্যের গ্রন্থরাজী, তাঁহার সময় ও 'বর্ণরত্নাকরে'র ভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

গুপ্ত-মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে দুইজন মিথিলাবাসী, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস ঝা, যাঁহাকে আমরা কবিরাজ গোবিন্দ দাস বলিয়া জানি।"

মিথিলায় গোবিন্দ ঝা বলিয়া কবি যে না থাকিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু কবিরাজ গোবিন্দদাস বলিয়া আমরা যাঁহাকে জানি তিনি যে খাঁটি বাঙালী সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাঙালী গোবিন্দদাস-কবিরাজ সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস', 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থে পাইয়া থাকি। গোবিন্দদাস-কবিরাজ তাঁহার স্বরচিত 'সঙ্গীত-মাধব' নাটকেও তাঁহার নিজের ও তাঁহার ভ্রাতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দদাস-কবিরাজের জন্মস্থান শ্রীখণ্ড, তাঁহার মাতামহ কবি দামোদর সেন, পিতা চিরঞ্জীব সেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ। 'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দদাসের কবিরাজ উপাধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

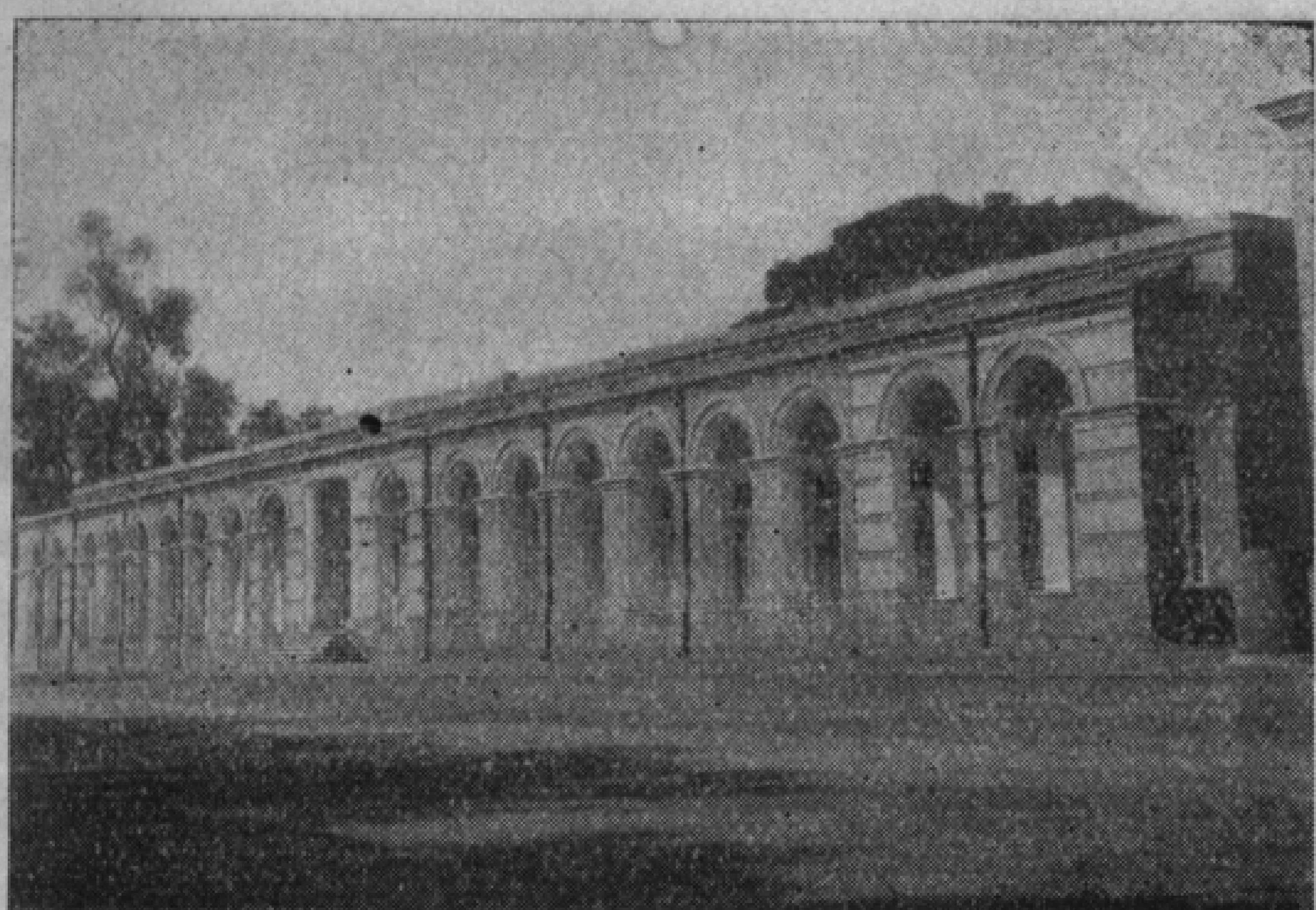
"গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব লোকনাথ-আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥"

যে-পুঁথিতে গোবিন্দ ঝার পদাবলী পাওয়া গিয়াছে গুপ্ত-মহাশয় সে-পুঁথির কিংবা কবির বংশপরিচয় কিছুই দেন নাই। গোবিন্দ ঝা কোথায়, কোন্ পণ্ডিতসমাজ হইতে কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ করা প্রয়োজন। গুপ্ত-মহাশয় ১৩৩১ সালে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রথম গোবিন্দদাস-কবিরাজকে মৈথিল করিয়া তুলিতে চাহেন। কিন্তু পদাবলীসাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩৩ সালের 'ভারতী'র আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় তাহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন। পরে নগেন্দ্রবাবু সেই প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পঞ্চত্রিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় ও ১৩৩৬ সালের 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় সে-কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। ইহার পরে প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ষট্‌ত্রিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় গুপ্ত-মহাশয়ের এ-মতের খণ্ডন করিয়া যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন আমরা ভাবিয়াছিলাম গুপ্ত-মহাশয় বোধ হয় সেই প্রতিবাদের যুক্তিনিরসন করিবেন। ১৩৩৬ সালের শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে'ও নগেন্দ্রবাবুর বহু প্রমাদের কথা প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে গুপ্ত-মহাশয় 'Govinda Jha—the Maithil Poet' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তাঁহার মতের পুনরাবৃত্তি করিলে সেখানেই তাঁহার সমস্ত যুক্তি বর্ত্তমান প্রতিবাদকারী কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীরঙীন হালদার

বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল

কলিকাতায় গত মার্চ্চ মাসে নিখিলভারতীয় মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উহার সভাপতি ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় বলেন, যে, খুব কম করিয়া ধরিলেও ভারতবর্ষের জন্য এক লক্ষ শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন। তাহার সিকিসংখ্যক চিকিৎসক এখন আছেন। ডাঃ সরকার এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের



বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল গৃহ

কথাই বলিয়াছেন। শিক্ষিত চিকিৎসকদের অভাব অনেক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। মফস্বলের পল্লীগ্রাম অঞ্চলেই এই অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। বঙ্গের সব জেলায় চিকিৎসাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং প্রয়োজনমত সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধসরঞ্জামবিশিষ্ট সুপরিচালিত হাসপাতাল স্থাপন করিলে এই অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে।

ইহা অনুভব করিয়া বাঁকুড়া জেলার হিতসাধনকল্পে প্রতিষ্ঠিত সমিতি বাঁকুড়া সম্মিলনী দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২২ সালে বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। ইহার প্রত্যেক বিভাগ—বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল—এখন শহরের বাহিরে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী উচ্চ খোলা বিস্তৃত স্বতন্ত্র হাতার মধ্যে অবস্থিত। এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে সহজে যাওয়া যায়।

প্রথম প্রথম যে বাড়িগুলিতে স্কুল ও হাসপাতাল উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলি কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলকে দান করেন। এইগুলি ৭৮ (আটাত্তর) বিঘা জমীর উপর অবস্থিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নামে এগুলির নাম নীলাম্বর ভবন রাখা হইয়াছে। হাতার মধ্যে পুকুর ও কূপ আছে। হাসপাতালে জলের কল স্থাপন করা হইয়াছে। সাবেক বাড়ি যত ছিল, তাহা ভিন্ন নূতন বাড়িও অনেকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের কয়েকটির ছোট ছোট ছবি প্রকাশিত হইল। স্কুলের হাসপাতালে এখন ৮৩ (তিরাশি) জন রোগীর স্থান হয়। তা ছাড়া, বাঁকুড়ার সদর হাসপাতাল ও স্কুল হাসপাতালের মধ্যে সহযোগিতা থাকায় ছাত্রেরা সদর হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা ও চিকিৎসাপর্য্যবেক্ষণ হইতেও শিক্ষার সুযোগ পায়।

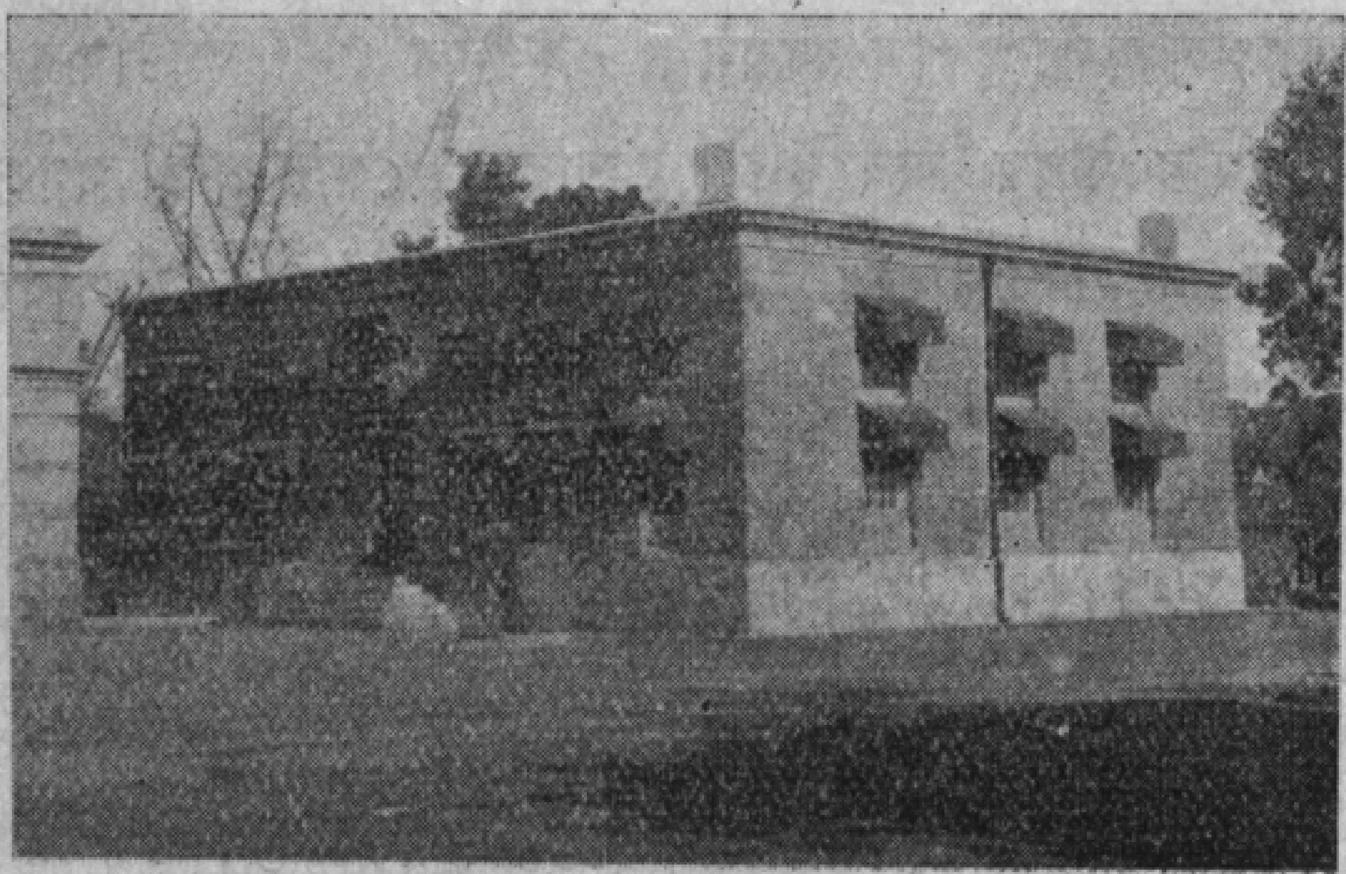
বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের হাসপাতালটিতে প্রধানতঃ বাঁকুড়া জেলার রোগীরাই চিকিৎসার জন্য আসে ; কারণ তাহারাই



নীলাম্বর ভবন
নীচে আউটডোর বিভাগ ও উপরে পুরুষদের চিকিৎসার ওয়ার্ড

উহার নিকটতম বাসিন্দা। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য জেলার রোগীর চিকিৎসিত হইতে কোন বাধা নাই। এই জন্য দেখা যায়, বর্দ্ধমান, মানভূম ও মেদিনীপুরের রোগীও এখানে

আসে। স্কুলের অধ্যাপকদের মধ্যে সুদক্ষ চিকিৎসক ও সার্জ্জন থাকায় হাসপাতালে কঠিন রোগের চিকিৎসা এবং কঠিন অস্ত্রোপচার হইয়া থাকে। যে-সমুদয় প্রসূতির শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে, তাঁহারা এই হাসপাতালে গেলে ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তারের সাহায্য পাইয়া উপকৃত হন। এখানে কঠিন অস্ত্রোপচার ১৯৩১ সালেই ২৬৫টি হইয়াছিল; প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত



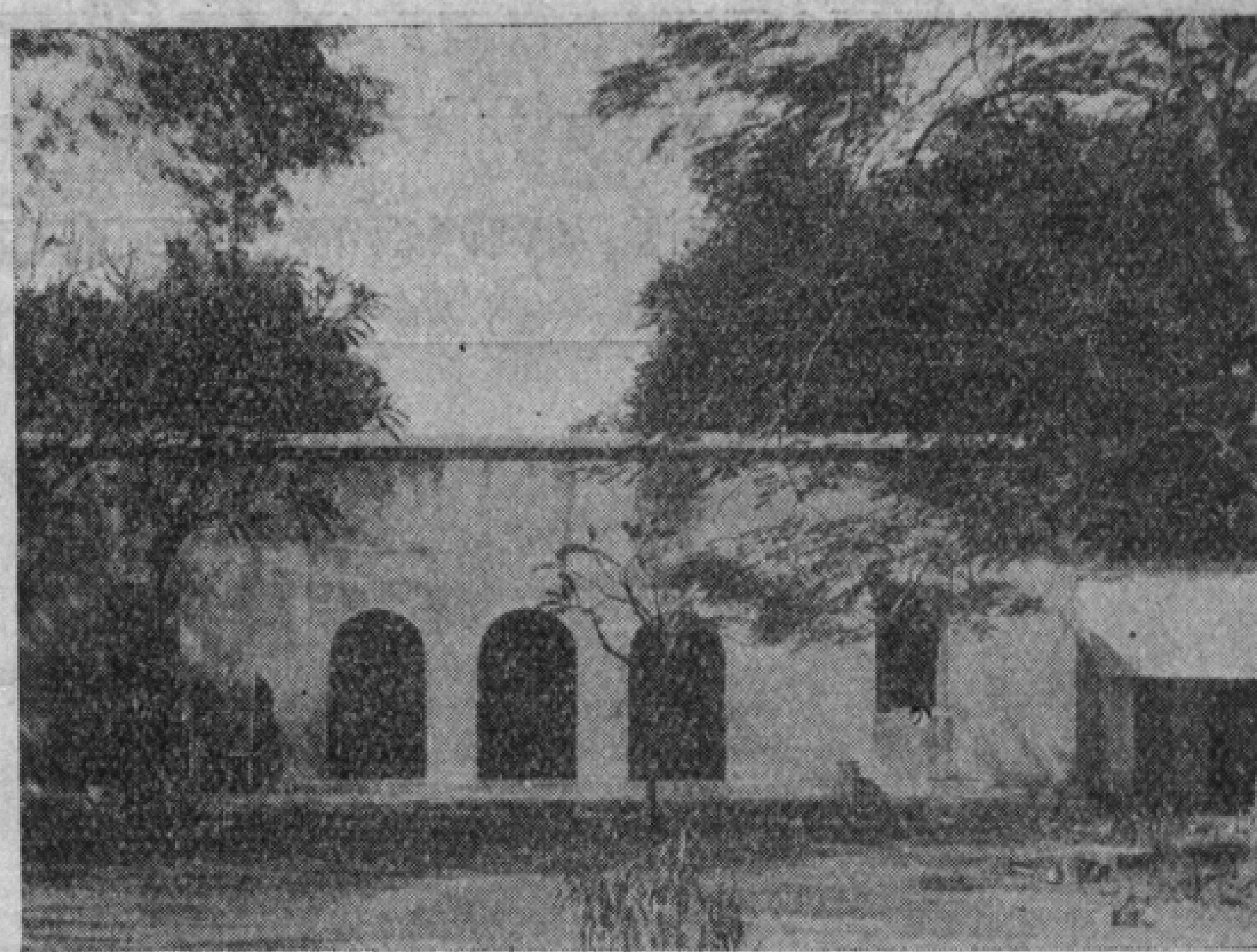
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী

মোট প্রায় ৯৬০টি। যে যে রকম অস্ত্রোপচার হইয়াছে, তাহার বাংলা নাম রচনার চেষ্টা না করিয়া ইংরেজী নাম দিতেছি :—Caesarian section, Hysterectomy, Intestinal obstruction, Cataract, Lithotomy,



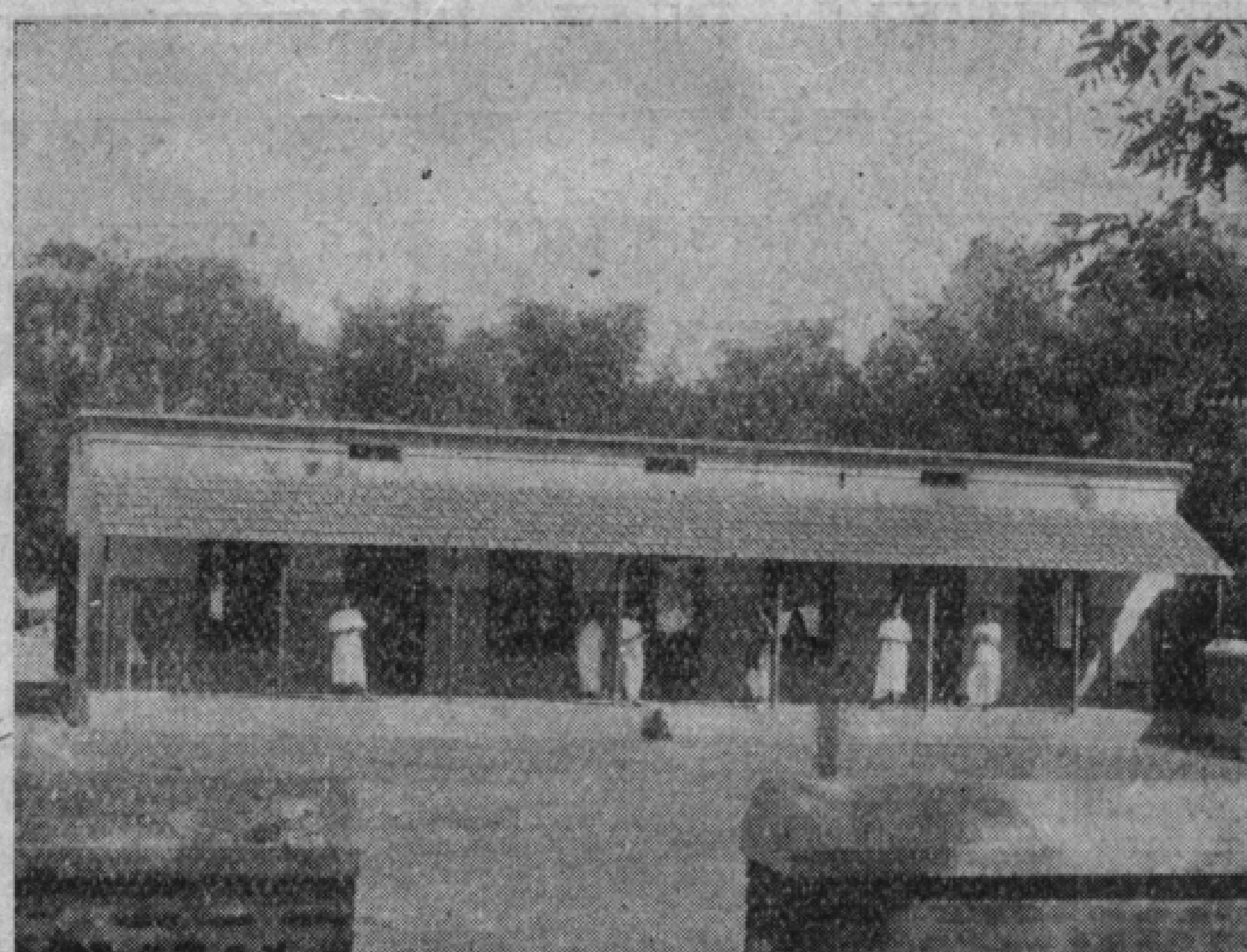
হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্জনের আবাসগৃহ

Removal of Gasserian Ganglion, Ovary Grafting, Amputations, Strangulated Hernia, Tracheotomy, Scrotal Tumour, ইত্যাদি। ১৯৩১ সালে হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে ২২,৩০৬ জন রোগী। বাহির হইতে আসিয়া ব্যবস্থা ও ঔষধ লইয়া গিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে ১৯,৪২১ জন। হাসপাতালের একটি বাড়িতে এক একটি কামরা লইয়া রোগীরা থাকিতে পারেন। প্রত্যেক কামরার পশ্চাতে ছোট উঠান ও তাহার পর রান্নাঘর আছে। সম্মুখে বারাণ্ডা। আত্মীয়রা আসিয়া সেখানে



পুরুষদের অস্ত্রোপচার-গৃহ

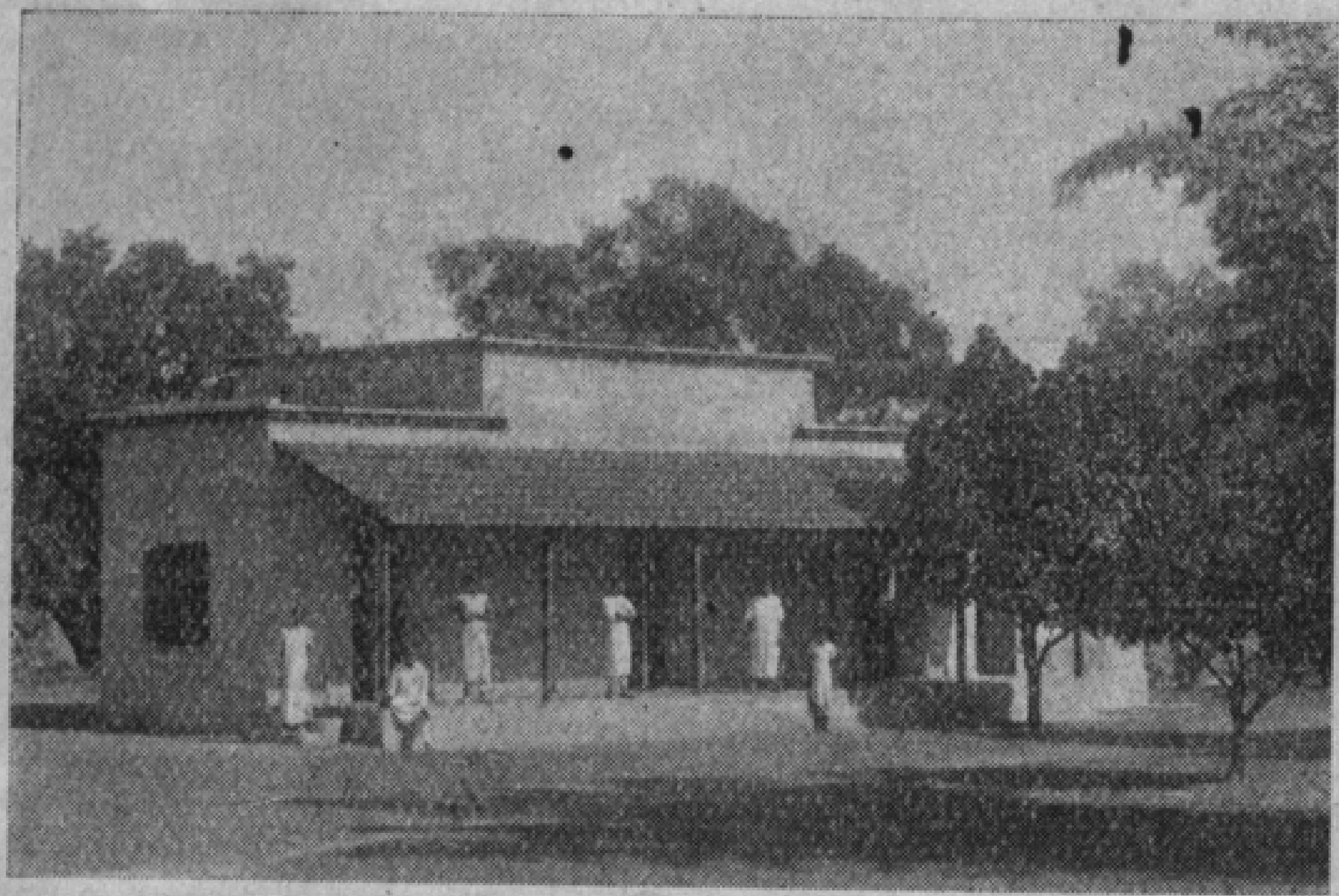
থাকিয়া রোগীর আহারাদির ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে পারেন। দৈনিক ভাড়া বার আনা মাত্র।



স্ত্রীলোকদের অস্ত্রোপচার-গৃহ

বিদ্যালয়টি এখন যে-সকল অট্টালিকায় স্থাপিত, তাহাতে পূর্ব্বে সরকারী সেট্‌লমেণ্ট আপিস ছিল। সেট্‌লমেণ্ট হইয়া যাইবার পর সেগুলি পড়িয়া থাকিত।

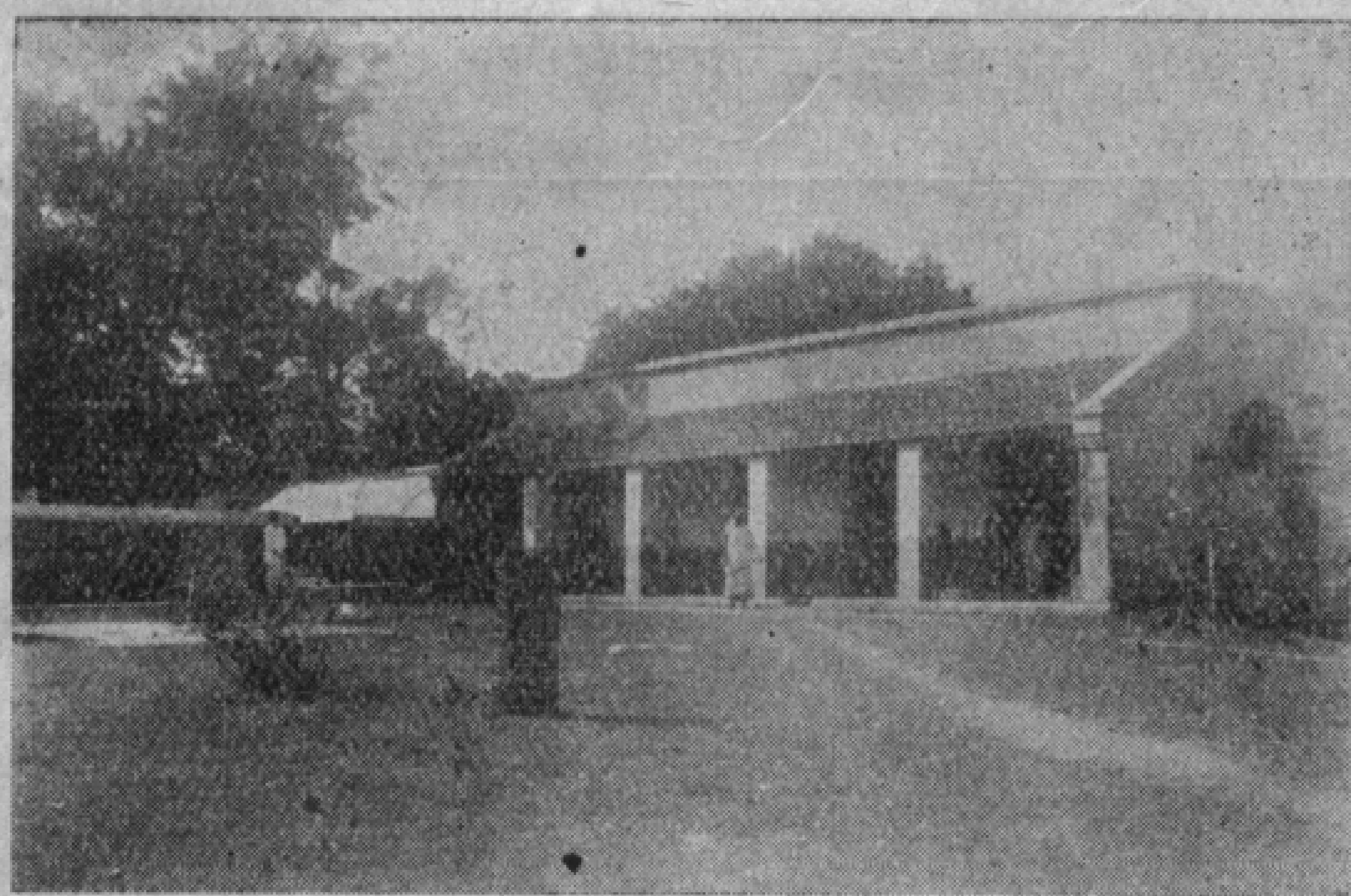
গবর্ন্মেণ্ট তাহা বিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। ইহার জন্য গবর্ন্মেণ্ট প্রশংসাভাজন। সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য ও কূপটি গভীর করিবার জন্য বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ন্মেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনার



সাধারণ অস্ত্রোপচার-গৃহ

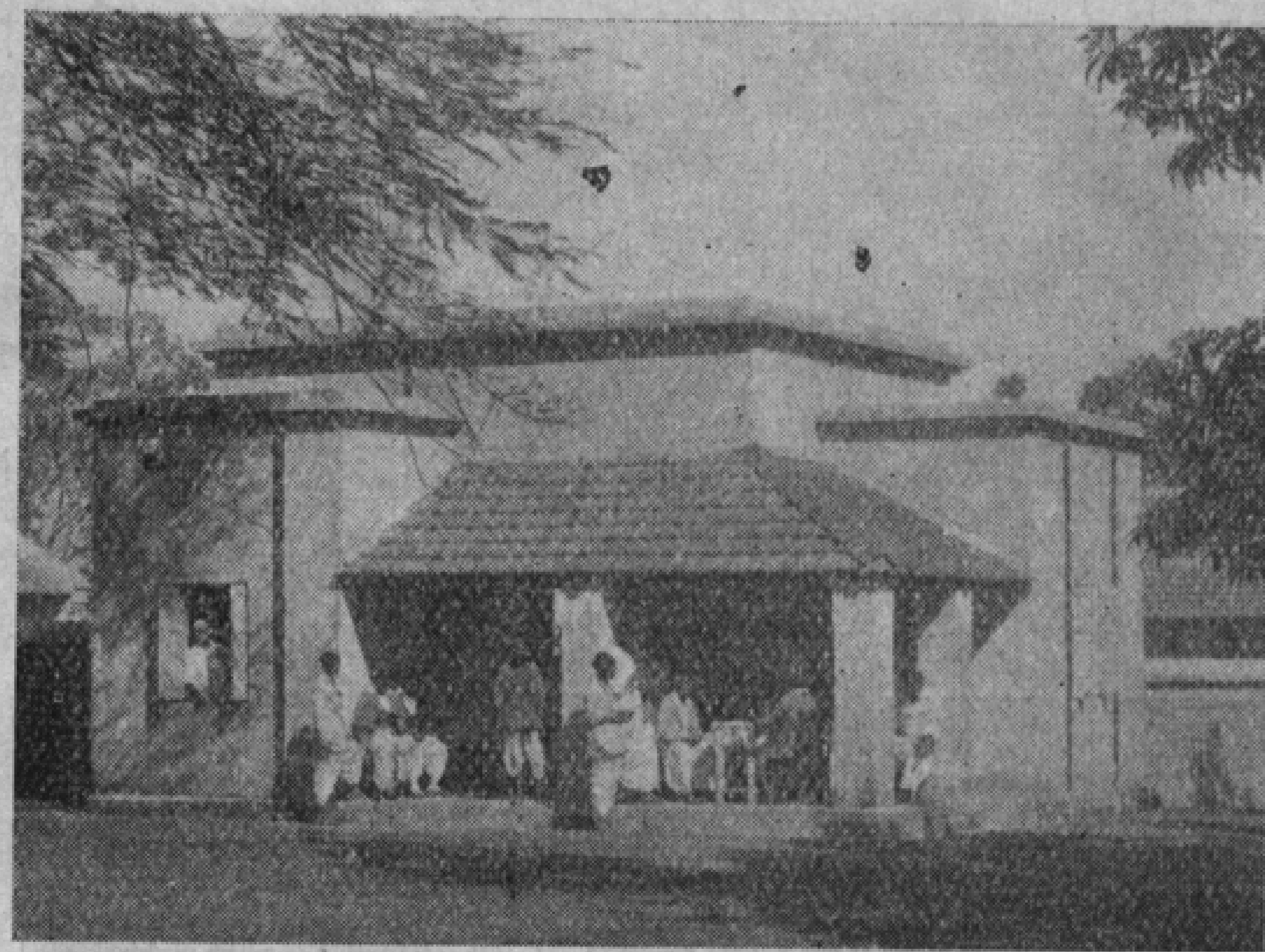
সাহেব জবাব দিয়াছেন তিনি স্কুল বা হাসপাতালকে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

স্কুলের ছাত্রেরা বরাবরই স্থানীয় ওয়েসলিয়ান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নী বিদ্যা শিক্ষা করে। কলেজের



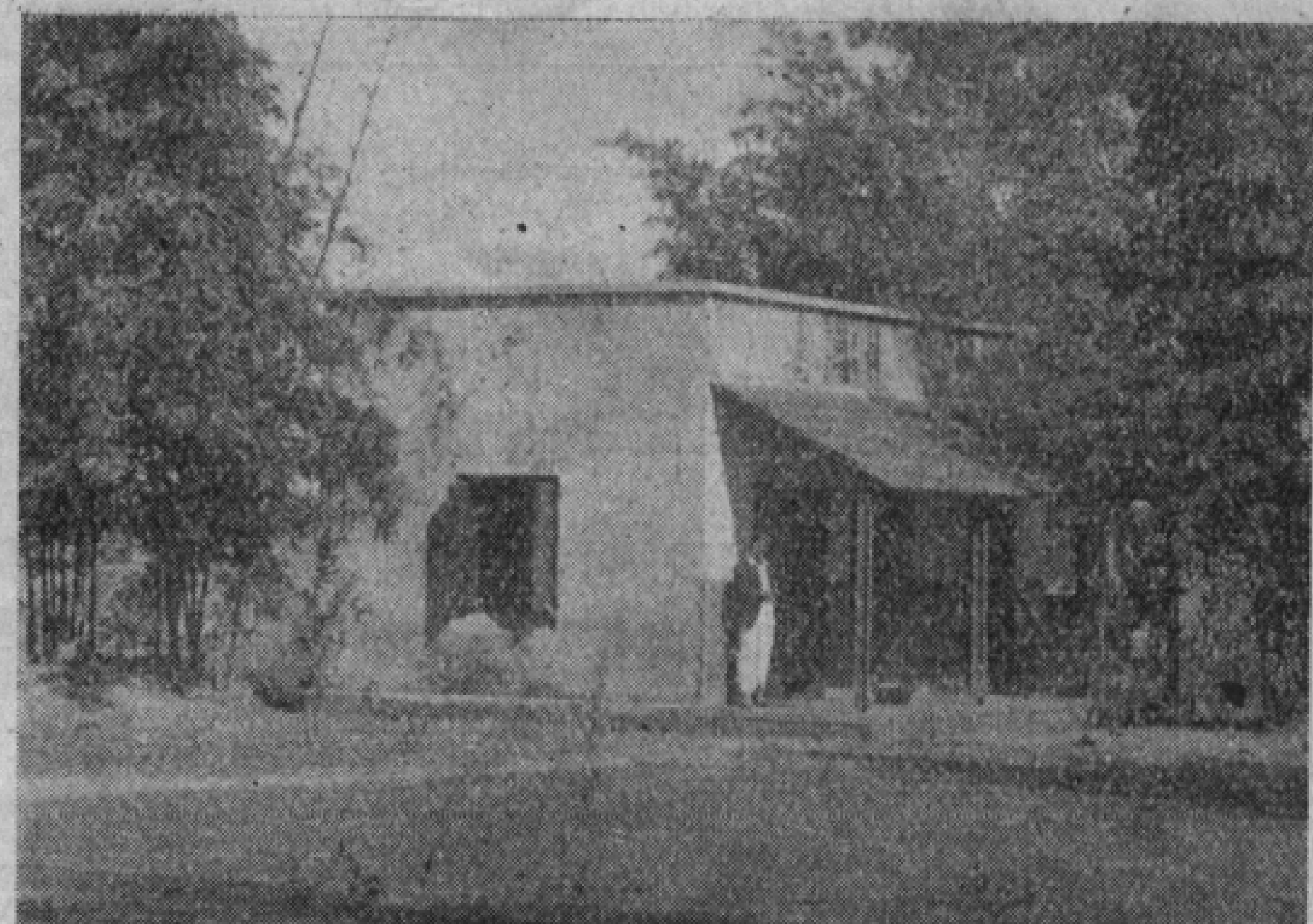
স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা-গৃহ

কর্তৃপক্ষ ও বিজ্ঞানাধ্যাপকগণ এই সদাশয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা-ভাজন। উহার প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন সাহেব (এখন ছুটিতে) দীর্ঘকাল স্কুলের অবৈতনিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়া ও অনেক চাঁদা তুলিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উক্ত দুটি বিষয় ছাড়া আর সমস্ত বিষয় স্কুলেই শিখান হয়। ইহার য়্যানাটমি, মেটীরিয়া মেডিকা, ফিজিয়লজি এবং প্যাথলজির মিউজিয়ম ও ল্যাবরেটরীগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সরঞ্জাম ও আসবাবে সজ্জিত। শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা দিবার হলটি ফাঁকা জায়গায় নদীর ধারে লোকালয় হইতে দূরে নির্ম্মিত হইয়াছে।



প্রসব করাইবার গৃহ

ছাত্রাবাস সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটি বাগানের মধ্যে স্থিত। ছাত্রদের ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস খেলিবার এবং কুস্তি করিবার



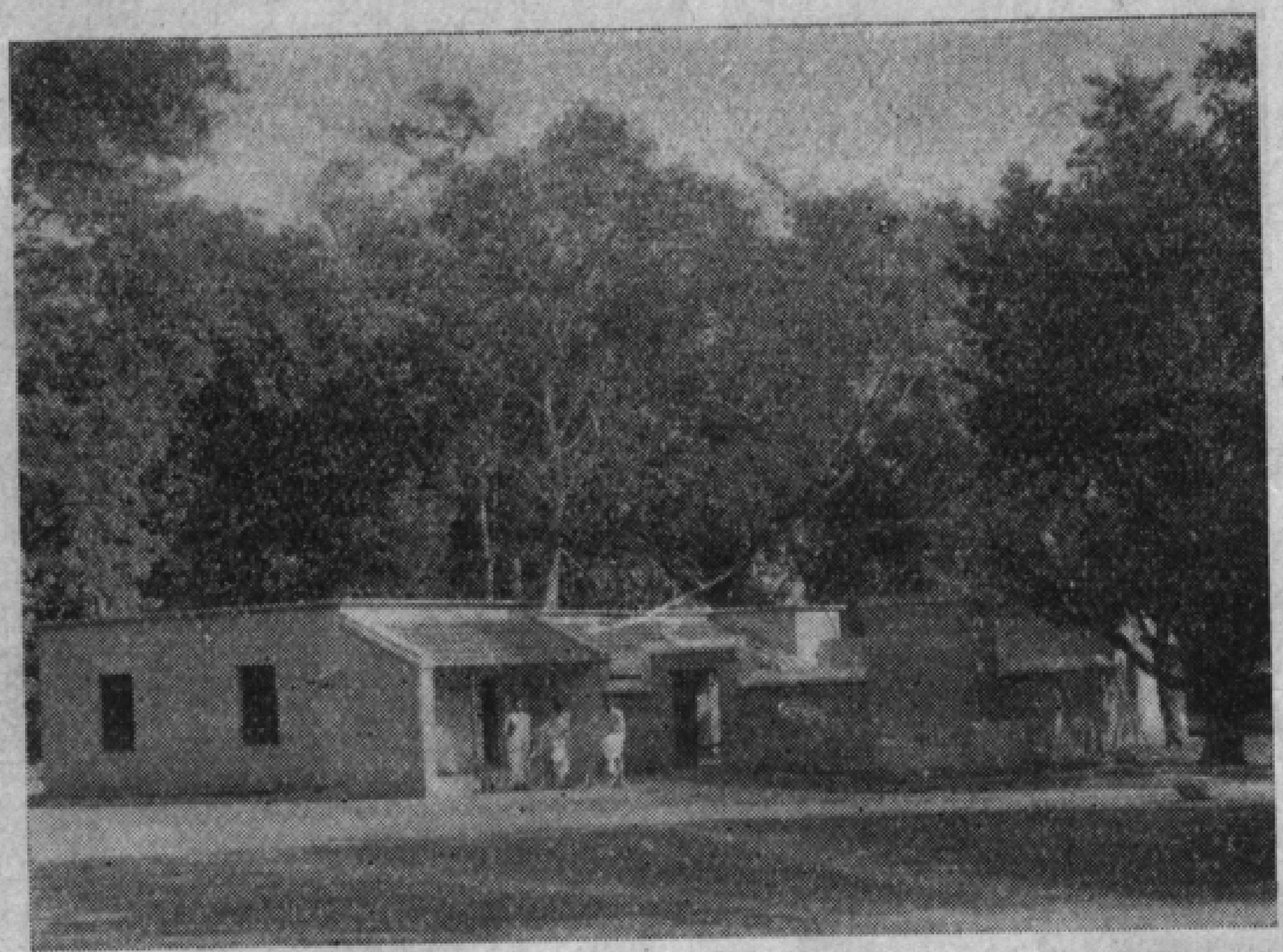
সংক্রামকরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র রাখিবার গৃহ

প্রশস্ত জায়গা আছে। একজন অধ্যাপক ছাত্রাবাসের হাতাতেই থাকেন। ছাত্রদের জন্য সাধারণ পাঠাগার আছে।

স্কুলে গড়পড়তা মোট ২০০ ছাত্র পড়াইবার অনুমতি আছে। এখন ২০১ জন ছাত্র আছে। তাহার মধ্যে এবার প্রায় ৫০টি ছাত্র ৫টে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির শেষ

পরীক্ষা দিতেছে। হাসপাতালে রোগীর শয্যা (beds) বাড়াইতে পারিলে আরও ছাত্র লওয়া চলিবে। সদাশয় সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বেড্ বাড়াইবার ব্যয়ে নিজের বা কোন আত্মীয়-আত্মীয়ার স্মৃতিরক্ষা এবং দেশহিতসাধন করিতে পারেন। আমরা বাঙালী মাত্রকেই এই অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ বঙ্গের সকল অংশ হইতে আগত ছাত্রেরা এখানে শিক্ষা পায়। তবে, অবশ্য যাঁহাদের জন্ম ও পৈত্রিক বাসভূমি এবং কর্ম্মস্থান ও রোজগারের জায়গা বাঁকুড়া জেলায়, তাঁহাদের উপর বিদ্যালয়ের দাবি বেশী।

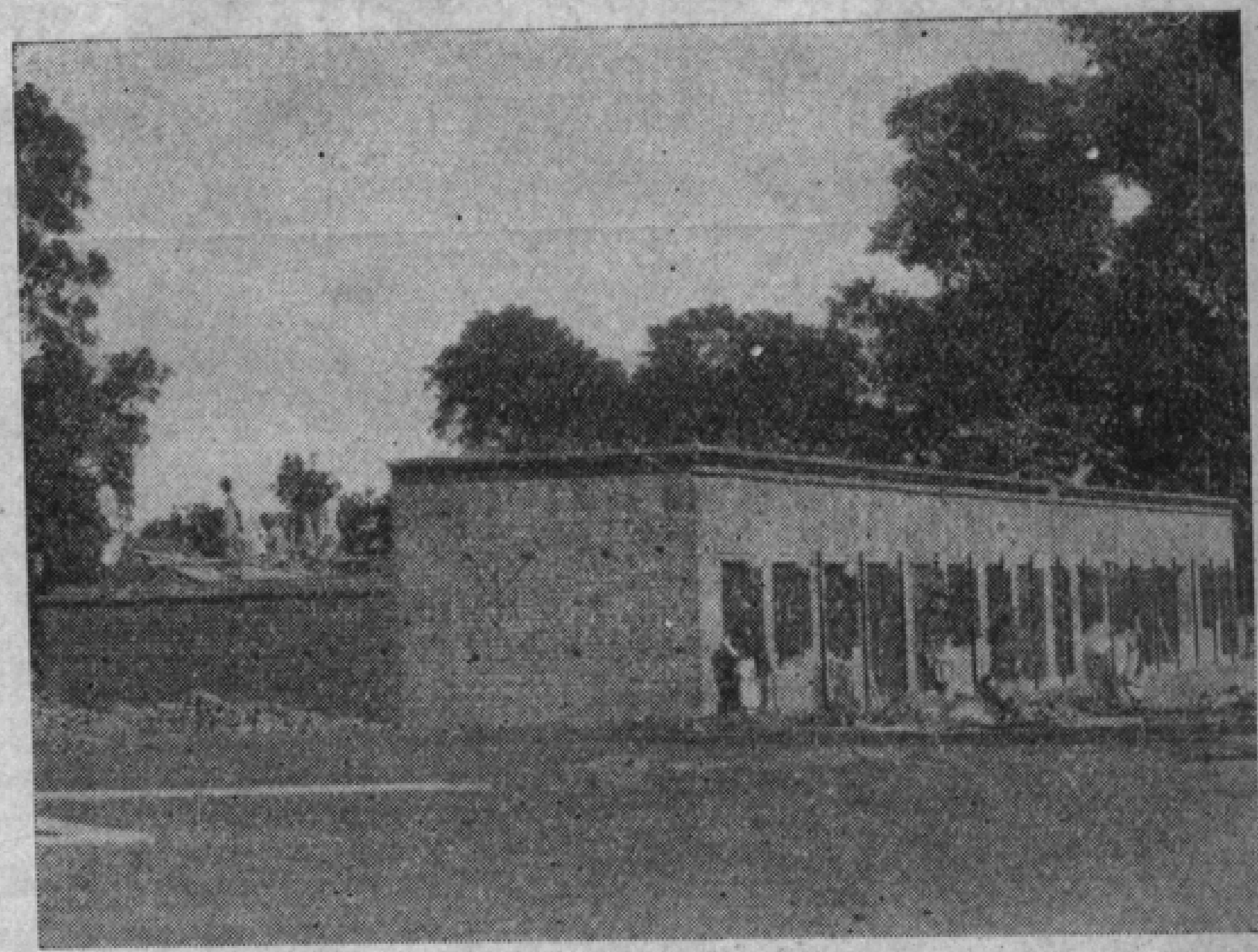
মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয় শিখাইবার



ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেনদের বাসগৃহ

জন্য যোগ্য অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিজ নিজ বিষয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।

স্কুল ও হাসপাতালের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে কখনও কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ও রেড ক্রস ফণ্ড হইতে কিছু টাকা পাওয়া যায়। ১৯৩০-৩১ সালে তাহার পরিমাণ যথাক্রমে বার্ষিক ১৫০০,৬০০ ও ২০০ টাকা ছিল। আর সমস্ত ব্যয়ই ছাত্রদের বেতনাদি ফী, দান, চাঁদা ইত্যাদি হইতে নির্ব্বাহ করিতে হয়। ছাত্রদের বেতন হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হয়। মোট ব্যয় ১৯২৮-২৯,১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সালে যথাক্রমে ৫৮২২৪৮/১,৫৫৯৭১।৶২ এবং ৫৩৮০৪॥১১ হইয়াছিল। প্রতিবৎসর দশ বার হাজার টাকা ঘাট্‌তি পড়িবার আশঙ্কা থাকে। কার্য্য-নির্ব্বাহকগণ কোন প্রকারে এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিতেছেন ও চালাইতেছেন। সর্ব্বসাধারণের আর্থিক ও অন্য সকল প্রকারের সাহায্য প্রার্থনীয়।



নূতন কুটিরসমূহ

এই প্রতিষ্ঠানটির কমিটির সভাপতি শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। উপসভাপতি ওয়েস্‌লিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন সাহেব, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কেদারনাথ দাস, অবসরপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরকারী উকীল রায় বাহাদুর বসন্তকুমার নিয়োগী, রায়সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত য়্যাডিশ্যন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায়-বাহাদুর রামসদন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত ডাকবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারাল রায় বাহাদুর হেমন্তকুমার রাহা, এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলাম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীব্রজদুর্লভ হাজরা।



প্রাইভেট ওয়ার্ড

আলিপুরের উকীল শ্রীকেদারনাথ আশ ইহার কোষাধ্যক্ষ, হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার সেক্রেটারী, আলিপুরের উকীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ, এবং শ্রীঅবনী-কান্ত মণ্ডল ও শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক। মিঃ এন্ সরকার এম্-এ, হিসাবপরীক্ষক। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, অধ্যাপক প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।



গাছের তলায়
শ্রীসুধাংশু রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চীনদেশের ছেলেদের খেলা

শ্রীসংগ্রাহক

সবদেশেই ছেলেমেয়েরা খেলা করে। চীনদেশও বাদ যায় না। আমাদের দেশের মত সেখানকারও অনেক পুরাতন খেলা অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে। আমরা



হাততালি

ছেলেবেলা, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে, যে-সব খেলা প্রচলিত দেখিয়াছি ও খেলিয়াছি, তার অনেকগুলিই লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে। তার জায়গায় অনেক বিলাতী খেলা চলিত হইয়াছে। চীন দেশেরও অনেক সাবেক খেলা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তার জায়গায় কোন্ দেশী খেলা চলিতেছে জানি না। আসল চীনা খেলা এখনও যেগুলি চলিত আছে, তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি।

১। হাততালি। এই খেলায় তুটি ছেলে সাম্না-সাম্নি দাঁড়াইয়া আড়াআড়ি ভাবে পরস্পরের হাতে তালি দেয়; অর্থাৎ একজন খেলোয়াড় নিজের বাঁ হাত দিয়া অন্যের বাম হাতে ও নিজের ডান হাত দিয়া অন্যের ডান হাতে তালি দেয়; এবং তার পরই তুজনেই নিজের নিজের তুই হাতে তালি দেয়। এই রকম পরস্পরের এবং নিজের হাতে তালি খুব দ্রুত চলিতে থাকে। হাততালি দিতে দিতে তাহারা একটি ছড়া গান করে। তাহার প্রথম পদ তুটির অনুবাদ এইরূপ—

"প্রতিপদের দিনে আমাদের বুড়ী পুষ্পচিত্রিত লণ্ঠন-গুলির মধ্যে বেড়ায়, এবং কয়েকটি ধূপ জ্বালিয়া বুদ্ধদেবের পূজা করে। দ্বিতীয়ার দিনে আমাদের বুড়ী মোরব্বা খায় এবং কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বালিয়া বুদ্ধদেবের পূজা করে।"

২। বিড়ালের ইঁতুর ধরা। এই খেলাতে এক জন ইঁতুর ও একজন বিড়াল হয়। বাকী সবাই ইঁতুরকে ঘিরিয়া ও বিড়ালকে বাহিরে রাখিয়া চক্রাকারে দাঁড়ায়। তাহার পর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে—

বিড়াল। ক'টা বেজেছে?



বিড়ালের ইঁতুর ধরা

খেলোয়াড় দল। ন'টা।

বিড়াল। আমার বড় দাদা বাড়ি আছেন কি?

খেলোয়াড়রা। আছেন (যদি সে প্রস্তুত থাকে); নাই (যদি সে প্রস্তুত না থাকে)।

বিড়াল। খাবার সময় হয়নি কি?

এইরূপ প্রশ্নোত্তরের সময় চক্রের ছেলেরা পাঁচবার



রুমাল লুকানো

ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত্তন করে। তাহার পর তাহারা থামে। বিড়াল চক্রের বাহিরে যেদিকে থাকে, ইঁদুর চক্রের ভিতরে তাহা হইতে দূরবর্ত্তী দিকে থাকে। বিড়াল এই দিকে চক্রের ভিতর লাফ দিয়া ঢুকে এবং ইঁদুর অন্য দিক দিয়া পলাইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিড়াল ইঁদুরকে ধরিয়া "খায়", ততক্ষণ খেলা চলিতে থাকে। এই "খাওয়াটা"তে ছেলেরা খুব আমোদ পায়।

৩। রুমাল লুকানো। এই খেলাটির বর্ণনা চায়না জর্ন্যালে দেওয়া হয় নাই। বলা হইয়াছে যে, ইহা ঐ প্রকারের বিলাতী খেলার মত। তাহা কাহারও জানা থাকিলে লিখিবেন। ছবি হইতেও কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিতে পারিবেন।

। অনুমানের খেলা। এই খেলায় ছেলেরা বা মেয়েরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া সাম্‌না-সাম্‌নি বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকে। প্রত্যেক দলের এক এক জন কাপ্তেন বা নেতা থাকে। সে বসে না। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক একটি ফুল বা ফলের নাম দেওয়া হয়। এক দলের কাপ্তেন তাঁহার দলের এক জনের চোখ হাত দিয়া বন্ধ করিয়া দেন। অন্য দলের এক জন আস্তে আস্তে আসিয়া এই চোখ-ঢাকা খেলোয়াড়টির মাথায় টোকা দিয়া চলিয়া যায় এবং তাহার পর নিজের দলে গিয়া নিজের জায়গায় বা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কাহারও জায়গায় বসে। অতঃপর চোখ-ঢাকা ছেলেটির চোখ খুলিয়া দেওয়া হয়। তাহাকে অনুমান করিতে হয়, কে তাহার মাথায় টোকা মারিয়াছে। সে অন্য দলে গিয়া প্রত্যেকের মুখ পর্য্যবেক্ষণ করে, প্রত্যেকের বসিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করে, এবং অন্যান্য অনেক বিষয় মন দিয়া দেখে—এইরূপে যে টোকা মারিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সে মুখ



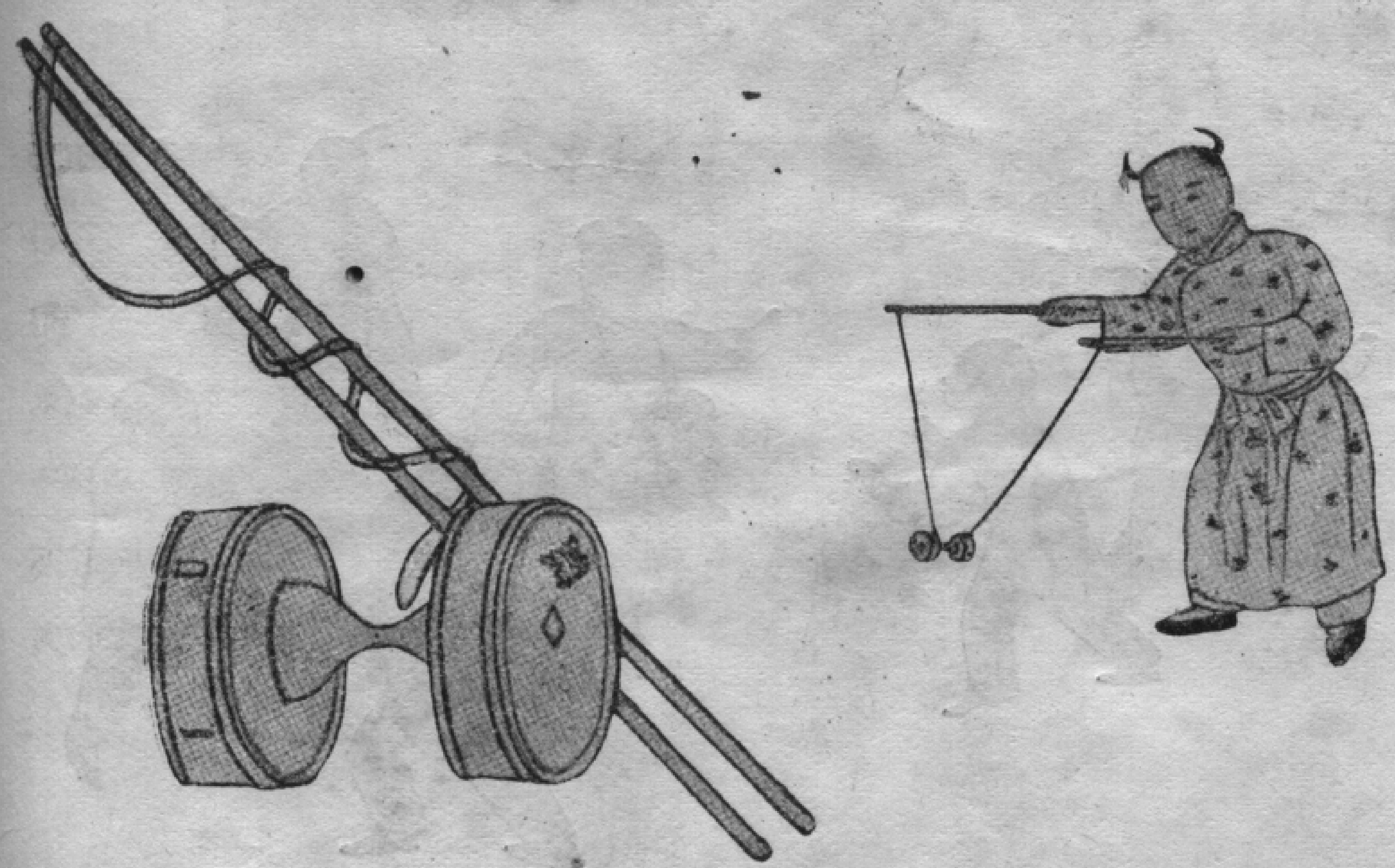
অনুমানের খেলা

ভ্যাংচাইয়া নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া "অপরাধী" ব্যক্তিকে হাসাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যেরা সবাই নির্ব্বিকার উদাসীন ভাব অবলম্বন করে, কিংবা

সবাই হাসে, যাহাতে "অপরাধী" ধরা না পড়ে। অনেক সময় তাহার মুখ ভ্যাংচান বা অন্য ভাঁড়ামিতে "অপরাধী" ধরা পড়ে। কিন্তু তাহা না হইলে, শেষে সে অনুমান করিয়া কাহারও নাম করে। যদি অনুমান ঠিক হয়, তাহা হইলে "অপরাধী"কে নিজের দলে লইয়া যায়, অনুমান ঠিক না হইলে নামিত খেলোয়াড় আপন দলেই থাকিয়া যায়। সেই দলের কাপ্তেন তখন নিজেদের এক জনের চোখ ঢাকা দেয়, অন্য দলের এক জন



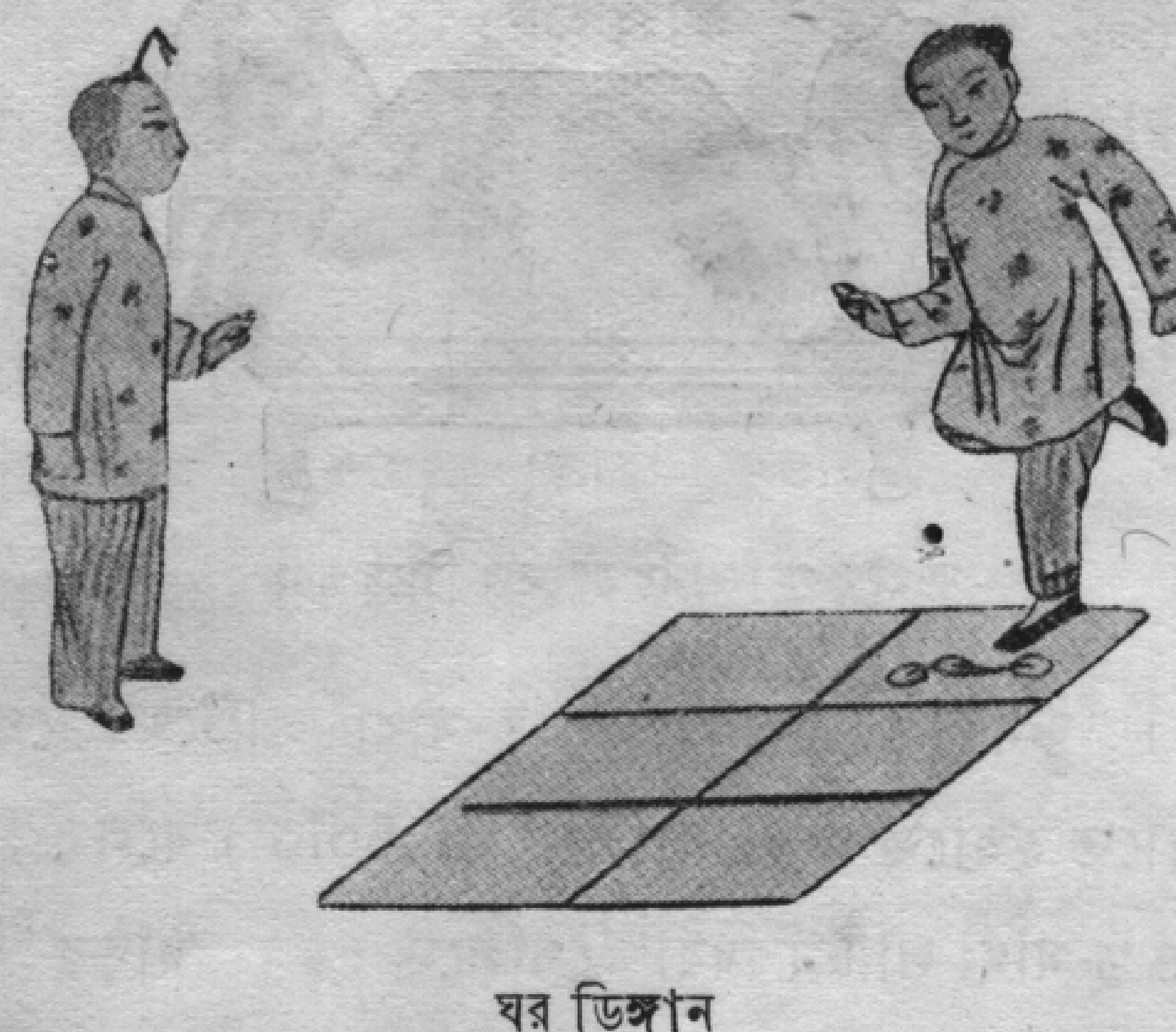
ইট চালান



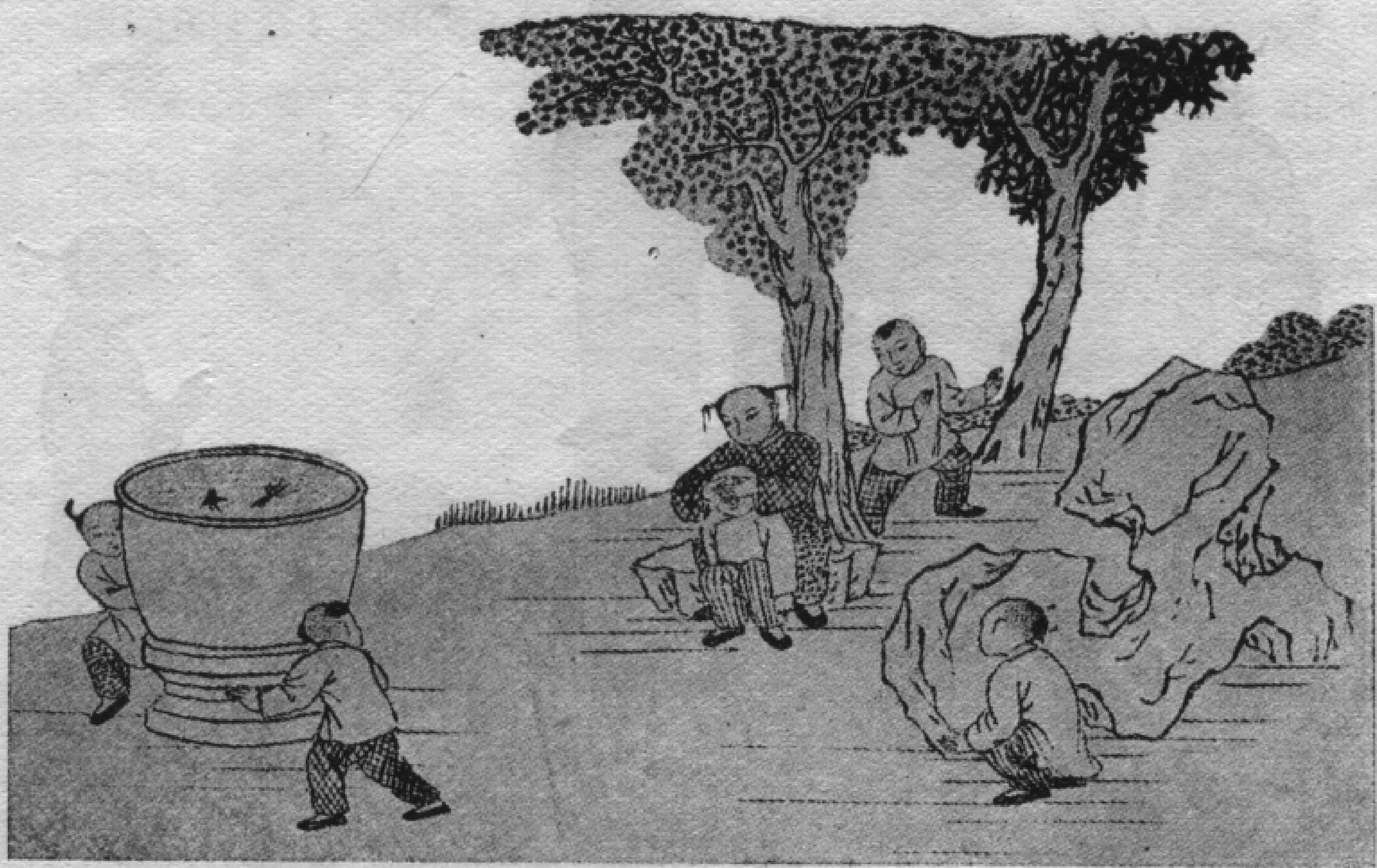
ডুগডুগির আকারের দু-মাথা লাটিমের খেলা

আসিয়া তাহার মাথায় টোকা দেয়, এবং এই "অপরাধী"কে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে; ইত্যাদি। যখন কোন দল এই প্রকারে নিজেদের সব খেলোয়াড় হারায় তখন খেলা শেষ হয়।

৫। ইট চালান। এক দল ছেলে নিজেদের দুটি হাত পিছনে রাখিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। সারির সামনে ও পিছনে এক এক জন দাঁড়ায়। পিছনের ছেলেটির হাতে এক টুকরা ইট থাকে। সে "ইট কোথায়, ইট কোথায়" বলিতে বলিতে সারির পিছন দিয়া যাইতে থাকে এবং এক জনের হাতে অলক্ষিতে ইটের টুকরাটি রাখিয়া দিয়া বলে, "এখানে একটি পীচ ফল আছে, এখানে একটি খুবানী ফল আছে।" যার হাতে ইটের টুকরাটি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে সে এমন নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, যেন কোন মতেই কেহ অনুমান করিতে না পারে যে, উহা তাহার কাছে আছে। এখন সামনের খেলোয়াড়কে অনুমান করিতে হইবে ইটের টুকরাটি কাহার নিকট আছে। "মোরগের মাথা কোথায়, কোথায় মুরগীর মাথা" সুর করিয়া ইহা বলিতে বলিতে সে সারির সম্মুখ দিয়া যাইতে থাকে, এবং এক এক বার থামিয়া নিজের মুঠা দিয়া নিজের হাঁটুতে টোকা মারে।



ঘর ডিঙ্গান



লুক্কায়িতের অন্বেষণ

আকাশে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘূর্ণিত অবস্থাতেই উহাকে দড়ির উপর ধরিয়া ঘুরাইতে পারিলে তাহার দ্বারা খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য প্রমাণিত হয়। এক এক জন ওস্তাদ এক ঘণ্টা বা তাহার অধিক সময় লাটিমটিকে ঘুরাইতে এবং মাথা ও ঘাড় বেষ্টন করাইতে এবং দুই পায়ের ফাঁক দিয়া চালাইতে পারে। আগেকার কালে ইহারা এই খেলা দেখাইয়া বেড়াইত এবং দর্শকদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিত।

যখন তাহার মনে হয় সে ইট-ধারীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তখন তাহাকে বলে, "এই দিকে এস।" তাহার অনুমান ঠিক হইলে ইট-ধারী তাহার স্থান অধিকার করে; ঠিক না হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইট-ধারী আবিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ অনুমান চলিতে থাকে।

৪নং খেলার মত এই খেলাতেও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বাড়ে।



খোঁড়া পা



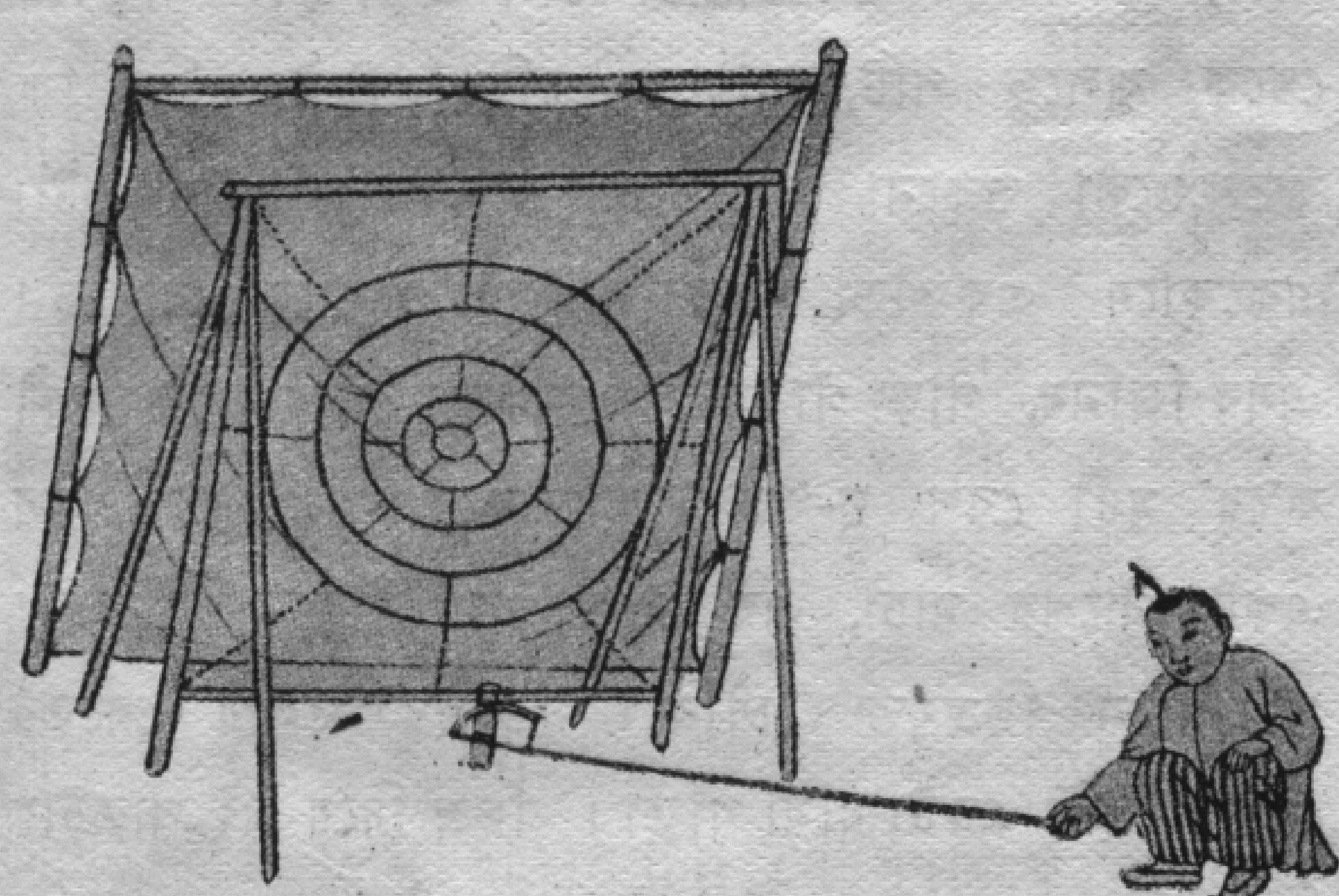
উৎক্ষিপ্ত জিনিষ হাতের পিঠে ধরা

৬। ডুগডুগির আকারের দু-মাথা লাটিমের খেলা। ইংরেজীতে ইহাকে ডায়াবোলো (diabolo) বলে। ইহা ছড়ি ও দু-মাথা লাটিম দিয়া খেলিতে হয়। দড়ির উপর লাটিমটি ঘূর্ণিত রাখিতে পারিলে এবং মধ্যে মধ্যে উহাকে

৭। ঘর ডিঙ্গান। খড়ি দিয়া মেজেতে ছয়টি বা তাহার বেশী ঘর আঁকা হয়। এক টুকরা ইট বা পাথর এক পায়ে দাঁড়াইয়া লাথি মারিয়া এক ঘর হইতে আর এক ঘরে লইয়া যাইতে হয় এবং এক পায়ে লাফাইয়া ঐ ঘরে যাইতে হয়। ইট বা পাথর কিংবা পা ঘরের রেখায় লাগিলে চলিবে না কিংবা ঘরের বাহিরে গিয়া পড়িলেও চলিবে না। যতক্ষণ খেলা চলিবে, ততক্ষণ এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। তোলা পা মাটিতে ঠেকিলে খেলোয়াড়ের হার। যে যত বেশী ঘর দখল করিতে পারে, তাহার জিত হয়।

৮। লুক্কায়িতের অন্বেষণ। ইহা কতকটা আমাদের লুকোচুরি খেলার মত।

৯। খোঁড়া পা। একজন ছেলে বা মেয়ের একটা পায়ের নীচে দিয়া এক টুকরা কাপড় চালাইয়া তাহা তাহার ঘাড়ের উপর বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে এই প্রকারে এক পায়ে লাফাইয়া অন্য কোন খেলোয়াড়কে ধরিতে বলা হয়। সে যদি কাহাকেও ধরিতে পারে, তাহা হইলে ধৃত খেলোয়াড়কে এইরূপ এক পায়ে লাফাইয়া লাফাইয়া আর কাহাকেও ধরিতে হয়; অধিকন্তু তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়ায় তাহাকে হাতড়াইতে হয়। যে প্রথমে খেলে তাহার চোখ বাঁধা হয় না। কাজেই দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে খেলাটা কঠিনতর। সে কাহাকেও ধরিতে পারিলে ধৃত ব্যক্তির ঐরূপ দশা ঘটে;



তুষার-হংসরূপ লক্ষ্যভেদ

কিন্তু ধরিতে না পারিলে সবাই তাহার মাথায় টোকা মারিতে থাকে—যতক্ষণ না তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া যায়।

১০। উৎক্ষিপ্ত জিনিষ হাতের পিঠে ধরা। এই খেলাটি বালিকাদের খুব প্রিয়। দুটি বালিকা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিমের বীজ, ছোট ছোট ইট বা পাথরের টুকরা দুই হাতের মুঠায় লইয়া হাত দুটি পিছনে রাখিয়া সাম্‌নাসামনি বসে। একজন চট করিয়া এক হাতের মুঠায় কয়েকটি ঐরূপ জিনিষ—ধরুন শিমের বীজ—লইয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত সাম্‌নে ধরে। তাহার সঙ্গিনী অনুমান করে তাহার মুঠায় কয়টি বীজ আছে। ধরুন, অনুমান হইল অপর পক্ষের হাতে চারিটি বীজ আছে। তখন



এক প্রকারের গুলিডাণ্ডা

সঙ্গিনী নিজের মুঠা খোলে। তাহাতে যদি চারিটির বেশী বীজ থাকে, তাহা হইলে তাহারই জিত হয়, এবং খেলার পরবর্ত্তী অংশ সেই প্রথমে খেলে। এখন উভয়ে সব বীজগুলি সামনে ছড়াইয়া রাখে। যে জিতিয়াছে সে একটি একটি করিয়া তুলিয়া লইয়া উপরদিকে ছুঁড়ে এবং হাতের পাতার উল্টা পিঠে ধরে। এইরূপে সব বীজগুলি উৎক্ষেপ করিয়া হাতের পিঠে ধরা হইলে খেলা শেষ হয়। হাতের পিঠে ধরিতে না পারিলে হা'র হয়।



১১। এক প্রকারের গুলিডাণ্ডা। গুলিটি উভয় দিকে সরু কাঠের টুকরা। খেলোয়াড় দুজন এক। একটি বৃত্তের পরিধিতে পা রাখিয়া দাঁড়ায়। একটি বৃত্তের মাঝখানে গুলিটি রাখিয়া তাহা ডাণ্ডার এক দুই বা তিন ঘা দ্বারা ২০ ফুট দূরে ফেলিতে হয়। তাহার পর অন্য খেলোয়াড় তাহা কুড়াইয়া লইয়া উহা অপর পক্ষের বৃত্তের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অপর পক্ষ উহা কুড়াইয়া লইয়া উৎক্ষিপ্ত করে এবং ডাণ্ডার ঘায়ে উহা প্রতিপক্ষের দিকে চালাইয়া দেয় এবং প্রতিপক্ষ আবার উহা অপর খেলোয়াড়ের দিকে ছুঁড়িয়া দেয়।

১২। তুষার-হংসরূপ লক্ষ্যভেদ। কয়েকটি চক্রাকার মোটা তারের কাঠামোর মাঝখানে যে ছোট বৃত্তটি দেখা যাইতেছে, তাহাই তুষার-হংস। পশ্চাতের কাপড়ের পর্দ্দাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আটক করিবার জন্য। তারের কাঠামোর সম্মুখে একটি খুঁটি পোঁতা থাকে। তাহাতে বাঁশের একটি ছোট ধনু সংলগ্ন থাকে। ধনুর বাঁকান দুটি দিক এক টুকরা চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। চামড়াটির সঙ্গে একগাছি সরু দড়ি বাঁধা থাকে। ঐ দড়িটির একদিক একটি ফাঁপা পিতলের গুলির ভিতর দিয়া চালাইয়া খেলোয়াড় উহা টানিয়া ছাড়িয়া দেয়। আকর্ষণে ধনুটি আরও বাঁকিয়া যায়। সুতরাং দড়িটি ছাড়িয়া দিলে ধনুটি অপেক্ষাকৃত সোজা হওয়ার শক্তিতে গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়। তারের কাঠামোর মধ্যস্থিত ছোট বৃত্তটিতে গুলিটি লাগিলেই তুষার-হংস্ রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে মনে করা হয়।

মুদী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

সরকারী পাকা রাস্তাটা উত্তর থেকে দক্ষিণে এঁকেবেঁকে কোথায় চলে গেছে—একথা গাঁয়ের প্রবীণরা ভাল ক'রেই জানে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা বহুবার শুনেও আজ পর্য্যন্ত ধারণা ক'রে উঠতে পারেনি যে, ঠিক কোথায় এর শেষ, আর সে কোথায়টা কেমন! কত গরুর গাড়ী ধীরে ধীরে ঐদিকে চলে গেছে, কত মানুষ গেছে! গাঁয়ের পথটা যেখানে পাকা রাস্তায় এসে মিশেছে সেইখানে মুদীর দোকানের দাওয়ায় ব'সে ছেলেরা মুড়িমুড়কী খেতে খেতে এই-সব ভাবে, আর জিজ্ঞাসা করে। মুদী ইচ্ছামত উত্তর দেয়।

মুদীর দোকানঘরের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড বাদামগাছ; লাল্‌চে পাতার ছাতা ধ'রে সে বহুদিন থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

চালাখানা একেবারে বুক পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, নীচু হয়ে ঢুকতে হয়। ভিতরে এলে প্রথমটায় কিছুই চোখে দেখা যায় না, এমনি অন্ধকার। প্রকাণ্ড ঘরটার অন্য কোথাও ফাঁক নেই, শুধু দু'খানা ঝাঁপ, আর চালের মটকার কাছে একটা ফুটো—তাই দিয়ে পয়সার আকারে একটা গোল আলো ঘরের মেঝের উপর থরথর ক'রে কাঁপছে। ক্রমশ সবই চোখ-সওয়া হয়ে আসে। এ-পাশটায় ঝাঁপগুলো দেওয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে। একটা বাঁশের মাচা, তার উপর থলে-ভর্ত্তি চালডাল প্রভৃতি। আড়কাঠ থেকে ঝুলছে পাট, নারকেল দড়ি, পাটের দড়ি, কি কতকগুলো শুকনো লতাগাছ, খানকতক ছেঁড়া চট। এককোণে একতাড়া পাঁকাটি দাঁড় করানো রয়েছে। এসব জিনিষ, পাড়া গাঁ হ'লেও অসময়ে চড়া দামে বিক্রী ক'রে মুদী বেশ দু-পয়সা লাভ করে। এ-পাশে আর একটা বাঁশের মাচা, এর উপর ওর দোকান। মাচার মধ্যেখানে ছিদ্রযুক্ত চৌকি। ছিদ্রের তলায় বেতের বোনা ছোট্ট একটা ধামা পাতা। ছিদ্র দিয়ে এই পাত্রটায় পয়সা এসে পড়ে, বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না রোজ কত বিক্রী হ'ল। লোকের নজরটাকে ওর বড় ভয়। ঐ চৌকিটার চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট মাটির গামলা আর ধামা। চাল ডাল সুজি চিনি আটা ময়দা পোস্ত, এমনি সব কত কি ওতে রয়েছে। ছোলার ডালের গামলার ভিতরকার উপুড়-করা সরাখানা দেখা যাচ্ছে। সরা উপুড় ক'রে তার উপর অল্প জিনিষেই চূড়াকারে সাজাবার ভারি সুবিধে। এমন ক'রে চূড়ো বানিয়ে দোকান সাজালে দেখতেও বেশ পরিষ্কার হয়, খদ্দেরও সন্তুষ্ট হয়, তাই। চৌকির বাঁ-দিকটায় তেলের আয়োজন।

ছোট ছোট ভাঁড়গুলোয় সরষের, নারকেল, আর রেড়ির তেল। সব ভাঁড়গুলোই গায়ে গায়ে ঠেসিয়ে একখানা বারকোষের উপর বসানো। তেল কেনার সময় যা দু-এক ফোঁটা ভাঁড়ের গা বেয়ে কিংবা ফোঁদেলের ছিদ্র বেয়ে কাঠের থালাটায় পড়ে, তা নষ্ট হ'তে পায় না। সাত আটদিন অন্তর, ভাঁড়মোছা কাপড় দিয়ে বারকোষের তেল শুষিয়ে নিয়ে নিংড়ে ভাঁড়ের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সরষে, নারকেল—দুটোই অতি প্রসিদ্ধ এবং হিতকর খাদ্যবস্তু; আর গাব, সে ত ওষুধের শিরোমণি, কাটা ছেঁচা পোড়া, যাতেই দাও না। এই তিন তেলের সংমিশ্রণটা কাজেই মানুষের পক্ষে চরম উপকারী—অন্তত মুদীর এই মত। যা হোক্, এই সংমিশ্রণটা কোন্ তেলের ভাঁড়ে নিংড়াবে, এসম্বন্ধেও যথেষ্ট ভেবেছে।—রেড়ির তেলের ভাঁড়ে যদি দেয়, তাহ'লে পিদ্দিম যদিও বা কোনো রকমে জ্বলে কিন্তু কাটা ছেঁচা পোড়ার পক্ষে ও-তেল তখন আর কোনো কাজেই লাগবে না। উপরন্তু ও-তেলে জোলাপের কাজ চলবেই না। তারপর যদি নারকেল তেলের ভাঁড়ে দেয় ত, ও-তেলে আর লুচি ভাজা চলবে না। মাথায় মাখলে মাথা চট্‌চটে আঠার মত হয়, দুর্গন্ধ হয়; ঝড়ঝাপটের দিন আর রক্ষে নেই, ধুলোয় মাথা ভর্ত্তি, যতই ধোয়ামোছা কর, যাবে না সহজে। চুলে চুলে জটা পাকিয়ে যায়। কত অসুবিধে। কিন্তু সরষের তেলের ভাঁড়ে দিলে—ও তার একটা মাত্র উত্তর দেয়,—ও-তেল ত অগ্নিশুদ্ধি ক'রে তবে খাবে, কোন দোষ নেই। তবে সত্যিকথাটা সে সবাইকে বলে না। সে হ'ল এই,—সরষের তেলটার ঝাঁঝ অন্য তেলের চেয়ে বেশী, কাজেই কেউ সহজে ধরতে পারে না। অন্য তেলে মিশালে ধরা পড়বার আশঙ্কা বেশী। আর তা ছাড়া, ওটা মিশালে সরষের তেলটা বেশ গাঢ় হয়, ওজনে বাড়ে, কাজেই খুব লাভ।

কাছে ও দূরের গামলা ও ধামার সামগ্রী ওজন করবার জন্যে আন্‌তে হয়। তাই একটা আধখানা নারকেল মালার কাণায় দুটো ছিদ্র ক'রে তাতে বাঁখারির আগাটা সরু ক'রে পরিয়ে নিয়েছে। ঠিক একখানা হাতার মত হয়েছে; ভারি সুবিধে। এদিকে হাতের কাছে কেরোসিন কাঠের অনেকগুলো থাক করেছে। তাতে সব মণিহারী জিনিষ।—পেন্সিল, খাতা, দোয়াত, কালি, আরসি, চিরুণী, মাথার কাঁটা, ফিতে, ঘুন্‌সী, গুলিসুতো, সুচ, ঘুড়ি, তরল আলতা, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, বোধোদয়, ধারাপাত, শ্রুতিলিখন, হাতা, খন্তি, কড়া, চাটু, কাঁচের এবং গালার চুড়ি, শাঁখা নোয়া,গায়েমাখা ও কাপড়কাচা সাবান। ওদিকে পুঁটুলি-বাঁধা কাপড় গামছা। লাল চুড়িপাড়, দাঁতপাড়, পাছাপেড়ে, রং-বেরঙের ডুরে, নীলাম্বরী, কচিকলাপাত রঙের কাপড়ে লাল পাড়, এমনি সব কত রকমের কাপড়। মাচার নীচে আলু ঢালা আছে। অনেকে সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখ গুঁজে ভাল আলু বেছে নিচ্ছে।

মুদী উপর থেকে বলছে, বাছলে দু-আনা, সাপ্টা নিলে ছ-পয়সা। ওরা বলে, হুঁ এই গুঁড়িআলু দু-আনা। চুপ কর বলছি মুঁদীর পো, নইলে তোমার দোকান লুট হয়ে যাবে, তা ব'লে দিচ্ছি।

এ-অঞ্চলে আর দোকান নেই। কাজেই মুদীর এই যথেচ্ছাচার ওরা মুখ বুজে সহ্য করে।

মুদী হেঁকে জিজ্ঞেসা করে, দোকানখানা কারুর বাপ-ঠাকুদ্দার কিনা? আরও কত কি, যা মুখে আসে তাই বলে ও গায়ের ঝাল মেটায়। নিজের কাজে মন দিতে ওর বেশী সময় লাগে না।

শীর্ণ মুখখানার উপর ধনুকের মত বাঁকা পিতলের চশমা। দুটো হাতলই তার ভেঙে গেছে। কিন্তু তাতে ওর যায়-আসে না, সুতো বেঁধে নিয়েছে। সুতোটা কানের উপর দিয়ে মাথার পিছন দিকে বাঁধা। কেবল কাজের সময় সে চশমা নামিয়ে নাকের ডগায় আনে, নইলে ওটা হয় কপালে আর না-হয় মাথার উপর তোলা থাকে।

মুদী অকস্মাৎ একটা ধমক দিয়ে বল্লে,—ঝোড়ো, পয়সা-কড়ি দিবি, না আমার সর্ব্বনাশ করবি, তাই বল্ দেখি।

একখানা খাতা কোথা থেকে টেনে বার করলে। বালির কাগজ, খেরোর মলাট, মুদীর পো নিজের হাতে আটা দিয়ে জুড়ে নিয়েচে। খাতাখানার একটা কোণ

উপ্‌ড়ে নিয়ে গেছে,—এমনি তার দুঃখ। ধারের অনেকগুলো টাকার হিসেবটাতেই হতভাগা ইঁদুর পেট ভরিয়েছে। কাজেই ও বাকী টাকাটার উপর মনপ্রাণ বসিয়ে রেখেছে।

ঝোড়ো উত্তর দিলে,—খুড়ো, তোমার অন্নেই পিবৃতি-পাঙ্গন, আর দুটো দিন সবুর কর না, তোমার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে যা লিচু জামরুল গোলাপজাম ধরেছে গাছ-ক'টায়, উঃ কি ব'লব। তোমার পয়সা আগে দিয়ে তবে ফল-বেচার পয়সা ঘরে তুলব, দেখো। তুমি না থাক্‌লে ঝড়ু মোড়লকে এদ্দিন ভাগাড়ে পচে মরতে হ'ত। শেয়াল শুকুনীতে মাংস খুব্‌লে খেত।

মুদী সশব্দে হরিধ্বনি ক'রে জিব কেটে বল্‌লে,—দ্যাখ্‌ লক্ষ্মীছাড়া, ক'টা টাকার জন্যে হিঁদুর সন্তান হয়ে অমন দুর্ব্বাক্য খবদ্দার উচ্চারণ করিসনি বলছি, নরকেও স্থান হবে না তাহ'লে। কি তোর চাই বল্‌ত? সেই সকাল থেকে ত এসে ব'সে আছিস্‌, দেখ্‌ছি?

ঝোড়ো তাড়াতাড়ি তার গামছার গ্রন্থিটা দেখিয়ে বললে,—এই নিয়ে রেখেচি, খুড়ো, সেরটাক আলু।

খাতায় মন দিয়ে মুদী বললে,—আচ্ছা যা, কিন্তু এই শেষবার যেন মনে থাকে। সব পয়সা মিটিয়ে না দিলে আর এক তিল সামগ্রী পাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।

মুদী খাতায় এক সেরের জায়গায় পাচপোর দাম লিখলে। ধারে জিনিষ নিলে ও কিছু চড়া দাম আদায় করে। খদ্দের দাম দিতে এসে বিস্মিত হ'লে মুদী চ'টে গিয়ে হিসাবের খাতাখানা খুলে ধরে। বলে,—দ্যাখ না, এই ত লেখা রয়েচে, আমি কি মিথ্যে বলছি।

নিরক্ষর খদ্দের লেখার পানে চেয়ে থাকে। শেষে মনে করে হবে হয়ত, লেখাপড়ার হিসেব কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু মুদীর সঙ্গে ঝগড়া করতে ছাড়ে না।

ছোট এক টুকরো মিস্রির ডেলা একটা ছেলে মুখে পূরে দিলে, তাও মুদীর দৃষ্টি এড়ালো না। মুদী অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে হাতের নড়ি আছড়ে ওকে গঙ্গার ঘাটে থুয়ে আস্‌তে লাগল। অন্য যারা দাঁড়িয়েছিল তারা মুখে মুখে মুদীকে খুব উৎসাহ দিয়ে উত্তেজিত ক'রে তুললে। মুদী বেচারী একবার মাচার এ-কোণ আবার ও-কোণ ছুটোছুটি ক'রে ছেলেটাকে নাগালে পায় না। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে যত উৎসাহ দিলে হাতে তত কাজ সারলে। কেউ এক মুঠো সুজি, কেউ এক ডেলা মিস্রি, এমনি সব, খয়ের সুপুরী ডাল, যে যার গামছার খুঁটে বেঁধে কোমরের সঙ্গে সেখানা চটপট এমন জড়িয়ে নিলে যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। দৌড়োদৌড়ি ক'রে মুদীর হাঁফ ধরে গেল। চৌকিটার উপর উঠে ব'সে ও ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। শেষে কেনাবেচায় মন দিতে হয়। যে চার পয়সার জিনিষ নিলে সে দিলে একটা পয়সা। কারণ মুদীর হুকুম—ওর অনেক বাকী পড়ে গেছে, আর শুধু হাতে জিনিষ নেওয়া চলবে না। নেপেন চাটুজ্জের মেয়ে তেল নিতে এসেছে। ওর বাবা সদরের মুহুরী, দু-পয়সা পায়।

মেয়ে বল্‌লে,—মুদীজ্যাঠা, আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, বাবা টাকা দিয়েছে জমা ক'রে নাও শিগ্‌গীর, আর আমায় রসিদ দাও।

মুহুরীর মেয়ে সে, ভারি চালাকচতুর।

মুদী লাফিয়ে এসে তার আঁচলের গ্রন্থি খুলে টাকা ক'টা গুণে বাজিয়ে নিল। দু-মুঠো বাতাসা তার কাপড়ের খুটে বেঁধে দিয়ে বললে,—কি করব মা, দেখছিস ত বুড়ো হয়েছি, একটু চলাফেরা করলেই হাঁফিয়ে যাই, তার ওপর ঐ আবাগের ব্যাটা বেজোর ছাবালটা একেবারে চরকিপাক ঘুরোলে, দেখলে ত মা।

মুদীর একান্ত বিশ্বাস এই নেপেন চক্কোত্তির উপর। সে একটা পয়সাও কোনদিন মারবার চেষ্টা করে না।

তেলের বোতলটায় তেল ভর্ত্তি ক'রে দিতে গিয়ে ওর হাতে গড়িয়ে পড়ল। মুদী সেটা গায়ে মাথায় মেখে নিলে। স্নানের সময় ওর আর নতুন ক'রে তেল মাখতে হয় না। সন্ধ্যার পরেও যদি হাতে তেল লেগে যায়, তক্ষুনি সেটা গায়ে মেখে ফেলে,—তাতে মশা কামড়াতে পারে না। কারণ মশা গায়ে বস্‌বামাত্র তেলে পা আটকে যায়। তখন সে হুল ফুটোবার চেয়ে নিজের মুক্তির জন্যে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রক্তশোষণ আর

হয় না, প্রাণপণে পাখা নেড়ে যুঁ-যুঁ-যুঁ ক'রে কাঁদে। মুদী হাসিমুখে মজা দেখে।

অনেকটা বেলা হ'লে ও দোকানের বাইরে এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বেলা অনুমান করে। সূর্য্যের দিকে একবার মাত্র চেয়ে নিয়ে ও যা সময় বলে, ঘড়ির সঙ্গে তার ঠিক মিল হ'য়ে যায়। বেলা একটায় ও দোকানে ধুনো গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে দোকান বন্ধ করে। গামছাটা কাঁধে ফেলে, নারকেল তেলের ভাঁড় থেকে একটু তেল নিয়ে মাথায় ঘস্‌তে ঘস্‌তে, ঝাঁপে চাবি লাগিয়ে চলে যায়। একেবারে মিত্তিরদের পুকুরে স্নান সেরে ঘরে খেতে আসে।

মুদী-বউ মুখ ভার ক'রে ভাত বেড়ে দেয়। মুদী গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলে দিতে দিতে ভাবে দোকানের সত্যি উন্নতি হচ্ছে কি না। মনে মনে গত সন আর এ সনের বিক্রি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কার কার কাছে কি কি পাওনা আছে, তার হিসেব করে। এই সব ভাবতে ভাবতে এত অন্যমনস্কভাবে খায় যে ভাত তরকারী পাতে প'ড়ে থাকে, কম ক'রে দিলেও আর চায় না। যা পায় নির্ব্বিবাদে তাই খেয়ে উঠে পড়ে। তরকারীতে বেশী ঝাল দিলেও কথা কয় না, নুন কম হ'লেও চায় না। মুদী-বউ প্রাণপণে তরিতরকারী ভাল ক'রে রাঁধে, কিন্তু এক দিনের জন্যেও মুদীর মুখ থেকে একটা তৃপ্তির কথা শোনে নি। বউয়ের সঙ্গে কোন কথাই ওর কওয়া হয় না। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে মুদী-বউ ঠিক করেছে যে, গায়ে প'ড়ে কথা কইবার দরকার নেই। ছেলে মেয়ে বউ যেন ওর শত্রু। কেন যে, তাও মুদী-বউয়ের মাথায় আসে না—কোনদিনই ত একখানা গয়না কি কাপড়ের জন্যে আব্দার জানায় নি, না সে নিজে, না তার ছেলেমেয়ে। মুদী যা হাতে তুলে দিচ্ছে, তাই ত ওরা হাসিমুখে নিয়ে আস্‌ছে। লোকটার উপর ওর মাঝে মাঝে রাগও হয়, আবার ভয়ও করে। তাই হঠাৎ কিছু বলতেও সাহস হয় না।

ডিবে থেকে দু'টো পান তুলে নিয়ে মুদী তখুনি গামছা কাঁধে ফেলে তাগাদায় বেরোয়। বিশ্রাম করবার ওর সময় নেই। ছেঁড়া ছাতাটা আর একখানা হিসেবের খাতা বগলে চেপে ও গোয়াল-ঘরের দিকে এগোয়। গাধার আকারের একটা লালচে বেতো ঘোড়ার পিঠে চট ও কাঁথার গদি বেঁধে ও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘোরে ঋণের তাগাদায়।

মুদী-বউ দাওয়ার খুঁটি ধ'রে চেয়ে থাকে। কখনও বা একটা দীর্ঘশ্বাস আর কখনও বা বড় বড় ফোঁটার জল ওর চোখ ছাপিয়ে ঝরে পড়ে। এসব কথা ও কাউকে জানায় না। নিজের বেদনা বুকে চেপে রাখে। এমনি ক'রে বউয়ের দিন যায়।

বেলা তিনটেয় মুদী তাগাদা শেষ ক'রে ফেরে। আর বাড়ি যায় না, সোজা একেবারে দোকানে। তাগাদা থেকে ও পায় ধান চাল, চিঁড়ে গুড়, শাকসব্জী, এমনি সব জিনিষ। চাল চিঁড়ে গুড় এ সব মুদী দোকানে রাখে বিক্রি করবার জন্যে। বাকী সব মুদীর মেয়ে বিকেলে এসে ঘোড়া-সুদ্ধ নিয়ে যায়, ঘরখরচের কাজে লাগে। তাগাদায় মুদী পয়সা বড় একটা পায় না। কাজেই হিসেবের খাতায় ত আর থোড় মোচা জমা হ'তে পারে না, কাজেই যে-ঋণ সে-ঋণই থেকে যায়, লাভের মধ্যে মুদীর খাইখরচটা বেঁচে যায়। তবে যে-ব্যাটারা নেহাৎ চামার তারা মুদীর সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে,—কেন খুড়ো, ঐ মোচাডা বাজারে বেচলি পরে নিছক দুডো পয়সা হোতুনি। তাই জমা করে নাও!

মুদী চোখ কপালে তুলে বলে,—বলিস্ কি রে; ঐ মোচাটা দু-পয়সায় বিকোতো! ভাল, তোর মোচা আমি ফেরত দেব। আধ পয়সা দিলেও কেউ নেয় না যে রে! চাষা হেসে বলে,—খুড়ো, মোচা ফিরোবে কেম্‌নে, সে ত খেয়ে ফেলেচো। না না আধলা-টাধলা নয় তুমি একডা পয়সা জমা করে নিও। আর একডা পয়সা তোমায় না হয় খাতি দিলুম।

এমনি ক'রে মুদী আদায়ও করে যত অপরের ঋণও ততই কমে না; মুদীর খাতা ভর্ত্তি হয়। পুরোনো খাতা ছেড়ে নূতনে হিসেব ওঠে, হালখাতার দিনে।

সন্ধ্যার সময় মুদী চৌকো একটা কাঁচের লণ্ঠনের মধ্যে কেরোসিনের আলো জ্বালে। তারপর ধুনো গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে ধুনুচি হাতে একটা তক্তার উপর গণেশের

মূর্ত্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। ধুনুচিটা সেখানে নামিয়ে রেখে ও দু-হাত এক ক'রে চোখ বুজে গণেশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে। তারপর এসে চৌকিতে ব'সে এক ছিলিম তামাক খায়। এই সময়টা ওর একটু তাড়া-হুড়োয় কাটে। সন্ধ্যার সময়ে কাজ থেকে ঘরে ফেরবার পথে সকলেই কেনা-কাটা ক'রে নিয়ে যায় তাই। মাত্র ঘণ্টা-খানেক, তারপর সব ঠাণ্ডা। মুদী শ্রান্ত হয়ে পড়ে। জিনিষ ওজন করা, পয়সার হিসেব, ধারের হিসেব লেখা একহাতে সব ক'রে উঠতে ওর দম বেরিয়ে আসে। উঠে ঘটির জলে মুখ হাত পা ধুয়ে, হাঁড়ির ঢাকা খুলে খানকয়েক বাতাসা আলগোছা মুখে ফেলে দেয়। তারপর একঘটি জল পান করে তবে যেন বুকে জোর পায়। দু-টুকরো কাটা সুপারি গামলা থেকে তুলে মুখে দিয়ে তামাক সাজ্‌তে বসে। তামাকের হাতটা ধুতে-না-ধুতেই সব একে একে আস্‌তে আরম্ভ করে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে নানা সঙ্গীরা সব এই সময়টুকু একটু গল্প-গাছা করবার জন্যে মুদী-খুড়োর ঝাঁপের পাশে এসে বসে। দিনান্তে পাঁচজনের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা না কইতে পেলে মুদীরও প্রাণ বাঁচে না। তাই এই সময়ের তামাকের খরচটা অন্যায় ব'লে ও কোন দিন মনে করে না। খরচও খুব বেশী নয়। দা-কাটা তামাক ও নিজে হাতেই তৈরি ক'রে নেয়। এই সময়টা ওদের কোন দিন গীতাপাঠ হয়, নইলে রামায়ণ মহাভারত, কি বটতলার উপন্যাস, আর তা নইলে দেশ-বিদেশের গল্প। ওদের মধ্যে মুদীই হ'ল জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কাজেই ওর কথা সকলে বেদবাক্যের মত শ্রদ্ধা ক'রে শোনে।

গীতা নিয়ে মুদী অনেক ভেবেছে,—এইভাবে ও তার ব্যাখ্যা করে।—

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, না সঞ্জয়?

ওরা বলে,—শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু মুদীর কাছে ধমক খেয়ে জিজ্ঞেসা করে,—তবে কে?

মুদী বলে,—এই যে, তোর মধ্যে দিয়ে ভগবান কাজ কলাগাছগুলো তুই সেবারে কাটলি ত? তারপর মিথ্যে সাক্ষ্যি দিয়ে গেলি জেলে! তারপর দেখ, চাষ-আবাদ করচিস, ভাল মানুষ হয়ে গেছিস, বিয়ে-থা করেছিস—দিনরাত্তির হে হরি হে হরি করছিস্ ত?—কিন্তু এসব এতদিন ধ'রে তোকে সেই জগদীশ্বর করাচ্ছেন, তা বুঝতে পারিস্? তেমনি সঞ্জয় হ'লেন দেবতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে দেখ না যুদ্ধ করিয়ে ছারখার করিয়ে দিলেন, আবার ষোল হাজার গোপিনীর সঙ্গে বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে দিলেন। অথচ দেখ, সেই শ্রীকৃষ্ণই কিনা সমস্ত গীতা বইখানা ভর্ত্তি ক'রে কেবল, হে সঞ্জয়, হে সঞ্জয় ক'রেই গেলেন। মিলিয়ে দেখ, তুই ঠিক তেমনি ক'রে হে হরি, হে মধুসূদন করিস কি না! ভাল ক'রে মন দিয়ে মিলিয়ে দেখ,—তোর যত কীর্ত্তিকলাপ, সবই আমরা জানি ত, কিন্তু যে-ভগবানকে তুই ডাকিস্ তাঁর কোন খবর তুই জেনেচিস্? তা কেউ পারে না! ঠিক তেমনি, শ্রীকৃষ্ণের যত কিছু লীলা সবই আমরা জানি ত, কিন্তু সঞ্জয়ের কিছু জানি কি? বল তোরা!

ওরা সবাই সভয়ে মাথা নেড়ে বলে,—না জানিনে।

মুদী আত্মগর্ব্বে স্ফীত হয়ে বলে,—কি ক'রে আর জান্‌বি বল,—চিরটা কালই মুকখু হয়ে রইলি বইত নয়!

ওরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঠাকুর না হবে তাহ'লে সবাই পূজো ক'রে কেন?

মুদী বলে,—নয় কে বললে? ঠাকুর বইকি।

উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার ক'রে বলে,—কিন্তু ছোট ঠাকুর, বড় হ'লেন সঞ্জয়। কেষ্টোর পূজো আমার শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি সঞ্জয়ের পূজো করি। তেত্রিশ কোটি দেবতা, সকলকেই ত একে একে মান্‌তে হবে, তোদের মত শুধু দু-দশ ঠাকুর আঁকড়ে সারা জীবনটা পড়ে থাক্‌লে ত চলবে না।—এটাকে মুদীর একটা গবেষণা বলা যেতে পারে।

যে-দিন রামায়ণ পড়া হয় সে ত মুদীর পক্ষে একটা শুভদিন। রামায়ণ পড়তে পড়তে সমুদ্রের এবং সেতুবন্ধের জন্যে যে-সব পাথর এখনও সেখানে জমা করা পড়ে আছে তার বর্ণনা দেয়। ও

বাপের তহবিল ভেঙে লম্বা দিয়েছিল। অনেক ঘুরতে ঘুরতে ও গিয়ে পড়েছিল ওয়ালটেয়ার। ও এখানে পৌঁছে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কাঁড়ি কাঁড়ি পাথরের ঢিবি, সমুদ্রের নীল জল তার উপর মানুষগুলো এবং তাদের ভাষা। বহু পর্য্যালোচনা ক'রে ও স্থির করেছে, এরা নিশ্চয়ই তখনকার লোক এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় সবই জানে। এদের সঙ্গে ওর আলাপ করবার বিশেষ আগ্রহ জন্মাল। কতভাবে কত প্রশ্ন ক'রে পাথর আর নীল জলের খবর পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য কড়্মড়ে ভাষায় ওর ধারণা নিশ্চিত হ'ল যে, এইখান থেকেই সেতুবন্ধ আরম্ভ হয়েছিল, কালে কালে ভেঙে চুরে এইমাত্র অবশিষ্ট আছে।—এই কথাটা যতই পুরনো হ'ত ততবার একটু ক'রে রঙ লাগিয়ে নিত। এমনি বহুদিন রঙ লাগাবার পর শোনা গেল যে, যে-মানুষদের ও সমুদ্রের ধারে দেখে এসেছে তারা কিচ্‌মিচ্‌ করে আর তাদের বিঘৎখানেক লেজও বর্ত্তমান। শ্রোতারা ভাবে গদগদ হয়ে মুদীকেই বার-বার প্রণাম ক'রে ফেলে। এমনি ক'রে রাত ন'টার গাড়ী যাওয়ার শব্দ শুন্‌তে না-পাওয়া পর্য্যন্ত ওদের আসর ভাঙ্‌ত না।

মুদী-বউ ছেলেমেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, সে অনেকক্ষণ হ'ল। দাওয়ার অন্ধকারে পা ছড়িয়ে ব'সে সে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার ফালি পায়ের উপর পেতে স'লতে পাকাচ্ছে। আর কত কি ভাবছে অন্ধকারের পানে চেয়ে। সলতে পাকানো ওর শেষ হয়ে যায় তবুও মুদী ফেরে না। বউ দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আকাশের তারাগুলোর পানে চেয়ে রইল। তারও কতক্ষণ পরে মুদী এল। বউ ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে জলের ঘটি এগিয়ে দিলে, গামছা হাতে তুলে দিলে, পিঁড়ে পেতে তার সুমুখে জল ছিটোলে; তারপর ভাত বেড়ে আনলে।

মুদী ভাত খেতে খেতেও ভাবছে, কত পয়সা জম্‌ল! কোন্ কোন্ জমি কিন্‌বে, কটা গরু কিন্‌বে। মনে মনে হিসেব করলে মেয়েটার বিয়েতে কত অবধি খরচ করবে, তাকে গৌরীদান করবে, না বেশী বয়সে বিয়ে দেবে। এমনি সব কত কি। কাজেই খাওয়ার সময়টা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ।

বউও মুদীর এই রকম ভাবগতিক দেখে মনে মনে কষ্ট পেয়ে চুপ হয়ে গেছে। কোন কথাই সে নিজে থেকে কয় না।

খাওয়ার পরও মুদী তেমনি যন্ত্রের মত দুটো পান তুলে মুখে দিলে। তারপর ভুষোমাখা লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে, লাঠিটা বগলে চেপে ও আবার বেরিয়ে পড়ল। রাত্তিরটা ওকে দোকানেই শুতে হয়, নইলে জিনিষপত্র চুরি যাবার ভয়।

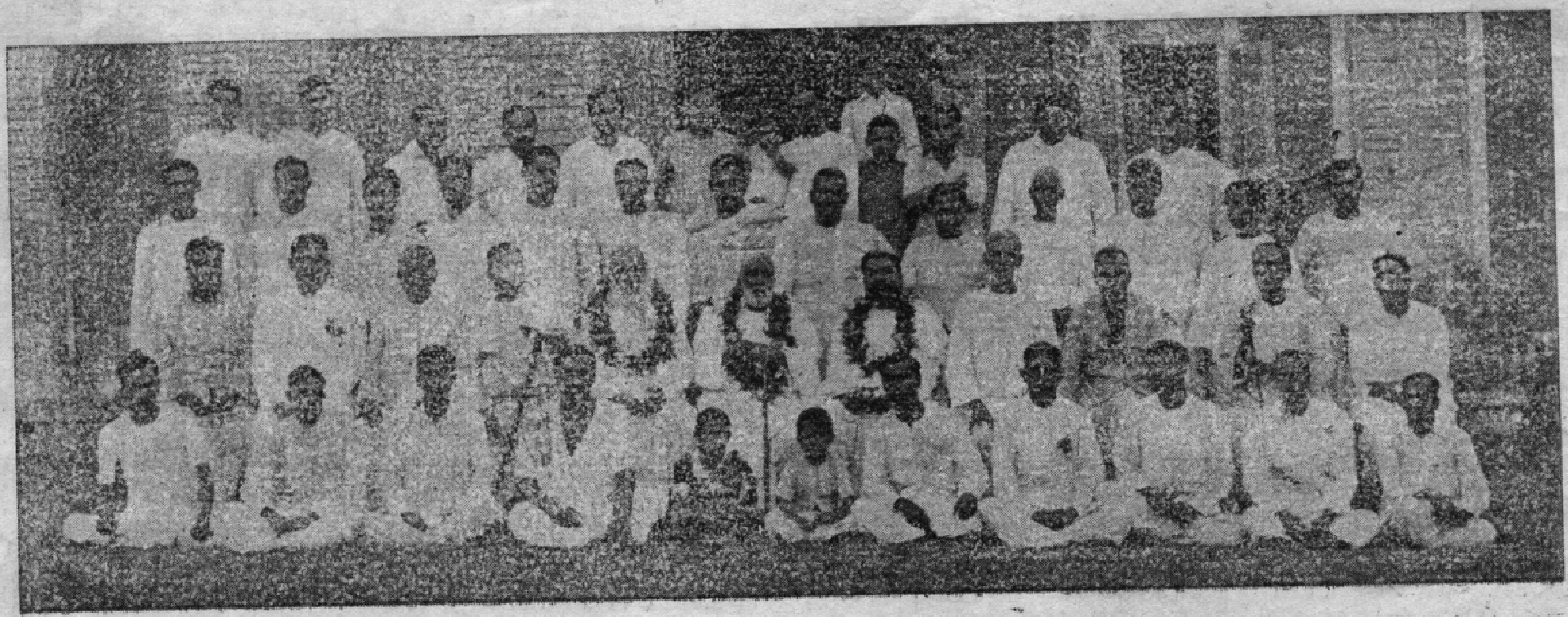
বউ পিছনে পিছনে এল, দরজা বন্ধ করতে। দরজার গায়ে গা রেখে ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলে মুদী চলে যাচ্ছে। এক একবার মনে হয়, ডাকি। কিন্তু ডাক আর কিছুতেই গলা দিয়ে বার হয় না। গাছের আড়াল থেকে আড়ালে যেতে যেতে শেষে মুদীর আলো আর দেখা যায় না। তবুও বউ ওইদিকে চেয়ে রইল। চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা নাম্‌ল, কিন্তু ঝরে পড়ল না। গণ্ডের উপর স্থির হয়ে রইল, তাতে তারার আলো ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল।



বাংলা

জলধর সম্বর্দ্ধনা—

ব্যাটরা পারিজাত সমাজের সাহিত্য সংসদের সংক্রান্তি মিলনের ১১৯ ও ১২০ সংখ্যক বৈঠকে সমাজের অন্যতম সম্মানিত সভ্য ও প্রবীণ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩১এ চৈত্র, ১৩৩৮ (১৩ এপ্রেল) হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডস্থ "দত্ত-ভিলায়" (সমাজ ভবনে) অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় "জলধর জয়ন্তী" উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। হাওড়া ও কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজের পক্ষ হইতে সেন-মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও গিরিজাকুমার বসু জলধর-প্রশস্তি পাঠ করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে জলধর-বাবু যথোচিত বিনয় সহকারে নিজের বক্তব্য বলেন। তার মধ্যে সকলের চেয়ে বড় কথা এই—



জলধর-সম্বর্দ্ধনা

"এতদিন আমি সাহিত্যিকদের দাস-গিরি করিতেছি—তার জন্যে আমি খুব বড় উপাধি পেয়েছি—সেই উপাধি হ'চ্ছে "দাদা" উপাধি—এই স্নেহের উপাধি বহন ক'রে যাবার চাইতে কোন বড় সম্বর্দ্ধনা আছে কি-না আমি জানি না। তবে পারিজাত সমাজের এই ভালবাসা, এই অনুগ্রহ, যা' তাঁরা আমার ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য দেখালেন—সে সকল আমি পরপারে যাবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় ব'লেই মনে ক'রব।"

ইহার পর ভূপাল বাবুর আবৃত্তি, কালিপদ পাঠক মহাশয়ের সঙ্গীত, মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসকৌতুক, ও ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বেহালা-বাদ্য উৎসবটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সর্ব্বশেষে রামানন্দ-বাবু অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন ঃ—

"সেন-মহাশয় অনেকদিন সাহিত্য চর্চ্চা ক'রছেন। যদিও আমার সম্পাদকী ৪০ বৎসরের উপর—আমি দেখ্‌তে প্রবীণ তথাপি সেন-মহাশয়ের চাইতে আমি ৫।৬ বছরের ছোট। উনি যখন লিখ্‌ছেন তখন আমরা পাঠক। প্রথম 'হিমালয়' ভ্রমণে ওঁর চড়াই উত্‌রাই দেখে আমাদেরও ঐ রকম adventure করবার ইচ্ছা হ'য়ে ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ হ'য়ে ওঠে নি। সাহিত্যের আসরে নেমে উনি অনেক কিছু লিখেছেন। সেন-মহাশয় যা করেছেন সাহিত্যিক হিসাবে অনেকেই তাঁর মত কিছুই ক'রতে পারেন নি। আমার লেখার মধ্যে সকলেই জানেন, ঐ জীর্ণ সচিত্র প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগ। আজ এই উৎসবে রসকৌতুকে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগের পালাগান হ'য়ে গেছে। কালে হয়ত আমার ঐ সচিত্র প্রথম আর দ্বিতীয়ভাগের পালা গান রচনা হবে। সেন-মহাশয় তাঁর সরল হৃদয়ের পরিচয় গুণে "দাদা" ব'লে পরিচিত হ'য়ে আছেন—এই রকম সম্মান লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? তিনি এই দাদা উপাধির জন্য যেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সেটি তাঁর হৃদয়ের পরিচয়। এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ তিনি লাভ ক'রেছেন হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের জোরে—যা অনেক মানুষের ভেতর নেই। এই বিশেষত্বের জন্য তিনি সকলের প্রীতি ও সম্বর্দ্ধনার পাত্র। আমি যেমন পূর্ব্বে শিক্ষক ছিলেম সেন-মহাশয়ও তদ্রূপ ছিলেন। উনি কাগজ চালনা করছেন, আমিও ক'রছি, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়ে তাঁর মত আমি কিছুই ক'রে উঠতে পারি নি।"

অসবর্ণ বিবাহ সভা—

গত ২৫এ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতা আর্য্য-সমাজ

মন্দিরে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা"। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ এম-এ, এবং শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ জীবনের বহু অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়—

১। "শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতিকে হ্রাস ও বিলোপ হইতে রক্ষা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা হিন্দুসমাজের মধ্যে নির্বাধায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।"

২। "হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য একটি অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "প্রবাসী" সম্পাদক; সহ-সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, "সঞ্জীবনী" সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বসু এম, এল, সি; সম্পাদক—ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসু এম, বি; সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল।

এই অসবর্ণ বিবাহ সমিতির কার্য্যালয়, ৩৮ নং বিডন রো, কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে।

বোধনা সমিতি—

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট-মহাশয় একটি সমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপরিণত মনোবৃত্তিবিশিষ্ট বালক-বালিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষক, সেবিকা ও শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে আশ্রমে রাখিয়া ইহাদের মানসিক ও দৈহিক সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার 'বোধনা-সমিতি' নামকরণ করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের সুপ্ত চেতনার উদ্বোধনই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় এই নামটি সার্থক হইয়াছে। বোধনা-সমিতি ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুযায়ী রেজিষ্টারি করা হইবে। সমিতির আপিস ভবানীপুর ৬।৫, বিজয় মুখার্জ্জী লেনে স্থিত। গিরিজাবাবু ইহার সম্পাদক। তাঁহার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিলে ইহার সম্বন্ধে সম্যক জানা যাইবে। নিম্নের ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; সহঃ সভাপতি—ডাঃ এডিথ ঘোষ, এম্-বি, ডাঃ কে-এস্ রায়, এম্-এ, বি-এস্‌সি, এম্-বি, পি-এইচ-ডি (এডিন), এবং ডাঃ বি-সি ঘোষ, এম্-এ, এম্ এ, বি-সি (ক্যান্টাব); সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ—মূক ও বধির বিদ্যালয়, শ্রীমতী সীতা দেবী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

সুনীতি সঙ্ঘ—

অসৎ সাহিত্য, এবং মনের বৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে এরূপ নৃত্য, অভিনয়, বায়স্কোপাদির প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সুনীতি সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা লইয়া এই সঙ্ঘের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; সহঃ সভাপতি—শ্রীমতী কামিনী রায়, রায় বাহাদুর জলধর সেন, মৌলবী মুজিবর রহমান, শ্রীযুক্ত জে-কে বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ইহার যুগ্ম সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহঃ সম্পাদক। সঙ্ঘের ঠিকানা—৬ রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলিকাতা।

সুনীতি সঙ্ঘের এই সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক ইহাই একান্ত কামনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পরীক্ষায় মহিলাগণের কৃতিত্ব—

ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে এ বৎসর ১৩ জন ছাত্রী পাশ করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, পরীক্ষায় ৪ জন ছাত্রী এ বৎসর পাশ করিয়াছেন।

কুমারী করুণাকণা গুপ্তা ইতিহাসের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী অশোকা সেন সংস্কৃত অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়াছেন।

কুমারী সুলেখা সেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী সাধারণ ভাবে বি-এ. পাশ করিয়াছেন।

বাঙালী মেয়ের কৃতিত্ব—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী রমলা দে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ—

ঢাকার দিঘলী-নিবাসী শ্রীযুত জানকীনাথ কুণ্ড মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শিল্পাশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুত যদুনাথ কুণ্ডের সহিত কোতলী-নিবাসী শ্রীযুত শ্যামলাল পালের বিধবা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর শুভবিবাহ গত ১৯এ বৈশাখ সোমবার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহ তাজপুর (বিক্রমপুর) নিবাসী শ্রীযুত রজনীমোহন ও রাধাবল্লভ সরকার মহাশয়দের বাড়িতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুত শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন। আবিরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ নন্দী মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহে স্থানীয় এবং লৌহজঙ্গের অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। লৌহজঙ্গের তিলি সমাজে বিধবাবিবাহ এই প্রথম।

বাঙালীর কারাবরণ—

প্রকাশ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গত জানুয়ারি হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাংলা দেশে ৯,৫৩৩ জন নরনারী কারাবরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী আছেন ৫,৩২২ জন। কলিকাতায় ৮৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী ধৃত হইয়াছেন।

বিদেশ

লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলনী—

গত ১৯২১ সনে লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য সম্মিলিনী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কিছুকাল পরে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাবে উহা লুপ্ত হইয়া যায়। পরে ১৯২৮ ইংরেজীর ১৮ই মার্চ্চ গাওয়ার ষ্ট্রীট ছাত্রাবাসে



লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ

শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি করিয়া বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

সম্মিলনীর উদ্দেশ্য বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয়দের জন্য বাংলায় বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার এবং প্রাঞ্জল ভাবে কথা বলিবার উৎসাহ দান এবং সুযোগ বিধান। এই সম্মিলনীতে প্রাদেশিকতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গোড়ায় সম্মিলনীর প্রায় অধিবেশনই ১১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হইত। নানা কারণে সম্মিলনী সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার পর সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ একটি স্থায়ী জায়গা পায়। সেখানে ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩০ সনের ২৯এ জুন।

উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে সম্মিলনীর কার্য্য বিস্তার লাভ করিয়াছে। সম্মিলনীর অন্তর্ভুক্ত দুইটি শাখা সমিতি আছে—পরিভ্রমণ সমিতি ও উৎসব সমিতি। বাংলা সমিতির উদ্যোগে একটি বাংলা পুস্তকের গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে—ইতিমধ্যে প্রায় এক শত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

সম্মিলনী এই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত চার বৎসর ইহার উদ্যোগে নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। পরিভ্রমণ সমিতির উদ্যোগে নানা জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা ও উৎসব সমিতির উদ্যোগে মুক্তধারা, বিরিঞ্চিবাবা, আনন্দমঠ ও বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় ও কয়েকবার প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হয়।

প্রতি বৎসর অন্তে সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

গত জুন মাসে সম্মিলনীর উদ্যোগে আনন্দমঠ ও বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। অক্টোবর মাসে মহা সমারোহে বিজয়ার প্রীতি মিলনোৎসব সম্পন্ন হয়। গত ডিসেম্বরে বাংলার নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়কে লইয়া একটি প্রীতি ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গত বৎসরে সম্মিলনীর উদ্যোগে পনরটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে নানা বিষয়ে আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ, সদ্যবক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

সম্মিলনীর চতুর্থ জন্মোৎসবে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রায়, শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া, শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ সরকার ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল শিকদার বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রীযুক্ত রণজিৎ সেন গানের ব্যবস্থা করিয়া উৎসবের অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশে ভারতবাসীর সংখ্যা—

	লোকসংখ্যা সেন্সাসের	বৎসর
সিংহল*	৯৫৯০০০	১৯২৯
বৃটিশ মালয়	৭০০০০০	১৯২৯
হংকং	২৫৫৫	১৯১১
মরিসাস্	২৮১০২৫	১৯২৮
সিলিনিস্	৩৩২	১৯১১
জিব্রাল্টার	৫০	১৯২০
নাইগেরিয়া	১০০	১৯২০
কেনিয়া	২৬৭৫৯	১৯২০
উগণ্ডা	১ ৬১৩	১৯২৬
নিয়াসাল্যাণ্ড	৫১৫	১৯২১
জাঞ্জিবার	১২৮৪১	১৯২১
টাঙ্গানিইকা	১৮৪৮৩	১৯২৭
জামাইকা	১৭৬৭১	১৯২৮
ট্রিনিডাড	১৩০৫৪২	১৯২৯
ব্রটিশ গায়ানা	১২৮২০৯	১৯২৯
ফিজিদ্বীপপুঞ্জ	৬৮৭৩৩৩	১৯২১
বাসুটোল্যাণ্ড	১৮৬	১৯১১
রোডেসিয়া	১৩০৬ (এসিয়াবাসী)	১৯২১
ক্যানাডা	১২০০	১৯২৩
অষ্ট্রেলেসিয়া	২৬০৬	১৯২১
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৬১৩৩৯	১৯২১
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩১৭৫ (এসিয়াবাসী*)	১৯১৬
ম্যাডাগাস্কার	৫২৭২	১৯১৭
রিইউনিয়ন	২১৯৪	১৯২১
ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৫০,০০০	১৯২০
সুরিনাম	৩৪৯৫৭	১৯২০
মোজাম্বিক্	১১০০ (এসিয়াবাসী)	১৯২২
পারস্য	৩৮২৭	১৯২২

*-এই অঙ্ক ঠিক নহে, কারণ ভারতীয় গদর-দলেই ৩০০০ জন সভ্য আছে।

—

ভারতবর্ষ

দান—

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী সার দোরাব টাটা তিন কোটি টাকার সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল লোক দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইবে, তাহাদিগকে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রকারে সাহায্য করা এই দানের উদ্দেশ্য। আরও প্রকাশ যে ঐ তিন কোটি টাকা ব্যতীত সার দোরাব পৃথিবীর যে-কোন-স্থানে অনারোগ্য ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে গবেষণারবৃত্তির জন্য আরও পঁচিশ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন।

ডাক-বিভাগে সরকারের ক্ষতি—

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩০-৩১ সনের রিপোর্টে প্রকাশ, এই বৎসর এই বিভাগে গবর্ণমেণ্টের মোট ৬২ লক্ষ ৯ হাজার ২১২ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে এই বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ২১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৩, টাকা ক্ষতি হইয়াছিল।

ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন—

বিগত জানুয়ারী হইতে ২০এ এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারত সরকার ৮০ হাজারের উপর লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫,৩২৫ জন মহিলা আছেন। বর্ত্তমান আন্দোলনে এই পর্য্যন্ত মোট ১৬৩টি সংবাদ পত্র ও ছাপাখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

২

অজয় পলাইতেছে।

জীবনে আরও অনেকবার সে পলাইয়াছে, কিন্তু আজিকার যে ভয়াবহতা সে-রকম কিছুর সঙ্গে এই চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনে ইতিপূর্ব্বে তাহার আর পরিচয় হয় নাই।

সে পলাইতেছে, কিন্তু তাহার অন্তরে মাধুর্য্যের স্পর্শ। নিশান্ধকার, মেঘহীন আকাশে অগণিত নক্ষত্রের স্পন্দন, নদীতীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তরের কুয়াসা-মণ্ডিত নিস্তব্ধতা, সবকিছু যেন কোন্ জন্মান্তর-পরিচয়ের ভাষায় তাহার সঙ্গে আজ কথা কহিতেছে। সে-ভাষা সে বুঝিতেছে না, কিন্তু তাহার হৃদয় সাড়া দিতেছে।

আজিকার এই মধুর ভয়াবহতার পশ্চাতে এক রূপসী অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণী। সে যে সত্যই রূপসী অজয় তাহা নিশ্চয় করিয়া জানে না, কেন-না রাত্রির অন্ধকারেই তাহার সঙ্গে অজয়ের আজ অস্ফুট দৃষ্টিবিনিময় হইয়াছে এবং তারপর হইতে অন্ধকার ভাল করিয়া আর কাটে নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তর বলিতেছে, তরুণীর রূপের তুলনা নাই। শেষরাত্রির দিকে চাঁদ উঠিলে জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া অপরিচিতার মুখখানি

কেমন তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে, এই আশা প্রথম হইতেই তাহার মনে ছিল, কিন্তু চাঁদ উঠিতে বহু বিলম্ব আছে বুঝিতে, পারিয়া সে আর ততক্ষণ অপেক্ষা করে নাই। একসার তোরঙ স্যুটকেস খাবারের-টিন ও হাঁড়িপুঁটুলির প্রাচীরের ও-পারে অপরিচিতা অস্পষ্টতার পায়ে তাহার তরুণ-মনের পূজা-নিবেদন প্রায় উজাড় করিয়াই ঢালিয়া দিয়াছে।

জাহাজে যতক্ষণ আসিতেছিল, একবার ভুলেও ভাবে নাই যে, মাধুর্য্যের অবলম্বন তাহার এত কাছাকাছি কোথাও কিছু আছে। বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে বিলাত যাওয়া সম্পর্কে দুই দিন ধরিয়া বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করিয়া তাহার মন তিক্তবিরক্ত হইয়া ছিল, এমন অবস্থা তাহার ছিল না যে চতুষ্পার্শে বিস্তৃত পল্লীপ্রকৃতির অজস্র অকুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য হইতে কণামাত্র নিজের মনের জন্ম আহরণ করিতে পারে। কিন্তু কোন্ অপরিচিত রহস্যলোক হইতে এই যে সৌন্দর্য্যের-দূত আজ তাহার হৃদয়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, এ ত বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুমতির অপেক্ষা করে নাই, নিজের অধিকারকে প্রচার করিবার সঙ্গেসঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

আর-কিছু ভাবিতে ইচ্ছা করিতেছে না, তবু বিগত-সন্ধ্যার সেই মহা-উত্তেজনার মুহূর্ত্ত-ক'টা পলায়নপর অজয়ের মনে পড়িয়া গেল।···জাহাজের গতিবেগের স্পন্দনের সঙ্গে শিরায় শোণিত-স্রোতের স্পন্দন অলক্ষ্যে কখন সমতালে মিশিয়া গিয়াছে।···সহসা কোথাও-কিছু-নাই, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, সেইসঙ্গে জাহাজের গতি এবং শিরাতে রক্তগতি সমস্বরে একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িয়া থামিয়া গেল। তারপর বহুকণ্ঠের চীৎকার-চেঁচামেচি, "দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনি,"···শিশুদের ক্রন্দন, নারীদের কোলাহল। ভয়ার্ত্ত যাত্রীদের ক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যকে কতকটা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে দোতলার ডেক হইতে একতলায় নামিবার সব-ক'টা সিঁড়িকে খালাসীরা কাছি জড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপর নিজেরা সারেঙের [illegible] কখনও একতলায়, কখনও দোতলায়, কখনও বা দোতলার ছাতে, কাছি-রেলিং-রেলিঙের-থাম বাহিয়া, লাফাইয়া, ঝুলিয়া, দ্রুতগতিতে ছুটিয়া ছিটকাইয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ-শিশুবৃদ্ধ যে-ই পড়িতেছে তাহাকে কঠোরহস্তে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

অজয়ের গলার কাছটা শুকাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সহজেই সমস্তকিছু হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্কেত ছেলেবেলা হইতে তাহার আয়ত্ত ছিল বলিয়া কিছুই তাহার চোখ এড়াইয়া যাইতেছিল না। যে স্থূলদেহ প্রৌঢ়টিকে পরে সে তরুণীর সহযাত্রী বলিয়া বুঝিয়াছে তিনি অতি কাতরস্বরে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে সারেঙের পিছন পিছন ঘুরিতেছিলেন, বারবার তাহার পথে পড়িয়া তাহার কাছে তাড়া খাইতেছিলেন, তবু তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছিলেন না। তরুণীর সহযাত্রিণী রূপবতী মহিলাটিকে সে পলকের মত একবার প্রথমশ্রেণীর ডেকের রেলিঙের কাছে দেখিয়াছিল, মনে পড়িতেছে। তরুণী তখন কি করিতেছিল, কে জানে? এমন আকস্মিক একটা দুর্ঘটনাও কি এক মুহূর্ত্ত তাহাকে চঞ্চল করে নাই? কি ঘটিয়াছে সংবাদ লইবার জন্যও ত সে একবার বাহিরে আসিতে পারিত। তখন প্রচুর আলো ছিল, তাহার মুখখানি কেমন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও পলকের মত অজয় তাহা হইলে দেখিয়া লইতে পারিত।

মজ্জিত বালুচরে ঠেকিয়া জাহাজ প্রায় উল্‌টিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। যাত্রীদের বহুভাগ্যবলে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয় নাই, কেবল বিপরীত পথযাত্রী আর-একটা জাহাজের কয়েকঘণ্টাব্যাপী টানাটানির ফলে বালুচর ছাড়িয়া সে যখন গভীরতর জলে নামিয়া আসিল তখন দেখা গেল একদিক্‌কার চাকা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া সে-যাত্রার মত সে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া কলকব্জাও কোথাও কোথাও বিগ্‌ড়াইয়াছে। নিকটতম ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোনোগতিকে জল কাটিয়া আসিয়া যাত্রীদের সে নামাইয়া দিয়া গেল, তারপর কাৎ-হইয়া-পড়া বিপুলাকার দেহটাকে টানিয়া

লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি সন্তর্পণে খিদিরপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

নদীতীরে খোলা আকাশের নীচে বিচিত্রবর্ণের সতরঞ্চের উপর শাদা ধবধবে চাদর বিছাইয়া উত্তেজনা-ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় অদূরবর্ত্তিনী সেই সুন্দরী অপরিচিতা অষ্টাদশী প্রথম অজয়ের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। মাঝখানে মাত্র কয়েক-হাত জমি এবং কতকগুলি স্তূপাকার জিনিষপত্রের প্রাচীরের ব্যবধান। অজয়ের দুর্ব্বল অপরিণত দেহে সে সাধ্য ছিল না যে, গুরুভার ট্রাঙ্ক্-সুটকেস্ ইত্যাদি টানাটানি করিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারে। অত রাত্রিতে সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে মুটের সাহায্যও মিলিত না। অগত্যা খালাসীরা যেখানে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেইখানেই সে রহিয়া গেল। জিনিষপত্র সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া বিছানাটা লইয়া সরিয়া যাওয়া যাইত, কিন্তু কি-কারণে সে-কথা তখন তাহার মনে হয় নাই।

ঘুমাইবার চেষ্টা সে সত্যসত্যই করিয়াছিল; কিন্তু অপরিচিত স্থানে অনভ্যস্ত আবেষ্টনের মধ্যে সহজে চোখে ঘুম আসে না। তাহার শিয়রের দিকে কয়েক গজ দূরে অপরিচিতার সহযাত্রী স্থূলদেহ সেই প্রৌঢ় নিশ্চিন্ত আরামে নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। সেদিক্কার বহুক্রোশব্যাপী সমতলতার মধ্যে তাঁহার শরীরের স্তূপটি যেন একটি বিশিষ্ট বিপুলতা অর্জ্জন করিয়াছিল। কেন যে অনেকক্ষণ সেদিক্ হইতে সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, জানে না।—অপরদিকে তরুণীর সহযাত্রিণী গায়ে মাথায় কাপড় চাপা দিয়া তরুণীর পাশেই জড়সড় হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আশেপাশে অন্য যাত্রীরা দলে দলে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে নারীও অনেক ছিলেন। কেবল সেই তরুণী একাকী দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া নিঃস্পন্দ হইয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল। সেদিকে চাহিতে অজয়ের সঙ্কোচের অবধি ছিল না, কিন্তু ভাল করিয়া না চাহিয়াও সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, অবারিত আকাশের নীচে অপরিচিত-সমাবেশের মধ্যে নিদ্রার অতি-অন্তরঙ্গতার আরাধনা করিতে তরুণীর লজ্জায় বাধিতেছে। এমন অবস্থায় পড়িলে বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাই পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্রের আশ্রয়ে সম্ভ্রমরক্ষা করিয়া অকাতরে নিদ্রা গিয়া থাকেন, তাই অপরিচিতার আজিকার এই বিশিষ্ট আচরণ তাহার প্রতি অজয়ের মনে অনেকখানি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিল। তরুণী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে আর সে পাশে পড়িয়া ঘুমাইবে ইহা তাহার কেমন যেন সম্ভব মনে হইল না। সে না-ঘুমাইলে তরুণীর নিশাজাগরণের ক্লেশের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না জানিয়াও সে সমস্ত রাত জাগিয়াই কাটাইবে স্থির করিল। পাছে অনবধানতায় নিদ্রাকর্ষণ হয় এই ভয়ে একবার বালিশের ভর ছাড়িয়া বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তরুণী অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইলে না-জানি কি মনে করিবে ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আবার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তন্দ্রাঘন নিশান্ধকারে কি জাদু আছে, তাহার স্পর্শ দুঃসাহসের গায় আসিয়া লাগে, তারপর তাহাকে আর দুঃসাহস বলিয়া চেনা যায় না। অন্ধকার রাত্রির আশ্রয়ে অজয়েরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া চলিল। বালিশে মাথা রাখিয়া তরুণীকে সে দেখিতেছে। একটি চোখের অপলক দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতেছে।

তারকাখচিত অসীম আকাশের গায়ে অন্ধকারের রঙে আঁকা একখানি কবরী। তরুণীর দুইখানি ক্ষীণ হস্তের সযত্ন কেশ-রচনা। আকাশ যেন অপরিসীম আদরে ইহাকে আজ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই কবরীটিরই শোভাবর্দ্ধনের জন্য সে যেন আজ ইহাকে নক্ষত্রের মণি গাঁথিয়া ঘিরিয়াছে। একটি শুভ্র পেলব হস্তের একগাছি কঙ্কণের উপর পড়িয়া অস্ফুট একটু তারার আলো পরম কৃতার্থতার গৌরবে হাসিয়া উঠিতেছিল; অজয়ের মনে হইতেছিল, তাহার জানা ও অজানা পৃথিবীতে এ মাধুর্য্যের কোথাও যেন আর তুলনা নাই। যেন একাধারে স্বর্ণিমসুধা, জ্যোতিঃ এবং ঝঙ্কার। অজয়ের পক্ষ হইয়া বলা আবশ্যক যে সে লুকাইয়া কবিতা

লিখিয়া থাকে। তদুপরি তাহার এই চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনে কোনও নিঃসম্পর্কিতা তরুণীর এতখানি নিকট সান্নিধ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সে লাভ করে নাই। আশৈশব যে-সমাজে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা শোভা-সম্পদহীন পুরুষের সমাজ, লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারীরা সেখানে অন্তরালবর্ত্তিনী। সে শৈশবে মাতৃহীন, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র পুত্র। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইবার পর নিজের দূর ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গিনীরূপে সে একটি বিদ্যুৎবর্ণা যূথিকাপেলবা ক্ষীণাঙ্গিনী বালিকামূর্ত্তি কল্পনা করিত মাত্র; কখনও তাহার অপরিমিত কেশরাজি বেণীবদ্ধ হইয়া পিঠে দুলিত, কখনও বা বর্ষার মেঘাড়ম্বরের মত গ্রীবামূল ছাইয়া অসম্বদ্ধ ভাবে বিরাজ করিত। আজ সহসা অদৃষ্টপূর্ব্বা অষ্টাদশীর বিশিষ্ট কবরীরচনা তাহার পূর্ব্বেকার সেই সৌন্দর্য্যস্বপ্নগুলির জগতে বিষম একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিল। যে বিপ্লবের আরম্ভ এমন মোহময় তাহার শেষ কোথায় জানিবার জন্য তাহার আগ্রহের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু রাত্রি যতই বহিয়া চলিল সুপ্তিব্যাপ্ত রহস্যময় অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে এই অপরিচিতার এমন একান্ত সান্নিধ্যে ক্রমেই বেশী করিয়া সে নিজেকে বিপন্নও বোধ করিতে লাগিল। অকারণেই ক্রমাগত তাহার মনে হইতে লাগিল, তরুণী যদিও একবারও মুখ তুলিয়া চাহে নাই, অজয় যে জাগিয়া আছে তাহা সে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেছে; কি সে মনে করিতেছে? ইংরেজীতে যে বস্তুকে শিভাল্‌রি বলা হয়, বাংলা দেশের কোনও তরুণী কোনও অপরিচিত তরুণের নিকট হইতে তাহা প্রত্যাশা করে না, প্রত্যাশা যে করিতে হয় তাহাও জানে না। অজয় যে তাহার প্রতি একমাত্র সহানুভূতি বশতঃই ঘুমাইতে পারে নাই, ইহা কি একবারও তাহার মনে হইবে? সেই সঙ্গে ইহাও সে ভাবিল যে, এতক্ষণ ধরিয়া এই মেয়েটির সম্বন্ধে মনে মনে সে যাহা অনুভব করিয়াছে তাহা সহানুভূতিই ত কেবল নহে। কিন্তু সে যে কিছু অপরাধ করিতেছে কোনও অচিন্তিত কারণে ইহাও সে মনে করিতে পারিল না। বাহিরে যাহাকে অপরাধ বলিয়া জানি, মনের মধ্যে সে যখন মনোহরণ রূপ লইয়া দেখা দেয় তখন তাহার মার্জ্জনাপত্র সে সঙ্গে লইয়াই আসে। অজয়ের আবাল্য-সঞ্চিত সমস্ত সংস্কারের শাসনকে হার মানাইয়া দিতে পারে তরুণীর সম্বন্ধে তাহার মনোভাবের মধ্যে সেই অপরিমেয় মোহময়তা ছিল।

কিন্তু যাহা অননুশোচনায় করা যায় তাহাই অসঙ্কোচে করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না। তরুণী কিছুই বুঝিতেছে না, বারবার নিজেকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজয় ক্রমেই বেশী করিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না উঠিবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অস্বস্তি ততই বাড়িয়া চলিল। এতক্ষণ যে-মুহূর্ত্তটিকে মনের সমস্ত শক্তি দিয়া সে কামনা করিতেছিল এখন তাহারই আসন্নতা তাহাকে ভয়াতুর করিয়া তুলিল। কেন ভয় তাহা সে জানে না, কেবল অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, যেন অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ তাহার আত্মরক্ষা করিবার অবকাশ ছিল, এবার কোথাও কিছু আর রাখা-ঢাকা থাকিবে না। যে-কথাকে মনের গোপনতায় নিজেও নিজের কাছে এতক্ষণ স্বীকার করে নাই, জ্যোৎস্নালোকে তাহা একেবারে অনাবৃত হইয়া এবার ধরা পড়িয়া যাইবে! পূর্ব্বাকাশে অস্ফুট জ্যোতির্দ্দীপ্তির বিকাশ হইবা-মাত্রই সে আর দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। স্থির করিল, সরিষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, অশ্বত্থ গাছের তলা বাহিয়া, দূরে বক্রদেহ ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো ঐ কাঠের পুলটা পার হইয়া, বহুদূরের তরুবন-সমাচ্ছন্ন গ্রামপ্রান্ত ছুঁইয়া ঘুরিয়া আসিবে। ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দিবসের আলোতে কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বহু লোকের ভিড়ে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলার মুখখানিকে নিজের স্বপ্নচারিণী মানসীর মুখটির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবে।

শেষরাত্রির দিকে একটু শীত পড়িয়া আসিতেছিল, একটা চাদরকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে নদীতীরের সেই নিভৃত মাধুর্য্যালোক হইতে পলাইল।

নদীর দিক হইতে তখন জলকরস্বরভিত ঝিরঝিরে

একটুখানি বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার স্পর্শে জাগরণের ক্লান্তি অতি সহজেই দূর হইয়া গেল। নদী হইতে একটা ছোট খাঁড়ির মত আসিয়া অশ্বত্থগাছটির তলার কাছে শেষ হইয়া গিয়াছে, বাতাসে তাহার জল তর্‌তর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। নামিয়া গিয়া অশ্বত্থগাছটার জলতলচুম্বী একটা শিকড়ের উপর বসিয়া সে ভাল করিয়া মুখ হাত ধুইল, তারপর কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিয়া আসিয়া অপরিসীম তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া একটা নিঃশ্বাস লইল।

পথ চলিতে চলিতে অনুভব করিল, আজিকার এই নিরুদ্দেশযাত্রা কি অপরূপ রূপ লইয়াই তাহাকে দেখা দিয়াছে। একদিকে অননুভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কুণ্ঠিত দুঃসহ গুরুভার সান্নিধ্য আর নাই; অপরদিকে, যে অস্ফুট আনন্দের গ্রন্থিবন্ধনকে সে সঙ্গে করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সব ভার সেই গ্রন্থিসূত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া পরিপূর্ণ নির্লক্ষ্যতায় যতদূর খুশী সে চলিয়া যাইতে পারে। সব মিলাইয়া নিজেকে সে সহসা অত্যন্ত বিস্ময়কর রকমের মুক্ত বলিয়া বোধ করিল।

পুল বাহিয়া খাল পার হইবে স্থির ছিল, কিন্তু পুলের কাছাকাছি আসিয়া-পড়িয়া অকারণেই তাহার মতের বদল হইল। কাপড় গুটাইয়া পুলের নীচেকার, অগভীর জল ভাঙিয়া সে খাল অতিক্রম করিল। ওপারে গিয়া তাহার চলার ছন্দে অলক্ষ্যে নৃত্যের তাল লাগিয়া গেল। মনের মধ্যে সেই তালের সঙ্গে তাল মিলাইয়া কোন্‌ একটা অত্যন্ত পরিচিত গানের সুর গুঞ্জরিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সেই গানের একটা কথাও তাহার মনে আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে ক্রমাগত একই পথ বাহিয়া চলায় অরুচি ধরিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত অসংশয়িতরূপ অপথগুলি বাছিয়া বাছিয়া চলিতে লাগিল। শিশিরসিক্ত জুতা-দুইটির তলা মরা ঘাসের টুক্‌রা আর আর্দ্র বালির আস্তরণে ভার হইয়া উঠিতে লাগিল। পথে গুটি-দুইতিন শৃগাল এবং একটি সজারুর সঙ্গে দেখা হইল, এলাইয়া-পড়া কুর্চির ঝাড়কে আবার তাহার সহকার-সাথীর আশ্রয় ধরাইয়া দিয়া গেল।

প্রান্তর পার হইয়া যখন গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছিল তখন পূর্ব্বদিগন্তে অস্ফুট রঙের আভাস চোখে পড়িতেছে। আমজাম-কাঁটাল-নারিকেলের বন ভরিয়া পাখীর কূজন সুরু হইয়াছে। বাতাসে উগ্র-মধুর নানাপ্রকারের পরিচিত-অপরিচিত গন্ধের সঞ্চার। যে-পথ এতক্ষণ কোমল ধূলিময় ছিল, তাহা ক্রমেই বেশী করিয়া শানের টুক্‌রা এবং মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষে আকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহুদূরে, পূর্ব্বদিগন্তের প্রায় কাছাকাছি জায়গায়, অশ্বত্থগাছটার আড়ালে করুগেটেড-টিনে ছাওয়া ক্ষুদ্র ষ্টেশনঘরটার দিকে সে চাহিয়া দেখিল। অতি সন্তর্পণে সমস্তকিছুর উপরে প্রত্যূষের আলো নামিয়া আসিতেছে। এতদূর হইতে কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু তাহার মনে হইল, সেখানেও যেন দু-একটি করিয়া মানুষের নড়াচড়া সুরু হইয়াছে। কল্পনা প্রখর হইয়া উঠিল, তাহার আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটি সুন্দর মুখ নদীর জলে প্রক্ষালিত ও উষার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে মার্জ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আজিকার প্রভাত যে চোখ মেলিয়াই সেই মুখটিকে দেখিতে পাইবে তাহা যেন সামান্য ঘটনা নহে, অসীমতা যেন তাহার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। লজ্জা-বিপন্নতার স্মৃতি ম্লান হইয়া আসিতেছিল, মনে হইল কেন অনেক আগেই ফিরিয়া যায় নাই, একটি পরিপূর্ণ সূর্য্যোদয় তাহার জীবনে ব্যর্থ হইল। মনে করিল, গ্রামের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ভিন্নপথে ষ্টেশনে ফিরিবে, কতকগুলি ফুল কোথাও চোখে দেখিয়া যাওয়া চাই। তাহার জীবনে অলক্ষ্যে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহার দুইখানি পায়ে সেইগুলির অর্ঘ্য মনে মনে সে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

নানাজাতি গাছে ছাওয়া কতকগুলি উঁচু মাটির ঢিবি, একটু দূরে গাছের ভিড়ে প্রায় ঢাকাপড়া একটি বাড়ী। তারপর বেড়া-দেওয়া একটা ফলের বাগান, ছোট ডোবা,

গোশালা, ধানের মরাই, খানিকটা পড়ো জায়গা, তারপর আমজাম নারিকেল স্থপারি বনে ঘেরা আবার একটি বাড়ী। শৃঙ্খলাহীন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন পল্লী। হালের গরুগুলি রাত্রিশেষে ছাড়া পাইয়া বাহির হইতেছে। গাভীদের মুক্তিলাভে এখনও বিলম্ব আছে, যদিও দুগ্ধ-দোহনের শব্দ কোথাও কোথাও শোনা যাইতেছে। একদল হাঁস কলরব করিতে করিতে হেলিতে দুলিতে চলিয়াছে। গ্রামের মধ্যেকার পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও পরিসর, কোথাও বা অতি সঙ্কীর্ণ। স্থানে স্থানে গোপাট ছাড়িয়া কাহারও বাড়ীর আঙ্গিনায় উঠিয়া পড়িতে হয়, কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠে। কাজলজলের দীঘি। গ্রামের বধূরা তত সকালেই স্নান সারিয়া কলসীতে জল লইয়া ভিজা কাপড়ে ঘোম্‌টা টানিয়া বাড়ি ফিরিতেছে, কেহ বা দীঘির ধারে বসিয়া উবু হইয়া বাসন মাজিতেছে, অপরেরা ঘোমটা মাথায় ডুব দিতেছে। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা ধারে নামিয়া গিয়া অজয় ক্লান্ত পা-দুইটাকে ধুইয়া লইল। জল দেখিলেই কোন অজুহাতে তাহা স্পর্শ করা তাহার স্বভাব ছিল। উঠিয়া আসিয়া রুমালে পা মুছিল, জুতার তলার আবর্জ্জনা ঘাসের উপর ঘসিয়া ছাড়াইল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এইখানে তৃণতটের উপর কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিয়া যায়, কিন্তু স্নানার্থিনীরা লজ্জিত হইবে ভাবিয়া আবার সে পথ চলিতে লাগিল।

ফুলের গন্ধ পাইতেছিল, কিন্তু ফুল কোথাও দেখিতে পাইল না। কাহারও বাড়ীর পশ্চাতে অযত্নবর্দ্ধিত বনের মধ্যে ফুটিয়া থাকিবে, ফুলের বাগান কোথাও চোখে পড়িল না। একটি ফুলকে শতটুকরা করিয়া শাস্ত্রমতে শতবার দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়া চলে, স্থতরাং ফুলের এই অপ্রাচুর্য্যে সে বিস্মিত হইল না।

উন্মুক্তদেহে জলপাত্র হস্তে গৌরকান্তি প্রৌঢ় এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের শতনাম জপ করিতে করিতে আসিতেছিলেন, অজয় তাঁহার পাশ কাটাইয়া যাওয়ার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইলেন। অজয় যখন বেশ খানিকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে

এতদূর হইতে কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিতে অজয় অভ্যস্ত ছিল না, মনে মনে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলরামপুর।"

"কীর্ত্তিখলা-বলরামপুর না, উত্তর-বলরামপুর ?"

"উত্তর-বলরামপুর।"

"মশায়ের নাম ?"

"শ্রীঅজয় রায়।"

"কি করা হয় ?"

"আজ্ঞে, ছাত্র, পড়ি।"

"কলেজে পড়েন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কল্‌কাতায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার ছেলেটিও কলকাতায় পড়ে, এম-এ দিচ্ছে এবারে।"

অজয়ের ঠোঁটের কোণে গভীর অবজ্ঞার অস্ফুট একটু হাসি খেলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন বোধ হয়, সুভদ্র—সুভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ?"

অজয়ের এবারে ক্লান্তি ধরিয়াছিল, অনাবশ্যক অনেকটা অতিশয়োক্তি করিয়া কহিল, "কল্‌কাতায় সব মিলিয়ে দু-হাজার ছেলে এম-এ পড়ছে, সবাইকে চিন্‌তে হ'লে আর-সব ফেলে তাই নিয়ে থাকতে হয়।"

অমনি হঠাৎ রাগিয়া ওঠা তাহার স্বভাব। কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার অনুশোচনা বোধ হইল, মোলায়েম কিছু বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণ আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা ?"

মুহূর্ত্তে আবার সব ঘোলাইয়া গেল, অজয় কহিল, "কায়স্থ। দক্ষিণ-রাঢ়ী, দক্ষিণ কর্ণ।"

"আপনার পিতার নামটি কি জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

"শ্রীবিজয় রায়, পিতামহ দুর্জ্জয় রায়, তাঁর পিতা—"

ব্রাহ্মণ এবার এমন বিস্মিত এবং ব্যথিত মুখ করিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন, যে, অজয়কে কথার মাঝখানে থামিয়া যাইতে হইল। ঠিক অনুশোচনা করিবার মত

হইতেই পলাইতেছে এমনই ভাবে দ্রুত সেস্থান পরিত্যাগ করিল। অপর একব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ একাধারে গ্রামের পোষ্টমাষ্টার এবং পিওন, হাতে একতাড়া চিঠি এবং কয়েকটা বাংলা-ইংরেজী খবরের কাগজের মোড়ক, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নিবাস ?"

অজয়ের মাথায় গতকল্যকার সেই মহা-উত্তেজনার মুহূর্ত্ত-কয়টি ভিড় করিয়া আসিল। দুর্গে দুর্গতিনাশিনি··· দুর্গে দুর্গতিনাশিনি···শিশুদের চীৎকার, মেয়েদের কোলাহল।···থপ থপ করিয়া পা ফেলিয়া এক স্থূলদেহ ভয়ার্ত্ত প্রৌঢ় ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে ; কি দারুণ অস্বস্তিভরা তাহার গতি।···কোনও উত্তর না দিয়া হন্ হন্ করিয়া অজয় পথ চলিল। হোঁচট না খাইয়া গ্রামের মধ্যের পথটুকু উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে বাঁচে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোট একটি নদীর ধারে বাজার, ঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। নৌকার গায়ের আল্‌কাতরা ধুইয়া জল তৈলাক্ত হইয়া বহিতেছে, ঘোলাটে জলের গায়ে অস্ফুট সবুজ ও লাল রঙের নানা বিচিত্র নক্সা আঁকা হইতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। এক সঙ্গে শুকনা লঙ্কা, তামাক এবং গুড়ের গন্ধের ঝাঁজ অজয়ের নাকে আসিয়া লাগিল। বিষে বিষক্ষয় হইল। সেই গন্ধ-ভারাক্রান্ত বাতাসে টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লইয়া তাহার মাথাটা আবার অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল। শৈশবের বহু রহস্যময় অভিযানের অস্পষ্ট স্মৃতি জড়ানো এই গন্ধটি অজয়ের ভালও লাগিত।

তখন ধুনা জ্বালাইয়া দোকানপাট সবে খোলা হইতেছে, বাজার বসে নাই। ভোরের হাওয়ায় অনেকখানি বেড়াইয়া ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। ষ্টেশনে বিছানার পাশে খাবারের চাঙারিতে বাড়ী-হইতে-আনা লুচি মাংস প্রভৃতি আছে, কিন্তু সেই অপরিচিতা অষ্টাদশীর সম্মুখে বসিয়া সে সেইগুলি গিলিতেছে মনে করিতেই তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। খাবারের দোকান একটা রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

একখানা কাঁসার রেকাবীতে খান-কয়েক বাসি কচুরী এবং গোটা-দুই সন্দেশ লইয়া সে সবে আহারে প্রবৃত্ত হইবে এমন সময় বাহির হইতে হঠাৎ কে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাবেন না, খাবেন না, ফে'লে দিন্, ফে'লে দিন্ !"

এ আবার কি অভিনব স্পর্দ্ধিত অভব্যতা ভাবিয়া অজয় বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যাহাকে দেখিতে পাইল সে যে পল্লী-সমাজের কেহ এমন মনে হইল না। গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত দেহ, মার্জ্জিতশ্রী উজ্জ্বলকান্তি যুবা, তাহার বেশ সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি, তাহার মুখভাবে চোখের দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিগর্ব্বিত সভ্যতাদীপ্ত আভিজাত্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। করজোড়ে অভিবাদন করিয়া সে সহাস্যে কহিল, "ক্ষমা কর্‌বেন, আপনাকে বিরক্ত কর্‌লাম ! কিন্তু এ অঞ্চলে কিছুদিন থেকে একটু-আধটু ওলাউঠা হচ্ছে, বাজারের খাবার কিছুতেই খাওয়া চল্‌তে পারে না।"

অজয় খাবার ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। আগন্তুককে প্রত্যভিবাদন করিল, তারপর ভয় লুকাইয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন, তা না হ'লে খুবই বিপদ্ হ'তে পার্‌ত।"

যুবক বলিল, "আমি ওপারের চেরিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে কয়েকটা দরকারী ওষুদ নিয়ে এইদিক্ দিয়ে ফির্‌ছিলাম, আপনাকে খাবারের দোকানে ঢুক্‌তে দে'খে প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে পড়েছি।"

দোকানীর খাবারের দাম চুকাইয়া দিয়া দুজনে বাহির হইয়া আসিল। অজয় কহিল, "ধন্যবাদ।"

যুবক কহিল, "ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। আপনি খেতে বসেছিলেন, বাধা দিলাম, এবারে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দিন্।"

"বাধা দেওয়াটা কি আপনার বিবেচনায় অপরাধ হয়েছে ?"

"এই অবস্থাতেই যদি আপনাকে ছেড়ে দিই তাহ'লে অপরাধ হবে। আমার বাড়ী এই কাছেই। মাখন

জুটবে, রুটি জুটবে না। ডিম, কলা আর চা দিতে পার্‌ব। আসুন দয়া ক'রে।"

অজয় প্রচণ্ড আপত্তি তুলিল, কিন্তু যুবক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, কহিল, "শুনুন, আমাকে একেবারে অপরিচিত ভাববেন না। আপনি অজয়বাবু ত? স্কটিশচার্চ্চ থেকে আমরা একসঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট দিয়েছিলাম, আমি তারপর সিটিতে চ'লে যাই। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে আপনার গান অনেকবার আমি শুনেছি। আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি।"

আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। অজয়ের মনে আবার কোন্ অলক্ষ্য সূত্র ধরিয়া মাধুর্য্যের স্পর্শ লাগিয়া গেল। নিবিড় বনান্তরাল হইতে বৌ-কথা-কও ডাকিতেছে, পাশে রৌদ্রপ্লাবিত তৃণতটে যেন অযুত মরকতমণির ছড়াছড়ি। তুইখানি ক্ষীণ হস্তের নিপুণ একটি কবরী-রচনা মনে পড়িয়া তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যুবককে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছে কিনা মনে আনিবার কোনও চেষ্টা সে করিল না, দেখে নাই কিন্তু যুবক তাহাকে চেনে ইহা ভাবিতেই তাহার ভাল লাগিল। তাহার আমন্ত্রণকে ইহার পর সে আর প্রত্যাখ্যান করিল না।

দীঘির পাড় ঘুরিয়া গিয়া একটি ছোট মাঠ। তারপর বেত এবং বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া শীতস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন পথ। একটা ভাঙা মন্দির বাঁয়ে রাখিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘনবিন্যস্ত সুপারিবনের মধ্যে কয়েকটি পরিপাটি খড়ে-ছাওয়া ঘরের সমষ্টি। যুবক কহিল, "এই আমাদের বাড়ী!"

বাহিরে আটচালা প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী। ভিতরের সরঞ্জাম দেখিয়া বুঝা গেল, বৈঠকখানা হিসাবেই সেটির এখন বেশী ব্যবহার। চতুষ্পাঠীর পর সদরের উঠান। একপাশে ঠাকুরঘর। অজয়কে লইয়া বিপরীত দিকের ঘরটিতে ঢুকিতে গিয়া যুবক কহিল, "চলুন, আগে বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় ক'রে দিই।"

কিন্তু ঠাকুরঘরের দরজার নীচে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াই অজয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, যেদিকে দুচোখ যায় ছুটিয়া পলায়ন করে। যুবকের পিতা সেই ব্রাহ্মণ যাঁহাকে একটু আগে নিজের স্পর্দ্ধিত নাগরিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া সে পথের মাঝখানে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

যুবক ডাকিল, "বাবা!"

ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "কি, ভদ্র?"

"তুমি একটুখানি বাইরে এস, আমার এই বন্ধুটি তোমায় প্রণাম করবেন।"

প্রৌঢ় ত্রস্তে বাহির হইয়া আসিলেন, অজয়কে দেখিয়াই কহিলেন, "এস, বাবা এস। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি সুভদ্রের পরিচিত কেউ হবে। ওকেই তুমি খুঁজছিলে ত?"

লজ্জায় ধিক্কারে অজয়ের মাথার মধ্যেটা তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়ের পায়ের কাছে সেটাকে নামাইয়া সে রক্ষা পাইল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দেখিল একটি স্নিগ্ধ সৌজন্যের প্রসন্ন অমায়িক হাসিতে তাঁহার মুখটি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উঠান অতিক্রম করিয়া সুভদ্রের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, ব্রাহ্মণ পূজা শেষ না-করিয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়িতে জুতা না-ছাড়িয়াই সে তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ফিরিয়া ঠাকুরঘরে ঢোকেন নাই, স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বারান্দা হইতে স্নানের ঘটিটি উঠাইয়া লইতেছেন।

অজয়কে নিজের ঘরে খাটের উপর বসাইয়া সুভদ্র চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। ওষুদগুলিকেও সব যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেওয়া চাই। বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজে হাতে করিয়া দিয়া আসিবে ইহাই স্থির ছিল, কিন্তু অতিথি জুটিয়া যাওয়াতে চাকরদের শরণাপন্ন হইতে হইল।

অজয় দেখিল, সুভদ্রের ঘরটি ঠাকুরঘরেরই মত পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন। ধবধবে বিছানাটিতে কেহ যে কখনও শুইয়াছে এমন মনে হয় না। বেড়ার গায়ে ঝুলান একটি মাঝারি-গোছের আয়নার সামনে একটুকরা শাটিনে ঢাকা একটি কাঠের তাকের উপর সুভদ্রের দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম, নখ কাটিবার যন্ত্র, চুলের তেল, চিরুণী,

বুরুশ, সাবানের বাক্স, একটি য়াল্‌কোহলের শিশি। এ-গুলিকে কেহ যেন কখনও ব্যবহার করে নাই। ঘরে খাট ছাড়া আর কোনও আসবাব নাই। জানালার গা ঘেঁষিয়া কয়েকটা ট্রাঙ্ক ও সুটকেসকে উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটা ছিটের কাপড় ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। সেই-খানে ছোট একটি পিরামিডের আকারে ছোটবড় কতক-গুলি বই, সেগুলিকে কখনও যে কেহ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অজয় মনে মনে কলিকাতায় নিজের মেসের ঘরটিকে এই ঘরটির পাশে ধরিয়া দেখিয়া লইল। পরিচ্ছন্নতা তাহারও ভাল লাগে, তাহার ঘরটিতে আসবাবপত্র সাজসরঞ্জামের অভাব নাই, ক্রমে ক্রমে সুদৃশ্য ছোটবড় বইও তাহার প্রচুর জমিয়াছে, কিন্তু কি নিদারুণ অবহেলায় আবর্জ্জনার মত স্তূপাকার হইয়া সেগুলি সেখানে পড়িয়া আছে। কতবার কোমর বাঁধিয়া সেগুলিকে সে গুছাইয়াছে, কিন্তু দুইদিনের বেশী গুছানো অবস্থায় একবারও সেগুলি থাকে নাই।

সুভদ্র ফিরিয়া আসিলে চা-ও আসিয়া পড়িল। একখানা বড় পিতলের রেকাবীতে ধূমায়িত চা দুধ, চিনি, দুইটি পেয়ালা, কয়েকটা ডিম, কিছু ফলমূল, গঙ্গাজলী লাড়ু, ভাজা চিঁড়া ও বাতাসা। বিছানার উপরেই গোটাদুই খবরের কাগজ বিছাইয়া সুভদ্র সেগুলির জন্য জায়গা করিয়া দিল।

চাকর চলিয়া গেলে অজয়কে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দিয়া এবং নিজে এক পেয়ালা লইয়া সুভদ্র কহিল, "তারপর আমাদের এলাকায় কি ক'রে এসে পড়লেন বলুন আগে।"

অজয় চায়ের চিনিটাকে চামচে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বাড়ীতে ছুটি কাটিয়ে কল্‌কাতায় ফিরছিলাম, জাহাজ বিগ্‌ড়ে রাস্তার মাঝখানে আট্‌কা পড়েছি। সন্ধ্যার আগে আর ষ্টীমার নেই বোধ হয়?"

সুভদ্র কহিল, "সন্ধ্যার আগে ত নেইই, কোনো-কোনোদিন বেশ রাত করেও আসে। আপনাদের জাহাজ বিগড়াবার খবর আমরা কাল রাত্রেই ষ্টেশনমাষ্টার ভুবনবাবুর কাছে পেয়েছিলাম, গিয়ে খোঁজ নেব একবার হ'ল ব'লে ওদিকে আর গিয়ে উঠতে পারিনি। রাত্রে খুব কষ্ট হয়নি ত?"

"কিছু না, নদীর ধারের খোলা হাওয়ায় বেশ আরামেই কাটিয়েছি।"

"বৃষ্টি-বাদল হ'লে খুব মুস্কিলে পড়তে হ'ত। ঐ ত ছোট্ট একটি ঘর, তারপর আর দুকোশের মধ্যে কোনো দিকে কোথাও মাথা গুঁজবার জায়গা নেই।"

অজয় চকিতে একবার খোলা জানালায় বাহিরে আকাশটাকে দেখিয়া লইল। বৃষ্টি-বাদলের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অকারণেই তবু তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। যদি বৃষ্টি হয়? তাহার পথসঙ্গিনী সেই অপরিচিতা দৃপ্তা মেয়েটি তাহা হইলে খোলা মাঠের মধ্যে হাঁটুতে মাথা গুঁজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ধারাজলে স্নান করিবে, কিছুতেই বহুলোকের ভিড়ে স্বল্পপরিসর ষ্টেশন ঘরটির মধ্যে ঢুকিতে রাজি হইবে না। সে অবস্থায় সেখানে উপস্থিত থাকিলেও সে মেয়েটির কোনও কাজে লাগিবে না, তবু ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইল।

ওলাউঠার নাম শোনা অবধি আহারে অজয়ের রুচি ছিল না। সে খাবার প্রায় কিছুই ছুঁইতেছিল না। তাহাকে খাইতে তাড়া দিয়া তারপর সে খাইতেছে কিনা না দেখিয়াই সুভদ্র বলিল, "তা ভালই হয়েছে। আমিও আর কয়েকদিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় ফিরতাম। আপনাকে সঙ্গী পাওয়া গেল, আর ভাবনা নেই। আমিও আপনার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।"

অজয়ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাহ'লে ত খুব ভালই হয়।" কিন্তু চট্‌ করিয়া কি একটা কথা ভাবিয়া লইয়া সুভদ্র যখন কহিল, "তাহ'লে এক কাজ করা যাক্; কলেজ খুলতে এখনও ত বেশ দেরি আছে, ছ'সাতটা দিন আপনি এখানে থেকে যান্; আপনার সঙ্গে আর কেউ নেই নিশ্চয়ই?" তখন তাহার সে উৎসাহের কণামাত্র অবশিষ্ট রহিল না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল, "তা নেই অবশ্য, কিন্তু আমাকে মাপ করবেন, আমাকে আজ যেতেই হবে।"

সেগুলিকে খণ্ডন করিবার বিশেষ কোনও চেষ্টা করিল না, ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্পকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিল। নিজে বুঝিতে পারিল, ভিতরে ভিতরে তাহার মেজাজ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, পাছে এই আতিথ্য-পরায়ণ সহৃদয় যুবকটির কাছে তাহা ধরা পড়ে এই ভয়ে প্রাণপণে নিজেকে সে সংবরণ করিতে লাগিল। সুভদ্রের শেষ কয়েকটা কথার কোনও উত্তরই সে দিল না, তাড়াতাড়ি চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালা শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল, হাতের ঘড়িটার দিকে অকারণেই একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "এবার তাহলে যাওয়া যাক্ কি বলেন? জিনিষগুলো কারও জিম্মা ক'রে দিয়ে আসা হয়নি।"

সুভদ্র কহিল, "এই ব্যাপার? বসুন, বসুন, সে ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছে। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠিয়েছি, আপনি ফিরে না-যাওয়া পর্য্যন্ত বস্‌বে। তাছাড়া ভুবন মাষ্টার আছে, তাকেও খবর পাঠিয়েছি। আপনার জিনিষ হারাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনি বসুন।"

অজয় বসিল, কিন্তু ইহার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিল। অজয় বুঝিল, গল্প জমাইবার চেষ্টা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার মাথা ভরিয়া বিরক্তি পিপীলিকার সারির মত অস্থির গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শিরদাঁড়া বাহিয়া নামিতেছে, আবার উঠিতেছে, প্রকাশের অবকাশ পাইলে এখনই দলে দলে ভিড় করিয়া বাহির হইয়া আসিবে। সকালের একবারকার অপরাধের অনুশোচনার স্মৃতি এখনও তাহার মন হইতে লুপ্ত হয় নাই, প্রাণপণে জিহ্বার রাশ টানিতে গিয়া সে একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গেল। সুভদ্র অবস্থাটাকে ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু ঘরের বাতাসটা যে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে ইহা অনুভব করা তাহার পক্ষেও কঠিন হইল না। সেও বসিয়া বসিয়া নীরবেই অজয়কে দেখিতে লাগিল।

এই স্তব্ধতার অবকাশে উঠিয়া পলায়ন করিলে সুভদ্রের হয়ত চট করিয়া প্রতিবাদ করিবার মত কথা জোগাইবে না ভাবিয়া অজয় আবারও খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নমস্কার করিয়া কহিল, "বসা ত হ'ল, এবার যাওয়া যাক। একদিন গিয়ে আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করব।"

সুভদ্র প্রতিনমস্কার করিল না, খাট ছাড়িয়া উঠিলও না, কহিল, "এবারে আপনি বাড়াবাড়ি কর্‌ছেন। আমার কথা না, হয় ছেড়েই দিন, বাবাকে খুব ভালমানুষ ভেবেছেন, কিন্তু ভালমানুষিতেই ওঁর মত একরোখা মানুষ আর দুটি নেই। তারপর আমার মা আছেন, প্রভা আছে, আমি ছাড়লেও তাঁরা আপনাকে ছাড়বেন না। আপনি আজ অভুক্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে এঁরা হয়ত সকলে অনাহারে থাকবেন, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করবেন না।"

অজয় কহিল, "তবু বলবেন বাড়াবাড়িটা আমি কর্‌ছি? ডিম, কলা, প্রায় আধখানা পেঁপে, আনারস, দুপেয়ালা চা, এত-সব খেয়ে গেলাম, এর নাম হল অভুক্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া? আপনিও কি অতিথির চেয়ে আতিথ্যকে বড় কর্‌বেন?"

সুভদ্র সত্যই একটু দমিয়া গেল, আস্তে কহিল, "অতিথির চেয়ে আতিথ্য বড় হ'লে সেটা অত্যাচার হয় জানি; কিন্তু আপনার উপর কোনো অত্যাচার করা আমার অভিপ্রায় নয়। দুপুরের রোদে খোলা মাঠের মাঝখানে অপনার সত্যিই খুব কষ্ট হবে, আপনি বুঝতে পারছেন না।"

এমন সময় ষোল-সতেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে পিছনের দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রায় ছুটিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ "ও মাগো" বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুভদ্র ছুটিয়া গিয়া দরজাটাকে ফাঁক করিয়া ধরিয়া ডাকিল, "প্রভা, প্রভা, পালাচ্ছিস্ কেন? কি চাস্ ব'লে যা-না?"

অনেকখানি দূর হইতেই উত্তর আসিল, "সে হবে এখন অন্য সময়।"

সুভদ্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল অজয় একখানা বই টানিয়া লইয়া একমনে তাহার পাতা উল্টাইতেছে।

ইহার পর যথারীতি অতিথি-সৎকারের পালা।

একটা ধার অকারণেই একটু ঝাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "বস বাবা বস, কাপড়-চোপড় ছাড়নি যে? আজ আবার যা গরম পড়েছে, খোলা গায়ে হাওয়া লাগ্‌লে তবু একটু আরাম পাবে। ভদ্র কি কর্‌ছিলে এতক্ষণ? ওরে শশী, শশী! ও নিমাই! এদিকে আয় তোরা একজন, বাবুর চাদর-জামাগুলো তুলে রাখ্‌, হাত-পা ধোবার জল দে।"

বাড়ীশুদ্ধ মানুষের সম্মুখে প্রৌঢ় হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাকে অর্দ্ধনগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, এই সম্ভাবনামাত্রে ভয়ে অজয়ের নাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইল। যুগসভ্যতার প্রভাবে দৈহিক লজ্জা যতটুকু থাকিবার তাহা ত তাহার ছিলই; তদুপরি সে নিজে তাহার শরীরের অপরিণতি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই, নতুন জায়গার হাওয়াটা আর গায়ে লাগ্‌তে দিতে চাই না।"

শরীর কেন ভাল নাই, ম্যালেরিয়ার ধাত আছে কি না, কলিকাতায় কোথায় কাহার কাছে থাকে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া কি-প্রকারের হয়, মাথা ঠিক রাখিয়া এই-রকমের আরও অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অজয় হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সাত-আট বৎসর বয়সের ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে একহাতে একটা আনারসের টুকরা লইয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারেই তাহার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গে ভাব জমাইল। কহিল, "আমরা একবার কল্‌কাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে বাঘ আছে।"

অজয় একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, কলকাতায় বাঘ আছে বটে। তুমি সুভদ্র-বাবুর ভাই?"

ছেলেটি ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, হাঁ।

"কি নাম তোমার?"

ছেলেটি মুখভরা আনারস লইয়া কষ্টে উচ্চারণ করিল, "সু-দ-র্শ-ন।"

সুভদ্র পূর্ব্বেই কি একটা কাজে অন্দরে গিয়াছিল, অজয়ের সঙ্গে সুদর্শনের দিব্য কথা জমিয়া উঠিয়াছে খানার দিকে প্রস্থান করিলেন। একটু পরে দশ-এগারো বৎসরের আর-একটি ছেলে আসিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মুখ করিয়া সুদর্শনকে কহিল, "তুই এখানে ব'সে বেশ ত আড্ডা দিচ্ছিস দেখছি! কি বলেছিল তোকে বড়দা?"

সুদর্শন অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করিয়া একবার অভিযোক্তার দিকে এবং একবার অজয়ের দিকে চাহিতে লাগিল। বড়ছেলেটি কহিল, "মা আপনাকে একটু দেখতে চান্‌, বড়দা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে ওকে পাঠিয়েছিলেন। আপনি আসুন।"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুদর্শনের হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। এই দুটি কিশোর বালকের কাছে নিজের কোনও দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ হইতে দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না।

অন্দরের বড়ঘরের বারান্দায় আসন পাতিয়া অজয়কে বসিতে দিয়া সুভদ্রের মাতা তাহার প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাহার মাথায় ধানদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। চোখের উপর অবধি ঘোমটা টানিয়া নিজে একটু দূরে বসিয়া সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর বন্ধুটি এত রোগা কেন?"

অজয় নীরবে একটু হাসিল। সুভদ্র কহিল, "এক-বেলার বেশী উনি থাক্‌বেন না, তা না-হলে খাইয়ে-দাইয়ে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারতে মোটা করতে পার কি-না।"

তাহার মা বলিলেন, "তুই নিজে যা-না পালোয়ান; তাছাড়া কি যে যা-তা বলিস, ওর মা বুঝি ওকে খাওয়াতে কিছু ত্রুটি করেন?"

অজয় নতমস্তকে বসিয়াছিল, কহিল, "খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার মা নেই, খেতে অবিশ্যি আমি সমানই পেয়েছি।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুভদ্রের মা কহিলেন, "বেচারা! মা নেই, তাই ত এমন দশা!"

অজয় বিব্রত বোধ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া সুভদ্র তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। গ্রামের

কোথাও কেহ ওলাউঠায় ভুগিতেছে, কাহারও ম্যালেরিয়া, কেহ বা জমিদারের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত। কোথাও একদল অনাথ শিশুকে দেখিবার কেহ নাই। কাহারও বা পৃথিবীর সর্ব্বশেষ সম্বল একখানি খড়ের ঘর দুইদিন হইল আগুনে পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও জন্য কিছুই তৎক্ষণাৎ করিতে পারিল না, কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুভদ্র সকলের সংবাদ লইল। যে মেয়েটি ওলাউঠায় ভুগিতেছিল তাহার স্বামী কিছুতেই সুভদ্রের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছিল না, সুভদ্র তাড়া দিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইল। তারপর অজয়কে ইস্কুল দেখাইল, ছেলেদের খেলিবার মাঠ, ধ্বসিয়া-পড়া বহুপ্রাচীন দেবমন্দির, রথতলা। কিন্তু অজয় সে-সমস্ত কিছুই দেখিল না, তাহার সমস্ত চৈতন্য জুড়িয়া চতুর্দ্দিক্‌কার নগ্নতা, নিঃস্বতা, ব্যাধিজীর্ণতা কি এক আসন্ন অকল্যাণের আভাসের মত নিদারুণ অবসাদের সুরে বাজিতে লাগিল। অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, স্বল্প পরিচয়েই সুভদ্রকেও তাহার ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এই পীড়িত পল্লীর বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে স্থির করিয়া সুভদ্রকে তাড়া দিয়া সে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

দীঘির ঘাটে জনসমাবেশের মধ্যে গা খুলিতে পারিবে না, এজন্য সেদিন আর স্নান করিল না। ছুটিতে যতদিন দেশের বাড়ীতে থাকে, তোলা জলে স্নান করা তাহার অভ্যাস।

খাইতে বসিয়া মনের অন্ধকার অচিন্তিত উপায়ে অনেকখানি কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিল, যে-দুইখানি হাত অন্ন পরিবেষণ করিতেছে তাহাদের মধ্যে স্নিগ্ধতা যেন আর ধরিতেছে না। পা-দুইখানি সুগঠিত সুন্দর সুডৌল, আর তাহাদের মধ্যে এমন একটি জিনিষের প্রকাশ আছে যাহাতে মাথা আপনা হইতেই সেই কুসুম-কোরকের মত অঙ্গুলিরাজির উপর লুণ্ঠিত হইতে চায়। মাথা নীচু করিয়াই যতটুকু সে দেখিতে পাইল, তাহাতেই তাহার মনে হইল, কি এক অপরিসীম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার অন্নে চক্ষের নিমিষে অমৃতের স্বাদ কোথা হইতে আসিয়া লাগিল। সুভদ্র সকালে প্রভা প্রভা বলিয়া ডাকিয়াছিল, নিজের মনে নামটা সে কয়েকবার উচ্চারণ করিল।

হঠাৎ শুনিল, সুভদ্র বলিতেছে, "আমিও আজকেই যাব ঠিক করেছি, বাবা।"

তাহার পিতা হাতের গ্রাস মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকেই ? কিন্তু ভাইফোঁটার ত আর দেরী নেই ?"

বাড়ীতে সুভদ্রের প্রতিপত্তি সাধারণ ছিল না। সুদর্শন ছাড়া তাহার কথার উপর সহজে আর-কেহ কথা কহিত না। কিন্তু তখন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আর পাঁচ-ছয় দিন মাত্র বাকী, প্রভা তখন হইতেই নানাভাবে সেজন্য প্রস্তুত হইতেছে, ছুটি ফুরাইতেও বেশ কিছুদিন দেরি। তাছাড়া কলিকাতায় সুভদ্রের পড়াশোনা নামে মাত্রই, রোগী দেখা এবং রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় সে সময় কাটায় তাহার দশগুণ। এ-সমস্ত জড়াইয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার প্রস্তাবটা সুভদ্রের নিজের কানেও অত্যন্ত দুরূহ শোনাইল। কিন্তু হৃদয়ের শাসন মানিয়া চলা কোনও কালে তাহার স্বভাব নহে, সে কখন কেন যে কি করে হৃদয়বান্‌ লোকে সেইজন্যই তাহার অর্থ খুঁজিয়া পায় না।

হাতের গ্রাসটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার পিতা আবার কহিলেন, "প্রভাকে বলেছ ?"

সুভদ্র কহিল, "প্রভা জানে, মাকেও বলেছি।"

তাহার পিতা কহিলেন, "আচ্ছা।" কিন্তু বেশ বোঝা গেল, ইহার পর আর তাঁহার আহারে রুচি রহিল না।

খাওয়ার পর সুভদ্র নিজের ঘরে প্রভাকে ডাকিয়া অজয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিল। পিতা দেখিতে না পান সে-বিষয়ে বিধিমত সতর্কতা অবলম্বন করিল। প্রভা কহিল, "দাদা বৃথাই পুরুষ-মানুষ, অল্পেতেই এত ভয় পায়।"

অজয় সঙ্কোচ কাটাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই একটি শ্যামল গভীর দৃষ্টির স্নিগ্ধতা তাহার দৃষ্টিকে অভিনন্দিত

কি আছে। বুঝিবার চেষ্টামাত্রও করিল না। লক্ষ্য করিল না, একটুখানি গোপন অশ্রুর অবশেষ এখনও একটি চোখের কোণে লিপ্ত হইয়া আছে। কেবল এইটুকু মাত্র অনুভব করিল, এই মানুষটির মধ্যে বিধাতা নিজের কোনও বিশেষ একটি রূপকে এমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যে, তাহা হইতেও বেশী আর-কিছু আশা করিবার কথা কল্পনাতে আসে না। মুখখানিকে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহ কতকগুলি ত্রুটি বাহির হইবে। দেহের বর্ণ শ্যাম, নাসিকা সমস্ত মুখটির তুলনায় যেন ঈষৎ একটু ছোট; কিন্তু দেখিবামাত্র ইহাকে অকারণেই চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয়, মাথা নত হইয়া আসে, আর মন বলিতে থাকে, তুমি সুন্দর হয়ত নও, হয়ত নওই, কিন্তু তুমি মনোরম, তুমি মনোরম, তুমি মনোরম!

একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় করে না?"

প্রভাও হাসিয়াই বলিল, "বাবাকে তাই ব'লে ভয় পাই না।"

অজয় বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল, "বাইরের পৃথিবীটাকে ত জানেন না, সেখানে ভয় করবার মত অনেক-কিছুই আছে।"

প্রভা কহিল, "জানি না, দেখলে বলতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না, দাদা যেখানে ভয় পায় না আমি ভয় পাব।"

সুভদ্র কহিল, "অজয়বাবুকে তোর ভয় করছে না?"

প্রভা অজয়ের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আঁচলে মুখ চাপিয়া একটু হাসিল, কহিল, "উঁহু।"

"সকালে তাহলে পালিয়েছিলি কেন?"

"পালাব না ত কি? ভয় পেয়ে ত আর পালাই নি।"

সুভদ্র কহিল, "আচ্ছা, তুই ত খাস্‌নি এখনও, খেগে যা, এবারে ফির্‌বার সময় তোর জন্যে একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস জোগাড় করে আন্‌ব।"

কাপড়ের ঢাকাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রভা সুভদ্রের [illegible]

বাক্সটা ভুলুর কাছে আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। অজয় নমস্কার করিয়াছিল, প্রতিনমস্কার করার বদলে সে হাসিয়া ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় আসিয়া পড়িল। এতক্ষণ অবধি সকলে অজয়কে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই সময় সে একেবারে দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল। সুভদ্র কি কি খাইতে ভালবাসে, আচার, মোরব্বা, বড়ি, সরুধানের চিঁড়া, মুগের লাড়ু, সে-সমস্তের জোগাড় হইতে লাগিল। তাহার ছোট ছোট ভাইবোন্‌রা দীর্ঘকালের মত দাদাকে বিদায় দিবার আগে তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া লইতে লাগিল। সুদর্শন সংবাদ দিল, দিদি কাঁদিতেছে। চাকরেরা কলরব করিয়া সুভদ্রের জিনিষ বাঁধাছাঁদা করিতে লাগিল। গুছাইবার যাহা তাহার সমস্ত গোছগাছ করিয়া তবেই প্রভার কাঁদিবার অবসর জুটিয়াছে। সুভদ্রের মাতা চোখ মুছিতে মুছিতে সব-কিছুর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাহার পিতার মুখ ছায়াচ্ছন্ন গম্ভীর। পাড়াপ্রতিবাসীরা অনেকে আসিয়াছে, অজয় সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কেবলই তাহাদের পথে বাধা হইতে লাগিল। তাহার দিকে ইহার পর আর কেহ ফিরিয়াও দেখিল না।

সেই পীড়িতা মেয়েটির স্বামী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভয়ার্ত্ত কাতর মুখে কহিল, "দুপুর অবধি ত বেশ ভালই ছিল দাদাবাবু, ঘণ্টাখানেক হল আবার বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে। সেই ওষুদটা আধঘণ্টা পর পর দিচ্ছি। কম্‌ছে বলে মনে ত হচ্ছে না।"

কখন্ কোন্ অবস্থায় কি করিতে হইবে সে-বিষয়ে বিশদ ভাবে উপদেশ দিয়া সুভদ্র প্রায় জোর করিয়াই তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইল। অজয়কে কহিল, "চ'লে যেতে হচ্ছে, কিন্তু কি করব বলুন। যেখানে যাব সেখানেই ত এই অবস্থা, তাই মায়া কাটাবার সময় হ'লেই কাটিয়ে ফেলি। যখন যেখানে থাকি, যতটুকু করতে পারি করি, দূরে গেলে আর মনে রাখি না।"

[illegible]

হইল, তখন তাহার মন কি একটা অপরিচিত বেদনায় ভার হইয়া আছে। কোথায় কি একটা আনন্দের সূত্র বাঁধা হইতে হইতে যেন তাহার নিজেরই অসাবধানতায় হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল, কোন্ একটা করুণ সুরের রেশকে নিজে অকারণ কোলাহল করিয়া ডুবাইয়া দিল, পরমাত্মীয় কাহাদের ভাল করিয়া চিনিবার আগেই ছাড়িয়া আসিতেছে, এমনইধারা আরও কত কি, কিন্তু কিছুই তার মনের উপলব্ধিতে খুব স্পষ্ট নয়। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত করিল, সুভদ্রকে যে সে ভালবাসিতেছে ইহাই তাহার এই বেদনাবোধের মূলে। স্বজনবিচ্ছেদে সুভদ্রের বেদনা কোনও অলক্ষিত উপায়ে তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌছিতেছে এবং তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই তাহারা দূরে ধোঁয়া দেখিতে পাইয়াছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো সেই পুলটার উপর যখন আসিল, তখন শিটি দিয়া জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার উপক্রম করিতেছে। প্রাণপণ দ্রুত পথ চলিতে চলিতে অজয় নিজের মনকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ষ্টীমার ধরা হয়ত যাইবে না, তখন পশ্চাতে ঐ বনরেখার পারে নিভৃত একটি ছায়ানীড়ের মধ্যে আবার কিছুকালের জন্য ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে, এই সম্ভাবনাতেই কেন তাহার বুকে এমন করিয়া দোলা লাগিতেছে? মনের গোপনে সেই ইচ্ছাকেই কি নিজেরও অজ্ঞাতে সারা পথ সে বহন করিতেছে? অথচ অল্প কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত সেই নীড়টিরই আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার অবধি ছিল না!

ক্রমশঃ

আষাঢ় সংখ্যায় রহস্যপূর্ণ উপন্যাস আরম্ভ

আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত একটি রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের মুদ্রণ আরম্ভ হইবে। তাহার প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়াটি এইরূপ :—

আমি কে?

প্রশস্ত রাজপথ। মাঠের উপর দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, কখন সোজা, কখন বাঁকা, ধরণীর অঙ্গে সাদা শিরার ন্যায় পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ দিয়া একখানা মোটর গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীতে তিনজন লোক। যাহার গাড়ী—হরিনাথ—সে নিজে গাড়ী চালাইতেছিল,তাহার পাশে বসিয়া তাহার বন্ধু গঙ্গাধর। গাড়ীর ভিতর বসিয়া মোটর-চালক। গাড়ীর পিছনে জিনিষ-পত্র বাঁধা, মোটর করিয়া দুই বন্ধু দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

হরিনাথের বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ। গঙ্গাধর তাহার অপেক্ষা কিছু বড়, শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, দোহারা গড়ন। চক্ষু উজ্জ্বল, দেখিলেই বুদ্ধিমান মনে হয়।

হরিনাথ ধনী। যথেষ্ট সম্পত্তি, বেশ বড় জমিদারী। পিতার এক সন্তান, দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। হরিনাথ কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, বিলাসিতায় রুচি নাই। ধনীর পুত্র বলিয়া অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। এপর্য্যন্ত হরিনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই।

গঙ্গাধর হরিনাথের বাল্যবন্ধু, এক গ্রামে নিবাস। পাঠ্যাবস্থায় মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকল পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অবস্থা সচ্ছল, সেইজন্য কর্ম্মকাজের বিশেষ চেষ্টা ছিল না। কিছু দিন অধ্যাপনা কর্ম্ম করিয়াছিল, কিছুদিন এক রাজার সেক্রেটারী ছিল, কিন্তু ওকালতী পাশ করিয়াও উকীল হইতে স্বীকার করে নাই। এখন কোন কারণ ছিল না। হরিনাথ তাহাকে নিজের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু গঙ্গাধর এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

সময় অপরাহ্ণ। মোটর ছুটিতেছিল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য আকাশপ্রান্তে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছিল, ক্রমে অস্তমিত হইল, আকাশে গোধূলি রাগ ছাইয়া আসিল।

গঙ্গাধর বলিল, ওখানে গাছপালার মধ্যে আগুন লেগেচে, দেখেচ?

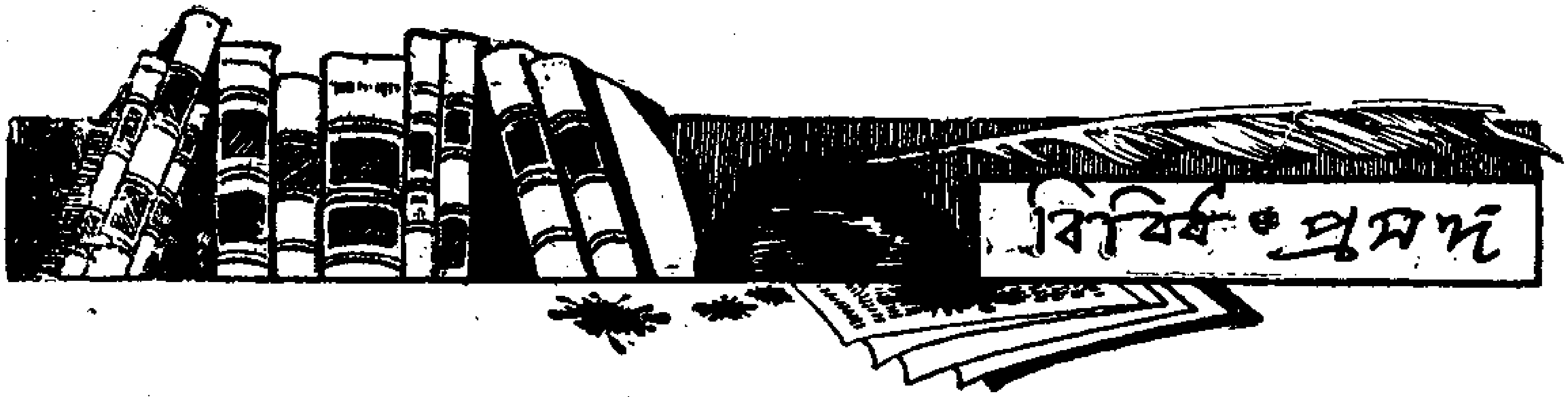
হরিনাথ দেখিতেছিল। সম্মুখে অনেক দূরে পথের বাম দিকে একটা ছোট বন। তাহার ভিতর দিয়া গাঢ়ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধুম নির্গত হইতেছিল, মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা উঠিতেছিল। গ্রাম বা কোন গৃহের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। হরিনাথ মোটরের বেগ বাড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে উপনীত হইল। মোটর থামাইয়া তিন জনেই অগ্নির অভিমুখে ছুটিয়া গেল।

পথের ধারে কয়েক বিঘা জমি জুড়িয়া শালবন। স্থানে স্থানে বন ঘন, অপর স্থানে বিরল। বনের ভিতর খানিকটা মুক্ত পথ। সেই পথে গিয়া হরিনাথেরা দেখিল একখানা মোটর গাড়ী গাছে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। উত্তাপ এত অধিক যে নিকটে যাওয়া অসম্ভব। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার কোন উপায় নাই, নিকটে কোথাও জলাশয় নাই। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের মনে হইল মোটরের নীচে একটা মানুষ চাপা পড়িয়া পুড়িতেছে। মৃত্যু অনেক পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে, কিন্তু এক পায়ের জুতা দেখিয়া তাহাকে পুরুষ মনে হইল।

মোটর-চালক বলিল, ও ব্যক্তি আরোহী মনে হচ্চে। চালক কোথায় গেল?

গঙ্গাধর এদিক ওদিক দেখিতেছিল। হঠাৎ এক দিকে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এ দিকে এ কে পড়ে রয়েচে?

তিন জনেই সেই দিকে গেল। একটা ছোট ঝোপের পাশে, খুব



আবার রাজকর্ম্মচারী হত্যা

কয়েক দিন হইল মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডাগলাস নিহত হইয়াছেন। এইরূপ খবর বাহির হইয়াছে, যে, যাহাকে হত্যাকারী বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহার পকেটে একটুকরা কাগজে এই মর্ম্মের কথা ছিল, যে, এই হত্যা হিজলীর কাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ।

এখন অবস্থা এই রূপ দাঁড়াইয়াছে, যে, এই রূপ হত্যাকাণ্ডের পর যে-সব খবরের কাগজ ও সভা তাহার নিন্দা করে ও তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, ইংরেজরা (এবং অনেক স্থলে অনেক অবাঙালীও) তাহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতে পারে, এবং যদি কোন সভা বা খবরের কাগজ এই রকম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা না-করে ও তৎপ্রতি সাতিশয় ঘৃণা প্রকাশ না-করে, তাহা হইলে তাহারা রাজকর্ম্মচারীহত্যা নীতির সমর্থক বিবেচিত হইতে পারে। এই রূপ ধারণা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতার ফলে কতকটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে মনে হয়। যেমন, সেই বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া মান্দ্রাজের একটি কাগজ, জাস্‌টিস্‌, লিখিয়াছে :—

A prominent member of the Bengal Legislative Council speaking in the Chamber on the assassination of Mr. Douglas (*sic*) last year, frankly avowed that, though there might be the most severe condemnation in public by leaders, there is quite a different kind of feeling in the hearts of most of them. It is highly imperative that this feeling should go, and that as early as possible. A strong antagonistic public opinion would result in the weeding out of terrorism wherever it has taken root. In Bengal particularly the long series of outrages lead one to the irresistible conclusion that on the whole, that province is not so wholly alive to the evil effects of terrorism as it should be.

এই রকম, লাহোরের ডেলী হেরাল্ড প্রস্তাব করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের নেতারা বঙ্গে গিয়া বিভীষিকাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন, তাহা হইলে বাঙালীদের সুমতি হইবে।

জিতেনবাবু যাহা বলিয়াছেন এবং তাহা হইতে জাস্‌টিস্‌ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহার সত্যতা ও ন্যায্যতার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তাহা করিবার মত দেশের লোকমত সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা কেবল নিজের মত জানি। এক দিকে সরকার কড়াকড়া আইন অর্ডিন্যান্স নিয়ম করিতে থাকুন, সরকারী বেতনভোগী এক দল লোক তদনুসারে দমন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকুক, এবং অন্যদিকে দলবদ্ধ বা অদলবদ্ধ কতকগুলি লোক কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকুক—দেশের এরূপ অবস্থা আর অল্পকালও স্থায়ী হয়, ইহা আমরা চাই না। ইহাতে দেশের কল্যাণকর কাজে বাধা পড়িতেছে, বিস্তর নিরপরাধ লোক অত্যাচরিত হইতেছে, এবং ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিতেছে। আমরা দুই পক্ষের উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কোন্ পক্ষ প্রথমতঃ দায়ী, তাহা স্থির করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা নহে; কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমরা বাঙালী বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের এবং অনেক অবাঙালীরও মনঃপূত না হইতে পারে। সেই জন্য আমরা রাজকর্ম্মচারী হত্যা সম্বন্ধে মান্দ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া কাগজের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। এই কাগজ শ্রীযুক্তা এনী বেসাণ্ট ও শ্রীযুক্ত শিবরাও দ্বারা সম্পাদিত। ইঁহারা কেহই বাঙালী নহেন, কেহ কখনও অসহযোগ আন্দোলন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন নাই, টেরারিষ্ট বা আতঙ্কোৎপাদকদের কার্য্যের ও নীতির বরাবর নিন্দা করিয়াছেন, এবং

বাঙালীদের পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত নহেন। ইঁহারা ৫ই মে তারিখের নিউ ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন :—

The natural effect of such deeds is to produce bitter feeling and resentment against India in the minds of the friends, relatives and acquaintances of the victims and of the peoples of their country, and thus increase the tension already existing in the relations between Britain and India. Violence on the part of representatives of either, provokes violence on the part of the other. Thus it remains as true now as when the words were uttered, that "hatred ceaseth not by hatred, hatred ceaseth by love." The remedy for the entire distemper, of which these outrages are symptoms, is Swaraj. Until that comes, repression on the one side and voilence on the other will go on intensifying each other, we are afraid.

এই মন্তব্যে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সত্য—যদিও সমগ্র সত্য ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। শেষ বাক্যটিতে যাহা লেখা হইয়াছে, সেরূপ অনুমান অনেক আগে হইতেই আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল। সেরূপ অনুমানের কারণ বলি।

আমরা গবন্মে´ন্টনামধেয় মনুষ্যসমষ্টির মনের কথা জানি না, যদিও এক এক সময়কার এই সমষ্টির মানুষগুলির নাম জানিলেও জানিতে পারি। অন্য দিকে, যাহারা রাজকর্ম্মচারী হত্যা বা হত্যার চেষ্টা করে, তাহাদের নামধামাদি জানিবার উপায় নাই, তাহারা দলবদ্ধ কি অদলবদ্ধ তাহাও জানি না, এবং তাহাদের মনের কথা ত জানা নাই-ই। কেবলমাত্র উভয় পক্ষের আচরণ হইতে এই রূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে, যে, যেন তাহাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। আতঙ্কোৎপাদকদের একটা কোন উপদ্রবের পর তাহাদিগকে বন্দী, বলহীন বা নির্মূল করিবার জন্য গবন্মে´ন্ট নূতন কোন আইন বা নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তাহার অল্প দিনের মধ্যেই কোন নূতন হত্যাকাণ্ড বা হত্যাচেষ্টা করিয়া আতঙ্কোৎপাদকেরা যেন গবন্মে´ন্টকে জানাইয়া দিল, যে, তাহারা মরে নাই। তাহার পর গবন্মে´ন্ট কঠোরতর আরও কিছু উপায় অবলম্বন করিলেন। তদনন্তর আবার এমন একটা কিছু ঘটিল যাহা হইতে বুঝা গেল, সমুদয় আতঙ্কোৎপাদক ধৃত ও বন্দীকৃত বা নিহত হয় নাই। বিনা বিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকে বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যত্র আটক করিয়া রাখিবার জন্য আইন প্রণয়নের, এবং এই রাজবন্দীদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের বাধ্য করিবার নিমিত্ত "যে কোনও এবং প্রত্যেক উপায়" ("any and every means") অবলম্বিত হইতে পারিবে বলিয়া সরকারী কলিকাতা গেজেটে নিয়ম প্রকাশের পরই মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডাগলাসের হত্যা এই ভীষণ "চক্রনৃত্যের" শেষ দৃষ্টান্ত।

উভয় পক্ষের এই যে রোখ চাপা অনুমিত বা কল্পিত হইতেছে বা হইতে পারে, তাহার পরিণাম ও অবসান কোথায় কখন হইবে কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু রোখের অবসান প্রার্থনীয়, এবং এই "চক্রনৃত্য" থামিলে দেশের কল্যাণ হইবে। কিন্তু কে আগে থামিবে? এবিষয়ে বোধ করি মতভেদ হইবে না, যে, উভয় পক্ষের মধ্যে গবন্মে´ন্টের শক্তি খুব বেশী। যে-পক্ষ বলবত্তর, শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুশোভন। আমেরিকার যে-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও বক্তা এড্‌মাণ্ড বার্ক তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য ব্রিটিশ গবন্মে´ন্টকে অনুরোধ করেন। তাঁহার এতদ্বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি বলেন—

"I mean to give peace. Peace implies reconciliation; and where there has been a material dispute, reconciliation does in a manner always imply concession on the one part or the other. In this state of things I make no difficulty in affirming that the proposal ought to originate from us. Great and an acknowledged force is not impaired, either in effect or in opinion, by an unwillingness to exert itself. The superior power may offer peace with honour and with safety. Such an offer from such a power will be attributed to magnanimity."

বার্কের পরামর্শ ব্রিটিশ গবন্মে´ন্ট গ্রহণীয় মনে করেন নাই। ফলে যুদ্ধ বাধে এবং আমেরিকা স্বাধীন হয়। আমেরিকার উপনিবেশগুলির যে শক্তি ছিল, ভারতবর্ষের জনকতক আতঙ্কোৎপাদকের শক্তি তাহা অপেক্ষা খুবই কম। সেই জন্য অনেকের মনে হইতে পারে, যাহারা এত তুচ্ছ তাহাদের কথা ভাবিয়া শাসননীতি পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপনও হাস্যকর। কিন্তু গবন্মে´ন্টের ও আতঙ্কোৎপাদকদের শক্তি তুলনীয় নহে বলিয়াই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবন্মে´ন্ট শান্তির পথে

অগ্রসর হইলে তাহার চেষ্টার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইবার সম্ভাবনা কম। তাহা হইলেও আমরা স্বীকার করি, এমন অনেক লোক আছে গবর্ন্মেণ্ট নূতন নূতন দমনোপায় অবলম্বনের পথে একটা দাঁড়ি টানিয়া ক্ষান্ত হইলে যাহারা ভাবিবে এই বিরতি ভয়প্রসূত। কিন্তু এরূপ লোকদের মতকে অগ্রাহ্য করাই গবর্ন্মেণ্টের উচিত। অগামী জুলাই মাসে অর্ডিন্যান্সগুলার মিয়াদ ফুরাইবে। তখন নূতন দমনমূলক অর্ডিন্যান্স বা আইন জারি না করিলেই চলিবে। এই রূপ আচরণে গবর্ন্মেণ্টের প্রকৃত প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে না, বরং সদাশয়তা ও সুবুদ্ধি প্রমাণিত হইতে পারে।

চক্রনৃত্যে গবর্ন্মেণ্টের পালা থামান এই কারণেই প্রধানতঃ দরকার, যে, অহিংসাপন্থী স্বাধীনতালিপ্সুদের শক্তি তুচ্ছ নহে, তাহা বিনষ্ট করা যাইবে না।

গবর্ন্মেণ্টকে যেমন শান্তি স্থাপনের পথে চলিতে হইবে, আতঙ্কোৎপাদকদিগকেও তাহা করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তাবের মানে এ নয়, যে, কেহ হত্যা, হত্যাচেষ্টা বা বলপ্রয়োগসাপেক্ষ অন্যবিধ কোন উপদ্রব করিলে তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে না। বিচারের পর শাস্তি অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু বিনা বিচারে বন্দীকরণ ও শাস্তি-প্রদান বন্ধ করিতে হইবে। সরকারী লোকদের দ্বারা গ্রামে ও নগরে, পথেঘাটে, সভাসমিতিতে, জেলে হাজতে, আটকখানায় ও থানায় যে-সকল অত্যাচার হয় বলিয়া শুনা যায় অথচ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না, তৎ-সমুদয় সংবাদরূপে আইনসঙ্গত আকারে সাধারণ খবরের কাগজে ছাপিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তৎসমুদয় কর্তৃপক্ষের নজরে পড়িবে, নজরে পড়িবার পর সেগুলার সম্বন্ধে খুব তলাইয়া তদন্ত করিয়া অত্যাচারীদের দমন ও প্রতিকারের অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। বেসরকারী আতঙ্কোৎপাদকদের যেরূপ কাজের জন্য শাস্তি হয়, সরকারী কোন লোকের বিরুদ্ধে সেরূপ কাজের প্রমাণ পাইলে তাহারও সেইরূপ শাস্তি হওয়া উচিত। যে-সব সত্য সংবাদ কিংবা অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা গুজব সাধারণ খবরের কাগজে স্থান পায় না, তাহা দেশমধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত না ছড়াইলেও উৎপত্তি-স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও শহরে ছড়ায় এবং তৎসম্বন্ধে কোন তদন্ত বা প্রতিবাদ না হওয়ায় সেই সেই জায়গার লোকেরা তাহাতে বিশ্বাস করে। তাহাতে উত্তেজনার ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। আতঙ্কোৎপাদক উপদ্রব অন্ততঃ কোন কোন স্থলে এইরূপ উত্তেজনার ও প্রতিহিংসাস্পৃহারই ফল, অনুমান করা যাইতে পারে। আতঙ্কোৎপাদক হত্যাদির দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে এরূপ বিশ্বাস, এই সব কাজ যাহারা করে তাহাদেরও সকলের আছে কি না সন্দেহস্থল।

যে-সব খবর আমরা হয়ত বিকৃত আকারে শুনি কিন্তু আমাদের সহযোগীরা ছাপেন না এবং আমরাও ছাপি না, তাহার কোনটিই যে ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়া যায় না তাহা নহে। কতকগুলি খবর যে ইউরোপে ও আমেরিকায় পৌঁছে, তাহা হইতে অনুমান হয় সেগুলি ভারতবর্ষেও খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রপাঠকেরা পড়িয়াছেন, জেনিভার অধ্যাপক প্রিভা ভারতবর্ষ হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া বিলাত যান এবং সেখানকার লোকদিগকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক সত্য সংবাদ সভাসমিতিতে ও কথাবার্ত্তার সাহায্যে জানাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টায় বিলাতে ব্যাপকভাবে লোকমতের কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকিলেও এবং তজ্জন্য তাঁহার মনে নিরাশার উদ্রেক হইয়া থাকিলেও খবরগুলা সেখানে পৌঁছিয়াছে। সুতরাং টেলিগ্রাফ ও চিঠির দ্বারা খবর পাঠান সম্বন্ধে অনেক বাধা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও বাধাগুলা কর্তৃপক্ষের অভিলষিত ফল উৎপাদন করে নাই। অধ্যাপক প্রিভা তাঁহার পত্নীর সহিত যখন আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সত্য প্রচারের চেষ্টা করিবেন। তিনি সুইজার্ল্যাণ্ডের লোক, ফরাসী তাঁহার মাতৃভাষা, কিন্তু যাহারা ইংরেজ নহে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য সংবাদ কেবল যে তাহাদের নিকটই পৌঁছিতেছে বা তাহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচারিত হইতেছে তাহা নহে। ইংলণ্ডের ইংরেজরাও সাক্ষাৎভাবে এরূপ খবর পাইতেছে।

"দি নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশ্যন" বিলাতের একটি

প্রধান সাপ্তাহিক কাগজ। গত এপ্রিল মাসের একটি সংখ্যায় তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

Side by side with the decision to ban the annual session of the Indian Congress come terrible reports of the "irregularities" now occurring in India under the rule of the Ordinances. Very few of these reports appear in the daily Press in this country. The American public are more fully informed and the accounts given by visitors to India and by private letters from Indians and Englishmen in India form altogether a body of evidence which cannot be ignored. One practice, bitterly complained of by Englishmen and women who have seen it in operation, is the use of a "cat-and-mouse" system. Political prisoners—often respectable persons of moderate views—are released on condition that they report at frequent intervals to the police. In many cases they are told to report within a few hours of their release. Conscious of no offence, they refuse to give their word, do not report and are then re-arrested and given long sentences, not as political prisoners but as ordinary criminals. Savage *lathi* beatings are reported daily and there are well-authenticated instances of prisoners being marched about in heavy chains. An inquiry might prove that some of the more shocking stories—we shall await with interest the inquiry into the alleged stripping and flogging of women reported by the *Daily Herald* correspondent in Bombay—are exaggerated, but exaggerations are as inevitable under a system of censorship as "irregularities" and brutalities are certain under a system which leaves a whole population at the mercy of an irresponsible police.

আমেরিকায় কিরূপ খবর পৌঁছিতেছে, তাহারও একটি নমুনা দিতেছি। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রধান শহর নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত "নিউ রিপাব্লিক" নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হইয়াছে :—

The censorship is as complete as it can be made, both of the mails and of newspapers—so complete, indeed, that even a report to the Labour Party in Great Britain was taken out of the mail. British soldiers and Indian troops which are loyal to the government are daily practising the most horrible cruelties upon prisoners whose only crime consists in wanting their country to be free. *The New Republic* has seen well authenticated statements describing a number of cases of torture and humiliation of an unprintable character. It is probably true that the followers of the Indian National Congress are hard to deal with; but if they are, much of the blame must be assessed against their English rulers who descend to such tactics.

নিউ রিপাব্লিক যে-সকল খবরের কথা লিখিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের কোন ভাষায় লেখা নয়, ইংরেজীতে লেখা। এবং ইহাও নিশ্চিত, যে, ঐ সব সংবাদ ভারতবর্ষে ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত কোন কাগজে বাহির হয় নাই। ইংরেজী ভাষায় দেশী লোকদের দ্বারা পরিচালিত প্রায় সমুদয় কাগজ আমরা পাইয়া থাকি। যাহা সাতিশয় ভয়ঙ্কর অথবা এরূপ অশ্লীল যে অমুদ্রণীয়, এরূপ কোন অত্যাচারের বা অবমাননার সংবাদ আমরা এই সব প্রকাশ্য সংবাদপত্রে দেখি নাই, সুতরাং তাহার সত্যতা অসত্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। অথচ আমেরিকার এই কাগজটি সেরূপ সংবাদ পাইয়াছেন এবং বলিতেছেন, যে, সেগুলি "ওয়েল অথেন্টিকেটেড" অর্থাৎ এরূপ যাহার সত্যতার প্রমাণ প্রয়োগ উত্তমরূপে করা হইয়াছে। কি প্রমাণ, আমরা তাহা না জানায় তদ্বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সব সংবাদ পৌঁছিতেছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছি, যে, সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার সম্বন্ধে যে-সকল অর্ডিন্যান্স ও নিয়ম করা হইয়াছে তাহা ফলপ্রদ হয় নাই, হইতে পারে না। সেগুলা রদ করিলে বরং গবন্মেণ্ট অত্যাচার বা অত্যাচার-সম্বন্ধীয় গুজব জানিতে পারিয়া প্রতিকার করিতে পারিবেন।

দিল্লীতে কংগ্রেসের গত অধিবেশন হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশী হইতে বিলাতে একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাইবার চেষ্টা করেন। কি প্রকারে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়, খবরের কাগজে তাহা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু ভারতসচিব স্তর সামুয়েল হোর পার্লেমেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মালবীয় মহাশয়ের টেলিগ্রামটিতে ভুল সংবাদ থাকায় তাহার প্রেরণ বন্ধ করা হয়! তাহা হইলে ভারতসচিবের মতে বিলাতী কাগজগুলাতে তাহাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত ভারতীয় সংবাদগুলা ধ্রুব সত্য! তাহাই না হয় হইল; কিন্তু তাহা হইলে স্তর সামুয়েল হোরকে হয়ত ইহাও মানিতে হইবে, যে, বিলাতী ডেলী হেরাল্ড ও নিউ ষ্টেটসম্যান এবং আমেরিকার নিউ রিপাব্লিক যে-সব খবর পাইয়াছেন এবং যাহা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় পৌঁছিতে দেওয়া হইয়াছে (অন্ততঃ যাহার প্রেরণ ও প্রাপ্তি গবন্মেণ্ট বন্ধ করিতে পারেন নাই) সেই সমস্ত সংবাদও সত্য। তিনি হয়ত

বলিবেন, এগুলা সত্য নহে; ভারতীয় গবন্মেণ্ট এগুলার প্রেরণের খবর পাইলে প্রেরণ বন্ধ করিতেন, খবর পান নাই বলিয়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। ইহাতে আমাদের এই কথাই প্রমাণ হইতেছে, যে, গবন্মেণ্ট সত্য বা মিথ্যা বিস্তর সংবাদের প্রচার বন্ধ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এবং গবন্মেণ্টের মতে যে-রকম সংবাদ বেশী বিপজ্জনক তাহাও অতি দূরদেশেও পৌছিতেছে। অথচ তাহা আইনসঙ্গত আকারে ও ভাষায় ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইতে দিলে প্রতিকারের উপায় গবন্মেণ্টের হাতে থাকে।

—

হিংসা ও অহিংসার বিরুদ্ধে একই অস্ত্র প্রয়োগ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টকে দুই ভিন্নপন্থী লোকদের সঙ্গে লড়িতে হইতেছে। কংগ্রেস অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেসের অসহযোগ ও নিরুপদ্রব ভাবে আইন অমান্য করিবার পন্থা দেশের সর্ব্বত্র এত বেশী লোকে অবলম্বন করিয়াছে, যে, তাহাদের মধ্যে একজনও অহিংসার পথ হইতে চ্যুত হয় নাই বলা কঠিন—বিশেষতঃ যখন সরকারী কঠোর দমননীতির অনুমোদিত লাঠি-প্রয়োগাদি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজনা জন্মিবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রহিয়াছে; কিন্তু মোটের উপর ইহা সত্য, যে, কংগ্রেসওয়ালারা অহিংসার পথে প্রতিষ্ঠিত আছে।

আর কতকগুলি লোকের বিরুদ্ধেও গবন্মেণ্টকে লড়িতে হইতেছে যাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে টেরারিষ্ট অর্থাৎ যাহারা হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে চায়। ইহাদের সংখ্যা কত কেহ বলিতে পারে না। তবে ইহাদের কাজ দেখিয়া মনে হয় ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়।

গবন্মেণ্টের প্রতিপক্ষ একদল মারিতে চায় না, কিন্তু মরিতে প্রস্তুত; অন্যদল মারিতে চায়, মরিতেও প্রস্তুত। সরকার বাহাদুর উভয় দলকেই একবিধ উপায়ে, নানা প্রকার রেগুলেশ্যন অর্ডিন্যান্স্ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া, কাবু করিতে ও পিষিয়া ফেলিতে চান। ইহা সমীচীন নহে। যদিও হিংসা দ্বারা হিংসাকে নাশ করা যায় না, তথাপি যে মারিতে চায় ও মারে তাহাকে মারিয়া ফেলা আদিম মানবপ্রকৃতি ন্যায়সঙ্গত মনে করিতে পারে। কিন্তু যে আঘাত করিতে চায় না, আঘাত করে না, তাহাকে আঘাত করিলে তাহার প্রতি দর্শক ও শ্রোতাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয় এবং তাহার দল বাড়িতে থাকে—এমন কি এই কারণে হিংসাবাদীদের দলও বাড়িয়া যাইতে পারে।

এই সব কারণে আমরা মনে করি গবন্মেণ্ট শান্তির পথে চলিলে সুফল উৎপন্ন হইবে।

—

টেরারিষ্টদের সম্বন্ধে বঙ্গের সাবেক লাট

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যর ষ্টান্‌লী জ্যাক্সন বাড়ি পৌছিয়া বঙ্গের আতঙ্কোৎপাদকদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই মত মিঃ ডাগলাসের হত্যার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"Terrorism in Bengal is still rather serious, but, during the past two months, there has been a very marked change in public opinion, on which you must depend if you want to deal satisfactorily with terrorism. You must depend also on Indian assistance. If you can get Indians to say that they will not have terrorism, they will help you to secure possibly those responsible for terrorism. It is most difficult to get any information regarding terrorists, though, I suppose, we have the finest C. I. D. service in India. Some terrorists are actuated by strong patriotic feeling and others by strong race hatred, which is most carefully sown amongst the people of Bengal by clever propagandists and also by the vernacular press.

টেরারিজম্ অর্থাৎ আতঙ্কোৎপাদনবাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে লোকমতের উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং এই লোকমত জ্যাক্সন সাহেবের মতপ্রকাশের পূর্ব্বের দুই মাসে বিভীষিকাবাদের অধিকতর বিরোধী হইয়াছে, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কাহাকে লোকমত বলিয়াছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। কারণ, দ্বিতীয় বাক্যে তিনি বলিতেছেন, "ভারতীয়দের সাহায্যের উপরও ("also on Indian assistance") নির্ভর করিতে হইবে।" এই যে "অল্‌সো" কথাটির প্রয়োগ, ইহা হইতে ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র অনুসারে এই বুঝায়, যে, লোকমত এবং ভারতীয়দের সাহায্য দুটি আলাদা জিনিষ। তাহা হইলে কি জ্যাক্সন সাহেব ইংরেজদের মতকেই লোকমত

বলিয়াছেন এবং ভারতীয়দের সাহায্য অধিকন্তু আর একটা জিনিষ মনে করেন ? ইংরেজদের মত ত বরাবরই চূড়ান্ত রকমে বিভীষিকাবাদের বিরুদ্ধে ছিল ; তাহার আর বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় ? যাহা হউক, ভূতপূর্ব্ব বঙ্গের লাটের বাক্য-বিন্যাসের দোষে কিছু সন্দেহ জন্মিলেও আমরা ধরিয়া লইতেছি তিনি দেশী লোকদের মতকেও লোকমত বলিয়াছেন।

বিভীষিকাবাদের উচ্ছেদসাধনে আন্তরিক লোকমতের কার্য্যকারিতা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে এই কার্য্যকারিতা এই একটি সর্ত্তের উপর নির্ভর করে, যে, গবন্মেণ্টকে সকল বিষয়েই লোকমতকে শ্রদ্ধেয় মনে করিতে হইবে। যখন লোকমত বলিবে, "বিভীষিকাবাদ সাতিশয় গর্হিত, জঘন্য, অনিষ্টকর ও ঘৃণ্য," তখন গবন্মেণ্ট বলিবেন, "এদেশের লোকেরা বড় বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও সত্যভাষী" ; কিন্তু যখন লোকমত বলিবে, "বিনা বিচারে বন্দীকরণ, লাঠিপ্রয়োগ, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের ন্যায্য স্বাধীনতার লোপ নিন্দনীয় ও অহিতকর, অতএব এই সমস্ত রহিত করিয়া অচিরে ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন আবশ্যক" তখন গবন্মেণ্ট বলিবেন, "তোমরা অতি নির্ব্বোধ এবং ভারতের হিতাহিত বুঝ না, আমরা তাহা খুব ভাল করিয়া বুঝি", – এরূপ হইলে কোন ফল হইবার কথা নয়, ফল হইতেছেও না ; যদিও সভাসমিতিতে ও সমুদয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত লোকমত একবাক্যে বরাবর বিভীষিকাবাদকে মন্দ বলিয়াছে। গবন্মেণ্ট যদি বিভীষিকাবাদীদিগকে বুঝাইতে চান, যে, লোকমতের অনুসরণ করা তাহাদের কর্ত্তব্য, কারণ উহা শ্রদ্ধেয় ও মূল্যবান, তাহা হইলে গবন্মেণ্টের নিজের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা চাই, যে, সরকার সত্যসত্যই লোকমতকে মূল্যবান্ ও শ্রদ্ধেয় মনে করেন।

ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেব বলিতেছেন, অনেক বিভীষিকা-বাদী প্রবল স্বদেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্যেরা প্রবল জাতিগত বিদ্বেষ দ্বারা প্রণোদিত, এবং এই জাতিগত বিদ্বেষ চতুর প্রচারকদের এবং দেশভাষার সংবাদপত্র-সমূহেরও দ্বারা সযত্নে বাঙালীদের মধ্যে বপন করা হয়। এখানে জাতিগত বিদ্বেষ বলিতে অবশ্য বক্তা ইংরেজ-বিদ্বেষ বুঝাইতে চান। ইহা সত্য কথা, যে, ভারতবর্ষের ও বাংলা দেশের লোকেরা ইংরেজ কিংবা অন্য কোন বিদেশীর অধীন থাকিতে চায় না এবং ইহাও চায় না, যে, বাণিজ্য বা অন্য সূত্রে ভারতবর্ষের ধন বাহিরে যায়। কিন্তু মনের এই রকম ভাবকে জাতিগত বিদ্বেষ মনে করা ও বলা ভুল। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই মনের ভাব এই রকম ; কোন জাতিই অন্য জাতি কর্তৃক শৃঙ্খলিত ও শোষিত হইতে চায় না। যে-সব সরকারী বা বেসরকারী ইংরেজ বিভীষিকাবাদ সম্পর্কে জাতিগত বিদ্বেষের কথা তুলেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ভারতবর্ষে ও বঙ্গে যত ইংরেজ বাস করে, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সবাই নির্ভয়ে দেহরক্ষীর সাহায্য না লইয়া বাস করে ও চলাফিরা করে, খুন কচিৎ দু-একজন হয়। তাহারাও, মিঃ ভিলিয়ার্স এবং টেগার্ট ভ্রমে হত অন্য একজন ভদ্রলোক ছাড়া, সবাই রাজকর্ম্মচারী। সুতরাং সমুদয় ভারতপ্রবাসী ইংরেজের প্রাণ বধ করিবার জন্য এক দল লোক ব্যগ্র, এরূপ মনে করা ভুল। বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলা এই অর্থে জাতিবিদ্বেষ প্রচার করে বলা নিতান্ত মিথ্যাবাদিতা।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ও বিদ্রোহীদের প্রভাবাধীন দুই একটা স্থান ছাড়া প্রত্যেক ইংরেজের প্রাণসংশয় ভারতে কোথাও হয় নাই ; এখন শান্তির সময়ে ত কোথাও প্রত্যেক ইংরেজ বিপন্ন নহে। প্রত্যেক ইংরেজের প্রাণসংশয় এক সময়ে গ্রেটব্রিটেনেরই অন্তর্গত ওয়েলসে হইয়াছিল। সেই বিষয়ে বার্ক তাঁহার আমেরিকার সহিত সদ্ভাব স্থাপন বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"The people [of Wales] were ferocious, restive, savage, and uncultivated ; sometimes composed never pacified. Wales, within itself, was in perpetual disorder ; and it kept the frontier of England in perpetual alarm."

". . . an Englishman travelling in that country could not go six yards from the high road without being murdered."

ইংরেজরা স্বদেশে বিদেশে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, এদেশে তাঁহারা বড়ই বিপন্ন, বেজায় বীর সাহসী ও সতর্ক বলিয়া তাঁহারা কোনমতে টিকিয়া আছেন। কিন্তু বার্ক যেমন ওয়েলসের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কি বাংলা দেশ সম্বন্ধে তেমনি বলিতে

পারেন, "এদেশে ভ্রমণকারী ইংরেজ নিহত না হইয়া সরকারী রাস্তা হইতে ছয় গজ যাইতে পারে না ?"

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও এখানে বার্কের অন্য কতকগুলি কথার তাৎপর্য্য জানাইতে চাই। তিনি বলিয়াছেন, ওয়েলসকে সায়েস্তা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তথায় অস্ত্রের আমদানী বন্ধ করা হইয়াছিল, ওয়েল্‌শ্‌দিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। তাহাদের ব্যবসায়ে বাধা জন্মান হইয়াছিল, তাহাদিগকে বাজার ও মেলার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। পনর পনরটা কঠোর দমনমূলক আইন ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রণীত ও প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার পর যখন রাজা অষ্টম হেনরী তাহাদিগকে ইংরেজ প্রজাদের সমুদয় অধিকার দিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে যেন জাদু দ্বারা সব গোলমাল উপদ্রব থামিয়া গেল; আইনানুগত্য পুনঃস্থাপিত হইল এবং স্বাধীনতার পশ্চাতে পশ্চাতে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার আবির্ভাব হইল (When Henry VIII "gave to the Welsh all the rights and privileges of English subjects," "from that moment, as by a charm, the tumults subsided; obedience was restored, peace, order, and civilization followed in the train of liberty")।

—

বিভীষিকাবাদ সম্বন্ধে চিন্তা আবশ্যক

ইংরেজরা ও অনেক অবাঙালী (এমন কি কোন কোন বাঙালীও) এমন কথা বলেন, যাহাতে মনে হয় যেন বিভীষিকাবাদ বঙ্গেরই একটা নিজস্ব ব্যাধি। কিন্তু শুধু বাংলা দেশের কথা ভাবিলে ইহার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে না। বাংলা দেশ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী ভারতীয় অনেক স্থানে হিংসাবাদীদের কাজের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। তাহার পর, ইউরোপের ফ্রান্স ও অন্য কোন কোন দেশে, আফ্রিকার মিশরে, এশিয়ার জাপান ও চীনে, আমেরিকার কয়েকটা দেশে বিভীষিকাবাদীদের উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল সন্ধান লইলে বঙ্গের বিভীষিকাবাদেরও নিদান আবিষ্কারে সাহায্য হইবে। কোথাও রাষ্ট্রীয় দুরবস্থাজাত অসন্তোষ, কোথাও সত্য বা কল্পিত অত্যাচারের প্রতিশোধ ইচ্ছা, কোথাও সামাজিক অবজ্ঞা লাঞ্ছনা উৎপীড়ন, কোথাও বা আর্থিক বিষয়ে অবিচার ও বৈষম্য ইহার মূলীভূত। এই সমুদয় কারণের উচ্ছেদসাধন একদিনে হইবার নহে। কিন্তু যদি অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত লোকেরা দেখে, যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ, সমাজনেতৃবর্গ, এবং পণ্যশিল্প ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থ অকপট ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের উত্তেজনা প্রশমিত হইতে পারে।

ইংলণ্ডের চেয়ে কোন দেশের লোকদের স্বাধীনতা অধিক নহে এবং সেখানে বেকার লোকদের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং চিন্তা করিবার লোকও আছে। সেখানে বিভীষিকাবাদ স্থান না পাইবার সম্ভবতঃ ইহা একটি কারণ।

আজকাল অতীত সকল যুগ অপেক্ষা পৃথিবীর সকল দেশের সহিত সকল দেশের সংস্পর্শ বাড়িয়াছে। এই জন্য অন্যান্য ব্যাধির মত কোথাও বিভীষিকাবাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভারতবর্ষে তাহা সংক্রামিত হইতে পারে। এই জন্য ভারতবর্ষে উহা বিনষ্ট করিতে হইলে বিদেশেও উহা বিনষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীর ইতিহাসে, নানা দেশের ইতিহাসে, দেখা যায়, যাহারা যুদ্ধে হাজার হাজার লোক মারিয়া জয়ী হইয়াছে, তাহারা দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে। এখনও যে-দেশের যুদ্ধে মানুষ মারিবার আয়োজন ও শক্তি যত বেশী জগতে তাহার মানসম্ভ্রম তত বেশী। এবং স্বাধীন অস্বাধীন সমুদয় দেশের গবর্ন্মেণ্টসমূহ অস্ত্রবলকেই নিজেদের শক্তির শেষ ভিত্তি এবং তাহা রক্ষার চরম উপায় মনে করেন। বিভীষিকাবাদ কেন উদ্ভূত হইয়াছে এবং সহজে কেন তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইতেছে না, তাহা বুঝিতে হইলে এই সব কথাও মনে রাখিতে হইবে।

গভীর চিন্তায় অনভ্যস্ত এবং অদূরদর্শী ইংরেজরা

দায়ী করে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত, বিভীষিকাবাদের প্রবলতম শত্রু ও বিনাশকর্ত্তা কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি চরম শান্তিবাদী (pacificist) এবং বিভীষিকাবাদের বিরোধী যুদ্ধেরও বিরোধী। বিভীষিকাবাদের ও শান্তি-বাদের বিরোধিতা একই মানুষ করিলে তাহার চিন্তাপ্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি দোষ আছে বুঝিতে হইবে।

—

নিরস্ত্রীভবন কন্‌ফারেন্সে

পৃথিবীর স্বাধীন জাতিদের নিরস্ত্রীভবন বা নিরস্ত্রী-করণের প্রস্তাব ও তাহার আলোচনা অনেক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবল জাতিরা কেহ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইতে ত চাই-ই না, যুদ্ধসজ্জা কমাইতেও চায় না;—সকলেরই ভয় পাছে আর কোন জাতির যুদ্ধসজ্জাটা বেশী রকম হইয়া বা থাকিয়া যায়। এই জন্য নিরস্ত্রীকরণ বা নিরস্ত্রীভবনের প্রস্তাবটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যুদ্ধের সাজসজ্জার লোপে নহে, তাহার হ্রাসে। জলে স্থলে আকাশে তাহা কে কত কমাইবে, এখন তাহারই তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। জেনিভাতে এতদ্বিষয়ক কনফারেন্সের অনেক বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলের সাজসজ্জা কিছু কমিলেও কোন কোন জাতি কোন কোন জাতি অপেক্ষা প্রবল থাকিবে, যে-সব জাতি অন্য কোন জাতির দেশ দখল করিয়া আছে তাহাদের তাহা দখল করিয়া থাকিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইবে না, পরাধীন জাতিরা স্বাধীন হইতে পারিবে না, এবং বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ ও যুদ্ধসজ্জা বিষয়ে অনুন্নত স্বাধীন জাতিদের স্বাধীনতা হরণ অপেক্ষাকৃত কম যুদ্ধসজ্জা লইয়াও অনেক জাতি করিতে পারিবে এবং সেইজন্য সেইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রলুব্ধ হইবে। অতএব কেবল হারাহারি সব স্বাধীন জাতির যুদ্ধসজ্জা-হ্রাস দ্বারা পৃথিবী হইতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ লুপ্ত করিতে ও শান্তি স্থাপিত করিতে পারা যাইবে না। জগদ্ব্যাপী শান্তি স্থাপন করিতে হইলে প্রত্যেক জাতিকে অন্যের সহিত যুদ্ধের সব সরঞ্জাম বর্জ্জন করিতে হইবে। অবশ্য কেবল নিজের নিজের দেশে চোর ডাকাত গুণ্ডা সিপাহী-শান্ত্রীর প্রয়োজন, তাহা রাখিতে হইবে; যেমন ডেন্মার্কে আছে।

সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীভবনের প্রস্তাব জেনিভার কনফারেন্সে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ইউরোপের অন্য সব দেশের লোক রুশিয়ার বলশেভিকদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করে, এবং আপনাদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশুখ্রীষ্টকে প্রিন্স অব্ পীস্ অর্থাৎ শান্তি-রাজ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু সকল জাতির নিরস্ত্রী-ভবনের এবং তদ্দ্বারা সকলের যুদ্ধবল সমীকরণের প্রস্তাব খ্রীষ্টীয় বলিয়া অভিহিত কোন জাতির প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই—উপস্থাপিত হইয়াছিল ধর্ম্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞাত সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিনিধি লিটভিনফের দ্বারা। তিনি প্রস্তাব করেন, যে, কন্‌-ফারেন্সের কার্য্যের ভিত্তি সকল জাতির সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতির উপর স্থাপিত হউক। তিনি তাঁহার প্রস্তাবের সপক্ষে যে যুক্তি দেখান তাহা এই, যে, যুদ্ধ হইতে নিরাপত্তা কেবল মাত্র অস্ত্রাদি যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ রহিত করিলে লব্ধ হইতে পারে, এবং সকল জাতি নিরাপদ হইতে পারে যদি সকলের নিরস্ত্র অবস্থার সাম্য জন্মে অর্থাৎ যদি সকলের যুদ্ধসজ্জা কমাইয়া শূন্যে পরিণত করা হয়। লিটভিনফ বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিবার পর সভাপতি সকল প্রতিনিধির মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন—যেন কে অতঃপর কিছু বলিবেন তাহার প্রতীক্ষায়। তখন তুরস্কের (কোনও খ্রীষ্টীয় জাতির নহে) প্রতিনিধি টিউফিক্ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে, যদি ইহার মানে সাম্য হয়।" তাহার পর পারস্যের প্রতিনিধি বলিলেন, "এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমি সুখী হইব।" অতঃপর জার্ম্মেনীর প্রতিনিধি বলিলেন, "আমার সহানুভূতি আছে।" গ্রীসের প্রতিনিধি "ঠাণ্ডা জল ঢালিতে" অর্থাৎ নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আগে পরস্পরে বিশ্বাস চাই। এই প্রস্তাব অস্ত্রসজ্জা-হ্রাসের ও নিরস্ত্রীকরণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বাধা জন্মাইবে।" তদনন্তর স্পেনের প্রতিনিধি ইংরেজ সাইমন ও রুশ লিট-ভিনফের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

বৈঠক দু-ঘণ্টা স্থগিত রহিল। আহারের পর সকলে ফিরিয়া আসিলে ভোট লওয়া হইল। কেবল মাত্র দুই জন প্রতিনিধি সকল জাতির সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীভবনে মত দিলেন। তাঁহারা নিরীশ্বর ("Godless") রুশিয়ার লিটভিনফ এবং "অকথ্য তুর্ক" ("the unspeakable Turk") প্রতিনিধি টিউফিক্।

আমেরিকার "ইউনিটি" কাগজের জেনিভাস্থ সংবাদদাতা বলেন, নিরস্ত্রীকরণ ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রধানতঃ ইংরেজীভাষী আমেরিকা, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা, কানাডা ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ দায়ী। কারণ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি, সেক্রেটারিয়েট, দুটি প্রধান নৌ-শক্তি, ধনীতম দুটি জাতি, বৃহত্তম সাম্রাজ্য দুটি, শান্তির সপক্ষে খবরের কাগজ গির্জ্জার উপদেশ ও বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার কার্য্য চালাইবার সুশৃঙ্খলতম ব্যবস্থা—এই সমস্তই ইংরেজীভাষী জাতিদের। কন্‌ফারেন্সের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ইহাদের পরে ফ্রান্স জাপান পোল্যাণ্ড প্রভৃতি। "ইউনিটির" সংবাদদাতা মিঃ সিডনী ষ্ট্রং নিজের দেশ আমেরিকাকে বাদ দেন নাই, দোষীদের সকলের নামের আগে আমেরিকার নাম বাসাইয়াছেন।

—

চীনজাপান যুদ্ধ ও কয়েকটি সভ্য জাতি

একদিকে জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সের বৈঠক বসিতেছে, অন্যদিকে চীনে জাপানে যুদ্ধ চলিতেছে এবং জাপান জাতিসংঘের মুখের উপর তুড়ি মারিতেছে—এদৃশ্য একটি শোচনীয় ঐতিহাসিক প্রহসন। কেন এরূপ ঘটিয়াছে তাহার অনেক কারণ অনুমিত হইয়াছে এবং প্রকৃত কারণের কিছু আভাসও আগে পাওয়া গিয়াছিল।

আমেরিকার "ইউনিটি" বলিতেছেন, ইউরোপের অনেক দেশ—ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া—চীন ও জাপান হইতে বিস্তর যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধসজ্জার, তোপ-গোলা-গুলি বারুদ এরোপ্লেন সৈনিকদের পোষাকের কাপড় ইত্যাদির, ফরমাইস পাওয়ায় তাহাদের ব্যব্সার "বাজার মন্দা" অবস্থা কাটিয়া গিয়া বাণিজ্য খুব জোরে চলিতেছে। পাউণ্ডের দাম কম হওয়ায় ইংলণ্ডেরই সুবিধা সকলের চেয়ে বেশী হইয়াছে। বিশেষ বৃত্তান্ত 'ইউনিটি'র নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পাওয়া যাইবে।

A lot of light is shed on the reluctance of the western powers to interfere with the Sino-Japanese conflict by the reports of the business boom this conflict has brought to Europe. For the first time in years, business is looking up, thanks to huge orders for military supplies from both China and Japan. Britain, aided by the low cost of the pound sterling, is feeling the quickest and largest measure of prosperity. Her airplane factories for example, are working overtime for the Mikado. In France, the Japanese are buying machine-guns, and light and heavy artillery units. Germany is manufacturing munitions and explosives in huge quantities. But this is not all! For both the Japanese and the Chinese, according to well authenticated reports, are placing large orders for textiles and woolen cloth in Czechoslovakia and in Poland. The artillery division of the Skoda works in Czechoslovakia has orders from the East for artillery parts. It is well known, of course, that the French Schneider Creusot Company has a fifty per cent interest in the Skoda works. All of which means that for the moment at least, Europe is being kept alive commercially and financially by the Asiatic embroilment! Indeed, if the Sino-Japanese war could only be turned into a really first-class conflict and thus kept raging some three or four years or more, like the World War, Europe would find therein the solution of all her economic difficulties, at least for the time being. War, in other words, is initially profitable—to those, at least, outside the area of conflict. It creates business by opening an enormous market for arms, munitions and machinery, and by destroying incalculable totals of wealth which must be promptly replaced if the world is to survive. What wonder that the European powers didn't want to stop the Asiatic conflict too soon! How obvious that every nation, east and west, is beset by interests which regard war, and preparedness for war, as a condition of prosperity, and peace as an economic disaster of the first magnitude.

অতঃপর অবশ্য ইউনিটি বলিতেছেন, যুদ্ধকে সম্পদের কারণ এবং শান্তিকে আর্থিক মহাবিপদ মনে করা অগভীর বিচারের ফল, ইংরেজ লেখক নর্ম্যান এঞ্জেল প্রমাণ করিয়াছেন বর্ত্তমান অতিজটিল যুগে যুদ্ধ সকল দেশেরই ধ্বংসের কারণ হইবে। কিন্তু সদ্য সদ্য লাভ ও ঐশ্বর্য্যের আপাতমধুর মোহ ভেদ করিয়া কোন্ জাতির চক্ষু পরিণামের মহতী বিনষ্টি দেখিতে পায়?

—

ফিলিপাইন্সের স্বাধীনতালাভে বিলম্ব

বৈশাখের প্রবাসীতে "ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা অদূরে" শীর্ষক নিবন্ধিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম,

"গত ৪ঠা এপ্রিল ২২শে চৈত্র তারিখে [আমেরিকার] কংগ্রেসের প্রতিনিধিসভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আট বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকার আইন পাস হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকলের চেয়ে সুসংবাদ। কারণ, যদিও এখনও বিলটির সেনেটে পাস হইয়া প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর পাইতে বাকী আছে তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন যে প্রারম্ভিক পরীক্ষা, তাহাতে উহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা ইহা ধরিয়া লইয়া এই সব মন্তব্য করিতেছি, যে, খাঁটি স্বাধীনতা ফিলিপিনোরা পাইবে।"

গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রয়টার আমেরিকা হইতে যে টেলিগ্রাম এদেশে পাঠায়, তাহাতে ছিল, "গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার কংগ্রেসে যাহা তর্কবিতর্কের বিষয় ছিল তাহার শেষ মীমাংসা হইল।" রয়টার এরূপ লেখা সত্ত্বেও আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই, ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দান বিষয়ক আইন এখনও সেনেটে পাস হয় নাই, এবং উহা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দ্বারা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইতেও এখনও বাকী আছে। এই অনুমান ঠিক্। ১৩ই এপ্রিল তারিখের নিউইয়র্কের নিউ রিপাব্লিকে দেখিতেছি, ফিলিপিনো স্বাধীনতা বিল প্রতিনিধি-সভায় ৪৭ ভোটের বিরুদ্ধে ৩০৬ ভোটে পাশ হইয়াছে। উহার সপক্ষে এত বেশী ভোট হওয়া সত্ত্বেও নিউ রিপাব্লিক মনে করেন, কার্য্যতঃ অবিলম্বে উহা ফলপ্রদ হইবে না; সেনেট যদি স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয় তাহা হইলেও আটের পরিবর্ত্তে পনর বৎসর পরে স্বাধীনতা দিতে চাহিবে, যদি আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসের উভয় কক্ষই একমত হয়, তাহা হইলেও প্রেসিডেন্ট হুভার সম্ভবতঃ বিলটি নামঞ্জুর করিবেন। তাঁহার না-মঞ্জুরী সত্ত্বেও উহাকে আইনে পরিণত করিতে হইলে উভয় কক্ষের যে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের অনুমোদন আবশ্যক তাহা পাওয়া কঠিন হইবে।

আমেরিকান কাগজখানির এই মন্তব্য, শ্রেয়ের পথে যে বিঘ্ন অনেক, এই সংস্কৃত প্রবাদবাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইতে কতকটা আশ্বাস পাওয়া যায়, যে, "প্রতিনিধি-সভার এত সভ্যের অনুকূল ভোট অভিদ্যোতক (significant)—তাহা হইতে এই আশা ন্যায্য মনে হয়, যে, অদূর ভবিষ্যতে, যে-পথ স্বাধীনতার দিকে লইয়া যায়, ফিলিপিনোদের চরণ সেই পথে স্থাপিত হইবে।"

"সাবিত্রী"র ও "দেবী"র ভাগ্য

একটি আইরিশ স্ত্রীলোক, এখন বয়স ৫০, মিস্টার জাফর আলী নামক একজন মুসলমানকে বিবাহ করিয়া মিসেস জাফর আলী হন। তিনি এলাহাবাদে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিচারাধীন আছেন। মোকদ্দমার এক দিনের শুনানীর বিবরণে দেখিলাম, তিনি ফিকা বেগুনী রঙের শাড়ী এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়া আদালতে হাজির হইয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানের ইউরোপীয় পত্নীকে হালফ্যাশন-দুরস্ত হইতে হইলে সিঁদুর পরিতে হয় কিনা জানি না। কিন্তু দেখিতেছি, এই স্ত্রীলোকটির হিন্দুনারীদের অন্য দুটি জিনিষেও লোভ আছে। তিনি নাম লইয়াছেন "সাবিত্রী" এবং পদবী লইয়াছেন "দেবী"। এই নাম ও এই পদবী উভয়ই বেওয়ারিস্! সাবিত্রীর পিতামাতা যখন এই নাম রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভাবেন নাই, তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার নামের এমন অংশীদার জুটিবে এবং যাঁহারা প্রথমে নিজেদের মহিলাদিগকে "দেবী" আখ্যা দিয়াছিলেন তাঁহারাও ভাবেন নাই সিনেমায় ও অন্যত্র উহার নানা রকমের এত দাবিদার খাড়া হইবে।

বাংলাকে বরাবর কম প্রতিনিধি দান

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ বাংলা দেশের রাজস্ব হইতেই ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্যবিস্তার হইয়াছে এবং অন্য অনেক প্রদেশের শাসন-ব্যয়ের ঘাটতি বঙ্গের রাজস্ব হইতে পূরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি দেখা যায়, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা, এখান হইতে সংগৃহীত রাজস্ব, শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টি বিষয়ে বঙ্গের অবস্থা ইত্যাদি যে-কোন

যত প্রতিনিধি দেওয়া উচিত তাহা দেওয়া হয় নাই। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার-বিধি অনুসারে দশ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যত প্রতিনিধি আছে তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল। তাহাতে দেখা যাইবে, অন্য কোন কোন প্রদেশ লোক-সংখ্যার যে অনুপাতে যত প্রতিনিধি পাইয়াছে, বঙ্গদেশ সে অনুপাতে তত পায় নাই।

প্রদেশ।	১৯২১ সালে লোকসংখ্যা।	প্রতিনিধির সংখ্যা।
মান্দ্রাজ	৪২,৩১৮,৯৮৫	১৭
বোম্বাই	১৯,৩৪৮,২১৯	১৮
বাংলা	৪৬,৬৯৫,৫৩৬	২০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫,৩৭৫,৭৮৭	১৭
পঞ্জাব	২০,৬৮৫,০২৪	১২
বিহার-উড়িষ্যা	৩৪,০০২,১৮৯	১২
মধ্য-প্রদেশ	১৩,৯১২,৭৬০	১৬
আসাম	৭,৬০৬,২৩০	৫
দিল্লী	৪৮৮,১৮৮	১
ব্রহ্মদেশ	১৩,২১২,১৯২	৫
আজমেড়-মারওয়াড়া	৪৯৫,২৭১	১

ভারতবর্ষকে নূতন শাসনবিধি দিবার নিমিত্ত তথা-কথিত গোলটেবিল বৈঠক দুইবার বসিয়াছে। দ্বিতীয় বারের বৈঠকের পর যে ফেডারেল ষ্ট্রাক্‌চ্যর কমিটি নিযুক্ত হয়, তাঁহারা ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ কত প্রতিনিধি পাইবে, তাহার একটা আভাস দিয়াছেন। অবশ্য বলা হইয়াছে, যে, ইহা চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ নহে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ গোড়ায় যে-রকম মতলব লইয়া কাজ আরম্ভ করেন, শেষ পর্য্যন্ত মোটের উপর তাহাই স্থির থাকে। এই জন্য ফেডার‍্যাল ষ্ট্রাকচ্যর কমিটির ফর্দ্দটাতে বঙ্গের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা আলোচিত হওয়া দরকার। লোকসংখ্যা সমেত ফর্দ্দটি এইরূপ।—

প্রদেশ	১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা	উপরিতন কক্ষে প্রতিনিধি-সংখ্যা	নিম্ন কক্ষে প্রতিনিধি-সংখ্যা
মান্দ্রাজ	৪৬৭৪৮৬৪৪	১৭	৩২
বোম্বাই	২২২৫৯৯৭৭	১৭	২৬
বাংলা	৫০১২২৫৫০	১৭	৩২
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	১৭	৩২
পঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫১	১৭	২৬
বিহার-উড়িষ্যা	৩৭৫৯০৩৫৬	১৭	২৬
উ. প. সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	২	৩
দিল্লী	৬৩৬২৪৬	১	১
আজমীর	৫৬০২৯২	১	১
কুর্গ	১৬৩০৮৯	১	১
ব্রিটিশ বালুচীস্তান	৪৬৩৫০৮	১	১

বাংলা দেশের প্রতি এই অবিচার, যে, ১০।১২ বৎসর আগে হইতেই হইতেছে, তাহা নহে। তাহার পূর্ব্বেও ছিল। অন্যান্য প্রদেশের জন্য যাহা বরাদ্দ হইত, সকল স্থলে বাংলা দেশের জন্য তাহা বরাদ্দ হইত না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি কিছু বড় করা হয়। অতিরিক্ত সভ্যদের সংখ্যা মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে করা হয় ২১ পর্য্যন্ত। কিন্তু বঙ্গে করা হয় ২০ পর্য্যন্ত। এখনও, বাংলা দেশকে ছোট করিয়া ফেলাতেও, উহার লোকসংখ্যা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অপেক্ষা বেশী আছে; তখন আরও বেশী ছিল—৭ কোটি ছিল—কারণ ভৌগোলিক বাংলা ছাড়া উহার সঙ্গে বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা যুক্ত ছিল। তথাপি বাংলাকে তখন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অপেক্ষা কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছিল। শুধু তাই নয়। নিয়ম করা হয়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অতিরিক্ত সভ্যদের অর্দ্ধেক বেসরকারী লোক হওয়া চাই, কিন্তু বঙ্গের বেলা নিয়ম হয়, যে, এক-তৃতীয়াংশ বেসরকারী হওয়া চাই।

রবীন্দ্রনাথের পারস্য-গমন

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নানা স্বাধীন দেশে গিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ চীনের, জাপানের ও শ্যামের সম্বর্দ্ধনা তিনি পাইয়াছিলেন। জাভা ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রধানতঃ মুসলমান হইলেও সেখানেও তাঁহার অভ্যর্থনা বিশিষ্ট রকম হইয়াছিল। প্রাচীনহিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিদ্বীপে তিনি সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। এবার তিনি পারস্য-নৃপতির নিমন্ত্রণে পারস্য-দেশে গিয়া সেখানে রাজা-প্রজার সম্মিলিত বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। অন্য

জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার ইরাক যাইবার কথা। পরে তুরস্ক যাইবারও কথা হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা দেশে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাঁহার মারফতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের আদর্শ ভাব চিন্তা ও সভ্যতার যে সংস্পর্শ ও যোগ স্থাপিত হইতেছে তাহাকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

—

পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়

বাংলা দেশের দুঃখের অন্ত নাই। আগেকার নানা দুঃখের অবসান হইতে-না-হইতেই ভীষণ ঝড়ে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে। সম্পত্তিনাশ ত হইয়াছেই, মানুষের মৃত্যু এবং পশুর মৃত্যুও অনেক হইয়াছে। সকলের চেয়ে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে মৈমনসিংহের জেলের উপর দিয়া। তাহাতে বিস্তর কয়েদী মরিয়াছে, এবং আহত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী। বিস্তর লোককে পাওয়া যাইতেছে না।

নানা স্থানে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাঁহারা কার্য্য দ্বারা এইরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছেন, তাঁহাদের সমবেদনা মূল্যবান্।

—

বঙ্গে চুরি ডাকাতি খুন

বঙ্গের নানা জেলায় চুরি ডাকাতি ও খুনের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার একটি কারণ দেশের আর্থিক দুরবস্থা। অন্য কারণ, শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা প্রধানতঃ রাজনৈতিক বেয়াদবীর উচ্ছেদসাধনে নিযুক্ত আছেন, দুর্বৃত্ততা নিবারণ করিবার সময় ও শক্তি তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ কোন কোন প্রদেশের পুলিসের বার্ষিক রিপোর্টে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, কংগ্রেস লোককে আইন অমান্য করিতে শিখাইয়াছে, এই জন্য লোকে চুরি ডাকাতি প্রভৃতির নিষেধক আইন মানিতেছে না। বাঘে মহিষে লড়াইয়ে উলুবন যেমন বিধ্বস্ত হয়, তেমনি কর্ত্তৃপক্ষ ও পত্রিকা-সম্পাদকদের এতদ্বিষয়ক তর্কযুদ্ধের সুযোগে চোরডাকাতরা নিজেদের কাজ হাসিল করিতে অধিকতর মনোযোগী ও উদ্যমশীল না-হইলে সুখের বিষয় হইবে।

কংগ্রেস বিশেষ বিশেষ রকম আইন ও হুকুম অমান্য করিতে বলিয়াছে, সব নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বলে নাই। কিন্তু সরকারী কোন কোন লোকের যুক্তির দৌড় দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন, দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইতেছে এই জন্য, যে, লোকে কংগ্রেস দ্বারা বিপথচালিত হইয়া স্বাস্থ্যের নিয়মের সহিত অসহযোগ আরম্ভ করিয়াছে!

—

ডাকবাক্সে চিঠি-পোড়ান

কংগ্রেস এই প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছিল শুনিতে পাই, যে, চিঠিপত্র কম লিখিলে বা না লিখিলে এবং লিখিত চিঠি ডাকে না পাঠাইয়া অন্য উপায়ে পাঠাইলে সরকারী রাজস্ব কিছু কমিতে পারে। এই ইঙ্গিতের সহিত ডাকবাক্সের চিঠি-পোড়ানর সম্পর্ক অচিন্তনীয় না হইলেও, উহা নিশ্চয়ই চিঠি-পোড়ানর কারণ এবং তদ্রূপ দুর্বৃত্ততার জন্য কংগ্রেস দায়ী, মনে করা উচিত নহে। কংগ্রেসপন্থীরা এইরূপ অপকর্ম্ম করিতেছে, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ইহা যে গুপ্তচরদের কাজ নয়, তাহার প্রমাণ কি?

—

প্রবর্ত্তক-সংঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক-সংঘ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে তের দিন উৎসব করেন। এ বৎসরও করিতেছেন। তাহা শুধু আমোদ-প্রমোদ নহে। উৎসবের সহিত নানা হিতকর অনুষ্ঠান জড়িত থাকে। সকলগুলির সহিত আধ্যাত্মিকতার যোগ রাখিবার চেষ্টা আছে। প্রথম দিন মেলা ও প্রদর্শনীর প্রারম্ভিক সভা হয়। এবার প্রবাসীর সম্পাদককে তাহার সভাপতি করা হইয়াছিল। উৎসবের সহিত মেলা একটি সর্ব্বদেশীয় অতি প্রাচীন প্রথা।

শুধু যে স্বদেশী জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা নহে। কতকগুলি মাটির মূর্ত্তিসমষ্টি কালের অনুক্রমে পরে পরে বর্ণনাসমেত সাজাইয়া ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের রক্ষা ও বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। যাঁহারা এই কাজটির পরিচালক তাঁহাদের কোন কোন ঐতিহাসিক মতের সহিত অনেক বিশেষজ্ঞের মত মিলিবে না। কিন্তু এরূপ চেষ্টা ব্যর্থ নহে, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন কোন যুগের কেন্দ্রগত সত্য পরিচালকগণ ঠিক ধরিয়াছেন মনে হয়।

গত ১৩৩৮ সালের প্রধান প্রধান ঘটনা ও উক্তি তারিখ অনুসারে এবং চিত্র ও বর্ণনা সহকারে যে দেখান হইয়াছে, তাহাও বেশ হইয়াছে। কোন ব্যক্তিরই ঘটনা-নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাচিত প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অপর সাধারণের মনঃপূত হইবে আশা করা উচিত নয়। এই জন্য মোটের উপর জিনিষটি কিরূপ হইয়াছে দর্শক-দিগকে তাহাই বিবেচনা করিয়া উপভোগ করিতে ও উপকৃত হইতে হইবে।

হুগলী জেলার সাহিত্যসংগ্রহ আর একটি উপদেশপ্রদ ও দর্শনীয় জিনিষ।

সমালোচনার কথা আমরা কেবল একটি বলিব। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা অভ্রান্ত নহেন। তাঁহাদের অনেকের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—সমুদয় প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে—কোন কোন প্রতিকূল ভাব ও সংস্কার আছে। কিন্তু আমাদেরও, অন্য সব জাতির মত, নিজের দেশ সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব আছে। প্রতিকূল ভাব ও পক্ষপাতিত্ব উভয়ই বর্জ্জন করিয়া কোন দেশের ইতিহাস বা অন্যবিধ কোন বিবরণ-পুস্তক লেখা অতি কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা করিতে পারিয়াছেন, বলিতেছি না। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য্য, যে, তাঁহারা খুব বেশী পরিশ্রম করেন, যাহা আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই করিয়া থাকেন। ইহাও স্বীকার্য্য, যে, আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত জিনিষের বড়াই করি, তাহার অধিকাংশ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আবিষ্কার। অতএব তাঁহাদের সমালোচনা করিতে হইলে পরিশ্রম করিয়া তদনন্তর শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহা করা দরকার। তাঁহাদিগকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। প্রবর্ত্তক-সংঘের মেলা ও প্রদর্শনীর বর্ণনা উপলক্ষ্যে যিনি একটি মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের প্রতি কটাক্ষে ও তাহার ভঙ্গীতে আমরা প্রীত হই নাই। পাশ্চাত্য লেখক-দিগের নিকট আমাদের ঋণের একটি দৃষ্টান্ত উক্ত অভিভাষণটি হইতেই দিতেছি। লেখক অহঙ্কার করেন, যে মোহেন্‌জো-দাড়ো হইতে প্রমাণ হইয়াছে, শৈব-ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম। সম্ভবতঃ ইহা লেখকের আবিষ্কার নহে; মার্শ্যাল সাহেব তাঁহার তিন ভল্যুমে সম্পূর্ণ মোহেন্‌জো-দাড়ো পুস্তকের প্রথম ভল্যুমের উপক্রমণিকার ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় ইহা লিখিয়াছেন এবং তাহা হইতে এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিউতে (৩৬৭ পৃষ্ঠায়) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ লেখক ইহা ঐ পত্রিকায় দেখিয়াছেন। অভিভাষণটির সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত, নতুবা আরও অনেক কথা বলা যাইত।

প্রবর্ত্তক-সংঘ যে খদ্দর প্রস্তুত করেন, তাহার সম্পর্কে অনেক মুসলমান কারিগরের অন্নসংস্থান হয়। বাঙালী মুসলমানেরা ইহা যেন মনে রাখেন।

—

বঙ্গের প্রতি অবিচারের উপর অপমান

ভারতবর্ষে যতগুলি প্রদেশ আছে, বাংলা দেশ হইতে তাহার কোনটির চেয়ে কম সরকারী আয় হয় না। অথচ, বাংলা দেশের ৫ কোটি লোকের জন্য বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে যত টাকা দেওয়া হয়, বোম্বাই মান্দ্রাজ পঞ্জাব প্রভৃতিকে তাহাদের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও, বেশী টাকা দেওয়া হয়। একটা কৌশল দ্বারা বাংলা দেশকে বঞ্চিত করা হইয়া আসিতেছে। সরকারী আয়ের যে-যে উপায়গুলি হইতে বেশী বেশী ও ক্রমবর্দ্ধনশীল অর্থ আসে, সেগুলি ভারত-গবর্ন্মেণ্ট নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন; যেমন পাটের শুল্ক, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, বাণিজ্য-শুল্ক (customs) ইত্যাদি। ইহাতে যে বাংলা দেশের প্রতি অবিচার হইয়া আসিতেছে, বাংলা দেশের কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি

হইতে পারিতেছে না, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থাতে এই অবিচারকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফেডারাল ফিন্যান্স কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের পঞ্চম পৃষ্ঠায় একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অনুমানে ভবিষ্যতে কোন্ প্রদেশে আয় অপেক্ষা ব্যয় কত কম বা বেশী হইবে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি কত হইবে তাহা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। তালিকাটি নীচে দিলাম।

প্রদেশ	উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি
মান্দ্রাজ	২০ লক্ষ ঘাট্‌তি
বোম্বাই	৬৫ ,, ,,
বাংলা	দুই কোটি ,,
আগ্রা-অযোধ্যা	২৫ লক্ষ উদ্বৃত্ত
পঞ্জাব	৩০ ,, ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১০ ,, ঘাটতি
মধ্যপ্রদেশ	১৭ ,, ,,
আসাম	৬৫ ,, ,,

কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের সপ্তম পৃষ্ঠায় অবিচারের উপর বঙ্গের পক্ষে অপমানজনক বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, বঙ্গের এইরূপ ঘাট্‌তি হইবে যদি অন্য কোন কোন প্রদেশের ব্যয়ে তাহার প্রতি বিশেষ ব্যবহার না-করা হয় ("except by special treatment at the expense of other Provinces"), অর্থাৎ অন্য কোন কোন প্রদেশ দয়া করিয়া বাংলা দেশকে কিছু ভিক্ষা দিলে বঙ্গের আয়ব্যয় সমান হইতে পারে। বাংলার টাকা যথাসাধ্য কাড়িয়া লইয়া, এমন কি তাহার একচেটিয়া পাট হইতে প্রাপ্ত চারি কোটি টাকার আধপয়সাও তাহাকে না দিয়া, তাহাকে ভিক্ষুক সাজান হইতেছে!

অথচ প্রধানতঃ এই "ভিক্ষুক" বাংলার রাজস্ব হইতেই ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম বহুবৎসর রাজ্যবৃদ্ধি ও অন্য অনেক প্রদেশের ঘাট্‌তিপূরণ করা হইত ও চলিত। তখনকার চেয়ে এখন বঙ্গে নানা রকমে সরকারী আয় অনেক বেশী হয়। তখন যে-বাংলা অন্য অনেককে টাকা দিতে পারিত, ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বলা হইতেছে, যে, অন্যে দয়া না-করিলে তাহার আয়ব্যয় সমান হইবে না। তাহা যদি নাই হয়, তাহা হইলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাংলা দেশ হইতে যত রাজস্ব অন্যত্র চালান হইয়াছে, আগে তাহা ফিরাইয়া দিয়া তবে দয়া ও ভিক্ষার কথা বলিলে তবু তাহা কিঞ্চিৎ সঙ্গত হয়। বাংলা দেশের রাজস্ব যে নিজ ব্যয়নির্ব্বাহের পর অন্যান্য কার্য্যের জন্য যথেষ্ট ছিল, তাহার কিছু প্রমাণ সরকারী ও বেসরকারী বৈদেশিকদের উক্তি হইতে নীচে দিতেছি।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি স্যর আয়ার কূট সকৌন্সিল গবর্ণর জেনার্যালকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, যে, "মান্দ্রাজের খাজনাখানায় টাকাকড়ি নাই, এবং মান্দ্রাজের তখনই তখনই মাসে সাত লক্ষ টাকার উপর দরকার যাহার প্রত্যেকটি কড়ি বাংলা হইতে আসা চাই; কারণ তিনি দেখিতেছেন অর্থাগমের এমন কোন উপায় নাই যাহা হইতে একটি মুদ্রাও পাইবার আশা করা যাইতে পারে।" ১৭৯২ সালে প্রধান সেনাপতি লণ্ডনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেন্দ্রীয় আপিস ইণ্ডিয়া হৌসে প্রেরিত একটি চিঠিতে জানান, যে, "দেশের তাৎকালিক অবস্থায় সৈন্যদলকে ও অধিবাসীদিগকে বাংলা হইতে আনীত অর্থের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে।"

১৭৬৫ সালে ক্লাইব শাহ্ আলম বাদশার নিকট হইতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। তাহার পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরে বাংলা প্রেসিডেন্সীর গড় বার্ষিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ২,২০,২২,০৭০ টাকা ও ১,৫০,৪৯,৩৪০ টাকা ছিল। ঐ সময়ে মান্দ্রাজের আয়-ব্যয় ছিল ৪০,৫১,৯১০ ও ৫৯,৫৯,২০০ টাকা এবং বোম্বাইয়ের আয় ৭,৬০,৫৭০ ও ব্যয় ৩০,৬৩,১৯০ ছিল। এই দুই প্রদেশের ঘাটতি বাংলার রাজস্ব হইতে পূরণ করিতে হইত।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর বঙ্গে ভীষণতম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ সালের পরবর্ত্তী আট বৎসরেও বাংলার গড় বার্ষিক আয় ছিল ২,৬২,৬৫,১৯০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১,৪৩,৫৭,৮৯০ টাকা। ঐ আট বৎসরে শুধু বোম্বাইয়েরই ঘাটতি ১,৮১,৪৮,৯০০ টাকা হইয়াছিল এবং

টাকা পাঠাইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, সে যুগে ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে বহুব্যয়সাধ্য দেশজয় দ্বারা রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিল তাহার খরচ বাংলাই জোগাইত। অনেক ইংরেজের লেখা বহিতে এই তথ্যের উল্লেখ আছে। এফ. এইচ. স্ক্রাইন্ সাহেব বাংলার একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি "ইণ্ডিয়াজ হোপ" ("ভারতের আশা") নামক বহিতে এই কথা বলিয়াছেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, সেকালে বাংলা প্রেসিডেন্সী বলিতে খাস্ বাংলা এবং বিহার উড়িষ্যাও বুঝাইত। কিন্তু এখনকার ন্যায় তখনও খাস্ বাংলাই সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল এবং রাজস্ব-সংগ্রহের প্রধান স্থান ছিল।

ইংরেজদের দ্বারা সম্পাদিত ও লিখিত ১৮৪৫ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় (*The Calcutta Review*, vol. iii, January 1845, pp.167-168) লিখিত হইয়াছিল :—

"সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলা বিহার উড়িষ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ও রাজস্বপ্রাপ্তির উপায়। গঙ্গার উপত্যকা হইতেই গবর্ন্মেণ্টের উদ্বৃত্ত থাকে; এখান হইতেই যুদ্ধের টাকা সংগৃহীত হয় এবং গবর্ন্মেণ্ট স্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়। এই গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর ও নিম্ন অংশের মধ্যে নিম্ন অংশই রাজকীয় কোষাগারের প্রধান অবলম্বন। ইহা যদিও ভারতবর্ষের ইংরেজদের অধিকৃত ভূখণ্ডের এক-দশমাংশ অপেক্ষা বেশী নহে, তথাপি এখান হইতে ঐ সমগ্র ভূখণ্ডের মোট রাজস্বের দুই-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ রকম ছয় আনার উপর আদায় হয়।"

যে-বাংলা দেশ গবর্ন্মেণ্টকে এত টাকা জোগাইত, সেই বাংলা দেশে প্রভূত রেলের আয়, কলকারখানার আয়, বাণিজ্যের আয়, বন্দরের আয়, ইন্‌কাম ট্যাক্স ইত্যাদি তখনকার চেয়ে খুব বাড়া সত্ত্বেও, এখন কিনা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা বাংলাকে দেউলিয়া ও ভিক্ষুক সাজান হইতেছে! এবং বাংলা দেশের লোকেরা এবং সংবাদপত্র-সমূহ ও নেতৃবর্গ এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করিতেছেন না। ভবিষ্যতে যাহাতে, আবশ্যক হইলে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের লোকসংখ্যার অনুপাতে বহুসংখ্যক বাঙালী প্রতিনিধি এই অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিবাদ চালাইতে পারেন, সেরূপ ন্যায্যসংখ্যক প্রতিনিধি পাইবার জন্যও বঙ্গের পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন হইতেছে না।

ভীক্টোর্ ঝাক্‌মং (Victor Jacquemont) নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক ও বৈজ্ঞানিক রামমোহন রায়ের সমকালে কিছু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি তখন লিখিয়াছিলেন :—

"ইংরেজরা গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা ও বিহার ছাড়াইয়া, কর্ণেল ক্লাইবের স্থাপিত সাম্রাজ্য ছাড়াইয়া, তাহাদের রাজ্যে যাহা যোগ করিয়াছে, তাহাতে কেবল তাহাদের রাজস্ব কমিয়াছে। নূতন অধিকৃত একটি প্রদেশও তাহার গবর্ন্মেণ্টের এবং তথায় ইংরেজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যক সৈন্যদলের খরচ দিতে পারে না। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সব জায়গা-গুলির আয়ের ও ব্যয়ের সমষ্টি ধরিলে প্রতিবৎসরই তথায় ঘাট্‌তি পড়ে; বোম্বাইয়ের নিজের খরচ চালাইবার সামর্থ্য আরও কম। সম্প্রতি কলিকাতা প্রেসিডেন্সীর সহিত যুক্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (এক্ষণে এলাহাবাদ) এবং বুন্দেলখণ্ড, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতির ঘাট্‌তি পূরণ করিয়া বাংলা ও বিহারের, প্রধানতঃ বাংলার, রাজস্বই উক্ত দুটি অপ্রধান ("secondary") রাষ্ট্রের (অর্থাৎ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের) রাজস্ব-বিভাগকে ঋণমুক্ত রাখে।"

কলিকাতায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ স্বত্বাধিকারীর ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্ নামক একটি দৈনিক কাগজ ছিল। ইহা উঠিয়া গেলে ইহার প্রেস কিনিয়া লইয়া ফর্‌ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। ১৯১২ সালে ইহার একটি সংখ্যায় ভারত-সরকারের এক বৎসরের হিসাব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—

"ভারত-গবর্ন্মেণ্টের ব্যয়নির্ব্বাহের-নিমিত্ত বাংলা দেশ বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দ্বিগুণ টাকা দিয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গ, আগ্রা-অযোধ্যা, পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সকলে মিলিয়া যত দিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী দিয়াছে।"

একথা এখনও সত্য, যে, বঙ্গদেশে সংগৃহীত যে পরিমাণ রাজস্ব ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পান, অন্য কোন প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী পান না।

সেকালে বঙ্গের ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা বাংলা প্রেসিডেন্সীকে এই প্রকারে শোষণ করার প্রতিবাদ করিতেন। ১৭৬৮ সালে গবর্ণর ভেরেল্‌ষ্ট লিখিয়াছিলেন :—

"প্রত্যেক তরফ হইতে এই প্রেসিডেন্সীর উপর যে টাকার দাবি করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার খাজানাখানার টাকা বড় কমিয়া গিয়াছে, এবং এই অঞ্চল হইতে এত বেশী অর্থ রপ্তানীর অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে ভীত করিয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোম্পানীর আমলে প্রথম প্রথম বাংলা প্রেসিডেন্সী বলিতে বিহার-উড়িষ্যাও বুঝাইত, এবং পরে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ প্রদেশও বুঝাইত। কিন্তু বরাবর খাস্ বাংলা হইতেই বেশী রাজস্ব আদায় হইত। ১৮৬১ সালেও বঙ্গের রাজস্ব শোষণ চলিতেছিল। বাংলার তাৎকালিক ছোটলাট জন পীটার গ্রান্ট লেখেন :—

"ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের আরম্ভ হইতে এই রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে, যে, বাংলাকে সাম্রাজ্যিক রাজস্বের তাহার ন্যায্য অংশ অপেক্ষা বেশী দিতে হয়, এবং সৈন্যদলদ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ, পুলিস্, রাস্তা ও অন্যান্য পূর্ত্ত-কার্য্য, ইত্যাদি বাবতে তাহাকে সাম্রাজ্যিক তহবিল হইতে তাহার ন্যায্য পাওনার সিকিও প্রতিদান করা হয় না। তিনি এই অবশ্যম্ভাবী রীতি তখনও প্রচলিত দেখিতেছেন, এবং যে-প্রদেশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাহার পক্ষে অনিষ্টকর প্রণালীবদ্ধ ("systematic") এই সকল বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।"

বঙ্গের প্রতি অবিচারের কথা লর্ড কারমাইকেল প্রভৃতি গবর্ণরেরাও বলিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এই অবিচারের প্রতিকার-চেষ্টায় আমাদের সহিত যোগ দিবে, এরূপ আশা নাই বলিলেই চলে। বাঙালীকেই ইহার জন্য লড়িতে হইবে। সমগ্রভারতের স্বাধীনতা-লাভ প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়া রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে অবশ্য বাঙালীর প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। রাজস্ব বিষয়ে এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে বাংলার প্রতি ন্যায্য ব্যবহার পাইবার

"যে-কোন এবং প্রত্যেক উপায় অবলম্বন"

বাংলা গবন্মেণ্টের সরকারী গেজেট কলিকাতা গেজেটে গত ২৮এ এপ্রিল নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1930, the Governor-in-Council is pleased to make the following rule:

If any detenu under the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1930, disobeys or neglects to comply with any order made, direction given or condition prescribed by virtue of any rule made under Section 13 of the said Act, the authority which made the order, gave the direction or prescribed the condition, may use any and every means necessary to enforce compliance with such order."

বিনা বিচারে যাহাদিগকে জেলে বা অন্যত্র আটক করিয়া রাখা হয় তাহাদিগকে "ডেটেনু" বলা হয়। এই ডেটেনুদিগকে কর্তৃপক্ষের হুকুম, নির্দ্দেশ, ও নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুর এই নিয়ম জারি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ডেটেনুদিগকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত তাহাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকেই তাহার স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার এরূপ অনির্দ্দিষ্ট পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া উচিত হয় নাই। এরূপ ক্ষমতা দেওয়া না-থাকা সত্ত্বেও হিজলীতে যেরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা সরকারী অনুসন্ধান-কমিটীর রিপোর্ট অনুসারেই অতি ভীষণ—তদ্বিষয়ক বেসরকারী সংবাদ ও গুজব না-ই ধরা গেল। গবন্মেণ্ট যেরূপ পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন, তাহার ফলে হিজলীর কাণ্ড অপেক্ষাও গুরুতর কিছু ঘটিতে পারে না কি?

সার্কাসের বন্য ও হিংস্র পশুদিগকে হুকুম মানাইবার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে বটে; কিন্তু পশু ও অন্য ইতরপ্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য যে-আইন আছে, সার্কাসের পশুশিক্ষাদাতারা তাহা লঙ্ঘন করিলে তাহাদের দণ্ড হয়। সুতরাং গবন্মেণ্ট যদি প্রপূরক আর একটি নিয়ম জারি করেন, যে, ডেটেনুদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত "কর্তৃপক্ষ" পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের আইন মানিতে বাধ্য থাকিবেন, তাহা হইলে

কারণ, ডেটেনুদিগকে যেরূপ অপরাধে অপরাধী বলিয়াই সন্দেহ করা হউক না কেন, তাহারা হিংস্র বা অহিংস্র পশু নয়, তাহারা মানুষ; পৃথিবীর বড় বড় শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটেরা যেমন মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, তাহারাও সেইরূপ মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণ হয় নাই। বস্তুতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ থাকিলে তাহাদিগকে বিচারার্থ কোন আদালতে হাজির করাই সঙ্গত হইত। মাসাধিক পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে মিঃ প্রেন্টিস্ বলেন, যে, বিয়াল্লিশটি মানুষকে আদালতের বিচারে খালাস পাইবার পরেই গ্রেপ্তার করিয়া এবং পুনর্ব্বার বিচার না করিয়া ডেটেনু হিসাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি এই উত্তর দিবার পর আরও কয়েক জনকে বিচারে খালাস পাইবার অব্যবহিত পরেই ডেটেনু করা হইয়াছে। বাকী সাত আট শত পুরুষ ও মহিলা ডেটেনুর বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য অভিযোগ করা হয় নাই, তাহাদের কোন বিচারও হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকেও নির্দ্দোষ মনে করা আইনসঙ্গত। কোন মানুষের সম্বন্ধেই অন্য কোন মানুষের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার থাকা উচিত নয়, নির্দ্দোষ মানুষদের সম্বন্ধে ত নহেই।

কর্ত্তৃপক্ষ যে কে কখন্ হইতে না-পারেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। স্থানবিশেষে ও সময়বিশেষে একজন কন্‌ষ্টেবলও কর্ত্তৃপক্ষ হইতে পারে। হিজলীর সরকারী অনুসন্ধান-কমিটির সম্মুখে এই রকম একটি লোক সাক্ষ্য দিয়াছিল, যে, তাহার মতে কোন ডেটেনুর প্রাণের চেয়ে সরকারী বন্দুকটার মূল্য বেশী।

কর্ত্তৃপক্ষ ১৩ ধারা অনুযায়ী যে-যে নিয়ম অনুসারে হুকুম আদি দিতে পারেন, সেরূপ নিয়মাবলীর পূরা তালিকা আছে কি? সেই সব নিয়ম অনুসারে যত প্রকার হুকুম আদি হওয়া ন্যায়সঙ্গত, নীতিসঙ্গত, মানবিকতাসঙ্গত ও আইনসঙ্গত, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এবম্বিধ নানা কারণে, আমরা যতটুকু জানি তাহাতে মনে হয়, বাংলা গবর্ন্মেণ্টের আলোচ্য নিয়মটির নজীর আধুনিক সভ্য ও স্বাধীন দেশসমূহে পাওয়া যাইবে না—অন্ততঃ পাওয়া সুকঠিন হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসক দেশগুলিতে ইহার কোন নজীর থাকিলে তাহা কোন পাঠক আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

আমাদের বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলিতেছি। সকল দেশেরই কোন-না-কোন রাজকর্ম্মচারী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, স্বাধীনতম এবং সভ্যতম দেশেও এ রকম কর্ম্মচারী থাকিতে পারে; কোথাও কোথাও যে আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ সংবাদও বিদেশী খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। সুতরাং আমরা সভ্য ও স্বাধীন দেশে রাজকর্ম্মচারীদের যথেচ্ছ ব্যবহারের নজীর চাহিতেছি না। শ্রেণীবিশেষের রাজকর্ম্মচারীদিগকে সরকারী নিয়মের দ্বারা স্বেচ্ছামত এরূপ কাজ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কোনও দেশে দেওয়া হইয়াছে কিনা যাহার বলে, তাহারা যাহা খুশী তাহাই করিলেও, তাহা নিয়মসঙ্গত বলিয়া গণিত হইবে, তাহাই আমরা জানিতে চাহিতেছি। ডেটেনুদের "কর্ত্তৃপক্ষ"কে স্বেচ্ছাচারী বানাইয়া তোলা বাংলা গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্য না-হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহারা ডেটেনুদের সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারী হয়, এবং গবর্ন্মেণ্ট তখন তাহাদের কৈফিয়ৎ চাহিলে তাহারা যদি আত্মপক্ষসমর্থনার্থ বলে, "গবর্ন্মেণ্ট আমাদিগকে যাহা খুশী তাই করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন," উত্তরে গবর্ন্মেণ্ট কি বলিবেন জানিতে কৌতূহল হয়। গবর্ন্মেণ্ট অবশ্য বলিতে পারেন, "তোমরা যতটা করিয়াছ, ডেটেনুদিগকে আজ্ঞাধীন করিবার জন্য ততটা করা আবশ্যক ছিল না।" প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিতে পারে, "আমরা ঘটনাস্থলের মানুষ (men on the spot); কি করা দরকার তাহা আমরা যেমন বুঝিয়াছিলাম, আপনারা কলিকাতায় বা দার্জিলিঙে বসিয়া তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন?" যাহা হউক, কোন আটকখানার কর্ত্তৃপক্ষ বাড়াবাড়ি করিলে তাহা ডেটেনুদিগকে বাধ্য করিবার জন্য আবশ্যক ছিল কিনা গবর্ন্মেণ্ট তাহার প্রকাশ্য তদন্ত করিবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের দোষ হইয়া থাকিলে তাহার শাস্তি দিবেন, এইরূপ নিয়ম

করা উচিত। আটকখানা হইতে ডেটেনুদের পলায়ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও প্রহরীরা তাহাদের উপর বন্দুক আদি অস্ত্র প্রয়োগও করিতে পারিবে, এরূপ নিয়ম আগেই হইয়াছিল। এখন তাহাদিগকে আজ্ঞাধীন করিবার নিমিত্ত "কর্তৃপক্ষকে" সমতুল্য ক্ষমতা দেওয়া হইল।

—

বিভীষিকাবাদ ও বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ

মেকলের সময় হইতে অনেক ইংরেজের দ্বারা বাঙালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা ঘোষিত হইয়াছে; কারণ, বাঙালীরা বেতনভোগী সিপাহী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মানুষ মারিবার সামর্থ্যের পরিচয় দেয় নাই। এই অপবাদ পরোক্ষ ভাবে কোন কোন বাঙালী যুবককে হিংসার পথে চালিত করিয়াছে, আমাদের কখন কখন এরূপ সন্দেহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মারের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামাক্ষি নটরাজন্ এই অপবাদ বঙ্গে আতঙ্কোৎপাদকদের প্রাদুর্ভাবের একটা কারণ বলেন। ইহা সত্য কি-না বিচার্য্য। সত্য হইলে, কাহারও এই অপবাদের পুনরুল্লেখ করা অনুচিত। কিন্তু কোন অবিবেচক লোক তাহা করিলেও, আমরা মনে করি, বাঙালী ছেলেমেয়ে ও অধিকবয়স্ক লোকদের সাহসের যথেষ্ট প্রমাণ থাকায়, সাহসিকতা প্রমাণ করিবার জন্য মানুষ মারা অনাবশ্যক এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সাত্ত্বিক সাহস প্রদর্শনের যথেষ্ট কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

—

ডায়ারের পক্ষ সমর্থন

বঙ্গসাহিত্যে এবং বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারদর্শিতার দাবিদার প্রাক্তন-রেভারেণ্ড মিঃ টম্‌সন্ জালিয়ানওয়ালা বাগের বীর ডায়ারের দোষ ক্ষালনার্থ এত বৎসর পরে কলম ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, ডায়ার জানিতেন না, যে, ঐ বাগের নির্গমন-পথ নাই। সুতরাং যখন তাঁহার হুকুমে সিপাহীরা বাগে সমাবিষ্ট জনতার উপর গুলি ছোঁড়ার পর জনতা পলাইল না, তখন ডায়ার ভাবিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ডায়ার কি অন্ধ ছিলেন? তিনি কি দেখেন নাই, যে, জনতা অস্ত্রহীন, এবং তাহারা আক্রমণের কোন চেষ্টাই করিতেছে না? গুলি ত একবার নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিপাহীদের পুঁজি ফুরায় নাই ততক্ষণ চলিয়াছিল। ততক্ষণেও জনতার না পলাইবার কারণ ডায়ার বুঝিতে পারেন নাই? যোদ্ধার অদ্ভুত পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বটে! মিঃ টম্‌সন বলিতেছেন, ডায়ার যখন জানিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্গমন-পথ ছিল না তখন তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার দুই ইংরেজ বন্ধুর কাছে সে কথা বলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, যে, তিনি রোজ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ছবি ঠিক যেন চোখে দেখেন। এই বন্ধুদের কাছেই মিঃ টম্‌সন এই সব কথা শুনিয়াছেন বলিতেছেন। ভাল কথা। কিন্তু ডায়ার তাঁহার কাজের তদন্তের জন্য নিযুক্ত হাণ্টার কমিশনের কাছে এ রকম কথা না বলিয়া নিজের কাজের সমর্থন করিয়াছিলেন, "বিদ্রোহীদিগকে" শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন। কেন এরূপ করিয়াছিলেন? তাঁহার বন্ধুরাই বা কমিশনের কাছে কেন সত্য সাক্ষ্য দেন নাই? তাহার মনস্তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের ষ্টাডির অর্থাৎ চর্চ্চার বিষয়, মিঃ টম্‌সন্ ইহা বলিয়াই সকলকে স্তম্ভিত করিতে চাহিয়াছেন। যখন পার্লেমেণ্টে, কাগজে পত্রে, এই হত্যাকাণ্ডের আলোচনা হয়, তখন ডায়ার ও তাঁহার দুই বন্ধু কেন সত্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন? এত বৎসর পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ টম্‌সনের ভারতবর্ষে শুভ পুনরাগমনে বন্ধুদের চৈতন্য হইয়াছে! ডায়ার তাঁহার দুই বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার যে রকম ভগ্ন দশা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এখন বলিতেছেন, সেই সব কথা ও সেই ভগ্ন দশা (সত্য হইলে) ডায়ারের পত্নীর নিশ্চয়ই অজানা থাকিত না। তাঁহার জানা থাকিলে ডায়ারের জীবনচরিত-গ্রন্থের লেখক তাহা অবশ্যই সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু মিঃ টম্‌সন সেই গ্রন্থ হইতে এই নূতন আলোক আমদানী করেন নাই।

মিঃ টম্‌সনের নিজের কথাও কতটা নির্ভরযোগ্য, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তিনি "An

ঘটনাবলীর স্থানটির নাম দিয়াছেন বিষ্ণুগ্রাম। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুরের নাম একটু বদলাইয়া বিষ্ণুগ্রাম নামে বাঁকুড়া জেলার দৃশ্য, বিষ্ণুপুরের কেল্লা ইত্যাদির বর্ণনা ইহাতে আছে। এই বহির পূর্ব্বভাষে লেখক বলিতেছেন, "No living person is sketched in this story, and if anyone in India finds his name in it he must please accept my assurance that it is because I never heard of him." যে-সব উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া বিদিত তাহাতেও ঐতিহাসিক নরনারীর হুবহু ছবি থাকে না, ঔপন্যাসিকের কল্পনা বাস্তব চিত্রে কিছু যোগবিয়োগ করে। সুতরাং ইহা সত্য, যে, মিঃ টম্‌সন্ কোন জীবিত ব্যক্তির বাস্তব ঠিক্ চিত্র এই বহিতে আঁকেন নাই। কিন্তু আমরা বাঁকুড়ার মানুষ। সেখানকার ও বর্দ্ধমান ডিবিজনের কয়েক বৎসর আগেকার কোন কোন উচ্চপদস্থ বাঙালী রাজকর্ম্মচারীকে চিনি, উক্ত কোনও রাজকর্ম্মচারীর আত্মীয়ের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার বিষয় জানি, বাঁকুড়ার মিশনরী কলেজের এক প্রিন্সিপ্যাল দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য খুব খাটিয়াছিলেন জানি, ঐ কলেজের হাতার পুকুর লইয়া মোকদ্দমা হইয়াছিল জানি, এবং আরও অনেক কথা জানি। মিঃ টমসন্ কি বলিতে চান, ঐ প্রকারের ব্যক্তি-সকল ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার বহিতে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তবের সহিত তাহার যতটুকু সাদৃশ্য বা মিল আছে তাহা আকস্মিক? তিনি কি বলিতে চান, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নাম কখনও শুনেন নাই? মিঃ টম্‌সনের একটা ভুল ধারণা আছে, যে, তিনি এতই চালাক, যে, সবাইকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করাইতে পারিবেন।

—

মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম

মহাত্মা গান্ধী অনেকবার বলিয়াছেন, তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করেন। কি অর্থে উহাতে বিশ্বাস করেন, সে-বিষয়ে তাঁহার সহিত কখনও আলোচনা হয় নাই, তাঁহার কোন লেখাতেও উহার বিশদ ব্যাখ্যা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। যাহা হউক, সাধারণতঃ লোকে বর্ণাশ্রম বলিতে যাহা বুঝে, তাঁহার বর্ণাশ্রম ঠিক তাহা নহে। কারণ, তিনি বৈশ্য হইয়াও এবং সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন (অবশ্য অন্যায় কিছুই করেন না), মেথরজাতীয়া একটি বালিকাকে পোষ্য-কন্যা লইয়া তাহার সঙ্গে ভোজন করেন, আব্বাস তৈয়বজীর সহিত পুনঃপুনঃ ভোজন করিয়াছেন, নিজের এক পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণ রাজগোপালাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ইত্যাদি। তিনি তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বর্ণাশ্রমে যেমন বিশ্বাস করেন, আমরাও সাধারণ মনুষ্য হইলেও আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে বর্ণাশ্রম মানি। তাহার আলোচনা পরে কোন সময়ে করিব।

—

আল্‌বেয়ার্ টোমা

ফরাসী সোশ্যালিষ্ট আল্‌বেয়ার্ টোমা মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জেনিভায় ইণ্টারন্যাশ্যন্যাল লেবার আপিস ১৯১৯ সালে স্থাপিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত উহার ডিরেক্টর বা প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি সব দেশের শ্রমিকদের অকপট বন্ধু বলিয়া বিদিত। কলকারখানার শ্রমিকদের কল্যাণার্থ যে-সব আন্তর্জাতিক চুক্তি হইত, তাহা যাহাতে সকল জাতি গ্রহণ করে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভায় তাঁহার আপিসে তাঁহার সহিত যখন আমার কথাবার্ত্তার সুযোগ হয়, তখন তাঁহাকে সুস্থ সবল দেখিয়াছিলাম। তিনি অকালবৃদ্ধ এরূপ মনে হয় নাই। অবশ্য তাঁহাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার জায়গায় কে ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, দেখা যাক্। লীগ অব নেশ্যন্সের প্রধান পদগুলি প্রায় ইংরেজ ও ফরাসীরা দখল করিয়া থাকে।

—

নিজামের পর্দ্দাবিরোধিতা

অল্পকাল পূর্ব্বে হায়দরাবাদের নিজাম লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন। পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ মুসলমানদের একটি প্রধান কেন্দ্র। নিজাম যখন সেখানকার মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে যান, তখন সেদিনকার মত তাঁহার সম্মানার্থ ঐ বিদ্যালয়ে পর্দ্দা অনুষ্ঠিত হয় নাই। নিজাম বাহাদুর তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বালিকাদিগকে বলেন, "তোমরা দেখিতেছ আমার পরিবারের মহিলারা পর্দ্দা-নশীন নহেন, তাঁহারা বোরখা বা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন না। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে তোমরাও পর্দ্দা বর্জ্জন করিও।" নিজামের সম্বর্দ্ধনার্থ লক্ষ্ণৌতে যত সভার অধিবেশন ও ভোজ হইয়াছিল, তাহাতে রাজকুমারীরা অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় যোগ দিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়। ইউরোপীয় ভোজে একটি রীতি আছে, যে, প্রত্যেক মহিলাকে এক এক জন ভদ্রলোক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট লইয়া যান। নিজাম এই রীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার মনোনীত এক এক জন মুসলমান ভদ্রলোককে রাজকুমারীদিগকে তাঁহাদের আসনের সমীপে লইয়া যাইতে অনুমতি দেন ও অনুরোধ করেন। লক্ষ্ণৌয়ের উলেমা ও মুজতাহিদ্‌রা নিজামের এই সব পর্দ্দাবিরোধী কাজের কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই।

[বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

—

ভদ্রলোকের স্বহস্তে হলচালন

সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে "ভদ্রলোক" শ্রেণীর মধ্যে স্বহস্তে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহা সামান্য পরিমাণে সফল হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে আবার সেই রকম চেষ্টা হইতেছে। মাণিকগঞ্জ মহকুমার আটপাড়া গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এক সভায় স্থির হয়, যে, বেকার যুবকেরা কৃষি, গোপালন ও মৎস্যপালন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। তদনুসারে স্থানীয় ডাঃ পরেশচন্দ্র লাহা নিজের জমীতে স্বয়ং হল চালান। অনেক যুবকও তাহা করেন। গোপালন ও দুধের ব্যবসাও তথায় হইয়াছে। কোন সৎ বৃত্তিকেই ভদ্রলোকদের হেয় বা অকরণীয় মনে করা উচিত নয়। সুতরাং তাঁহারা এই সব কাজে প্রবৃত্ত হইয়া ভালই করিতেছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। এই সব কাজ সাধারণ কৃষক, গোয়ালা ও ধীবরেরাও করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কেবল কতকগুলি লোক বাড়িলে তাহা দেশের কল্যাণ ও উন্নতির কারণ না হইতেও পারে। এই সকল কাজে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে, গবাদি পশুর খাদ্য তৃণ ও শস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারিলে, গোচারণের মাঠ না কমাইয়া পতিত বা অনাবাদী জমী চাষ করিতে পারিলে, দুধ ও দুধ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দীর্ঘকাল রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক যে-যে স্থানে উহা দুর্ম্মূল্য সেখানেও উহা যোগাইতে পারিলে, এবং মৎস্যপালন ও মৎস্যবিক্রয় সম্বন্ধেও ঐ প্রকার নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, দেশের কল্যাণ ও উন্নতি হইতে পারে।

[বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

—

উন্মত্ত ও অনুন্মত্ত হাতীর উপদ্রব

অনেক খবরের কাগজে দেখিলাম, ত্রিপুরা-রাজ্যের খোয়াই অঞ্চলে একটা পাগলা হাতী পাঁচজন মানুষের প্রাণবধ করিয়াছে এবং তা ছাড়া ঘরবাড়ি ও শস্যও নষ্ট করিয়াছে। ইহা শোচনীয় সংবাদ। আর এক শোচনীয় সংবাদ রটিয়াছে, যে, ত্রিপুরা জেলার হাসানাবাদ গ্রামে অনুন্মত্ত হাতী মানুষের ঘর ভাঙিয়াছে। এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। ইহা সত্য হইলে ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত।

[বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

—

বাঙালী মুদ্রাবিজ্ঞানবিদের সম্মান

মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে একটি পুস্তক লিখিয়া ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব-সভার নেল্‌সন্‌-রাইট্‌ পুরস্কার পাইয়াছেন।

[বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

বিজ্ঞপ্তি

গত মাসের প্রবাসীতে (পৃঃ ১২০) প্রকাশিত "ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক" চিত্রটি শ্রীঅসিতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বিরহী যক্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা

সাংখ্য ও যবন দর্শন

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

পালি দীর্ঘনিকায়ের প্রথম সূত্র ব্রহ্মজাল সুত্তে গৌতমবুদ্ধ বলিতেছেন, কতক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা 'পুব্বন্তকপ্পিক,' পূর্ব্বান্তকল্পিক, সৃষ্টির প্রথম কল্পে বা যুগে যাহা ছিল তাহার আলোচনা করেন, 'পুব্বন্তানুদিট্‌ঠিনো', পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টিন্, কি প্রকারে সৃষ্টি হইল তাহার চিন্তা করেন। এই সকল শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ দুই উপায়ে তত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা করেন। প্রথম উপায়, সমাধি (যোগ); সমাধিদ্বারা জানিতে চেষ্টা করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ইঁহারা কি ছিলেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়া ইঁহারা সৃষ্টির আদি পর্য্যন্ত পৌছিতে চেষ্টা করেন। তত্ত্বনিরূপণের দ্বিতীয় উপায়, তক্ক (তর্ক) এবং বীমংস (বিমর্স) বা চিন্তা।

ইধ ভিক্খবে একচ্চো সমণো বা ব্রাহ্মণো তক্কী হোতি বীমংসী।
"হে ভিক্ষুগণ, কতক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তার্কিক এবং চিন্তাশীল।"

এইরূপ তার্কিক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণগণ তর্ক করিয়া, বিচার করিয়া, আত্মার এবং জগতের আদি অন্ত সম্বন্ধে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ব্রহ্মজাল সুত্তে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তর্কের এবং চিন্তার বলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্বরূপনিরূপণের চেষ্টার ফলে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রাচীনকালে হিন্দুর এবং যবনদিগের (Ionians) মধ্যে এই চেষ্টা এবং দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন নিবদ্ধ ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে কবে যে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবনদেশে দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে অবধি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুদর্শনের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলিয়া আসিতেছেন, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা হিন্দু দর্শনের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। অনেকে আবার এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে হিন্দুর এবং গ্রীকের মধ্যে বিদ্যার আদান-প্রদান সম্ভব ছিল কি না বিগত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে (৩১ ভাগ, ২য় খণ্ড) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিচার্য্য, গ্রীক দর্শনের প্রথম পর্ব্বে, যবন (Ionian) দর্শনে, হিন্দু প্রভাব আছে কিনা।

এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী যবন (Ionia) দেশের অন্তর্গত মিলেটাস নগরে আনুমানিক ৬২৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যবনদর্শনের জনক থালেস * (Thales) জন্মগ্রহণ

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে গ্রীক নামগুলি অক্ষরান্তরিত হইল।

করিয়াছিলেন এবং ৫৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, থালেস ঈজিপ্তে গিয়া জ্যামিতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে বেবিলনে যতটা জ্যোতিষ জানা ছিল তাহা তিনি জানিতেন। এই জ্যোতিষের জ্ঞানের বলে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মে মাসে যে সূর্য্যগ্রহণ হয় তাহা থালেস পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। থালেস গণিত ও জ্যোতিষের ন্যায় যবন দেশে দার্শনিক চিন্তারও প্রবর্ত্তক এবং গুরু। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, জল জগতের বীজ পদার্থ; জল হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং জলেই উহার লয়। থালেস যে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখিয়া গিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে আর যে-সকল দার্শনিক মত থালেসের নামের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে তাহা তাঁহার প্রবর্ত্তিত কি না বলা কঠিন।

থালেসের সহযোগী মিলেটাসবাসী আনাক্সিমান্দর (Anaximander) আনুমানিক ৬১১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫৪৬ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। আনাক্সিমান্দরের রচিত একখানি দার্শনিক গ্রন্থ এক সময় প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থের কতক অংশের সার কথা পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাওয়া যায়। আনাক্সিমান্দর সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বচনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

Anaximander of Miletos, son of Praxiades, a fellow-citizen and associate of Thales, said that the material cause and first element of things was the Infinite, he being the first to introduce this name of the material cause. He says it is neither water nor any other of the so-called elements, but a substance different from them which is infinite, from which arise all the heavens and the worlds within them.

He says this is "eternal and ageless," and that it "encompasses all the worlds."

And into that from which things take their rise they pass away once more "as is meet ;...

And besides this, there was an eternal motion, in which was brought about the origin of the worlds.

He did not ascribe the origin of things to any alteration in matter, but said that the oppositions in the substratum, which was a boundless body were separated out.*

অর্থাৎ জগতের যাহা উপাদান কারণ তাহা জল নয়, বায়ু নয়, অথবা অন্য কোন ভূত (element) নয়, তাহা অসীম, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, অবিনাশী; সমস্ত পদার্থ এই অসীম হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই পুনরায় লয়প্রাপ্ত হয়। এই অসীমের মধ্যে নিত্য আবর্ত্তন (eternal motion) আছে, তাহারই ফলে সৃষ্টি হয়। অসীমে এবং সৃষ্ট সসীম পদার্থনিচয়ে বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু অসীমের অন্তরে পরস্পরবিরোধী যে গুণ (oppositions)-সমূহ আছে তাহারা সৃষ্টির সময় বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন হয় (separated out)। পরে উদ্ধৃত একটি বচনে দেখা যাইবে, আনাক্সিমান্দর এই মূল পদার্থকে অব্যক্ত (indeterminate) বলিয়াছেন।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, আনাক্সিমান্দরের অসীম জল, বায়ু প্রভৃতির মত স্থূল পদার্থ নহে, কিন্তু সাংখ্যের প্রধানের মত সূক্ষ্ম, নিত্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র পদার্থ। সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ প্রধান এবং প্রধানের কার্য্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যেমন ভেদ ও অভেদ দুইই আছে, আনাক্সিমান্দরের জগৎকারণ অসীম এবং অসীমের কার্য্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেও ভেদাভেদ দুই-ই আছে। প্রধান ত্রিগুণময়। আনাক্সিমান্দরের 'অসীমে' ত্রিগুণ নাই, কিন্তু ত্রিগুণের স্থানে আছে পরস্পরবিরোধী কতকগুলি গুণ (oppositions in the substratum)। সাংখ্য দর্শনের মতে অচেতন প্রধানকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে নিষ্ক্রিয় পুরুষের সামীপ্য; আনাক্সিমান্দরের অসীমকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে অনন্ত আবর্ত্তন (eternal motion)। সাংখ্যের প্রধানে এবং আনাক্সিমান্দরের অসীমে এতটা সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, আনাক্সিমান্দর হিন্দুর সাংখ্যের নিকট অনেকটা ঋণী। এই অনুমানের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

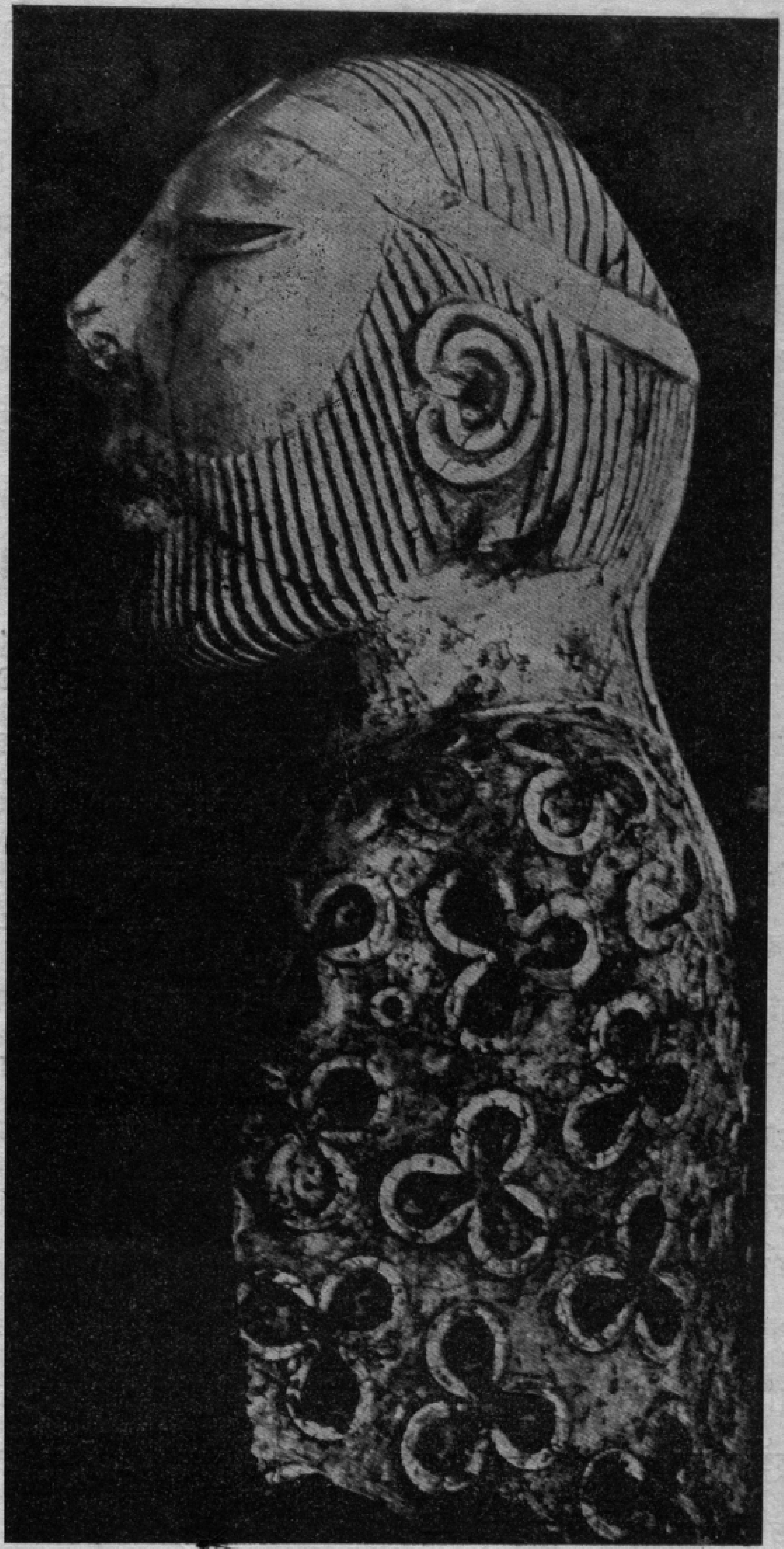
প্রথম আপত্তি—সাংখ্যের প্রধানে এবং আনাক্সিমান্দরের অসীমে সাদৃশ্য অল্প, তফাৎ বেশী; এতটুকু সাদৃশ্য লইয়া

* John Burnet, *Early Greek Philosophy*, Fourth edition, London, 1930, p. 52.

এত বড় অনুমান করা যায় না। আনাক্সিমান্দরের দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও, সাংখ্যের প্রধানে এবং আনাক্সিমান্দরের অসীমে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আনাক্সিমান্দর অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন এবং থালেসের মতও তিনি জানিতেন। এরূপ পণ্ডিতের নিকট কোন পরমতের অবিকল নকল আশা করা যায় না। আনাক্সিমান্দরের অসীম কারণ-বাদ যে সাংখ্য প্রভাব পরিপুষ্ট এরূপ মনে করিবার আর এক কারণ, যবন দেশের স্বাভাবিক দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত এই মতের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না; এই মত যবন দেশের আর কোন দার্শনিক গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। আনাক্সিমান্দরের গুরুস্থানীয় থালেস যে জলকে জগতের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আনাক্সিমান্দরের সহযোগী এবং শিষ্য স্থানীয় ছিলেন আনাক্সিমেনেস। ইনিও মিলেটস্‌নগরবাসী ছিলেন। ইনি আনুমানিক ৫৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। আনাক্সিমেনেসের রচিত একখানি দার্শনিক গ্রন্থ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন প্রমাণ পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাওয়া যায়। আনাক্সিমেনেসের মত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

> Anaximenes of Miletes, son of Eurystratos, who had been an associate of Anaximander, said, like him, that the underlying substance was one and infinite. He did not, however, say it was indeterminate, like Anaximander, but determinate; for he said it was air.
>
> From it, he said, the things that are, and have been, and shall be, the gods and things divine, took their rise, while other things come from its offspring.*

আনাক্সিমান্দরের সহিত তাঁহার শিষ্য আনাক্সিমেনেসের মতের মুখ্য প্রভেদ এই, আনাক্সিমান্দরের মূলাধার পদার্থ সূক্ষ্ম, অব্যক্ত (indeterminate); আনাক্সিমেনেসের মূলাধার পদার্থ স্থূল, ব্যক্ত (determinate) বায়ু। থালেস, আনাক্সিমান্দর এবং আনাক্সিমেনেস যবন দার্শনিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই তিন জন ছাড়া এই শাখার আর যে-সকল দার্শনিক অভ্যুদিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ থালেসের অনুসরণ করিয়া জলকে জগতের মূল কারণ বলিয়াছেন, কেহ বা আনাক্সিমেনেসের অনুসরণ করিয়া অনন্ত বায়ু-মণ্ডলকে জগতের মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।*



(১নং ক) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি যোগীর মূর্ত্তি (পার্শ্বচিত্র)

আনাক্সিমান্দর হয়ত লিডীয়ার রাজা ক্রীসাসের রাজধানী সার্ডিস নগরে কোন হিন্দু আগন্তুকের নিকট প্রধান

*John Burnet, *Early Greek Philosophy*, p. 73

* W. T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, London, 1920, p. 30.

কারণ-বাদের আভাস পাইয়াছিলেন। এই প্রকার মতবাদের পুনঃ পুনঃ উদ্ভাবন অসম্ভব।

আনাক্মিমান্দরের দর্শনে সাংখ্যের প্রভাবের অস্বীকৃতির আর এক কারণ, সাংখ্য যে এত প্রাচীন, অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে সাংখ্যমত যে এত প্রচার লাভ করিয়াছিল, এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'। 'সাংখ্যকারিকা' খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা। অনেকে মনে করেন, যে-দর্শনের প্রধান পাঠ্য গ্রন্থ এত আধুনিক, সেই দর্শন আর কত দূর প্রাচীন হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং অধিকতর বিস্তৃত সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্রে'।

বেদান্তের বা উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণ বেদান্ত-সূত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে-সকল বেদান্তবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম জগৎকারণ, বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তাহাদের অর্থের বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের ১৩৪ সূত্রের মধ্যে ১৩০টি সূত্রেই কার্য্যত দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যে-সকল উপনিষদ্‌বাক্য সাংখ্যের অচেতন প্রধানের বা প্রকৃতির জগৎ কারণত্ব সমর্থন করে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ বা সাংখ্যপন্থী প্রচার করেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই সকল বচন প্রধানকারণবাদ সমর্থন করে না, ব্রহ্মকারণবাদই প্রতিপাদন করে। সভাষ্য এই সকল সূত্র পাঠ করিলে মনে হয়, বেদান্ত সূত্র রচনার পূর্ব্বে এমন কোন প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ছিল যাহাতে উপনিষদের সাংখ্যাদর্শনানুসারী ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের শেষ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

দেবল প্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থেষ্বাশ্রিতঃ।

"দেবল প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মসূত্রকার নিজ নিজ গ্রন্থে (প্রধান কারণবাদ) স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।"

দেবলের ধর্ম্মসূত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মসূত্র শ্রৌত গৃহ্য এবং ধর্ম্ম এই তিন খণ্ডে নিবদ্ধ কল্পসূত্রের অন্তর্গত এবং আদৌ বিভিন্ন বৈদিক শাখার বা চরণের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যগণের সঙ্কলিত। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে যাহা সূত্রযুগ দেবলাদির ধর্ম্মসূত্র সেই যুগেই আদৌ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সূত্রযুগের পূর্ব্বে বেদের ব্রাহ্মণখণ্ডের আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল। এই উপনিষৎ রচনার যুগে বিশেষ প্রচার লাভ না করিয়া থাকিলে অবশ্য প্রধানকারণবাদ কোন ধর্ম্মসূত্রে স্থান লাভ করিতে পারিত না।

প্রাচীন সাংখ্য গ্রন্থ যখন বিলুপ্ত হইয়াছে তখন দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাস ধরিয়া সাংখ্যের প্রচীনতা নিরূপণ করা অসম্ভব। কিন্তু মতামতের পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাব করিয়া আপেক্ষিক প্রাচীনতা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সাংখ্যের ভিত্তি প্রধানকারণবাদ, উপনিষদের দার্শনিক মতের ভিত্তি ব্রহ্মকারণবাদ। এখন বিচার্য্য, মতামতের উৎপত্তির ক্রমানুসারে এই দুইটি মতের মধ্যে কোন মতের উৎপত্তি আগে এবং কোন মতের উৎপত্তি পরে হওয়ার সম্ভব। সাংখ্য অনাত্মার বা বাহ্য জগতের মূলে নিত্য প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সুতরাং এই মতকে বলা যায় অস্তিবাদ (realism)। সাংখ্য অনাত্মা সম্বন্ধে অস্তিবাদী। আবার সাংখ্য প্রধান বা প্রকৃতি এবং পুরুষ বা আত্মার এই দুইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সুতরাং সাংখ্য দ্বৈতবাদী। উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; আর যাহা কিছু আছে তাহা আত্মাতেই অবস্থিত। সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বিজ্ঞানবাদ (idealism), এবং অদ্বৈতবাদ (monism)। এখন জিজ্ঞাস্য, মতামতের পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাবে অস্তিবাদ (realism) আগেকার, না বিজ্ঞানবাদ (idealism) আগেকার; এবং সাংখ্যের দ্বৈতবাদ (dualism) আগেকার, না বেদান্তের অদ্বৈতবাদ (monism) আগেকার। অধ্যাপক ডয়সনের মতে উপ-নিষদের বিজ্ঞানবাদ (idealism) জমাট বাঁধিয়া অস্তিবাদে (realism) পরিণত হইয়াছে; উপনিষদের অদ্বৈতবাদ ভাঙ্গিয়া প্রথম সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ, এবং তার পর প্রকৃতি পুরুষাত্মক দ্বৈতবাদ গঠিত হইয়াছে; অর্থাৎ মতামতের ক্রমোৎপত্তির হিসাবে আগে বেদান্ত (উপনিষৎ), তারপর

সাংখ্য।* সুপরিচিত গ্রীকদর্শনের ইতিহাসে মতামতের ক্রমোৎপত্তির কিন্তু ঠিক বিপরীত ধারা দেখা যায়। থালেস, আনাক্সিমান্দর, আনাক্সিমেনেস অস্তিবাদী ছিলেন; ইহাঁরা প্রত্যেকেই, ব্যক্ত হউক অব্যক্ত হউক, একটা বাহ্য পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে বিজ্ঞানবাদের প্রথম আভাস পাওয়া যায় পার্মেনিদেসের দর্শনে এবং পূর্ণবিকাশ দেখা যায় প্লাতোর দর্শনে। হিন্দুদর্শনের ইতিহাসে যে এই ক্রমের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে যেমন সাংখ্যের দ্বৈতের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে, পক্ষান্তরে সাংখ্যের দ্বৈতবাদের পরিণামে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে (৪।১০) কথিত হইয়াছে—

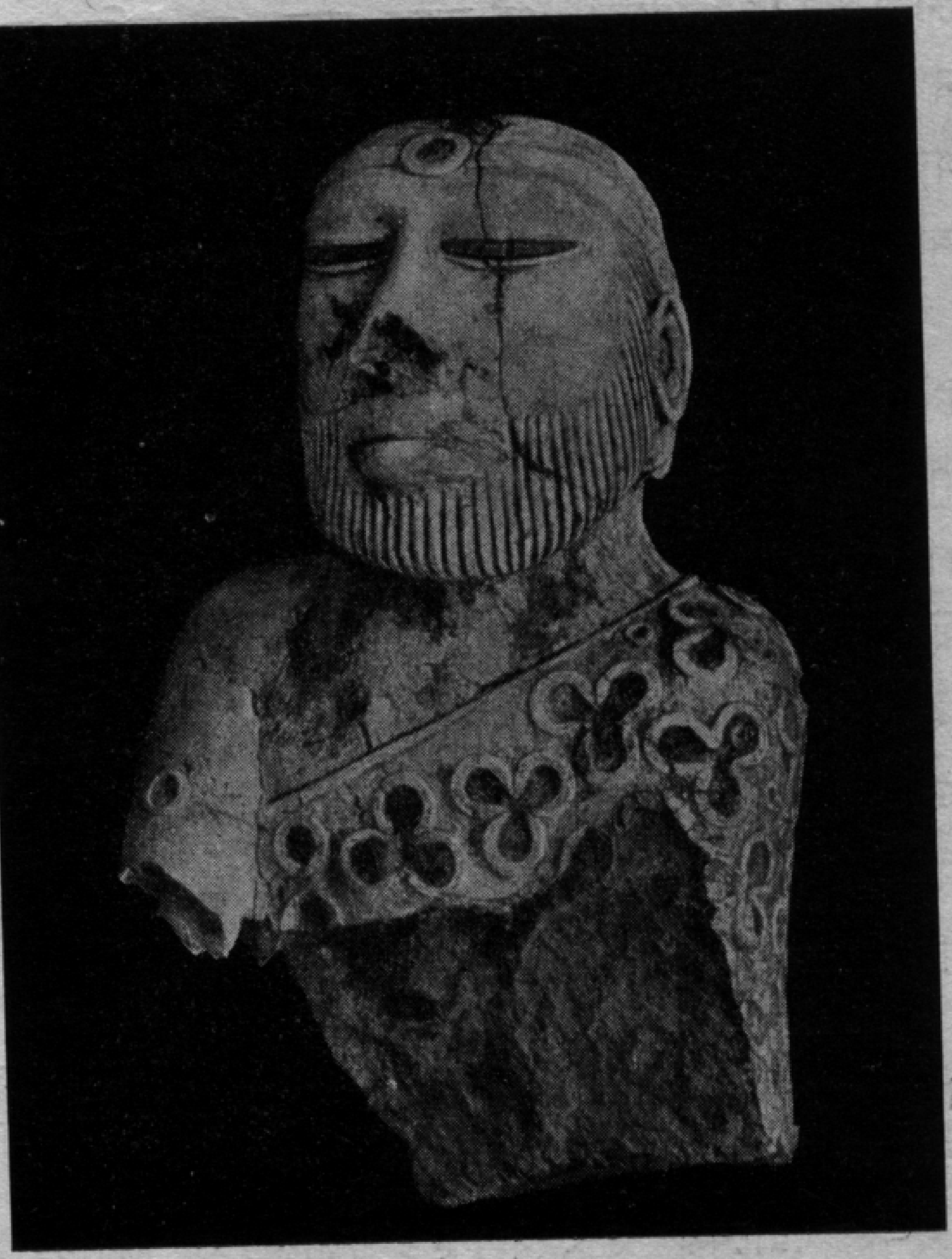
> মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
> "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া, এবং মায়ার বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া, জানিবে।"

সাংখ্যকারিকার ১৭ কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ 'ষষ্ঠিতন্ত্র' নামক অতি প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ত্ততে
> "পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রধান (সৃষ্টি কার্য্যে) প্রবৃত্ত হয়।"

সাংখ্যের বহুপুরুষ বেদান্তের একে (পরমাত্মায়) পরিণত হইয়াছে, এবং সাংখ্যের প্রধান মায়াতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমানের কোন অন্তরায় নাই; বরং এইরূপ অনুমানই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। মানুষের চিন্তা-মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া একমূলে পৌছিতে পারিলেই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করে। এই হিসাবে সাংখ্যের দ্বৈতবাদ এবং বহু আত্মাবাদ উপনিষদের অদ্বৈতবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে হয়।

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদে যে-সকল আখ্যায়িকা আছে তাহা হইতে জানা যায়, অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা এক সময় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই সকল আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু কোন ভিত্তি না থাকিলে নিজেদের বর্ণের গ্লানিকর এমন সকল আখ্যায়িকা যে ব্রাহ্মণেরা কল্পনা করিতে যাইতেন ইহা মনে হয় না। আর একটি আধুনিক ভুল সংস্কার, জাতিভেদের মূল আর্য্য-অনার্য্যের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে পরাজিত অনার্য্যেরা শূদ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে, এবং আর্য্যেরা বৃত্তি অনুসারে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ



(১নং খ) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি যোগীর মূর্ত্তি (সম্মুখ)

ছাড়া অন্যান্য দেশেও তথাকথিত আর্য্য-অনার্য্যের মধ্যে, সভ্যতর আক্রমণকারী জাতির এবং হীন আদিম অধিবাসীর মধ্যে, আবহমান কাল এইরূপ দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিজিত আদিম অধিবাসীরা শূদ্রত্ব বা দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু বিজয়ী আগন্তুকগণের মধ্যে আর কোথাও ত স্বতন্ত্র তিন বর্ণের অভ্যুদয় দেখা যায় না। যদি বৃত্তিভেদই কেবল জাতিভেদের কারণ হইত, তবে সমস্ত সভ্য দেশেই জাতিভেদ দেখা যাইত। সুতরাং অনুমান হয়,

* Deussen, *The Philosophy of the Upanishads* (English Translation), Edinburgh, 1906, pp. 244-246.

আদৌ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ভেদ শরীরের চর্ম্মের বর্ণভেদ (racial difference) মূলক হউক আর না হউক, খুব সম্ভব আচার-বিচারের বিশেষ ভেদ (cultural difference) মূলক ছিল।* যদি ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়বিদ্যা হয়, তবে তাহার মূলও স্বতন্ত্রভাবে ক্ষত্রিয় সমাজে বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাকে ক্ষত্রিয়বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে উহার বীজ দেখা যায়। ঋগ্বেদের এই সকল মন্ত্রে যে ক্ষত্রিয়প্রভাব নাই তাই বা কে বলিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-গত শ্রুতি-স্মৃতি (tradition) উপেক্ষা করিয়া কল্পনার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মোক্ষসাধন ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়বিদ্যা একথা শুধু উপনিষদে বলা হয় নাই, ভগবদ্গীতায়ও বলা হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে (৩৬-) অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করে? বাসুদেব উত্তর করিয়াছেন, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম বা তৃষ্ণা এবং কাম হইতে উৎপন্ন ক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ পাপ করে। এই কামকে পরাজিত করিবার উপায় সম্বন্ধে বাসুদেব বলিতেছেন :—

"এই প্রকারে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, এবং মনকে আত্মায় সমাহিত করিয়া, হে মহাবাহো, তুমি কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, যোগ বা সমাধিবলে আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিতে পারিলে কাম ধ্বংস হয়। তারপর চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায় বাসুদেব বলিতেছেন :—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবে ঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহমহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

অর্থাৎ এই যোগ আমি বিবস্বৎ (সূর্য্য)কে উপদেশ দিয়াছিলাম; বিবস্বান্ উপদেশ দিয়াছিলেন মনুকে, এবং মনু উপদেশ দিয়াছিলেন ইক্ষাকুকে। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিতেন। কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমি আজ তোমাকে এই পুরাতন যোগ উপদেশ দিলাম।

এখানে যোগ শব্দের অর্থ যোগসাধনলভ্য ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান। সুতরাং উপনিষদের ন্যায় গীতায়ও ব্রহ্ম-বিদ্যাকে রাজর্ষিবিদ্যা বা ক্ষত্রিয়বিদ্যা বলা হইয়াছে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মকে বলা হয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, এবং জ্ঞানকাণ্ডকে বলা হয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

ভগবান নারায়ণ এই জগৎসৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতির ইচ্ছা করতঃ অগ্রে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ (যাগযজ্ঞাদি) গ্রহণ করাইয়াছিলেন; তারপর সনক-সনন্দনাদি অন্য প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগ্য লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লক্ষণ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ (এই) দুই প্রকার।

শঙ্করাচার্য্য এখানে যে-কথার আভাস দিয়াছেন তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩৪২ অধ্যায়, ১৩০৭৫-১৩০৮০) বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।—

মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন (ঋষি ব্রহ্মার) মন হইতে উৎপন্ন। ইঁহারা বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, বেদের আচার্য্য, প্রবৃত্তি লক্ষণ (সর্গ কামনায় অনুষ্ঠিত) ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজাপতি রূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন।...সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল এবং সনাতন এই সাতজন স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী, নিবৃত্তিলক্ষণ (জ্ঞান-বৈরাগ্য) ধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া কথিত হয়েন। ইঁহারা যোগবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, সাংখ্যতত্ত্ববিশারদ, ধর্ম্মশাস্ত্রের আচার্য্য এবং মোক্ষপথের প্রবর্ত্তক।

এখানে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের সকল প্রবর্ত্তককেই 'সাংখ্য-তত্ত্ববিশারদ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্যতত্ত্বকে নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের মূলে স্থাপন করা হইয়াছে। মহাভারতকারের সাংখ্য বিশুদ্ধ সাংখ্য নয়, বেদান্তের এবং পাঞ্চরাত্রের সহিত মিশ্রিত। বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ সাংখ্যমতের আকর ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। সাংখ্যকারিকার প্রাচীনতম ভাষ্যকার গৌড়পাদ ভাষ্যের সূচনায় লিখিয়াছেন,—

ইহ ভগবান ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম, তদ্ যথা—
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তামহর্ষয়ঃ॥

মহাভারতের পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের সন, সনৎসুজাত এবং সনৎকুমারের স্থানে এই বচনে আসুরি, পঞ্চশিখ এবং বোঢ়ুর নাম আছে। সাংখ্যকারিকার ৭০ কারিকায় আসুরিকে বলা হইয়াছে কপিলের শিষ্য এবং পঞ্চশিখকে

* ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের মূলতঃ আচারভেদ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 41-এ আলোচিত হইয়াছে।

বলা হইয়াছে আসুরির শিষ্য। এই সকল বচন সপ্রমাণ করিতেছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কপিলের সাংখ্য সৃষ্টির আদি হইতে আছে, অর্থাৎ যতদূর সম্ভব প্রাচীন। মহাভারতের অন্যত্র (শান্তিপর্ব্ব, ৩৫১ অধ্যায়, ১৩৭১১) বলা হইয়াছে—

সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে
বেদাশ্চ সর্ব্বে নিখিলেন রাজন।

"হে রাজন সাংখ্য, যোগ এবং সমস্ত বেদ (এই তিনই) সনাতন, অর্থাৎ চিরদিন আছে।"

মহাভারতকারের এই প্রকার উক্তি উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই উক্তি সাংখ্যের এবং যোগের প্রাচীনতা এবং বেদ হইতে স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধীয় লোকমত সূচিত করে। অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রমাণের সহায়তা ব্যতীত এইরূপ লৌকিক-বিশ্বাসের ঐতিহাসিক মূল্য স্থির করা যায় না। সৌভাগ্য-ক্রমে যোগ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যোগের সম্বন্ধে প্রধান পাঠ্য পুস্তক, পতঞ্জলির যোগসূত্র। অনেকে মনে করেন যোগসূত্রও সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা বেশী প্রাচীন হইবে না। যোগসূত্রে যোগ বা সমাধি প্রধান দুই ভাগে বা স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগ, দ্বিতীয় ভাগ 'অসম্প্রজ্ঞাত' যোগ বা সমাধি। 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগের চারি স্তর—

(১) বিতর্ক—স্থূল বস্তুতে চিত্ত সমাধান।

(২) বিচার—সূক্ষ্ম বস্তুতে (তন্মাত্রে) চিত্ত সমাধান।

(৩) আনন্দ।

(৪) অস্মিতা (অহঙ্কার)।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হইলে যখন সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় গৌতম বুদ্ধের জীবন-কথা লইয়া যত সূত্র বা গ্রন্থ আছে তাহাদের সকলের মধ্যেই কথিত হইয়াছে, গৌতম ক্রমে চারি প্রকার ধ্যান করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির যোগ-সূত্রানুসারে ধ্যান যোগের একতম অন্তরঙ্গ। অনেক স্থলে ধ্যান এবং সমাধি যোগের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পালি এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে বিবৃত গৌতম বুদ্ধের অনুষ্ঠিত এবং উপদিষ্ট চারি প্রকার ধ্যান সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অনুরূপ। ললিতবিস্তরে প্রথম ধ্যানের বিবরণ এইরূপ—

বিবিক্তং কামৈর্বিবিক্তং পাপৈরকুশলৈর্ধর্ম্মৈঃ সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং প্রথমং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। (২২ অধ্যায়)



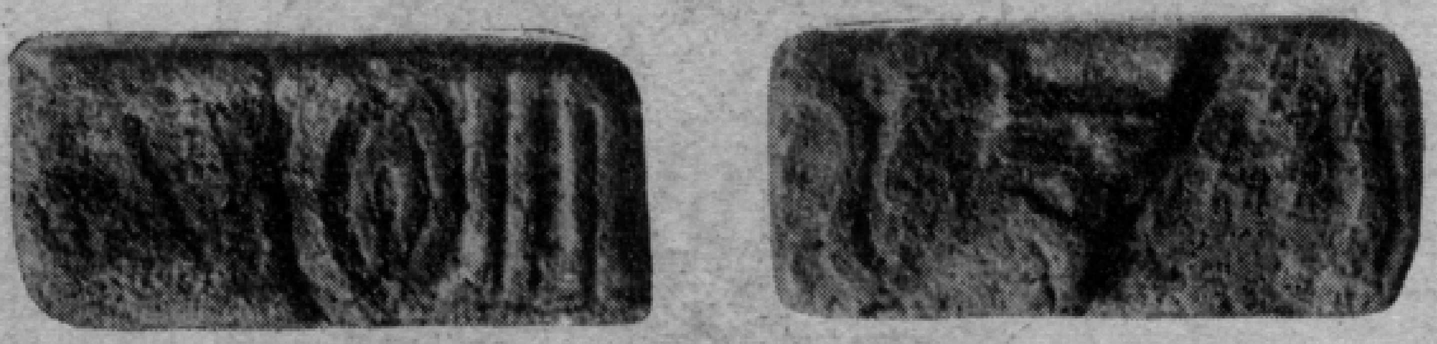
(২নং) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রায় যোগাসনস্থ পশুপতির চিত্র

সবিতর্ক এবং সবিচার একত্র থাকায় পতঞ্জলির সম্প্রজ্ঞাত যোগের যাহা প্রথম (সবিতর্ক) এবং দ্বিতীয় (সবিচার) স্তর তাহা এখানে একস্তরে নিবদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির তৃতীয় স্তরের লক্ষণ আনন্দ, বৌদ্ধমতে দ্বিতীয় ধ্যানের প্রধান লক্ষণ অধ্যাত্ম সংপ্রসাদ; সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চতুর্থ স্তরের লক্ষণ অস্মিতা, বৌদ্ধমতে তৃতীয় ধ্যানের লক্ষণ স্মৃতিমত্তা। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সহিত চতুর্থ ধ্যানের ঐক্য অবশ্যই আছে। ভদ্রবাহুর কল্প-সূত্রের টীকায় তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের অনুষ্ঠিত শুক্ল ধ্যানও এইরূপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছে,* এবং প্রথম ধ্যানকে বলা হইয়াছে 'পৃথক্ত্ববিতর্কং সবিচারম্', এবং দ্বিতীয় ধ্যানকে বলা হইয়াছে 'একত্ববিতর্কমবিচারম্'। এখানেও সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রথম দুই স্তরকে প্রথম ধ্যানের সামিল করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, যোগের অন্তরঙ্গ ধ্যানের বা সমাধির স্তরভেদ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি ঐক্য আছে। পতঞ্জলির যোগসূত্রের সময় যাহাই হউক, যোগের অন্তরঙ্গ ধ্যান যে প্রাচীন বৌদ্ধ পালি সুত্ত তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন সাক্ষ্য

The Kalpasutra of Bhadhrabahu edited by H. Jacoli, Leipzig, 1879, p. 112,

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪।৫ যেখানে আত্মাকে 'শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য' বলা হইয়াছে। নিদিধ্যাসন অর্থ ধ্যান।

যোগের ধ্যান ধারণা সমাধি যেমন অন্তরঙ্গ, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি তেমন বাহ্য অঙ্গ। এই সকল বাহ্য অঙ্গের মধ্যে আসন অর্থাৎ বসিবার ভঙ্গী প্রধান। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আছে, 'স্থিরসুখমাসনম্' (২।৪৬), 'নিশ্চল অথচ আরামজনক আসন' হইবে। যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে অনেক



(৩নং) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রায় যোগীর পূজার চিত্র

আসনের নাম আছে, এবং বাচস্পতিমিশ্র এই সকল আসন বর্ণনা করিয়াছেন। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রে আছে (৪।১।৭-৯), অচল ভাবে বসিয়া ধ্যান করিবে। ভগবদ্গীতায় (৬।১৩) যোগাসনের এই সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায় শিরো গ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥

"শরীর, গ্রীবা এবং মস্তক সমসূত্রে অচল ভাবে রাখিয়া, স্থির হইয়া, নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং অন্যান্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগানুষ্ঠান করিবে।"

এখানে দেহের উপরিভাগের এবং চক্ষুর ভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ আছে, কিন্তু কি প্রকারে হস্তপদ বিন্যস্ত করিয়া বসিতে হইবে সে-সম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।৮) যোগাসনের এই পর্য্যন্ত লক্ষণই দেখা যায়—

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং

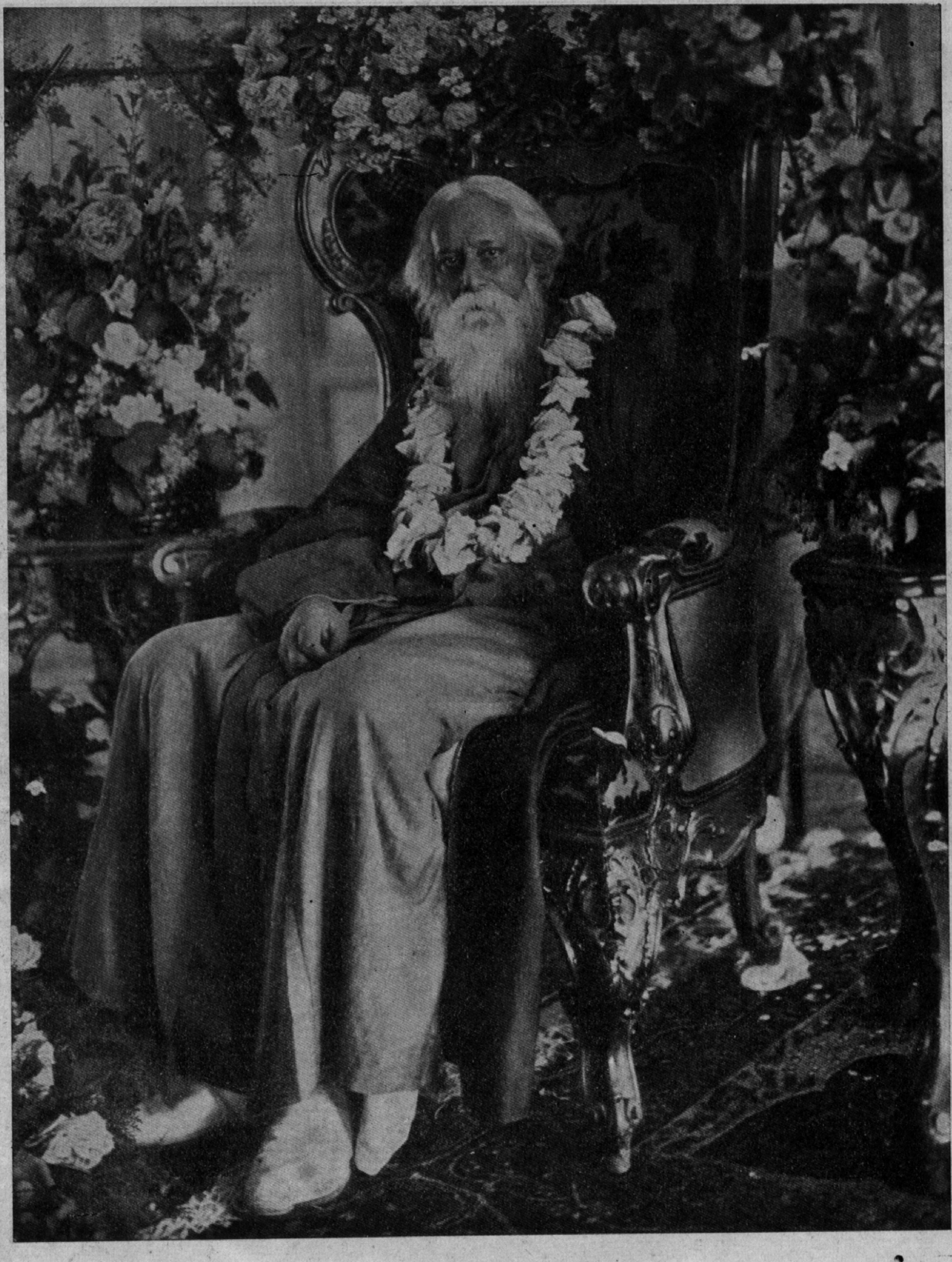
"শরীরের তিন ভাগ (কায়, গ্রীবা এবং মস্তক) উন্নত করিয়া এবং সমসূত্রে রাখিয়া।"

প্রাচীন শাস্ত্রে যোগাসন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা থাকায় অনুমান হয়, কি ভাবে হস্তপদ রাখিয়া ধ্যানে বসিতে হইবে এই বিষয়ে সাধকের স্বাধীনতা ছিল। এই নিমিত্তই পরবর্ত্তী যোগশাস্ত্রে অনেক আসনের ব্যবস্থা দেখা যায়। যোগীর আসনের প্রধান লক্ষণ, শরীরের উপরার্দ্ধ লম্বভাবে স্থাপন এবং নাসাগ্রবদ্ধ-দৃষ্টি। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের 'আয়ারংগসুত্তে' (আচারাঙ্গ-সূত্রে) কথিত হইয়াছে (২।১৫।২৫), তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান (মহাবীর) যখন শুক্লধ্যান করিয়া "কেবল" জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তখন উর্দ্ধদিকে জানুদ্বয় এবং অধোদিকে মস্তক রাখিয়া বসিয়াছিলেন (উডঢং জানু অহো শিরসা)। পাতঞ্জল সূত্রের (২।৪৬) ব্যাস-ভাষ্যে ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন, উষ্ট্রনিষদন প্রভৃতি নানাবিধ আসনের নাম আছে। এইরূপ কোন আসনই বোধ হয় আচারাঙ্গ সূত্রকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ যাবৎ জৈন তীর্থঙ্করগণের যত আসনবদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে সকলগুলিই পর্য্যঙ্ক-বন্ধাসনস্থ। সকল বৌদ্ধগ্রন্থেই আছে গৌতম বুদ্ধ পর্য্যঙ্ক-বন্ধাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ধ্যানমুদ্রাবদ্ধ যত বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সকলগুলিই পর্য্যঙ্কবন্ধাসনে আসীন। অন্যান্য মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির যত প্রাচীন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সকলেরই নাসা-বদ্ধদৃষ্টি দেখা যায়। এই লক্ষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুর উপাস্য পুরুষ বা দেবতামাত্রই যোগীরূপে কল্পিত। এই যোগাসন এবং যোগাসনবদ্ধ উপাস্যের কল্পনা কত প্রাচীন?



(৪নং) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রায় যোগীর পূজার অঙ্কিত চিত্র

এই পর্য্যন্ত যত যোগাসনস্থ বা ধ্যানমুদ্রাবদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মথুরায় প্রাপ্ত দুই-তিনখানি তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এই কয়খানি মূর্ত্তিও খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালের অপেক্ষা প্রাচীনতর হইবে না। ইহারও অন্ততঃ চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার



তেহারানে ২৫শে বৈশাখ তারিখে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে অজস্র গোলাপফুলের
দ্বারা সজ্জিত গৃহে গৃহীত কবির আলোকচিত্র



তেহারানে আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কবিকে অভ্যর্থনা



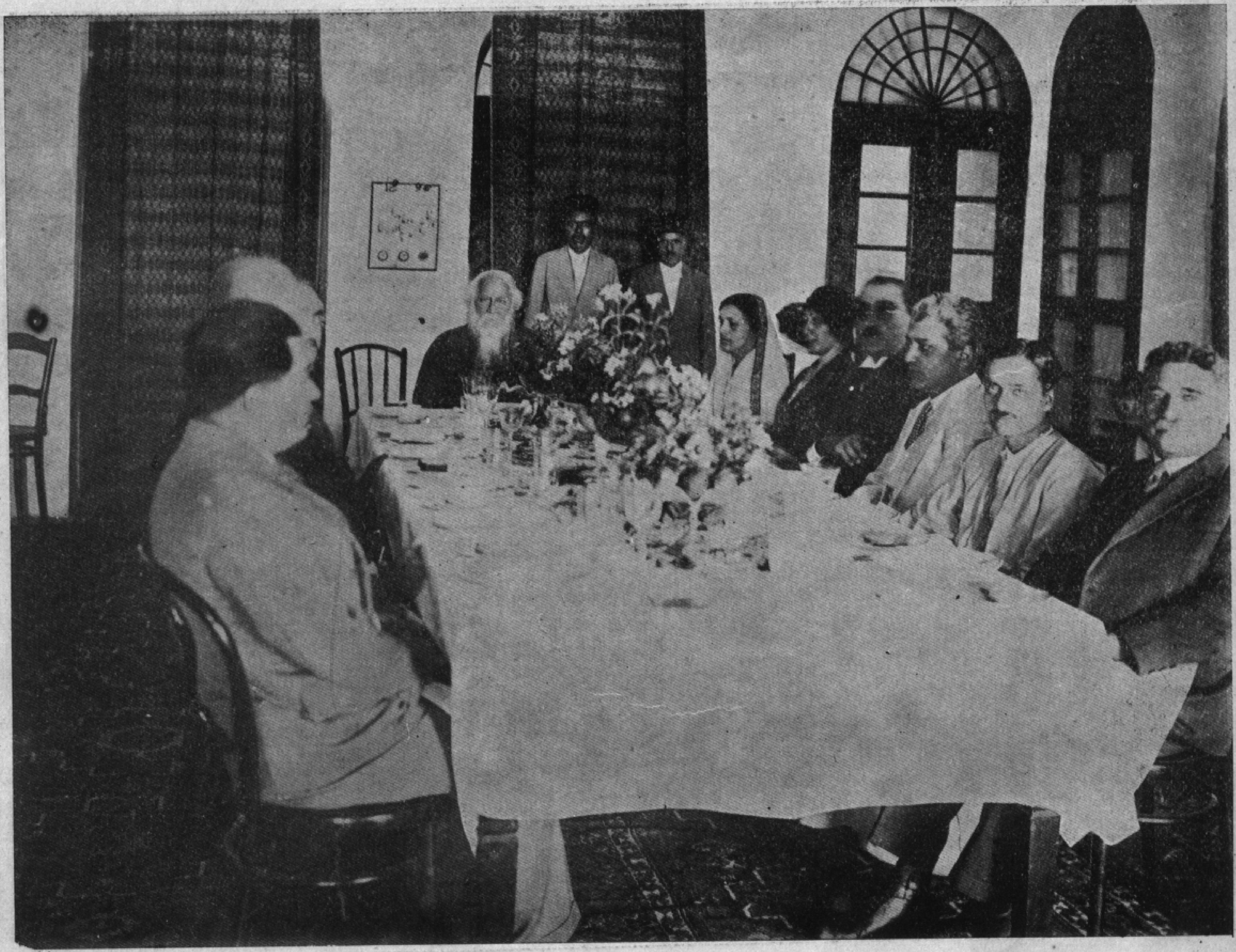
তেহারানের আমেরিকান কলেজ উদ্যানে কবির বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ও বন্ধুবর্গের সম্মিলন
ছবির মধ্যস্থলে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী দণ্ডায়মান



পারস্য-সীমান্ত হইতে বগদাদ ষ্টেশনে কবির ট্রেন উপস্থিত হইলে সেখানকার শিক্ষকবর্গ, সাহিত্যিকবর্গ, ব্যবসায়ীবর্গ, মহিলামণ্ডলী, আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ, ভারতীয়গণের প্রতিনিধিবর্গ ও সরকারী প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে সম্মিলিত অভ্যর্থনা।



বগদাদ হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে একটি বেদূইন তাঁবু, রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট বেদূইন শেখ



বুশেয়ারে পুরী রেজার বাসভবনে কবির সান্ধ্যভোজন
ডান দিকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী উপবিষ্ট

পালি বৌদ্ধসূত্রে নিয়মিতরূপে পর্য্যঙ্কাসনে ধ্যানানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যে নিদিধ্যাসনের বিধি আছে তাহাও এই নিয়মানুসারী। এখন জিজ্ঞাস্য, এই নিয়ম হইল কবে এবং কোথায়? বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞ দান (ইষ্টাপূর্ত্ত) তপস্যার বিধি আছে, নিদিধ্যাসনের বিধি নাই। এই বিধি কি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ রচনার সময় সহসা উদ্ভাবিত হইয়াছিল? অভিনব মতামতের উদ্ভাবন প্রতিভাশালী পুরুষের কার্য্য, তাহা সহসা ঘটিতে পারে। কিন্তু যোগের মত অনুষ্ঠান সহসা প্রচারলাভ করিতে পারে না। সুতরাং যোগকে অবৈদিক এবং প্রাগ্‌বৈদিক মনে করাই কর্ত্তব্য। মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রত্নবস্তু এই অনুমানের সমর্থন করে।

মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত প্রস্তরের একটি উপবিষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তির ভগ্নাংশে * (১নং ক-খ চিত্র) নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি এবং কায়-শিরো-গ্রীবা সমসূত্রে বিন্যস্ত দেখিয়া এই প্রস্তাবের লেখক অনুমান করিয়াছিল এইটি যোগীর মূর্ত্তি।† এই মতের সমালোচনা করিতে গিয়া একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তির দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ নয়, ইহার চক্ষু টেরা (squint); আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন এই প্রকার চক্ষু সিন্ধুদেশবাসীর স্বাভাবিক লক্ষণ। সার জন্ মার্শেল কর্ত্তৃক প্রকাশিত মোহেঞ্জোদড়ো সম্বন্ধীয় পুস্তকে চিত্রিত দুইটি মুদ্রায় বা সিলমোহরে যোগানুষ্ঠানরত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার মধ্যে একটি মুদ্রায় আছে, তিন মুখবিশিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি পর্য্যঙ্কবদ্ধ ভঙ্গীতে সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। এই মূর্ত্তির বাহুদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা জানু স্পর্শ করিয়া দুইপার্শ্বে বিস্তৃত। এত ক্ষুদ্র চিত্রে নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি দেখাইবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার অন্য সমস্ত লক্ষণই যোগীর নিশ্চলতা এবং স্থিরতা সূচিত করে। মূর্ত্তির মস্তকের উপরে ত্রিশূল চিহ্ন; সিংহাসনের নীচে দুইটি হরিণ ঘাড় বাঁকাইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া আছে; চারিদিকে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার এবং মহিষ এই চারিটি পশু অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং ব্যাঘ্রের ও হস্তীর অন্তরালে একটি মনুষ্য দণ্ডায়মান আছে। সার জন্ মার্শেল মনে করেন এইটি মহাযোগী পশুপতি শিবের মূর্ত্তি (২ নং চিত্র)। এখানে অন্য প্রকার অনুমানের অবকাশ নাই। পশুপতি সেকালে হয়ত অন্য কোন ভাষায় অন্য কোন নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মুদ্রার সিংহাসনের উপর ঠিক এই ভঙ্গীতে সাধারণ (একমুখ) মনুষ্য মূর্ত্তি উপবিষ্ট। দুই দিকে দুইজন উপাসক জানু পাতিয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক উপাসকের মস্তকের উপর একটি সর্প ফণাবিস্তার করিয়া রহিয়াছে (৩ নং চিত্র)। এই মুদ্রার অঙ্কিত চিত্রে মূর্ত্তি কয়টি পরিষ্কার দেখা যায় (৪নং চিত্র)। শুনিয়াছি হরপ্পায়ও এইরূপ চিত্রযুক্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উপাস্যরূপে অঙ্কিত এই সকল যোগীর মূর্ত্তির তাৎপর্য্য কি? এই ভঙ্গীতে নির্ম্মিত বুদ্ধ, জৈন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদির মূর্ত্তি তত্ত্বজ্ঞানের বিগ্রহরূপে কল্পিত। মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রায় অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলিও কি বুদ্ধের বা জিনের মত তত্ত্বদর্শীর মূর্ত্তি? যোগের সঙ্গে বেশী সম্বন্ধ সাংখ্যদর্শনের। সাংখ্য-দর্শন যোগের মূল দার্শনিক ভিত্তি। সাংখ্য-মতের খণ্ডনের পর বেদান্তসূত্রে উক্ত হইয়াছে (২।১।৩)—

> এতেন যোগ প্রোক্তঃ।
> "এই সকল যুক্তির দ্বারা যোগমতও খণ্ডিত হইল।"

যোগের সহিত সাংখ্যের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এই, সাংখ্যজ্ঞানীরাই প্রথম যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পরে বৌদ্ধ, জৈন, বৈদান্তিক, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় ঐ অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রায় চিত্রিত যোগীর মূর্ত্তি সাংখ্যজ্ঞানীর মূর্ত্তি এতদূর কথা বলা যাইতে পারে কি? যতদিন না এই সকল মুদ্রার চিত্রাকার লিপি পঠিত এবং ব্যাখ্যাত হয় ততদিন এমন কোন কথা বলা যাইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানলাভ যোগসাধনের একমাত্র

*Sir John Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization, London, 1931, Vol. III, pl. XCVIII.

†Memoirs of the Archaeological Survey of India,

উপায়রূপেও যোগ বিহিত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রার যোগীর চিত্র তত্ত্বজ্ঞানের বিগ্রহ না হইয়া সিদ্ধের চিত্রও হইতে পারে। মোহেঞ্জোদড়োতে এবং হরপ্পায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই যুগে ভারতবর্ষে দর্শনচর্চ্চা ছিল কি না তাহা নিরূপণ করা এখন অসম্ভব। কিন্তু এই সকল নিদর্শন দেখিয়া, সাংখ্য-যোগ উপনিষদ মূলক এই জাতীয় সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যোগাভ্যাস ছিল বলিয়াই যে সাংখ্যদর্শনও উদ্ভাবিত হইয়াছিল এমন কথা বলিবার উপায় নাই সত্য, কিন্তু এত প্রাচীন যোগীর মূর্ত্তি থাকিতে যোগের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিকে তাহার আড়াই হাজার বৎসর পরে, যবন দর্শনের অভ্যুদয়ের সমসময়ে, টানিয়া আনা যাইতে পারে না। যোগের উদ্দেশ্য একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ের চিন্তন। মোহেঞ্জোদড়োর মূর্ত্তি কয়েকটি সপ্রমাণ করিতেছে, আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ সালে, সিন্ধু দেশে এইরূপ মনন বা চিন্তন আরম্ভ হইয়াছিল, এবং উপাস্য দেবতাও এইরূপ চিন্তনকারীর ছাঁচে গঠিত হইতেছিল। এইরূপ চিন্তন একবার আরম্ভ হইলে তত্ত্বনির্দ্ধারণে বেশী বিলম্ব হইতে পারে না। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ সালের এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ সালের মধ্যবর্ত্তী প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে প্রধান কারণবাদ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে যে আনক্সিমান্দর খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে মিলেটাসে বসিয়া একেবারে নূতন করিয়া অনুরূপ অসীমকারণবাদ উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন এমন মনে করা সঙ্গত হয় না। গ্রীক-বিজ্ঞানের এবং গ্রীক-শিল্পের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, গ্রীকেরা সর্ব্বদাই পরের নিকট হইতে নূতন বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন।

দেব-শিশু

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মধ্যদিন-সূর্য্য আজি প্রখর, নীলাকাশে,
তৃষ্ণাহতা ধরণী শুধু দহন-বিষে কাঁপে ;
রুদ্র যেন কুটিল-চোখে ভ্রূকুটি করি' হাসে—
পরাণ-পাখী সংজ্ঞাহারা ভীষণ অভিশাপে !

*

মানস-সরোবরের তীরে মরালী পথ-হারা,—
গোধূলি নামে কপালে পরি ঘন-শোণিত-লেখা !
ধূলি ও ধূমে ঢেকেছে আঁখি সপ্ত ঋষি তারা—
পীড়িত নর-দেবতা চোখে লুপ্ত জল-রেখা !

*

গভীর ঘুমে শুনেছ তুমি দারুণ হাহাকার—
হে দেব-শিশু, নেমেছ তুমি তোমার অপমানে—
মন্থ-শেষ-বিষের মত ঘনালো আঁধিয়ার,—
তোমারি রথ-চক্রে শুনি, প্রণব-ধ্বনি কানে !

*

শুভ্র ধূলি-উড়ানো পথে, হে নব নট-নাথ
তৃণ-কুসুম উঠেছে ফুটি করুণ মনোরম !
কৃপাণ-হানা আননে তুমি ধরেছ সে-আঘাত—
মধুর করি হেসেছ তুমি কৃপাণ-পাণি সম !

*

(আজি) মাঘেরই বায়ু ভেঙেছে কারা, কহিছে কানে তব,
'মরণ আলো-তীর্থ পানে পথিক যত চলে—
অশোক-ফুলে তাদেরই প্রাণ, ফুটেছে অভিনব ;—
সাগর-পারে 'কুমারী' কাঁপে ;—গিরিশেখর জলে।'

*

ধূসর হর-জটার তলে উছল জল-ধারা—
'গঙ্গোতরী'-প্রপাতে শুনি শঙ্খ,—অভিরাম !
প্রখর স্রোতে ঝলকি' উঠে অযুত মণি-তারা,—
হে দেব-শিশু, সেখানে দেখি লিখেছ তব নাম !

হাফেজ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ

যাহারা অনুবাদের সাহায্যে অন্য ভাষার,—বিদেশী ভাষার কাব্যসাহিত্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বিচার ও মতের মূল্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা আদৌ দিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে সাহিত্য, বিশেষ করিয়া কাব্য-সাহিত্য, শব্দচয়ন ও বাক্যসন্নিবেশের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে; অনুবাদে এই-সব শব্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় না, পূর্ব্বের বাক্যরচনারীতির বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং অনুবাদে ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পচাতুর্য্য ও রস—যাহা সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ—তাহার কোনই নিদর্শন থাকে না। সুতরাং অনুবাদে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, অনুবাদের সাহায্যে এরূপ সাহিত্য বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। আবার এ-কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মানুষের আয়ু স্বল্প, বিঘ্ন বহু, সুতরাং অনুবাদকে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। জার্ম্মান ভাষা না শিখিয়া গেটে পড়িব না, রাষিয়ান ভাষা না শিখিয়া লেনিনের কি টলষ্টয়ের গ্রন্থে হাত দিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিলে গেটে-লেনিন-টলষ্টয় অজানাই থাকিয়া যাইবে, তাঁহাদের সহিত পরিচয়লাভের সৌভাগ্য ঘটিবে না। তাই ফার্সিতে অনভিজ্ঞ হইয়াও হাফেজের কাব্যসুধা পান করিবার ও তাঁহার কথা আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা যদি করিয়াই থাকি তবে সে দুঃসাহস ক্ষমার যোগ্য ; নহিলে আমাদের মত হীনশক্তি সাধারণ মানুষ যে একেবারে নিরুপায়।

আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে অন্য দেশের যোগসূত্র যাঁহারা অনুসন্ধান করিতে চাহেন পারস্য কবি-কুলপতি হাফেজের কথা নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মনে পড়িবে, এ-কথা বলা যাইতে পারে। হাফেজ ছিলেন কবি। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে, জাগতিক সমস্যা সম্বন্ধে, জীবনমৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার সত্যান্বেষী দার্শনিকের মত বিধিবদ্ধ ভাবে লিখিয়া যান নাই,—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ভক্তিরসে রসিক ভারতীয় কবিদেরই মত তাহা কবির অমর সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে কথা রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে বলিয়াছেন,—

> গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
> বাহির মনে
> চিরদিবস মোর জীবনে।
> … … …
> গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
> এই ভুবনে।

ভগবৎপ্রীতি হাফেজের মহাসঙ্গীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল ; সুরের হাওয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল ; সে সুর এখনও একেবারে থামে নাই, এখনও তাহার তরঙ্গ থামিয়া থামিয়া দেখা দেয়, ভারতীয় সঙ্গীতে, বাউলের গানে, কবির কাব্যে তাহার আমেজ পাওয়া যায়।

হাফেজ নাম নয়, উপাধি ; কবির প্রকৃত নাম, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ। 'কালিদাস', 'হাফেজ'—বাগ্‌দেবীর এই-সব বরপুত্রের উপাধি বা লোকদত্ত নামই টিঁকিয়া আছে ; পূর্ব্বাশ্রমের নাম বেঙ্গাচির লেজের মত খসিয়া গিয়াছে ; শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ লোকে জানে শুধু হাফেজ, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শুধু ঐতিহাসিকের বা জীবনীকারের মগজে বা কলমের ডগায়। সমগ্র কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া এই উপাধি তাঁহাকে দেওয়া হয় ; কোরাণ সব সময় তাঁর বুকে থাকিত। পিতা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। ইস্পাহান হইতে শিরাজে আসিয়া বসবাস করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই শিরাজেই কবির জন্ম। শিরাজ! কবির কল্পনা ভরা শিরাজ! নৃত্যগীতমুখর চিরউৎসবময় শিরাজ! শিরাজেই তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিল। মুসল্লার ঝিরঝিরে বাতাস, রুক্‌নাবাদের নদী,—এ-সব ছাড়িয়া তিনি কোথাও

তাঁহার পা চলিতে চাহিত না। কিন্তু স্থানবৈচিত্র্য না ঘটিলেও অন্তরের এক মহা পরিবর্ত্তনের কথা তাঁর চরিতকার লিখিয়া গিয়াছেন;—যৌবনে সুরা ও বিলাস তাঁহার সাথী ছিল; কবি ত স্পষ্টতঃই সুরাদেবীর বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, মরিলেও যাহাতে সুরাপূত (?) করিয়া তাঁহাকে শেষ শয়ানে সমাহিত করা হয় সেজন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

সুরাপানে মরণ হোলে তেমনি কবর দিও,
মাতাল বেশে সাজিয়ে আমায় তোমরা বহে নিও,
দ্রাক্ষালতায় আমার তরে সমাধি রচিও,
সরাইখানার পথের পাশে কবর আমার দিও।
দেহটাকে করায়ো স্নান সরাইখানার জলে,
কবরপানে আনবে বহি সুরাপায়ীর দলে,
লাল পেয়ালার ছিটায় মরুক ধূলা আমার যত,
বেহালাতেই শোকের গীত বাজুক অবিরত।
মরণকালে রইবে লেখা, এই-ই দানপত্র,
হাফেজ তরে করিবে শোক নট, চারণ, মাত্র;
কিন্তু কবি, সুরায় তব বিরাগ নাহি চাই,
—মাতাল যারা তাদের উপর রাজার দাবী নাই।

কিন্তু পরে তিনি সুফীবাদের আশ্রয় লইলেন, বিলাস-স্পৃহা ভগবন্মুখী হইল, ভোগ সংসারকে ছাড়িয়া আনন্দময়কে আশ্রয় করিল। তাঁহার অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি কি করিয়া লাভ হইল সে-সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে। শিরাজের উপকণ্ঠে "পীরসব্জ" নামে এক স্থানের খ্যাতি ছিল; পর পর চল্লিশ রাত্রি সেখানে জাগিলে কাব্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিত; হাফেজ জাগিতে আরম্ভ করিলেন,—নিকটেই প্রণয়িনীর আবাসভবন, সেদিকে দৃষ্টি দিতেন না। চল্লিশ দিনের দিন সকালে প্রলোভন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে কবি অপূর্ব্ব সংযমের পরিচয় দেন; তাই সে রাত্রি প্রভাত হইলে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত এক বৃদ্ধ (ইনিই নাকি ইমাম আলী) আসিয়া সাধককে এক পাত্র অমৃত উপহার দেন। এই অমৃত পানে কবির কবিত্ব শক্তি অদ্ভুত ভাবে ফুটিয়া উঠে।

হাফেজের কাব্যামৃত যাঁহারা আস্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছেন,—আঃ কি আনন্দ, কি সুন্দর, কি মনোরম! পারস্তের কবিদের মধ্যে তাঁহার আর তুলনা নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার ভাষার পারিপাট্য, তাঁহার কল্পনাসৌন্দর্য্য তাঁহাকে কবিজগতে শীর্ষস্থান দিয়াছে। প্রসিদ্ধ পারসিক কবি জামী তাঁহাকে বলিয়াছেন — অদৃশ্য জিহ্বা — "লিসান-আল্-ঘাএব্" — তর্জ্জমান্-আল্-আস্রার্—রহস্যভেদী; গোপন যিনি তাঁহাকে তিনি জানিয়াছিলেন, অদৃশ্য জগতের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই যুগে যুগে রহস্যলোকের সন্ধানী মানুষ তাঁহার বাক্যসুধায় নিজ নিজ অন্তরের ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিয়াছে, সান্ত্বনা পাইয়াছে, সন্ধান জানিয়াছে; তাই তিনি দেশবিদেশের রাজা বাদশাহের সমাদর ও প্রসাদ লাভ করিয়া ছিলেন, শাহ্ আবু ইশাকের সভায় পঞ্চরত্নের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, আর অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের চাবী তাঁহার কাছে ছিল বলিয়া দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের করাল ছায়া তাঁহার কাব্যের সরসতাকে একটুও ম্লান করিতে পারে নাই। তাই উনবিংশ শতাব্দীতেও মনীষী এমার্সন কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির কথা বলিয়া গিয়াছেন, জার্ম্মান কবি গেটে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য কাব্যের রস পাইতে চাহে তাহাকে হাফেজের কাব্য পড়িতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, জানিতে হইবে, কারণ প্রাচ্যকে না জানিলে পাশ্চাত্যকে ঠিক বোঝা যায় না, প্রকৃত জ্ঞানের পথ বিশ্লেষণ নহে, সম্মেলন; অথবা, জ্ঞানের আরম্ভ বিশ্লেষণের পথে, কিন্তু শেষ তাহার সম্মেলনে।

Over the Mediterranean Sea
Bright the Orient sun has sprung:
Only he who Hafiz knows and loves
Knows what Calderon has sung.

হাফেজের জন্মতারিখ জানা না গেলেও মৃত্যুতারিখ কিন্তু জানা যায়, প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ লইয়া বিরোধ বাধিল, যে-ব্যক্তি যৌবনে সুরা ও নারীর উপাসনা করিয়াছে এবং বিলাসতরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়াছে বলিয়া জনাপবাদ, তথা মনসুরের 'আনল্ হক্'-ধর্ম্মে যাহার আস্থা, তাহার আবার শুদ্ধভাবে কবরে স্থান পাইবার দাবি! বিরোধের মীমাংসার এক উপায় স্থির হইল—কবির শ্লোকগুলি পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হইবে, তাহ



'হাফেজিয়া' (হাফেজের সমাধি-উদ্যান)

হইতে প্রথম যে শ্লোক হাতে উঠিবে, তাহাই কর্ত্তব্য সূচিত করিবে এবং সে ইঙ্গিত গ্রাহ্য হইবে। তখন এই শ্লোক উঠিল ঃ—

হাফেজের দেহের কাছে যেতে ভয় কিবা বল ?
পাপে মলিন হোক না সে যে, আছে বাঁধা স্বর্গতল।

সুতরাং বিরোধীদলের কোনও আপত্তি আর টিঁকিল না, পরম সমারোহে মৃতদেহের সমাধি হইল ; তাঁর সমাধির উপর তাঁহারই রচিত কবিতা খোদাই করা আছে ; তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল।

কোথায় তোমার মিলন-বার্ত্তা ? মুগ্ধচিত্ত, উঠ্‌তে চাই ;
বাঁধা আছে নানান্ ফাঁদে, পুণ্যপাখী, উড়্‌তে চাই ;
সেবার তরে ডাকো মোরে,—প্রেমের ডাকে উঠ্‌বো আমি,
দেশ ও কালের প্রভুত্ব লোভ একেবারেই যাবে থামি।
পথ-দেখানো মেঘের থেকে ঝরুক্ তোমার প্রসাদ-বারি,
তাহার পরে উঠ্‌তে বোলো মানুষের রাজ্য ছাড়ি ;
ডাকো চারণ, পেয়ালা আনো, নৈলে হেথায় থাক্‌বো না ;
ভরে যাক্ সৌরভে দিক্—কবরে আর রৈবো না ;
বৃদ্ধ আমি, এক রাত্রিরও নিবিড় তব আলিঙ্গনে
আসবে ফিরে নব যৌবন, উঠ্‌বো প্রভাত সমীরণে—
জাগো জাগো ! দীর্ঘদেহে, সকল লোক উচ্ছ সি ;
প্রাণ-হারা এই হাফেজেরো সকল বাঁধন যাক্ খসি'।

নানাদেশ হইতে সমৃদ্ধ ভক্তবৃন্দ এই সমাধি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শিরাজের অনতিদূরে একটি সুন্দর বাগানের মাঝখানে এই সমাধি, কবির নাম অনুসারে বাগানের নাম হইয়াছে হাফেজিয়া। চারিদিকে, বাগানের মধ্যে বিস্তর ভক্তের সমাধিস্থান, মহানিদ্রার অন্ধকারেও তাঁহারা কবির সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। যাঁহারা পারস্যে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এই সমাধিস্থান একবার দেখিয়া যান।

হাফেজের বন্ধু মুহম্মদ গুলন্দাম তাঁহার কবিতাগুলি একত্র করিয়া প্রকাশিত করিবার সময় যে জীবন পরিচয় দেন সে প্রসঙ্গ ক্রমে বলেন যে কবি কোরাণ পাঠ, অন্যান্য গ্রন্থ চর্চ্চা ও রাজকার্য্যে এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে নিজের রচনা সংগ্রহ করিয়া সাজাইবার দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না ; বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার এক উত্তর ছিল—'দরদীর অভাব' ; তাঁহার সমসাময়িক জগৎ তাঁহাকে বুঝিল না, এই অভিযোগ। "যে নাম কচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্"—ভবভূতির এ গর্ব্বোক্তির পিছনে যে অনাদরের আভাস ইঙ্গিত এখানেও যেন তাহারই অনুরূপ

দেখিতে পাই ; কিন্তু কেন ? জীবনে তিনি ত যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার সরস কাব্য শ্রবণে কাশ্মীরের রূপসীদের কৃষ্ণতার চক্ষুর মধ্যে একটা হর্ষের দীপ্তি দেখা যাইত, সমরখন্দের তুর্কেরা হাফেজের কাব্যের তালে তালে নাচিত ও গাহিত ; দেশাধিপতির অনুগ্রহও তাঁহার শিরে বাগ্‌দেবীর আশীর্ব্বাদের মতই আসিয়া ক্রমাগত পড়িয়াছিল। হাফেজের সবচেয়ে যোগ্য সমালোচক ও কবিতার সংগ্রাহক ছিলেন সুদী, তাঁহার জন্ম বোস্‌নিয়ায় ; সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি টীকা-টিপ্পনী সহ হাফেজের কাব্য প্রকাশ করেন।

কবির লেখাবলী খুলিয়া কত লোকে সমস্যার উত্তর পাইয়াছেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন রোমানেরা ভার্জ্জিলের কাব্য গ্রন্থ খুলিয়া তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর পাইতেন, আধুনিক পারসিকেরা সমগ্র কোরাণ ও হাফেজের দীওয়ান খুলিয়া দেখেন, জীবনের নানা বিচিত্র সমস্যার ভিতরে তাঁহাদের প্রশ্নের সদুত্তর কবির কাব্যে ও জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্র খুঁজিয়া পান কি না। এই উদ্দেশ্যে দীওয়ান খুলিবার পূর্ব্বে কেহ কেহ কবি-প্রণয়িনী 'শাখে নবাত্‌' (বা ইক্ষুলতার) দিব্য দিয়া কবিকে সদুত্তর দিতে অনুরোধ করেন। নাদির শাহ্‌ পারস্য ও ইরাক জয় করিয়া কবির সমাধি দেখিবার পথে এক পক্ষ কর্ত্তৃক গৃহে ফিরিবার জন্য ও অন্য পক্ষ হইতে আবদুর বৈজন হইতে তুর্কদিগকে বিদায় দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন, তখন কি করা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া হাফেজের কাব্য খুলিয়া দেখেন—"সুধাময় সঙ্গীত দ্বারা তুমি ইরাক ও পারস্য জয় করিয়াছ ; এখন বোগদাদ ও তব্রীজ জয় কর।" এই সঙ্কেত হইতেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন।

কবি শুধু গোলাপ, বুলবুল, প্রেম ও বীণার কথাই বলেন নাই, নানা ভাবের আবেগ তাঁহার লেখনীকে চালিত করিয়াছিল ; একটি গজলের অনুবাদ নীচে দিতেছি।

মুস্‌ড়ে পোড়ো না ভাই, সুন্দরের সৌন্দর্য্য তোমাকে তার আমোদে উৎফুল্ল কোরবে ; একদিন তোমার দুখের কাঁটা গোলাপ হোয়ে ফুটবে।

ওহে কাতর হৃদয়, মুস্‌ড়ে পোড়ো না, তোমার অশুভ শুভ হোয়ে দাঁড়াবে, যা তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা তোমাকে থামাতে পারবে না, যে ভাব এখন অস্থিরতার সৃষ্টি কোরছে তা হোয়ে যাবে শান্ত।

কাতর হোয়ো না, যে উদ্যানে তুমি এখন আছ সেখানে আরো একবার প্রাণের স্পন্দন দেখা দেবে ; তোমার সামনে যে গোলাপের অবগুণ্ঠন আছে, হে রাত্রির গায়ক, তা কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

এ জীবনের রহস্য যদি না-ই জেনে থাকো, তা হলেও মুস্‌ড়ে পোড়ো না, অবগুণ্ঠনের মধ্যে প্রচুর আনন্দ লুকানো রয়েছে।

ঐ তারকিত নভ যদি তোমার ইচ্ছামত না ঘোরে, কালচক্র যদি সর্ব্বদা একই দিকে না চলে, তবে মুস্‌ড়ে পোড়ো না।

আশ্রয়ের সন্ধানে এগিয়ে যদি মরুভূমিতে পৌঁছাও, কাঁটার হার যদি তোমার পুরস্কার হয়, তা হলেও দুঃখে মুহ্যমান হোয়ো না।

প্রাণ আমার, দিনের ঘূর্ণীবায়ু যদি তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর ঘরখানি ধূলিসাৎ কোরে দেয়, তা হলেও দুঃখ কোরো না, কারণ প্রলয় হোতে তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রেম সঞ্চিত আছে।

পথ ভীষণ, লক্ষ্য অ-দৃষ্ট ; তাতে কি ? সব পথেই যে এক লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

দীনহীনের মত এক কোণে পড়ে আছ, দারিদ্র্য তোমার সহচর, নির্জ্জন রাত্রির গভীর অন্ধকারে তুমি একা,—এ সবের জন্য দুঃখ কোরো না হাফেজ, দুঃখ কোরো না ; তোমার ভালবাসা, তোমার গান—যে তোমারই।

সঙ্গীতের মধ্যেই যে তিনি পরম সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়াছিলেন সে কথা জগৎকে তিনি বড় গলায় বলিয়া গিয়াছেন, আর বলিয়াছেন গোলাপের রহস্যকথা,—

সুন্দর কবিতার মধ্যে বিরস হৃদয় সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়। এই গীত সংগ্রহের মধ্যে তুমিও হয়তো একাধিক প্রতিকারের সন্ধান পাইবে।

তোমার চুম্বনের একটিমাত্র স্পর্শ যদি আমার ওষ্ঠে পাইতাম, তাহা হইলে আমার প্রাণে তাহার চিহ্ন থাকিয়া যাইত, লোকোত্তর মুদ্রায়—যাহা কিনা সলোমনের মুদ্রার চেয়েও দৃঢ়, সেইরূপ অদ্ভুত মুদ্রায় সীলমোহর করিয়া আমি সাত রাজার ধনকে নিরাপদে রাখিতাম।

এমন ভাবে কাঁদিও না, ভাগ্যদেবী তোমার হৃদয়ে যে শর বিদ্ধ করিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহা দেখ। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে হয়ত দেখিবে যে তাহা সুন্দর।

ভগবানের করুণা আশীর্ব্বাদের মত শিরে আসিয়া পড়ে নাই, এরূপ লোকই নাই। এই আঘাত আসিল, আবার ওই আসিল প্রেম।

গোলাপের, তার সৌরভের, রহস্য এইখানেই : বাজারে অনেক গোলাপ দেখা যায় বটে, কিন্তু গোলাপের যাহা সার তাহা যে আবরণের পশ্চাতে।

ভারত চিরদিনই হাফেজের কবিতার আদর করিয়া আসিয়াছে। ভারতের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত (শুধু কবিতাগত নয়) সম্বন্ধ ঘটিবারও আশা ছিল। দক্ষিণ ভারতের বাহ্‌মণী রাজ্যাধিপতি গুণগ্রাহী মামুদ শা বাহ্‌মণীর সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ বহুবার প্রত্যাখ্যানের পর অবশেষে একবার কবি তাহা স্বীকার করেন। আসিবার ব্যয় জন্য বহু অর্থ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই

শিরাজে দানাদিকর্ম্মে ব্যয়িত হয়; পারস্যোপসাগরে আসিবার পথে এক নিঃস্ব বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে অবশিষ্ট যাহা কিছু সঙ্গে ছিল সব দিয়া দেন। তখন দুইজন পারসিক সম্ভ্রান্ত বণিক ভারতে আসিতেছিলেন। কবির সঙ্গসুখের আশায় তাঁহারা তাঁহার সকল ব্যয়ভার দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু হোরমুজে আসিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিবার সময় এক প্রচণ্ড ঝটিকা দেখা দিল, তিনি আর সাগর পাড়ি দিতে ভরসা করিলেন না; পোতাধ্যক্ষ তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন, যে স্থান হইতে পোত যাত্রা করিয়াছিল পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া ভিড়িল। কবি দেহে প্রাণ পাইলেন, তীরে নামিয়াই নিজের অক্ষমতা অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিলেন, বাহ্‌মণীরাজের নিকট হাফেজের আর যাওয়া হইল না বটে কিন্তু তাঁহার শ্লোকটি গিয়া পৌঁছিল। কবিতার শেষাংশ এইরূপ ঃ—

না চলে চোখের দৃষ্টি, রত্নপ্রভা সমুজ্জ্বল;
উপজে পরাণে ত্রাস, গুরু গর্জ্জে সিন্ধুজল।
অসঙ্কোচে ভাবি, ভুল কোরেছিনু অতিশয়;
স্বভাব প্রবল অতি, এই শুধু মনে লয়।

হাফেজ নিজে না আসিলেও তাঁহার এক পুত্র কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বুর্‌হানপুরে প্রাণত্যাগ করেন। অসীরগড়ে তাঁর সমাধি আছে।

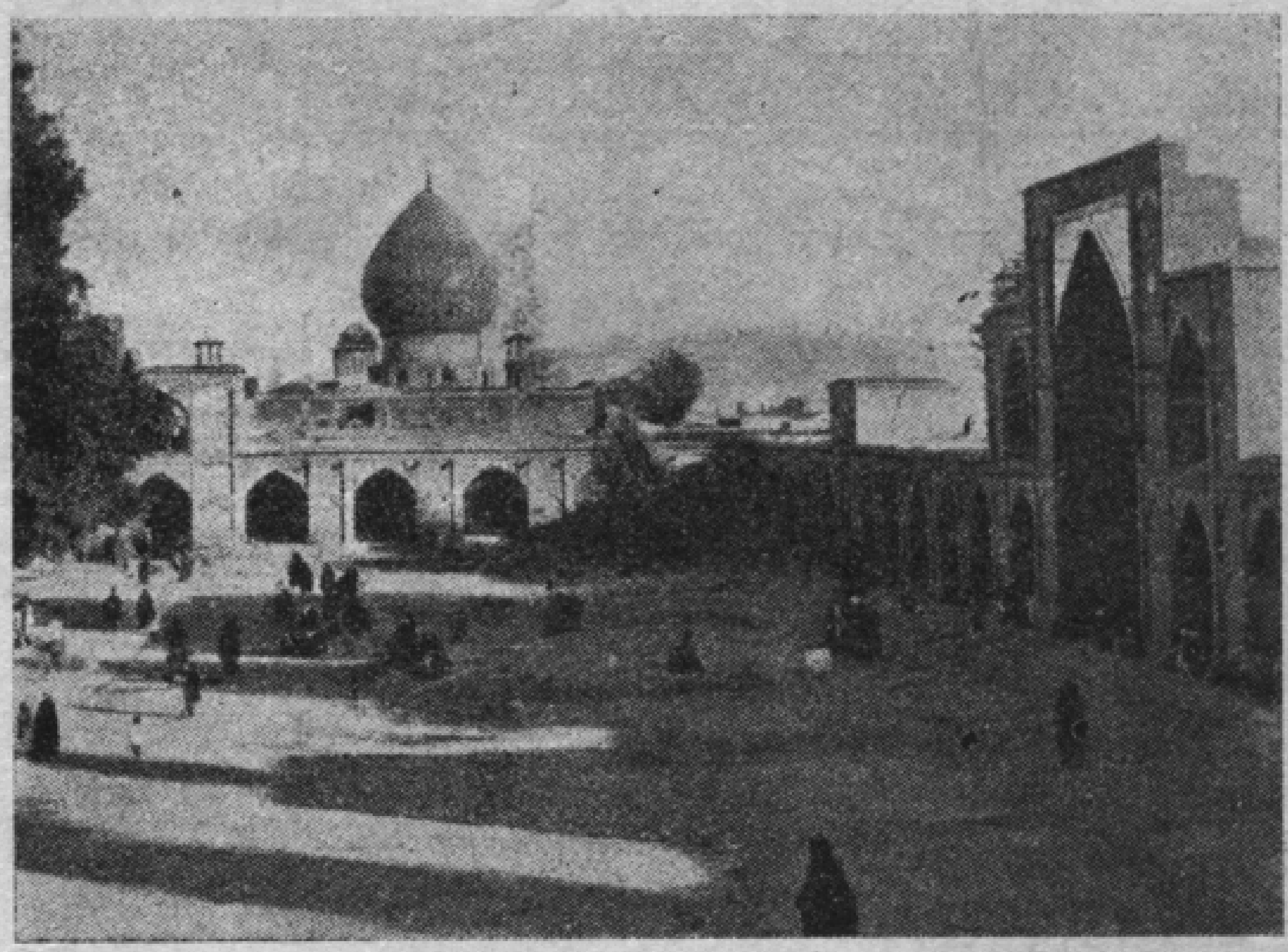
কবির নামে আর একটি কাহিনী চলিত আছে,—দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরলঙের সহিত সাক্ষাতের কথা। কবি এক সময়ে প্রণয়িনীর গণ্ডে তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারার রাজকোষ (অবশ্য কাব্যে) তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই অবহেলা-ব্যঞ্জক পঙ্‌ক্তি দুইটি এখনও বিদ্যামোদীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনা যায়। দিগ্বিজয়ী বীর, উত্তর ভারত জয় করিয়া ধনরত্ন প্রচুর লইয়া গিয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বে যখন তিনি শিরাজ বিজয় করেন তখন দেশে দেশে বিশ্রুত-কীর্ত্তি হাফেজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন—

সমরকন্দ, বোখারার, আর ধনভাণ্ডার যত,
ঋদ্ধ করিয়া তুলিতেছি আমি দিগ্বিজয়ের ফলে;
নারীর গণ্ডে তিলটির লাগি তাহাও তুচ্ছ মান,
হীন কবি—কোন্ মদগর্ব্বের বলে?

কবি তখন অত্যন্ত বিনয় ও সম্মানের সহিত কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন,—

এ গর্ব্বের মূলে প্রভু সেই তো কারণ,
—রমণীর রূপমুগ্ধ আমি অভাজন।

অর্থাৎ নারীর গণ্ডের তিলটিই তাঁহাকে জীবনের নূতন



শিরাজের মস্‌জিদ

অর্থ দেখাইয়াছে, অন্যের কাছে যাহা মূল্যবান্ তাঁহার কাছে তাহা নয়—সমাজে আদৃত ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রেমের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; revaluation of accepted values, ইহা তাঁহাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিত। সাধারণ লোকে ইহা উন্মাদ বা মূর্খের লক্ষণ মনে করিবে। কিন্তু যে সন্ধানী, যে দরদী, সে বুঝিবে অন্যরূপ।

ভারতের সঙ্গে জীবনকালে কবির এই যে সম্পর্ক, ভাবজগতের তুলনায় তাহা কত সামান্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের চিন্তার সহিত তাঁহার ভাবের ঐক্য দেখা যায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কাব্যসুধায় ডুবিয়া থাকিতেন। 'সদ্ভাবশতক' দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, কৃষ্ণচন্দ্রের উপর হাফেজের প্রভাব কত বেশী ছিল। সাহিত্য-পরিষদে 'সদ্ভাবশতকে'র যে কপিখানি আছে তাহা দ্বাদশ সংস্করণের, তারিখ দেওয়া আছে সন ১২৯০ সাল। প্রথম সংস্করণ হইয়াছিল ১২৭১ সালে। প্রথম কয়েকটি কবিতায় হাফেজের প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। প্রথম কবিতার নাম 'দুরাশা'; ইহার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করি—

প্রেম নাই, প্রিয়লাভ আশা করি মনে !
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভবভবনে ?

দ্বিতীয় কবিতা—'উদ্বোধন' ; তারও শেষ দুই পঙক্তিতে হাফেজের কথা আছে ; তৃতীয় কবিতায়ও সেইরূপ। এই ভাবে চলিয়াছে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—

'পারসীক মহাকবি হাফেজ প্রবর,
যাঁহার জনমে ধন্য শিরাজনগর' ইত্যাদি (১০৫ পৃঃ)

বিশ্বের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া 'মরি কিবা শোভাময় এ ভবভবন' কবিতার শেষে কবি বলিতেছেন,—

"এ সব স্বভাবশোভা রচিত যাঁহার,
হাফেজ ! মজ না কেন প্রেমরসে তাঁর ?"

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে' বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এখনও স্থান পায়, কিন্তু তার যে দুই পঙ্‌ক্তি দেখা যায় না তাহারা এই—

মনে ভেবে বিষম বিরহ-রিপু-ভয়,
হাফেজ ! বিমুখ কেন করিতে প্রণয় ?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হাফেজের কাব্যামৃত পান করিয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে আত্মহারা হইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলেন, সঙ্গীরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়। আমাদের সে যুগ আর এ যুগ—কত ব্যবধান ! তবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথের পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে মূল পারসীক ভাষায় হাফেজের কাব্যমালা আর কষ্টেলো প্রণীত The Rose Garden of Persia দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নয় যে, আধুনিক যুগের সত্যেন্দ্রনাথও হাফেজের ভক্ত ছিলেন। গত বৎসরের মধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে হাফেজের কাব্যালোচনা ও কাব্যানুবাদ কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল ; মদীয় স্নেহাস্পদ ছাত্র অজয়চন্দ্রের অনুবাদও পাঠকসমাজে আদর লাভ করিয়াছে শুনিয়াছি। অতীতের ভাবধারা হইতে বর্ত্তমানকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, যিনি আমাদের দেশের সাহিত্যে ও সাধনায় হাফেজের স্থান কোথায় তাহা দেখাইয়া দিবেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়ং সন্ধ্যায় পারস্যের সেই অতীত কবিপ্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌড়জনের জন্য অভিনব সুধাভাণ্ড পুনরায় বিতরণ করিতে থাকিবেন।

হাফেজ ও তাঁহার সহধর্ম্মীরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিষম কথা, সহজ নহে। তন্ত্রসাধনায় যেমন একটা symbolism-এর ব্যবস্থা আছে, একটা সন্ধা ভাষা আছে, প্রকাশের একটা কৃত্রিম ভঙ্গী বা রীতি আছে, হাফেজ ও তাঁহার সহধর্ম্মী অন্যান্য সুফীদেরও সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সুরা সুরা নহে, তরুণী মূর্ত্তিমতী নহে, গোলাপ, কাঁটা, চুম্বন, আলিঙ্গন,—কোনও কথাই সোজাসুজি নিতে পারিব না, মনোজগতে, সাধনাজগতে ইহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক, সমাজে প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে কবির এবং সাধনার অপমানই করা হইবে, অর্থগ্রহ হইবে না, আমাদের মত সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা যে দুরত্যয় বাধা। তন্ত্রের পঞ্চম-কারের স্থূলরূপের আবরণে মহাযোগী সন্ন্যাসী অতি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন ; নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, আকুমার ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণের মিলনগাথায় কোমলকান্ত পদাবলীর মাঝে নানা প্রকার সম্ভোগবর্ণনায় আত্মহারা, দরবিগলিতাশ্রু ; পার্শ্বে প্রেমাতুরা তরুণী রূপসী, হস্তে বীণা, নিকটে সুগন্ধি মদ্য পাত্র, অথচ ভগবৎপ্রেমে বিভোর সুফী ; স্থূলকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মকে লক্ষ্য করা, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বন্ধনের মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে পাইবার জন্য এই যে আকুলিব্যাকুলি,—এ সবই ত রুচির ভেদ অনুসারে নানা পথ, কিন্তু ধারা এক। সদ্‌গুরুর হাতে পড়িলে বুঝি এই কঠোরতম এবং প্রকৃত সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ হয়, নতুবা যে জানে সে-ই জানে, আমাদের মত জড়বুদ্ধির স্থূল হস্তাবলেপে মোহগর্ত্তের চিরান্ধকারে পড়িয়া মরিতে হয়।*

* প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি :

১। Browne---*Persian Literature under Tartar Dominion.*

২। *Poems of Shamsuddin Mohammed Hafiz of Shiraz.* Ed. by John Payne, London, 1901.

৩। রহস্য-সন্দর্ভ। ৩য় খণ্ড। সম্বৎ ১৯২২।

৪। Charles Devillers---*Les Ghazels de Hafiz.* Paris. 1922.

৫। A. K. Shirazi---*Hafiz.* "Calcutta Review."

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি কে ?

প্রশস্ত রাজপথ। মাঠের উপর দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, কখন সোজা, কখন বাঁকা, ধরণীর অঙ্গে সাদা শিরার ন্যায় পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ দিয়া একখানা মোটর গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীতে তিন জন লোক। যাহার গাড়ী—হরিনাথ—সে নিজে গাড়ী চালাইতেছিল, তাহার পাশে বসিয়া তাহার বন্ধু গঙ্গাধর। গাড়ীর ভিতর বসিয়া মোটরচালক। গাড়ীর পিছনে জিনিষপত্র বাঁধা। মোটরে করিয়া দুই বন্ধু দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

হরিনাথের বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ। গঙ্গাধর তাহার অপেক্ষা কিছু বড়, শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, দোহারা গড়ন। চক্ষু উজ্জ্বল, দেখিলেই বুদ্ধিমান মনে হয়।

হরিনাথ ধনী। যথেষ্ট সম্পত্তি, বেশ বড় জমিদারী। পিতার এক সন্তান, দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। হরিনাথ কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, বিলাসিতায় রুচি নাই। ধনীর পুত্র বলিয়া অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। এ পর্য্যন্ত হরিনাথ দ্বিতীয় বার বিবাহ করে নাই।

গঙ্গাধর হরিনাথের বাল্যবন্ধু, এক গ্রামে নিবাস। পাঠ্যাবস্থায় মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকল পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অবস্থা সচ্ছল সেই জন্য কর্ম্ম-কাজের বিশেষ চেষ্টা ছিল না। কিছু দিন অধ্যাপনা কর্ম্ম করিয়াছিল, কিছু দিন এক রাজার সেক্রেটারী ছিল, কিন্তু ওকালতী পাস করিয়াও উকীল হইতে স্বীকার করে নাই। এখন কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত না। বাড়িতে বৃদ্ধা বিধবা মাতা ও স্ত্রী। সন্তানাদি হয় নাই। ছোট সংসার, ব্যয়বাহুল্য ছিল না, সুতরাং চিন্তারও বিশেষ কোন কারণ ছিল না। হরিনাথ তাহাকে নিজের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু গঙ্গাধর এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

সময় অপরাহ্ণ। মোটর ছুটিতেছিল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য আকাশপ্রান্তে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছিল, ক্রমে অস্তমিত হইল, আকাশে গোধূলি রাগ ছাইয়া আসিল।

গঙ্গাধর বলিল,—ওখানে গাছপালার মধ্যে আগুন লেগেচে, দেখেচ ?

হরিনাথ দেখিতেছিল। সম্মুখে অনেক দূরে পথের বাম দিকে একটা ছোট বন। তাহার ভিতর দিয়া গাঢ় ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছিল, মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা উঠিতেছিল। গ্রাম বা কোন গৃহের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। হরিনাথ মোটরের বেগ বাড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে উপনীত হইল। মোটর থামাইয়া তিন জনেই অগ্নির অভিমুখে ছুটিয়া গেল।

পথের ধারে কয়েক বিঘা জমি জুড়িয়া সালবন। স্থানে স্থানে বন ঘন, অপর স্থানে বিরল। বনের ভিতর খানিকটা মুক্ত পথ। সেই পথে গিয়া হরিনাথেরা দেখিল একখানা মোটর গাড়ী গাছে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। উত্তাপ এত অধিক যে নিকটে যাওয়া অসম্ভব। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার কোন উপায় নাই, নিকটে কোথাও জলাশয় নাই। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের মনে হইল মোটরের নীচে একটা মানুষ চাপা পড়িয়া পুড়িতেছে। মৃত্যু অনেক পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে, কিন্তু এক পায়ের জুতা দেখিয়া তাহাকে পুরুষ মনে হইল।

মোটরচালক বলিল,—ও ব্যক্তি আরোহী মনে হচ্চে, চালক কোথায় গেল ?

গঙ্গাধর এদিক ওদিক দেখিতেছিল। হঠাৎ এক দিকে ছুটিয়া গিয়া বলিল,—এ দিকে এ কে পড়ে রয়েচে?

তিন জনেই সেই দিকে গেল। একটা ছোট ঝোপের পাশে, খুব পুরু ঘাসের উপর একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতা না মূর্চ্ছিতা?

হরিনাথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রমণী যুবতী, অপূর্ব্ব রূপবতী। চক্ষু মুদ্রিত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। গঙ্গাধর হাত দেখিয়া বলিল,—এখনও বেঁচে আছে। একে শীঘ্র মোটরে নিয়া চল।

গঙ্গাধর ও হরিনাথ দুইজনে ধরাধরি করিয়া রমণীকে তুলিয়া নিজেদের মোটরে লইয়া গেল। মোটরে একটা বাক্সে কতকগুলা ঔষধ ছিল, তাহার মধ্যে এক শিশি ব্রাণ্ডি ছিল। গঙ্গাধর কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি রমণীর মুখে দিল। তাহাতে নাড়ীতে একটু বল হইল, কিন্তু মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। হরিনাথ দেখিতে পাইল রমণীর মাথার পশ্চাৎ দিকে আঘাত লাগিয়াছে, অল্প রক্ত পড়িতেছে। রক্ত বন্ধ করিবার ঔষধও ছিল, ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়া হরিনাথ বাঁধিয়া দিল।

মোটরের ভিতর রমণীকে শয়ন করাইয়া হরিনাথ ও গঙ্গাধর তাহার নিকটে বসিল। হরিনাথ মোটরচালককে আদেশ করিল,—শীঘ্র একটা গ্রামে চল। কোন ডাক্তারকে দেখাতে হবে।

আধ ঘণ্টা পরে একটা গ্রাম দেখা গেল। গ্রামে একখানা বড় বাড়ি দেখিয়া তাহার সম্মুখে মোটর দাঁড়াইল। মোটর দেখিয়া বাড়ির পুরুষেরা বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ির কর্ত্তার বয়স হইয়াছে। তাঁহাকে গঙ্গাধর দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বলিয়া বলিল,—আমাদের আজ রাত্রের মত আশ্রয় দিন। যদি কোন ডাক্তার গ্রামে থাকে তাঁকে ডাকিয়ে পাঠান।

কর্ত্তার এক পুত্র তখনই ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল। কর্ত্তার নির্দ্দেশমত হরিনাথ ও গঙ্গাধর রমণীকে তুলিয়া বাড়ির ভিতর একটা ঘরে শয্যায় শয়ন করাইল, বাড়ির স্ত্রীলোকেরা উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। বাহিরে গ্রামের লোক জড় হইল। বাড়ির একজন বিধবা বৃদ্ধা আসিয়া রমণীকে দেখিয়া বলিলেন,—মেয়ে ত নয় যেন দুর্গা ঠাকরুণ। কাদের বাড়ির বউ গা?

গঙ্গাধর সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। বলিল,—আমরা কিছুই জানিনে। একখানা মোটরে ইনি কারুর সঙ্গে আসছিলেন। মোটর পুড়ে গিয়েচে, সে লোকটিও মরেচে। ইনি খানিক দূরে এই অবস্থায় পড়েছিলেন দেখে আমরা তুলে এনেচি।

ডাক্তার আসিলেন। ইনিও বর্ষীয়ান লোক। রমণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—কোন হাড় ভাঙেনি, মাথায় জখম হয়ে অজ্ঞান হয়েচে। মস্তিষ্কের ভিতর লেগেচে কি না বুঝতে পারচিনে।

ডাক্তার সঙ্গে করিয়া কিছু ঔষধ আনিয়াছিলেন, রমণীর মুখ খুলিয়া তাহাকে পান করাইলেন। ক্রমে তাহার চক্ষের পাতা নড়িল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, মাথার ও অঙ্গের বস্ত্র সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল। চারিদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখিল। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী ছিল, ঘুরাইয়া দেখিল, শাড়ীর পাড় ধরিয়া দেখিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্মৃতিলোপ

এমন প্রশ্ন কেহ কখন কোন যুবক অথবা যুবতীর মুখে শুনিয়াছে? আমি কে? আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তি নিজেকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঋষিযোগীরা আত্মজ্ঞানের অনুধ্যানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন। অহমিকা সাধারণ লোকের দুর্ব্বলতা, কিন্তু নিজের পরিচয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকে না।

রমণীর প্রশ্ন শুনিয়া সকলে মনে করিল হয় আঘাত লাগিয়া তাহার মস্তিষ্কের কোন বিকার ঘটিয়া থাকিবে, না হয় তাহার মাথার কোন দোষ আছে। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, ডাক্তার মাথা নাড়িলেন। মুখ নীচু করিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ মা, তোমার বাড়ি কোথায়?

রমণী আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ডাক্তারের মুখের দিকে

ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া কহিল,—আমার বাড়ি? কেন, এই কি আমার বাড়ি নয়?

—তোমারই ত বাড়ি। তোমার নাম কি?

খানিক ভাবিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাত উল্‌টাইয়া যুবতী বলিল,—আমার নাম? কই, আমি জানি নে।

—তোমার মাথায় লেগেচে। কোথায় লেগেছিল মনে পড়ে?

যুবতী মাথায় হাত দিয়া বলিল,—তাই ত, মাথায় বড় ব্যথা। কখন লেগেছিল মনে পড়ে না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিলেন। হরিনাথ ও গঙ্গাধরও সেই সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

ডাক্তার বলিলেন,—মস্তিষ্কে কোনরূপ আঘাত লেগে স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়েচে। এ রকম হয় পড়েচি কিন্তু কখন দেখি নি। আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

হরিনাথ বলিল,—কাল কলকেতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাব। কোথায় বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে তারও সন্ধান নেব।

হরিনাথ ডাক্তারকে টাকা দিতে চাহিল, ডাক্তার গ্রহণ করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রিলোচন

এক গ্রামে—নাম এখন নাই বা বলিলাম—এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল জমিদারবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রসন্তান কেহ ছিল না, একমাত্র কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। জমিদারের সম্পর্কে এক বড় ভাই ছিলেন, তিনিই সংসারের কর্ত্তা, কিন্তু বিষয়-পরিচালনের ভার তাঁহার হাতে ছিল না। ম্যানেজার ত্রিলোচন সর্ব্বেসর্ব্বা, আদায়পত্র তাঁহার হাতে, লোকজন তিনিই নিযুক্ত করিতেন, আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁহার হাতে। জমিদার-কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হইয়াছিলেন, কিছু দিন হইল জ্যাঠা মহাশয়ের সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

ত্রিলোচন কাছারি-বাড়িতে বসিয়া জমিদারীর কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। বয়স চল্লিশ হইবে, মাথার মাঝখানে টাক পড়িয়াছে, দেহ স্থূল, গোলগাল মুখ, গোল চক্ষু দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মানুষটা দেখিতে হাবাগোবা ভালমানুষের মতন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে হাবাও নয়, ভালও নয়।

ত্রিলোচন আলাদা ঘরে বসিতেন, সেখানে আর কেহ থাকিত না। তিনি বসিয়া আছেন এমন সময় আর এক ব্যক্তি সে ঘরে প্রবেশ করিল। ভদ্রলোকের বেশ হইলেও তাহাকে ভদ্র মনে হয় না। বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, চোয়াড়ের মত গড়ন, পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া ত্রিলোচনের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ত্রিলোচন বলিলেন,—কি হ'ল?

নবাগত ব্যক্তি কঠোর হাস্য করিয়া কহিল,—যা হবার কথা ছিল তাই হয়েচে।

—অল্প কথায় সব খুলে বল।

সে ব্যক্তি গলা নীচু করিয়া ত্রিলোচনকে কতকগুলা কথা বলিল। সকল কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া ত্রিলোচন বলিলেন,—কেউ কিছু টের পায় নি?

—কে আবার টের পাবে? সেখানে জনমনুষ্য ছিল না।

—তা যেন হ'ল কিন্তু একটা খবর আসা চাই। তুমি বনবিহারীর সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—হাঁ, করেছিলুম, খবর শীঘ্র আসবে।

—এ গ্রামের কারুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি ত?

—না, আমি খেয়ানৌকায় পার হয়ে সোজা চলে এসেচি। আবার অমনি ফিরে যাব।

—দেখ, শ্যামাচরণ, আর একটা কথা আছে। এখানে তুমি বড় বেশী যাওয়া-আসা ক'রো না, লোকের মনে একটা সন্দেহ হ'তে পারে।

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল আমাকে একটা ভাল কাজ দেবেন।

—সে পরে দেখা যাবে।

—আর এখন?

—এখন এই দু-শো টাকা নিয়ে যাও। এর আগেও টাকা পেয়েচ।

—তা ত পেয়েচি। আমার একটা বাঁধা আয়ের দরকার।

—কার দরকার নেই? কিন্তু এখন তুমি যাও, অন্য কথা আর কোন সময় হবে।

শ্যামাচরণ গোঁফ পাকাইতে পাকাইতে, মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বাগতা

লুপ্তস্মৃতি, অজ্ঞাতনাম্নী যুবতীকে হরিনাথ ও গঙ্গাধর কলিকাতায় লইয়া আসিল। দেশে হরিনাথের বাড়িতে তাহার একজন বিধবা খুড়ীমা থাকিতেন। হরিনাথ তাঁহাকে আনাইল। তাহার অনুরোধে গঙ্গাধর তাহার মাতা ও স্ত্রীকে দেশ হইতে ডাকাইয়া পাঠাইল।

যুবতীকে দেখিলে কি মনে হইত?—অতুলনীয় রূপ, কিন্তু সে রূপে যেন কিসের অভাব। সব আছে, অথচ পূর্ণতা নাই। সজ্জিত আলোকিত মন্দির, তাহাতে সমস্তই আছে কেবল চৈতন্যরূপিণী প্রতিমা নাই। কলিকাতায় আনিবার সময় রমণী কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, কোন আপত্তি করে নাই। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের পরিচয় পর্য্যন্ত জানিতে চায় নাই। কলের মত চলিত ফিরিত, কিংবা একা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। চক্ষে সেই শূন্য দৃষ্টি, নিজের সম্বন্ধে অথবা অপরের সম্বন্ধে কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিত না। বড়-একটা কথাও কহিত না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে দুই চারি কথায় উত্তর দিত।

হরিনাথের খুড়ীমা ও গঙ্গাধরের মা আসিয়া রমণীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাহার অসাক্ষাতে তাঁহারা হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে বলিলেন,—ও কি পাগল?

গঙ্গাধর বলিল,—না, পাগল ও-রকম হয় না। মোটর থেকে পড়ে যাবার সময় মাথার ভিতর কোন রকম লেগে থাকবে, সব ভুলে গিয়েচে।

হরিনাথের খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সধবা না বিধবা?

মূর্চ্ছিতাবস্থায় রমণীকে যখন হরিনাথ ও গঙ্গাধর তুলিয়া আনিয়াছিল সে-সময় তাহার পরিধানে সরু কালাপেড়ে শাড়ী, হাতে দু-গাছি সরু সোনার চুড়ী, মাথায় সিঁদুর ছিল না। সিঁদুর মুছিয়া গিয়া থাকিতে পারে, অল্প বয়সে কন্যা বিধবা হইলে বাপ-মা কখন কখন তাহাকে থান কাপড় পরিতে দেন না, আবার ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাহিতা রমণীরাও কেহ কেহ মাথায় সিন্দুর দেন না। অতএব রমণী সধবা কি বিধবা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিবার উপায় নাই, কারণ তাহার পূর্ব্বের স্মৃতিশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে।

হরিনাথ কয়েক জন বড় ডাক্তার ডাকিয়া রমণীকে দেখাইল। তাঁহারা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া এরূপ হইতে পারে তাঁহারা স্বীকার করিলেন, কিন্তু মাথার ভিতর অস্ত্র করা বড় কঠিন ব্যাপার, কোথায় অস্ত্র করিতে হইবে তাহাও তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে যদি রমণীর মস্তিষ্কের বিকার কিংবা দুর্ব্বলতা থাকে তাহা হইলে অস্ত্র করিলেও কোন ফল না হইতে পারে, আর আশঙ্কা ত আছেই। ডাক্তারেরা মস্তিষ্কে বল হইবার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু অস্ত্র করিতে সম্মত হইলেন না।

ডাক্তারদের দেখা হইলে পর হরিনাথের খুড়ীমা বলিলেন,—কাদের মেয়ে, কাদের বউ, আমরা কিছু জানি নে, আমাদের কাছে কত দিন রাখব?

হরিনাথ বলিল,—তাই যদি জানা যাবে তাহ'লে আর ভাবনা কি? এখনই আমরা ওঁকে পাঠিয়ে দি। কিন্তু যখন কিছুই জানা যাচ্চে না এমন অবস্থায় আমরা কি করব? অনাথ-আশ্রমে ত আর পাঠাতে পারি নে। সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে না হ'লে কি মোটরে চ'ড়ে বেড়ায়? আমরা দেখতে না পেলে হয়ত মারা যেতেন। আমাদের বাড়িতে রাখা ছাড়া এখন আর উপায় কি? এখন কিছু দিন তুমি এখানে থাক তার পর ওঁকে নিয়ে দেশে যেও।

এমন কথার কোন উত্তর দেওয়া যায় না। কলিকাতায়

জন্য স্বতন্ত্র দাসী নিযুক্ত হইল। লেখাপড়া শিখাইবার জন্য হরিনাথ একজন উত্তম শিক্ষয়িত্রী রাখিল। সন্ধ্যার সময় খুড়ীমা রমণীকে সঙ্গে করিয়া মোটরে বেড়াইতে যাইতেন।

বাড়িতে কেহ থাকিলে তাহাকে ত চিরকাল ওগো হাঁগো বলিয়া ডাকিতে পারা যায় না। মানুষের একটা নাম ত চাই। এই রমণী নিজের নাম, আত্মপরিচয় সব ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ ঘরে থাকিলে সময় সময় ডাকিতেই হয়। হরিনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া খুড়ীমাকে বলিল,—ওঁর নাম আমরা ত জানি নে, ওঁকে স্বাগতা ব'লে ডেকো।

—ও আবার কোন্ দেশী নাম ?

—আমাদের বাড়িতে ওঁর শুভাগমন হয়েচে এই জন্য উনি শুভাগতা।

খুড়ীমা রমণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—হ্যাঁগা মেয়ে, তোমার নাম স্বাগতা। মনে থাকবে ত ?

রমণী একবার খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিল, আর একবার হরিনাথের দিকে চাহিল। কহিল,—আমার নাম স্বাগতা ? তা ত জানতাম না। মনে থাকবে বই কি।

পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হইলেও শিক্ষয়িত্রী দেখিলেন স্বাগতার অসাধারণ স্মরণশক্তি ও শিক্ষা করিবার বিশেষ আগ্রহ। অপরের শিখিতে যাহা ছয় মাস লাগে স্বাগতা তাহা এক মাসের মধ্যে শিখিয়া ফেলিত। অল্পদিনের মধ্যে হাতের লেখাও বেশ পরিষ্কার হইল। আবার কতক বিষয়ে স্বাগতা একেবারে অনভিজ্ঞা। শিক্ষয়িত্রী লক্ষ্য করিতেন, কোন আখ্যায়িকা পড়িবার সময় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উদ্বাহ-সম্বন্ধীয় কোন কথা স্বাগতা একেবারেই বুঝিতে পারিত না। বয়সে ও আকৃতিতে যুবতী হইলেও ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। যেমন খুড়ীমা ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা কহিত হরিনাথ ও গঙ্গাধরের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ সরল ভাবে কথা কহিত। তাহার প্রকৃতি কোমল, মধুর, শান্ত, সহজ লজ্জাশীলা, কিন্তু যুবা পুরুষের সাক্ষাতে যুবতীর যে রকম সঙ্কোচ হয় তাহা ছিল না। শিক্ষয়িত্রীও স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন কথা তাহাকে বলিতেন না।

স্বাগতার মাথার ভিতর যেন দুইটি কক্ষ, একটি আলোক-উজ্জ্বল, অপরটি অন্ধকার। পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, অভিনব স্মৃতির প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট ফুটিয়া রহিয়াছে। অজানা এই রূপসীর শুভাগমন কোথা হইতে হইল ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ঘটনা

ত্রিলোচনের বাড়িতে তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা বড়, বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। পুত্রও নিতান্ত ছোট নয়, বয়স বাইশ বৎসর, লেখাপড়া তেমন অধিক হয় নাই, বাপের কাছে জমিদারী শেরেস্তায় কর্ম্ম করিত। নাম কার্ত্তিক কিন্তু দেখিতে মোটেই কার্ত্তিকের মত নয়। চেহারা কতক বাপের সঙ্গে মিলে, দেহ বাপের অপেক্ষাও স্থূল, বুদ্ধিও তদনুরূপ। তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কন্যা বিধুমুখী দেখিতে তাহার মায়ের মতন। ত্রিলোচনের স্ত্রী বিশেষ সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী, মেয়েও দেখিতে ভাল। বিধুমুখীর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা তেমন ভাল নয়, ত্রিলোচন জামাইয়েরও একটা কর্ম্মকাজের চেষ্টায় ছিলেন।

ত্রিলোচনের পত্নী রমা খুব সেয়ানা, সংসার বেশ গুছাইয়া করিতেন, তবে স্বামীর মনের সকল কথা তিনি জানিতেন না। সকল কথা ত্রিলোচনের পক্ষে বলা সম্ভবও ছিল না।

জমিদারী সম্পত্তির মালিক করুণাময়ী দেবী তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। সঙ্গে অধিক লোকজন ছিল না। প্রবোধচন্দ্রের নিকট হইতে নিয়মিত পত্র আসিত। হঠাৎ এক দিন পত্র আসিল—একজন কর্ম্মচারীর লেখা—যে প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ী আর কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া কোথায় দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুই তিন দিন অতীত হইল তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কতক পথ নৌকায় যাইবার কথা, তাহার পর গাড়ী মোটর পাওয়া যায়। তাঁহাদের সন্ধান লইবার জন্য চারিদিকে

লোক ফিরিতেছে; কিন্তু কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

জমিদার-বাড়িতে, কাছারিতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ত্রিলোচন নিজে কয়েকজন লোক লইয়া সন্ধান করিতে গেলেন। সে-স্থান অনেক দূর, সাধারণতঃ সেদিকে অধিক লোকের যাতায়াত নাই। সন্ধান পাওয়া গেল যেদিন প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ী চলিয়া যান তাহার পর দিবস কয়েক ক্রোশ দূরে নৌকাডুবি হয়, সে নৌকায় ভদ্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক কয়েকজন ছিলেন, সকলের মৃত দেহ পাওয়া যায় নাই। নদীতে অনেক কুমীর, খাইয়া ফেলিয়া থাকিবে। মহাজাল ফেলিয়া কয়েক স্থানে নদী দেখা হইল, কোথাও কোন শব পাওয়া গেল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ীর জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহাদের শব কুমীরে খাইয়া ফেলিয়াছে।

ত্রিলোচন ও তাঁহার সঙ্গের লোকেরা শোকার্ত্ত চিত্তে গ্রামে ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নূতন উত্তরাধিকারিণী

করুণাময়ীর অপমৃত্যুর পরে তাঁহার এক খুড়তুতা ভগিনী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইঁহারও ভাই ভগিনী কেহ ছিল না। ইনিও বিধবা, নাম শৈলবালা, বয়সে করুণাময়ী অপেক্ষা বড়, কোলে একমাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন। কন্যাটির বয়স এখন দশ বার বৎসর হইবে, নাম সুবালা, দেখিতে থাঁদাথোঁদা। করুণাময়ী ইঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন, মেয়ে আর একটু বড় হইলে বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনের ক্ষমতা পূর্ব্বের অপেক্ষাও বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বেও তাঁহারই হাতে সব ছিল, কিন্তু করুণাময়ী ছিলেন বুদ্ধিমতী, জমিদারীর টাকাকড়ির খবর রাখিতেন। ত্রিলোচন তাহাকে একটু ভয় করিতেন। শৈলবালা কখনও মনে করেন নাই যে, সম্পত্তি তাঁহার হাতে আসিবে। করুণাময়ী তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট, নীরোগ সুস্থ শরীর, তাঁহার একটি পোষ্যপুত্র লইবার কথা হইতেছিল। হঠাৎ একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনায় বিষয় শৈলবালার হাতে আসিল। সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যে-কোন নূতন বন্দোবস্ত হইতে পারে এ কথা একবারও তাঁহার মনে হইল না। ত্রিলোচন না থাকিলে কে বিষয় দেখিবে?

ত্রিলোচন শৈলবালার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে কহিলেন,—এখন বিষয় আপনার। আপনার বোন-ঠাকরুণ যেমন আমার হাতে সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন আপনারও কি সেই মত?

শৈলবালা হাত তুলিয়া বলিলেন,—তার আবার কথা! করুণা ত তবু জানত শুনত; আমি কিছুই জানি নে। আপনি যা করবেন তাই হবে।

—তা হ'লে আপনি আপনার বোনের মতন আমাকে একখানা আমমোক্তারনামা লিখে দিন, জমিদারীর আদায়পত্রের জন্য মামলা-মোকদ্দমা আছে, আপনি ত আর আদালতে উপস্থিত হ'তে পারবেন না।

—আমি মেয়েমানুষ, আমি ও-সব কি জানি? আর আদালতেই বা যেতে গেলাম কেন? আপনি ওই যে কি বললেন তাই লিখিয়ে নেবেন।

—আর দেখুন, বাড়ির কাজকর্ম্মেও আপনার বোন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এখনও সেই রকম থাকলে ভাল হয় না?

—সেই রকম থাকবে না ত কি আবার নতুন রকম হবে? আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কোন কাজ হবে না।

—এই দেখুন না, সুবালা রাণীর বিয়ের কথাও আপনার বোন আমার কাছে পাড়তেন।

—কি কথা হয়েছিল? ভাল পাত্র কোথাও আছে?

—সে কথা এর পর হবে। তার ত কোন তাড়া নেই, আর এই সেদিন অত বড় বিপদ গেল।

—সে কথাও বটে।

—এখন এই হাতখরচের জন্য পাঁচ-শো টাকা নিন। আপনার নিজের যখন যা আবশ্যক আমাকে বললেই হবে। আপনার মামার বাড়ি কিছু টানাটানি, বলেন ত তাঁদেরও কিছু পাঠিয়ে দিই।

শৈলবালা আগ্রহের সহিত বলিলেন,—মাসে মাসে তাঁদের একশো টাকা ক'রে দিলে তাদের বড় উপকার হয়।

—বেশ্ ত, এই মাস থেকেই দেওয়া হবে।

ত্রিলোচন চলিয়া গেলেন। শৈলবালা পাঁচশো টাকা কখনও হাতে করেন নাই, তিনি টাকাটা বাক্সে পূরিলেন।

ত্রিলোচন বাড়িতে স্নান আহার করিতে গেলেন। ঘরে বসিয়া রূপা-বাঁধান হুঁকায় তামাক খাইতেছেন এমন সময় রমাসুন্দরী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—আজ যে মেজাজ ভাল দেখচি।

ত্রিলোচনের ফুলো গালে, ড্যাবডেবে চোখের কোণে হাসি ভরা, মুখের ধুঁয়া বাহির করিয়া বলিলেন,—মেজাজ খারাপ কবে দেখলে? বদমেজাজ হ'লে কি আমার কাজ চলে?

—আমি বলচি কি যে তোমাকে বেশ খুশী-খুশী দেখচি, যেন কোন ভাল খবর এসেচে।

—নতুন খবর আবার কি আসবে? আমি কি ভাবছিলাম জান? এই কার্ত্তিকের বিয়ের কথা।

—সে ত বেশ কথা। বিয়ে দিলেই হয়।

—তা ত হয়। তবে কোথায় বিয়ে হবে তার খবর রাখ?

—কোন ভাল সম্বন্ধ এয়েচে বুঝি?

—সম্বন্ধ যদি এখানেই হয়! সুবালা রাণীর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়!

রমাসুন্দরী ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া, গলা খাটো করিয়া কহিলেন,—তাও কি কখনও হয়? আমার সঙ্গে তামাশা করচ বুঝি?

—তামাশারই কথা বটে। কথাটা মনে এল তাই ভাবচি। তুমি ঢাক পিটিয়ে বেড়াও তা হ'লে সব ফেঁসে যাবে, শেষে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

—আমাকে কি তেমনি অসেয়ানা পেয়েচ? এমন কথা প্রকাশ হ'লে আমাদেরই বিপদ, তা কি আমি বুঝতে পারিনে?

—তা হ'লে ও-কথা এখন চাপা থাক। ও-বাড়িতে যে রকম বিপদ হয়ে গিয়েচে তাতে এখন বিয়ে-থাওয়ার কথা কেউ তুলবে না। আমাকে ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে, সময় বুঝে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

কথা ঐ পর্য্যন্ত রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রূপোন্মাদ

স্বাগতা লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। অতি সহজে শিখিতে পারে দেখিয়া হরিনাথ নিজে তাহাকে ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিল। স্বাগতাকে হরিনাথ ও বাড়ির আর সকলে বুঝাইয়াছিল যে, সে তাহাদেরই আত্মীয়া, বাপ-মা নাই বলিয়া তাহাদের কাছে থাকে। স্বাগতার কৌতূহলও বড় ছিল না, তবে একা থাকিলে মাঝে মাঝে সেই রকম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিত আগেকার কোন কথা তাহার মনে পড়ে না কেন? বাপ-মাকে কি কখন দেখে নাই? কই, তাঁহাদের কাহাকেও ত মনে পড়ে না। তাহার বাল্যস্মৃতি কি হইল? কাহারা তাহার শৈশবসঙ্গিনী ছিল, এখন তাহারা কোথায়? যাঁহাদের কাছে রহিয়াছে তাঁহারা নিশ্চয় তাহার আত্মীয়, নহিলে তাহাকে এত যত্ন করিবেন কেন?

এ কি রকম জীবন? সেই যে কোন্ গ্রামে কাহাদের বাড়িতে বসিয়া স্বাগতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আমি কে তাহার আগেকার ত কোন কথাই তাহার মনে পড়ে না। মাথায় যে বেদনা হইয়াছিল কোথায় কি রকম করিয়া আঘাত লাগিয়াছিল তাহাও ত স্মরণ নাই। এ রকম কি আর কাহারও হয়? যেন কোন পুস্তকের গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠা নাই, একেবারে মাঝখান হইতে আরম্ভ। তাহা হইলে আনুপূর্ব্বিক কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে?

একবার কয়েক দিনের জন্য হরিনাথ বাড়ির সকলকে একটা বাগানবাড়িতে লইয়া গিয়াছিল। হরিনাথ ও গঙ্গাধর মোটরে করিয়া বেড়াইত, স্বাগতা গঙ্গাধরের স্ত্রী প্রভাবতীর সঙ্গে বাগানে ও গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন বৈকালে দুইজনে বাঁধান ঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

সাগরগামিনী তরঙ্গচঞ্চল ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গাবক্ষে পান্সি, নৌকা, ছোট ষ্টীমার। ওপারে গাছের

ভিতর দিয়া অস্তমান সূর্য্যের লোহিত আভা জলে পড়িয়াছে। কোথাও গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড বটগাছ, জলের উপর কালো ছায়া দুলিতেছে। অবিশ্রান্ত অনিবার্য্য স্রোত, লহরীলীলায় নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

স্বাগতা হাতের তেলোয় চিবুক রাখিয়া শুভ্রোর্ম্মি মুকুটধারিণী জাহ্নবীর অক্লিষ্ট গতি দেখিতেছিল। কিছু আপনার মনে, কতক প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—আমার কি মনে হয় জান?

প্রভাবতী স্বাগতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। স্বাগতার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী, ললাট নির্ম্মল। প্রভাবতী বলিল,—কি?

—এই যে গঙ্গার স্রোত দেখচ, আমার জীবন যেন ঠিক সেই রকম। যেটুকু আমরা দেখতে পাচ্চি সেই-টুকু জানি, কোথা থেকে আসচে কোথায় যাবে আমরা কিছুই জানি নে। সে কথা যেন আমরাও নিজের সম্বন্ধে জানি নে, কিন্তু আমি ত ছয় মাস আগের কোন কথাই জানি নে; কিছুই মনে নেই। এই সামনের স্রোতটুকুর মতন আমার জীবনের ইতিহাস।

প্রভাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ও-সব কথা কিছু বুঝতে পারি নে। তুমি কত বই পড়, তোমার মনে ত কত রকম কথা আসবেই।

—এ ত কেতাবের কথা নয়, মনে থাকার কথা। ছেলেবেলাকার কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

—তা পড়বে না কেন? খুব ছেলেবেলাকার কথা মনে থাকে না, কিন্তু পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকে সব কথা মনে আছে।

—তা হ'লে আমার নেই কেন? ছেলেবেলাকার কথা দূরে থাকুক এই মাসকতক আগেকার কথা কিছুই মনে পড়ে না। আমার কি মাথার কোন দোষ হয়েচে?

—তোমার যেমন কথা! বলিয়া প্রভাবতী অন্য কথা পাড়িল।

হরিনাথের মনে একটা অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বদা স্বাগতাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত, তাহাকে দেখিয়া কখন তৃপ্তি হইত না। যখন তাহাকে পড়াইত সমস্তক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যদি কখন হাতে হাত ঠেকিত তাহা হইলে হরিনাথের রোমাঞ্চ হইত, হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। স্বাগতা সম্মুখে না থাকিলেও হরিনাথ যেন সকল সময় তাহার মুখখানি দেখিতে পাইত। ক্রমে তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। যেমন পর্ব্বত হইতে বর্ষার জল নামিলে সে-স্রোতের মুখে কিছু তিষ্ঠিতে পারে না, সব ভাসিয়া যায়, সেইরূপ হরিনাথের মনের বল, চিত্তসংযম সমস্ত ভাসিয়া গেল। মনকে দমন করিবার শক্তি রহিল না, সে চেষ্টাও করিল না। অজ্ঞাতকুলসম্ভবা, অপরিচিতা, লুপ্তপূর্ব্বস্মৃতি এই অপূর্ব্ব সুন্দরীর হরিনাথের গৃহে শুভাগমন হইয়াছিল, শাপগ্রস্ত দেবকন্যার ন্যায় তাহাকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, কিন্তু এই স্নিগ্ধ শান্ত মূর্ত্তি রমণী ঝটিকার ন্যায় হরিনাথের হৃদয়মন্দিরের অর্গল ভগ্ন করিয়া তাহার নিভৃত অন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার রূপ বহ্নিশিখার ন্যায় হরিনাথের আত্মসংযম দগ্ধ করিয়া ফেলিল। স্বাগতা! স্বাগতা! স্বাগতা! জাগরণে, স্বপনে সেই রূপ হরিনাথের মানস চক্ষে জাগিতে লাগিল।

গঙ্গাধরেরা দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। হরিনাথের খুড়ীমাও ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। হরিনাথও স্বীকার করিয়াছিল তাঁহাকে ও স্বাগতাকে শীঘ্র দেশে লইয়া যাইবে।

একদিন হরিনাথ স্বাগতাকে পড়াইতেছিল। সেখানে আর কেহ ছিল না। হরিনাথ বলিল,—স্বাগতা!

টেবিলের উপর পুস্তক ছিল, খোলা পুস্তকের উপর স্বাগতার হাত ছিল। সে হরিনাথের মুখের দিকে সরল শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—কি?

—তোমার আগেকার কোন কথা মনে পড়ে না?

—কিছু না।

—তুমি কি কখন কাউকে ভালবাসতে না?

স্বাগতা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন, তোমাদের সকলকেই ত ভালবাসি।

—এ রকম ভালবাসা নয়। আমি আর এক রকম ভালবাসার কথা বলচি। যেমন স্বামীতে স্ত্রীতে ভালবাসা।

—সে কি আর এক রকম ?

হরিনাথ অধীর হইয়া স্বাগতার হস্ত ধারণ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। স্বাগতার কোনরূপ বিকার নাই, হস্ত কোমল শীতল, চক্ষের দৃষ্টি স্নিগ্ধ নির্ব্বিকার।

স্বাগতা বলিল,—তোমার হাত কাঁপচে কেন ? কোন অসুখ করেচে ?

হরিনাথ বেগে কহিল,—অসুখ ? তোমার জন্তই অসুখ। তুমি আমার ঘরে এসেচ, এবার আমার হৃদয়ে এস। তুমি বললেই আমি তোমাকে বিয়ে করি।

স্বাগতা বলিল,—বিয়ে ত আমি জানি নে, তুমি যদি আবশ্যক মনে কর ত কোরো। তোমরা যা বলবে আমি তাই করব।

স্বাগতা ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। হরিনাথ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া হরিনাথ গঙ্গাধরকে দেশ হইতে ডাকাইয়া পাঠাইল। গঙ্গাধর আসিলে পর হরিনাথ তাহাকে নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া বলিল,—তোমাকে একটা কথা বলব ব'লে ডেকেচি। আমি স্থির করেচি স্বাগতাকে বিয়ে করব।

গঙ্গাধর বলিল,—আমারও মনে হচ্ছিল তুমি ঐ রকম কোন একটা কথা বলবে। আর কাউকে এ কথা বলেচ ?

—না, এখনও বলিনি। তোমার সঙ্গে প্রথমে পরামর্শ করচি।

স্বাগতা এ কথা জানে ?

—তাকে বলেচি, সে কোন আপত্তি করে নি, তবে আমার মনে হয় বিয়ের বিষয় সে কিছু বোঝে না।

—বোঝবার কোন সম্ভাবনাও নেই। স্বাগতার সহজ অবস্থা নয়। আগেকার কোন কথাই ওর মনে নেই। বয়সে যুবতী হ'লেও অনেক বিষয়ে নিতান্ত শিশুর মতন, ওকে যা করতে বলবে তাই করবে। আর এক জন যদি ওকে বিয়ে করতে চায় তা হ'লেও রাজী হ'তে পারে, কেন-না, ও বিষয়ে ও কিছু জানে না, কোন মতামতও নেই।

—আমারও তাই মনে হয়।

—তারপর তুমি ওর বিষয় কি জান ? কি জাতি, কোথাকার মেয়ে কিছু জান ?

—তাতে কিছু এসে যায় না, অন্য জাতি হ'লেও অন্য মতে বিয়ে হ'তে পারে।

—যদি স্বজাতি স্বগোত্র হয় ?

—তা হ'লই বা ! আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

—ভাল, তাই যেন হ'ল, কিন্তু সধবা কি বিধবা তাও তুমি জান না।

—বিধবা বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই।

—বেশ, তুমি যেন সমাজসংস্কারক হ'লে। আর এর পর যদি জানতে পারা যায় যে ও সধবা, ওর স্বামী জীবিত আছে ? মনে কর যদি ওর লুপ্তস্মৃতি কখন ফিরে আসে, যদি ওর স্বামী ও সন্তান বেঁচে থাকে তখন ওর মনের অবস্থা কি হবে, আর তুমি যে মহাপাতকে লিপ্ত হয়েচ মনে ক'রে তোমারই বা কি দশা হবে ?

এ কথা একবারও হরিনাথের মনে হয় নাই। রূপের লালসা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, স্বাগতার সম্বন্ধে কোন কথা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার তাহার শক্তি ছিল না। প্রথমে গঙ্গাধরের কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় না, পরে কহিল,—ওর স্বামী থাকলে কি সে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ?

—তুমি কেমন ক'রে জানলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ? স্বাগতা যে তোমার বাড়িতে রয়েচে খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি, সব জেলায় পুলিসকেও খবর দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া স্বাগতার একজন সঙ্গী মারা পড়েচে আমরা জানি। যদি ওর আত্মীয়রা মিথ্যা খবর পেয়ে থাকে যে স্বাগতাও মারা গিয়েচে তা হ'লে তারা খোঁজ ক'রে কি করবে ? আমার এ অনুমান তোমার কি অসম্ভব মনে হচ্চে ?

—না, অসম্ভব কেন হবে ?

—তার পর তোমার নিজের মনের অবস্থা। স্বাগতার

রূপে মুগ্ধ হয়ে তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছ, আর কোন দিকে ভাববার তোমার ক্ষমতা নেই। স্বাগতা প্রকৃতিস্থ নয়, এ অবস্থায় যে কখন স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ বুঝতে পারবে তা বলতে পারা যায় না। তা হ'লেও যদি তুমি ওকে বিয়ে কর সে তোমার অভিরুচি, কিন্তু ওর পূর্ব্ব-পরিচয় না জেনে, ওর স্বামী বর্ত্তমান কি না নিশ্চিত না জেনে তুমি ওকে বিয়ে করতে পার না। তাতে আশঙ্কাও আছে, পাপও আছে।

হরিনাথ কি উত্তর দিবে? অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, অবশেষে কহিল,—গঙ্গাধর, আমার মনের স্থিরতা নেই, আমাকে কি করতে বল?

—এ স্বাগতা কে তার সন্ধান কর। যদি জানতে পারা যায় ও বিধবা তা হ'লে ওকে বিয়ে ক'রো।

—এ সন্ধানে তুমি আমার সহায়তা করবে?

—করব। স্বাগতার কয়েকখানা ভাল ফোটোগ্রাফ আমাদের নিতে হবে, যদি কেউ কোথাও চিনতে পারে। তোমার ওর কাছে আর থাকা উচিত নয়, আর ওকে দেশেও এখন নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, সেখানে কত লোকে কত কথা বলবে। যিনি ওকে পড়ান তাঁকে এই বাড়িতে রেখে যাও, তিনি স্বাগতার তত্ত্বাবধান করবেন।

সেই রকম ব্যবস্থা করিয়া হরিনাথ ও গঙ্গাধর চলিয়া গেল, বলিয়া গেল আবার দেশভ্রমণে যাইতেছে।

ক্রমশঃ

মনের পদ্ম

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তুলিনু যূথিকাপুঞ্জ একদা সে পুষ্প-বীথি হ'তে,
ঘরে আসি ঘ্রাণে ঘ্রাণে ক'রে দিল আকুল পরাণ;
ক্ষুদ্র শিশুকন্যা মোর হেসে যবে দাঁড়াইল পাশে,
যূথিকা কাঁদিল লাজে শুকায়ে ঝরিল ম্রিয়মান।
আনন্দের ছন্দ-শিশু মধুভরা সংসার-রতন,
মৃত্যুর নিঃশ্বাসে ঢলি' যবে হায় মাগিল বিদায়;
হেরিনু কাঁদিয়া ওরে এই বিশ্বে যে যত সুন্দর,
সে যে তত নিঃস্ব ওরে, পুষ্প ফোটে—পুষ্প ঝরে যায়!
গগনে জ্যোছনাভরা, গোলাপ করেছে কুঞ্জ আলো,
রাজ সভা মুখরিছে মধুকণ্ঠ-গায়কের গান;
ফুটে আছে পদ্মবন আনন্দের শয্যা বিছাইয়া,
বিকাশের মন্ত্রে মন্ত্রে কেঁদে ওঠে ঝরিবার ঘ্রাণ!
ঝরে সংসারের ভোগ, ফুল ঝরে—গন্ধ ঝরে বনে,
ভকতির পদ্ম শুধু ফুটে রয় নিত্য মনে মনে।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

বিভিন্ন মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত—অনুবৃত্তি

অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞবাদ ও ওঙ্কারোপাসনাঃ—গীতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ৩১৪ অধ্যায়, অশ্বমেধপর্ব্ব ৪২ অধ্যায়, বৃহদারণ্যক উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় ১ম-২য় খণ্ড ও তৃতীয় অধ্যায় ১৮ খণ্ড, তৈত্তিরীয় প্রথম বল্লী, কৌষীতকি চতুর্থ অধ্যায়, তত্ত্বসমাস সপ্তম সূত্র ইত্যাদি বহু স্থানে অধিভূত, অধিদৈবাদির আলোচনা আছে। অধিভূতাদি সাধনমার্গকে আমি সংক্ষেপে অধিবাদ বলিব। ওঙ্কারোপাসনা এই সাধনমার্গের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক মহৎ বস্তুসমুদয়কে পূজা করার প্রবৃত্তি আদিম মনুষ্যের স্বভাবজ। অনুমান করা যায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, আকাশ ইত্যাদির পূজা এই প্রবৃত্তি হইতেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে যখন ঋষিদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিল তখন কেহ বায়ু কেহ আকশ কেহ আদিত্য কেহ কালকে ব্রহ্ম বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ বৃহৎ। যে বস্তু অন্য সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান, বা যাহাতে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত তাহাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় অষ্টম খণ্ডে ঋষিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার অনুসন্ধানের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। সামের প্রতিষ্ঠা কি, এই লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ হইল। সামের প্রতিষ্ঠা স্বর, স্বরের গতি প্রাণ, প্রাণের গতি অন্ন, অন্নের জল, জলের স্বর্গলোক (পর্ব্বত)। অতএব স্বর্গই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্তা, স্বর্গকেই পূজা করিবে। প্রথম ঋষি এই পর্য্যন্তই জানিতেন। দ্বিতীয় ঋষি বলিলেন, পৃথিবীই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা, অতএব পৃথিবীকেই পূজা কর। তৃতীয় বলিলেন, পৃথিবী আকাশে অবস্থিত অতএব আকাশই পরমা গতি। ঋষিরা ক্রমে বুঝিলেন যে আকাশ, বায়ু, কাল ইত্যাদি বহির্বস্তু—বৃহত্তম সত্তা নহে। মানুষের আত্মাই এই সমুদায় ধারণ করিয়া আছে। তখন আত্মার সন্ধান চলিল। কেহ বলিলেন দেহই আত্মা, কেহ বলিলেন প্রাণ, কেহ মন, কেহ বুদ্ধি, অপরে বলিলেন ইহার কোনটাই আত্মা নহে; এই সকলের আশ্রয় যে সত্তা তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই সমস্ত চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে।* বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন—"যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিকসমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ ইত্যাদি দেবতায় অবস্থিত অথচ এই সমূহ হইতে পৃথক; এই সমুদায় যাঁহাকে জানে না কিন্তু এই সমুদায় যাঁহার শরীর এবং যিনি ইহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইহাদের সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনিই মনুষ্যের আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত।" বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইত। দেবতা কথার অর্থ যাহা জ্যোতিষ্মান, অর্থাৎ যাহা প্রকাশবান। যে-গুণের জন্য পৃথিবী বা সূর্য্যের প্রকাশ আমরা বুঝিতে পারি সেই গুণই পৃথিবী বা সূর্য্যের অভিমানী দেবতা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশগুণ আছে বলিয়া তাহাদিগকেও উপনিষদের স্থানে স্থানে দেবতা বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য যাহার কথা বলিলেন তাহাকে 'অধিদৈবতম' বলা হইয়াছে। অনন্তর অধিভূত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা। তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত।"

সমস্ত জড়পদার্থ অধিভূত কথার দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

* *Modern Review*, Jan. 1931. The Psychological Outlook in Hindu Philosophy নামক মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীকে সমষ্টিরূপে তাহার প্রকাশকত্ব গুণের জন্য দেবতা বলা হইলেও পৃথিবীর অন্তর্গত মৃত্তিকাদি সমস্ত জড়পদার্থ ভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। সমস্ত জীবশরীরও ভূত-বর্গের অন্তর্গত। অনন্তর অধ্যাত্ম বিষয়ে বলিতেছেন —"যিনি প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, শ্রোত্রে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, জীব বীজে বা শুক্রে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন অথচ যিনি এই সকল হইতে পৃথক তিনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। তাঁহাকে কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকলকে জানেন।" অধ্যাত্ম পদের অন্তর্গত আত্মা শব্দের অর্থ শরীর। উপনিষদে ও বেদে অনেকস্থলে শরীরকে আত্মা বলা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ প্রাণযুক্ত শরীর সম্বন্ধীয়। গীতায় সর্ব্বত্রই এই অর্থে অধ্যাত্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক শব্দ আত্মা-সম্বন্ধীয় বা spiritual এই অর্থে প্রয়োগ হয়। গীতায় বা উপনিষদসমূহে এই অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই, একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারেরা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। জড়বস্তু ও অপরাপর জীবশরীর হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা আধিভৌতিক; অগ্নি, বায়ু, জল, বিদ্যুত ইত্যাদি জনিত কষ্ট আধিদৈবিক, এবং শারীরিক ও মানসিক রোগের কষ্ট আধ্যাত্মিক।

যাজ্ঞবল্ক্য দেখাইলেন প্রাকৃতিক তাবৎ পদার্থের মধ্যেই আত্মার বা ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অধিবাদের বিশেষত্ব এই যে দেবতা, ভূতগ্রাম, দেহাদির উপাসনা আদিম মনুষ্যের মনোবৃত্তির অনুকূল হইলেও জ্ঞানী তাহারই মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিতে পারেন।

অধিবাদের 'অধি' কথার অর্থ বিচার্য্য। অধিরাজ বলিলে যেমন আমরা বুঝি যাহার অধীন অন্যান্য রাজারা আছেন, সেইরূপ অধিদৈব বলিলে বুঝিতে হইবে যাহার অধীন দেবতারা আছেন। গীতার ৮।৪,৫ শ্লোকে অধ্যাত্মকে স্বভাব বলা হইয়াছে। আত্মা অর্থাৎ প্রাণবান শরীর যাহার অধীন বা যাহার বশে চলে তাহাই অধ্যাত্ম। প্রকৃতিজাত স্বভাবই শরীরকে চালায়, একথা গীতার বহুস্থানে আছে। এজন্য স্বভাবই অধ্যাত্ম। ভূতগ্রাম সমস্ত বিনাশশীল, এজন্য তাহারা ক্ষর ভাবের অধীন। ক্ষর ভাবই অধিভূত। আদিত্য, পৃথিবী ইত্যাদি দেবতার প্রকাশগুণ শেষ পর্য্যন্ত মানুষের মনের সত্ত্ব গুণের উপর নির্ভর করে। অন্তঃকরণের চিৎশক্তি তদাকারকারিত হইয়া তাবৎ বস্তু প্রকাশিত করে। এজন্য পুরুষই অধিদৈবত। ৮।৩ শ্লোকে 'কর্ম্ম' কথা আছে এবং তাহারই অধিষ্ঠান হিসাবে অধিযজ্ঞ কথা আসিয়াছে। এখানে সকল প্রকার কর্ম্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারের যাহা হইতে উৎপত্তি তিনিই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞই যাজ্ঞবল্ক্যের অধিবাদের আত্মা। বাস্তবিক অধিদেবতাদিকে ইনিই নিয়মিত করিতেছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১ম বল্লী ৭ম অনুবাকে আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। ৮ম অনুবাকে এই সমস্ত উপাসনার বিষয়ীভূত ওঙ্কার-উপাসনার বিধান আছে এবং ৯ম অনুবাকে নানাবিধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতাতেও ওঙ্কার-উপাসনা ও কর্ম্মরূপ যজ্ঞের কথা অধিবাদের সহিত জড়িত আছে (৮।৩,৪,১৩)। উপনিষদে উল্লেখ না থাকিলেও গীতাপাঠে বুঝা যায় যে, তৎকালীন অধিবাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে মরণকালে ওঙ্কারের স্মরণ করিলেই মুক্তি হয়। মৃত্যুকালে যে-চিন্তা লইয়া মনুষ্য ইহলোক পরিত্যাগ করে পরলোকে তাহার তদনুযায়ী গতি হয়। অর্থাৎ সারাজীবন পাপ করিয়া মরণকালে ওঙ্কার ধ্যান করিলেই মুক্তি। কিংবা সারাজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুকালে যদি কোন পাপ-চিন্তা মনে উদিত হয় তবে জীব অধমগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের এই অদ্ভুত মত সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি ৮।৫,৬ শ্লোকে অধিবাদের এই মত উদ্ধৃত করিয়াই ৭ম শ্লোকে বলিলেন, অতএব 'সর্ব্বেষু কালেষু' অর্থাৎ সব সময়েই আমার প্রতি মন নিবিষ্ট কর, মন যাহাতে অন্যদিকে না যায় তাহার অভ্যাস কর (৮।৮)। এখনও মৃত্যুকালে 'তারকব্রহ্ম' নাম শুনাইবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এই অধিবাদ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সাধকের পক্ষে সমস্ত চরাচর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁহার নিজ শরীর তাঁহার নিকট অতি বিশিষ্ট সত্তা। তাঁহার নিজের মন, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ

তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রত্যেকটিতে 'আমার নিজস্ব' এই ভাব জড়িত থাকায় তিনি নিজেকে জগতের অন্য সমুদায় বস্তু হইতে পৃথক ভাবেন। অপরাপর জীবশরীর, বৃক্ষ লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি সাধারণ বস্তু সমুদায় তাঁহার মনে কোন বিশেষ ভাবের উদ্রেক করে না, কিন্তু আকাশ, বায়ু, বিদ্যুত, পর্ব্বত, সাগর, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত করে। হিমালয়, সমুদ্র বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ ইহাদিগকে এক এক মহৎ সত্তা বলিয়া অনুভব করে ও তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য দেখে। উপরি উক্ত এই তিন বর্গের পদার্থ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের অন্তর্গত। ইহাদের লইয়াই সাধকের সমস্ত কর্ম্ম। সাধকের নিকট ব্যক্ত চরাচর যে-ভাবে প্রকটিত হয় অধিবাদ তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্ত চরাচরকে কাপিল সাংখ্যবাদীরা আর একভাবে দেখিয়াছেন। অধিবাদ ও সাংখ্যবাদে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গীতায় কাপিল সাংখ্যবাদের পরই শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

অধিবাদে যজ্ঞ বা কর্ম্মের কথা কেন আসিয়াছে তাহা উপরের আলোচনায় বুঝা যাইবে। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ইত্যাদি সমস্তই অধিযজ্ঞ বা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাকে ওঙ্কাররূপে ধ্যানের উপদেশ আছে। এত অক্ষর থাকিতে পরমাত্মাকে কেন ওঙ্কাররূপে ধ্যান করিতে বলা হইল তাহা বিচার্য্য।

গীতার ৮।১২ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শঙ্কর বলিতেছেন, "ওঁকার পরমব্রহ্মের বাচক এবং প্রতিমাদির ন্যায় ওঁকার পরব্রহ্মের ধ্যেয় মূর্ত্তি। যাহারা মন্দবুদ্ধি অথবা মধ্যম বুদ্ধি তাহাদের পক্ষে এইভাবে ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।" উত্তম অধিকারীর পক্ষে ওঙ্কারের ধ্যান শঙ্কর অনুমোদন করেন না। প্রশ্নোপনিষদে আছে যিনি এক মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দুই মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকেও পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যিনি তিন মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি প্রথমে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন ও পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ও পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন। প্রশ্নোপনিষদের উপদেশের মর্ম্ম এই যে, সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তবে ওঁকারের উপাসনায় ব্রহ্মদর্শন হয়, নচেৎ নহে। ওঁকার দ্বারা পর ও অপর ব্রহ্ম উভয়কেই পাওয়া যায়। শঙ্কর-মতে পরব্রহ্মকে ওঁকার দ্বারা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাত্র।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লী ১৫, ১৬ এবং ১৭ শ্লোকে আছে—"সকল বেদ যে-পদের কীর্ত্তন করে, সকল প্রকার তপ যাঁহার কথা বলে, যাঁহাকে পাইবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি—তাহা এই ওঁ। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম পদার্থ; এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা কামনা করে সে তাহাই পায়। এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম। এই অবলম্বনকে জানিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়।" প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে বলা হইয়াছে, যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও পরম বিদ্বান ওঙ্কাররূপ সাধনের দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হন। সমগ্র মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঙ্কারের মহিমাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি উপনিষদসমূহেও ওঙ্কার সম্বন্ধে অনুরূপ বাক্য আছে, বাহুল্য বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অনুমান করা যায়, বেদে ও উপনিষদে ওঁকারকে শ্রেষ্ঠ সাধন হিসাবে ধরা হইলেও পরবর্ত্তীকালে সেই সকল উপদেশের মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি না হওয়ায় ওঁকার-সাধন মধ্যম ও নিম্ন অধিকারীর উপযুক্ত মনে করা হইয়াছিল। আজকাল আমরা 'হাঁ' বলিলে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে 'ওঁ' বলিলে তাহাই বুঝাইত। 'ওঁ' শব্দ হইতেই 'হাঁ' শব্দের উৎপত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে ওঁ এর এই অর্থ পাওয়া যাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১।৮) বলা হইয়াছে "ওঁ এই অক্ষর অনুমতিজ্ঞাপক। যখন কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয় তখনই বলা হয় ওঁ। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহার উপাসনা করেন তিনি কাম্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন।"

ওঁকারের ধ্যান বলিলে কেবলমাত্র ওঁকার-রূপ অক্ষরের মূর্ত্তি ধ্যান বা প্রতিমারূপে ওঁকারের ধ্যান উদ্দিষ্ট হয় নাই। এই প্রকার ধ্যানে চিত্তশুদ্ধি হইবে সত্য, কিন্তু যে-কোন অক্ষরের ধ্যানেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে ওঁকার-ধ্যান নিম্নাধিকারীর উপযুক্ত বলিতে পারা যায়। ওঁকারের দ্বারা যে-ভাব প্রকাশিত হয় তাহারই ধ্যান কর্ত্তব্য। বাংলা 'হঁা' কথার ধ্যান বা কার্লাইলের everlasting yeaএর ধ্যানও ঋষিদের ওঁকার উপাসনা। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার 'বেদপ্রবেশিকা' গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—

"আহাব সংজ্ঞক বেদমন্ত্র অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই; নিবিদ অপেক্ষাও প্রাচীন। যেমন বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনি স্তুতি পাঠকালে সমুদায় বেদমন্ত্রের মধ্যে আহাবের প্রাধান্য। কেন-না, এই আহাবের মধ্যে 'ওঁ' এই শব্দ বিদ্যমান। এই শব্দটি স্বয়ং একটি মন্ত্র। একটি একাক্ষর মন্ত্র, ইহার পারিভাষিক নাম 'প্রণব।' ওঁ শব্দের আদিম অর্থ—হঁা বা বটে। ইহাতে 'ভাব' এই অস্তিত্বের ধ্বনি পাওয়া যায়, অভাব নিরাকৃত হয়। আস্তিক ব্রহ্মবাদীগণ আপনাদের মৌলিক বিশ্বাস সকল এই একাক্ষর প্রণবের দ্বারা প্রকাশিত করিতেন। পরমেশ্বর আছেন কি নাই? নাস্তিক বলিবেন 'ন'—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলিবেন 'ওঁ'। মানুষের মৃত্যু দেখিয়া লোকে যে তর্কবিতর্ক করে, জিজ্ঞাসা করে পরলোক আছে কি নাই? তদুত্তরে নাস্তিক বলেন 'ন'—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলেন, 'ওঁ'। এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বুঝিবেন 'ওঁ' এই শব্দটি বেদের সার কি না। অবশেষে 'ওঁ' এই শব্দ রূপনাম-বিবর্জ্জিত সত্তামাত্রজ্ঞেয় পরমাত্মার উৎকৃষ্ট নাম বলিয়া ঋষিসমাজে পরিগৃহীত হয়। 'ওঁ' অর্থাৎ 'হঁা আছেন বটে।' পরমাত্মা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে?"

ওঁকারের ধ্যান সচ্চিদানন্দের সৎরূপের ধ্যান। ঋষিবাদীগণ জগতের সর্ব্ব পদার্থের সত্তার মধ্যে এই অবিনাশী ওঁকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন ও তাহারই ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন। 'অস্তিত্ব' বা 'অনুমতি' বা 'স্বীকৃতি' এই ভাবগুলির ধ্যানে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি হইবে, ইহাই ঋষিদের উপদেশ। কঠঋষি ওঁকার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন—"এতদাবলম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদাবলম্বনম্পরম্" অর্থাৎ "এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম।"

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদ—গীতার ১৩ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদের বিবরণ আছে। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জীবাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ রাখিলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার বুঝা যাইবে। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মা জীবদেহেই অবস্থিত। জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হয় এবং এই জীবদেহই ক্ষেত্র, অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানেই মুক্তি। প্রাণবান শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে অধ্যাত্ম বলা হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান একই। ক্ষেত্র বা শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান নানা প্রকারের হইতে পারে; যথা, শারীর-বিদ্যা (physiology), স্বাস্থ্যতত্ত্ব (hygiene), চিকিৎসা-বিজ্ঞান (medicine), ইত্যাদি কিন্তু এই সকল জ্ঞান অপেক্ষা যে-জ্ঞানের দ্বারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ বুঝা যায় সেই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ক্ষর-অক্ষর বাদ—গীতার ১৪ অধ্যায়ে প্রকৃতিজ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণের বিচার আছে এবং তাহারই বিস্তার হিসাবে ১৫ অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর বাদ আসিয়াছে। প্রকৃতিজ গুণত্রয় হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুঝা চাই যে, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থই বিনাশশীল অর্থাৎ ক্ষরভাবাপন্ন। অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ (গীতা ৮।৪), 'ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি' (গীতা ১৫।১৬), 'ক্ষরম্ প্রধানম' (শ্বেতাশ্বতর ১।১০) অর্থাৎ প্রকৃতিজাত সর্ব্ববস্তুকে ক্ষর বলা হয়। পুংলিঙ্গ ক্ষর শব্দ বা ক্ষর পুরুষ বলিলে জড়জীবদেহ বুঝায়। জড়বস্তু অভিমানী দেবতারাও ক্ষর পুরুষ; ব্রহ্মাও ক্ষর পুরুষ। ক্লীবলিঙ্গ ক্ষর শব্দে সমস্ত জড়বস্তু বুঝায়। জড়জীবদেহকে উপনিষদাদি শাস্ত্রে অনেকস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম কথার আত্মা শব্দেরও এই অর্থ। মনুও শরীরকে ভূতাত্মা (১২।১২) বলিয়াছেন। এজন্য গীতাতে ত্রিবিধ পুরুষ উক্ত হইয়াছে; যথা, (১) ক্ষর পুরুষ বা জড়দেহ যাহাকে সাধারণে 'আমি' বা আত্মা বলিয়া মনে করে; এই পুরুষ বিনাশশীল। (২) জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ; ইনি মায়ার দ্বারা দেহেতে আবদ্ধ এবং (৩) পরম অক্ষর বা পুরুষোত্তম যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন ও সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই তিন সত্তার কথা ঈষৎ ভিন্ন ভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ১।৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদাবিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

অর্থাৎ দুই অজ বা জন্মরহিত সত্তা আছেন; ইহাদের জ্ঞ ও অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এবং ঈশ ও

অনীশ অর্থাৎ শক্তিশালী পরমেশ্বর ও শক্তিহীন মায়াবদ্ধ জীব বলা হয়। আর এক অজা বা জন্মরহিতা সত্তা আছেন ইনি ভোক্তার অর্থাৎ জীবের ভোগ্য বিষয় প্রদায়িনী (প্রকৃতি)। অনন্ত আত্মা (ঈশ) বিশ্বরূপ হইয়াও অকর্ত্তা। এই তিনের (জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজা) উপলব্ধিতে ব্রহ্মলাভ হয়।

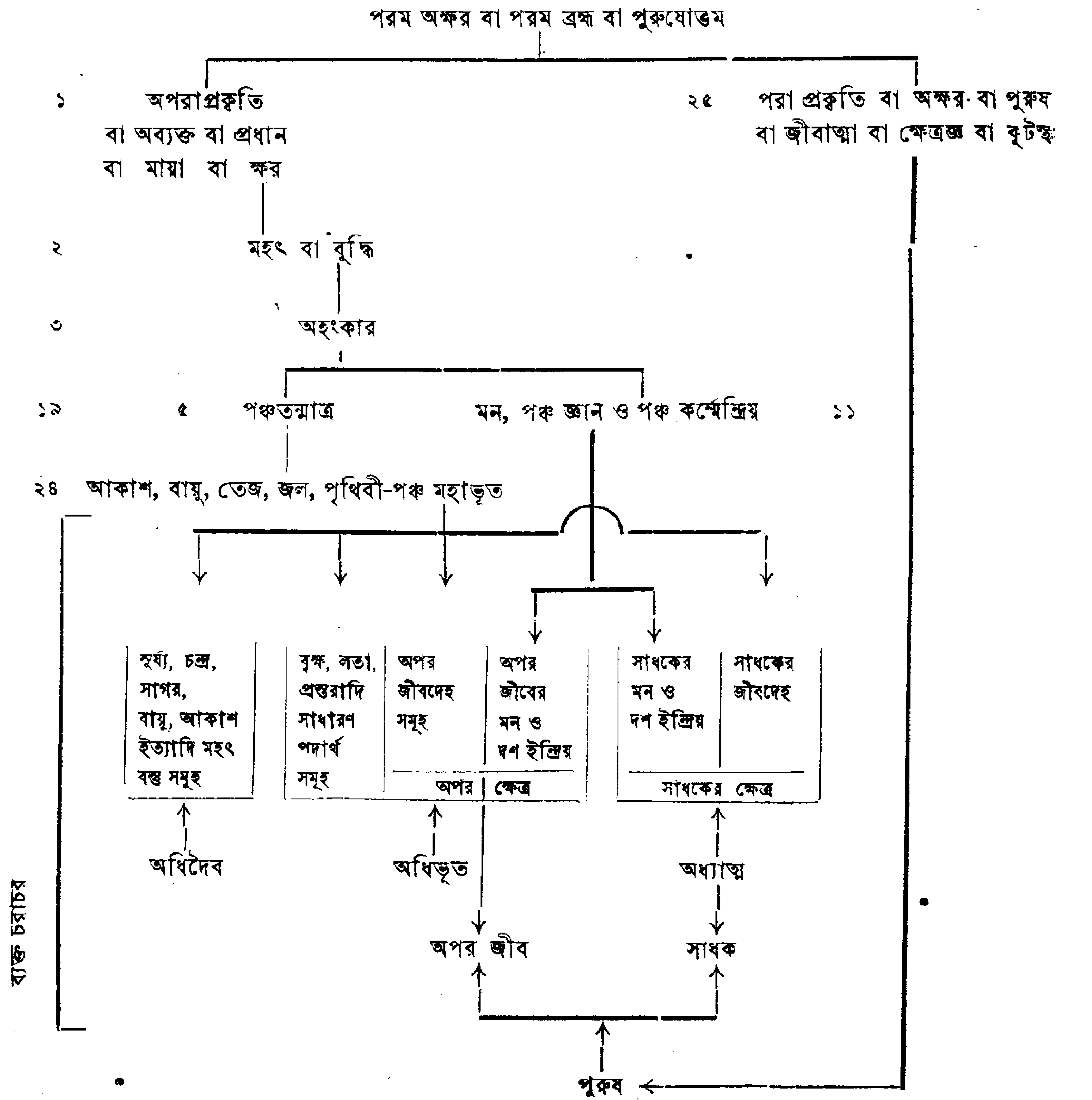
পুনশ্চ শ্বেতাশ্বতর ১।১২ শ্লোকে আছে—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ"

অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা বা নিয়ন্তা এই তিনকে জানিলে ব্রহ্মলাভ হয়।

গীতোক্ত বিভিন্ন পারিভাষিক তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ-প্রকাশক একটি নির্লেখ (chart) দিলাম। এই ক্রমণী হইতে পূর্ব্বালোচিত তত্ত্বগুলি সহজে বুঝা যাইবে।

গীতানুযায়ী সৃষ্টি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ক্রমণী



সন্তান-স্নেহ

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি শিকার ক'রে বাড়ি ফির্‌ছিলাম। তরুবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় আস্‌ছিলাম। আমার কুকুরটা আমারই আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে চলেছিল।

অকস্মাৎ কুকুরটা তার গতি মন্দ ক'রে গুড়ি মেরে মেরে চল্‌তে লাগল, সে যেন কোন শিকারের সন্ধান পেয়েছে।

আমি তরুবীথিকার ভিতর দিয়ে বরাবর নজর ফেললাম, দেখলাম অদূরে মাটির উপর একটা চড়াই পাখীর বাচ্চা পড়ে রয়েছে, তার ঠোঁটের দুটি কিনারে দুটি হলদে আঁজি টানা, আর তার মাথার উপরে কোমল পালক। সেটি গাছের উপর তার বাসা থেকে মাটিতে পড়ে গেছে, তখনও জোরে বাতাস বইছিল, আর পথ-বীথিকার গাছগুলিকে ঝুঁটি ধরে ক'ষে নাড়া দিচ্ছিল। সেই পাখীর ছানাটি মাটিতে পড়ে গিয়ে চোট খেয়ে চুপ ক'রে বসে ছিল, একটুও নড়ছিল না, কেবল তার আধফোটা অক্ষম কোমল ডানা দুটি মেলে ধরে অসহায় আতঙ্কে কাঁপাচ্ছিল।

আমার কুকুর ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথার উপরের গাছ থেকে এক টুকরা পাথরের ডেলার মতন আছড়ে এসে পড়ল তার নাকের ডগার কাছে একটা ধাড়ী চড়াই, তার গলায় কালো পালকের কণ্ঠি আঁকা। আর সে মাটিতে আছড়ে পড়েই বারংবার কুকুরের করাতের মতন দাঁতের পাটি মেলা হিংস্র মুখের সাম্‌নে ঝাপ্‌টা মার্‌তে লাগল একবার, দুবার, তিনবার,—সে ব্যাকুল হয়ে ভয়ে একবার সঙ্কুচিত হচ্ছিল, আর আবার উত্তেজিত হয়ে আপনাকে কুকুরের মুখের সমুখে ছড়িয়ে ধরছিল।

ধাড়ী চড়াই তার বাচ্চাটিকে বাঁচাতে চায়। সে তার নিজের দেহ দিয়ে বাচ্চাটিকে আড়াল ক'রে রাখতে চাইছে। তার ছোট্ট শরীরটুকু ভয়ে ভাবনায় থরথর ক'রে কাঁপ্‌ছিল, তার ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ বিহ্বল আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর ক্রমে গাঢ় গদ্‌গদ হয়ে এল, সে এলিয়ে পড়ল ক্লান্ত হয়ে, তবু তার ভয়-ভাবনায় বিহ্বল শিথিল শরীরটুকু কুকুরের বিকশিত দন্তপংক্তির সম্মুখে একবার অন্তিম প্রতিবাদ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, তার পর সে মরে গেল।

সে আপনাকে সন্তানের রক্ষার জন্য বলি দিলে।

তার কাছে এই কুকুরটা না-জানি কত বড় আর কত ভীষণ হিংস্র জন্তু ব'লে বোধ হয়েছিল। তবু সে ত তার নিরাপদ উঁচু ডালের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে নি। তার নিজের প্রাণরক্ষার আর ভয়ের চেয়েও কি একটা প্রবল শক্তি তাকে তার উচ্চ আশ্রয় থেকে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলেছিল।

আমার কুকুর এই ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে পরাজিতের মতন পলায়ন কর্‌ল। সেও সেই একটুকু চটকের অচিন্ত্য ও প্রাণের ভয়ের চেয়েও প্রবল শক্তির প্রতাপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমি কুকুরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এগিয়ে চল্‌লাম। সেই চড়াই পাখীর পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় আমার মনে কেমন একটা ভক্তি আর শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক হ'ল।

হ্যাঁ, হাসির কথা নয়, শ্রদ্ধা ত বটেই, ভক্তিও অনুভব করেছিলাম। সেই বীর পাখীর আশ্চর্য্য আত্ম-ত্যাগ আর তার স্নেহ-বাৎসল্যের প্রগাঢ় প্রকাশ দেখে আমার মনে শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক হয়েছিল।

আমার মনে হ'ল, মৃত্যুভয় আর মৃত্যুর চেয়েও ভালবাসা ঢের বেশী শক্তিশালী। ভালবাসাতেই, কেবল এক ভালবাসাতেই জীবন সম্ভব হয়, রক্ষা হয়, জীবনযাত্রা সঞ্চারিত হয়, আর জীবন ধন্য হয়। *

---

* তুর্গেনিভের গল্প অবলম্বনে।

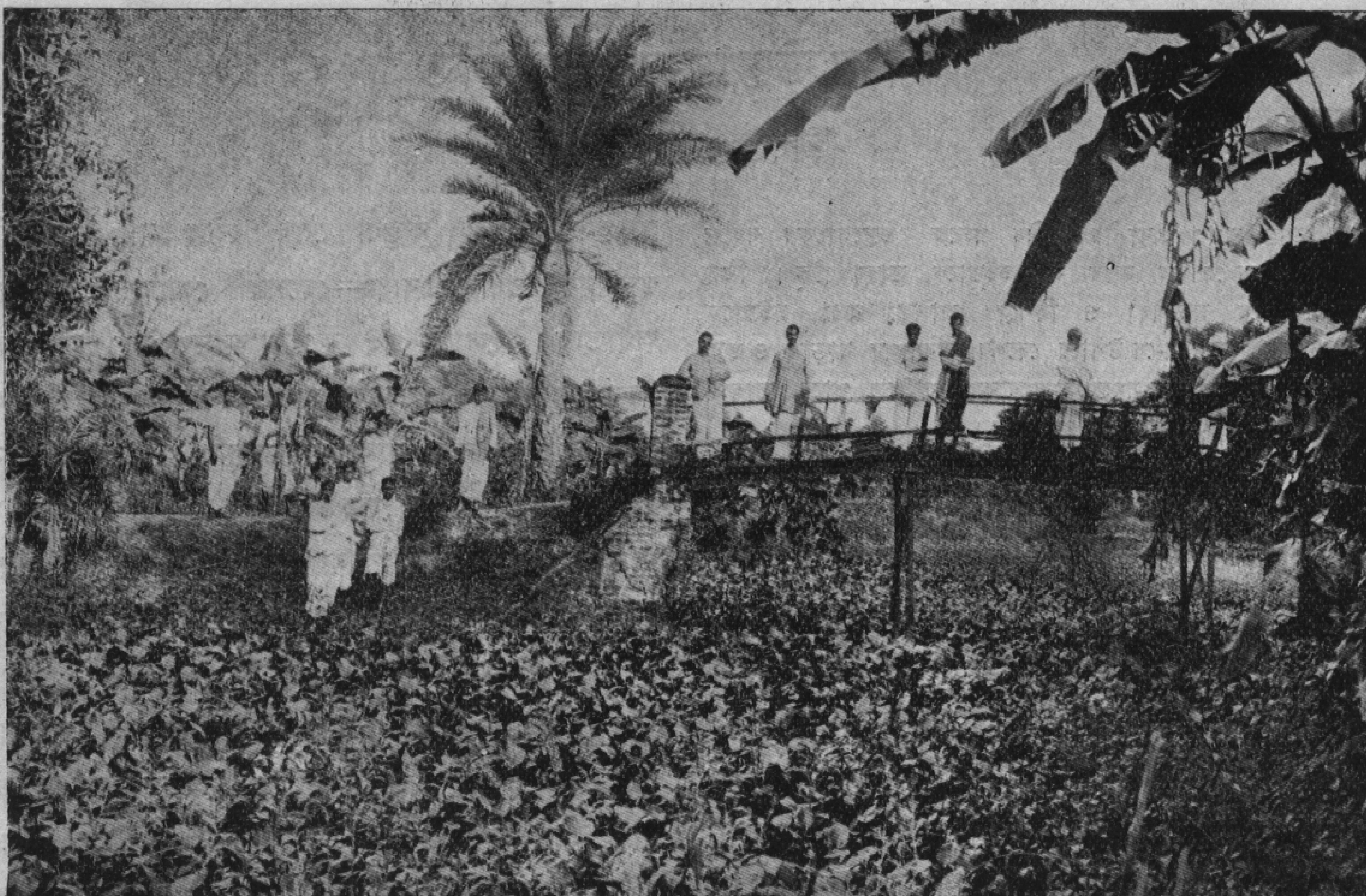
বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি সমিতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে "ভদ্রলোকের স্বহস্তে হলচালন" সম্বন্ধে যে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা ঠিক্‌। কিন্তু উহাতে যে যে অসুবিধা ও বিপদের আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা এড়াইয়া অন্ন যে-যে উপায়ে দেশের কৃষিসম্পদ বাড়ান ও ভদ্রলোকের দৈনন্দিন আহার্য্য সমস্যা সমধান করা যাইতে পারে, তাহার প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বাংলার ও বাঙালীর প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া। এই ম্যালেরিয়া দেশ হইতে কিরূপে তাড়াইতে পারা যায় তাহার জন্য দেশের মনীষীবৃন্দ চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌. বি. মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে-কোন স্থানের অধিকাংশ লোক সমবেত চেষ্টার দ্বারা নিজের নিজের বাসস্থানের চারিদিকের জায়গা-জমির আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার না করিলে, নিজের নিজের বাটীর নিকটস্থ পুকুর ও ডোবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিলে এবং যাহাতে মশক উৎপন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা না করিলে, আশপাশের জায়গা-জমিতে খানা-খন্দ গর্ত্ত ইত্যাদি ভরাট না করিলে সেখানকার ম্যালেরিয়ার মূল উৎপাটিত হইবে না। কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কুইনাইন সেবন করিলেই চলিবে না—কুইনাইন সেবন দরকার, কিন্তু সে কেবল রোগের সময়। যাহাতে রোগ না আসিতে পারে তাহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করাই হইতেছে আসল ও প্রধান কার্য্য। অন্যান্য আরও ছোট ছোট প্রতিষেধক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জঙ্গল সাফ, পুকুর পরিষ্কার ও খানা-খন্দ ভরাট করাই হইতেছে আসল ও মূল প্রতিষেধক ব্যবস্থা। গোপালবাবু এই উপায়ে সমগ্র বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুই হাজার ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণে কিয়ৎ পরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন। বাংলা দেশে ৮৫ হাজার গ্রাম, তাহার মধ্যে দুই হাজার গ্রামে সমিতি-স্থাপিত হইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল না। সমিতি-স্থাপনের প্রধান বাধা—দেশের লোকের আলস্য ও অর্থাভাব। লোকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মহাশয়! আজ পয়সা খরচ করিয়া বা নিজ হাতে কোদাল ধরিয়া জঙ্গল সাফ করিলাম, কাল আবার বর্ষার বৃষ্টি আরম্ভ হইতে-না-হইতে ব্যাঙের ছাতার মত চারিদিক হইতে আগাছা সব মাথা তুলিবে; আজ পয়সা খরচ করিয়া পুকুর পরিষ্কার করিলাম, কাল আবার পানা দামে ভরিয়া যাইবে; কি করিয়া অত সাফই বা করি, আর কি করিয়াই বা অত কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া মশক মারি।" যদি বলি পুকুরে কেরোসিন তৈল না দিয়া মাছের চাষ করিতে পারা যায় তাহা হইলে মশাও মরে এবং মাছও হয়—লোকে উত্তর দেয়, "মহাশয় ত বল্‌লেন! একবার হাতে-কলমে করিয়া দেখান দেখি।"

লোককে যদি দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, বাটীর চারিধারের জায়গা-জমির আগাছা ও জঙ্গল সাফ করিয়া রাখিতে হইলে প্রত্যেক বৎসরেই বেশী কিছু খরচ করিতে হইবে না, অল্পব্যয়ে বা সামান্য পরিশ্রমে ঐ পরিষ্কৃত জমি হইতে ফসলের দ্বারা যে আয় হইবে, যদি দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, পুকুর ডোবা পরিষ্কার করিতে যে খরচ পড়ে, তাহার চতুর্গুণ লাভ হয় সামান্য ব্যয়ে বা অল্প আয়াসে মাছের চাষ করিলে, যদি দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে-সময় তাস দাবা পাশা খেলিয়া বা পল্লীগ্রামের অতিমুখরোচক পরচর্চ্চা, পরনিন্দা বা দলাদলি সৃষ্টি করিয়া নষ্ট হয় সেই সময়ে বিনাব্যয়ে নিজের আহার্য্যের সংস্থান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একাধারে দেশের শত্রু ম্যালেরিয়া দমন, কৃষিজাত সম্পদের সৃষ্টি ও সময়ের সুব্যবহার হয়। এ বিষয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দায়িত্ব সমধিক—তাঁহারা সকলেই লেখাপড়া জানেন, সকলেরই কিছু-না-কিছু জমিজায়গা আছে এবং সকলেই অবসর



কচুরি পানা পূর্ণ খাল

সময় কিছু-না-কিছু বাজে কাজে নষ্ট করেন। যাহাদিগকে আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা চাষা বা জেলিয়া বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি, তাহারা উদরান্নের সংস্থানের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক আমাদের মত সময়ের এত অপব্যবহার করে না।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া গোপালবাবু কলিকাতার দশ মাইল উত্তরে বারাকপুরে যাইবার বড় রাস্তার ধারে উদ্যান-কৃষি-সমিতির সাফল্য হাতে-কলমে দেখাইবার জন্য একটি demonstration farm স্থাপন করিয়াছেন। লোককে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোককে, যাঁহাদের দু-দশ বিঘা জমি বাড়ির নিকটে আছে, তাঁহাদের অবসর সময়ে বিনা খরচায় বা অল্প খরচায় সামান্য পরিশ্রমে কি করিয়া বাড়ীর চারিধার পরিষ্কার রাখিতে ও তাহাতে আহার্য্য উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহাই দেখান এই বাগান স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কতকগুলি উপায় বা প্রথা কেবলমাত্র কৃষি-জীবীদের বেলায় খাটে; যেমন বাড়ির সংলগ্ন আম-বাগানে লাঙ্গল দিয়া চাষ করান যায় না—এরূপ জমি কোদাল দিয়া পরিষ্কার করা ব্যতীত উপায় নাই। আবার কতকগুলি উপায় কেবলমাত্র large scale agricultural production-এর বেলায় খাটে। বাষ্পীয় লাঙ্গল একশ দেড়শ বিঘার কম জমিতে চালাইয়া লাভবান হওয়া যায় না এবং তাহাতে প্রচুর মূলধন ও নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ চাই। অপর কতকগুলি উপায় অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে খুব ভাল, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য ম্যালেরিয়া-নাশ ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ আহার্য্য উৎপাদনের দিক দিয়া, একেবারেই অশোভন ও অ-কাজের; যেমন প্রদর্শনীতে দেখাইয়া পুরস্কার পাইবার আশায় নানারূপ রাসায়নিক সার দিয়া ও নানারূপ কারকিৎ করিয়া একটি তিন সের বীচিবিহীন পেঁপে ফলাইলাম। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে বা সাধারণের চক্ষে এরূপ পেঁপের আদর খুব; কিন্তু আমার দৈনন্দিন সংসার চালাইবার



পানা পরিষ্কারের পরে খালের দৃশ্য

পক্ষে বা আমার নিজ ব্যবহারের জন্য এরূপ পেঁপের প্রয়োজনীয়তা খুবই অল্প। ইহার পরিবর্ত্তে যদি আমি আমার পেঁপে গাছে আধ সের করিয়া আড়াইশ-তিনশ পেঁপে ফলাইতে পারি, তাহা বিক্রয় করিয়া সংসারের আয় বাড়াইতে পারি বা নিজ পরিবারবর্গকে খাইতে দিয়া পেটের অসুখের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি।

এমন উপায় আবিষ্কার করা দরকার বা পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক যাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খায় এবং মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হয়। যেমন, আমি কলিকাতায় আপিসে চাকুরি করি, রোজ নিজ গ্রাম হইতে ট্রেনে ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করি—সকাল বেলায় সময় অল্প, ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। নিজ হাতে গোবর সার সংগ্রহ করা বা ছড়ানোর সুবিধা নাই। অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে চিলিয়ান নাইট্রেট সার দিয়া কাজ সারিতে পারা যায়। জানিয়া লইলাম ফুলকপির চাষ করিতে কি পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ সার লাগে। এই সার কিনিয়া লইলাম—সার কিনিতে পয়সা লাগিল বটে, কিন্তু গোবর সংগ্রহ করিয়া তাহা পচাইয়া মালী লোকজনের দ্বারা জমিতে সার দেওয়াইতে যে খরচ পড়ে—আমি নিজ হাতে সমস্ত কার্য্য করি বলিয়া তাহার চেয়েও কম খরচ পড়িল। দুই বা আড়াই কাঠা জমিতে আড়াই-শ ফুলকপি হইল—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইলাম ও পাড়ায় বিলি করিলাম। নিজ কায়িক পরিশ্রমের ফল বলিয়া আনন্দও হইল। মোট খরচ যাহা হইয়াছিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিয়াছিলাম, খতাইয়া দেখিলাম স্থানীয় বাজার-দর অপেক্ষা সিকি দাম পড়িয়াছে। অবশ্য খতাইবার সময় আমার নিজের বা পরিবারবর্গের পরিশ্রমের কোন মূল্য ধরি নাই।

বাড়িতে গরু-বাছুরে ছয়-সাতটি—ইহাদের গোবর, চোনা, আবর্জ্জনা, খড়ের কুচি ইত্যাদি নিত্য সাফ করান একটি ব্যাপার। পাড়ার গোয়ালা-বউ যদি একদিন না আসিলেন বা ভাল সাফ করিলেন, গোয়াল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তারপর প্রশ্ন,—গোয়াল সাফ করিয়া আবর্জ্জনা ফেলি কোথা? পূর্ব্বে রাস্তার ধারে ফেলিয়া দিতাম, এখন দেশের নূতন কমিশনার অমৃত-বাবুকে ভোট দিই নাই বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী হইতে

আপত্তি হইতে লাগিল। একবার নোংরা করিয়াছি বলিয়া বেঙ্কোর্টে পাঁচ টাকা জরিমানা দিলাম। ভাবিতেছি, করি কি? গোপালবাবুর সুখচরের-বাগানে দেখিলাম সুবিধামত এক এক জায়গায় পাঁচ-ছয় হাত লম্বা, ঐ পরিমাণ চওড়া ও প্রায় আড়াই-তিন হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে বাগানের যত আগাছা প্রভৃতি প্রথমে একস্তর এক হাত গভীর করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর চোনার সঙ্গে বিচালী, গোবর, পাতা, কলার বাখলা, আনাজের খোসা প্রভৃতি এক হাত বা দেড় হাত গভীর করিয়া ফেলা হয়, উপরে আবার একস্তর আগাছা ইত্যাদি এবং আবার চোনার সঙ্গে বিচালী প্রভৃতি আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ এক স্তরের পর অপর এক স্তর করিয়া পালা করিয়া গোয়ালের আবর্জ্জনা ও আগাছা ফেলা হইয়াছে। দেখিলাম, বেশ সার প্রস্তুত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জমির উপর গাদা দিয়া সার প্রস্তুত করা অপেক্ষা জমিতে গর্ত্ত করিয়া সার প্রস্তুত করায় ফল বেশী পাওয়া যায়। কারণ জমির উপর সার প্রস্তুত করিতে গেলে সারের আসল অংশ অনেক পরিমাণে রৌদ্রে ও হাওয়ায় বাষ্প হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে সার পচিতে অনেক দেরি হয় ও মধ্যে মধ্যে গাদা ভাঙিয়া ওলট-পালট করিয়া দিতে অনেক মজুরী লাগে। গর্ত্তের ভিতর হইলে চাপে চাপে উহাতে ভরা-ভর্ত্তি করিয়া দিলে—বিশেষ করিয়া উপরে মাটি চাপা দিলে সারও শীঘ্র শীঘ্র পচে এবং মজুরীও কম পড়ে। গর্ত্তের তলায় এক সারি ইট সাজাইয়া দিতে পারিলে না-কি আরও ভাল হয়—কেন না মাটি একটুও রস শুষিতে পারে না, সব রসটাই সারে থাকিয়া যায়।

সুখচরের বাগান দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য করিলাম যে, খামারের গোয়াল-ঘরকেও কাজে লাগান হইয়াছে। এখানে চোনা ধরিবার জন্য গোয়াল-ঘরের পিছনে একটি সিমেণ্টের চৌবাচ্চা গাঁথা হইয়াছে। তাহাতে চোনা ও গোয়াল-ধোয়া জল আসিয়া পড়ে। প্রথমে ঐ সঞ্চিত জল তুলিয়া সার গর্ত্তের উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু চৌবাচ্চার 'শেষানি' জলটুকু হইতে মশা মাছি জন্মিয়া গোয়াল-ঘরের ও নিকটবর্ত্তী খোঁয়াড়ে দিনে মাছি ও রাতে মশার উপদ্রব যাহাতে না হয় তজ্জন্য এক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গোয়ালে ঝাঁট দেওয়া শুক্‌না বিচালি ও বাগানের শুকনা পাতা ঐ চৌবাচ্চায় দেওয়া হইয়াছে। শুক্‌না পাতা ও বিচালি জল টানিয়া শুষিয়া লইতেছে, মশামাছি জন্মাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে। যখন শুক্‌না পাতা পচিয়া যায় তখন তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত সার গর্ত্তে আবার ফেলা হয়। এই প্রথায় মশা-মাছির হাত হইতে অব্যাহতি ও গোয়াল-ধোয়া জলের ও সমস্ত চোনার আদায়—দুই কাজই হয়। দেখিয়া আসিয়া বাড়িতে ঐরূপ চৌবাচ্চা করিলাম এবং ঐ প্রথায় সার প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। প্রস্তুত সার নিজ ব্যবহারে লাগাইয়া প্রচুর ফল পাইয়াছি।

সব জিনিষ সকলে জানে না বা জানিতে পারে না; বিশেষ করিয়া এইরূপ কৃষিবিদ্যা একটি practical art. আমার অভিজ্ঞতার ফল আপনি লউন, আপনার অভিজ্ঞতার ফল আমি লই—ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে বৈঠক বসা দরকার। এইরূপ বৈঠক বসাইবার উদ্দেশ্যেই Bengal Home Crofters Association-এর সৃষ্টি। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা গোপালবাবুকে ১।২এ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কিংবা বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি-সমিতির বাগান, সুখচর পোঃ আঃ—এই ঠিকানায় সমিতির ডিমনষ্ট্রেটর শ্রীমদনমোহন দত্তকে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

আজব রোগ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর মাসের প্রত্যূষ। দারুণ দুর্য্যোগ। পাহাড়ের ওপার থেকে এক ঘোড়-সওয়ার সমুদ্রতীরবর্ত্তী গ্রামে এসে পৌছল। লোকটির মুখময় তামাটে দাড়ি—যাজক মহাশয়ের সন্ধানে তার আগমন। যাজকাবাসে গিয়ে সে হাঁক দিয়ে বল্‌লে, প্রোক্‌লাই গাঁয়ের এক কুঁড়ে ঘরে এক ব্যক্তি অজানা রোগে মরতে বসেছে। ডাক্তার অনুপস্থিত, নার্স বলে ব্যাধিটা টাইফয়েড, জ্বরবিকার বা হামবসন্ত কিছুই নয়—অতএব ধর্ম্মযাজককে ডাকা দরকার। রোগীর নাম লাইডন্।. যুবক পাঁচ দিন আগে পর্য্যন্ত দিব্য সুস্থ সবল ছিল, কিন্তু এখন মুখ থুবড়ে প'ড়ে প'ড়ে কেবলই ককাচ্ছে, খাদ্যপানীয় স্পর্শ করছে না।

প্রধানযাজক মহাশয়ের ঘুম ভাঙান হ'ল—তিনি চ'টেই আগুন, থ্যাক্ করে উঠে দাসীকে বল্‌লেন, ছোট-যাজকের বাড়ি পাঠিয়ে দাও না! সুতরাং তাঁকেই জাগানো হ'ল। যথাকালে তিনি সংবাদবাহীর সেই সাদা পাহাড়ী ঘোড়ায় চেপে বসলেন। তখন তামাটে দাড়ির মালিক আবার হেঁকে হেঁকে বল্‌তে লাগল, বাতাস থাকবে আপনার পিছনে, অতএব সোজা ককরে পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে নেমে একটা গিরিসঙ্কট পার হ'লেই আমাদের গাঁয়ে গিয়ে পৌছবেন। ঘোড়াটা ভালই, কেবল তার ডান পাশে চাবুক দেবেন, বাঁ পাশে নয়!

ছোটযাজক সাদা ঘোড়া ছুট করিয়ে চ'লে গেলেন। তামাটে দাড়ির মালিক তখন সরাইখানার মালিককে ডেকে তুল্‌লে। লম্বা দাড়িতে ঝাড়া দিয়ে দিয়ে বৃষ্টির জল ঝরিয়ে ফেল্‌লে, তারপর ঘরের মেঝের উপর গিয়ে দাঁড়াল। ঘর কাঁপিয়ে বাজখাঁই সুরে সে সকলকে শোনাতে লাগল যে তার গাঁয়ের এক ছোকরা এক আজব রোগে শয্যাগত। দিব্যি সুস্থ সবল যুবক, তার নাম লাইডন্। সে-ই এখন উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে, খাদ্য পানীয় স্পর্শ করছে না। কি যে তার রোগ কেউই বোঝে না, ভয়ে সকলের প্রাণ উড়ে গেছে!

ছোটযাজক পাহাড়ে চড়াইয়ের পথে উঠে ঘোড়াকে চাবুক দিলেন। পিছনের সমুদ্র থেকে ঝড়বৃষ্টি তাঁর পিঠ যেন ছেঁদা ক'রে ফেলতে লাগল—সকাল না হতেই ভ্যালা এক বিপদ—এতে কার না বিরক্তি হয়! যাজক মধ্যবয়সী, বিশ বছর ধ'রে সেই বুনো দেশটার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলেও এখনও মানুষগুলোকে ভয় ক'রে চলেন, তাদেরকে আফ্রিকার অসভ্য বুনোদের চেয়ে এক তিল সভ্য ব'লে ভাবতে পারেন না। বিশেষ ক'রে প্রোক্‌লাইয়ের লোকগুলোকে—যেখানে তিনি এই দুর্য্যোগে যাত্রা করেছেন। তার উপর এই নতুন নাম-না-জানা রোগ!

কি হতে পারে রোগটা?—তিনি ভাবতে লাগলেন।

বৃষ্টি তাঁর কালো বর্ষাতি ও কানের কাছে ঝুঁকে-পড়া টুপির উপর চটপট শব্দে আঘাত করতে লাগল। প্রকৃতির আক্রোশ দর্শনে আর পাহাড়ের মাঝে অভব্য কুঁড়ে ঘরে অজানা রোগের চিন্তায় ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

চড়াইয়ের পথ যখন আরও খাড়া হয়ে উঠল, তখন সাদা ঘোড়াটা সলম্ফ ধাবন ছেড়ে হামা দিয়ে ওঠার মত ক'রে পাহাড়িয়া ঘোড়ার অভ্যস্ত চাল সুরু করলে। পিছনের পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে সে উঠতে লাগল যেন একটা ভারি পদার্থ টেনে নিয়ে চলেছে, খুরের ঘায়ে এবড়ো-খেবড়ো পথ থেকে আলগা নুড়িপাথর ছিটকে পড়তে লাগল। এখানে গাছগুলো উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে। একটা পাহাড়ের কাঁধের পিছনে বাতাস থেমে গেল। বৃষ্টি ঘনতর হয়ে উঠল, কোমল করুণ ঝম্‌ঝম্ শব্দে। গাছের ডাল থেকে ভিজে পাতা বাতাসে ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে, একটা অজানা পাখী আশ্রয় ছেড়ে ঝোড়ো ভিজে ডানা ফট্‌ফটিয়ে আরও দূর

বনের মধ্যে উড়ে গেল। জলের ধারা গিরিমাটির স্পর্শে লাল হ'য়ে পথের ফাটলের মাঝ দিয়ে কুলকুল ক'রে ছুটে চলেছে, ঘোড়াঁর সাদা গায়ে আর যাজকের কালো কোর্ত্তায় ঝাপটা দিয়ে দিয়ে। গাছগুলো অতিক্রম ক'রে শিলাময় সুঁড়িপথের মাঝ দিয়ে মেষপালকের কুঁড়ে পেরিয়ে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার প্রশস্ত প্রান্তরে এসে পড়ল—স্থানটা গুল্মবহুল আর কালো কাদায় ভরা। চতুর্দ্দিকে আকাশ নীচু হয়ে নেমে এল, দিগন্ত কুয়াশার ঢালু পাড়ের মত সন্নিকটে এসে পৌছল। তীব্র বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল, তারই তাড়নে বৃষ্টি হু হু করে' কাত হয়ে পড়তে লাগল।

যাজকের হাড় পর্য্যন্ত ভিজে উঠেছে। ভগবানের রাজ্যে চক্ষুশূল এক নোংরা অভব্য কুঁড়ের মধ্যে অজানা রোগগ্রস্ত সেই অচেনা লোকটার উপর তিনি দারুণ চ'টে গেলেন। কোথাকার কে একটা বর্ব্বর আজব ব্যাধির কবলে পড়েছে—জগতে তার কোন্ প্রয়োজন থাক্‌তে পারে? তারই জন্য ভোর না হতে সুখশয্যা থেকে তাঁকে টেনে বার ক'রে এই বিষম জলঝড়ে তাঁর রক্ত হিম করা কেন? কল্পনায় তিনি দেখতে লাগলেন সেই জনমানবহীন ভয়ঙ্কর স্থান ভূতপ্রেত ও অপদেবতায় ভরে উঠেছে। ঘোড়ার উপর তিনি ঘন ঘন চাবুক বর্ষণ করতে লাগলেন।

চাবুকের জ্বালায় অস্থির হয়ে জলেভেজা ঘোড়া জলাপথের উপর দিয়ে সুদীর্ঘ লাফে লাফে ছুটে চলে, শেষে খাড়াই পার হয়ে অপ্রশস্ত গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করলে। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়গুলো দু-পাশে নতমাথা মৃত্যুমূর্ত্তির মত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে থরে থরে আঁকাবাঁকা, তারই মাঝ দিয়া সরুপথটি বিসর্পিত গতিতে ক্রমশ নাম্‌তে নাম্‌তে বাহির হয়ে খাড়া নেমে গেছে বড় বড় গোলাকার শৈলপ্রাচীরবেষ্টিত এক অন্ধকার উপত্যকায়। সেই উপত্যকার তলদেশে কুয়াশার মেঘ ও বৃষ্টির মাঝ দিয়া ছোট গ্রাম প্রোকৃলাই দৃষ্টিগোচর হ'ল—নির্জ্জন নিরানন্দ, পাহাড় ও দেবদারুর মধ্যে জড়ামড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে জলাবাহিনী এক জলধারার পাশে। দেখতে পেয়ে ঘোড়াটা আনন্দে হ্রেষাধ্বনি ক'রে মরিয়া হয়ে ছুটল—যেন উড়ে চলেছে। দু-হাতে ঘোড়ার ঝুঁটি চেপে ধরে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কোনো গতিকে যাজক-মশাই ঘোড়ার পিঠে লগ্ন রইলেন, পিঠের দিক দিয়ে হাওয়ার চোটে তাঁর কোর্ত্তা উড়ে তাঁর দুই কান ঢেকে ফেল্‌লে।

গাঁয়ের পথে পৌছে ঘোড়াটা থামল। দেখতে দেখতে চারিদিকে ভিড় জ'মে গেল। লোকগুলো পরস্পরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সুরু ক'রে দিলে। জনকয় এসে যাজক-মহাশয়কে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিলে। দারুণ বিরক্তিভরে চারিদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তিনি তাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতি সামান্য, কারণ সে অঞ্চলের যাজকেরা ঐ গ্রাম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। তাঁহাদের মতে লোকগুলোর উদ্ধারের কোনো আশা নাই। কুসংস্কারে ভরা, বন্যপ্রকৃতি—তাদের পোষ মানানো অসম্ভব; খৃষ্টধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করা তাদের কর্ম্ম নয়। ভেড়া চুরি করা তাদের পেশা, কিন্তু পরস্পরের ভেড়া চুরি করার জন্য সে ব্যবসায়েও বিশেষ লাভ হয় না। পাহাড়গুলো তাদের চারিদিকে জেলখানার মত দেওয়াল তুলেছে, আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের ফলে তাদের মধ্যে পাগলামো আর ধ্বংসের বীজ এসে পৌছেচে। বাস করে তারা কুঁড়ে ঘরে, কারও কাছ থেকে যাজকের দক্ষিণা আদায় হওয়া অসম্ভব, অথচ হতভাগারা নিয়তই যাজকাবাসে ভিক্ষা করতে আসে।

তাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মযাজকদের এই ধারণা, বিশেষ ক'রে এই যাজকের। তিনি মনে মনে তাদের ঘৃণা করতেন, এবং সংসারে তারা একান্ত অনাবশ্যক ব'লে ভাবতেন; বেদীর উপর থেকে অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে, তাদের আত্মাও অবিনশ্বর, অতএব পরলোকে তারা অপ্রয়োজনীয় নয়।

এই ক্ষণে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক সিক্ত, শীতে অবশ ও অভুক্ত অবস্থায় তিনি কামনা করছিলেন পদতলে ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে পাষণ্ডগুলোকে গ্রাস করুক; বিশেষ ক'রে সেই বেটাকে যাকে অজানা রোগে ধরেচে!

রাগতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় সেই ব্যারামী লোকটা?

লোকগুলো এতক্ষণ কলরব করছিল। তাঁর কথা

শুনে বিদেশীকে দেখার কৌতূহল ও আনন্দ উবে গিয়ে মুহূর্ত্তে তাদের মধ্যে সেই অজানা রোগের ভয় এসে ঢুকল। কলরব থেমে গেল। একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, সে-ই রোগীর মা। অতিরিক্ত বিনয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে সে যাজককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল জীর্ণ একটা খোড়ো ঘরে। ঘরের সামনের দেওয়ালে একটিও জানালা নাই, দ্বারপথে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে রাণীর মত মধুর ভঙ্গীতে নমস্কার ক'রে রোগীর মা যাজককে আহ্বান করলে "তার সামান্য কুটীরে পদার্পণ ক'রে তাকে ধন্য করতে।" যাজকমহাশয় রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন, স্ত্রীলোকটি তাঁর অনুগমন করলে। দ্বারের ধারে সমস্ত গ্রাম ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ালো।

প্রথমটা যাজক ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেলেন না। উনানে ঘাসের চাপড়ার আগুন, তা থেকে বার হচ্ছে অসম্ভব রকম ধোঁয়া—আগুনের জৌলুস নয়। সম্ভবত বহু কাল চিম্‌নি পরিষ্কৃত হয় নি, তাই সে ধোঁয়া বার হবারও উপায় নাই—রান্নাঘর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। যাজক খক্ খক্ ক'রে কাশতে সুরু করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রোধও বেড়ে চল্‌ল।

বল্‌লেন,—তোদের কি একটা আলোও জোটে না?

রোগীর মা তাড়াতাড়ি একটি মোমবাতি নিয়ে এল। বাতির মুখটা আগুনের মধ্যে গুঁজে বার ক'রে আনলে—হলদে ছাই আর গলিত মোমে ঢাকা একটি মিটমিটে আলোর সৃষ্টি হ'ল। নোংরা মোমবাতিটা মাথার উপর তুলে ধ'রে সে ঘরে একটা কোণের দিকে ইঙ্গিত করলে।

বল্‌লে, ওই দেখুন।

ঘরের কোণে গিয়ে যাজক নীচুদিকে তাকালেন। মাটির মেঝের উপর একখানা খড়ের গদি, তারই উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পুরোদস্তুর পোষাক-পরা এক যুবক।

যাজক বল্‌লেন,—এই? এরই অসুখ?

স্ত্রীলোকটি বল্‌লে,—হ্যাঁ বাবা।

যাজক মোমবাতি নিয়ে গদির পাশে পাতা একখানা খেলো চেয়ারের উপর রাখলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে শায়িত মূর্ত্তিকে স্পর্শ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুমুচ্ছে না কি?

পীড়িত লোকটি শোকার্ত্ত অথচ দিব্য সুস্থ সবল কণ্ঠে উত্তর দিলে, না বাবা ঘুমুই নি!

যাজক চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। কুপিত কণ্ঠে বল্‌লেন,—অ্যাঁ? কথা শুনে ত রোগ হয়েছে ব'লে মনে হয় না!

রোগী বিছানায় উঠে বসে যাজকের পানে তাকালে। তার মুখ মিটমিটে মোমবাতির নিকটেই ছিল। সে-মুখ বিষম বিবর্ণ—উন্মাদের মত। বড় বড় নীল চোখ ও পুরু ঠোঁট। গায়ের নীল পশমী কোর্ত্তা তার সবল গ্রীবাকে আবৃত করতে পারে নি। সেই সুপুষ্ট গ্রীবা পিরামিডের মত উঠে তার সুন্দর মাথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মাথাটি চমৎকার, তার সামনে তার বোকাটে বিবর্ণ মুখ ভারি বেমানান আর বিসদৃশ। অস্পষ্ট আলোয় তার দেহাবয়ব প্রকাণ্ড ও কোমল প্রতিভাত হ'ল।

ঘ্যানঘেনে স্বরে সে বল্‌লে,—ঘর থেকে ওদের যেতে ব'লে দিন। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।

যাজক বল্‌লেন, যাও, বেরোও সকলে এখান থেকে।

সকলে বিদায় হবার পর তিনি বল্‌লেন, বল্ কি বলবি!

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর স্তব্ধতা! রোগী কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার ঠোঁট নড়লেও তা থেকে কোনো শব্দ বার হচ্ছে না। ছোট ক'রে ছাঁটা চুলের উপর দ্বিধাভরে সে তার নরম বড় হাত বুলোতে লাগল।

যাজকের বিরক্তি ধ'রে গেল। বল্‌লেন,—আচ্ছা বল্, এবার। তোর নাম কি?

"আজ্ঞে, প্যাট্রিক লাইডন্।"

"বয়স?"

"আজ্ঞে, বাইশ।"

"হুঁ! তারপর···বেদনা আছে? নে চটপট খুলে বল্।"

"উ···উ···" লোকটা তোৎলাতে লাগলো। "দয়া ক'রে বাতিটা নিবিয়ে দেবেন কি বাবা?"

"কি বলছিস্?"

লোকটা কম্পিত উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল,—কি আর বলি বাবা, বলতে ভারি লজ্জা করে! বাতিটা নিবিয়ে

দিলে অন্ধকারে বলা সহজ হবে। বেঁচে থেকে আর সুখ নেই বাবা, জীবনে ধিক্কার জন্মেছে !

"কি হয়েছে ছাই··· ?"

"ওঃ, বা—আ—বা···"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছি নিবিয়ে !"

যাজক বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। রোগী কম্পিত হাতে বাতিটা ধ'রে চেয়ার থেকে তুলে নিলে।

"বসবেন কি বাবা ?" সে অস্ফুট স্বরে বল্‌লে। "আমার পাশে আপনি ব'সে থাকলে বলা সহজে হবে। জীবনে ধিক্কার জন্মেছে বাবা, বেঁচে থেকে আর সুখ নেই !"

"কি বল্‌লি ?"—যাজক প্রশ্ন করলেন।

চেয়ারের উপর ব'সে বল্‌লেন, নে বল্ এবার।

লোকটা যাজকের হাঁটু চেপে ধ'রে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দিলে।

"উঃ বা—আ—বা, জীবনে ধিক্কার জন্মেছে ! আমি···আমি···"

"কি ?"

"আমি···আমি···আমি···"

"মোলো যা, গর্দ্দভ কোথাকার ! হয়েছে কি ?"

"আমি···আমি···এই প্রে—এ—মে পড়েছি বাবা !" ব'লেই গদির উপর ধুপ ক'রে প'ড়ে সে গোঙাতে লাগল।

ঢোক গিলে যাজক বল্‌লেন,—অ্যাঁ ? তুই···তুই···প্রেমে হা ভগবান ! আমি তোকে···একেবারে···

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে লোকটা বলতে লাগল শাপ দেবেন না বাবা ! বলছি সব কথা। মেয়েটির নাম নোরা, কামারের বউ, তার পানে চাইতে আমার ভয় করে, কিন্তু তার মুখখানা যেন আমায় ডাকতে থাকে, দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে। আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, আমি মরতে চাই ! কিন্তু দোহাই আপনার শাপ দেবেন না, শাপ দেবেন না !

যাজক দাঁড়িয়ে উঠলেন, ঠোঁটে ঠোঁটে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলেন, তারপর মুখের উপর হাত তুল্‌লেন। তাঁর ক্রোধ ফেটে বার হ'ল। মুষলধারে বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে আপন দুর্গতির কথা নিমেষে মনে প'ড়ে গেল, আর মনে পড়ল হতচ্ছাড়াদের নোংরা জীবন যাত্রা। তিনি ছুটে দ্বারের কাছে গেলেন।

চীৎকার ক'রে বল্‌লেন, নিয়ে আয় ত চাবুকগাছা !

চাবুক তারা নিয়ে এল। দেখে রোগী তারস্বরে চেঁচাতে সুরু ক'রে দিলে,—শাপ দেবেন না বাবা, শাপ দেবেন না বাবা !

আর যায় কোথা, যাজক সপাসপ চাবুক হাঁকড়াতে লাগলেন। চাবুকের ঠেলায় অসভ্যটা লাফিয়ে উঠে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে চেঁচাতে দ্বারপানে ছুটল—স্বাস্থ্য খুব ভাল না থাকলে তেমন ক'রে কেউ চেঁচাতে পারে না। গাঁয়ের পথ দিয়ে একেবারে ভোঁ দৌড়, তারপর একটা পাথরের দেওয়াল টপকে জলাভূমিতে অবতরণ। তারপর বিকট চীৎকার করতে করতে আবার ছুট্।

কে একজন বল্‌লে, ভগবানের অপার দয়া ! ওর রোগ সেরে গেছে ! ব্যারামটা হয়েছিল কি ?

অ্যাঁ ? ব'লে যাজক চোখ ঘুরিয়ে চাবুক আস্ফালন করলেন। 'ঘোড়া নিয়ে আয় !'

ঘোড়ায় চেপে তিনি চ'লে গেলেন, গেঁয়ো লোকগুলো ভয়ে ভক্তিতে নিঃশব্দে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কি যে ঘটল সে কথা যাজককে জিজ্ঞাসা করতে কারও সাহস হল না।

ঘোড়ার পিঠে চড়াই-পথে উঠতে উঠতে যাজক শীতে আর রাগে কাঁপতে লাগলেন। দুঃখে ও ক্রোধে তাঁর চোখে জল এল। আকাট মূর্খগুলোর উপর রাগ করার চেষ্টাও নিষ্ফল ভেবে তাঁর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

অবশেষে তিনি একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে তাঁর ক্রোধ সেই বেল্লিকের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন যে এই সমস্ত অনর্থের মূলে।

অবনত মেঘপুঞ্জের পানে ঘুসি উঁচিয়ে তিনি হাঁকতে লাগলেন—

প্রেমে পড়া ! প্রেমে পড়া !···কুৎসিত কদর্য্য কাণ্ড। দারুণ পাপ ! দারুণ পাপ ! *

---

* বিদেশী গল্পের অনুবাদ।



বাঁশরী

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ জাতি

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সুইডেনের উত্তর ভাগে প্রায় অর্দ্ধেক অংশে শীতের কঠোরতা ও প্রস্তরময় পার্ব্বতীয় ভূমির অনুর্ব্বরতাবশতঃ লোকজনের বাস খুব কম। এই উত্তর ভাগকে সাধারণতঃ নরল্যাণ্ড বা উত্তর দেশ বলা হইয়া থাকে। এই প্রদেশের কতক অংশ সুমেরু বৃত্তে পড়িয়াছে। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে ল্যাপল্যাণ্ড এবং পাশ্ববর্ত্তী দক্ষিণ অংশকে জ্যাম্পল্যাণ্ড বলা হইয়া থাকে। এই উত্তর দেশেই বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী সুইডেন ও নরওয়ের মাঝখানে প্রায় ষাট মাইল জুড়িয়া সীমান্ত প্রাচীর



প্রবন্ধ-লেখক শীতকালে 'ওরে' নামক পর্ব্বতে অরোহণ করিতেছেন

হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই উপর ল্যাপ জাতি বাস করে। এই কঠোর শীতের প্রদেশে ল্যাপ জাতিদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে জনৈক সুইডিস বন্ধুর সঙ্গে নরল্যাণ্ডে রওনা হই। শীতের কঠোরতাবশতঃ জ্যাম্পল্যাণ্ডের পরে আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় নাই। এই জ্যাম্পল্যাণ্ডের বিখ্যাত ওরে নামক পার্ব্বতীয় স্থানে শীতপ্রধান দেশীয় স্লেজ ও 'স্কী' খেলার বিপুল আয়োজন আছে। পরের বৎসর



আপন বিশ্বস্ত কুকুর সঙ্গে ল্যাপ শিশু

গ্রীষ্মকালে (যদিও তখন শীতের মাত্রা সেন্টিগ্রেড ০° ডিগ্রির নীচে ছিল) ল্যাপ জাতি ও সেই প্রদেশের সঙ্গে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে ল্যাপ ল্যাণ্ডের শেষ সীমানা: পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করি। নিম্নে তাহারই বিবরণ দিতেছি।

গাড়ীতে সেই দেশ ভ্রমণ করিবার খুব সুবিধা—যদিও জনমানবের সংখ্যা খুব কম। পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ী চলিতে থাকে, কিন্তু এখানে-সেখানে তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য ভূমির উপর সেই দেশীয় হরিণের পাল, স্থানে-স্থানে হ্রদ ও গহ্বর, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন চারি ঘণ্টা পর-পর যখন গাড়ী কোন ষ্টেশনে আসে তখন মাত্র কয়েকটি

আবাস-গৃহ ছাড়া জনমানবের সাড়া নাই বলিলেও চলে। এই দারুণ নিস্তব্ধতার মধ্যে জনমানবের কোলাহল হইতে আসিয়া পড়িলে প্রথমটা বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু এই স্থানেই ল্যাপরা সাধারণতঃ সপরিবারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই ল্যাপ জাতি কখন কি ভাবে আসিয়া এই মেরু-



শীতবস্ত্রে লেখক

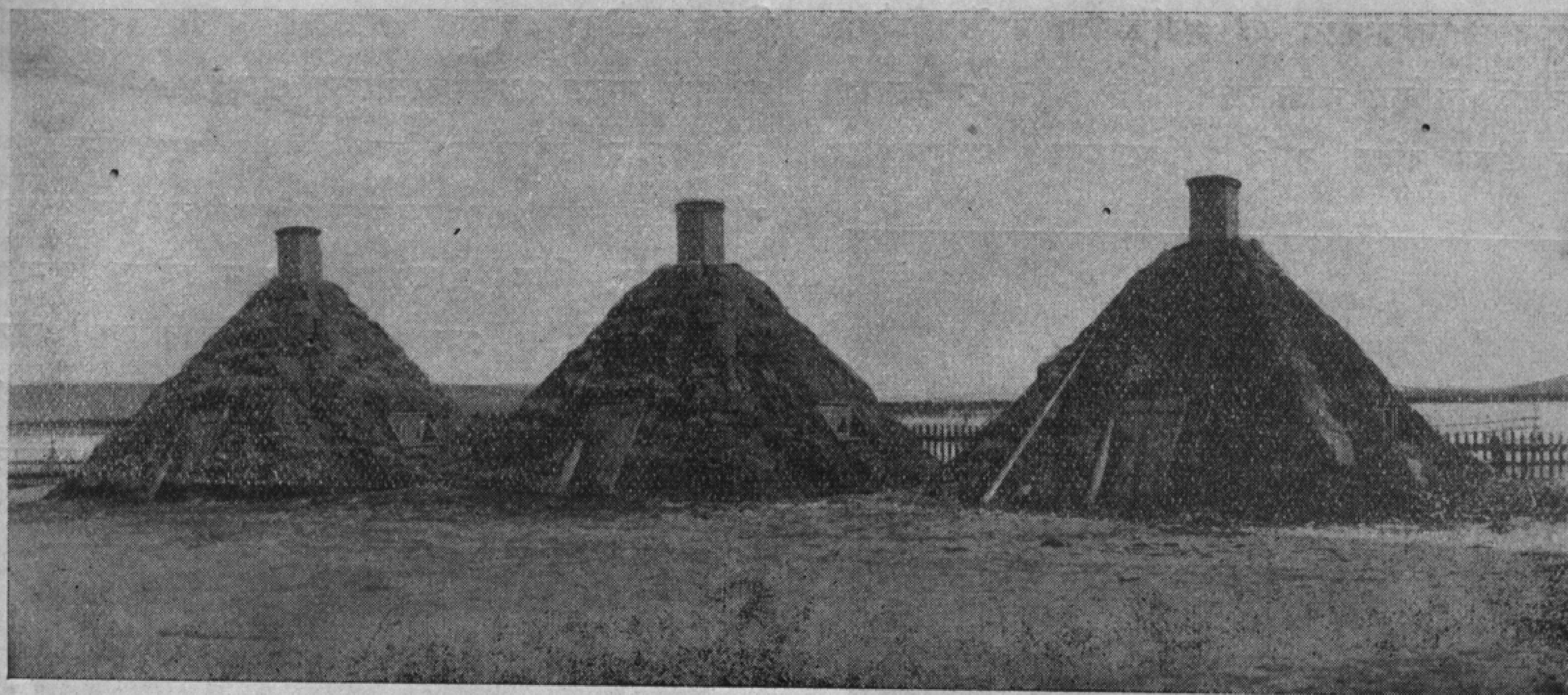
প্রদেশে আশ্রয় লয়, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে তাহারাই সুইডেনের উত্তর সীমান্ত প্রদেশের প্রথম অধিবাসী। জাতিতে তাহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। অনেকে মনে করেন যে, মধ্য-এশিয়া হইতে প্রথমে ইহারা এই উত্তরমেরু-প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু সে-সম্বন্ধেও আজ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। সুইডিস সভ্যতা উত্তর দিকে বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপ জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং তাহা খুব বেশী দিনের কথা নহে। ল্যাপল্যাণ্ড এবং ল্যাপ জাতি ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের সর্ব্বপ্রথম রাজা ম্যাগনূস্ লাডুওসের রাজত্বকালে সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এখানে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, নরওয়ে, ফিন্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশে অনেক ল্যাপ বাস করে এবং এই ল্যাপেরা এক সময়ে প্রতিবেশীদের হাতে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিয়াছিল। এখানে সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত ল্যাপল্যাণ্ডের ল্যাপদের কথাই বলা যাইতেছে।

সুইডেনে এই ল্যাপদের সংখ্যা মাত্র সাত হাজারের অল্প উপর; এবং তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল সংখ্যায় অতি নগণ্য,—তাহারা আজকাল তীরভূমিতে আসিয়া ঘরবাড়ির আশ্রয় লইয়াছে। আর এক দল পুরুষানুক্রমে এখনও ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় জীবনযাপন করে। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট ল্যাপদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং তাহাদের স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট। এই ল্যাপ শব্দের উৎপত্তি কি ভাবে হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।



জাতীয় পোষাকে ল্যাপ যুবক বল্গা হরিণ সঙ্গে। হরিণের শৃঙ্গটি দেখিবার মত

ল্যাপেরা এই শব্দটিকে অবজ্ঞাসূচক বলিয়া মনে করে এবং আপনাদিগকে 'সেইম' (Sameh) বলে। সুইডিস্রা কিন্তু ইহাদিগকে পাহাড়ী জাতি (fjallfolket) আখ্যা দেয়।

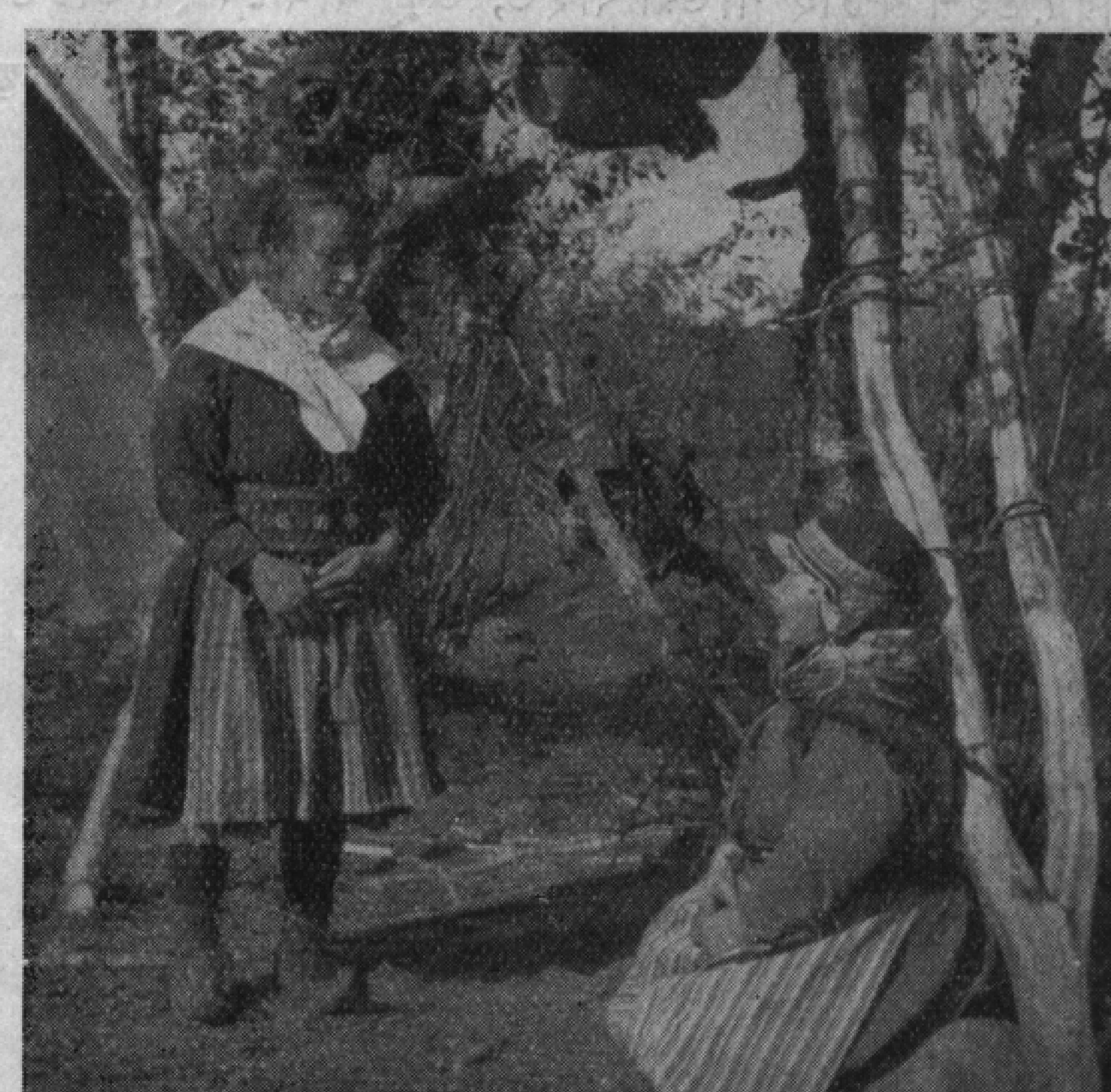


ল্যাপ বিদ্যালয়

আকৃতিতে সুইড্‌দের সঙ্গে ইহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহারা খর্ব্বাকৃতি। কিন্তু সময়-সময় উঁচু লম্বা ল্যাপও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সব ক্ষেত্রে ইহাদিগকে মিশ্রিত বলিয়া সন্দেহ করা হয়। ইহাদের শরীরের গঠন চমৎকার। পুরুষদের রং সাধারণতঃ বেশ গাঢ়, যেন সূর্য্যের তাপে পোড়া। ইহাদের মাথা সাধারণতঃ গোলাকৃতি; ঘাড়ের দিকটা চওড়া, কপালটা ক্রমশঃ সরু হইয়া মাথার দিকে উঠিয়াছে। হনু দুইটি মঙ্গোলীয়দের মত প্রশস্ত, চোখ ছোট ছোট; নাকের উপরিভাগটা সোজা হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। ঠোঁট দুইটি পাতলা, কিন্তু মুখ বেশ প্রশস্ত, চুল কালো। সময় সময় পুরুষদিগকে দাড়ী রাখিতে দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গোলীয়দের মত এদের দাড়ী খুব পাতলা, লম্বায়ও খুব বেশী বড় হয় না।

মেয়েরা প্রথম বয়সে খুব সুন্দরী থাকে, কিন্তু অল্প বয়সেই মেয়েপুরুষ সকলের মুখেই প্রৌঢ়তার ছায়া ফুটিয়া উঠে। চল্লিশ বৎসর বয়সে সকলেরই মুখের চামড়া কুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। কঠোর শীতের প্রভাবই বোধ হয় এরূপ হইবার কারণ।

সুইডেনের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অপেক্ষাকৃত নূতন তৈরি শহরের নাম—কিরোনা। সেই জায়গায় সুইডেনের সুবৃহৎ লৌহখনি-সম্পদ রহিয়াছে। এই লৌহ-পাহাড় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। লৌহ-সংগ্রহের জন্যই সেই বিচ্ছিন্ন জনমানবহীন প্রদেশে এই শহরের সৃষ্টি হয়। সেখান হইতে প্রতি পাঁচ মিনিটে চল্লিশ গাড়ী বোঝাই লৌহ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের



আপন কুটিরের সম্মুখে জাতীয় পোষাকে ল্যাপ মাতা ও কন্যা

সাহায্যে বিপুল তুষারমালা ভেদ করিয়া পর্ব্বতের গায়ে ঘেঁষিয়া স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া নরুইজিয়ান সামুদ্রিক বন্দর নাভিক নামক স্থানে চালান দেওয়া হয়। এই নাভিক আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত; এবং

নরওয়ের প্রধান অংশকে এই পর্ব্বতমালা নার্ভিক হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই স্থানে সেই জায়গা সম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখি। কিরোনায় অবস্থানকালে



মুক্ত বাতায়নতলে পাঠরত ল্যাপ শিশু

গাছপালা একেবারে পাতাশূন্য ছিল এবং যদিও সূর্য্যোত্তাপ প্রায় তেইশ ঘণ্টাই পাওয়া যাইত, তবু আমাকে অতিরিক্ত শীতের জামা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু



নিম্ন ভূমিতে স্থায়ী কুটিরের সম্মুখে ল্যাপ পরিবার

নার্ভিক আরও উত্তরে অবস্থিত থাকিলেও সেখানকার গাছপালা সবুজ পাতায় পূর্ণ এবং শীতের মাত্রাও খুব কম ছিল। এইরূপ অদ্ভুত প্রভেদের কারণ সেখানকার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে গরম জলস্রোতের প্রবাহ।

কিরোনা হইতে নার্ভিক যাইবার পথে অন্য একটি শহর পাওয়া যায়। সেখানে মাত্র পঞ্চাশটি স্থইডিস্ পরিবার বাস করে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দূরস্থান হইতে অনেকেই সেখানে স্কেটিং ও স্লেজ খেলা দেখিবার জন্য আসে। সেই শহরটির নাম আবিস্কো। তাহার পার্শ্বেই সেখানকার বিখ্যাত হ্রদ তর্ণেস্ত্রাক্ অবস্থিত। ইহারই



গ্রীষ্মকালে কুটিরের বাহিরে ল্যাপ-গৃহিণী কফি গুঁড়া করিতেছেন

কাছাকাছি জায়গায় অনেক ল্যাপ বাস করে বলিয়া এই স্থানকে ল্যাপদের দরজা বলা হয়।

এখানে দুইবারে প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ল্যাপদের সঙ্গে পরিচয় করা। দেখিলাম, পাহাড়ের নীচে এখানে-সেখানে ল্যাপদের তাঁবু রহিয়াছে। তখন ল্যাপদের কাছে যে আতিথেয়তা পাইয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। ল্যাপদের স্বভাব সাধারণতঃ বড় মধুর এবং সর্ব্বদাই তাহাদিগকে



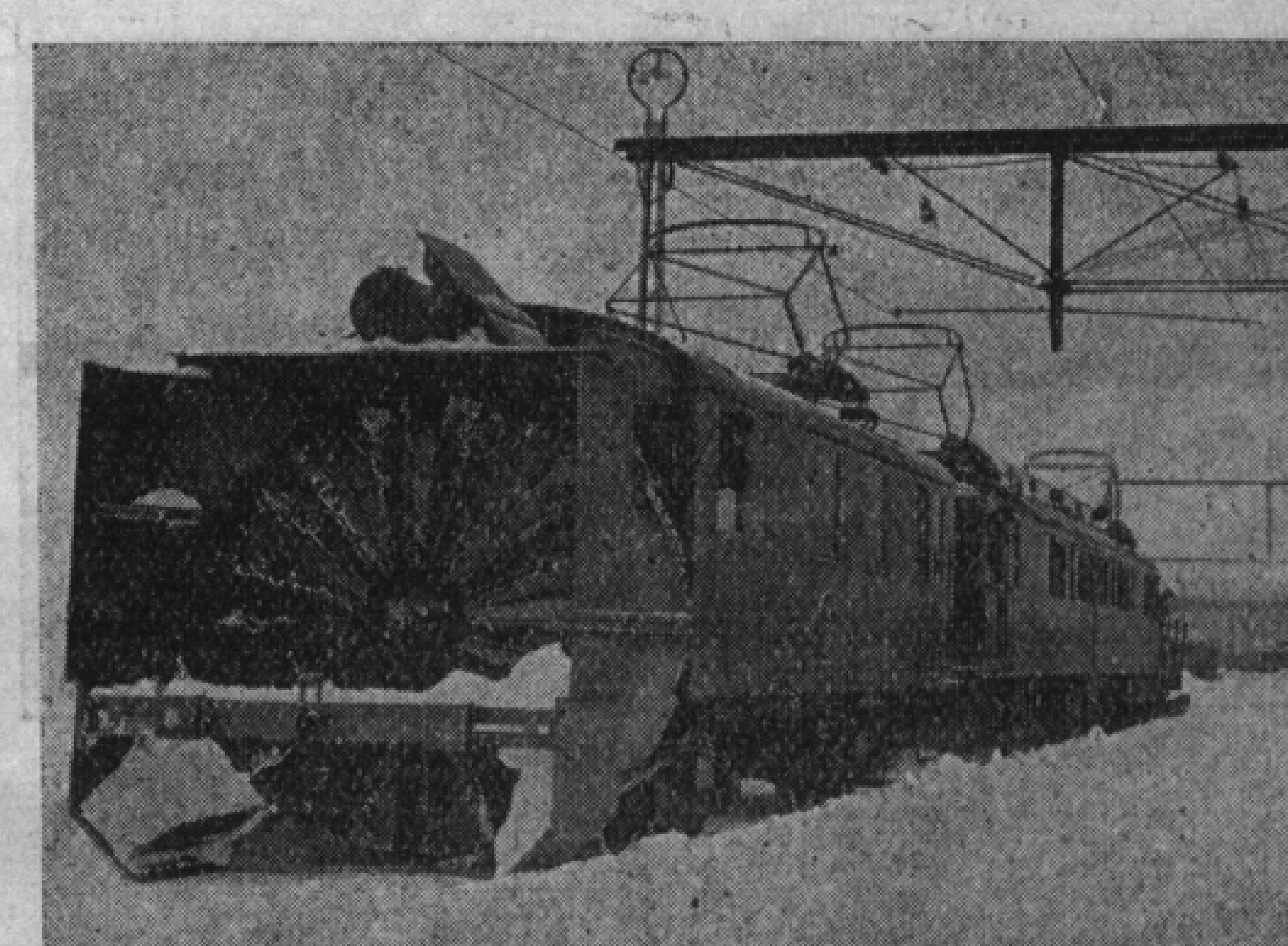
বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত একুশ শত টন লৌহ বোঝাই করিয়া গাড়ী নার্ভিকের পথে চলিয়াছে

প্রসন্নমনা দেখা যায়। ইহারা কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। বিদেশীয়দের সম্বন্ধে অতিশয় সংযত হইয়া প্রথমে কথাবার্ত্তা বলে, কিন্তু একবার পরিচিত হইলে নিতান্ত আন্তরিকতার সহিত নিজেদের সম্বন্ধে



তুষার পর্ব্বত ভেদ করিয়া গাড়ী আপনার পথ করিতেছে

তাহারা সকল কথাই বলে। তখন তাহাদের সরল মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হৃদয়কে অতিশয় স্পর্শ করে। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি যথেষ্ট, কিন্তু মানব-সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আবহমানকাল পুরুষানুক্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার ফলে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান খুব কম এবং তাহাদের শিশুসুলভ সরলতার ইহাই বোধ হয় একটি বড় কারণ। ল্যাপরা আদিম জাতি বটে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি মোটেই বন্য নহে; বরং বিশ্বস্ততা, শান্তিপ্রিয়তা, দয়ার্দ্রতা এবং



এঞ্জিনের সম্মুখভাগে তুষার পর্ব্বত কাটিবার যন্ত্র

আতিথেয়তা বোধ হয় সভ্যজাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অনেক বেশী।

ল্যাপ জাতিরা আদিম কাল হইতেই সেই শীত প্রদেশের তুষারময় পার্ব্বত্য ভূমিতে স্কেটিঙের সাহায্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। বরফের উপর একদিন ষাটসত্তর মাইল এমন কি একশ মাইল পর্য্যন্ত ঘোরা-ফেরা তাহাদের পক্ষে খুব কঠিন নহে। কিন্তু এখন সে প্রদেশে যে-সব

সুইড আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় এত ঘুরিয়া বেড়ায় না। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।



পার্ব্বত্য প্রদেশে হরিণের যাত্রা

সুইডিস্ শিক্ষকরা এরোপ্লেনে যাইয়া তাহাদিগকে পড়াইয়া আসে। তাহা ছাড়া সুইডেনের রেড্‌ক্রস্ সোসাইটী তাহাদিগকে দৈবদুর্ব্বিপাকে ও অসুখ-বিসুখের সময়



'স্লেজ' নৌকায় ল্যাপ শিশু—বলগা হরিণ তাহা টানিয়া লইয়া যাইতেছে

সাহায্য করিবার জন্য এরোপ্লেন মোতায়েন করিয়াছেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর এরোপ্লেন ঘুরিয়া বেড়ায়। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িলে সেই প্রদেশের অধিবাসীরা আগুন জালিয়া এরোপ্লেনের কাছে সঙ্কেত পাঠায়। মোটের উপর এই কথা বলা চলে যে, ল্যাপদের মত একটি জাতির উপর সুইডিসদের মায়ামমতা আজকালকার দিনে অতিশয় আশ্চর্য্য জিনিষ। অন্ততঃ যে-সব ইউরোপীয় জাতির অধীনে অন্য দেশ আছে তাহাদের নিকট হইতে ঐরূপ ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয় ব্যবহার অধীন জাতিরা কখনও পাইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। এই বিষয়ের তুলনায় সুইডিস্‌দের সহিত অপর ইউরোপীয়দের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট এবং ইহার কারণ ভাবিবার বিষয়।



বরফের উপর অগ্নিশিখা প্রস্তুত করিয়া রেড্ ক্রস্ এরোপ্লেনকে বিপদ সঙ্কেত জানাইয়া নামিয়া আনা হইয়াছে

বলগা হরিণ (Reindeer) ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের একমাত্র সম্পত্তি। এই হরিণ-পালের জন্য কোন ঘর নাই। পাহাড়পর্ব্বতের উপর হরিণের দল স্বাধীনভাবে চরিয়া



অসুস্থ ল্যাপকে এরোপ্লেনে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে

বেড়ায়। কিন্তু কোন ল্যাপদের হরিণ যাহাতে হারাইয়া না যায়, সে-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। হরিণমাতা শিশুসন্তান প্রসব করিবার পরেই ল্যাপরা নিজেদের বিশেষ চিহ্ন ইহাদের কানে কাটিয়া দেয়। ঐ সকল চিহ্ন নানা প্রকারের। প্রত্যেক ল্যাপ পরিবারকেই তাহাদের এই সকল চিহ্নের প্রতিচিহ্ন স্থানীয় বিচারালয়ে রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হয়—যাহাতে কোন গোলমাল না ঘটে এবং আইন যাহাতে তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে। ল্যাপদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী। কোন কোন ল্যাপ-

পরিবার এক হাজার বা তাহারও উপর হরিণ-সম্পত্তির অধিকারী এবং উক্তসংখ্যক হরিণের মূল্য নিতান্ত কম পক্ষেও নব্বই হাজার টাকার সমান হইবে। সাধারণতঃ তিন শত হরিণ থাকিলেই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। কিন্তু ছোটখাট পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ একশটি হরিণ না থাকিলে চলে না।

ল্যাপদের মধ্যে যাহাদের হরিণ-সম্পত্তি নাই বা হারাইয়া গিয়াছে, তাহারা তীরভাগে আসিয়া মাছ ধরিয়া



ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের চিরাচরিত জীবন-যাপন

জীবিকার্জ্জন করে। তাহাদের অনেকেই সমতলভূমিতে আশ্রয় লইয়া ক্ষেত চাষ করে এবং হরিণ কিনিয়া হরিণের ব্যবসাও করে। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে নামমাত্র খাজনা লইয়া বা একেবারে তাহা না লইয়াও কৃষিকর্ম্মে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু এই সকল ল্যাপও নিজেদের তাঁবুঘরে থাকিতে ভালবাসে।

ভ্রাম্যমাণ খাঁটি ল্যাপদের প্রকৃতিতে কিন্তু এক জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করা সম্ভব হয় না। তাহারা বৃক্ষলতাহীন উচ্চ পর্ব্বতভূমি ও বনপ্রদেশের মধ্যে আপন আপন হরিণ-দল লইয়া ঘুরিতে ভালবাসে। বসন্তের হাওয়া বহিলে হরিণ আপনা হইতে উচ্চ পর্ব্বতভূমিতে যাইতে সুরু করে। আবার শরৎ আসিলেই বনপ্রদেশে নামিয়া আসে। সেই স্থানে এক জাতীয় শৈবাল জন্মায় এবং ইহাই হরিণের



দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে বনভূমিতে ছত্রভঙ্গ হরিণ পালের উপর দৃষ্টি রাখা হইতেছে

একমাত্র খাদ্য। এই শৈবালের উপর বরফের যে পুরু পর্দ্দা পড়ে, হরিণদল খুরের সাহায্যে তাহা ভাঙিয়া মুখ



দুইটি ল্যাপ শিশু পুস্তকের ছবি দেখিতেছে

দিয়া সরাইয়া খাবার খুঁজিয়া লয়। আমি যে বৎসর সেখানে গিয়াছিলাম, সেই বৎসরের শীতকালে শীতের মাত্রা খুব বেশী ছিল বলিয়া অনেক হরিণ খাবার না

পাইয়া মারা গিয়াছিল। অত্যধিক শীতে বরফ জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত শক্ত হয় এবং তাহা ভাঙিয়া খাবার খোঁজা সহজ ব্যাপার নয়। হরিণদল আপন ইচ্ছামত চরিয়া খায় বটে, কিন্তু ল্যাপরা সর্ব্বদাই ইহাদের উপর চোখ রাখে—যাহাতে হরিণরা একেবারে ছড়াইয়া না যায় এবং নেকৃড়ে বাঘের গ্রাসে না পড়ে। প্রতি বৎসর এই ভাবে ল্যাপরা গড়ে প্রায় তিন শত মাইল ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রত্যেক ল্যাপ-পরিবারের আপন হরিণদলের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা চারণভূমি আছে এবং পাহাড়পর্ব্বতে ঘুরিবার কালেও নিজেদের স্বতন্ত্র পথ থাকে। সকল ল্যাপকেই বিপথে না গিয়া আপন পথে চলাফেরা করার জন্য যথেষ্ট সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ তুষার-ঝড়ে রাস্তাঘাট পাহাড়-পর্ব্বত—সবকেই এমনভাবে ঢাকিয়া দেয় যে, সহজে পথ চিনিয়া লওয়া মোটেই সোজা ব্যাপার নহে। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য ল্যাপদের কুকুর থাকে। হরিণদলকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে কুকুরেরা যথেষ্ট সহায়তা করে।

শেষের কবিতা*

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই উপন্যাসখানি প্রথমে প্রবাসীতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে এটি পুস্তক আকারে ছাপা হয়েছে, সেও ১৩৩৬ সালে। এই বই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। গত বৎসরের মাঘ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীমান্ নীহাররঞ্জন রায় একটি সুনিপুণ রসগ্রাহী সমালোচনা করেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলা অনেকের কাছে অনাবশ্যক বোধ হবে, নূতন কিছু বলাও হয়ত সম্ভব হবে না, অনেক কথারই পুনরুক্তি করতে হবে। কিন্তু প্রবাসীর পক্ষ থেকে কবীন্দ্রের এই শেষ উপন্যাসের সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করা হয় নি ব'লে আমাকে আবার এর আলোচনাতে প্রবৃত্ত হ'তে হচ্ছে।

এই উপন্যাসখানি নিছক উপন্যাস নয়, এটি কবিবরের শেষের কবিতাও বটে, এটি গদ্য-পদ্যময় চম্পূ কাব্য, এর গদ্যও কবিতার সমধর্ম্মী, এবং এর মধ্যে অনেকগুলি কবিতা প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই হিসাবে এই উপন্যাসখানি একটু নূতন ধরণের। এর পূর্ব্বে বাংলাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভানুমতী উপন্যাস এইরূপ গদ্যপদ্যসমন্বিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া আর কোন উপন্যাস এই ধরণের আছে কি না তা আমার এখন মনে পড়ছে না।

উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রীগুলি বিলাতীভাবাপন্ন ধনী বাঙালী সমাজের এক একটি টাইপ, মূর্ত্তিমান্ অবতার, বই পড়তে পড়তে মনে হয় তারা যেন আমাদের চোখে-দেখা চেনা লোক, যেমন এর আগে গোরা উপন্যাসে পানুবাবু বরদাসুন্দরী লাবণ্য ললিতা সুচরিতা আমাদের চেনাশোনা লোকেদেরই ছবি ব'লে মনে হয়েছিল। এরা সবাই সজীব, সংসারের মানুষ।

নায়ক হচ্ছে অমিত রায়, কিন্তু তাদের সমাজের বিলাতী কায়দার আর অনুকরণের উচ্চারণে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিট্রায়ে। সে ধনী ব্যারিষ্টারের ছেলে, নিজে ব্যারিষ্টার। সে মানবজীবনে ষ্টাইলের ভক্ত, কাজেই নিজেও বেজায় ষ্টাইলিশ, বাক্যবাগীশ, কথার তুবড়ী। তার দুই বোন সিসি আর লিসি, তারাও মূর্ত্তিমতী ফ্যাশান। অমিতর কথায় লোকের চমক লাগে, তাতে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য এত বেশী যে মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, সে কবিত্বে আর দার্শনিকত্বে মিলিয়ে যে খিচুড়ি বানায় তা যেমন মুখরোচক তেমনি গুরুপাক। সে বহু মেয়ের সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্ঠ রকমেই মেশে, ভাল লাগার আভাস দেয়, কিন্তু কাউকে সে ভালবাসতে পারে না; সে কথা লিলি গাঙ্গুলী একদিন তার মুখের উপর স্পষ্টই শুনিয়ে দিয়েছিল যখন সে লিলিকে একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাতে উদ্যত হয়েছিল। সে রবি-ঠাকুরের লেখার বিরোধী, কারণ রবি-ঠাকুর অনেক দিন বেঁচে অন্য কবিদের পথরোধ ক'রে রেখেছেন। সকল সভা সমিতিতে কেবল নিছক রবি-ঠাকুরের কবিতা আর লেখারই আলোচনা হয়, এতে সে আপত্তি উত্থাপন করে, তাঁকে লেখা থামিয়ে দিয়ে অপরের আসর অধিকার করবার সুযোগ ক'রে দিতে বলে, আর মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করে নিবারণ চক্রবর্ত্তী নামক এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবিকে, অর্থাৎ নিজেরই বেনামদারকে। নিবারণ চক্রবর্ত্তী যে সে নিজে তার পরিচয় পরে ধরা প'ড়ে গিয়েছে, সে স্বীকার কবুল করেছে যে "ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী।"—১০৩ পৃষ্ঠা। আর তার জীবনের গিল্‌টি যার কাছে সম্পূর্ণ ধরা প'ড়ে খ'সে মুছে গিয়েছিল, সেই তার বন্ধু বলেছে—"তুমি কি ভাবচ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতেম্

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষের উপন্যাস। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোল ভাঁজের ২৩২ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। কাপড়ে বাঁধাই বইয়ের মূল্য ২৲ টাকা, আর কাগজের মলাটের বইয়ের দাম ১৸০ টাকা মাত্র।

পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্ত্তী?" অমিত কিন্তু অসামান্য, কথায় বার্ত্তায়, বেশে ভূষায়, চাল-চলনে, মতে-ধারণায়; সাধারণের মত ধারণা ও আচরণের বিপরীত কিছু করাতেই তার মৌলিকত্বের আনন্দ। কেবল যাকে সে নিন্দা করে সেই রবি-ঠাকুরের কবিতারই মতন তার কবিতা, সেই সাদৃশ্য থাকাতেই সে বোধ হয় তা লুকাবার জন্য অত কোমর বেঁধে নিন্দা করে।

অমিত গেছে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে। মোটর-ধাক্কা লাগ্‌ল লাবণ্যলতার মোটরের সঙ্গে। গোরা উপন্যাসে যেমন গাড়ীর অপঘাতে বিনয়ের সঙ্গে পরেশবাবু আর সুচরিতার পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছিল, এখানেও তেমনি মোটর-সংঘাতে অমিতর সঙ্গে ঘটল পরিচয় লাবণ্যলতার, যে শীঘ্রই অমিতর কাছে হয়ে উঠ্‌ল বন্যা, আর অমিতও তার কাছে হয়ে গেল মিতা। মোটর-সংঘাতে দুজনেই জখম হ'ল, দেহে নয়, মনে, মনোভবের আবির্ভাবে। যে অমিত এতদিন প্রণয় নিয়ে কেবল ভাববিলাসিতা করেছে, সে-ই এখন প্রণয়কে জীবনের জীবনরূপে অনুভব করলে। আর লাবণ্যলতাও স্বীকার করলে "এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—কেবল বই পড়্‌ব, আর পাস করব, এমনি ক'রেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলাম, আমিও ভালবাস্‌তে পারি।...মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।" ১১৫ পৃষ্ঠা।

লাবণ্যর একটু পুরাবৃত্ত আছে। সে ধনী অধ্যাপকের এক মাত্র কন্যা। তার বাবা তাকে এমন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন যাতে তার মনের আর সকল দরজার দিকে নজর দেবার অবসরই হয় নি। সেই অধ্যাপকেরই ছাত্র ছিল শোভনলাল। বেচারা মুগ্ধ কুণ্ঠিত পূজারীর মত সকলের অগোচরে লাবণ্যকে ভালবাস্‌ত, আর যেমন ক'রে একলব্য একান্ত মনে দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তিকে গুরুর আসনে বসিয়ে সাধনা করেছিল, তেমনি শোভনলাল লাবণ্যর একখানি ছবি আঁকিয়ে তাকেই ফুল দিয়ে ঢেকে নিজের গোপন হৃদয়ের প্রণয় নিবেদন করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার সেই গোপন পূজা ধরা প'ড়ে গেল, আর লাবণ্য তাকে কঠোর তিরস্কার ক'রে তাদের বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলে। শোভনলাল একটি কথাও না ব'লে অপরাধীর মতন মাথা নত ক'রে চলে গেল। বিপত্নীক অধ্যাপক এতদিন কন্যার প্রণয় ও পরিণয় অনাবশ্যক মনে ক'রে তাকে গঠন ক'রে এসেছেন, এখন নিজেই এক বিধবার প্রণয়ে প'ড়ে তাকে পরিণয়ে নিজের করবার জন্য একটু উৎসুক হলেন, অথচ কন্যার বিবাহ না হ'লে ত তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারেন না। লাবণ্য বাবার মনের ভাব টের পেলে, এবং নিজে উদ্‌যোগী হয়ে পিতার বিবাহ দিলে, আর তার পর পিতার সকল সম্পত্তি ও সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে সে নিজে উপার্জ্জন করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সে হল বিধবা যোগমায়ার কন্যা সুরমার শিক্ষয়িত্রী। যোগমায়ারও একটি ছোট পুরাবৃত্ত আছে, কিন্তু সেটুকু না জান্‌লেও আমাদের বইখানির উপাখ্যান বুঝ্‌তে বেশা অসুবিধা হবে না। অমিত লাবণ্যর বাসায় গিয়ে যোগমায়ার সঙ্গেও পরিচিত হল, আর সে সহজেই তাঁর সঙ্গে মাসি-বোন্‌পো সম্বন্ধ পাতিয়ে তাঁর স্নেহভাজন হয়ে উঠ্‌ল। সে যখন তাঁর কাছে লাবণ্যর পাণিপ্রার্থী হয়ে তাঁর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলে, তখন যোগমায়া তাকে বল্‌লেন—"ধ'রেই নাও লাবণ্যকে তুমি পেয়েইচ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছা প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝবো লাবণ্যের মত মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।" অমিত বল্‌লে—"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে ক'রে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে ব'লেই অমিত রায় মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ।"

যোগমায়ার মনে যে ভয় জেগেছিল অমিতের স্বভাব দেখে, লাবণ্য তা জেনেও ভয় পায় নি। সে বলেছিল—"মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপর। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চল্‌তে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়্‌ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেবো না।..." ৯৯ পৃষ্ঠা। লাবণ্যকে অমিতর ভাল লাগ্‌ছে সে তার বুদ্ধির আর চিন্তার যেন শাণযন্ত্র হয়েছে ব'লে। তার বুদ্ধিতে শাণ লাগাবার জন্যেই লাবণ্যকে তার প্রয়োজন, আর কিছুর জন্যে নয়; ঘরসংসার পেতে বন্দী হবার মানুষ অমিত নয়, এ কথা লাবণ্য বুঝতে পেরে অমিতকে বলেছিল—"আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে করো না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশী হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে সাজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।"

লাবণ্য জানে যে অমিত চিরপলাতক। তাই লাবণ্য স্থির করলে তারা চাইবে না বিবাহের বন্ধন, চাইবে প্রেমের মুক্তি; এদের প্রেম সুখের দাবি করবে না, প্রিয়ের ইচ্ছাকে মুক্ত রেখে দিতে-পারার আনন্দ চাইবে।

বিবাহের বন্ধনে স্বত্ব-স্বামিত্ব-বোধের স্থূলতায় তারা পরস্পরের কাছে অতিপরিচয়ে তুচ্ছ খেলো হয়ে যেতে পারে এ ভয় অমিতর মনেও ছিল। এই জন্যে বিয়ের রাতে জীবনে যে বাঁশী বাজে সংসারে প্রবেশ করলে সে সুর আর শুনতে পাওয়া যায় না। তাই মনে প্রশ্ন ওঠে—"বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?"—(রবীন্দ্রনাথ, বাঁশি।) যদিও সে লাবণ্যকে বিবাহে সম্মত করবার জন্যে অনুনয়-বিনয় করছিল, তবু তার ভবিষ্যৎ সংসারের যে-চিত্র এঁকে সে লাবণ্যকে মুগ্ধ করতে চাইছে তাতে তার ব্যবস্থা হবে চখাচখির মত, একটা বাগানবাড়ির মধ্যে কাটা খালের এপারে ওপারে দুটি বাড়িতে হবে দুজনার বাস, কেউ কারও কাছে বিনা এত্তালায় হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হবে না। তাই অমিত লাবণ্যকে বলছে—"ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামী জিনিষকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেন-না, শক্ত ক'রে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড় কম নয়!" তাদের সাক্ষাৎ হবে তাদের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টিক মনভুলানো অবস্থায়। নতুবা হঠাৎ কারও ত্রুটি চোখে পড়্‌লে মনের আর্টিষ্টিক অনুভবে আঘাত লাগতে পারে, আর তাতে মন বিগড়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা ক'রেই বহু বহু শতাব্দী আগে মনু বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন যে—'ভার্য্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, ভোজন করিতেছে এমন সময় ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না। হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযতভাবে বসিয়া আছে—এমন সময়েও ভার্য্যাকে দেখিবে না। নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলমর্দ্দন করিতেছে, ...এমন সময়েও ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না।' (চতুর্থ অধ্যায়)। এই আশঙ্কাতেই ভিক্‌তর হুগো তাঁর প্রণয়িণীকে নিজের আবাসস্থল

থেকে চার মাইল দূরে রেখে দিয়েছিলেন, উভয়ের বহু দিনের বিচ্ছেদের পর মাঝে মাঝে কারও আহ্বানে কেউ নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, পাছে কেউ অপরের অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনকে বিরক্ত করে তোলেন। এই আশঙ্কা ক'রেই থিয়োফিল্ গতিয়ের মানস-সৃষ্টি মাদ্‌মোয়াজেল মোপাঁ যে প্রিয়তম তাকে পাবার জন্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বেড়িয়ে তবে সন্ধান পেয়েছে তাকে কেবল মাত্র একটি রাত্রে দেখা দিয়ে চিরদিনের জন্ম পালিয়ে গিয়েছিল, পাছে সে অতি-পরিচয়ে পুরাতন অবহেলিত হয়ে যায়। একজন বিখ্যাত বাঙালীও তাঁর প্রণয়িনীর নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকে শুনে তার প্রতি বীতরাগ হয়েছিলেন শোনা যায়।

এই রকম যখন কবিত্বময় কল্পনায় অমিত তার বন্যাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার নেশায় মশগুল হয়ে আছে, আর অল্প দিন পরেই তাদের বিবাহ হবে স্থির হয়েছে, এমন সময় এল লাবণ্যলতার কাছে তার বহু দিন আগে বিতাড়িত অপমানিত অনুরক্ত ভক্ত শোভনলালের একটি কুণ্ঠিত প্রশ্ন—"তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কি অপরাধ করেছি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারিনি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাইনে। ভয় ক'র না। আমার আর কোন প্রর্থনা নেই।"

এর অল্পদিন আগেই লাবণ্যকে অমিত বলেছিল—"হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদওয়ালা।...এক সময়ে সে ক্ষেপেছিল আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে।...তারপর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখন কাশ্মীরে, কখন কুমায়ুনে।...প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানিনে, কিন্তু...বুঝতে পারলুম ওর জীবনের কোন্‌খানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও ক্ষইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্য এখন অমিতকে ভালবাসে আর অমিতর সরব আর সাহসী ভালবাসার পরিচয় পেয়ে ভীরু শোভনলালের ভালবাসার মর্য্যাদা আর ব্যথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে। "যে-অঙ্কুরটা বড় হয়ে উঠ্‌তে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয়নি, তার সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার ক'রে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে দুর্ব্বলতা ব'লে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হল ধূলিসাৎ।...সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত মূর্ত্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।"

যখন লাবণ্যর মনের এই অবস্থা তখন অমিতর অজ্ঞাতবাস ও অজ্ঞাতবাসের কারণ আবিষ্কার করবার জন্তে তার বোন সিসি এল শিলং পাহাড়ে। কাজে কাজেই তার সঙ্গে এল তার অনুরক্ত নরেন মিটার আর নরেনের বোন ও সিসির সখী কেটি মিটার। কেটি মিটারের এই অভিযানের মধ্যে একটু স্বার্থের আমেজ ছিল, যখন সে আর অমিত বিলাতে ছিল তখন একদিন অমিত তার হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিল, সে আজ সাত বৎসরের আগেকার কথা। কেটি কিন্তু সেই দিনটিকে আর অমিতকে কিছুতেই ভোলে নি। সে অমিতর চঞ্চল মনকে চিরবন্দী করতে পারে নি, তাই সে এর মধ্যে আর কারও মনোরঞ্জন করা যায় কি-না দেখবার জন্ম তাদের সমাজের উপযুক্ত মেয়ের নকল হয়ে ওঠবার জন্তে সাধনা করেছে, তার চালচলন এখন "বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্‌স্," তার কেশ বেশ সবই এখন "অনুকরণের উল্লম্ফনশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা।" তারা তিনজনে মিলে আবিষ্কার করলে অমিতর অজ্ঞাতবাসের কারণ, আর অভিযান ক'রে ক'সে অপমান ক'রে দিলে লাবণ্যকে আর সেই সঙ্গে যোগমায়াকেও।" নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব্ব আছে।"

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল অমিত, আর সে ওদের ব্যবহার দেখে বিদ্রোহ ক'রেই লাবণ্যর হাতে আংটি পরিয়ে দিলে। এবং কেটিকে উপেক্ষা ক'রেই নিজের বোনকে সম্বোধন ক'রে বললে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য।...এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কল্‌কাতায় অঘ্রাণ মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে যদিও প্রথমটায় বললে—"আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্।" কিন্তু অবশেষে তাকে বল্‌তে হ'ল, স্বীকার করতেই হ'ল যে "এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলং পাহাড়ে কি এ'কে বাজিতে খোয়াতে হবে?...মনে মনে নিজের উপর অহঙ্কার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহঙ্কার ভাঙল,...আমারি হার।...বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক, অমিট। আমার হাতে রেখে এ'কে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেবো না।"

"কেটি আংটি খুলে রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ধারে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।" গভর্ণেস্ লাবণ্যর হাত থেকে অভিজাত অমিটকে উদ্ধার করার আশা তাকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

লাবণ্য নিজের হৃদয়ের প্রেমের বেদনা দিয়ে কেটির বেদনা বুঝতে পারলে। লাবণ্য আস্তে আস্তে অমিতকে বললে, "একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?"

অমিত বললে, "সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ?"

লাবণ্য বললে, "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।...মিতা, একদিন যে নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার ক'রে রাখলে না কেন? যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আল্‌গা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্ত্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে ব'লেই দশের মনের মত ক'রে নিজেকে সাজাতে বসল।...তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ ক'রে বলছি না, আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোন চিহ্ন রাখবার কোন দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

"এই ব'লে সে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে পরিয়ে দিলে, অমিত কোন বাধা দিলে না।"

অমিত আর লাবণ্য দুজনেই তাদের পরস্পরের ভালবাসার আলোকে অপরের ভালবাসার মর্ম্ম সহজে বোঝবার ক্ষমতা লাভ করেছিল। তাই অমিত কেটির ভালবাসার মান রক্ষা করতে আর লাবণ্য-শোভনলালের ভালবাসার মান রক্ষা করতে সঙ্কল্প স্থির করলে। কেটি মিটার অমিতর ভালবাসা ফিরে পেয়ে আবার হ'ল কেতকী মিত্র। তার পর লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের আর কেতকীর সঙ্গে অমিতর বিবাহ হবে সবাই জানলে। কিন্তু লাবণ্যর আর অমিতের ভালবাসার হ্রাস হ'ল না, তারা তাদের প্রণয় দিয়েই তাদের পুরাতন প্রণয় খুঁজে ফিরে পেয়েছে।

অমিত আর লাবণ্য যে কেমন ক'রে একসঙ্গে দুজনকে ভালবাসতে পারে তাই নিয়ে যোগমায়ার ছেলে যতির মনে সন্দেহ উদয় হ'লে অমিত তাকে বলেছিল—"অক্‌সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হ'লে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বল্‌তে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,— দুটোর কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।...যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।...একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আন্‌বার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।...কেতকী সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বল্‌তে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাবো যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

উপন্যাসের উপাখ্যান অত্যল্প। কিন্তু এর মধ্যে নরনারীর হৃদয়ের একটি গভীর সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে এবং আমাদের মনে হয়, তার মীমাংসাও করা হয়েছে। এই বইয়ের ভাষার প্রশংসা অনেকে মুক্তকণ্ঠে করেছেন। বাস্তবিক এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর কথায়বার্ত্তায় আর দেখা যায় নি। কথায় কথায় রূপক আর উপমা, খুঁটিনাটি বর্ণনার কারিগরী আর বাহাদুরী সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে উপভোগ করবার জিনিষ হয়েছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আর মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেমতত্ত্বের একটা রহস্য ও তার মীমাংসা, একটি বিশেষ সমাজের নরনারীর চরিত্রচিত্রণ যুবক-যুবতীদের হাব-ভাবে বেশ-ভূষা সম্বন্ধে নিপুণ ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, কথায় কথায় হাস্যরসের আভাস পাঠক-পাঠিকাকে অভিভূত, আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ ক'রে তোলে। অমিতর কথা শুনে লাবণ্য হাস্‌ছে দেখে অমিত বলেছিল—"হাস্‌ছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য্য রাখতে পারিনে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ। ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সর্ব্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে মরতেও জানে না।" যাঁরা রবি-ঠাকুরের কোষ্ঠীর খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে তাঁর জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, আর অমিতর বেনামী কথাটা তাঁরই নিজের কথা, তাঁর বেলাই সেটি খুব খাটে। নিবারণ চক্রবর্ত্তীর বেনামী স্বয়ং রবি-ঠাকুরই যে-সব কবিতা লিখেছেন সেগুলিও তাঁর আগের কবিতার থেকে আলাদা ধরণের, বড় গভীর অর্থভরা; এইজন্যেই এই বইয়ের নাম রাখা হয়েছে শেষের কবিতা। কিন্তু আমরা আশা করি ও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে এই কবিতাই যেন কবির শেষের কবিতা না হয়।

ভূমিকম্প

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝরাত্রে বাসুকী একবার মাথা নাড়িলেন।

প্রসন্ন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কাল গরমে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই, আজ ন'টা বাজিতে-না-বাজিতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। খাইয়া উঠিয়া দশ মিনিট কালও সে আজ বসিতে পারে নাই। অমন চাঁদ উঠিয়াছিল আজ, টুক্‌রা টুক্‌রা গতিশীল মেঘে অমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল আকাশ, ওদিকে তাকাইবার অবসরও তাহার ছিল না। চোখে ঘুম লইয়া সে শুইয়াছিল এবং শোয়ামাত্র ঘুমাইয়াছিল।

তারপর মাঝরাত্রে প্রকৃতির এই কাণ্ড।

প্রসন্নের ঘুম ভাঙিল আতঙ্কে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়াছে, ঘরের ভিতর অন্ধকার এমন গাঢ় যে চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। চৌকীটা বেতালে দুলিতেছে, টিনের চালে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিয়াছে, বাহিরের আকাশ শঙ্খের আর্ত্তনাদে মুখর। কোণ ছিঁড়িয়া মশারির একটা দিক্ গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বুঝিবার জো নাই যে এই কোমল অবাধ্য আলিঙ্গন মশারিরই, একটা নাম-না-জানা ভয়ানক কোন কিছুর নয়।

প্রসন্নের মনে হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। ভয়ের এতগুলি সমন্বয় মানুষের জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে ঘটে না।

হঠাৎ প্রসন্ন সচেতন হইয়া উঠিল, কে যেন উঠানে তারস্বরে হাঁকিতেছে, 'প্রসন্ন ওঠ্ শিগগির, ভূমিকম্প হচ্ছে। ওরে প্রসন্ন, প্রসন্ন?'

ভয়ের মধ্যে পলায়নের প্রেরণা থাকে, কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে ভয়ের আগে আগে সে পলাইয়া বেড়াইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই, কিছু না-জানিয়া কিছু না-বুঝিয়া ওভাবে পলানোর মত ভয়ানক আর কিছু নাই, এবার প্রসন্ন বাঁচিল। মশারির আলিঙ্গন ছাড়াইয়া সে চৌকির নীচে নামিয়া পড়িল।

কিন্তু পলাইতে আরম্ভ করার মধ্যে যে পরিত্রাণ নাই সে কথা বোঝা গেল মুহূর্ত্তের মধ্যেই। প্রসন্ন দরজা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার ধারণা মত যেখানে দরজা থাকার কথা সেখানটা হাতড়াইয়া শুধু দরমার বেড়াই তাহার হাতে ঠেকিল। আজ এই একান্ত অসময়ে সে দরজার অবস্থান ভুলিয়া গিয়াছে। এ কি অসহায় অবস্থা!

ভূমিকম্পের চেয়ে হৃদ্‌কম্পই এবার তাহার বড় বিপদ হইয়া উঠিল। মাটির সঙ্গে কাঁপিতে গিয়া সাজানো ইটের বাড়ি যেভাবে ভাঙিতে থাকে প্রসন্ন তেমনি ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। নাড়া খাইয়া তাহার মগ্ন চেতনা হইতে যে কত দুঃখ ভয় ও উত্তেজনার তলানি উঠিয়া আসিয়া তাহার বর্ত্তমান আতঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার হিসাব হয় না।

বাহিরে শঙ্খের শব্দ, হুলুধ্বনি ও আত্মীয়স্বজনের ব্যাকুল ডাকাডাকির বিরাম নাই। পৃথিবীর যেখানে যত মমতা আছে সব যেন তাহার বিপদে একসঙ্গে আপশোষ জুড়িয়া দিয়াছে, সে বাহির হইতে না পারিলে শেষ পর্য্যন্ত ওদের-বুকও তাহার বুকের মতই ভাঙিয়া যাইবে।

'দরজা কই, দরজা ?'

'এইখানে দরজা, এইখানে—' মার হাতের বালা ঠকাঠক্ শব্দে দরজায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

প্রসন্ন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাঁচিবার অনন্ত অবকাশ লইয়া উঠানের কোণে ভাঙা চৌকীটাতে সে বসিয়া পড়িল। এই রুক্ষ কঠোর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে অসমান যুদ্ধে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে দারুণ আহত। এই কয়টি মুহূর্ত্তের অনন্ত ভয়ের আঘাতে তাহার অবস্থা হইয়াছে বুনিয়াদ-নড়া বাড়ির মত।

সেই ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রসন্নের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কেহ জোরে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দ্দা দুলিতে আরম্ভ করে। পর্দ্দাটির প্রান্তগুলি পরল পরল অন্ধকার দিয়া দরমার বেড়ার মত করিয়া বোনা এবং ঝাপসা অন্ধকারের দেয়ালে আটকানো। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া পর্দ্দা সরানো যায় না, অতীত জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মত দুলিতে থাকে। চেষ্টা স্থগিত করিলে হঠাৎ এক সময় পর্দ্দাটা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আশ্চর্য্য এই, তখন আর পর্দ্দাটির ভূতপূর্ব্ব অস্তিত্বে প্রসন্ন বিশ্বাস করে না। মাথার মধ্যে যে মাঝে মাঝে তাহার অমন খাপছাড়া অভিনয় হয় সে কথাটাও সে বেশ ভুলিয়া থাকে।

বছর দুই পরে চাকরির চেষ্টায় একবার মাদ্রাজ ঘুরিয়া আসিয়া পর্দ্দাটা তাহার মাথা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাখিয়া গেল অন্য উপসর্গ।

মাদ্রাজ যাওয়ার সময় তাহার সঙ্গে একটি স্যুটকেসে থান-দুই ধুতি ও একটি জামা ছিল, ওই সামান্য জিনিষ চুরি যাওয়ার ভয়ে সমস্ত পথ সে চোখ বুজিতে পারে নাই। রূপান্তর লইয়া এই ভয় তাহার মনে কায়েমী হইয়া রহিল। প্রত্যেক রাত্রে সমস্ত রাত্রির জন্য নিজের অচেতন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার ঘুম টুটিয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলের ছোট বড় সমস্ত বিষয় ঘুমের রহস্যের মতই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। যাহা গোপন, যাহা সে বোঝে না তাহাই ভয়ানক, তাহাই নিষ্ঠুর। একদিন ছেলেদের পুরাণো মাসিকে একটা সামান্য ধাঁধাঁর জবাব বাহির করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে সে এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার দুঃখ ও লজ্জার সীমা রহিল না।

তখন দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে, চারিদিকে আনন্দের দীনতা। কপালের ঘাম বাতাসেই শুকাইয়াছে, তথাপি কাপড় দিয়া কপাল মুছিয়া প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, সে যে পাগল নয় তার প্রমাণের সংখ্যাগুলি যদি এমনি ভাবে কমিয়া আসে তাহা হইলে উপায় হইবে কি ?

অথচ প্রতিকার নাই। সে সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজেকে কিছুই বুঝাইতে পারে না। রাত্রে মশারি গুঁজিয়া শুইয়া তাহার মনে হয় ভাল করিয়া বুঝি গোঁজা হয় নাই, কোথায় ফাঁক রহিয়াছে, মশা ঢুকিবে। এ যে ভুল বুঝিতে পারিলেও তিন চার বার সন্তর্পণে তোষকের চারিপ্রান্ত না হাতড়াইলে তাহার স্বস্তি থাকে না। বসিবার ঘরে তালা দিয়া বার-বার টানিয়া দেখিয়া আসিলেও তাহাকে আবার ফিরিয়া গিয়া তালা ঠিকমত লাগানো সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। চৌকীর নীচে রোজই সে চোর খোঁজে।

এমনি সব অন্তহীন পাগলামী। মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাহাতে ফল আরও খারাপ হয়। যুদ্ধ করিয়া হার মানিতে জ্বালা যেন বাড়িয়া যায়। নিজের কাছে নিজের সে কি নির্মম অপমান!

প্রসন্নের হৃদয়বৃত্তিগুলি ক্রমে তীক্ষ্ণ ও সতেজ হইয়া উঠিল, অনুভবশক্তি আশ্চর্য্যরকম বাড়িয়া গেল ;—তাহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা দেখা দিল। ছোট দুঃখ তাহার কাছে এখন আর ছোট নয়, প্রাত্যহিক জীবনের যে-সব সূক্ষ্ম ও কোমল সুর তাহার মত অকবির কানে পশিবার কথা নয় এখন সেগুলি সে বেশ ধরিতে পারে। কল্পনাকে, —অবাস্তব কল্পনাকে, আমল দিতে তাহার ভাল লাগে।

সময় সময় সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়ে। জীবনের দেনা-পাওনার কড়া হিসাবী সে নয়, তবু সে টের পায় জীবনটা অর্থহীন। বাঁচিয়া থাকার কোন মানেই সে খুঁজিয়া পায় না।

জীবনের যে মানে সে খোঁজে তাহা যে অসাধারণ বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, ভূমিকম্প, রোগশোক ও আতঙ্কের সমারোহ ভিন্ন আর কিছু নয়। মদের তৃষ্ণা জলে মিটিবে কেন? নিত্য পাত্র ভরিয়া তীব্র সুরা সম্মুখে ধরিবে মানুষের জীবন তেমন সাকীও নয়।

রাত্রে প্রসন্ন আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখে।

একটা খাড়া উঁচু পাহাড়। তার উপরে প্রসন্নের স্কুল। অনেক বয়সে স্কুলে পড়িতেছে বলিয়া প্রসন্নের বড় লজ্জা, টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে পাহাড়ের একেবারে ধারে সে চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ একটা ছেলে তাহাকে এমন ধাক্কাই দিল যে পাহাড়ের নীচে আছড়াইয়া না পড়িয়া প্রসন্নের আর উপায় নাই; কারণ আজ শাড়ী পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে বলিয়া উড়িবার প্রক্রিয়াটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা ইঁদারা, শূন্যে পড়িতে পড়িতে প্রসন্ন বিবেচনা করিয়া দেখিল ইচ্ছা করিলে ইঁদারার মধ্যেও পড়া যায় অথবা একটু বাঁকিয়া ইঁদারার পাকা বাঁধানো পাড়ের উপরেও আছড়ানো চলে। কি করা উচিত?

আধাআধি পড়িয়া সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। ইঁদারার জলে পড়িলে লাগিবে না বটে, কিন্তু ওর মধ্যে আবছা অন্ধকার, ওর মধ্যে অজানা রহস্য। তাছাড়া নিজের চেষ্টায় উঠিয়া আসিতে না পারিলে ওর মধ্যেই তাহাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। হেড মাষ্টার নিয়ম করিয়াছেন কোন ছেলে ইঁদারায় পড়িলে তাহাকে আর তোলা হইবে না।

নৌকার হালের মত হাতের খাতায় বাতাস কাটিয়া প্রসন্ন ইঁদারার পাড়ে আছড়াইয়া পড়িল।

হাত পা ভাঙিল না বটে, কিন্তু আঘাত লাগিল, সত্যিকারের আছাড় খাওয়ার সমানই। স্বপ্নে আর বাস্তবে ও ছাড়া আর তফাৎ আছে কি? ভালবাসিয়া যাহাকে পাই নাই, স্বপ্নে সে পাশে আসিয়া বসিলে এই স্বপ্নে পাওয়ার মধ্যে শুধু বাস্তবতার ফাঁকিটুকুই থাকে বলিয়া বাঁচা সম্ভব হইয়াছে। স্বপ্নকে তাহার ন্যায্য মূল্য দিতেই হইবে।

প্রসন্ন উঠিয়া আলো জ্বালিল। জল খাইয়া গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া চুপচাপ বিছানায় বসিয়া রহিল। শুধু বাড়ি নয়, সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। আলোটা ভয়ে ভয়ে মিটিমিটি জ্বলিতেছে, রাস্তার আলো এতখানি অন্তরালে যে অস্তিত্বের মৃদু প্রমাণটাই বিস্ময়কর।

এ যেন রাত্রি নয়, শঙ্কার কুয়াশা।

প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, একটা বউ থাকিলে এসময়ে কাজ দিত। প্রেমালাপ নয়, মানুষের সঙ্গে দুটি সাধারণ কথা বলিবার এত বড় প্রয়োজন কি সচরাচর আসে? বউ নিশ্চয় তাহার ভয়ের ভাগ লইত, দু-চোখ বড় বড়

করিয়া ভীত কণ্ঠে বলিত 'কি গো? কি?' সে বলিত 'কিছু না, বড্ড মশা লাগ্‌ছে। উঠে মশারিটা একবার ঝাড় না?'—'আলোটা বাড়িয়ে দাও, আমার বড় ভয় করছে।' 'আমি রয়েছি ভয় কি?' বলিয়া সে হাসিত। বউ তথাপি বলিত, 'না, না, আলোটা তুমি বাড়িয়ে দাও।'

মা কেমন করিয়া টের পাইয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া জানালা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'রাতদুপুরে আলো জেলে বসে রয়েছিস যে?'

'একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম, মা।'

'তা দেখবি না? যে অনাচারটাই তুই করিস্। কাপড়ে ভাত পড়ল, পই পই করে বারণ করলাম কানে তুললি না, সেই কাপড়ে এসে শুলি। নে, মা দুর্গাকে ডেকে আলো নিবিয়ে ঘুমো।'

পরদিন সকালে মা বলিলেন, 'এবার একটা বিয়ে কর্ বাবা, মাথা খাস। রোজগার-পাতি করছিস্—'

সকালে বউয়ের প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, খবরের কাগজটা নামাইয়া প্রসন্ন বলিল, 'কাণপুরে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে জান মা? একটা আপিসের ছাদ ভেঙে সাতজন কেরাণী মারা গেছে, পনের জন জখম হয়েছে।'

মোটা হেডিংটা দেখাইয়া মা বলিলেন, 'ওই লিখেছে বুঝি?'

'না, ওটা যুদ্ধের খবর।'

'পড়্ ত, শুনি।'

'যুদ্ধের খবর আর কি শুনবে মা? কানপুরের কাণ্ডটা কি ভয়ানক বল ত! আপন মনে সবাই কাজ করছে, কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে ছাদ ভেঙে সাতজনের কবর হয়ে গেল, পনের জন জখম হ'ল। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।'

বলিয়া প্রসন্ন উপরের দিকে তাকাইল। এ বাড়ির কড়িবরগা সমস্তই লোহার। ছাদ ভাঙিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। সে মৃদু মৃদু হাসিল। ভাবিল, খবরের কাগজের খবরগুলিও ওষুদের বিজ্ঞাপনের মত এমন হিপ্‌নটিক! ষ্টোভ-দুর্ঘটনার বিবরণ পড়া অবধি আজকাল সে কত ভয়ে ভয়ে ষ্টোভ জালায়, মাকে জ্বালাইতে দেয় না, চাকরকেও না।

চাকরি পিতৃবন্ধুর কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়বাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালবাসেন। দোষ করিলে ধমকান না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া উপদেশাদি দেন এবং কামানো চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি যেন ভাবেন।

ঠিক যেন ভাবেন না, দুশ্চিন্তা করেন।

সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রসন্নর প্রমোশন হইল। সবদিক দিয়াই সে উপরে উঠিল, তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর হইতে আশী টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতালা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। বড়বাবুর পক্ষপাত-ভরা দরদ প্রসন্নকে এমন বিচলিত করিল বলিবার নয়।

বড়বাবু ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার বয়স কত হ'ল হে প্রসন্ন?'

'আজ্ঞে, সাতাশ।'

'বল কি, সাতাশ! বিয়েটিয়ে ক'রে এবার সংসারী হও? না, ও-সব ইচ্ছা নেই?'

প্রসন্ন চোখ নামাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে সামান্য আয়—'

বড়বাবু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি যখন বিবাহ করেন তাঁহার এক পয়সা আয় ছিল না। স্ত্রী কি তাঁহার খাইতে পায় নাই? প্রসন্ন আশী টাকা বেতন পায়, দেশে বাড়িঘর জমিজায়গা আছে, বিবাহ করিতে হইলে কি রাজা হইতে হয় নাকি? তারপর—

'আমি যদ্দিন এখানে বড়বাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তোমার ভাবতে হবে না বাপু।' বলিয়া বড়বাবু হাসিলেন।

এ ত শুধু চুম্বক, কথা তিনি কম বলেন নাই। দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো ভিজাইয়া প্রসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়বাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়বাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালই হয়। প্রসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। অমন একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া অল্প বিরক্তিতে ভ্রূকুটি অমন ভাবে একটুখানি কুঁচকাইয়া যে মেয়ে ও রকম আশ্চর্য্য-কণ্ঠে বলিতে পারে 'বাবা বাড়ি নেই' তাহাকে বিবাহ

করা কি ভয়ের কথা? ও মেয়ের সঙ্গে একা একঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোন মতেই যেন ভাবা যায় না।

এদিকে বড়বাবুকে না বলিবার সাহসই বা সে কোথায় পায়?

বড়বাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর প্রসন্নর শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে ভাবিতে লাগিল, নিজের মেয়ের উপরেও কি লোকটার কিছুমাত্র মমতা নাই? অমন মেয়েকে কি বলিয়া তাহার মত লোকের হাতে সঁপিয়া দিতে চায়? দেশে কি সুপাত্রের অভাব ঘটিয়াছে?

যেখানে বসিয়া প্রসন্ন কাজ করে তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা জানালা। পাঁচ সাতজন মানুষ একসঙ্গে গলিয়া যাইতে পারে জানালাটা এত বড়। শিক নাই। তা, তিনতলার জানালায় শিকের কি প্রয়োজন? গলিয়া পড়া সহজ বলিয়াই কে আর তিনতলার জানালা দিয়া গলিয়া নীচে পড়িতেছে? মানুষ ত পাগল নয়!

কাজ করিতে করিতে প্রসন্ন বার-বার জানালায় উঠিয়া যায়। শহরটা ইটেরই বটে। পথ দিয়া গাড়ী ঘোড়ার আর মানুষের স্রোত বহিয়া যায়, পথটা যেন নদী। নীচু ফুটপাথটার দিকে চাহিয়া প্রসন্নর গা একটু ছম্ ছম্ করে।

লিফটে উঠিবার সময় যেমন হয় তেমনি একটা অনুভূতি, কেবল তীব্রতা কম। গভীর কিন্তু তীব্র নয়।

আজ বিচলিত মন লইয়া খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া প্রসন্ন প্রথম অনুভব করিল যে, ফুটপাথটা আসলে বেশী নীচু নয়, তিনতলার মানুষের অনায়াস মরণ বিছানো আছে বলিয়াই অত নীচু মনে হয়। ফুটপাথের চৌকা পাথরের প্রান্তগুলি সে বেশ দেখিতে পাইতেছে, একটা কলার খোসা পড়িয়া আছে ইহাও তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। প্রসন্ন একদৃষ্টিতে কলার খোসাটার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনতলা হইতে লাফাইয়া পড়িলে মানুষ বাঁচে কি না এই কৌতুককর সমস্যাটা তাহাকে হঠাৎ আজ বিব্রত করিয়াছে।

মরিবেই যে এমন কোন মানে নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে ইহার চেয়ে উঁচু হইতে লাফাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচাইয়াছে, আর এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে না? বাড়িতে আগুন লাগিয়া হোক্, ছাদটা ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রমেই হোক্, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকেই যদি এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়, তাহাকে মরিতেই হইবে?

প্রথমটা ক্ষুব্ধ হইয়া শেষে প্রসন্ন শান্ত হইল। মরেও যদি, মন্দ হয় না। তাহাকে ঘিরিয়া রাস্তায় ভিড় জমে, আপিসসুদ্ধ সকলে ছুটিয়া নীচে নামে, চকিতের জন্য বড়বাবুর মনে কন্যার বৈধব্য সংঘটিত হয়, য়্যাম্বুলেন্স আসে, সমারোহের আর সীমা থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে রোগশয্যায় শুইয়া মরার চেয়ে এ মৃত্যুতে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব থাকে।

সেদিন কাজে আর তাহার মন বসিল না। বার-বার উঠিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসিতে লাগিল, কলার খোসাটা তখনও পড়িয়া আছে কি না। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তাহার চোখের সামনে একজন খোসাটায় পা দিয়া পিছলাইয়া পড়ে, দেখিয়া মনের আনন্দে সে খানিক হাস্য করে। এত লোক চলিতেছে পথে, কারও পা কি খোসাটায় পড়ে না? এমনি সব সাবধানী পথিক যে পা পিছলাইয়া পড়াটাও সকলে সাবধানে বাঁচাইয়া চলে?

কলার খোসাটার সদ্গতিই হইল। প্রসন্নর চোখের সামনে একটা গরু সেটা খাইয়া গেল। ক্ষুন্নমনে সে টেবিলে ফিরিয়া গেল। সেদিন আর জানালায় উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না। কলার খোসার অপচয়কে উপলক্ষ্য করিয়া জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে না পারার দুঃখ তাহার মনে মৃদু বিষের মত প্রভাব বিস্তার করিল, আকাশের রহস্যভরা সুনীল রূপ দিগন্তবিস্তৃত ইটের স্তূপের গম্ভীর মহিমা, আর জানালার ঠিক নীচে পাথর-বাঁধানো ফুটপাথ প্রসন্নের কাছে সমস্ত আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিল। কাহার উপর অভিমান করা উচিত সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহাকে ঠকাইতেছে, ক্রমাগতই ঠকাইতেছে।

প্রসন্ন চমকাইয়া উঠিল। বড়বাবু কাঁধে হাত রাখিয়াছেন।

'মাকে ব'লো হে, রবিবার দেখা করতে যাব।'

'আজ্ঞে, বল্‌ব।'

তিনতলায় কাজ আরম্ভ করা অবধি প্রসন্ন নানা ছলে লিফ্‌টে ওঠানামা করিয়াছে। একটা ছোটখাট ঘর, মেঝে আছে, দেয়াল আছে, ছাদ আছে, তার মধ্যে মিনিট-খানেক বন্দী থাকিয়া সোঁ করিয়া উপরে ওঠা নীচে নামা কি রোমাঞ্চকর রোমান্স! আজ সে সিঁড়ি দিয়াই নীচে নামিল। লিফটের মোহ আজ তাহার নাই। যার এমন বিপদ ঘটিতে বসিয়াছে অত সখে তাহার কাজ কি? জীবনে সহসা যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এখন গভীর ভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। মেয়েটাকে আর একবার দেখিতে পারিলে ভাল হইত। একবার মাত্র দেখিয়া ওকে যেন বেশী রহস্যময়ী মনে হইতেছে। অল্প বিরক্তিতে ঠিক কি ভাবে সে ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করে আর একবার না দেখিয়া ও মেয়েকে বিবাহ করা বোধ হয় সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

অন্যমনে বাসে উঠিতে গিয়া প্রসন্ন পড়িতে পড়িতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। ভিতরে বসিয়া লজ্জায় সে কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধ সে কারও কাছে করে নাই, কিন্তু সেজন্য শাস্তি আটকায় না, এমনি মন্দ তাহার কপাল। রাত্রে ঘুমাইতে সে যে কষ্টটা পাইল তাহার তুলনা হয় না। বড়বাবুর মেয়েটি যেন কড়া নেশা, তাহার কল্পনা সেই নেশারই অবসাদ; নিস্তেজ অথচ নির্ম্মম। তাহার বেশ ঘুম আসিতে থাকে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জট পাকাইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই,—সহসা সে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হইয়া ওঠে। জাগরণ এমন আকস্মিক হয় যেন চমক্ লাগে। সার্কাসের তাঁবুতে পাঁচ ছয়টা উঁচু দোলনার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিবার কসরৎ করিতে করিতে একি ঘুম ভাঙা!

এমনি ভাবে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে সে মাকে বলিল, 'তাড়াহুড়ো ক'রে রাঁধবার দরকার নেই মা। আজ আপিস যাব না।'

মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিল, 'রাত্রে তাহার জ্বর আসিয়াছিল।' মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'ওষুদপত্তর কিছু খা বাবা তুই। বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোর চেহারা।'

প্রসন্ন মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওষুদপত্রের ব্যবস্থাই হচ্ছে মা।'

বিবাহের প্রক্রিয়াটা প্রসন্ন সাহসী পুরুষের মতই সহ্য করিল। বিশেষ কঠিন নয়, কারণ নিজের তাহার কিছুই করিবার নাই, যাহা দরকার অন্যে করাইয়া লয়। তাহার ভয় ছিল বাসরে। একগাদা মেয়ে যখন তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিবে হালভাঙা নৌকার মত টলমল করিলে চলিবে না, নিজেকেই তাহার চারিদিক সামলাইয়া চলিতে হইবে। ঘর নির্জ্জন হইলে বউয়ের সঙ্গে ভাবও করিতে হইবে তাহাকেই।

বাসর বসিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। মেয়েরা হাসিল, ফাজলামি করিল, গান গাহিল, রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত। তবু কি তাহারা উঠিতে চায়—এই যে আরম্ভ এ যাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, কারণে অকারণে স্বামী এখন যার বকে, অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়, পরের জীবনে এই আরম্ভকে সেও ঘাঁটিতে চায়, ইহাকে প্রকাশ্য ও সাধারণ করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম নয়। বাসরে বিবাহিতা মেয়েরাই ভিড় করে বেশী। বিবাহোৎসবে সধবা নারী অপরিহার্য্য এবং সে নিয়ম তাহাদেরই তৈরি।

প্রসন্ন ইহাদের চিনিতে পারিল না। সংসারের সংস্রবে সে এত বড় হইয়াছে, ইহাদের জীবনী তাহার অজানা নয়, এত উল্লাস ইহাদের আসে কোথা হইতে? অবাধে ইহারা আনন্দ করিতেছে, হাসি ইহাদের আন্তরিক, দেখিয়া মনে হয় না জীবনে ইহাদের কোনদিন দুঃখের ছায়াপাতও হইয়াছিল। একে একে প্রসন্ন উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, কারও চোখ দুটিতে পর্য্যন্ত বিষণ্ণতার আভাসটুকু নাই, খুব যে নিরীহ সেও হাসিমুখে অন্যের পরিহাস উপভোগ করিতেছে, দু-চোখ খুশীতে চপল। প্রসন্ন সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, সংসারে শোক

তাপ নাই একথা সত্য নয়, তার বড় ভাগটা মেয়েরাই গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত জীবনকে কিছুকালের জন্য অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটা ইহাদের বোধ হয় জানা আছে।

ভাবিয়া প্রসন্ন খুশী হইল। খানিক পরে যে-স্ত্রীর সঙ্গে তাহার আলাপ করিতে হইবে সে ইহাদের স্বজাতীয়া। যে প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার দরুণ ইহারা কান্নার সময় প্রাণ দিয়া কাঁদিয়া হাসিবার সময় নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিতে পারে বড়বাবুর মেয়ের মধ্যেও সে দুর্ব্বলতা নিশ্চয় আছে। সকল নারীর মত তার বউও জীবনকে যাচাই করিবে না, হাসিকান্না যাহাই আসুক বিনা প্রতিবাদে দ্বিধামাত্র না করিয়া গ্রহণ করিবে এমনি একটা সান্ত্বনা প্রসন্নকে খানিক আশ্বস্ত করিল। আড়চোখে সে একবার চেলি-পরা বউকে দেখিয়া লইল। বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেও সে বিশ্বাস করিল দুঃখ এবং আনন্দের মত স্বামীকেও সমগ্র সত্তা দিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা এ মেয়ের হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসা হাসাকাঁদার মতই ইহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহার অস্থিমজ্জায় নিঃসন্দেহ স্বামিপ্রেম আছে এবং সে প্রেমে শ্রদ্ধা-ভক্তির অংশটা অন্য মেয়ের চেয়ে কম নয়।

ক্রমে মেয়েরা বিদায় লইল। বাহির হইতে কে যেন দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

প্রসন্ন মুহূর্ত্তে পাংশু হইয়া গেল।

যে-মেয়েটি শিকল দিয়াছিল বাহির হইতে সে পরিহাস করিয়া বলিল, 'কই গো বর, খিল চড়াবার শব্দটা পাচ্ছি না যে? আমাদের ভদ্রতায় এতখানি বিশ্বাস ক'রো না, ঠকে যাবে।'

প্রসন্ন ততক্ষণে উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, 'শিকল দিলেন কেন? খুলে দিন্।'

বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ কি রকম বর?

বারান্দার মেয়েটি চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিয়া গেল, 'কাল সকালে খুলব।'

কাল সকাল! সমস্ত রাত তাহাকে এই ঘরে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে, ইচ্ছা করিলেও বাহিরে যাইতে পারিবে না? কি ভয়ানক। প্রসন্ন মিনতি করিয়া বলিল, 'না না, এখুনি খুলে দিন। আমি একবার বাইরে যাব। দেখুন ত কি করছেন আপনি!'

ছোট একটি কিল দেখাইয়া মেয়েটি হাসিমুখে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন খাটে গিয়া বসিল। তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে। ঘরের বাতাস তাহার নিঃশ্বাস লওয়ার পক্ষে অপ্রচুর।

কত জল্পনাকল্পনাই সে করিয়া রাখিয়াছিল! সে-সব কিছুই হইল না। বিপন্ন হইয়া প্রসন্ন এই বলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল—

'তোমার ভাইটাই কাউকে ডেকে বল না শিকলটা খুলে দিক!'

বউ মৃদুস্বরে বলিল, 'একটু পরেই খুলে দেবে।'

প্রসন্ন তাহা জানে। এ যে কৌতুক, দশ পনের মিনিট পরে মেয়েটি যে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া শিকল খুলিয়া দিয়া যাইবে ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বস্তি মেলে না। বন্ধ ঘরে এক মুহূর্ত্ত থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার দম আটকাইয়া আসে। যদি এখনি একটা অঘটন ঘটিয়া বসে সে কি করিয়া ঘরের বাহির হইবে? অপঘাত হইতে রক্ষা পাইবে কি করিয়া? অবশেষে আবার সেই বন্ধ দরজা!—'না, এখুনি খুলে দিতে বল। এসব কি? এসব আমি ভালবাসি না।'

নিরুপায় বউ চুপ করিয়া গভীর বিস্ময়ে প্রসন্নের ভীত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আলোচনা

চণ্ডীদাসের পদাবলী

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

গুপ্ত-মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ কথাটি কে ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে যদি চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অনেক আধুনিক অপর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া যায় না কেন?...কবিরাজ গোবিন্দদাস অতবড় কবি, তাঁহার পদাবলীর পুঁথি, কেহ কি কখনও দেখিয়াছে? রায়শেখর কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, বংশীবদন, ইঁহারা সকলেই উত্তম কবি, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে কোথাও পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তরে আমরা নিবেদন করিতে চাই—হাঁ, আমরা দেখিয়াছি, পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা আমাদের রতন-লাইব্রেরীতে (বীরভূমে) অপরাপর পাঁচ হাজার প্রাচীন পুঁথির সহিত রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্থানেই আছে।

আমাদের লাইব্রেরীতে গোবিন্দদাসের স্বতন্ত্র পদাবলীর পনের-ষোলখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। এই সকল পুঁথিতে গোবিন্দদাসের একুশ পদ হইতে তিনশতাধিক পদাবলী একত্র সংগৃহীত আছে। অপরাপর বহু কবিরও এইভাবে সংগৃহীত পদাবলীর সঞ্চয়-গ্রন্থ পুঁথির আকারে লিপিবদ্ধ আছে।

রায়শেখরের নিজের সঙ্কলিত "দণ্ডাত্মিকা" পদাবলীর কথা সকলেই জানেন। "দণ্ডাত্মিকা" পদাবলীর ছাপা পুঁথিও পাওয়া যায়। আমাদের লাইব্রেরীতেও এই গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পদকর্ত্তার পদাবলীর স্বতন্ত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কোন-কোনটির সঙ্কলনকাল "পদকল্পতরু"রও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে

পূর্ব্বোল্লিখিত রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী" খানিকে প্রকারান্তরে পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ বলা যাইতে পারে পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশীশেখরের "নায়িকা রত্নাবলী" নামে স্বতন্ত্র পদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

গুপ্ত-মহাশয় রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থের নাম লিখিয়াছেন "পদসমুদ্র," কিন্তু গ্রন্থের নাম "পদসমুদ্র" নহে—"পদামৃত সমুদ্র"। "পদসমুদ্র" আউলিয়া মনোহর দাস রচিত বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। স্বর্গীয় হারাধন ভক্তনিধি মহাশয় এই পুঁথির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন", পদাবলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। ইহাতে যে-সমস্ত কবিতা আছে, তাহার প্রত্যেকটি কবিতাই রাগরাগিণী সম্বলিত পদ।

সিউড়ি, বীরভূম — শ্রীগৌরীহর মিত্র

প্রতাপাদিত্যের কথা

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। বাহারিস্তানের গ্রন্থকর্ত্তার নাম মির্জ্জা সহন নহে, মির্জ্জা নথন। যদুবাবু ভুল করিয়া সহন পড়িয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় Mughal North-East Frontier Policy নামক গ্রন্থে এই ভ্রম-সংশোধন করিয়াছেন। পুরাতন আসামী বুরঞ্জিগুলিতে এই নথনের নাম অনেকবার করা হইয়াছে।

২। বঙ্গের 'বারভূঞা' নাম যে আসামের বারভূঞার অনুকরণ তাহা আমার এক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বার' কথাটা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক নহে। যে-আমলে দেশে কোন অধিরাজ ছিল না, ছোটবড় অনেকগুলি জমিদারের অধীনে দেশ ছিল, সেই আমলকেই বারভূঞার আমল বলিত। Bengal : Past and Present, Vol. XXXV, p 30. "How the number of the Chiefs came to be fixed at 'twelve.'" দ্রষ্টব্য।

৩। প্রতাপের বংশ-পরিচয়ের জন্য রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত'-এর উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

৪। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য দায়ুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াই যে যশোর-রাজ্য মোগলের নিকট হইতে বকশিস্ পাইয়াছিলেন, ইহা আমার প্রবন্ধে বেশ পরিষ্কাররূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। Bengal : Past and Present. Vol. XXXVI. p. 16. দ্রষ্টব্য। হতভাগ্য দায়ুদের প্রধান অন্তরঙ্গ ছিল দুইজন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি,—কতলু খাঁ ও শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য। এই দুইজনই দায়ুদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছিল। কতলু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলের হাতে উড়িষ্যা-রাজ্য ইনাম পায়, আর শ্রীহরি পায় যশোর-রাজ্য। কতলুর সহিত মোগলের আবার অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যশোর-রাজ্য চিরদিন মোগলের অনুগত ছিল। প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা একেবারে মিথ্যা কথা এক পতনকালের সঙ্ঘর্ষ ভিন্ন তাঁহার সহিত মোগলের কোন দিন আর কোন সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া বিন্দুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

৫। নিখিলবাবু লিখিয়াছেন—"যে সময় আজিম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন সেই সময়ে প্রথম মোগলদের সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়।" আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। তিনি এক রকম বিহার সীমান্ত ছাড়াইয়া বাংলায় ঢোকেন-ই নাই! প্রতাপাদিত্যের সহিত সঙ্ঘর্ষ ত অনেক দূরের কথা। নিখিলবাবু চাঁচড়া রাজবংশের কাগজপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাগজপত্রের কোনটায় যদি আজিম খাঁ-প্রতাপ সঙ্ঘর্ষ সমর্থিত হয় তবে তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে চিত্রাদি সহ প্রকাশিত হওয়া উচিত। সতীশবাবুর 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে'

দেখা যায় (পৃ. ৪৭৯) এই বংশের ভবেশ্বর সিংহ আজিম খাঁর সুবাদারীর কালে চারিটি পরগণার সনন্দ প্রাপ্ত হন। মোগলপক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই নাকি এই সনন্দ-প্রাপ্তির কারণ। এই মূল্যবান দলিলখানি থাকিলে চিত্রসহ উহার পাঠ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৬। কার্ভালো সত্যই প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কাশিম খাঁর সুবাদারীর আমলের কার্ভালো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। Bengal: Past and Present, Vol. XXXV. p. 28, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৭। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোন সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। বসু-মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য-চরিতেও দেখা যায়, মানসিংহ যশোরে অতি বন্ধুভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন (নিখিলবাবুর সংস্করণ, ৬২ পৃষ্ঠা)। মানসিংহের বঙ্গীয় ভৌমিকদমনের ইতিহাস 'আকবরনামা' হইতে বেশ বিস্তৃতরূপেই জানা যায়। প্রতাপের সহিত সঙ্ঘর্ষের কোন কথা কোথাও নাই। প্রতাপ আগাগোড়া মোগলপক্ষে ছিলেন। একটা নিতান্ত মিথ্যা কথা ভারতচন্দ্রের প্রসাদে বাংলায় কুখ্যাত হইয়া আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযানে মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার প্রতাপাদিত্য নাটকে ইহা লইয়া কত রঙ্গই না করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্য করার জন্যই নাকি মানসিংহ তাঁহাকে কয়েকটি পরগণা বকশিস্ দিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। বোর্ড-অব-রেভেনিউর অনুমতি ও আনুকূল্যের বলে আমি নিজে কৃষ্ণনগর গিয়া কৃষ্ণনগর জমীদারীর মূল সনন্দগুলির ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছি এবং পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাদি করিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি। জাহাঙ্গীরের আমলের বাদসাহী সনন্দ দুই-খানা আছে। প্রথমখানার তারিখ ১৩ শাবান, ১০১৫ হিজরি= ৪ই ডিসেম্বর, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয়খানা ১০২২ হিজরির—প্রথমখানার ৭ বছরের পরবর্ত্তী। দ্বিতীয়খানার বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন নাই। এই সনন্দদ্বয় চিত্রাদি সহ যথাসময়ে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

প্রথমখানার মর্ম্ম এই যে ভবানন্দ বাঙালীর দুই ভ্রাতা বসন্ত ও দুর্গাদাস দিল্লীতে যাইয়া বাদশাহী দরবারে আরজী পেশ করিয়াছেন যে সুবা বাংলার সরকার সাতগাঁর অধীন তিনটি পরগণার চৌধুরাই এবং কানুনগুই পুরুষানুক্রমে উক্ত ভবানন্দ ভোগ করিতেছেন এবং সম্প্রতি নদীয়া পরগণার কতকগুলি জনশূন্য গ্রামে জনবসতি করাইয়া এবং মহদ্‌পুর নামকরণ করাইয়া সুবাদার রাজা মানসিংহ এই পরগণারও চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দ বাঙালীকে প্রদান করিয়াছেন। মহদ্‌পুরের আয় ১২,০০০৲ টাকা। মানসিংহ মহদপুরের চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দকে প্রদানের সনন্দ বাদশাহী শেরেস্তায় দাখিল করিয়াছেন। বাদশাহ আদেশ দিলেন পুরুষানুক্রমে উপভুক্ত তিন পরগণার চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দের অব্যাহত থাকিবে। নূতন পরগণা মহদপুর 'জাহাঙ্গীরপুর' নাম প্রাপ্ত হইবে এবং উহার চৌধুরাই ও কানুনগুইও ভবানন্দে সমর্পিত হইল ও এই সমর্পণ বাদশাহের অনুমোদন লাভ করিল। সুবাদার কুতবউদ্দিন আদেশ পাইলেন, জাহাঙ্গীরপুরের আয় যদি খালসা-বিভাগে লওয়ার উপযুক্ত হয় তবে উহা খালসা-বিভাগে যাইবে, নচেৎ উহা জাগীরদারের বেতন-স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

পুরাতন তিন মহালের নাম বাগোয়ান, মস্তারি, নদীয়া। নূতন মহালের নাম জাহাঙ্গীরপুর ওরফে মহদপুর।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিবার পুরস্কার-স্বরূপ ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হইতে এই সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, উপরের সংক্ষিপ্তসার হইতে ঐতিহাসিকগণ এখন তাহা বিচার করিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ, এই আমলের ইতিহাসের মালমশলা যাহা পাওয়া যায় তাহা যথাসম্ভব ঘাঁটিয়া যশোহর-রাজ্য সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই যে পাঠানরাজের বিশ্বাস-হননের পুরস্কার-স্বরূপ শ্রীহরি যশোর-রাজ্য মোগলের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য চিরদিন মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার চেষ্টা, স্বাধীনতা-সমর ইত্যাদি নিছক্ মিথ্যা কথা। স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছিলেন কতলু খাঁ, ঈশা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলী, ঈশা খাঁর পুত্রগণ, ওসমান খাঁ, এবং হিন্দু ভূঞার মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়।

জবরদস্ত সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসিয়া প্রবলপ্রতাপে ভূঞা দমন আরম্ভ করিলে প্রতাপ তাহাকে যথোচিত সাহায্য না করায় ইসলাম খাঁ প্রতাপের দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। আত্মরক্ষার্থ অবশেষে প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের ফলেই তাঁহার পতন।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১০

জ্ঞানদা রোগশয্যা হইতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর সারিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আজ এটা, কাল সেটা লাগিয়াই আছে। খাদ্যে রুচি নাই, ঘুম হয় না, সারাদিন একটা অস্বস্তি লাগিয়াই থাকে। ডাক্তার তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন, কিন্তু চোখের উপর কাজকর্ম্মে ত্রুটি অবহেলা দেখিলে চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী জ্ঞানদা নন। বকাবকি চেঁচামেচি লাগিয়াই থাকে। কয়েক দিন মাত্র শুইয়াছিলেন, ইহারই ভিতর চাকরবাকর এমন অসম্ভব বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে যে, কিছুতেই আর তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যাইতেছে না। বাড়ি-ঘরদোর হইয়াছে যেন ভূতের বাথান। এটা অবশ্য জ্ঞানদা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিত না। যামিনী এবং যামিনীর বাবা, দু-জনের উপরেই জ্ঞানদার বিরক্তির সীমা ছিল না, ক'টা দিন দেখিয়া-শুনিয়া সংসারটা চালাইবার যোগ্যতাও কি ইহাদের নাই?

সেদিন সকালে উঠিয়াই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গিয়াছিল। জ্ঞানদা চা খাওয়া শেষ করিয়া ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল, পিয়ানোর পিছনে ছেঁড়া কাগজের মত কি সব দেখা যাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তদারক করিতে গেলেন। ছেঁড়া কাগজই ত বটে, তাহার সঙ্গে আরও কত জঞ্জাল, তাহার ঠিকঠিকানা নাই। শুধু পিয়ানোর পিছনে নয়, চেয়ার সোফা সবগুলির নীচেই নোংরা, ভাল করিয়া ঝাঁট দেওয়া ও মোছা হয় নাই। এই ঘরখানি জ্ঞানদার অত্যন্ত গর্ব্বের জিনিষ ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "সাহেব বাড়ির চেয়ে আমার বাড়ি একচুল কম নয়। কই এ ঘরখানাতে এক কণা ময়লা বা ধুলো তোমরা দেখাও দেখি?" সেই ঘরের এই অবস্থা? রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

ছোট্টুর ডাক পড়িল। গৃহিণীর বকুনি ও ছোট্টুর আত্মসমর্থনের চেষ্টার শব্দে বাড়ির যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। যামিনীর কিছু বলিতে সাহস হইল না, তাহা হইলে বকুনিটা এখনই তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। মিহিরের কোনো অবস্থায় চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব, সে বলিল, "যত দোষ ছোট্টুর, কেউই ত কিছু কাজ করে না, খালি ওকে বকৃছ কেন? তোমার অসুখের সময় যা রান্না হ'ত তা যদি দেখতে!"

জ্ঞানদা কিছু বলিবার আগেই পাচক ভজহরি বলিয়া উঠিল, "কেন খোকাবাবু, কি খারাপ রান্না হয়েছিল? এই ত দিদিমণি রয়েছেন, বলুন না?"

জ্ঞানদা তাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমায় আগে থেকে সাফাই গাইবার জন্যে কে ডেকেছে? তুমি যাও এখান থেকে। তোমরা যে কে কত কাজের তা আমার জানা আছে, একবার আমি পিছন ফিরলেই হয়।" বকুনির স্রোত আরও বহুক্ষণ একটানা চলিত, কিন্তু গৃহিণী হাঁপাইয়া গেলেন। রক্তবর্ণ মুখে সোফায় বসিয়া খালি রাগে আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নৃপেন্দ্রবাবু চশমাজোড়া কপালের উপর ঠেলিয়া তুলিয়া, আপিস-ঘর হইতে ড্রয়িং-রুমে আসিয়া ঢুকিলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই রকম কাণ্ড যদি কর, ত কালকেই আবার পড়বে। এর নাম বিশ্রাম করা?"

জ্ঞানদা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বাজে কথা রাখ দিকিন্। ঘর-সংসার সব চুলোয় যাক, আর আমি বসে বসে খালি বিশ্রাম করি। তোমরা যদি মানুষের মত হ'তে, তাহ'লে আমায় এই শরীরে এত চেঁচাতেই বা হবে কেন?"

কর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা তা হলামই না হয় আমরা অমানুষ। তাই ব'লে দুচার দিন সবুর কি করা যায় না? এখন চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আবার যদি পড়, তাহ'লে তুমি

আর উঠবে মনে করেছ ? ডাক্তাররা ত উপন্যাস শোনাতে আসে না, তারা সত্যি কথাই বলে। তারপর ? চিরদিনের মত ঘরকন্না অচল হওয়ার চেয়ে দুদিন যদি খারাপ ভাবেই চলে তাতে কি এমন ক্ষতি ?"

গৃহিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন, "তাহ'লে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল বাপু। চোখের উপর এই সব অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখে আমি কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে পারব না। তার চেয়ে আমার দূরে থাকাই ভাল।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বেশ। চেঞ্জে যেতে ত তোমায় ডাক্তার বলছেনই, তারই ব্যবস্থা কর না হয়।"

জ্ঞানদা চটিয়া বলিলেন, "ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে! এর পর মরলে পরে, বইবার খাটটিসুদ্ধ আগে কিনে দিয়ে যেতে বলবে। গায়ে পড়ে সব কাজ নিজে সর্ব্বদা করেছি কি না, তাই এখন এই দশা।"

যামিনী আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেল। তাহার মনটা ছিল আশ্চর্য্য নরম এবং ভাবপ্রবণ। অন্য দুইজন মানুষকে ঝগড়া করিতে দেখিলেও তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত। বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ, সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

কর্ত্তা বলিলেন, "না গো না, তোমায় খাট-কুর্শি কিছু আমি কিনতে বলছি না। কোথায় যাবে সেইটাই বল, বাকী ব্যবস্থা আমিই করব। অন্যের পছন্দে তোমার কোনো কাজ ত হয় না, তা তোমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে উপায় কি ? আমি হয়ত এক জায়গায় সব ঠিক করলাম, তারপর তুমি বল্লে সেখানে তুমি কিছুতেই যাবে না। তার চেয়ে গোড়ার থেকে সব সোজাসুজি হওয়া ভাল।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "এই দারুণ শীতে কোথায় বা যাব ? এখন ত আর পাহাড়ে যাওয়া যাবে না ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "পাহাড় ত নয়ই। সেখানে তুমি ভালও থাকবে না। পুরী, কি ওয়াল্টেয়ার, এই ধরণের জায়গা হ'লে তোমার পক্ষে ভাল এখন।"

গৃহিণী তখন বলিলেন, "তুমি ত 'যাও' বলে নিশ্চিন্দি, ছুটি পাবে না দু-মাসের। খুকীরও পরীক্ষা আসছে, তাকেও কিছু আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। তাকে আগ্লাতে তোমাকে ত থাকতেই হবে। একলা আমি এই শরীরে কোথায় কার ভরসায় যাব শুনি ?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বল্লে কি হয় ? প্রাণের বাড়া কিছু নেই, যেমন ক'রে হোক ব্যবস্থা করতে হবে। আয়া তোমার সঙ্গে গেলে সেবা-শুশ্রূষা সবই করতে পারবে, তবে দেখাশোনার জন্যে একজন লোক দরকার। দেখি ভেবে কি করা যায় ?"

গৃহিণী উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভাব যত পার, ভাবলেই ত আর মানুষ সৃষ্টি হবে না। 'টাকা দাও, টাকা দাও' করবার বেলা সাতগুষ্টি ঢের আছে, কিন্তু কাজের বেলা কেউ নেই। তা কাকেই বা বল্ব ? আমার নিজের গুষ্টিই বা কেমন ? মরলেও কেউ এসে পুঁছবে না গা," বকিতে বকিতে তিনিও উপরে উঠিয়া গেলেন।

কর্ত্তা আবার আপিস-ঘরে ফিরিয়া গেলেন। বাস্তবিকই ভাবনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। গৃহিণীকে এখানে থাকিতে দিলে বকাবকি করিয়া, এবং উপর নীচে করিয়া তিনি অবিলম্বে আবার শয্যাগ্রহণ করিবেন। কিছুতেই তাঁহাকে চাকর-শাসন হইতে নিরস্ত করা যাইবে না। কিন্তু কোথায়ই বা তাঁহাকে পাঠানো যায় ? কাহার ভরসায়ই বা পাঠানো যায় ? আত্মীয়-স্বজন দু-চার জন এদিক-ওদিক আছে বটে, কিন্তু কাহারও সঙ্গে জ্ঞানদার বনিবনাও নাই। অনুরোধ করিলে তাহারা অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ সকলেই নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে অনেক উপকার পাইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদাই সে-সব জায়গায় স্বস্তিতে থাকিতে পারিবেন না, আর তাঁহার মন ভাল না থাকিলে, শরীরও কিছুতেই সারিবে না। পুরী জায়গাটা ভাল, সেখানে বাড়ি ভাড়া করিয়া, ঝি-চাকর সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে কি রাখা যায় না ? কিন্তু আত্মীয় একজন কেহ সঙ্গে থাকা দরকার। হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হইয়া পড়িলে ঝি-চাকরে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে, সামলাইতে পারিবে না। কাহাকে পাঠানো যায় ?

যাইবার উপায় নাই। পুত্রকন্যাকে কাহার জিম্মায় রাখিয়া যাইবেন ?

আপিসের সময় হইয়া আসাতে, নৃপেন্দ্রবাবু ভাবনা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জ্ঞানদা নিজে কিন্তু ভাবিতে সুরু করিয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার এখন সারিয়া উঠা দরকার, কিন্তু এখানে থাকিলে সারা কঠিন। না-হয় সংসারে কিছুদিনের জন্য বিশৃঙ্খলাই হইবে। কিন্তু এখন যদি জ্ঞানদার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি কাণ্ড যে হইবে, তাহা ভাবিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এক ত মরিবার ইচ্ছা কোনো মানুষেরই পক্ষে স্বাভাবিক নয়, তাহার উপর জ্ঞানদার বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছাটা একটু অতিরিক্ত রকম প্রবল ছিল। বাল্য ও যৌবনে তাঁহার জীবনে সংগ্রামের অন্ত ছিল না। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এখন তিনি সে-সব কাটাইয়া উঠিয়াছেন। ঠিক যে-সময় তাঁহার মনের মত করিয়া সব গুছাইয়া আনিয়াছেন, পরিশ্রমের অবসানে যখন শান্তি ও বিশ্রাম এবং ফল উপভোগের সময়, তখনই পরপারের ডাক আসিয়া পৌছান অতিশয় হৃদয়বিদারক ব্যাপার। তাঁহার সাজান সংসার এক নিমেষে ভাঙিয়া পড়িবে, কর্ত্তা কিছুই সামলাইতে পারিবেন না, যা তাঁহার অসংসারী মন। ছেলেমেয়ের কি হইবে, তাহারই বা ঠিকানা কি ? মেয়েটাকে হয়ত কোন হা-ঘরের হাতে তুলিয়া দিবেন, চিরজীবন নাকের জলে চোখের জলে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। ছেলে পাড়ার যত ছোটলোকের সঙ্গে টো টো করিয়া ঘুরিবে, শিক্ষা সহবৎ কিছুই তাহার হইবে না। বিশ বৎসরের একান্ত চেষ্টায় যাহা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, দুই দিনে সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। স্বামীর হতভাগা আত্মীয়গুলা আসিয়া সব জুড়িয়া বসিবে, কল্পনার চক্ষে সে-দৃশ্য দেখিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

পুরীতে যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন। সঙ্গে আয়া এবং একজন চাকর লইবেন। অভিভাবকত্ব করিবার লোকের অবশ্য তাঁহার কিছু প্রয়োজন নাই, তবে পুরুষ মানুষ একজন সঙ্গে থাকা দরকার। তিনি নিজে অসুস্থ, না হইলে কাহারও প্রয়োজন হইত না। অনেক ভাবিয়া ঠিক করিয়া পুরী লইয়া যাইবেন। পরেশ নৃপেন্দ্রবাবুর অতি দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয়। পিতামাতা নাই, অথচ পড়িবার সখ তাহার অত্যন্ত, সেইজন্য অনেক কষ্টে বছর-দুই আগে সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও, জ্ঞানদা বাধ্য হইয়া তাহাকে বাড়িতে স্থান দিয়াছিলেন।

কিন্তু পরেশ প্রথম হইতেই যামিনীর এমন ভক্ত হইয়া উঠিল যে, জ্ঞানদা বেশী দিন তাহাকে বাড়িতে রাখিতে সাহস করিলেন না। নানা ছুতা করিয়া মফঃস্বলের এক কলেজে চালান করিয়া দিলেন। সেইখানেই পড়াশুনা করিতেছিল, খরচ অবশ্য বেশীর ভাগ নৃপেন্দ্রবাবুই দিতেন। কিন্তু পূজার সময় দেশে গিয়া পরেশ টাইফয়েড ফিভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু কলেজে আবার যোগ দিবার মত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় নাই। বাড়িতেই এখন বেকার অবস্থায় বসিয়া আছে। পুরীতে গেলে তাহার নিজেরও যথেষ্ট উপকার হইবে, সুতরাং যাইতে আপত্তি সে কখনও করিবে না। মাস-দুই থাকিলেই হইবে, তাহার বেশী থাকিবার সম্ভবতঃ প্রয়োজন হইবে না।

কর্ত্তা আপিসে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছু এই ব্যবস্থার বিষয়ে বলা গেল না। গৃহিণী যামিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে সবে স্নান সারিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, মায়ের ডাকে চিরুণী হাতে করিয়াই তাঁহার ঘরে হাজির হইল। জ্ঞানদা তখন খাটে বসিয়া খোঁপা খুলিতেছিলেন, স্নান করিতে গেলেই হয়। মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "তোর চুল উঠে যাচ্ছে নাকি খুকি ? কেমন যেন কম কম দেখাচ্ছে।"

যামিনী বলিল, "না, চুল ওঠেনি, আজ একটু বেশী ক'রে তেল দিয়েছিলাম, তাই ও রকম দেখাচ্ছে। আমাকে ডাকছিলে কেন মা ?"

মা বলিলেন, "আমি মনে করছি আসচে রবিবারেই পুরী যাব। শরীর ত এখানে কিছুতেই ভাল থাকছে না। তোদের কাউকে নিয়ে যাওয়া ত সম্ভব হবে না, পড়াশুনো রয়েছে।"

"তুমি কি একলাই যাবে নাকি মা? তোমাকে দেখবে কে?"

গৃহিণী বলিলেন, "একেবারে একলা কি আর যাব? আয়া সঙ্গে যাবে, আর একজন চাকরও যাবে। পরেশকে চিঠি লিখে আনিয়ে নেব ভাবছি, উপরি উপরি দেখাশোনা-গুলো করতে পারবে।"

পরেশের নামে যামিনীর গালটা একটু লাল হইয়া উঠিল। স্পষ্ট করিয়া কোনো কথা তাহাকে বলা হয় নাই, তবু পরেশের বিদায় হইবার কারণ সে বুঝিতেই পারিয়াছিল। কিন্তু পরেশের কথা বেশী মনে করিবার মত তাহার তখন অবস্থা ছিল না। মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়াই তাহার মন ভার হইয়া উঠিতেছিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়াও এখনও সে মায়ের প্রতি শিশুরই মত নির্ভরপরায়ণা ছিল। বছর-দুই আগে পর্য্যন্ত সে নিজে গুছাইয়া কাপড় পরিতে বা চুল বাঁধিতে পারিত না। কোথাও যাইতে হইলে মা তাহাকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিতেন। এখনও বাড়ির বাহির হইতে হইলে, কি কাপড় জামা পরিবে, তাহা মা স্থির করিয়া দেন, না হইলে যামিনী একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহার বয়সই বাড়িয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারকে সে এখনও চিনিতে বুঝিতে শিখে নাই। জ্ঞানদার ভিতর দিয়াই সংসারের সঙ্গে তাহার যত লেনদেন চলিত।

এমন মেয়ের পক্ষে মা চলিয়া যাওয়ার সংবাদ কিছুই সুসংবাদ নয়। যামিনী কি বলিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না, খালি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অনেক দেরি হবে মা?"

জ্ঞানদা বলিলেন, অনেক দেরি করবার জো কি আমার? মাস দুই নিতান্ত না থাকলে নয়, তাই থেকে আসব। পড়াশুনোর যেন কোনো ত্রুটি না হয়। বাড়ির কাজ না-হয় একটু বিশৃঙ্খলই হবে, তার আর উপায় কি? আর দেখ, খুব বুঝেসুঝে সাবধান হয়ে চলবে। কোনোমতে কোনো কথা না ওঠে। যা ত আমাদের সমাজ, একখানা হ'লে শতখানা ক'রে গুজব রটিয়ে বেড়াবে। অবিবাহিত মেয়ের নামে গুজব ওঠা ভারি খারাপ।"

যামিনী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি একলা একলা কোথায়ই বা যাব মা যে আমার নামে গুজব রটবে? থাকব ত ঘরের কোণে বসে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তাতেই কি আর আটকায়? বাড়িতেও ত লোক আসতে পারে? এই ত আমার অসুখের সময় খোকার মাষ্টার একটু উপরে যাওয়া-আসা করেছে, তুইও তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছিস্ দরকারে পড়ে, অমনি সেদিন মিসেস্ ঘোষাল একেবারে কত কথা পেড়ে বসল। ছেলেটি কে? কোথায় থাকে, অবস্থা কেমন, বিয়ে হয়েছে নাকি, হেন তেন কত কি! আমার কাছে অবিশ্যি সুবিধে হ'ল না, তা তুই ত যা মেয়ে তোকে কেউ ও-রকম কথা বললে কেঁদেই ফেল্‌বি।"

যামিনী এমনিতেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "কি বিচ্ছিরি, ছি ছি! আমি প্রতাপবাবুর সঙ্গে মাত্র দু-তিনবার কথা বলেছি, নিতান্ত দায়ে পড়ে। তাইতেই অমনি কিনা—" আর তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না, নাক-চোখ মুছিতে মুছিতে সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু মায়ের কথাটা ভুলিতে পারিল না। এই রকম কথাও তাহা হইলে উঠিয়াছে? প্রতাপবাবু বেচারা নিতান্ত ভালমানুষ, তাঁহার মাথায় কখনই এ সব বাজে খেয়াল আসে নাই? কিন্তু কি জানি?

যামিনীর বাস্তব সংসারের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও কাব্য ও উপন্যাস জগতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। প্রেমের মহিমাকে সে বিশ্বব্যাপী এবং জীবনের সর্ব্বোত্তম সম্পদ বলিয়া মনে করিত। যে-কল্পলোকে এই নিঃসঙ্গ তরুণীর চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা প্রেমের আলোকে রঙীন, প্রেমের সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত। সেখানে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই, সমাজের গণ্ডী নাই, আত্মীয়স্বজনের বাধা নাই। ভালবাসার পথই সেখানকার একমাত্র পথ।

গল্প করিতে গিয়া জ্ঞানদা যে কি অনর্থের সূত্রপাত করিলেন, তাহা তিনি নিজেও জানিলেন না। যামিনীর মনে যে-বীজ তিনি রোপণ করিলেন, সে তাহাতে নিরন্তর বারি সিঞ্চন করিয়া সেটিকে সজীব ও সতেজ রাখিয়া দিল।

১১

পরেশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জ্ঞানদা ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্রবাবুর টেলিগ্রাফ পাইবামাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হইল, একদিনও আর বিলম্ব করিল না।

আজ রবিবার। আজই সন্ধ্যার ট্রেনে জ্ঞানদা যাত্রা করিবেন। সারাদিন তিনি ব্যস্ত, আয়ার সাহায্যে জিনিষ-পত্র সব গুছাইয়া রাখিতেছেন, কি সঙ্গে লইবেন, কি রাখিয়া যাইবেন তাহা পৃথক করিতেছেন। মিহির সব জিনিষে হাত দিয়া তাড়া খাইতেছে, যামিনী সজল চক্ষে ঘর-বাহির করিতেছে। পরেশ এক-একবার দরজার কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার খুব ইচ্ছা ভিতরে আসে, কিন্তু অবাধ প্রবেশাধিকার তাহার নাই, তাহা সে ভাল করিয়াই জানে।

বিকাল হইয়া আসিল। আজ চা খাওয়াটা তাড়াতাড়ি করিয়া চুকিয়া গেল। জ্ঞানদা সঙ্গে ট্রেনে খাইবার জন্য যে-সব জিনিষ তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা চট্‌পট্ শেষ করিবার জন্য পাচককে তাড়া দিতে লাগিলেন। যামিনী মায়ের সঙ্গে ষ্টেশনে যাইবে, সে চুল বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতে গেল।

প্রতাপ জ্ঞানদার যাত্রার কথা আগেই শুনিয়াছিল। আজ মিহির যে বেড়াইতে যাইবে না তাহা সে উত্তম-রূপেই জানিত, তবু তাহাকে যখন আসিতে নিষেধ করা হয় নাই, তখন সে চারটার সময় নিয়ম-মত আসিয়া উপস্থিত হইল। মিহির জুতা মোজা আঁটিয়া নীচেই লাফাইয়া বেড়াইতেছিল। প্রতাপকে দেখিয়া বলিল, "আজ আর বেড়াতে যাব না স্যর, আজ মাকে তুলে দিতে ষ্টেশনে যাচ্ছি।"

প্রতাপ বলিল, "তাই নাকি? তোমার মা আজই যাচ্ছেন?"

মিহির বলিল, "হ্যাঁ, পুরী যাচ্ছেন।" যাত্রার আয়োজন চারিদিকেই দেখা যাইতেছিল। বাক্স বিছানা প্রভৃতি বাঁধাছাঁদা হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, বাড়ির গাড়ীখানাও তৈরি হইয়া গেটের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রতাপ কি করিবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। মিহির তাহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া বলিল, "আপনিও চলুন না ষ্টেশনে স্যর?"

প্রতাপ মৌখিক আপত্তি দেখাইয়া বলিল, "আমার কি যাবার দরকার হবে?"

মিহির বলিল, "দরকার আবার কি, আমারও ত কিছু দরকার নেই। এমনি যাচ্ছি মজা দেখতে।"

অসুস্থা মাতা চলিয়া যাওয়ার ভিতর যে মজাটা কোন্ খানে তাহা প্রতাপ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহা লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার সময় তাহার হইল না। গৃহিণী কন্যা স্বামী সহ নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ যামিনীর মুখের দিকে একবার অন্যের অগোচরে চাহিয়া দেখিল। মুখখানি বড় করুণ দেখাইতেছে, চোখ দুটি ঈষৎ রক্তিম, যেন অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে।

গৃহিণী নামিয়াই বিরক্তভাবে বলিলেন, "ব্যস, এত ক'রে যে বললাম, জিনিষপত্র নিয়ে যাবার জন্যে একখানা ঠিকে গাড়ী আনিয়ে রাখতে, তা বুঝি আর কিছুতেই পারলে না? জিনিষগুলো কি আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাব?"

ছোট্ট তৎক্ষণাৎ গাড়ী ডাকিতে ছুটিল। কর্ত্তা বলিলেন, "এই ক'টা ত জিনিষ, আমাদের গাড়ীর মাথায়ই ত যেতে পারত?"

জ্ঞানদা চটিয়া বলিলেন, "তা আর না? এতগুলো মানুষ, তার উপর একরাশ লগেজ, যা চমৎকার দেখাবে! আর পাঁচজন মানুষ বড় বড়, একখানা গাড়ীতে ধরে নাকি?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বেশ, লগেজ তোমার ঠিকা গাড়ীতেই যাক্ না হয়। কিন্তু সময় আর বেশী নেই তা ব'লে দিচ্ছি। শেষে ট্রেন ফেল করবে।"

জ্ঞানদা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বার্থ রিসার্ভ করা হইয়া গিয়াছে, এখন ট্রেন ধরিতে না পারিলে চলে কখনও? এককাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ হইবে যে? তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমরা বেরিয়ে পড়ি, জিনিষ না-হয় পরে যাবে। আমার ছোট ব্যাগটা শুধু সঙ্গে দাও।"

কর্ত্তা বলিলেন, "জিনিষপত্র ফেলে যে যাচ্ছ, ধর

ঠিকে গাড়ী ঠিক সময় পৌছল না। তখন বিদেশে বিভুঁয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়বে যে!"

জ্ঞানদা গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "অত ভাবতে গেলে চলে না। জিনিষ নাই যদি পৌছয়, কাল ভজহরিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। ও ত পুরীরই মানুষ। একদিন আমি কোনমতে চালিয়ে নেব। আয়া জলদি আও, খুকি আয়। ও গো, তুমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওঠ না গাড়ীতে। পরেশ, তুমি না হয় কোচবাক্সে বস, আর ত ভিতরে জায়গা নেই।"

তাঁহার তাড়ার চোটে সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। কর্ত্তা উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাই চললাম ত, জিনিষপত্র নিয়ে আসবে কে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কেন, খোকা ত রয়েছে, এত বড় ছেলে সে আর জিনিষগুলোকে ষ্টেশনে পৌছে দিতে পারবে না? ভজহরিও না হয় সঙ্গে যাবে।"

মিহির চটিয়া আগুন হইয়াছিল। সবাই চলিল বাড়ির গাড়ী চড়িয়া, যেন লাটসাহেব। আর সে কি বাজার সরকার যে একগাদা জিনিষ ঘাড়ে করিয়া মুটের মত যাইবে। "আমি ষ্টেশনে যাচ্ছিই না মোটে," বলিয়া একলম্ফে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্ঞানদা মহা বিপদে পড়িলেন, এদিকে ট্রেনের সময় হইয়া যায়। গাড়ী হইতে নামিয়া অবাধ্য পুত্রকে শাসন করিবার মতও সময় নাই। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি প্রতাপকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রতাপবাবু, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আসেন ও-গুলো নিয়ে তাহ'লে বড় ভাল হয়। আপনার কষ্ট হবে হয়ত, কিন্তু এখন আর অন্য ব্যবস্থা করবার মোটে সময় নেই।"

প্রতাপ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। আপনারা বেরিয়ে পড়ুন, সত্যিই আর দেরি করা উচিত নয়।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যামিনী একবার প্রতাপের দিকে তাকাইয়া দেখিল। সেই দৃষ্টিটুকু প্রতাপ বহুমূল্য সম্পদের মত হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিল। পরের জীবনে কোনোদিন এই দৃষ্টিটিকে সে ভুলিতে পারে নাই। আজই যেন প্রথম যামিনী তাহাকে প্রতাপরূপে দেখিল, এতদিন সে মিহিরের মাষ্টার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

ছোট্ট ও ঠিকা গাড়ী লইয়া মিনিট তিন-চার পরেই ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষগুলি গাড়ীর উপরে তুলিয়া দিয়া, প্রতাপ একবার মিহিরের সন্ধানে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই। আর দেরি করা অসম্ভব, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া জোরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দিল।

ষ্টেশনে পৌছিল সে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে। জ্ঞানদা গাড়ীতে উঠিয়া উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, কখন তাঁহার জিনিষ আসে। কর্ত্তা এবং পরেশ ক্রমাগত প্লাটফর্ম্মে ছুটাছুটি করিতেছেন, যামিনী একটা লোহার বেঞ্চে বসিয়া আছে। চোখে জল আসিয়া পড়িতেছে, অনেক কষ্টে সেটাকে দমন করিয়া আছে।

প্রতাপকে দেখিয়া গৃহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িতেছে, সবাই মিলিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া সব গাড়ীতে উঠান হইতে-না-হইতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেষ বাক্সটা প্রতাপ এবং কুলীরা জানলা দিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিল। গাড়ী তখন জোরে চলিতে সুরু করিয়াছে।

নৃপেন্দ্রবাবু যামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল মা, এবার যাওয়া যাক্।"

যামিনী একটি ছোট পাত্‌লা রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেছিল। সে বলিল, "চল বাবা।"

প্রতাপও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মিহির কি আজকে আর যাবে বেড়াতে? না আমি বাড়ি ফিরে যাব?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "চলুন ত বাড়ি অবধি, দেখা যাক। ছেলেটা বড় অবিবেচক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

প্রতাপ অগত্যা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে কোথাকার মানুষ কোথায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার ঠিকানা নাই। সে ইঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু এখন প্রায় আত্মীয়ের অধিকার পাইতে বসিয়াছে। ইহারও অধিক কিছু তাহার ভাগ্যে কি জুটিবে? সে

একবার যামিনীর দিকে চাহিল, একবার নিজের শ্রীহীন দেহ, দীন পরিচ্ছদের দিকে চাহিল। না, এ সব দুরাশার স্বপ্ন দেখিয়া সে নিজে নিজের অনিষ্ট করিতেছে।

গাড়ী আসিয়া বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। যামিনী সর্ব্বাগ্রে নামিয়া উপরে চলিয়া গেল। একবার চোখের জলকে মুক্তি না দিলেই নয়। প্রতাপ ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার পিছন পিছন নামিয়া পড়িল। এ কি অচ্ছেদ্য জালে সে নিজেকে জড়াইতেছে। ইহাই কি শেষে তাহার গলার ফাঁসী হইয়া দাঁড়াইবে?

নৃপেন্দ্রবাবুও উপরে চলিয়া গেলেন। মিহিরকে কাছাকাছি কোথাও না দেখিয়া প্রতাপ আপিস-ঘরে ঢুকিয়া বসিল। ঘরটি এমন শূন্য যে, কিছুর দিকে চাহিয়া দু-দণ্ড অন্যমনস্ক হইবার উপায়ও এখানে নাই।

কর্ত্তা খানিক বাদে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "মিহিরকে ত কোথাও দেখছি না। বকুনি খাবার ভয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসে আছে বোধ হয়। আপনি আর কেন শুধু শুধু বসে থাকবেন, এমনিতেই ঘণ্টা-দেড়েক আপনার এখানে কেটে গেছে।"

প্রতাপ উঠিয়া পড়িল। হায় রে, এমন অবস্থা তাহার ঘটিয়াছে যে, সকল মানুষের কাম্য যে ছুটি তাহাও প্রতাপের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিনটা তাহার যেন আর কাটিতেই চায় না। এই গৃহখানিতে যতটুকু সময়ের জন্য সে স্থান পায় ততক্ষণই তাহার শান্তি।

বাড়িতে ফিরিতে তাহার তখনই ইচ্ছা করিল না। সেখানে বৃদ্ধা পিসীমার বকুনি শোনা ছাড়া তাহার চিত্ত-বিনোদনের আর অন্য উপায় নাই। রাজুর আজ সারাদিন দেখাই পাওয়া যাইবে না। গজু বেলা একেবারে পড়িয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইবে। সুতরাং প্রতাপ গিয়া কি করিবে?

অন্যমনস্কভাবে পথে পথেই সে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। বন্ধুবান্ধব এমন কেহ তাহার নাই, যাহার নিকটে গিয়া সে দু-দণ্ড বসিতে পারে। পরিচিত অনেক ব্যক্তি তাহার আছে বটে, কিন্তু কাহারও কাছে গিয়া সে

মনে করে না, সেও কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে না। মেসের বাড়ি একবার যাইবে ভাবিল, সেখানের ঋণ সে শোধ করিয়াছে সুতরাং সেখানে যাইতে সঙ্কোচ হইবার কোনো কারণ আর তাহার নাই। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় সে-ইচ্ছা সে পরিহার করিল। রবিবার রাত্রে সেখানে প্রায়ই ভোজ থাকে। সে এখন গেলে সকলে তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবে না, কিন্তু মনে মনে ইহাই ভাবিবে যে খাবারের লোভেই প্রতাপ দিনক্ষণ দেখিয়া অমন সময় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

একটা মাঠে গাছতলায় পা ছড়াইয়া কিছুক্ষণ সে বসিয়া রহিল। শীতের মাঠ শ্রীহীন, শুষ্ক। তৃণের হরিৎ বর্ণটুকুও জ্বলিয়া গিয়াছে। তবু কলিকাতার ইষ্টকপঞ্জরে বন্দীপ্রাণ তাহার খানিকটা মুক্ত স্থান দেখিয়া যেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। বসিয়া বসিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কখন যামিনীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

শীতের কুয়াসা ক্রমে পথ-ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

তাহার গায়ের র‍্যাপারখানা শতছিন্ন বলিয়া মিহিরকে পড়াইতে যাইবার সময় সেখানা সে সঙ্গে লইয়া যাইত না। এখন শীতের হাওয়া তাহার বক্ষপঞ্জরে শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। উঠিয়া পড়িয়া সে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

যামিনী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়াই ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইতেছিল। মা তাহাকে যেন একেবারে অসহায় করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। এতদিনকার জীবনে কোনও একটা দিন সে মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই। কি করিয়া সে সংসার চালাইবে, আবার নিজের পড়াশুনা করিবে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখিবে, তাহা ভাবিয়াই সে আকুল হইয়া উঠিল।

প্রতাপের কথা কয়েকবারই তাহার মনে হইল। ভারি ভদ্র মানুষটি, পরের সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কত দিনেরই বা এ বাড়ির সঙ্গে তাহার পরিচয়, তবু কত সাহায্যই তাহাকে দিয়া পাওয়া গেল। কিন্তু

জন্য বিশেষ ভাবে করিবার তাহার কিছু কারণ আছে? আছে হয়ত। যামিনীর গালের কাছটা একলা ঘরে বসিয়াই খানিকটা রাঙা হইয়া উঠিল। একটা মধুর কল্পনার আবেশ তাহাকে পাইয়া বসিল। উপন্যাসে কাব্যে যত প্রেমের রঙীন চিত্র সে অঙ্কিত দেখিয়াছে, সবগুলি নিজের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনে নূতন রূপে উদিত হইতে লাগিল। সে ছবিগুলিতে তাহার পাশে কে? সে কি প্রতাপ? হইলেও হইতে পারে। এখন তাহার কল্পলোকের প্রেমিকের মূর্তি যামিনীর মনে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ক্রমশঃ

পুনরাগমনায়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বছরের ফুল বাসি হয়ে গেল, চৈত্র-পাপড়ি পড়িল খসি',
রিক্ত-শস্য শূন্য ধরণী সন্ধ্যা-হাওয়ায় উঠিল শ্বসি';
মহাকালগলে পদ্মবীজের মাল্য-গুটিকা জপের শেষে
মুদ্রিত-আঁখি রুদ্র তাহার পূজার অর্ঘ্য লভিল হেসে।

যে ফুল কুড়ায়ে সাজায়েছি ঘর, যে ফুলে যতনে ভরেছি ডালা,
যে ফুল তুলিয়া আপন খেয়ালে মনের মতন গেঁথেছি মালা,—
সে ফুল ঝরেছে; সুত্রটি তারি গন্ধমাখা যা' দুলিছে গলে,
বাসনার তীরে বসি' আজি তারি তর্পণ করি নয়নজলে।

কত সুখসাধ কত অপরাধ কত আশা কত মধুর স্মৃতি
ডোরের মাঝারে বন্ধন হয়ে বক্ষে কেবলি বাজিছে নিতি;
যত-না পরশ যত-না গন্ধ যত রূপ যত বর্ণ ফুলে—
সবি কি স্বপ্ন, সকলি কি মোহ—বন্ধনই শুধু সবার মূলে?

নয় নয়, ওগো নয় তাহা নয়, বন্ধন যাহা মুক্তি তাই,
বৈশাখী বীজে শঙ্কর নিজে ফলায় তাহারি সত্যটাই!
নূতন গন্ধে ভরে যে ভুবন, নূতন বর্ণে যে ফুল ফুটে,
নবীন হরষে প্রাণের পরশে মাল্যে ফিরি' তা ভরিয়া উঠে।

পিঙ্গল-আঁখি কালবৈশাখী যতইনা হানুক ভ্রান্তিভয়,
অতীতের বল—হয় তা সফল তারি মাঝে করি মৃত্যুঞ্জয়;
নূতনের ফুল আজি যা মুকুল—উঠে তা ফুটিয়া মেলিয়া দল,
অর্ঘ্যের সাজি ভরে সে আবার লভি বেদনার অশ্রুজল।

বছরের ফুল বাসি হয় যাহা, মহাকালগলে লভিয়া ঠাঁই
পদ্মমালার গুটিকারই মত আবার ফিরিয়া আসিবে তাই!
আশা-নিরাশায় হরষে-ব্যথায় ফুটে যার লীলা কমলদলে
ভাল বা মন্দ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অর্পিনু তারি চরণতলে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ

রবীন্দ্রনাথ যে-দিন প্রথম সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে ঘেরিয়া সমালোচনার জাল বোনা সুরু হইয়াছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে সমালোচ্য বিষয়ের সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী ছিল না। রাজনীতির স্রোত সে-দিনে মৃদুমন্থর গতিতে বহিত— অন্ততঃ ছাত্রেরা তাহাতে বড় ঝাঁপ দিতেন না। আমাদের সে-দিনে যে-সকল বিষয় লইয়া সমালোচনা চলিত, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গল্প-নাটকই ছিল প্রধান। ইহার মধ্যে প্রতিকূল সমালোচনার বহর নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা গান গায়িতে বলিলে রবিবাবুর গান গায়িতাম, অন্য গান লোকে তেমন শুনিতে চাহিত না। আবৃত্তি করিতে হইলে রবিবাবুর কবিতা নহিলে চলিত না। মাসিক পত্রে রবিবাবুর নাম নহিলে পাঠকের মন খুশী হইত না।

এই সকল সমালোচনার মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, অনেকে রবিবাবুর লেখা না পড়িয়াই সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেন। অর্থাৎ সে সময়ে রবিবাবুর লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করা একটা 'ফ্যাসানে' পরিণত হইয়াছিল। তাহার কারণ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় ছিল। এখনকার মত সেই নবীন বয়সেও তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

আমি জানি না এখনও রবিবাবুর লেখা সম্বন্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের এরূপ বিশাল অজ্ঞতা আছে কি-না। আমেরিকা, জার্ম্মানী, জাপান, রুশিয়া, ইতালী, স্পেন্ প্রভৃতি দেশে যাঁহার কাব্য-উপন্যাস সুপরিচিত, তাঁহার সম্বন্ধে 'জানি না' বলিতে আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে। ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ অজ্ঞতার নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বের আসরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, তাহার কিছু পরে আমার একটি কবি-বন্ধুর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নাম না-ই করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'রবিবাবুর কবিতা বৈষ্ণব কবিতার গন্ধে ভরপুর। তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণে আজ ইয়ুরোপে তাঁহার যশের দুন্দুভি বাজিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রবিবাবুর কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন? ভানুসিংহের পদাবলী? সেগুলির ত তরজমা হয় নি।' তিনি বলিলেন, 'না, তাঁহার অন্য কবিতার কথা বলিতেছি। রবিবাবুর সব কবিতায় চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অমর মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, 'হয়ত বা ঠিক!' কারণ তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত আমার বেশী পরিচয় ছিল না। পরে যখন বৈষ্ণব কবিতা পড়িতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম যে বন্ধুবরের তীর লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কবিতায় বৈষ্ণব ভাবের ছায়া কতখানি পড়িয়াছে, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। আমার মনে হয় যে, বিহারীলালের কবিতা ব্যতীত অন্য কোনও কবিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যেমন বৈষ্ণব কবিতা করিয়াছে। কবি নিজেও তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বলা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতার মূলধন লইয়াই রবীন্দ্র-বাবুর কারবার, তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যিক অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাঁহার কতকগুলি গানে ও কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাম বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বলিয়া চিরদিন উল্লিখিত হইবে। ভারতবর্ষ গীতি-কবিতার

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে যদি বলা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তাহা হইলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় বৈষ্ণব কবিতার অলস তরল গতি আছে, উহারই ন্যায় ছন্দ-বৈভব আছে। বৈষ্ণব কবির পরে প্রেমের উজ্জ্বল মধুর ছবি আর কেহ এমন করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। আর একটি মনোমুগ্ধকর সাদৃশ্য এই যে, বৈষ্ণব কবিতারই মত রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক সোনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে :—

দেবতারে যাহা দিতে পারি,
তাই দিই মানবেরে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবি প্রিয়কে দেবতা করিতে চাহিবেন না, সত্য। কিন্তু মানবের প্রেম যে সেই অখণ্ড প্রেমের প্রাতিভাসিক বিকাশ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আমরা যে রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে—বিশেষতঃ প্রেম সম্বন্ধীয় গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাই না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈষ্ণব কবির প্রেমচিত্রের মধ্যে যাহা সার্ব্বভৌম বা বিশ্বজনীন (universal) তাহারই উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রতিভাবান লেখক বা কবির রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা পড়িলেই যেন কত পরিচিত, কত পুরাতন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন আরও কোথায়ও পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি। নূতনত্ব সত্ত্বেও যে তাহারা অপরিচিতের মত আসিয়া মনের আঙ্গিনায় বিপ্লব বাধাইয়া দেয় না, ইহা একটি আশ্চর্য্য অথচ উপাদেয় সত্য। এই কারণে আমরা বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে যদি বৈষ্ণব কাব্য-প্রতিভার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই—ভাবি, তাহা হইলে তাহার অনুকূলে যথেষ্ট বলিবার আছে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরব বাড়াইবার জন্য বা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক মৌলিকতা খর্ব্ব করিবার জন্য যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে সেরূপ চেষ্টার সমর্থন করা যায় না।

সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম যে, 'শ্রীরাধাই হইতেছেন রবিবাবুর কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য। রাধাই রবিবাবুর কাব্য-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।' একথা শুনিলে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ চমকিয়া উঠেন, তাহা দেখিতে কৌতূহল হয়। লেখক 'উর্ব্বশী' কবিতায় এই রাধা-ভাবের একটা 'এ্যাস্‌পেক্‌ট' দেখিয়াছেন।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।

* *

বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।

ইহার মধ্যে লেখক শ্রীরাধাকে নিঃসন্দেহ রূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহারা এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যে ঐ কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের ছায়া ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

কিন্তু যাঁহারা 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতাটি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রেমিকার ছবি দিয়া তাঁহার প্রেমের অমরাবতী সাজাইয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই। আছেন শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, আর আছেন তপস্বিনী মহাশ্বেতা ও পার্ব্বতী। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও কবি রাধিকার চিত্র বাদ দিয়া প্রেমামরাবতী সাজাইবার কল্পনাও করিতে পারেন না। কেন-না, বৈষ্ণবের প্রেম-নন্দনকাননের কল্প-পারিজাত—শ্রীরাধা!

তবে বৈষ্ণব কবিদিগের অঙ্কিত চিত্রের যে মাধুর্য্য, যে 'অকথিত বাণী মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে' সদাই জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-লুণ্ঠনকারী হৃদয়কে এড়াইবে কিরূপে? বৈষ্ণব সাহিত্যে যাহা-কিছু সুন্দর আছে, তাহাই তিনি আত্মসাৎ করিয়া বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

'দেহের মিলন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন :—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।

জ্ঞানদাসের কবিতায় রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুলতা-ভরা আবেগ বাসনা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলি মোর থির নাহি বাঁধে॥

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহারই কতকটা অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়:—

তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।* (কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথ যে জ্ঞানদাসের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিলেও অনুকরণ করেন নাই, তাহা আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরা পড়ে।

আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

ইহা ঠিক বৈষ্ণব ভাবের অনুকূল নহে। বৈষ্ণবের প্রেম বিলয় কামনা করে না। বৈষ্ণবের মতে প্রেমিক ও প্রেমিকার, ভক্ত ও ভগবানের, উপাস্য ও উপাসকের চির ব্যবধানই অনুরাগের তীব্রতা ও গাঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখে।

বড় সাধে জ্বালিনু দীপ গাঁথিনু মালা
চির দিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন। (গান)

এই যে 'চিরদিনে' দর্শন পাওয়া—ইহা কেবল তিনিই লিখিতে পারেন, যিনি বিদ্যাপতির পদের সহিত পরিচিত।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই পদ গায়িয়া স্বগৃহে শ্রীচৈতন্যের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 'বড় সাধে জ্বালিনু দীপ গাঁথিনু মালা' পড়িলেই মনে পড়ে:—

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥ (বড়ু চণ্ডীদাস)

* তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।—রঘুবংশ সপ্তম।

চিতলোভী নৈনদ্বার অতিহী সূক্ষ্ম কহাঁ বহ
সিন্ধু ছবি হৈ অগাধা।
রোম জিতনে অঙ্গ নৈন হোতে সঙ্গ রূপ লেতী
নিদরি কহত রাধা॥—সূরদাস

শ্রীরাধা বলিতেছেন আমার প্রতি রোম যদি চক্ষু হইত, তাহা হইলে সাধ মিটাইয়া শ্যামরূপ দেখিতাম।

রবীন্দ্রনাথের

এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা
কেমনে আছে সে পাসরি।
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী॥

'ক মন্দ্র মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ' স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?

ভানুসিংহের পদাবলী কবির কাব্যকুঞ্জে প্রভাতী সঙ্গীত। তিনি সেই প্রথম যৌবনে বৈষ্ণব কবিদের ভাব, ভাষা ও সঙ্গীতের মধ্যে যত কিছু সুন্দর আছে, তাহা নিঃশেষে লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে বৈষ্ণব কবিতার তরলিত গতি তাঁহার অনুভূতি-প্রবণ হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের ঢেউ বহাইয়া দিয়াছিল! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলার আর একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বৈষ্ণব কবিতার দ্বারা এইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' পরিণত বয়সের রচনা। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা ও ছন্দ তাঁহারও প্রাণে মাধুর্য্যের ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই বৈষ্ণব ভাবের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তাঁহার কবি-হৃদয় সে-সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্যের সন্ধানে অভিসারে ছুটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথেও আমরা দেখিতে পাই নানা প্রতিকূল অবস্থানের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সৌন্দর্য্যের আহ্বানে বৈষ্ণব কবির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি।

পড়িলেই মনে পড়ে:—

কদম্বের বন হৈতে কি বা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥ (অজ্ঞাত পদকর্ত্তা)

আর ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনোমাঝে!

পড়িলে সেই বিরহ ব্যাকুলা রাধার চকিত চাহনি মনে পড়ে না কি?

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্

অথবা—

কেন বাজাও কাঁকন কন কন
কত ছল ভরে!

যেন একখানি জীবন্ত ছবি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে। সেই যমুনাতীরের নীপনিকুঞ্জ, সেই কদম্ব-কেতকী-যূথীর পরাগমাখা সৌরভ, সেই বাঁশীর আকুল আহ্বান আর গৃহকর্ম্মে শৃঙ্খলিতা অথচ মন যার নিমেষে শতবার 'কদম্ব কাননে ধায়' এমন একখানি রমণীর চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

বঁধু হে ফিরে এস।

* * *

আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস।

এ শুধু আধুনিক কীর্ত্তন নহে; বৈষ্ণব কবিতার জলতরঙ্গ সঙ্গীতে যাহাদের কান বাঁধা, তাহারা যে ইহাতে সেই বৈষ্ণব কবিতারই সুর শুনিতে পায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

এমনি এবং আরও কত ভাবে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। তিনি নিপুণ জহুরীর ন্যায় বৈষ্ণব কবিতার ভাণ্ডারে যে-সকল মণিমাণিক্য ছড়ান আছে, তাহা চুনিয়া চুনিয়া নিজের কবিতা-লক্ষ্মীকে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন:

কো তুঁহু বোলবি মোয়।

একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার একটি কলি বা অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি কেমন সুন্দর ভাবে তাহার অন্তরতম ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন:

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥

---তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, আঁখির অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদপাঁতি, গ্রীবার হার, দেহের সর্ব্বস্ব এবং গৃহের সার। পাখীর পাখা যেমন, মাছের পক্ষে জল যেমন, জীবের জীবন যেমন, তেমনই আমার তুমি। (তবু) হে মাধব, তুমি আমায় বল, তুমি কেমন!

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, কো তুঁহু বোলবি মোয়। তুমি কে, আমাকে বলিয়া দাও। তোমার বাঁশীর স্বর বষামৃতে মিশানো, ('মুরলী বাজায় যেন, বিষামৃতে একত্র করিয়া'—অজ্ঞাত পদকর্ত্তা) তোমার হাসি দেখিয়া ঋতুরাজ বসন্ত ছুটিয়া আসিল, ত্রিভুবন চরণ-কমল ছুঁইবার আশে বিভ্রান্ত মধুকরের মত ধাইল, বলিয়া দাও, তুমি কে! কো তুঁহু বোলবি মোয়।

বৈষ্ণব কবিতার একটি কলির অর্দ্ধাংশ নিজ কবিতায় গাঁথিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিবার যে পদ্ধতি, তাহা নূতন নহে। সার এড্‌উইন আরণল্ড্‌ও গীত-গোবিন্দের ছন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ইংরেজী কবিতায় এইরূপ একটি কলি জুড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

The lesson that thy faithful love has taught him
He has heard;
The wind of spring, obeying thee has brought him
At thy word;
What joy in all the three worlds was so precious
To thy mind?
Ma Kooroo Manini Manamaye
Ah, be kind!
—*The Indian Song of Songs.*

ইহা ঠিক অনুবাদ না হইলেও জয়দেবের ঝঙ্কার যেন কতকটা তুলিতে পারিয়াছে। জয়দেবের কবিতায় 'মাধবে মাকুরু মানিনি মানময়ে' যেমন 'ধ্রু' কলি, অর্থাৎ প্রত্যেক যুগ্মের পরে গায়িতে হয়, আরণল্ডও সেইরূপ প্রত্যেক stanza-র শেষে ঐ কলিটি দিয়া জয়দেবের ছন্দ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' কলিটিও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক stanza-র পরে ধ্রু কলির মত প্রদত্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় ব্রজবুলির সুন্দর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়:

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, হে মরণ, তুমি আমার শ্যামের সমান। অর্থাৎ আমি তোমাকেই বরণ করিলাম। শ্যাম নির্দ্দয় হইলেও তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিবে না, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না; রাধার হৃদয় তুমি কখনও ভাঙিয়া দিবে না।

বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা রাধাকে দিয়া অন্য ভাবে এই একই কথা বলাইয়াছেন:

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥—গোবিন্দ দাস

---হে সখি, আজ মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ তাহা চুকিয়া যাউক।* যদি ঐ ভাবে গোকুলচন্দ্রের সহিত মিলন ঘটে! (মৃত্যু হইলে আমার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চ মহাভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন যেন) প্রভু আমার যেখানে রাঙ্গা চরণ ফেলিয়া চলিয়া যান, আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেখানকার মৃত্তিকা হয়। তিনি যে-সরোবরে স্নান করেন, আমার দেহ যেন সেই সরোবরের জল হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শীতল করে।

এখানে একটি কথা এই যে, বৈষ্ণব কবির সহিত সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। কারন বৈষ্ণব কবির প্রভাবে প্রভাবিত কোনও কবি হয়ত মরণকে শ্যামের সহিত তুলনা করিতেন না। শ্যাম অতুলনীয়, নিরুপম।

মধু রিপু সম নহি দেখিঅ সোহাওন
জে দিঅ তহিক উপামরে।—বিদ্যাপতি
মধু রিপুর তুল্য সুন্দর দেখি না যে তাঁহার উপমা দিব।
(নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ)

মরণ যখন একান্ত কামনার বিষয় হয়, তখন সে কেবল 'ঐছন মিলই যব গোকুল চন্দ'—তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য। নহিলে মরণ কে চায়?

হরি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।—শশীশেখর

বৈষ্ণব কবিতার তরল সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথ বহু পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিতে পারে নাই, নানা কারণে। প্রতিকূল বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের ভাব, ভাষা ও ছন্দ যত দূর ধরিতে পারিয়াছেন, আর কোনও কবি তাহা পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য বা অন্য কোনও সাহিত্য হইতে তিনি যদি উপকরণ লইয়া নিজের অনন্য-সাধারণ অনুভূতির রসে পাক করিয়া পরিবেষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কোনও হানি নাই। জয়দেবের গীতি-কবিতা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাস যে তাঁহার অমর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কবি-যশ একটুও ম্লান হয় নাই। গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াও বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অবলীলাক্রমে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ধনে ধনী হইয়াও অমরতা লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার নিকটে কি পরিমাণে ঋণী। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার আভাস আছে, কোথায় কোন্ গানে কীর্ত্তনের সুর বাজে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে বহুকালব্যাপী গবেষণা আবশ্যক। অসামান্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের ইতিহাস যে-দিন গ্রথিত হইবে, সে-দিন বুঝিতে পারা যাইবে বৈষ্ণব কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিত্ব কোথায় ও কতখানি।

বৈষ্ণব কবিতার সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাদৃশ্য যতই থাক্, ইহা বলিতেই হইবে যে সে-সাদৃশ্য ঐ সাহিত্যের অতি অল্প অংশ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে গানে নাটকে ও প্রহসনে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় যে বিরাট সৃষ্টি-শিল্পের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া অল্পই স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে অপূর্ব্ব কাব্যভোজে তিনি আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে নানা রসের পরিবেষণ হইয়াছে। বৃন্দাবনের মনোহরা তাহাতে একমাত্র মিষ্টান্ন নহে।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি কবির যে অসাধারণ অনুরাগ আছে, তাহার বহু প্রমাণ তাঁহার লেখা হইতে সংগ্রহ করা যায়। বাউল ও কীর্ত্তনের সৌন্দর্য্য তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতা অভ্রান্তভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এ গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;—

এ উক্তি মুগ্ধ ভক্তের উক্তি, শ্রদ্ধার প্রস্ফুট কুসুম-সম্ভার। আমার মনে হয় কোনও কবি, কোনও কালে বৈষ্ণব কবিকে এইরূপ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন কি-না

* বিরহে মরণমেব নির্দ্বন্দ্বং নির্ব্বিরোধমিত্যর্থঃ —রাধামোহন ঠাকুরের টীকা। অর্থাৎ এতদিন আমার দেহ লইয়া মৃত্যু ও বিরহের

করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পথের কোন্‌খানে মহাজনদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হইল। কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
> ......একি শুধু দেবতার ?

তিনি বলিতে চাহেন :—

> বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
> চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
> বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
> অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
> লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহ তরে...

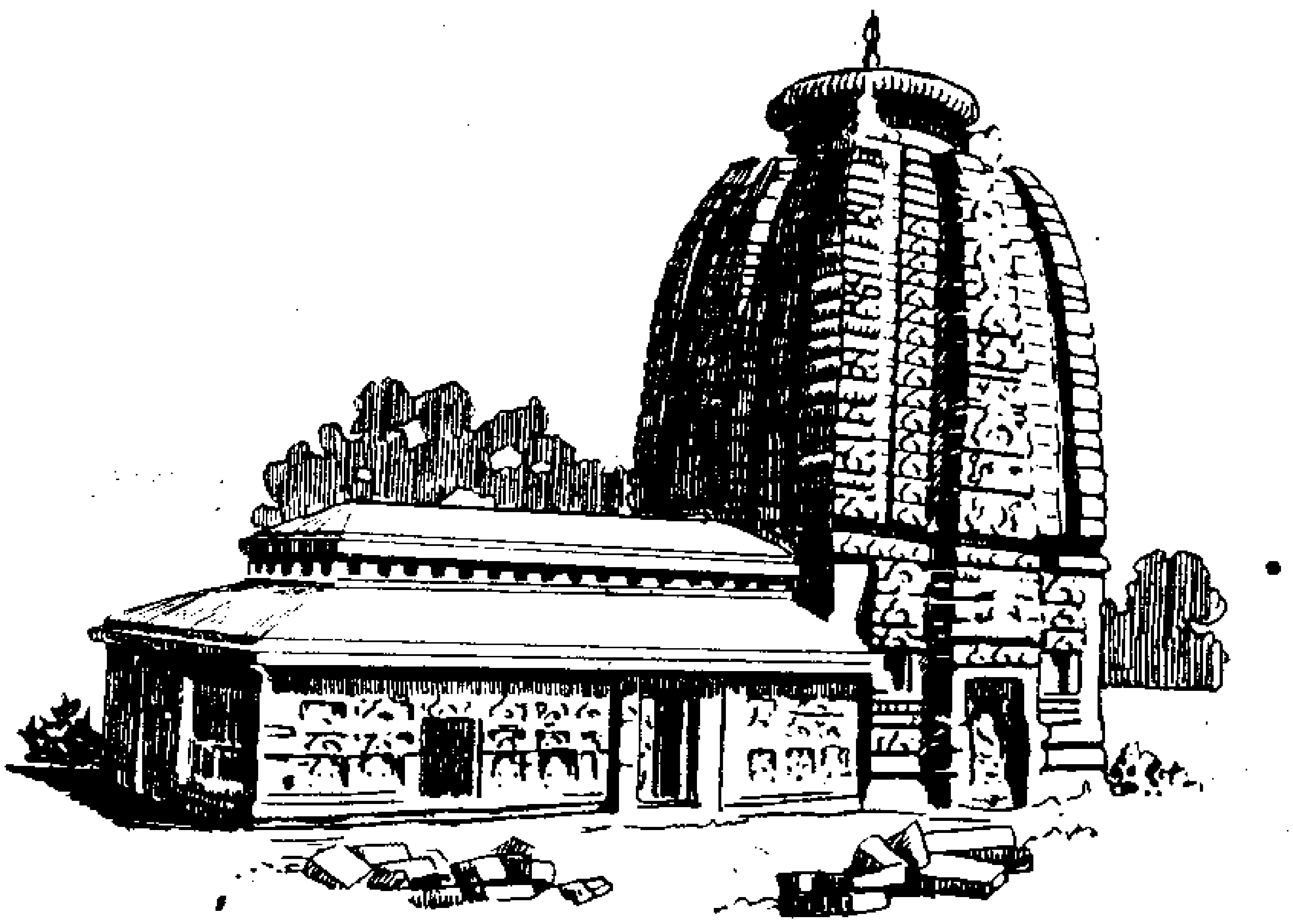
এইখানেই কবি বৈষ্ণব ভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গেলেন।

> কেহ দেয় তারে, কেহ বঁধুর গলায়।
> দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয়জনে।... ... ...

ইহা শুনিতে যতই সুন্দর হউক, বৈষ্ণবের ভাব এখানে রক্ষিত হইল না। কে প্রিয়? কার তরে এই গান? বৈষ্ণব বলিবেন—তাহার প্রিয়তমের জন্য, চির কিশোর কিশোরীর নিমিত্ত—মানুষের জন্য কখনও নহে। যাহা অনিত্য, যাহা মরণশীল, তাহা প্রেমের বিষয় হইতে পারে না। কাম ও প্রেম, লালসা ও প্রীতি পৃথক বস্তু। কাম-লালসা পার্থিব, নশ্বর, সংসারেরই মত অনিত্য। প্রেম,প্রীতি স্বর্গীয়? না; একমাত্র বৃন্দাবনের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রেমতরু বাঁচে না। ইহাকে ব্রজ ছাড়া করিও না; তাহাতে প্রেমও থাকিবে না, তোমারও বিপদ হইবে।

> ব্রজ বিনা অন্যত্র ক্রিহার নাহি বাস।—চৈতন্যচরিতামৃত

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাব ছুঁই ছুঁই করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দের মন্দিরের অনতিদূরেই ভাষার তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুই-ই অপূর্ব্ব, দুই-ই সুন্দর। রবীন্দ্রের কাব্য শুধু ভক্তের জন্য নহে, তাঁহার সঙ্গীত সবই ধর্ম্মসঙ্গীত নহে। তাঁহার বহু কবিতা আছে, যাহা বৈষ্ণব ভাবের ধার ধারে না। মানব-চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি অসামান্য অনুভূতির বলে তিনি যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এমন কোনও কবি পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতির নব নব বিভ্রমশালী সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় যেমন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন বৈষ্ণব কবিতায় নহে। তাঁহার 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' উপমাহীন। তাঁহার বহু কবিতা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রসে ভরপূর, অথচ তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার গন্ধমাত্র নাই।



পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—(১৫-১৬ খণ্ড)---শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। বীরভূম, রতন-লাইব্রেরী হইতে শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিত্রাভিধান। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে শিবরতনবাবু এই গ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষণে সেই কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। মাতৃভাষানুরাগী বাঙালীর নিকট এই গ্রন্থের যথাযোগ্য সমাদর হইলে আমরা সুখী হইব।

মফস্বলে বসিয়া এরূপ গ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এই কারণে গ্রন্থের স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আলোচ্য খণ্ডেও কিছু কিছু ভুল আমাদের নজরে পড়িয়াছে। সেগুলি না থাকিলে পুস্তকটি নিখুঁত হইত। যে-ভুলগুলি চোখে পড়িয়াছে তাহার দুই-চারিটির উল্লেখ করিতেছি।

(১) ৬১৪ পৃষ্ঠায় আছে :—"মদনমোহন গোস্বামী—'পরিদর্শক' নামে বাঙ্গালার প্রথম দৈনিক পত্রের অন্যতম সম্পাদক।···বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রথম প্রাত্যহিক-সংবাদপত্র···১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে (১৮৬০ খ্রীঃ, ১৫ই এপ্রেল)···প্রকাশিত হইয়াছিল।" শিবরতনবাবু যে এরূপ গুরুতর ভুল করিবেন তাহা আমরা সত্যই আশা করি নাই। বাংলার সর্ব্বপ্রথম প্রাত্যহিক পত্র 'পরিদর্শক' নহে,--কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬) হইতে "বারত্রয়িক" 'সংবাদ প্রভাকর' প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়।

ইহা ছাড়া 'পরিদর্শক'-এর প্রকাশ-কাল দিতেও শিবরতনবাবু একটু ভুল করিয়াছেন। প্রাত্যহিক 'পরিদর্শক' ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়,—১৮৬০ সনের এপ্রিল মাস হইতে নহে। ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ', ১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৯ দ্রষ্টব্য।)

(২) পৃ. ৬০১ :--"ভোলানাথ সেন···১৮৩৮ খ্রীঃ হইতে প্রকাশিত স্বনামখ্যাত 'রসরাজ' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তদানীন্তন নিমক-মহলের দেওয়ান নীলরত্ন হালদার মহাশয়, 'বঙ্গদূতের' প্রতিষ্ঠাব্দ ১৮২২ খ্রীঃ হইতে ১৭ বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন।" এই সংবাদগুলির একটিও ঠিক নহে। 'সম্বাদ রসরাজ' পত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে—কালীকান্ত গাঙ্গুলীর সম্পাদকত্বে। 'বঙ্গদূতে'র প্রকাশকাল ১৮২২ নহে,—১৮২৯ সনের ১০ই মে। নীলরত্ন হালদার ১৭ বৎসর 'বঙ্গদূত' সম্পাদন করেন নাই, করিয়াছিলেন মাত্র এক ৎসর ; তৎপরে ভোলানাথ সেন কিছুদিন কাগজখানি পরিচালন করেন। ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে আমি এ-বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

৩) পৃ. ৬১০ :—"মথুরানাথ গুহ—'দুর্জ্জয় দমন মহানবমী' নামক পাক্ষিক-পত্রিকা সম্পাদক। এই পত্রিকাখানি ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রীঃ) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ হইতে পাক্ষিক-পত্র রূপে···প্রকাশিত হয়।"

শিবরতনবাবু সর্ব্বত্রই এই কাগজখানির 'দুর্জ্জয় দমন মহানবমী' এই নাম লিখিয়াছেন। উহার প্রকৃত নাম 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' যে প্রথমে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়,—পাক্ষিক রূপে নহে--ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১১ মার্চ্চ ১৮৪৭) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন'টিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

'এই দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রিকা প্রকাশের নিয়মিত দিবস স্থির করা যায় নাই, মাসের মধ্যে এক দিবস ইচ্ছামত প্রকাশ করা যাইবেক,···। সম্পাদক মথুরামোহন গুহ।"

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র প্রকাশকাল ১৮৪৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (১২৫৩, ২৮এ মাঘ),—এই তারিখটি দিতে শিবরতনবাবু ভুল করিয়াছেন।

(৪) পৃ. ৬৩১ :—"মাইকেল মধুসূদন দত্ত···জন্ম ১২৩০ সাল, ১১ই মাঘ (১৮২৪ খ্রীঃ, ২৫ শে জানুয়ারী) শনিবার।"

যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহাদের গ্রন্থে মাইকেলের যে-জন্মতারিখ দিয়াছেন, দেখিতেছি শিবরতনবাবু তাহাই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন ; কেবল '১২ই মাঘ' স্থলে ভ্রমক্রমে '১১ই মাঘ' মুদ্রিত হইয়াছে। মাইকেলের এই জন্মতারিখ যে নির্ভুল নহে তাহার প্রমাণ ১৮২৪, ২৫এ জানুয়ারি=১৩ই মাঘ ১২৩০, রবিবার হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চম্পারণ সত্যাগ্রহ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত ; খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মাঘ, ১৩৩৮। মূল্য---বাঁধাই বারো আনা, সাধারণ আট আনা।

১৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তকখানিতে মহাত্মা গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহের কথা বিস্তৃত ও বিশদভাবে জানিতে পারা যায়। সতীশবাবু বেহারের জনপ্রিয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্ নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দীভাষায় লিখিত "চম্পারণে (?) মহাত্মা গান্ধী" নামক পুস্তক হইতে ঘটনাভাগ অনুবাদ করিয়া যাহাতে বাঙালী পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হয় তেমন ভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন। পনেরো ষোল বৎসর পূর্ব্বে এই আন্দোলনেই মহাত্মাজী ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের কথা অল্পদিনে তৃতীয়বার প্রচার করেন, এবং স্বয়ং কারাবরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে "চম্পারণ সত্যাগ্রহ" অবশ্যপাঠ্য, চম্পারণ তাঁহাদের নিকট উপেক্ষার বিষয় নহে। পুস্তকখানির পূর্ব্বভাগ সুরচিত, ও সমস্তটাই সুন্দর হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সংস্করণের জন্য দু-একটি বিষয়ে সঙ্কলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি : (১) চম্পারণের একটি মানচিত্র দিলে আমাদের মত সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের (যাহার কি না ভৌগোলিক জ্ঞান বড় কম) বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত। (২) "আজব দেশ মঝৌয়া"—মঝৌয়া

কথাটার অর্থ দিলে ভাল হইত ; এবং (৩) কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহাদের সংশোধন পরবর্ত্তী সংস্করণে বাঞ্ছনীয়।

গীতার গান্ধী ভাষ্য—মূল, অন্বয়, গান্ধীভাষ্য ও ভাবার্থ শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত। খাদি-প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮, আশ্বিন। মূল্য বাঁধাই ১, অবাঁধাই ৮০ আনা।

অক্লান্তকর্ম্মী সতীশবাবু মহাত্মাজীর গীতাভাষ্য মূল গুজরাটী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের পক্ষে তাহা সহজপাঠ্য করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭ সনের আশ্বিন মাসে হয়, তখন মূল নাম অনাসক্তিযোগই ছিল। ২য় সংস্করণ হইতে সতীশবাবু গান্ধীজীর গীতানুবাদ ও ভাষ্য ছাড়া নিজেরও কিছু দিয়া আসিতেছেন, এই নূতন ভাগের নাম দিয়াছেন গীতা-প্রবেশিকা, তাহাতে গীতার তত্ত্বসমূহ আলোচনা করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর গীতাভাষ্য পড়িয়া দেখিবার মত, আশা করি শিক্ষিত বাঙালী এ সুযোগ হারাইবেন না। গীতার সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের প্রধান কর্ম্মবীর কি বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে দিয়া যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকেও হত্যা করাইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিছু বাধে না, তাঁহার বাণী জীবনের সকল কর্ম্মে অহিংসামন্ত্রের উপাসক মহাত্মাজীর নিকট কি ভাবে পৌঁছিয়াছে, তাহা পড়িয়া এবং বিচার করিয়া দেখিবেন। বাংলায় এই পুস্তকের অনুবাদ, প্রকাশ ও প্রচার করিয়া সতীশবাবু বাঙালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

তবু কেন সতীশবাবু বলেন যে, "গীতার সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলার নাই, যিনি যাহাই বলুন তাহাই পুনরুক্তি হইবে।" (॥৵০) মহাত্মাজীর যদি নূতন কিছু বলার না-ই থাকিবে তবে কি আর তিনি নূতন করিয়া ব্যাখ্যা লিখিতে বসেন? তাঁহার ত আর 'কলম-কণ্ডূয়ন' নাই! আর একস্থানে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "গীতার ন্যায় গ্রন্থের উপর গান্ধীজীর ন্যায় অনুভব-জ্ঞানী পুরুষ যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া লওয়ার মত নির্ভরতা আসিলে পাঠকের বিশেষ উপকার হইবে—অথচ বিক্ষেপ হইবে না।" (॥৵০)—গান্ধীজীর সকল মতই যেন বিচার করিয়া যুক্তি দিয়া আলোচনা করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, সে-কথা মহাত্মাজী বার-বার বলিয়া গিয়াছেন, ইহার বিপরীত করিলে তাঁহার অবমাননা করাই হইবে। শঙ্করাচার্য্য ও গান্ধীজী, এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রদৃষ্টির যে বিরোধ তাহা সতীশবাবু 'সময়ের দূরত্ব, ও সেই হেতু সমাজের অবস্থাগত প্রভেদ জন্য ঘটিয়াছে,' এই কথা বলিয়া কাটাইয়া দিতে চাহেন ; কিন্তু এ কথা মনে ধরিবার মত নয় ; লোকমান্য তিলক মহারাজ ত বেশী দিন পরলোকগত হন নাই, তাঁহার গীতারহস্য ও গান্ধীভাষ্য ইহাদের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনায় সতীশবাবুর ভূমিকায় আচার্য্য শঙ্কর ও মহাত্মা গান্ধীর ব্যাখ্যার মূল কথা পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম।

বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণগত প্রভেদ যখন বাংলায় করাই হয় না, এবং সতীশবাবু যখন বাঙালী পাঠকের জন্যই পুস্তক লিখিয়াছেন, তখন এই প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টায় (কোনও কোনও স্থানে এই প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টায় উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে, ঠিকে ভুল হইয়াছে) অযথা শক্তি ও সময় ব্যয় হইয়াছে মনে করি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

"পূর্ব্বাপর"—শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য। গোপাল পাবলিশিং হাউস, ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

বইখানি ১৫৩ পাতায় সম্পূর্ণ একখানি উপন্যাস। লেখকের "প্রেমে ঝাঁপাইয়া পড়িবার" সাহসটুকু ছাড়া আপাতত আর কিছুরই প্রশংসা করা গেল না। না-আছে চরিত্রের একটা পরিণতি, না-আছে ভাষার বাঁধুনী, না-আছে উদ্দেশ্যের একটা ঠিক-ঠিকানা। এক কথায় বলিতে গেলে বইখানি পূর্ব্বাপরই অসঙ্গতিদুষ্ট।

নায়ক মুরলী একটি দুঃখবিলাসী জীব। সে সংসারের স্বার্থপরতা, আভিজাত্যের অত্যাচার, ভালবাসা আর বিবাহের অসারতা এই সব বড় বড় কথা বলে ; কিন্তু তাহার নিজের চরিত্রের দীনতা কখনই তাহার মধ্যে বিদ্রোহীর তেজস্বিতা আনিয়া দিতে পারে নাই—যাহা বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। নিজের আশ্রয়দাত্রী সদ্যবিবাহিতা সিপ্রার সর্ব্বনাশ করিয়া যখন গভীর রাত্রে সভ্যতাবিরোধী মুরলী তাহাকে লইয়া পলায়নপর, তখন রেবাকে বলিতেছে—"আপনি সারা জীবন কামনা কোরবেন, যেন আমরা মনে প্রাণে পশু হোয়ে যেতে পারি, তার চেয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আর কিছু নেই···"

আমরা বলি—"তোমরা সর্ব্বতোভাবে তাই হোয়ে গেছো, আর খেদ কোরে কাজ নেই ; কারণ লেখক তোমাদের শিব গোড়তে বাঁদর গোড়েই ফেলেচেন, আর্টের দিক দিয়াও, আদর্শের দিক দিয়াও।"

ভাষার মধ্যে পুনরুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান হইয়া চরিত্র-সমষ্টি ও আখ্যানভাগের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নজর রাখিলে লেখকের ভবিষ্যতে আশা যে একেবারেই নাই এমন নয় ; তবে সে-ভবিষ্যৎ এখনও খানিকটা দূরেই বলিয়া মনে হয়।

ছাপা বাঁধাই ভাল। দাম ১॥০

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

যোগরহস্যম্ বা পাতঞ্জলযোগদর্শন—বরাহনগর সাধনসমর আশ্রম হইতে শ্রীগদাধর বগড়িয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে এক একটি সূত্র এবং তৎপরে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দেবনাগর অক্ষরেই সংস্কৃতে সূত্রের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আছে। তারপর বাংলা অক্ষরে গ্রন্থকারের দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা। আলোচনায় তাঁর নিজের মতই দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থ হইতেও স্বমত-পোষক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি "অবতরণিকা"য় স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এই পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষিপ্রণীত সূত্র-সমূহের অনুভবসিদ্ধ সরল মর্ম্মার্থই বিবৃত হইয়াছে।" তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যার জন্য "ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষি" দায়ী নহেন, ইহাই তাঁহার উক্তির উদ্দেশ্য বুঝিতেছি। গ্রন্থকার যে নিজের কথাই বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে বেশী দেরি হয় না। "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" এই প্রসিদ্ধ সূত্রের তিনি অর্থ করিতেছেন "ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই যোগলাভ হয়" (পৃ. ৭৮)। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই যোগের নানা উপায় বর্ণিত হইয়াছে ; এখন ঈশ্বর প্রণিধানকে অন্যতম উপায়রূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যদি "ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই" কেবল "যোগ" হইত—"হইতেই" কথাটা হইতেই তাই বুঝায়—তবে অন্য উপায়ের বর্ণনা নিরর্থক হয়। ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষির পক্ষে ইহা সম্ভব কি? সুতরাং "হইতেই" না হইয়া 'হইতেও" হইবে। বিকল্পবিধানরূপে "ঈশ্বর"কে উপস্থাপিত করিয়া পতঞ্জলি নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বর করিলেন। পাতঞ্জল-দর্শনের নাম "সেশ্বর সাংখ্য"ও বটে। গ্রন্থকার ঈশ্বরবাদী, সুতরাং তিনি ঈশ্বরের বিশেষ স্থাননির্দ্দেশের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহার এই ব্যস্ততা "ঈশ্বর" শব্দের ব্যাখ্যায় আরও বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী তিনটি সূত্রে (২৪, ২৫, ২৬) বর্ণিত আছে—"যিনি ক্লেশ, কর্ম্ম-বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট এরূপ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর"। গ্রন্থকার অনুবাদে "পুরুষবিশেষ" কথাটা পরিহার করিয়াছেন (পৃ. ৮০); "তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞবীজ" (আছে), এবং (সেই ঈশ্বর) "পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গুরু, যেহেতু তাহাতে কালের অবচ্ছেদ নাই"। এই ঈশ্বর যে সাংখ্যের একটি "মুক্ত পুরুষ" সে-বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না অথচ গ্রন্থকার নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, এই যোগশাস্ত্রে যেরূপভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া গেল, ইহার সহিত বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ঈশ্বরের কোন বিলক্ষণতা নাই। এই জন্যই কি গ্রন্থকার "পুরুষবিশেষ" কথাটা পরিহার করিয়াছেন? বেদান্তের ব্রহ্ম আর যা-ই হউন না হউন, "পুরুষবিশেষ" নহেন, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? পাতঞ্জলের পুরুষবিশেষ সাংখ্যের বহু পুরুষের মধ্যে একটি মুক্তপুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম বহুদূরে। বৈদান্তিক আলোচনায় যে পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দগুলির সময়ে সময়ে পার্থক্য প্রদর্শিত হয় গ্রন্থকার তাহার সঙ্গে পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। তাই বলিতে সমর্থ হইয়াছেন "কেবল আর্য্যশাস্ত্রানুযায়িগণের নহে, অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণেরও ঈশ্বর পৃথক্ নহেন" (পৃ. ৮১) ঈশ্বর এক, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা নানা "মুনি"র নানা রকমের; ইহা এত প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অনুমান-বলে বা গায়ের জোরে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহা হউক, এই প্রায় ৫০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহা না পাইয়া, নিরাশ হইয়াছি। এই এতবড় গ্রন্থে সেই প্রাচীন প্রথানুযায়ী কতকগুলি শব্দের মারপ্যাচেই আলোচনা চলিয়াছে। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দ্বারা তথ্য পরিষ্কার করিবার নূতন প্রণালী একেবারেই বর্জ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের শাস্ত্র-নিষ্ঠা আছে, "গুরুকৃপা"ও পাইয়া থাকিবেন, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট অন্যতম তত্ত্ব, স্বানুভূতি, ব্যবহার করেন নাই, গতানুগতিক পথে চলিয়াছেন। তবে গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় আছে, সুতরাং এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে এই পুস্তক আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বেদান্তবাগীশ

সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এস-সি, এম-বি প্রণীত। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রায় ১৫০টি কবিতায় সজ্জিত। গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ ভূমিকার প্রারম্ভে জানিতে পারা যায় যে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁহার বিভিন্ন বয়সের রচনার একত্রীভূত সমষ্টি। তিনি এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে বারোমেসে গাছের আম্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"ইহার অধিকাংশ কবিতাই মুকুলে ফলে কাঁচায় ডাঁসায় একত্রে বর্ত্তমান।" লেখকের উক্তি সত্য হইলেও তাঁহার কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহা "মুকুলে ফলে কাঁচায়-ডাঁসায় একত্রে বর্ত্তমান" থাকা সত্ত্বেও পাঠক-চিত্তকে সুগন্ধে আমোদিত করে। পরিপক্ব হস্তের কবিতাও এই গ্রন্থে অনেকগুলি আছে, উদাহরণ-স্বরূপ 'অভিনেত্রী', 'বর্ষান্তে', 'কবির', 'বহ্বস্যাম্', 'শ্যামনটরাজ' প্রভৃতি কবিতাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সাঁঝের প্রদীপ' স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল এবং তাহা দেবমন্দিরকে আলোকিত করিবে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। দাম দেড় টাকা।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গীতিগুঞ্জ—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন প্রণীত। প্রকাশক—বাণী-বিতান, ২ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২১৬। মূল্য—কাগজের মলাট ১॥০।

গ্রন্থকারের 'কয়েকটি গান' ও 'কাকলি'তে যে-সকল গান প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে যে-সকল নূতন গান রচিত হইয়াছে, তাহাই একত্র গ্রথিত হইয়া 'গীতিগুঞ্জ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে এগুলির মধ্যে এমনই একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্য গানের মধ্যে দুর্লভ। এই অসাধারণ গুণের জন্য শিক্ষিত বাঙালী সমাজে অতুলপ্রসাদের গানের এত আদর। আমার মনে হয়, এই সকল গানের মধ্য দিয়া তিনি বাঙালী জাতির মনকে যে-ভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, অনেকে তাহা পারেন নাই। আজকাল স্বদেশী সঙ্গীতই হউক, অথবা মিষ্ট কোন গান হউক, অতুলপ্রসাদের গান যেমন জনপ্রিয়, এমন আর কোনও গান আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার 'বল বল সবে', 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মী', 'হও ধরমেতে ধীর', 'মোদের গরব মোদের আশা' প্রভৃতি স্বদেশ-সঙ্গীত তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার গানে যে শুধু স্বদেশ-প্রীতির শতবেণুবীণা বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার সকল গানেই ভাষার অলস তরলতা, কল্পনার তরুণ মোহ এবং সুরের কোমল মাধুর্য্য রহিয়াছে। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী দিলীপকুমার, প্রতিভাময়ী গায়িকা সাহানা দেবী প্রভৃতির মুখে অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়াছেন দেখিয়াছি। অতুলপ্রসাদ নিজেও সুরের যাদুকর। যে-কোনও সুর তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্‌ভাবনী শক্তির প্রভাবে কোমল মূর্চ্ছনায় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে। তাঁহার প্রত্যেকটি গানের মধ্যে সুরের অভিনব শিল্পচাতুর্য্য থাকে। গতানুগতিকতার দ্বারা তাঁহার কল্পনা বা সুরসৃষ্টি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকগুলি কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীত তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহারও মধ্যে এমন একটি তুলির টান, এমন একটি সুরের মীড় আছে, যাহাতে সেগুলি অতি উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে বন্ধু আমার!' 'পরাণে তোমারে ডাকিনি হে হরি, ডেকেছি শুধুই গানে', 'ওরে বন, তোর বিজনে সঙ্গোপনে কোন উদাসী থাকে', 'প্রকৃতির ঘোম্‌টাখানি খোল্‌লো বধূ, ঘোমটাখানি খোল্', 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে, ও আকাশ বল্ আমারে' প্রভৃতি গান এমন একটি কোমলতায় ভরা, যে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। এই সকল গান বাংলার আধুনিক অপ্রচুর সঙ্গীত-সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি মনে করি। বাদল রাতে গাছের পাতায় যখন ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি পড়ে, তখন যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় কোমল মধুরিমায় চোখের পাতা আপনি জুড়িয়া আসে, অতুলপ্রসাদের গানে তেমনি একটি স্বাভাবিক তরল মাধুর্য্য আছে যাহা ভাষায় ব্যক্ত হইতে চাহে না। একদিকে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর কবিসুলভ কল্পনা, অপরদিকে তাঁহার সুরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য—এই উভয়ে 'গীতিগুঞ্জে'র গানগুলিকে অতি সরল ও উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গীত-রসজ্ঞগণ ইহা হইতে প্রচুর আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র—মৌলভী একরামদ্দিন প্রণীত এবং কুলিয়া, বড়ৈর, বর্দ্ধমান হইতে শ্রীযুক্ত সুরল আবসার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

বইখানি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমালোচনা অন্যান্য উপন্যাসের

তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসখানিতে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, তাহা দেখানো গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। তাই নাম লইয়া একটু গোলে পড়িতে হয়। প্রথমে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পটি কিরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা আছে। তাহার পর চরিত্রগুলির সমালোচনা এবং নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ছোট হইলেও বইখানিতে কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'আদি বাংলা ভাষার জনক' নহেন, এবং অক্ষয়কুমার দত্তও 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী' নহেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাঙালী সমাজ।—শিবচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিপ্রসাদ লালা, ৮৯ নং গোলামহল, বারাকপুর। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকার লেখকের সকল মতের আমরা সমর্থন করিতে না পারিলেও তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় প্রীত হইয়াছি। ইহা সকল ধর্ম্মাবলম্বী বাঙালীর পড়িয়া দেখা উচিত।

বহিখানির গোড়ায় লেখক "প্রকাশ" নাম দিয়া যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নীচের কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাঙালী নরনারীর পানভোজন বিবাহে পূর্ণ স্বাধীনতা সর্ব্বদা বিদ্যমান। বাঙালীর মধ্যে জন্মগত কায়েমী উচ্চনীচ জাতিবিভাগ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। বাঙালী সমাজে জাতিবিশেষের সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রদানে এবং পৌরোহিত্যে জন্মগত একচেটিয়া অধিকার স্বার্থপরতার এবং অবিচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাঙালী কন্যার বাধ্যতা-মূলক বিবাহ বাঙলার নারীজাতির উপর দারুণ নৈতিক অত্যাচার; এবং অবরোধ দ্বারা নারীকে উচ্চ শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত করাতেই বাঙালীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। এইগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের মোটামুটি অভিমত। উক্ত অভিমতগুলিকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।"

স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং স্বামীজীর মতামত ঐরূপ ছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখিবার সাধ্য নাই। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, স্বামীজী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মণ্ডলীর সন্ন্যাসীদিগকে এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দকে কার্য্যতঃ নিজের মতানুবর্ত্তী করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বামীজীর আগে হইতেই ব্রাহ্মসমাজ ঐরূপ অনেক মত প্রকাশ এবং আচরণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; এবং এখনও করিতেছেন। যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজের সহিত স্বামীজীর যোগও ছিল। সুতরাং এবিষয়ে স্বামীজীর নিজস্ব মত কতটুকু এবং কৃতিত্ব কতটুকু, তাহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইলে ভাল হইত।

অবশ্য, সামাজিক আদর্শ স্থাপন বিষয়ে স্বামীজীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে চেষ্টা লেখক যে মোটেই করেন নাই, তাহা নহে। তিনি ১৭-১৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,

"রামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে অনুপ্রাণিত আমাদের বিবেকানন্দ যে সমস্ত উদার সামাজিক আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গৃহস্থভক্তেরা সেই সকল উচ্চ আদর্শ তেমন ভাবে এখনও গ্রহণ করিতে পারেন নাই; উক্ত আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যমউৎসাহও দেখান নাই। তাঁহার সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থদিগকে ঐ সকল উদার সামাজিক আদর্শ অবলম্বন করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন নাই। হয় তাঁহারা স্বামীজীর

ইহার পর লেখক বলিতেছেন, "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ চাপা পড়িবার নহে, নষ্ট হইবার নহে। অচিরেই ঐসকল উদার সামাজিক আদর্শগুলি একজনে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। তিনি আমাদের বাংলার সমাজবীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।"

এই কথার সমর্থন হিসাবে লেখক চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের নিজে অসবর্ণ বিবাহ করা, ভগিনীর কায়স্থের ঘরে বিবাহ দেওয়া, তাঁহার এক সহোদরের ইংরেজ-কন্যা বিবাহ করা, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের পিতামাতা ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ব্রাহ্মের কন্যা, অধিকাংশ আত্মীয় ব্রাহ্ম, অসবর্ণ বিবাহ স্বামী বিবেকানন্দ কেবল কথায় সমর্থন করিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজ কথায় ও তদনুযায়ী কাজে উহার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন; তথাপি চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যে সমাজবীর, তাহার কারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ, এরূপ বলার সঙ্গতি বা যাথার্থ্য কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রশংসা লেখক করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় বাঙলার যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।" দোষত্রুটি উল্লেখও তিনি করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "ইহার অনেক দোষত্রুটি বাহির হইল। মুরুব্বীরা ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিলেন না।" দোষত্রুটির অন্ততঃ কিছু নমুনা দিলে এবং মুরুব্বীদের নাম দিলে ব্রাহ্মসমাজের উপকার হইত। "যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে, প্রভূত অর্থ আছে এবং হিন্দুসমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে যাঁহাদের মন একটু উদার হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ করিয়া ঐরূপ নরনারী লইয়াই গঠিত হইতে লাগিল।" বিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট লোক, প্রভূত অর্থশালী একআধজন লোক ব্রাহ্মসমাজে আছে। কিন্তু অধিকাংশই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক। লিখনপঠনক্ষম লোকের অনুপাত ব্রাহ্মসমাজে বেশী, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদিগকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত, ইহা সত্য নহে। লেখকের মতে "ব্রাহ্মসমাজে বহুদিন প্রচলিত দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজাপার্ব্বণ না থাকায় সাধারণ লোকেরা ঐ দিকে তত আকৃষ্ট হইল না।" লোকদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট না হইবার ইহা একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অপরিহার্য্য কারণ; কেন না, ব্রাহ্মসমাজ পরব্রহ্মের উপাসক, বহু দেবদেবীর উপাসক নহে।

Annual Report & Audited Accounts of Visva-Bharati for 1931. Price Two Annas only. Visva-Bharati office, 210 Cornwallis Street, Calcutta.

বিশ্বভারতীর এই বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব যথাক্রমে ৪৬ ও ৪৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। রিপোর্টটি পড়িলে বুঝা যায় এই প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানদান, শিক্ষাদান, ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে, এবং পল্লীসংস্কার, পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, গ্রামাশিল্পের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি দ্বারা পল্লীসমাজ পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য কত রকম কাজ বিশ্বভারতী করিতেছেন।

ইহার গবেষণা-বিভাগের নাম বিদ্যাভবন। ইহাতে হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয়, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা, ব্যাখ্যান, পুস্তকরচনা আদি কাজ হইতেছে। সংস্কৃত, পালি, চৈনিক, তিব্বতীয়, পহ্লবী, ফারসী, আরবী, হিন্দী প্রভৃতি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ এবং ফ্রেঞ্চ জার্মেন প্রভৃতিতে মুদ্রিত পুস্তকাদির সাহায্যে গবেষণা হয়। বিশেষ বৃত্তান্ত রিপোর্টে দ্রষ্টব্য।

কলেজ-বিভাগের নাম শিক্ষাভবন। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের

সুতরাং কলেজ এ বৎসর বি-এ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই চলিবে এবং আশা করি বরাবর বি-এ পর্য্যন্ত চালাইবার চেষ্টা হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াতেই ঐরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞাপন না দেখিলে কেবল রিপোর্টের নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি হইতে এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারিত :—

"The question of re-organizing the educational system at Santiniketan, and particularly the Santiniketan College, engaged the attention of the authorities. The question was gone into thoroughly and a new detailed syllabus was drawn up for all classes up to the I. A. Standard. Henceforth more attention will be given to securing girl students in the two college classes."

ছাত্রী লওয়ার দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা আমরাও বাঞ্ছনীয় মনে করি। ভবিষ্যতে যদি বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ কখনও কেবল ইণ্টারমীডিয়েট পর্য্যন্তই কলেজ ক্লাস রাখা সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, তখন ভাবিয়া দেখিবেন, আধখানা কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ও তাহাদের অভিভাবকদের আকর্ষণের জিনিষ হইতে পারে না, ইহাতে শিক্ষাও ভাল হয় না। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের চলন অনেক বৎসর হইতে হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি বেশ ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। রিপোর্টে দেখিতেছি, এই বৎসর শান্তিনিকেতনের কলেজের ছেলেরা মশকের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের যে-পাড়ায় আমরা মধ্যে মধ্যে ছিলাম, সেখানে ঐ সাফল্যের বিশেষ প্রমাণ পাই নাই।

স্কুল-বিভাগের নাম পাঠভবন। ইহার কাজ ভালই চলিয়াছিল। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ পড়াশুনা ছাড়া আরও অনেক রকম কাজ করে। আগামী বৎসর নূতন উদ্যমে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতায় কলাভবনের কাজ উত্তমরূপে চলিতেছে।

কৃষি, গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের শিল্প ইত্যাদি নানা দিকে কাজ করিয়া গ্রামের লোকদিগকে সুস্থ, সচেতন, এবং স্বাবলম্বী করিবার যে চেষ্টা শ্রীনিকেতন দ্বারা হইতেছে, তাহা ক্রমশঃ ফলবতী হইতেছে।

আর্থিক অবস্থা ও হিসাব সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লিখিবার স্থান নাই কোনও প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই লাভজনক কারবারে পরিণত করা যায় না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেশের অন্য কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত বিশ্বভারতী শিক্ষাবিপণিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; লাভের জন্য পরিচালিত ও হয় না সুতরাং ইহার ব্যয় অপেক্ষা আয় যে বেশী নয়, তাহা কাহারও ক্ষোভের কারণ নহে। কিন্তু ঋণ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে, প্রত্যুত তাহা চিন্তার বিষয়। ইহার ঋণ পরিশোধ কেবল প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের কর্ত্তব্য নহে, অন্য সকলেরও কর্ত্তব্য। এই জন্য বিশ্বভারতীর সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং শিক্ষাদান ও আয়ব্যয়ঘটিত সমুদয় ব্যাপারে সভ্যদের মনোযোগবৃদ্ধি ও প্রকৃত অধিকারবৃদ্ধি আবশ্যক। শ্রীনিকেতন যে এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ একজন সদাশয় বিদেশীর অর্থে চলিতেছে, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে সম্মানকর নহে। সাধ্যমত সকল বাঙালীরই ইহার সাহায্য করা উচিত।

কলিকাতায় গত বৎসর রবীন্দ্রনাথের যে সপ্ততিতম জন্মোৎসব হইয়াছিল, তাহা বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান না হইলেও উহার প্রতিষ্ঠাতার জয়ন্তী বলিয়া রিপোর্টে তাহার উল্লেখ অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু জয়ন্তী সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে ভ্রম প্রদর্শনের বা অন্যবিধ সমালোচনার অবসর না থাকিলে ভাল হইত। লেখা হইয়াছে, যে, "গোল্ডেন্ বুক্ অব্ টাগোর" সেলিব্রেশুন্স্ কমিটি দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। সত্য কথা এই, যে, ঐ পুস্তক গোল্ডেন্ বুক্ অব্ টাগোর কমিটি নামক অন্য একটি কমিটি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন এবং এই কমিটির উৎপত্তি ও কার্য্যারম্ভ সেলিব্রেশুন্স্ কমিটির জন্মের অনেক পূর্ব্বে হয়। ইহার কয়েকজন সভ্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই পুস্তক-প্রকাশক-কমিটির সভাপতি রূপেই যে ব্যক্তিবিশেষ কবিকে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার দিনে ঐ পুস্তক উপহার দেন, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই। মেলা ও প্রদর্শনীর জন্য যাঁহারা শিল্পদ্রব্য ধার দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুরের নামের অনুল্লেখ এবং কর্ম্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকদিগের সংগ্রাহক ও পরিচালক এবং চিত্রাদির সংগ্রাহক ও কালানুক্রমে ও যথাযোগ্য স্থানে বিন্যাসক, অন্ততঃ প্রধান এই দুজনের নামের অনুল্লেখ ঠিক্ হয় নাই। রিপোর্টে জয়ন্তীর সম্পর্কে যদি কাহারও নাম না-করা হইত, তাহা হইলে এরূপ কোন কথা বলা আবশ্যক হইত না। রিপোর্টে যতগুলি শব্দের সাহায্যে জয়ন্তী বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় ততগুলি শব্দের দ্বারাই বর্ণনাটিকে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত করা যাইত।

Rise of the Christian Power in India.

By Major B. D. Basu, I. M. S. Second Edition. With 4 maps, and 58 plates, one in colours. R. Chatterjee, Prabasi Office, Calcutta. Price Rs. 15.

ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব কি প্রকারে স্থাপিত হইল, তাহার ইতিহাস ইংরেজরা লিখিয়াছেন, এবং মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের ইতিহাস প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয়েরা এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনুসরণ করিয়া লিখিত। তাহাতে প্রকৃত সত্য বহুস্থলে অপ্রকাশিত থাকিয়া গিয়াছে এবং অপ্রকৃত অনেক কথাও সত্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। স্বর্গীয় বামনদাস বসু মহাশয় বহুবর্ষব্যাপী পুস্তকাদি সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের ফলে তাঁহার এই ইতিহাস রচনা করেন, এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহা প্রকাশ করান। এই ইতিহাসখানিকে আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি। তাহার মানে এই, যে, আমরা ইহাতে কোন ভুল দেখিতে পাই নাই; ইহা নহে, যে, ইহাতে কোন ভুল থাকিতেই পারে না। কারণ, কোন ইতিহাসই সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য এবং নিঃশেষে সমুদয় তথ্য ও সত্যের আধার হইতে পারে না। সুতরাং বসু-মহাশয়ের ইতিহাসে কোনই ভুল নাই এবং উহা যে-যুগের বৃত্তান্ত তৎসম্বন্ধীয় সকল তথ্যই ইহাতে আছে, এরূপ দাবি করা হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে, ইহাতে জ্ঞাতসারে কোন ভ্রান্ত বা মিথ্যা কথা লেখা হয় নাই, এবং ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন সম্বন্ধে অন্য যত ইতিহাসই কেহ পড়ুন না কেন, এই গ্রন্থখানি না পড়িলে ইংরেজরাজত্বস্থাপন-যুগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে না। এই যুগ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত এই পুস্তকখানির সমান বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই। ইহার প্রায় সমুদয় তথ্যই ইংরেজ বা অন্য ইউরোপীয়দের লেখা বহি এবং সরকারী চিঠিপত্র রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। প্রথম সংস্করণে ইহার দাম ২৫ টাকা ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে ৪ খানি মানচিত্র, ১২০ খানি ছবি, অনেক নূতন তথ্য এবং সূচী সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মূল্য কমাইয়া পনর টাকা করা হইয়াছে। ইহা প্রায় প্রবাসীর সমান আকারের ৩১১+১৬ পৃষ্ঠা পরিমিত, এবং পুরু কাগজে সুমুদ্রিত। বাঁধাই বেশ মজবুত।

History of Orissa. By R. D. Banerji. Two volumes. R. Chatterjee. Prabasi Office, Calcutta. Price of each volume Rs. 20; or Rs. 40 for the two volumes.

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ-কাল পর্য্যন্ত এইরূপ একটি ইতিহাস ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেরই নাই। ইহা কেবল প্রচলিত অর্থে ইতিহাস নহে। ইহাতে উৎকলের ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, প্রভৃতিরও বিবরণ আছে। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ইতিহাসখানিতে, বর্ত্তমান সময়ে উড়িষ্যা বলিতে যাহা বুঝায়, সেই ভূখণ্ডের ইতিহাস আছে; তদ্ভিন্ন পুরাকালে আধুনিক বাংলা, বিহার, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে-সকল অংশ উৎকল নৃপতিদের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহারও ইতিহাস আছে। অতএব ইহা কেবল উৎকলীয়দের পঠনীয় নহে, অন্যদেরও বটে। শুধু বর্ত্তমান উড়িষ্যার ইতিহাস হইলেও ইহা সমুদয় ইতিহাস-পাঠকের পাঠযোগ্য হইত। অনেক ঐতিহাসিক ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা অতি উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর রূপে মুদ্রিত, বাঁধাইও ভাল। ইহার প্রথম খণ্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দুই খণ্ডে মোট ১৪১ খানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। তাহার মধ্যে একটি বহুবর্ণে মুদ্রিত, প্রাচীন উৎকলীয় পুঁথির রামরাবণের যুদ্ধের প্রতিলিপি। ছবিগুলি ও তদ্বিষয়ক লেখা হইতে প্রাচীন উৎকলীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাজললতা—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। এম্‌-সি, সরকার এণ্ড সন্স্‌। দাম দেড় টাকা। পৃঃ ২৩৮।

কাজললতা লেখকের নূতন-লেখা বই নয়, তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু এ বইখানাতে তিনি মুন্সিয়ানা দেখাইতে পারেন নাই। বইখানি শেষ করিয়া তাঁর উদ্দেশ্যের গভীরতা সম্বন্ধে যেটুকু অস্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহাতেই আরও বেশী মনে করাইয়া দেয় যে এ ধরণের লেখার ভিত্তি আরও কতটা বাস্তবের উপর সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। লেখক চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, টাইপ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুলতা, উপেন, সত্যেন, মানুর মা—কাহারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। শীতলা ও সন্ন্যাসিনী ত একেবারেই অবাস্তব জীব। সুলতাকে বুঝিতে কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু চরিত্রের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা সৃষ্টিসাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়, একথা লেখক নিশ্চয়ই জানেন। সুলতা কোথাও রক্তমাংসের প্রাণী হইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে না—তার রূপের এত অজস্র বর্ণনা সত্ত্বেও তাহা পাঠকের মনে রং ধরায় না। লেখকের ভাষাটি সুমিষ্ট ও ঝরঝরে। বইখানার ছাপা ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিভূতিষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাথমিক যুযুৎসু—শ্রীসুবলচাঁদ চন্দ্র প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, বেলগাছিয়া, কলিকাতা। মূল্য ৬০ আনা।

আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার যতগুলি উপায় আছে তাহার মধ্যে যুযুৎসু একটি। এই জন্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই পদ্ধতি যতই প্রচারিত ও প্রচলিত হয় ততই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত সুবলচাঁদ চন্দ্র যুযুৎসুর নানা কসরতের চিত্র সম্বলিত এই পুস্তিকাখানি প্রণয়ন করিয়া বাঙালী-মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাতে যুযুৎসু শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক পাঠ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার ভাষার দিকে নজর দিলে পুস্তিকাখানি আরও সুন্দর হইতে পারিত।

লামাদের দেশ তিব্বতে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ।।০ আনা।

এক কালে 'ঘর কুণো' বলিয়া দুর্নাম থাকিলেও বাঙালী যে ঘরের বাহিরে আসিয়া বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়া ইহা উৎরাইয়া উঠিতে সক্ষম, তাহার নানা কার্য্যে আজ তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সাহিত্যের কৃতিত্ব কম নয়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্য দিয়া বাঙালী বালক-বালিকার মধ্যে দেশ-ভ্রমণ প্রীতি জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বন্ধুর পথ, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী, ততোধিক বিপদ—সন্দিগ্ধচেতা তিব্বতী, এ সকলই অতিক্রম করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে পর্য্যটক লামার দেশে উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে তিব্বতবাসীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিরও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আছে। ইহা পাঠে ছেলেমেয়েদের যে শুধু ভ্রমণ-প্রীতিরই উদ্রেক হইবে তাহা নয়, ভিন্ন দেশ ও লোক সম্বন্ধেও তাহাদের নানা জ্ঞান বাড়িবে। রেখ-চিত্র সমাবেশে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভিক্ষার ঝুলি—প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ বসু, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ।০ আনা।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ—ক্ষুদকুঁড়া হইলেও ইহাতে মনের ক্ষুধা মিটাইবার উপাদান আছে। লিপিচাতুর্য্য বিশেষ কিছু নাই তবে আন্তরিকতা আর ভগবদ্ভক্তির সরল স্বচ্ছন্দ প্রকাশের জন্য মন আকর্ষণ করে। পাঠকগণকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মুদ্রাকর-প্রমাদ—যাহা এই সংস্করণে অনেক, আশা করি আবার যদি প্রকাশ করা হয় সম্পূর্ণ সংশোধিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ফরাসী ইম্‌প্রেসনিষ্টদের কথা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

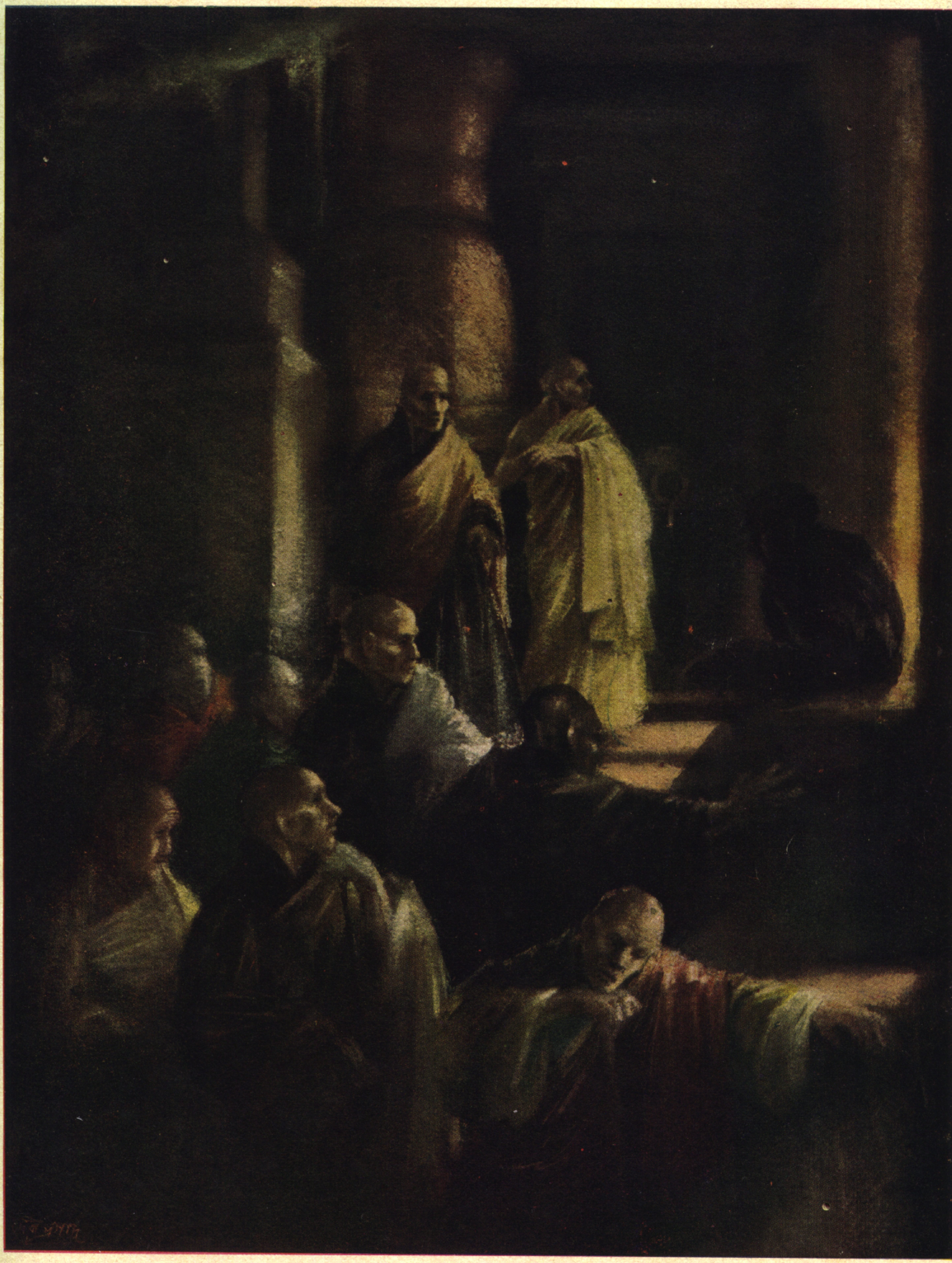
"ঘাসের উপর প্রাতরাশ" (Le déjeuné sur l'herbe) —চিত্রটি হচ্ছে, শহরের এক সুন্দর উপবনে গাছের ছায়ায় দুইটি সুসজ্জিত পুরুষ ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে, তাদের পাশে এক নিরাবরণা নিরাভরণা নারী মধুর-ভঙ্গীতে বসে, তার সুগঠিত তনুর লাবণ্যে চারিদিক উজ্জ্বল; অদূরে ঝিকিমিকি জলের ধারে এক যুবতীর আনত দেহ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে, যেন পদ্মের বৃন্ত হেলিয়ে পড়া; পাশে গাছের গোড়ায় খাবার জিনিষ সব ছড়ান। এডুয়ার মানে-র (Edouard Manet, ১৮৩২—১৮৮৩) এই ছবিটি আজ পারির লুভ্‌র্ চিত্রশালায় সগৌরবে রক্ষিত, দেশবিদেশের লোক তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। তরুণ শিল্পী মানে ১৮৬৩তে যখন এই ছবিটি পারির সালোঁর জন্য পাঠান, সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষ ছবিটি দেখাতে রাজী হলেন না। সে বছর অনেক নবীন চিত্রকরের ছবি এরূপ-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এক salon des refusés,—প্রত্যাখ্যাতদের সালোঁ—করবার আদেশ দেন, সেই সালোঁতে অনেক প্রাণবান নতুন শিল্পী এসে জুটলেন—হুইস্‌লার, ভোলোঁ, পিসারো, লেগ্রো, ফাঁতাঁ-লাতুর ইত্যাদি। মানের চিত্র সেই সালোঁতে নব্যচিত্রকরদলের জয়পতাকারূপে জল্ জল্ করতে লাগল।

আজ ছবিখানি দেখে আমরা অবাক হয়ে ভাবি, কেন ১৮৬৩তে পারির সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষ ছবিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ছবিখানিতে শালীনতার কোন অভাব আছে ব'লে বোধ হয় না। জোর্জ্জোনের "গ্রাম্য কনসার্ট" (Concert Champetre) লুভ্‌রে তখনও ছিল। উন্মুক্ত আকাশের তলে মনোরম উপবনে সুবেশ পুরুষদের মধ্যে সুরূপা বিবসনা নারীর চিত্র মানের আগে জোর্জ্জোনে এঁকে গেছেন। হয়ত, জোর্জ্জোনের La fête champêtre দেখেই মানে-র Le déjeuné sur l'herbe আঁকার আইডিয়া হয়। কিন্তু জোর্জ্জোনের চিত্রে সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষ যা ক্ষমা করতে পারলেন, মানে-র চিত্রে তা পারলেন না, যেমন সংস্কৃত বা কোন ক্লাসিক সাহিত্যে যে স্পষ্টোক্তি আমরা ক্ষমা করতে পারি, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে সেরূপ কোন জিনিষ দেখলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। জোর্জ্জোনে যে অনাবৃতা নারীকে আঁকতে চেয়েছেন, সে অমর্ত্ত্য, সে পৃথিবীর নয়, সে শিল্পীর স্বপ্নের, সে হয়ত সুরসভার কোন অপ্সরী, কোন বনদেবী বাঁশী হাতে ক্ষণিকের জন্য স্বপ্নের মত পাশে এসে বসেছে; কিন্তু মানের নারী যে আজিকার দিনের, আমাদের গৃহের, সে বাস্তব, সে মায়া নয়, ক্ষণিক সৌন্দর্য্যস্বপ্ন নয়।

জোর্জ্জোনের ছবি ও মানে-র ছবি, এ-দুয়ের মধ্যে বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য থাকলেও দু-জনের অঙ্কণভঙ্গী একেবারে আলাদা; মানের এই নব অঙ্কনপদ্ধতি সালোঁর বিচারকদের ছিল অপছন্দ, তাই তাঁরা তাঁর নব ইম্‌প্রেসনিষ্ট-রীতি বুঝতে পারেননি।

"ঘাসের উপর প্রাতরাশ" ছবিখানিতে মানে সাধারণ চিত্র আঁকতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন আলোর লীলা আঁকতে; নারীর দেহে, সবুজঘাসভরা মাঠে, নদীর জলে আলো কিরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি তাই এঁকেছেন; ভূমির পান্না-সবুজ, জলের ঝলমলানি, তরুণীর দীপ্ত শুভ্রতা, যুবকদের জলজলে হলদে, তামাক-হলদে বর্ণ—আলোক-প্রতিফলিত কতকগুলি রঙীন ক্ষেত্র দিয়ে তাঁর পট সজ্জিত হয়েছে।

মানের পরবর্ত্তী ছবি "ওলিম্পিয়া" (Olympia) সবাইকে আরও চমকে দিলে। ছবিখানি এখন লুভ্‌রে আছে, কিন্তু ১৮৬৪-র চিত্রপ্রদর্শনীতে ছবিখানি যখন রাখা হয়েছিল, তার সামনে প্রহরী রাখার দরকার হয়েছিল, সাধারণ দর্শকদের ঘুসি ও ছড়ির আঘাত হতে ছবিখানিকে রক্ষা করবার জন্যে।



নির্ব্বাণ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কি অনুপম শক্তির সহিত "ওলিম্পিয়া" অঙ্কিত! বড় আইডিয়া খুঁজতে গেলে ছবিটিতে কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু রেখার কি নব ছন্দ! বর্ণের কি নব সমাবেশ! নীলাভ শয্যায় রঙীন ভারতীয় শালের উপর তরুণীর শুভ্র দেহ যেন মর্ম্মরের; পিছনের পটভূমিকা মেহগ্‌নি-লাল ও বোতল-সবুজ, পটভূমিকার গাঢ়বর্ণ ও তরুণীর দেহের দীপ্ত শুভ্রতা, আলো ও অন্ধকারের এই দুই বর্ণক্ষেত্রের মধ্যে কোন রঙের পর্দ্দা নেই; তলায় জানালার কাছে মিউলাতোর কৃষ্ণমূর্ত্তি, ঘন কালো রঙের ছোপের মত; নিকষ মণির গহ্বরের মত সেই ঘন কালো হতে রঙের উৎসের মত বা'র হয়ে এসেছে নানা বর্ণের ফুলের গুচ্ছ, তোড়ার চারদিকে শুভ্র আবরণ; পায়ের তলার কালো বেরাল—আর একটি কালো রং-এর ছোপ।



মানে—"লোলা"

এই কালো, সাদা, পাটল, নানা বৈসাদৃশ্যময় বর্ণজগতের মধ্যে নীলাভ শয্যায় শায়িত শুভ্র দেহ যেন গজদন্তে গড়া—কঠিন, প্রাণহীন। এক রঙের ক্ষেত্রের সঙ্গে আর এক রঙের ক্ষেত্রের যেন কোন ক্রমমান যোগ নেই। শিল্পী কুর্‌বে "ওলিম্পিয়া" দেখে বলেছিলেন, একি ছবি! এ ত তাসের ছবি, এ ত তাসের



মানে—"ল্য বঁ বক্"

বিবি। কুর্‌বের কথা কিছু পরিমাণে সত্য। মানের এ ছবি দেখলে মনে হয়, সব ফ্ল্যাট—শরীর যেন চ্যাপ্টা হ'য়ে গেছে; কোথাও বস্তুপুঞ্জ নেই, দেহের স্থূলতা নেই। রুবেন্‌সের মত মানে সুন্দরী তনু আঁকতে চাননি, তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন তনুর লাবণ্যকে, আলোকসম্পাতে তার দ্যুতিকে, দেহকে নয়, দেহের আভাকে। তাঁর আঁকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আলোককে আঁকা, এই রীতির জন্য তিনি ইম্প্রেসনিষ্টদের অগ্রদূত। তরুণীর শুভ্র দেহ, হল্‌দে শাল, কালো মিউলাতো, কালো বেরাল, রঙীন ফুলের তোড়া, এ-সবের উপর আলো ঝরে পড়ছে; আলোক-প্রতিফলিত তাদের রূপ তিনি আঁকতে চেয়েছেন। এখানে light is perspective, light is colour; চিত্ররূপ রেখাপরিপ্রেক্ষিত নয় (line perspective), আলোক-পরিপ্রেক্ষিত; সেজন্য মূর্ত্তির, বস্তুর যেন স্থূলতা নেই; স্থানের দূরত্ব ও গভীরতা রেখা টেনে আঁকা নয়, রঙের প্রগাঢ়তা ও তার বৈষম্য-বিন্যাস দিয়ে সৃষ্টি করা। পুরাতন-

পন্থীদের আঁকার প্রথাগত নিয়ম হচ্ছে, এক বিশুদ্ধ রঙের পাশে আর এক বিশুদ্ধ রঙ্ দিতে পারবে না, এক বিশুদ্ধ রঙের ক্ষেত্র হতে নানা অর্দ্ধমাত্রা (semi-tone) রঙের পর্দ্দা দিয়ে তারপর আর একটি বিশুদ্ধ রঙের ক্ষেত্রে পৌঁছাতে হবে। মানে কিন্তু এ নিয়ম মানেননি "অলিম্পিয়া" ছবিতে; তিনি দীপ্ত রঙের বড় বড় ছোপ পাশাপাশি দিয়েছেন; মাঝে আর বর্ণের অর্দ্ধমাত্রা রাখেন নি। এই নবঅঙ্কনপদ্ধতি সালোঁর কর্তৃপক্ষগণ সইতে পারেননি, সর্ব্বসাধারণ বুঝতে পারেনি, কিন্তু সাহিত্যিক-মহলে, রসিকসমাজে "ওলিম্পিয়া" অতিপ্রিয় হয়ে উঠল। রূপার মত জলজলে, তুষারের মত শীতল ওলিম্পিয়ার মূর্ত্তি যেন বদলেয়ারের সনেট, Fleurs du Mal-র একটি কবিতা।

মানেকে সত্যিকার ইম্প্রেসনিষ্ট বলা যায় না। তিনি প্রথমে ছিলেন কুর্বের শিষ্য, তারপর স্প্যানিস চিত্রকরগণ,—ভেলাস্কেথ, এল গ্রেকো, গোইয়া তাঁর আদর্শ শিল্পী হন; পরে মিলে ও কোরোর প্রভাবে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যে আলো ও বায়ুমণ্ডলের অপরূপ মায়া আঁকতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি ইম্প্রেসনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন, এক প্রদর্শনীতে ছবি দেখিয়েছেন, তাদের অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তবু তিনি কোনো ইম্প্রেসনিষ্ট প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি; তাঁর কোন বিশেষ মতবাদ ছিল না। ইম্প্রেসনিষ্টদের মত তিনি প্রকৃতিকে স্বাভাবিক আলোয় আঁকতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে নরনারীর মূর্ত্তি আঁকার প্রতি তাঁর আকর্ষণ অধিক ছিল। তিনি নিছক প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকেননি, তার মধ্যে মানব মূর্ত্তি, মানবীয় ভাব এনেছেন। বার্বিজঁর (Barbizon) চিত্রকরদল পারি ত্যাগ ক'রে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দৃশ্য আঁকতে বা'র হয়েছিলেন, মানে চিত্রকলাকে আবার পারিতে ফিরিয়ে আন্‌লেন। পারির আলো-ঝলমল সবুজ উপকণ্ঠ, তার জনস্রোতবহুল আলোকদীপ্ত পথঘাট, ঘরে বসে খোলা জানালা দিয়ে দেখা মানবকল্লোলময় পথে আলোছায়ার রঙের মায়াপট, পারির নব সৌন্দর্য্য তিনি উদ্‌ঘাটিত ক'রে গেছেন—মানবমূর্ত্তির নানা রং ঘিরে সোনালী আলো পথে ঝলমল করে, ছায়াগুলি স্বচ্ছ নীল ও দীপ্ত তাম্র-সবুজে মেশান, গভীর ছায়া যেন কমলালেবুর রঙের মেশান আলো। ইম্প্রেসনিষ্টদের মতন মানে বর্ণময় ছায়া এঁকেছেন, আবার তিনি ভাবময়ী নরনারী মূর্ত্তি এঁকে গেছেন; আলোর লীলা আঁকতে গিয়ে তিনি ভোলেননি যে চিত্রকলা হচ্ছে ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি আঁকা।

২

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হতেই ফ্রান্সে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে সকল অকৃত্রিমতা অবাস্তবতা দূর করার চেষ্টা চল্‌ছিল। ষ্টুডিওর কৃত্রিম অস্বাভাবিক আলোকে প্রাকৃতিক দৃশ্য না এঁকে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি বসে তার সহজ স্বাভাবিক রূপকে রঙে ও রেখার ছন্দে ধরবার জন্যে একদল শিল্পী নগর ছেড়ে চলে গেলেন গ্রামে, মাঠে, বনে, প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে, বার্বিজঁর স্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্য্যলোকে। রুসো, দিয়াজ, তুপ্রে এরা সব প্রকৃতির বাস্তব সৌন্দর্য্যরূপ আঁকতে আরম্ভ করলেন। এই বাস্তব ও স্বাভাবিক অঙ্কনের সাধনা করতে গিয়ে ক্লদ মোনে (Claude Monet) (১৮৪০-১৯২৬) এক নব সৌন্দর্য্যলোকে উপস্থিত হলেন, আলোছায়া-লীলায়িত বিশ্বপ্রকৃতির রূপ তিনি এক অপরূপ নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন, যা তাঁর পূর্ব্বের কোন চিত্রশিল্পী দেখেন নি; সেই বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা প্রকৃতির চিত্র আঁকতে বিশেষ অঙ্কনরীতির উদ্ভাবনা হ'ল, সেই রীতি হ'ল ইম্প্রেসনিজম্। ১৮৭৪তে এক চিত্রপ্রদর্শনীতে মোনে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দিয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন, "সূর্য্যোদয়—একটি ইম্প্রেসন।" এই "ইমপ্রেসন্" কথা হতে চিত্রকলা সমালোচকরা মোনে ও তাঁর দলের চিত্রকরদের "ইম্প্রেসনিষ্ট" নাম দিলেন।

মোনে কি বিশেষ সুন্দর নবদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখলেন, তা প্রথমে বোঝা দরকার। মোনে দেখলেন, আলোই হচ্ছে ছবির সত্যিকার রঙ—light is colour—কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন চিরস্থায়ী রঙ নেই, তার বর্ণ বদলায় আকাশের আলোর সঙ্গে সঙ্গে; আকাশ, বাতাস, গাছপালা, নদী পাহাড় ও তাদের মধ্যে জীবজন্তু সব আলোর দ্যুতিতে ভরা।

যদি একটি সবুজ মাঠ আঁকতে হয়,—শরতের নির্মেঘ সুন্দর প্রভাতে ঘাসভরা মাঠের রঙ দেখাবে সূর্য্যালোক-ভরা সবুজ; কিন্তু যদি একটি সাদা মেঘ বলাকার মত উড়ে এসে সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে, মাঠে তার ছায়া পড়ে, অমনি মাঠের রঙ বদলে যায়; এই মেঘচ্ছায়াঢাকা সবুজ সূর্য্যালোকভরা সবুজ থেকে আলাদা; আবার শ্রাবণের কালো মেঘের সমারোহঘন আকাশের তলে এ মাঠের রূপ অন্যরূপ। সুতরাং কোন দৃশ্য বা বস্তু আঁকতে হ'লে দেখতে হবে, তার স্থানিক বর্ণ (local colour) কি, তার বায়বীয় বর্ণ (atmospheric colour) কি, তার দীপক বর্ণ (illumination) কি, ও তার অনুপূরক বর্ণ (complementary colour) কি। এই চারি প্রকার বর্ণের পর্য্যবেক্ষণ ও সামঞ্জস্য করে দৃশ্য আঁকতে পারলে তবেই সে দৃশ্যের সত্য বর্ণ, বাস্তব রূপ আঁকা হবে—মোনে এই সত্যে এসে পৌছালেন।

বনভরা পাহাড়ের রঙ সবুজ,এ সবুজ তার স্থানিক বর্ণ; কিন্তু দূর হতে সে পাহাড় দেখায় নীল, নীল হচ্ছে স্থানিক বর্ণের সঙ্গে বায়বীর বর্ণের সংযোগ; আবার পাহাড়ের পিছনে যখন সূর্য্যাস্ত হয়, সবুজ বন রাঙা হয়ে ওঠে, এই রাঙা রঙ তার দীপক বর্ণ।

ইম্প্রেসনিষ্টরা আর একটি কথা বললেন, প্রতি রঙের একটি অনুপূরক রঙ আছে, সে অনুপূরক রঙ না দিলে মূল রঙের দ্যুতিতে তার আলোক প্রভাব প্রকাশিত হয় না। কোন রঙকে দ্যুতিময় করতে হ'লে তার পূরণাত্মক রঙটি তার পাশে দেওয়া দরকার। দেলাক্রোয়া বহুদিন আগেই এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন; আলোকদীপ্ত মরকোতে দেলাক্রোয়া দুটি চাষার ছেলে আঁকতে গিয়ে দেখেন, যে ছেলেটির মুখের রঙ হল্‌দে, তার মুখের ছায়ায় রয়েছে ভায়লেট; আর যে ছেলেটির মুখের রঙ লাল তার মুখের ছায়া হচ্ছে সবুজ; সুতরাং ছায়া বর্ণময়, ধূসর বা কালো রং প্রকৃতিতে কোথাও নেই; মূল রঙের পাশে তার ছায়ার সত্যিকার রঙ দিতে পারলেই তবে সে মূল রঙ হবে দীপক।

রং হচ্ছে আলোর দৃষ্টি; রং বস্তুর গুণ নয়, আলোর গুণ, আলোর মায়াখেলা; আলোই সব বস্তুর বর্ণের নির্দ্দেশক, নির্দ্ধারক, চিত্রকর আলো আঁকতে পারলেই বস্তুর সত্যিকার রঙ আঁকতে পারবেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বায়ুমণ্ডলে ঘেরা, আলোর ধারায় ধোওয়া, আলোছায়ায় লীলায়িত, সুতরাং কোনো দৃশ্য আঁক্‌তে হ'লে বায়ুর রঙ, আলোর রঙ, ছায়ার রঙ, সব রঙ ধরতে হবে তুলির রঙের ছোপে, তবেই চিত্রপট হবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দর্পণ। পূর্ব্বতন চিত্রকরগণ কোন বস্তু আঁক্‌তে গিয়ে দেখতেন বস্তুর রঙ চোখে কি দেখাচ্ছে, কিন্তু ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পী প্রথমে দেখলেন বস্তুর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলের রঙ কি—কারণ বাতাস শুকনো হ'লে মাঠের এক রঙ হবে, ভিজে হ'লে আর এক রঙ হবে—বাতাস গতিচঞ্চল না স্থির, রৌদ্রভরা না জলভরা, আকাশ মেঘে ঢাকা, না সূর্য্যালোকদীপ্ত, মেঘগুলি নৌকার পালের মত ধীরে চলেছে, না ছুটে চলেছে মত্তহস্তীদলের মত—এ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে, কারণ এদের প্রভাবে বস্তুর বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। বস্তুর কোন চিরন্তন রূপকে কোন স্থায়ী রঙকে নয়, শুধু কোন বিশেষ স্বর্ণের আলোকসম্পাতে তার যে দীপ্তমূর্ত্তি চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই ক্ষণিকস্থায়ী রূপকে চিত্রে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে হবে।

ইম্প্রেসনিষ্ট চিত্রশিল্পীর চোখে কোন বস্তু বা দৃশ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হ'ল না, এক অখণ্ড রূপ সমগ্র ভাবে অলৌকিক দর্শনরূপে (vision) উদ্ভাসিত হ'ল, আলো হচ্ছে তার মধ্যবিন্দু। সেজন্য চিত্রগুলি আলোক-পরিপ্রেক্ষিত; বস্তুর স্থুলমূর্ত্তি বা রেখাচিত্র আঁকা নয়, রঙের ছোপে আলো-ঝলমল রঙীন পট আঁকা হ'ল চিত্রকলা, এ যেন চিরপ্রবহমান কোন বর্ণের ঝরণা, দুল্‌ছে, কাঁপছে, টল্‌ছে, ঝলমল করছে। ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপসৌন্দর্য্যপ্রকাশিনী প্রকৃতির এই প্রতীয়মান মায়া আঁকতে ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পীকে নূতন চিত্র অঙ্কন-পদ্ধতির সন্ধান করতে হ'ল।

দেখার নূতন ভঙ্গী হতে উদ্ভাবিত হ'ল আঁকার নূতন রীতি। ইম্প্রেসনিষ্টরা প্রথমে পুরাতন বর্ণদানির সংস্কার করলেন। আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ এ বিষয়ে তাঁদের বিশেষ সাহায্য করল।

ইয়োরোপের পুরাতন চিত্রশিল্পীদের বর্ণতত্ত্বে মৌলিক বর্ণ ছিল তিনটি—লাল, নীল, হলদে। কিন্তু ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পিগণ দেখলেন, আলোর মৌলিক বর্ণ হচ্ছে—সবুজ, কমলালেবু-লাল, ও লাল-বেগুনে। আলো আঁকতে হ'লে সূর্য্যের আলোর যে সাত রঙ রামধনুতে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সাত রঙ দিয়ে আঁকতে হবে। প্রকৃতিতে কালো রঙ কোথাও নেই, শিল্পীর বর্ণদানিতেও কালো রঙ থাকবে না। ইম্‌প্রেসনিষ্টদের রঙ হ'ল—ইন্‌ডিগো, নীল, সবুজ, হলদে, কমলালেবুর রঙ, লাল, ভায়লেট,—রামধনুর সূর্য্যবর্ণ সাত ছত্রের বর্ণ।

১৮৭৪তে মোনে, পিসারো, রেনোয়ারের বর্ণদানিতে ছিল—হল্‌দে, কমলা, সিঁদুর, লেক, লাল, ভায়লেট, নীল, সবুজ ও মরকতমণির বর্ণ।

ইম্‌প্রেসনিষ্টদের আদর্শ হ'ল, 'donner a` la couleur le plus d'e´clat possible' অর্থাৎ রঙকে যতদূর সম্ভব দ্যুতিময় ক'রে তোলা, প্রকৃতির আলোকদীপ্ত বাস্তব রঙের ছবি আঁকা, চিত্রপট হবে রঙের দীপালী। এই আদর্শ সফল করতে তাঁরা বর্ণদানির সংস্কার করলেন, তারপর নব অঙ্কনরীতির প্রবর্ত্তন করলেন।

এ অঙ্কনরীতি হ'ল বিভাগনীতি। এক রঙের সঙ্গে আর এক রঙ বর্ণদানিতে মিশিয়ে ছবি আঁকলে রঙের জৌলুস থাকে না, কিন্তু রং দ্যুতিময় না হলে প্রকৃতির পটে আলোর ঝলমলানি কি করে চিত্রপটে আসবে? ইম্‌প্রেসনিষ্টরা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, দুটো বিভিন্ন রঙ মিশিয়ে যখন একটা নতুন রঙ তৈরী করার দরকার হয়, তখন সে দুই রং বর্ণদানিতে না মিশিয়ে যদি সেই বিভিন্ন রঙের ছোপ চিত্রপটে পাশাপাশি দেওয়া যায়, তাহ'লে চোখে সে দুটো রঙ মিশ্রিত হয়ে নতুন রঙ দেখাবে, আর এই চোখের দৃষ্টিতে সম্মিলিত নতুন রঙের দীপ্তি বর্ণদানিতে মিশ্রিত রঙের চেয়ে অনেক বেশী। যেমন ধরা যাক, ধূসর বর্ণ; বর্ণপাতে দুই বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রিত ক'রে যে ধূসর রঙ তৈরী হবে তার কোন লাবণ্য নেই, কিন্তু পটের উপর ভায়লেটের পাশে হলদে-সবুজের ছোপ দিয়ে যে ধূসর রঙের সৃষ্টি হবে, তা জল্‌জলে, আলো-ভরা। পটের উপর পাশাপাশি বিশুদ্ধ নানা রঙের ছোপে নতুন রঙ তৈরী করে ছবি আঁকার রীতি ইমপ্রেসনিষ্টদের নানা প্রচেষ্টা, পরীক্ষা, গভীর সাধনার ফল।

ইম্‌প্রেসনিষ্ট অঙ্কনরীতির নূতনত্ব হচ্ছে—

প্রথমতঃ, বর্ণদানির রঙ সূর্য্যবর্ণছত্রের সাত রং হবে, পুরাতন শিল্পীদের বর্ণদানির কালো ধূসর, সব মেটে রং হবে নির্ব্বাসিত।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বস্তু বা দৃশ্য আঁকতে হ'লে তার রঙ পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে চারভাবে,—স্থানিক, বায়বীয়, দীপক ও অনুপূরক রঙ।

তৃতীয়তঃ, এই চার রঙের সামঞ্জস্য, ভাবসাম্য ক'রে দৃশ্য আঁকতে হবে।

চতুর্থতঃ, রঙ আর রঙদানিতে মেশান হবে না, পটের উপর তুলির টানে, ছোপে, বিন্দুতে নানা রঙের সম্মিলন হবে। দ্রষ্টার চক্ষে এই বর্ণসম্মিলন-পদ্ধতি (me´lange optique) দ্বারা রঙ হয় আলোকময় নবসৌন্দর্য্যমণ্ডিত।

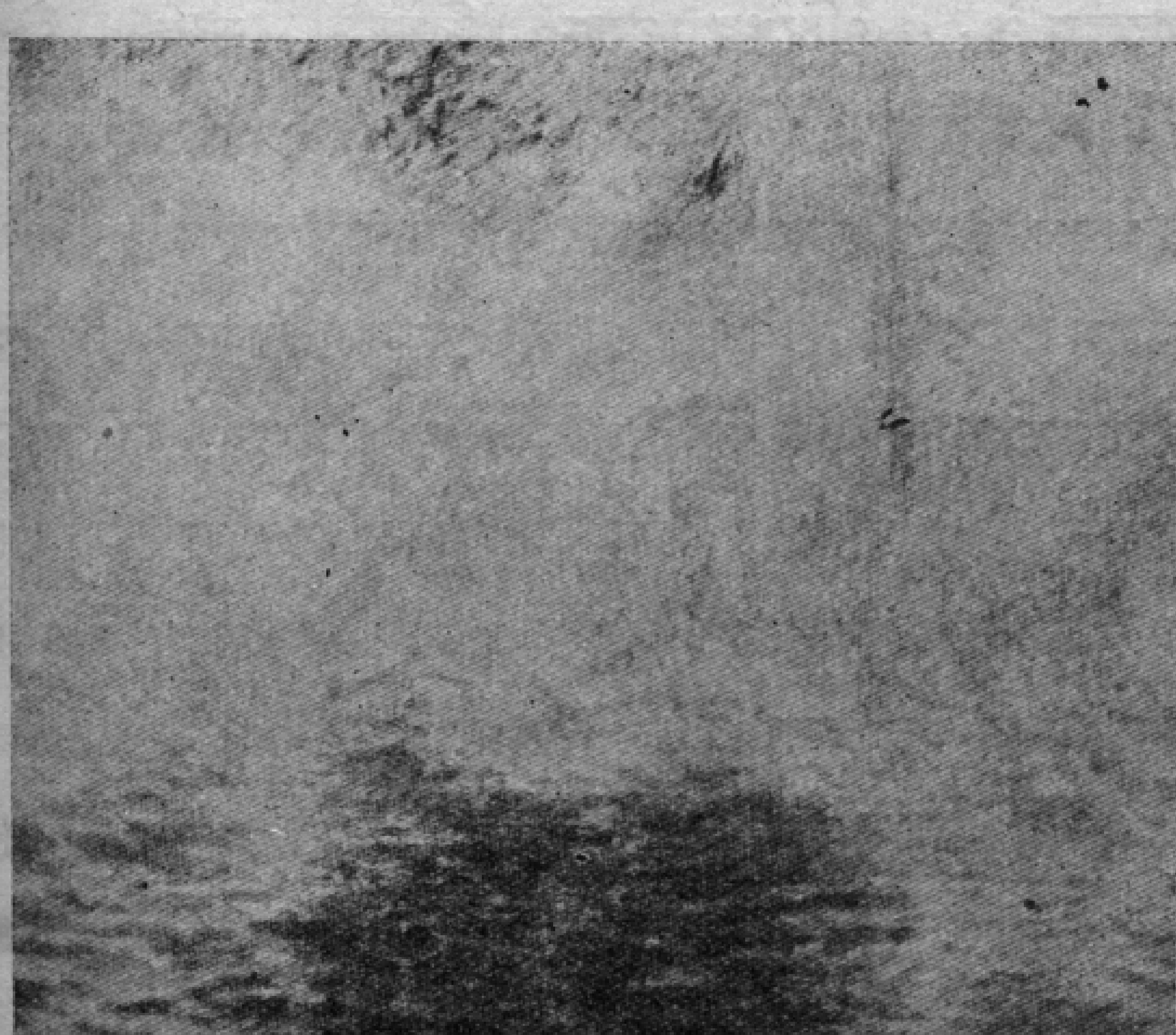
৩

ইম্‌প্রেসনিষ্টদের মতবাদ বুঝে নিয়ে মোনের রঙে-জলজল চিত্রজগতে প্রবেশ করলে তার আশ্চর্য্য প্রতিভা বোঝা যায়। ছবিতে যা প্রথমে অভিনব অদ্ভুত মনে হতে পারে, তা নবদৃষ্টির সৌন্দর্য্যসন্ধান, নবপ্রতিভার অপরূপ সৃষ্টি, শিল্পীর গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি। মোনের চিত্রগুলি প্রথমে দেখলে মনে হয়, যেন রঙের আতসবাজী, নানা চমকপ্রদ বর্ণ সাজানোর পাগলামি, কিন্তু সত্যি খামখেয়ালী কোথাও নেই, প্রকৃতিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখার পর তার আলোছায়ার বর্ণের সকল মাত্রা অর্দ্ধমাত্রা পরম অধ্যবসায়ের সহিত পর্য্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের পর তবে প্রতি তুলির টান প্রতি রঙের ছোপ পটে দেওয়া হয়েছে; এ রূপলোক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, বৈজ্ঞানিক বর্ণতত্ত্বের উপর স্থাপিত, শিল্পীর খেয়াল নয়।

মোনের চিত্রজগৎ হচ্ছে আলোর জয়গান।

মোনে প্রথমে পুরাতন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন, কোরো (Corot) ও কুরবের (Courbet) বর্ণপাত্র নিয়ে। কামিয়ে (Camille) ছবিতে মানে-র প্রভাব

বিশেষ ভাবে দেখা যায়। ধীরে ধীরে তিনি পুরাতন অঙ্কন-পদ্ধতি ছেড়ে নূতন রীতির সন্ধান করতে লাগলেন ১৮৭১তে শিল্পীবন্ধু পিসারোর সঙ্গে তিনি লণ্ডন যান। লণ্ডনে টার্ণারের ছবিগুলি দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, এ আলোর দীপ্তিভরা অভিনব সৌন্দর্য্য-লোক, এ আলোর দ্যুতি টার্ণার কোন্ অঙ্কনরীতির সাহায্যে সৃষ্টি করতে পেরেছেন? টার্ণার তাঁর আকাশ বাতাস সমুদ্র আঁকতে বিশুদ্ধ অমিশ্রিত রঙ ব্যবহার করেছেন, তাঁর রঙ মিশ্রিত হয়েছে, বর্ণদানিতে নয়, পটে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে। টার্ণারের তুষারের শুভ্রতা মোনেকে বিমুগ্ধ বিস্মিত করলে; তুষার এমন শুভ্র আঁকা যেতে পারে তা তিনি ভাবেন নি; এ শুভ্রতা হয়েছে পটের উপর নানা রঙের ছোপ পাশাপাশি সাজিয়ে। টার্ণারের আঁকবার নব রীতি দেখে মোনে ইম্প্রেসনিষ্ট অঙ্কন-পদ্ধতির সন্ধানে মেতে উঠলেন।



মোনে—"টেম্সের তীরে পার্লামেন্ট"

ফ্রান্সে ফিরে এসে তিনি মানুষের মূর্ত্তি আঁকা ছেড়ে দিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি বসে দীপ্ত আলোর চঞ্চল লীলা রঙের পটে ধরতে পাগল হয়ে গেলেন।

মোনের ছবির মূল বিষয় হচ্ছে আলো। সূর্য্যের আলো একই বস্তু, একই দৃশ্যের উপর দিবসের নানা বিভিন্ন সময়ে প্রতিফলিত হয়ে সে-বস্তু সে-দৃশ্যের কি বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে তাই তিনি প্রেমিকের মত মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখে

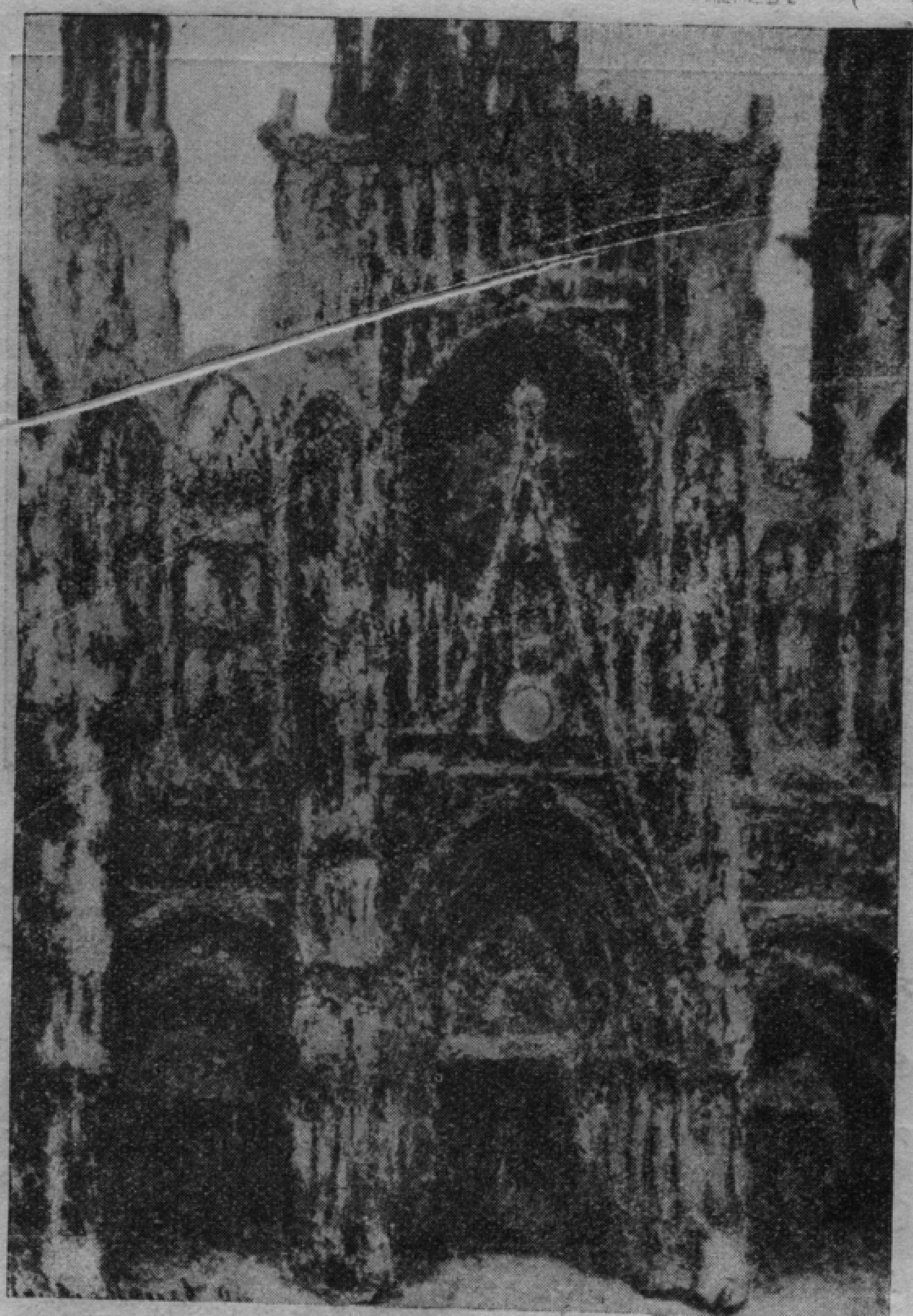


মোনে—"স্নানের ঘাট"

সাধকের মত এঁকে গেছেন। এই ধরণের তাঁর কতকগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রপর্য্যায় হচ্ছে, "ঘাসের গাদা" (Hay-ricks), পপ্‌লার (Poplars), রুয়ঁ ক্যাথিড্রাল (Rouen Cathedral), জলকুমুদ (Water-lilies), টেম্সের তীর (Thames)।

একটি ঘাসের গাদা, খোলা মাঠে; প্রভাতের আলোকে তার স্নিগ্ধ সতেজ রূপ, দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যালোকে তার দীপ্ত জ্বালাময় রূপ, আবার সন্ধ্যার মলিন মায়ায় তার মূর্ত্তি রঙীন করুণ সুন্দর। সুতরাং সকালের ঘাসের গাদার ছবি দুপুরের ঘাসের গাদার ছবির সঙ্গে এক হবে না। মোনের আঁকার প্রথা ছিল, সকালের আলো হতেই তিনি অনেকগুলি পট নিয়ে মাঠে গিয়ে বসতেন; সকালের আলোময় ঘাসের গাদা আঁকতে আরম্ভ করতেন; কিন্তু সকালের আলো যেই প্রখর প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল, অমনি তিনি নূতন পটে মধ্যাহ্নের ঘাসের গাদার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন; এম্নি দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোকে উদ্ভাসিত একই ঘাসের গাদার বিভিন্ন রূপের কুড়িখানি ছবি তিনি এঁকে গেছেন। এই বিশটি ঘাসের

গাদার চিত্রপর্য্যায়ে প্রতি চিত্রে ঘাসের গাদার সৌন্দর্য্য বিভিন্ন, সে বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছে চঞ্চল আলোর লীলা। মোনের প্রভাতের ছবিতে যেমন জাগরণপূর্ণ আলোর আনন্দ অনুভব করা যায়, দুপুরের ছবিতে তেমনি আলোর



মোনে—"রুয়ঁ ক্যাথিড্রাল"

তেজ, তার দহনজ্বালার স্পর্শ পাওয়া যায়, দুই চক্ষু যেন তার প্রখর দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে আসে, চিত্রপট হতে আলোর জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়। আকাশ বাতাস গাছপালা নদী সমুদ্র পাথর সবার উপর চঞ্চল আলোর বর্ণকে বিশ্লেষণ করবার অত্যাশ্চর্য্যকর ক্ষমতা এবং সেই বিশ্লেষিত বর্ণগুলিকে পটের উপর রঙের ছোপের পর ছোপে বিন্যাস ক'রে সমন্বয় ক'রে প্রকৃতির আলোক-দীপ্তিকে চিত্রপটে সৃষ্টি করার অদ্ভুত শক্তি তাঁর মত আর কোন চিত্রশিল্পীর মধ্যে দেখা যায় না। সেজান (Cézanne) বলেছিলেন, মোনের চোখ কি সাংঘাতিক চোখ! এ সতেজ বিশ্লেষক দৃষ্টি কোনো ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পীর ছিল না।

সূর্য্যালোকিত আকাশ, উন্মুক্ত শ্যামল বন, আলো টলমল জলধারা, প্রকৃতির পঞ্চভূত হচ্ছে মোনের অতি প্রিয়, এই আলো-ঝলমল প্রকৃতি তাঁকে বার বার ভুলিয়েছে। তাঁর আঁকা সূর্য্যালোকধৌত বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত শ্যামল বন, বৃক্ষের সারি, নদীর তট, সমুদ্রের কূল, সকল ছবি যেন স্থির কঠিন মাটির, ভাবময় বস্তুর ছবি নয়, তাদের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত দ্যুতিময় বায়ুমণ্ডলের বর্ণের লীলার ছবি; আমাদের বিমুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে যে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণের বিরাট নদী টলমল ক'রে প্রবাহিত, তারই কোন অপূর্ব্ব ক্ষণের সুন্দর রূপ পটেতে আঁকা। বস্তুপুঞ্জ অলীক অবাস্তব; সত্য হচ্ছে এই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল রঙের ঝলমলানি; আলোর আঘাতে রঙের তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে নানাবর্ণময় বস্তু ফুটে উঠছে বুদ্‌বুদের মত, সেই রঙের তরঙ্গোচ্ছ্বাস আঁকাই শিল্পীর কাজ। এই রঙের মায়া প্রকৃতি যে রীতিতে সৃষ্টি করছে, সেই রীতি অনুসরণ ক'রে মায়ারূপ ধরতে হবে পটে।

ক্যাথিড্রাল ছবিপর্য্যায় মোনের প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রুয়ঁ ক্যাথিড্রালের সম্মুখভাগ, মূর্ত্তিখোদিত কারুকার্য্যময় কালো পাথর, বহু শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরস্তূপ; এচিঙের পক্ষে বিষয়টি ভাল, কিন্তু এই কালো গির্জ্জার তোরণের শতাব্দীমলিন প্রস্তরের উপর কি অপরূপ আলোর রঙের লীলা হয়, মোনে ছাড়া এ সৌন্দর্য্য আর কোন চিত্রকর দেখাতে পারতেন না। এক ক্যাথিড্রালের সম্মুখদেশ নিয়ে তিনি সতেরখানি ছবি এঁকে গেছেন, প্রতি ছবিতে ক্যাথিড্রালকে নতুনরূপে দেখতে পাই, তার কোন অজানা সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হয়। পাথরের স্থানিক বর্ণ দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোর বায়বীয় বর্ণের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়, প্রভাতে রাঙা আলোয় যে পাথর ঈষৎ বিবর্ণ লাল গোলাপের মত, দুপুরের সূর্য্যতাপে তা হয়েছে আনীল-লোহিত, আবার সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্য্যের আভায় সে পাথর জ্বলজ্বল করে সোনার মত, রক্তের মত। পাথরের প্রতি কণা আলো পান করছে, সেই আলোর রঙের সঙ্গে তার রূপ বদল হয়, যা ছিল স্থির, দৃঢ়, কঠিন বস্তুপুঞ্জ, আলোকসম্পাতে রঙীন দ্যুতিময় বায়ুমণ্ডলে

সে প্রস্তরস্তূপ সুন্দরীর রঙীন অঞ্চলের মত ঝলমল করে, এ যেন চুনীপান্না হীরা নানামণিমাণিক্যখচিত কোন অপরূপ পট।

মোনের আঁকা লণ্ডনের ছবিগুলি নগর-জীবনের জনস্রোতময় পথের ছবি নয়; প্রেমিকের মত তিনি টেম্‌স-নদীর রূপ এঁকেছেন। তাঁর আঁকা লণ্ডনের আকাশ ফ্রান্সের আকাশের মত সূর্য্যালোকিত নয়, কুয়াসার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। লণ্ডনের ছবিগুলি হচ্ছে এই কুয়াসার উপর আলোর রঙের লীলা। কুয়াসার পর্দ্দার ভেতর দিয়ে রঙ ফোটাবার জন্য আলোর যে বেদনা, যে সংগ্রাম, কুয়াসায় ঢাকা হয়ে নদীজলের যে অস্পষ্টতা, বাড়িঘরের যে আবছায়া অপরূপ মূর্ত্তি—এ-সব তিনি এঁকে গেছেন অত্যাশ্চর্য্যকর বাস্তবতার সঙ্গে। প্রথমে তাঁর ছবি দেখে যা অলীক মনে হবে, ছবি দেখার পর সেরূপ একটি দৃশ্য দেখলে মনে হবে সত্যিই ত প্রকৃতির এ নবরহস্যময় সৌন্দর্য্য ত আগে চোখে পড়েনি; মোনে অবাস্তব কোথাও আঁকেননি।

মোনের কাছ থেকে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের এক নবদৃষ্টি লাভ করেছি। তাঁর চিত্রজগৎ থেকে আমরা যখন আবার বাস্তব প্রকৃতির অঙ্গনে যাই, কোন সূর্য্যালোকিত প্রভাতে ঝলমল নদীজলের শ্যামল তীরে বসি, বিজন মধ্যদিনে বাতায়ন থেকে ফুলশোভিত উপবনের দিকে চেয়ে থাকি, সন্ধ্যার রঙীন আলোয় কোন প্রাচীন গির্জ্জার সম্মুখে দাঁড়াই, প্রতি দৃশ্যে আমরা এক নব আনন্দরস পাই; ঘরবাড়ি গাছপালা নদীজল আকাশের আলো সব এক অখণ্ডযোগে রঙের দ্যুতিমণ্ডিত হয়ে অপরূপ মূর্ত্তি নেয়। প্রকৃতির নানাবর্ণের সুন্দর দৃশ্যের নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বিপুলা,চিরচঞ্চলা, তারই এক একটি দৃশ্য চক্ষে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, মনে হয় চিরন্তন এ দৃশ্য, কিন্তু প্রকৃতি কখন যে পুরাতন দৃশ্যের উপর নতুন আলো, নতুন রঙের তুলি বুলিয়ে নব দৃশ্য চোখের সামনে ধরেছে, তা বুঝতে পারা যায় না, এ বহুরূপিণী একদিকে ক্ষণিকা অপরদিকে চিরন্তনী। তারই রঙের ঝরণাতলায় হৃদয়ের পাত্র ভরে নিতে হবে দুই চক্ষু দিয়ে।

৪

রেনোয়ার (Pierre Auguste Renoir, ১৮৪১—১৯১৯) ছিলেন ইম্‌প্রেসনিষ্ট চিত্রশিল্পীদের বন্ধু, তাঁদের সঙ্গে এক চিত্রপ্রদর্শনীতে ছবি দেখিয়েছেন, তাঁদের অঙ্কনরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু ইম্‌প্রেসনিষ্টদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মানতে চান নি। চল্লিশ বছর ধরে তিনি নানা রকম ছবি এঁকেছেন, মোনের মত কেবল



রেনোয়ার—"বাগানে প্রাতরাশ"

আলোকময় প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, আলেখ্য, নারী, বিশেষতঃ নগ্নানারীর তন্ু, সমুদ্রের দৃশ্য, নানা ফুলফল, উন্মুক্ত স্থানে সামাজিক বৈঠক ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিত্র তিনি এঁকে গেছেন।

একদিকে তিনি যেমন ইম্‌প্রেসনিষ্ট অঙ্কনরীতি অবলম্বনে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে চেয়েছেন, ছায়াতে ভায়লেট রং দেখেছেন, আলোর দ্যুতি পটে ধরতে চেয়েছেন, তেম্‌নি তিনি শ্রেষ্ঠ পুরাতন চিত্রকরদেরও গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর চিত্রাঙ্কনের প্রথম পর্ব্বে বুশের প্রভাব খুব দেখতে পাওয়া যায়। তারপর টিশিয়ান, ভেলাস্কেথ, রুবেন্‌স, ভেরোনিজ হ'ল

তাঁর প্রিয়। পুরাতন চিত্রকরদের প্রাচীন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির সঙ্গে নবীন ইম্‌প্রেসনিষ্ট রীতির সমন্বয় ক'রে রেনোয়ার তাঁর নিজস্ব এক স্নিগ্ধমধুর সুষমাময় চিত্রকলার সৃষ্টি করেছেন। ইমপ্রেসনিষ্টদের মত প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি



রেনোয়ার—"নিদাঘে"

ব'সে তার আলোকদীপ্তি, তার বাস্তবতা আঁকতে যেমন চেষ্টা করেছেন তেম্‌নি লুভরের শিল্পগুরুদের কাছ থেকে পাঠ নিতে ভোলেন নি।

সবচেয়ে সুন্দর তাঁর নারীসৌন্দর্য্যের চিত্রগুলি। "স্নানার্থিনী" ছবিগুলি তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি; সদ্যস্নানস্নিগ্ধ লাবণ্যরসটলমল নারীদেহের অপরূপ দ্যুতিকে এমন মধুর, এমন স্বপ্নময় করে আর কোন চিত্রশিল্পী আঁকতে পারেন-নি। টিশিয়ান, রুবেন্‌স নারীকে যে রূপে দেখে এঁকে গেছেন সে-দেখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইম্‌প্রেসনিষ্টের চোখের দেখা; এই নবদৃষ্টি রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত দীপ্তলাবণ্যময়, শ্রাবণের ভরা স্রোতস্বিনীর মত হৃদয়াবেগময়। রুবেন্‌সের নারীমূর্ত্তি রেনোয়ারের তুলিতে হয়েছে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যভরা, আলোর রঙীন স্বপ্নময়, তাতে কামনার জালা নেই, বেদনার আবেগ নেই, স্থূল বাস্তবতা নেই, রূপের প্রখর দীপ্তি নেই; এ সৌন্দর্য্যস্বপ্ন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মন উদাস করা। রেনোয়ারের নারীচিত্রগুলির এই lyrical sweetness-এর জন্য তিনি সবার প্রিয়। টিশিয়ান ও রুবেন্‌সের পর নারীদেহের লাবণ্যকে তাঁর মত কোন চিত্রকর আর এঁকে যান নি। মোনে যে ইম্‌প্রেসনিষ্ট অঙ্কনরীতিদ্বারা নদীজলে আলোর ঝলমলানি, ঘাসের গাদায় আলোর রঙের লীলা এঁকে গেছেন, সেই রীতি রেনোয়ার অনুসরণ করলেন জলে ভেজা, আলোয় ধোওয়া নারীর দেহ আঁকতে; দেহ নয়, দেহের আভা হ'ল তাঁর আঁকার বিষয়; দেহের দ্যুতির সঙ্গে আলোর দীপ্তির মিলন হয়ে অপরূপ লাবণ্যের সৃষ্টি হ'ল, সেই রূপ-মায়া বড় মধুরভাবে বড় আবেগের সঙ্গে তিনি এঁকে গেছেন। তাঁর এই ছবিগুলি অতুলনীয়।

৫

সিসলে (Alfred Sisley ১৮৩৯-১৮৯৯) ছিলেন জাতিতে ইংরেজ; তাঁর জন্ম হয় পারিতে ও তিনি সম্পূর্ণ ফরাসীভাবাপন্ন। মোনের লিরিক সৌন্দর্য্য, গভীর হৃদয়বেগ তাঁর ছবিতে হয়ত পাওয়া যাবে না, কিন্তু আলো আঁকার দক্ষতায় তিনি মোনের সমকক্ষ। সেন নদী, টেম্‌স্, আলো, জল, নদীতীরের সবুজ শোভা মোনের মত তিনি ভালবাসতেন, নদীর নানারূপ এঁকে গেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে আকাশ, তাঁর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রের মধ্যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আকাশ স্বপ্নময় সুষমা ভ'রে দিয়েছে; ফ্রান্সের আলোভরা আকাশ খুব কম চিত্রকরই তাঁর মত আঁকতে পেরেছেন। আলোঝলমল সবুজ দুই তীরের মধ্য দিয়ে টলমল নদীজলধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, দুধারে ফুলভরা কুঞ্জ, ফলের বাগান, ছোট পাহাড়ের উপর লালছাদওয়ালা গ্রামগুলি সূর্য্যালোকে জলজল করে, জলের রূপালি ধারা দূরে দিগন্তে নীলাকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, অপূর্ব্ব মায়াময় আকাশ—Ile de France। সেন নদীর নানা দৃশ্যগুলি সিসলের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী। জলের ছবি যে কি অনুপম শক্তিতে আঁকা যায়, তা তাঁর "বন্যা" ছবি দেখে বোঝা যায়।

কামিয়ে পিসারো (Camille Pissarro ১৮৩০-১৯০৩) ছিলেন আমেরিকান ইহুদী ফরাসী। প্রথমে তিনি



সিসলে—"নদীতীর"

কোরোর প্রভাবে আসেন, তারপর মোনের ইম্‌প্রেসনিষ্ট দৃশ্যাবলীর মায়া তাঁকে ভুলায়—বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, সূর্য্যা-



পিসারো—"কিশোর ঢোল-বাদক"

লোকিত বনভূমি,মেঘভরা উন্মুক্ত আলোক তাঁর। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সুন্দর, কিন্তু নিছক প্রকৃতির অপেক্ষা আলোকদীপ্ত নগরের জনতাভরা প্রশস্ত পথের দৃশ্যগুলি আরও ভাল লাগে। পিসারোর পটের পথের চিত্রগুলি, বুলভারগুলি পরম দক্ষতা ও নবসৌন্দর্য্যময় দৃষ্টির সহিত অঙ্কিত, প্রাসাদাবলী, বৃক্ষশ্রেণী, জনতা—সবার সুন্দর সুসমাবেশ, তাহাদের ঘিরে আলোকের তরঙ্গোচ্ছ্বাস; গতিময় জনতার, আলোকফুল্ল নগরের প্রাণের স্পর্শ পাই ছবিগুলিতে।

মাটির প্রতি পিসারোর নিবিড় অনুরাগ। শীতের শেষে বসন্ত আগমনের আভাসভরা ধরিত্রীর প্রভাতের রূপ "মার্চ্চমাসের সূর্য্যে" কি সুন্দর ফুটে উঠেছে! হলদে-সবুজের সঙ্গে হলদে ও নীলের রংভরা এই প্রথম বসন্তের শোভাচিত্র ইম্‌প্রেসনিজমের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

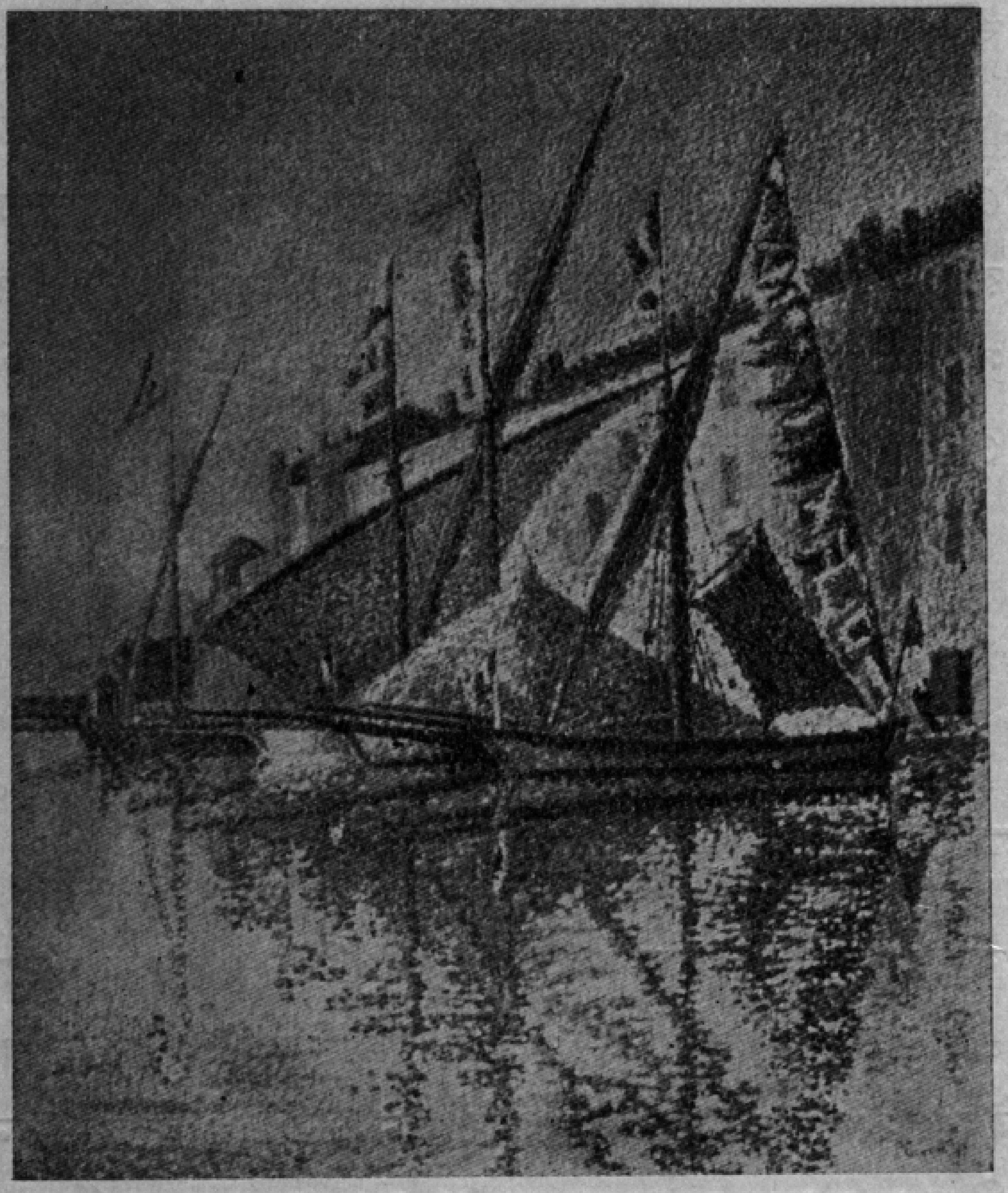
৬

মোনে কোন বিশিষ্ট মতকে স্থিরনিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, তিনি যে-নব অঙ্কনরীতি অনুসারে ছবি এঁকেছেন, সে-রীতি তাঁর শিল্পসাধনার, তাঁর অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু তাঁর অনুবর্ত্তী ইম্‌প্রেসনিষ্টগণ অঙ্কনরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন দৃঢ় ক'রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর। ইম্‌প্রেসনিষ্টদের সাতরঙের বর্ণদানি তাঁরা গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার সঙ্গে আনলেন বর্ণের অনুপূরকতত্ত্ব বর্ণবিজ্ঞান অনুসারে।

ইম্‌প্রেসনিষ্টরাও বর্ণের অনুপূরকতত্ত্ব মানতেন, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁদের নির্দ্ধারক ছিল চোখ, কিন্তু নিও-ইম্‌প্রেসনিষ্টদের হ'ল বিজ্ঞান। যেমন, ধরা যাক, নীল শ্লেট-ছাওয়া ছাদের বাড়ি আঁকতে হবে, নিও-ইমপ্রেসনিষ্ট শিল্পী বাড়ির দিকে প্রথমে চাইবেন না, তিনি প্রথমে দেখবেন আকাশের রঙ কি, যদি আকাশের রঙ কমলালেবুর রঙ হয়, তবে বাড়ীর ছাদ হবে নীল কমলালেবুর রঙ, কিন্তু তার সঙ্গে সাদারঙের ছোপ দিতে হবে আর থাকবে সবুজ রঙের ছোপ; এ সবুজ রঙ ছাদে নেই, আকাশে নেই, কিন্তু এ হচ্ছে কমলালেবু-নীল রংএর প্রতিপূরক রং; চোখ অজানাভাবে এ সবুজ রং দেখছে বৈজ্ঞানিকমতে; সুতরাং এ সবুজ রঙ দিতে হবে, কমলালেবু-নীলের সঙ্গে।

নিও-ইম্‌প্রেসনিষ্টরা আর একটি নূতন রীতির

প্রবর্ত্তনা করলেন। তাঁরা বললেন, এক বিশুদ্ধ রঙ আর এক বিশুদ্ধ রঙের সঙ্গে বর্ণদানিতে ত মিশ্রিত হবেই না, পটেতেও যে মিশ্রিত হবে তা ইম্‌প্রেসনিষ্টগণ যে-ভাবে মিশ্রণ করেছেন তুলির লম্বা টান দিয়ে—সে-ভাবে হবে

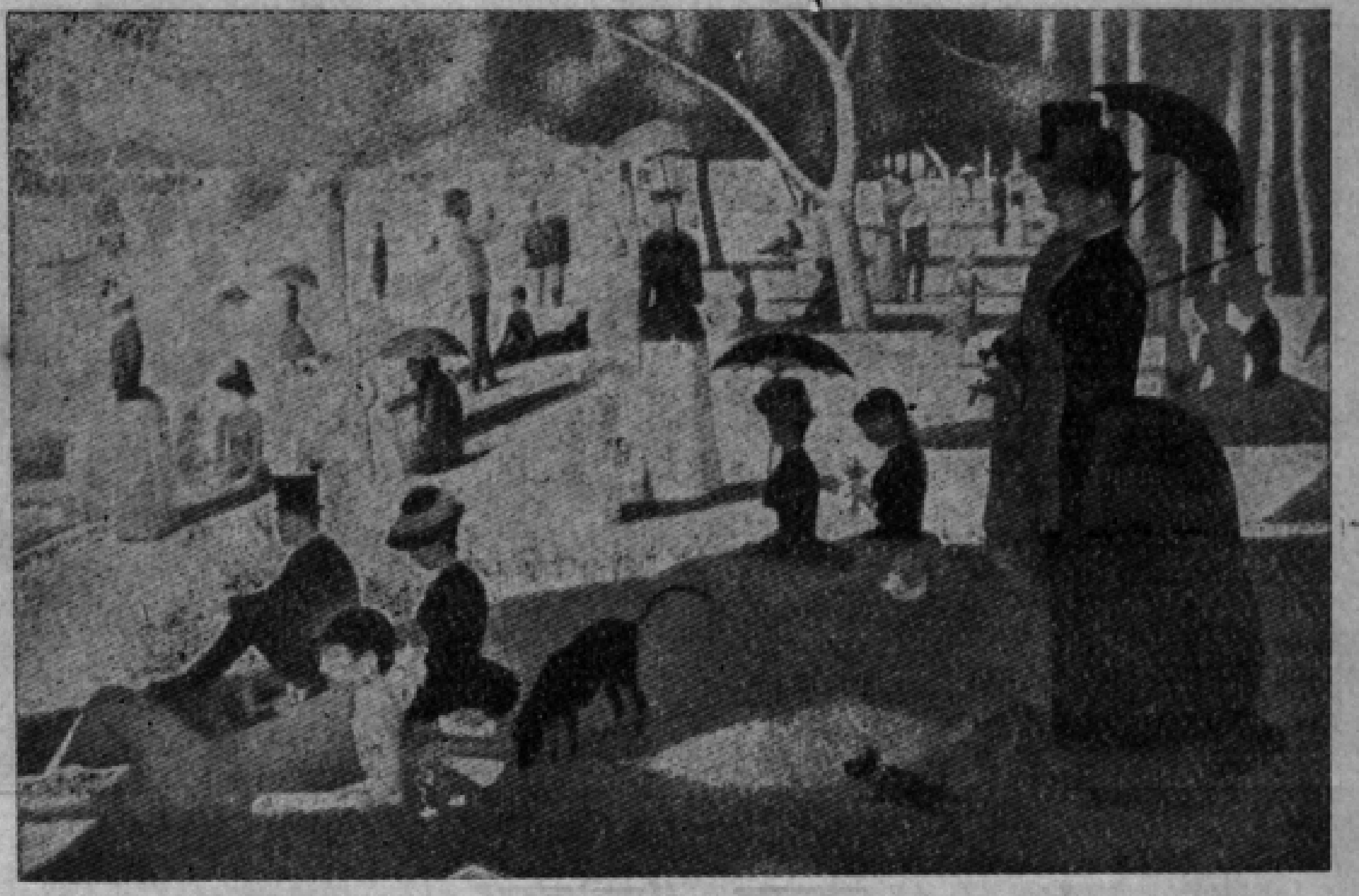


সিঁঞাক—"বন্দরে"

না; এক রঙের ছোপের পাশে আর এক রঙের ছোপ পড়বে; দুই রঙের ছোপ পাশাপাশি থাকবে, দর্শকের চোখের দৃষ্টিতে তাদের মিলন হবে। এই রঙের ছোপ হবে ছোট বিন্দুর মত; তুলির টান আর প্রশস্ত ও লম্বা রইল না, হ'ল বিন্দুময়। এই নবরীতির নাম হ'ল Pointillism, বিন্দু-অঙ্কনরীতি। রঙের প্রতিমাত্রা ভাগ ক'রে সে রঙ পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে হবে রঙের বিন্দুর পর বিন্দু পাশাপাশি বসিয়ে, বিন্দুগুলি ছোট-বড় হবে না।

চিত্র বিন্দু-অঙ্কনরীতিতে হয়ে উঠল মোজেয়িক আর্ট, নানা রঙের বিন্দুর জাল বোনা—যেন নানা মণিমাণিক্য-খচিত পট।

স্যরা (Seurat, ১৮৫৯-১৮৯১) ও সিঞাক্ (Signac, ১৮৮৩—) হলেন এই পোয়াঁতিলিজ্‌মের পাণ্ডা। কিন্তু আর্ট যখন শিল্পীর দর্শন, প্রাণের অনুভূতি, সৌন্দর্য্যের সাধনা না হয়ে বিজ্ঞানের নিয়ম পরিচালিত রীতির দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হ'ল, তখন তার আর কোন প্রাণ, কোন সুষমা রইল না। ইম্‌প্রেসনিষ্ট-অঙ্কনরীতিকে নিও-ইম্‌প্রেসনিষ্টরা



স্যরা—"বেড়াবার বাগান"

এমন রূপ দিলেন যে, ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যদর্শনের চক্ষু অন্ধ হ'ল। ইম্‌প্রেসনিজম্ হয়ে এল জীবনহীন; সৃষ্টি নয়, বৈজ্ঞানিক বর্ণতত্ত্ব অনুসারে আঁকার পরীক্ষা। বস্তুর রেখা-রূপ, তার সৌন্দর্য্যবিন্যাস চলে গিয়ে ছবি হয়ে উঠল, নানা রঙের প্রতিফলক এক রঙীন ক্ষেত্র, নানা রঙের বিন্দুর জালে রঙের পর্দ্দার সংযোগে এ ক্ষেত্র গড়া; বস্তুর কোন মূর্ত্তি নেই, কেবলমাত্র আলোর দ্যুতি। এই অঙ্কনরীতির প্রতিক্রিয়ারূপে এল এক্সপ্রেসনিজম্।

৭

আলো হচ্ছে জীবনের, আনন্দের প্রতীক। ইম্‌প্রেসনিষ্ট চিত্রকরদের আলোকভরা ছবিগুলি চঞ্চল জীবনের আনন্দময় উচ্ছ্বাসে ভরা; প্রকৃতি,নরনারী, পৃথিবীকে আমরা নব আনন্দময় রূপে দেখতে পাই; এই নদী বন পাহাড় মাঠ, এই জলস্রোতক্ষুব্ধ বৃক্ষসারিশোভিত পথ, সব আলোর দ্যুতিতে আনন্দের সুরে ভরা; কোথাও কদর্য্যতা, বীভৎসতা নেই; অন্তরের বেদনা, জীবনের সমস্যা, শক্তির

সংঘাত, দুঃখের সংগ্রাম—ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পীর কাছে এ সব অলীক।

আমাদের চোখে এ প্রতীয়মান জগৎ একদিকে রঙের জগৎ, আর একদিকে গতির জগৎ; এই রঙের ধারা গতির সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আলোর বন্যার চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে বস্তুর স্থূলরূপ ভেঙে গিয়ে রঙের পর রং ফুটে উঠছে; আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নব নব সৌন্দর্য্যরূপিণী প্রকৃতির যেন কোনো রঙীন অঞ্চল দুলছে, কাঁপছে, ঝলমল করছে,—আলোকোদ্ভাসিতা আনন্দময়ী। ইম্‌প্রেসনিজম্ আমাদের সৌন্দর্য্য উপভোগের দৃষ্টি দিয়েছে। *

* প্রবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে---

(1) Die Kunst des Realismus und des Impressionismus von E. Waldmann.
(2) d'Eugène Delacroix au Neo-Impressionnisme par Paul Signac.
(3) Manet par J. E. Blanche.
(4) Claude Monet par Camille Mauclair
(5) The French Impressionists by Camille Mauclair.
(6) Outline of Art by Sir William Orpen.

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৩

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর অজয়ের অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, কিন্তু তখনও রৌদ্রের দীপ্তি মরিয়া যায় নাই; শুভ্র সমুজ্জ্বল কম্পিত জলরাশি, বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার উপর আলোছায়ার ছুটাছুটির প্রতিযোগিতা, নির্ম্মল নীলাকাশে খণ্ডমেঘের আলিপনা, দিগন্তপ্রসারী শ্যামল প্রান্তর, তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন গ্রামরেখা, এ-সমস্তের দিকে চাহিয়া তাহার ঘুমাইতে ইচ্ছা করিল না। একবার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদিনের সহযাত্রিণীদের সন্ধান সে করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের দর্শনলাভ অনায়াসসাধ্য নহে বুঝিতে পারিয়া সে স্থির করিল, পল্লীলক্ষ্মীর প্রসন্ন স্নেহস্পর্শের মত যে শ্যামল স্নিগ্ধতার প্রসাদকে সে আজ তার দুই চোখের দৃষ্টি এবং হৃদয় ভরিয়া লইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতিকার মত সেই সম্পদই তাহার নয়ন-মনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এ জীবন বৃহৎ, ইহার মাধুর্য্যের পুঁজি অফুরন্ত, ইহার সম্ভাবনার কোথাও শেষ নাই। একটি মোহের গ্রন্থি বাঁধা হইতে-না-হইতেই ছিঁড়িয়া গেল বলিয়া সে শোক করিবে না।

জাহাজের পিছনের টানা ঢেউ লাগিয়া একটা জেলে-ডিঙ্গি হাবুডুবু খাইতেছিল। "ঐ গেল, গেল," বলিয়া সুভদ্র ঠিক তাহার কাঁধের উপর প্রায় চীৎকার করিয়া উঠাতে সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। জেলেডিঙ্গিটা ডুবিল না, ঢেউয়ের টান সরিয়া আসিতেই তাহার দোলা থামিয়া গেল। পিছনের গলুয়ে বৈঠা লইয়া যে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ বীরদর্পে লাফাইয়া উঠিয়া দুই হাতে মাথার উপর বৈঠাটাকে নাড়িয়া কি বলিল, এতদূর হইতে বোঝা গেল না, রোদে বৈঠাটা চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। সুভদ্র সত্যই ভয় পাইয়াছিল, এখন আরাম পাইয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসি থামিলে রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া নীচের আবর্ত্তিত জলধারার দিকে চাহিয়া অজয় কহিল, "বৈঠা দিয়ে জাহাজটাকে এক ঘা দেবার মতলব, না আর-কিছু?"

সুভদ্র আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "এতটা আশা করিনি। এততেও ডোবেনি যে তাইতেই জাহাজটাকে বেশ এক ঘা দেওয়া হয়েছে, এই বোধ-হয় ওর বক্তব্য।"

সেইখানটায় জেলেডিঙ্গির ভিড়। ঘন ঘন শিটি দিতে দিতে জাহাজ অগ্রসর হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্ক অজয়ের বাহুতে মৃদু করস্পর্শ করিয়া সুভদ্র কহিল, "এইদিকে দেখুন।" কিছু সে

একটা দেখাইল, জাহাজের সম্মুখের ডেকে একরাশ স্তূপাকার কাছির আড়ালে বসিয়া একটি অবগুণ্ঠনবতী জননী উৎক্ষিপ্ত জলধারার ছাট হইতে নিজের শিশুটিকে বহু ক্লেশে আড়াল করিতেছে। একতলায় দুতলায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভিড়ে আর কোথাও পর্দ্দা বাঁচাইয়া বসিবার স্থান নাই, তাই এই দুর্ভোগ। কিন্তু অজয় দেখিয়াও সেদিকে দেখিল না। নানা দিগ্‌দেশের যাত্রী, আলোছায়া-বিচিত্র কত সংসারযাত্রার এক-একটি বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা আজ এই একটি যাত্রার মধ্যে একসঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। কেহ কাহাকেও জানে না, দুই দণ্ড পরে কেহ কাহাকেও মনে রাখিবে না, তবু কোন্ একটি অপরূপ আত্মীয়তার বন্ধন ইহাদের আজ একসঙ্গে অলক্ষ্যে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছে। দুই দণ্ডের পরিচয়ের পরিধির মধ্যে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবনের স্রোত অস্থির গুঞ্জনে তরঙ্গায়িত হইয়া বহিতেছে। অজয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহু-যাত্রীসমাবেশের মধ্যে জীবনের সেই অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন রূপটিই কেবল দেখিল। একসঙ্গে বহু-বিচ্ছেদের বেদনা এবং বহু-মিলনের অধীর প্রত্যাশা তাহারও বুকের মধ্যে রক্তস্রোতকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ক্রমে আর সব-কিছু ভুলিয়া বুকের মধ্যেকার সেই চাঞ্চল্যটিকেই সে কেবল অনুভব করিতে লাগিল। দিনের আলো বিষণ্ণ ছায়াভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, অপর দিকের রেলিঙের ওপারে দিক্‌চক্রবালের কাছে কৃষ্ণায়মান বনরেখার দিকে চাহিয়া তাহারও হৃদয় আবার একবার কোন্ নামহীন, কিন্তু গভীর বেদনায় ভার হইয়া উঠিল। সুভদ্রের একটু কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল, "আপনি এ রকম হঠাৎ চ'লে এলেন, আপনার বাড়ির লোকদের কথা ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

সহযাত্রী বছর-দশ বয়সের একটি বালককে জুটাইয়া লইয়া সুভদ্র তখন তাহার সঙ্গে একটি লেবু সহযোগে লোফালুফি খেলা সুরু করিয়াছিল, অজয়ের দিকে তাহার চাহিবার অবসর ছিল না, তবু কহিল, "না, না, দুঃখ পাবেন না। যাদের কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছেন, তারাই যখন সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেনি তখন স্বচ্ছন্দে তাদের আমরা ভুলে যেতে পারি।"

অজয় কহিল, "সব কথাই কি আর মুখফুটে বলতে হয়। সে যাক্, ওঁরা দুঃখ পেয়েছেন তা আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত, ক্ষমা চাচ্ছি।"

একটুক্ষণ খেলা থামাইয়া লেবুটাকে একলা লুফিতে লুফিতে সুভদ্র কহিল, "না, না, কি যে বলেন! আপনি কি আমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন? আমার অম্‌নি খেয়াল হ'ল চ'লে এলাম।" তারপর একটু হাসিয়া কহিল, "অবশ্য আপনি যদি কয়েকটা দিন থাকতে রাজি হতেন, আমিও খুব খুশী হয়েই থেকে যেতাম।"

অজয় মাথা নীচু করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর দ্বিধাজড়িত কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "এখন মনে হচ্ছে থেকে এলেও হ'ত।" অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মন তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে এই কথাটি বলিবলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। এবার অতর্কিতে তাহা বলা হইয়া গেল, তাহার মনের উপর হইতে একটা গুরুভার বোঝা নামিল।

সুভদ্র তাহার দিকে এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "সত্যি বলছেন?"

সে-দৃষ্টির সম্মুখে অজয় কেমন মুষড়াইয়া গেল, কষ্টে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "সেকথা এখন আর ভেবে লাভ কি?"

কিছুক্ষণ অজয়ের আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া সুভদ্র অকস্মাৎ আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমি প্রভাকে লিখব, একটু হাসতে পেলে সে-বেচারীর উপকার হবে।... যাই বল, এটা ঠিক যে তোমাকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখলে এতটা সৃষ্টিছাড়া লাগে না।"

অজয় তাহাদের বাড়ি থাকিয়া আসিতে পারিলে খুশী হইত, তাহার এই আন্তরিকতার প্রতিদানে সুভদ্র তাহাকে তুমি সম্বোধন করিয়া আন্তরিকতা জ্ঞাপন করিল। অজয় তাহা লক্ষ্য করিল কি-না বোঝা গেল না, লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, প্রভাকে লিখতে হবে না। অবশ্য আমি একটু সৃষ্টিছাড়া আছিই এবং তাই নিয়ে আমি গর্ব্বও ক'রে থাকি।" প্রভাকে লিখিতে

বারণ করিল, কিন্তু সুভদ্র হয়ত প্রভাকে লিখিবে, হয়ত প্রভা জানিবে অজয় সৃষ্টিছাড়া, সে জোর করিয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু আসলে চলিয়া আসিতে সে চায় নাই, কেন চলিয়া আসিতে চায় নাই—কোনও অবসর সন্ধ্যায় নিভৃতে বসিয়া হয়ত প্রভা সেই গূঢ় সমস্যাটির সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে, এই কথাগুলি বারংবার তাহার মনের তারে অধীর ঝঙ্কারে ঘা দিতে লাগিল।

সুভদ্র খেলার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, অজয়ের পাশে রেলিঙে পিঠের ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু গর্ব্ব করবার মত গুণ সত্যিই তোমার কতকগুলি আছে, আজ কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি নিজে হয়ত সেগুলির কথা জান না।"

অজয় সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল না, কহিল, "সেইটেই ভাল ব্যবস্থা। নিজের সদ্‌গুণগুলির সঙ্গে খুব বেশী পরিচয় থাকলে মানুষ নিজেকে কেবলই নিজের ছাঁচে গড়তে থাকে। কিন্তু কারও পদাঙ্ক অনুসরণ করা বিধাতা আমার স্বভাবে দেননি, নিজেরও না।"

সুভদ্র হাসিয়া কহিল, "সেইটেকেই নিজের একটা সদ্‌গুণ ঠিক ক'রে সেই অনুযায়ী ভাবতে এবং কাজ করতে সুরু করতেও ত পার? কিছুতেই কোনও বাঁধা-পথে পা দেব না, এ-সঙ্কল্পেরও একটা বন্ধন আছে।"

অজয় এ কথার আর কোনও জবাব দিল না, তাহার চিন্তার ধারা কিছুক্ষণ সুভদ্রের শেষ কথাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া গোধূলি-পরিব্যাপ্ত পল্লীপ্রকৃতির করুণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া হারাইয়া গেল। তাহার সমস্ত চৈতন্যকে আবৃত করিয়া একটি রহস্যময় অসীমতা, নক্ষত্রখচিত একখানি কবরী, দুইখানি শ্যামল পদপল্লব এবং একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টির অতল গভীরতা চতুর্দ্দিক্‌কার সৌন্দর্য্যলোক হইতে প্রাণ আহরণ করিয়া একটি পরিচিত প্রিয়স্পর্শের মত পড়িয়া রহিল। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সুভদ্র আবার তাহার কিশোর সাথীটিকে জুটাইয়া খেলা এবং বিশ্রম্ভালাপে মনোনিবেশ করিল।

অজয়ের হৃদয়ের সম্মুখে সমুদয় বিশ্বসৃষ্টিই সেদিন যেন নাই, অপরিচয়ের যবনিকা উঠিয়া যাইতে অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে, সানাই বাজিতেছে, দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং হৃদয় মধুময় হইয়া গিয়াছে। শৈশব হইতেই সে ভাবিতে শিখিয়াছিল, বিশ্বের সমুদয় বস্তুই কোন-না-কোন একটি বিশেষ অর্থে তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সে যেন একটি অচিন্তিত উপায়ে এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে, একেবারে তাহার মর্ম্মশতদলটির মধ্যে রহিয়াছে। সেই বিশেষ অর্থটি যে কি, আজ যেন পুলকিত চিত্তে তাহারই আভাস সে হৃদয়ঙ্গম করিল। কম্পিতবুকে স্বয়ম্বরা ধরিত্রী আজ যেন বরণমালা লইয়া অন্তরালে তাহার জন্য অবস্থান করিতেছেন। দেহে-মনে-প্রাণে নিজেকে কল্পনায় সে সম্রাটের বেশে সাজাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে দ্বিতলায় আসিয়াছিল। হঠাৎ প্রথম শ্রেণীর কেবিনগুলির দিক হইতে একটা চকিত শব্দ এবং তার পরেই উচ্চকণ্ঠের কোলাহল কানে আসিল। গতকল্যকার দুর্ঘটনা-জনিত উত্তেজনার স্মৃতি তখনও তাজা ছিল, সহসা তাহার চঞ্চল-রক্তস্রোতে যেন বহুকণ্ঠের আর্ত্তস্বর ধ্বনিত হইতে লাগিল, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি।...সেদিকে ডেকের যাত্রীদের যাওয়া বারণ, যতটা সম্ভব অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, তাহার পূর্ব্বদিনের সহযাত্রিণীদের সঙ্গী সেই স্থূলদেহ প্রৌঢ় ডেকের উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া অত্যন্ত ব্যথাকাতর মুখে পিঠে কোমরে এবং হাঁটুতে পর্য্যায়ক্রমে হাত বুলাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে ক্যান্‌ভ্যাসের একটা ডেক চেয়ার ভাঙিয়া সটান্ হইয়া পড়িয়া আছে। নীল-পাজামা-পরা দুইজন খালাসীকে মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই বলিয়া তিনি গালি দিতেছেন। তাহারা প্রতিবাদ করিতে গিয়া আরও বেশী করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে।

সেদিকেই উপরে সারেঙের ঘরে যাইবার সিঁড়ি। স্থূলতায় প্রৌঢ়ের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, আদ্দির পাঞ্জাবী এবং পাজামা পরা মুসলমান সারেঙ খবর পাইয়া হেলিতে-দুলিতে নামিয়া আসিল। ত্রস্তে কহিল, "কি হয়েছে

"আর কি হয়েছে মাশয়! আমার কোমরটা গেছে আর কি। ফার্ষ্ট ক্লাসের ডেকে এমন তেঠেঙে ভাঙা চেয়ার তোমরা রাখ কি ব'লে? আমি কলকাতায় গিয়েই কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট করব।".

সারেঙ বিধিমতে দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রৌঢ়ের রাগ পড়িল না। ক্রমাগত সকলকে গালি দিতে লাগিলেন, যে-কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট করিবেন বলিয়াছিলেন তাহাদেরও রেয়াত করিলেন না। অজয় যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "যারা ডেকে যাচ্ছে বেশ যাচ্ছে, আমি বেশী পয়সা খরচ ক'রে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট ক'রে প্রচুর লাভ করেছি।"

প্রৌঢ় অজয়ের দিকে চাহিতেই সেও আশান্বিত হৃদয়ে তাঁহার দিকে তাকাইল, চোখের দৃষ্টিতে সমবেদনা ভরিয়া দিল, কিন্তু প্রৌঢ়ের দৃষ্টিকে বাঁধিতে পারিল না। বোঝা গেল ডেকের যাত্রীদের সম্বন্ধে তাঁহার ঈর্ষ্যা যতই থাকুক, অবজ্ঞাও তাহা অপেক্ষা কম নাই। হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় চকিতে তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। জাহাজের একেবারে সম্মুখের ডেক ঘুরিয়া সহসা একটি দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

অজয়ের দেহ-মন-উপলব্ধি ভরিয়া কি সুর যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল নিজেই সে তাহা বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে পারিল না সে-স্বর আনন্দের না বেদনার, কেবল অনুভব করিল, তাহার সমস্ত বিগত জীবন এবং আজিকার এই রাত্রিটির মাঝখানে একটি সুদুস্তর ব্যবধানের বারিধি তরঙ্গময় হইয়া বহিতেছে। কাল নিশান্ধকারে এই জ্যোতির্ম্ময়ীকেই একান্ত সান্নিধ্যে সে যে কাছে পাইয়াছিল সে কথাও তাহার মনে রহিল না। স্বাভাবিক সঙ্কোচ ভুলিয়া দুই চোখের অকুণ্ঠিত দৃষ্টি ভরিয়া তরুণীকে সে দেখিতে লাগিল। কেবল ভুলিতে পারিল না যে দেখিবামাত্রই ইহাকে চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয় না, তাহার কল্পিত-অকল্পিত কোনও মানসীমূর্ত্তির সঙ্গে ইহার তুলনা মিলে না, এ যেন সত্যই মানবী নহে, এ যেন সর্ব্বতোভাবেই অপরূপ এবং অভিনব। তবু এ যে পর, এ যে অপরিচিত, কেন সেই বেদনা সমস্ত বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া বাজিতে থাকে? কেন ইহার কাছে আত্মসমর্পণ করিবার আগে ইহাকে জয় করিবার কথা মনে হয়?

প্রৌঢ়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তাঁহার সঙ্গে তরুণীর কি যে কথা হইল, তত দূর হইতে অজয় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইটুকু বুঝিল, প্রৌঢ়ের অত্যন্তই কষ্ট হইতেছে এবং তাঁহার হাতের ইঙ্গিতে মনে হইল, তিনি তাঁহার কেবিনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু পারিতেছেন না। খালাসীরা গালাগালি খাইয়া সদলে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, যাত্রী যাহারা কাছাকাছি ছিল নিতান্ত উপরোধ ভিন্ন তাহাদের কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা করা বৃথা। তরুণী তাহা ভাল করিয়াই জানিত, সুতরাং অত্যন্ত দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেই একবার প্রৌঢ়কে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহের ভার এতটুকুও উত্তোলন করা কি তাহার কাজ? অজয় সহসা সম্বিৎ পাইয়া দেখিল, তরুণী তাহারই দিকে আসিতেছে।

প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর ডেকের মাঝখানকার রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পরিষ্কার কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে তরুণী ডাকিল, "শুনুন!"

মন্ত্রাহতের মত অজয় অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাকে দুই চোখ বুলাইয়া তাড়াতাড়ি একবার দেখিয়া লইয়া তরুণী এক মূহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর দূরে সহসা কাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "ঐ ভদ্রলোকটিকে একবার ডেকে দিন না?"

অজয় ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, সুভদ্র কাছেই কোথায় ছিল, বড় বড় করিয়া পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। অজয়ের চোখের সম্মুখে সহসা যেন অন্ধকার নামিয়া আসিল, দুই কর্ণ যেন বধির হইয়া গেল, লজ্জা হতমান এবং ক্ষোভের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতে পড়িতে সে নীচে নামিয়া আসিল। সুভদ্র সত্যই তরুণীর কাছে গেল কি-না, তাহা দেখিতে সে দাঁড়াইল না। তাহার ও-রূপ আকস্মিক আচরণে তরুণী এবং সুভদ্র উভয়েই কি মনে করিল তাহা চিন্তা করিবারও তাহার

অবকাশ হইল না। নীচের ডেকে বয়লারের পাশে একটা জায়গায় কতকগুলি স্তূপাকার চালের বস্তার আড়ালে অন্ধকারে নিজেকে লুকাইয়া সে আত্মরক্ষা করিল।

নিজের শরীরের দিক্‌কার ত্রুটি লইয়া লজ্জা এবং ক্ষোভ তাহার চিরকালই ছিল, কিন্তু কখনও এই ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা তাহার কিংবা তাহার অভিভাবকদের দ্বারা হইয়া উঠে নাই। যতদিন ইস্কুলে পড়িত, কোনও খেলার দলে কখনও সে যোগ দেয় নাই। ক্রীড়া-বর্ত্তুল লইয়া যে-সব ছেলেরা মাঠে মাঠে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, ক্লাসের পরীক্ষার খাতায় তাহাদের প্রায়ই বর্ত্তুলাকার ফল লাভ ঘটিতে দেখিয়া খেলাধূলাজাতীয় সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই তাহার মনে কুসংস্কারমিশ্রিত একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছিল। গৃহে এবং পাঠাগারে অভিভাবকেরা এই কুসংস্কার দূর করিতে তাহাকে সাহায্য ত করেনই নাই, বরং ইহাকে প্রশ্রয়ই দিয়াছিলেন। হিতাহিতজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবার পর বহুবার খেলার দলে সে যোগ দিতে গিয়াছে, কিন্তু খেলার মাঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজত্ব, সেখানে তাহার স্থান হয় নাই। যেখানে তাহার উৎসাহ প্রাপ্য ছিল, সেখানে উপহাস জুটিয়াছে। গৃহের গোপনতায় যতটা চেষ্টা চলে তাহা সে বহুবার সুরু করিয়াছে, কিন্তু নিজের স্বভাবের অধৈর্য্যের ফলে কোনও চেষ্টাই সমভাবে বেশী দিন ধরিয়া সে করিতে পারে নাই। হয় অতি শীঘ্র ফললাভের আশায় বাড়াবাড়ি করিয়া বিপরীত ফল লাভ করিয়াছে, নয়ত অতি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ সে-সমস্ত কথা ভাবিয়া তাহার অনুশোচনার আর সীমা রহিল না।

জাহাজের নীচের ডেকের সেই জায়গাটা জুড়িয়া তপ্ত বাষ্পের উত্তাপ, জাহাজের স্রোতঃব্যাহত প্রখর গতির স্পন্দন, সলিলস্পৃষ্ট নৈশ বাতাসের অবসর-স্পর্শ, বহু কণ্ঠের অস্পষ্ট কোলাহল-গুঞ্জন এবং পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রা এ-সমস্ত মিলিয়া অজয়ের বেদনাতুর ক্লান্ত মনটাকে ঘিরিয়া ঘুমের মায়াজাল রচনা করিতে লাগিল। কখন সে যে সেইখানেই একটা চালের বস্তার উপর জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতেও পারিল না। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল, যাদুকরের খেলা হইতেছে। নেপথ্য হইতে নানা জানা-অজানা বাদ্যযন্ত্রে কোন্ অপরূপ সঙ্গীতের গুঞ্জন উঠিতেছে। বিপুল জনসমাগম, যাদুকরের মুখ দেখিতে পাওয়া কঠিন, তবু কোনও রূপে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া সে দেখিল মণিমুক্তাখচিত বেশ পরিধান করিয়া, হীরার মুকুট মাথায়, হাতীর দাঁতের মায়াকাঠি হাতে সুভদ্র দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

সুভদ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখতে চাও তুমি ?"

অজয় কি যে কোন্ ভাষায় বলিল, নিজেই তাহার অর্থ বুঝিল না। এইটুকু বুঝিল, কিছু একটা বলা হইয়াছে, কেননা, সুভদ্র ইউরোপীয় কায়দায় কটি হইতে দেহের ঊর্দ্ধভাগ নমিত করিয়া কহিল, "Very good, sir।" তারপর গজদন্তের দণ্ডের এক আঘাতে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেই জ্যোৎস্নাফুলের মত পেলবোজ্জ্বল-কান্তি এক তরুণী বিপুল কবরীর ভারে মাথা নত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অজয় তাহার সমস্ত অন্তরের আগ্রহের ভাষায় বলিতে লাগিল, তুমি পীড়িত হইতেছ, তোমার কবরীর বন্ধন আমি খুলিয়া দিই, তোমার রূপ-জ্যোৎস্নাকে ঘিরিয়া ছায়াময়ী রাত্রির আলিঙ্গনের মত তোমার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি ছড়াইয়া পড়ুক। যেন সে অগ্রসর হইয়া গেল, বলিল, তোমার মুখখানি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেছি তবু ভাল করিয়া কিছুতেই কেন দেখিতে পাইতেছি না, যাদুকর আমাকে কি যাদু করিয়াছে ? একবারটি তোমার আরও কাছে আমাকে যাইতে দাও, মৃদুহস্তে সন্তর্পণে তোমার চিবুকটি আমি তুলিয়া ধরি, আমার অন্তরের সঞ্চিত আলোকে চির-কালের পরিচয়ে তোমাকে দেখিয়া লই। অথবা তুমি একবারও আমার চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহ নাই বলিয়াই কি তোমাকে দেখা আমার কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতেছে না ? যাদুকর সুভদ্র তাহার বুকের উপর হাতীর দাঁতের দণ্ডের অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া দৃঢ়হস্তে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। অজয়ের দুর্ব্বল দেহ টলিয়া পড়িল।

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া সে রোদন করিতেছে দেখিয়া যাদুকরের করুণা হইল। সে তাহাকে

হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, আচ্ছা, আবার দেখ। তারপর শুভ্রযষ্টি অন্ধকারের গায়ে তুলির মত করিয়া বুলাইয়া নিপুণ চিত্রকরের মত সে আর-একটি মূর্ত্তিকে ফুটাইয়া তুলিল। অজয়ের রোদন থামিয়া গেল, তাহার বেদনাতুর বুকে স্নিগ্ধতার প্রলেপ লাগিল, দেখিল প্রভা। বলিল, তুমি আমার কে হও, কিছুতেই কেন আমার মনে পড়িতেছে না? যাদুকর আমাকে কি যাদু করিয়াছে? আমার যে-মাকে আমি কখনও দেখি নাই, তুমি কি তাঁহার মত দেখিতে? তাহা না হইলে তোমার পায়ের নখর-রাজি কেন আমার এমন চিরপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে, কেন তোমার পা-দুটিকে স্পর্শ করিবার জন্ম আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে? এইখানে যাদুকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অজয়কে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমাকে এমনি দেখতে ত একটুও সৃষ্টিছাড়া লাগে না? কিন্তু প্রভা যে হাসতে পাচ্ছে এতে তার উপকারই হবে। প্রভা হাসিতেছে, তাহাকেই দেখিয়া আঁচলে মুখ চাপিয়া পরিহাসের হাসি হাসিতেছে ভাবিয়া অজয় মাটিতে মাথা গুঁজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার আর সাহস হইল না। সুভদ্র তাহার মায়াকাঠিতে খোঁচা দিয়া দিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল, ওঠ, ওঠ, ওঠ!

অজয় চোখ মুছিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই সম্মুখের একটা বিদ্যুতের আলো তাহার মুখের উপর পড়িল। অত্যন্ত বিরক্তমুখে স্তিমিতচোখে চাহিয়া সে দেখিল, সুভদ্র দাঁড়াইয়া আছে। কহিল, "ঠেলছ কেন?"

সুভদ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ ঘুমোবার জায়গা আবিষ্কার করেছ। আমি এদিকে ভেবে অস্থির, কি-জানি হয়ত পড়েই গেলে জাহাজ থেকে। অমন ক'রে পালিয়ে এলে কেন তখন?"

অজয় কহিল, "পালালাম কখন্ আবার?"

সুভদ্র বুঝিল, এই আলোচনাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিলে ফল শুভ হইবে না। কহিল "পালাওনি তা বেশ, এখন চল, খাবে না?"

"জাহাজের বাটলারকে মুরগীর কারি আর ভাতের ব্যবস্থা করতে বলেছি।"

"আমার ক্ষিদে নেই, খাব না।"

শুদ্ধমাত্র দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠতায় সুভদ্র তাহাকে টানিয়া উঠাইল। লোকের সম্মুখে তাহার সঙ্গে লড়ালড়ি করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে চাহে না বলিয়া অজয় ইহার পর নিরাপত্তিতে উপরে উঠিয়া আসিল। কিন্তু তাহার এত বেশী রাগ হইল, যে, খাবারের থালা সম্মুখে লইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছু খাইলও না, সুভদ্রের কোন কথার জবাবও ইহার পর আর দিল না। মুরগীর কারি সুভদ্রের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য, বাড়িতে ছুটির মাসটা খাইতে পায় নাই, খুব উৎসাহ করিয়া, নিজে মুরগী বাছিয়া দিয়া রান্না করাইয়াছিল। অজয়ের ব্যবহারে তাহার সমস্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়া গেল। দু-একগ্রাস ভাত কোনরকমে গিলিয়া সেও থালাটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া রহিল।

বুড়া বাট্‌লার থালা তুলিয়া লইতে আসিয়া দেখিল, দুজনের কেহই খাবার স্পর্শ করে নাই। কহিল, "কারি রান্না কি ভাল হয়নি, বাবু?"

একটু থামিয়া সুভদ্র কহিল, "না বেশ রান্না হয়েছে।"

অবস্থাটা বৃদ্ধকে বুঝাইবার ভার সম্পূর্ণ সুভদ্রের উপর চাপাইয়া দিয়া অজয় নিঃশব্দে উঠিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। উপরে ডেক জুড়িয়া হাঁড়ি-পুঁটুলির আল তুলিয়া সারি সারি অসংখ্য বিছানা পাতা হইয়াছে। যাহারা আগে আসিয়াছিল, তাহারা বেশ করিয়া ছড়াইয়া গুছাইয়া শুইয়াছে, যাহারা যত পরে উঠিয়াছে তাহাদের তত বেশী জড়াজড়ি এবং ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থা। অজয়দের বিছানা হইতে নীচের সিঁড়ি বেশখানিকটা দূরে, পা গুণিয়া গুণিয়া, প্রতিপদে থামিয়া, নীচু হইয়া, হাঁড়ি-পুঁটুলি সরাইয়া বহু কষ্টে অজয় অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে বিরক্তিতে তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত বসিয়া যাইতে লাগিল, মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। পথের অধিকার লইয়া দু-একজন যাত্রীর সঙ্গে তর্ক করিয়া তাহার মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গেল। ঠিক ইচ্ছা

করিয়া নহে, কিন্তু অনিচ্ছাতেও নহে, দু-একজনের বিছানা সে মাড়াইয়া দিল। কোথাও বা কাহারও জিনিষপত্র সরাইয়া পথ করিতে গিয়া অনাবশ্যক রূঢ়তা প্রকাশ করিল। প্রায় সিঁড়ির কাছাকাছি জায়গায়, গুটানো এক পায়ের উপর আর-এক পা তুলিয়া ছিটের লুঙি এবং লাল রঙের শার্ট পরিয়া একজন যাত্রী শুইয়াছিল। জাহাজের ডেকের মিটমিটে বিদ্যুতের আলোয় চাহিয়া অজয়কে অনেকক্ষণ অবধি সে লক্ষ্য করিতেছিল এবং মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিতেছিল, যে, আর যে যাহাই করুক, সে নিজে এই উদ্ধত ছাত্র-বাবুকে কিছুতেই তাহার বিছানার এলাকা পার হইতে দিবে না। তাহার মাদুরের বিছানার চারি পাশ ঘিরিয়া বড় বড় চামড়ার ট্রাঙ্ক, বিপুলাকার হোল্ডল, টুপির বাক্স, বন্দুকের পেটিকা, টেনিস খেলিবার সরঞ্জাম। অজয় যেই সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটি ট্রাঙ্কের প্রাচীর উত্তীর্ণ হইতে যাইবে, যাত্রীটি দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চাপা গলার গর্জ্জনে তাহাকে বাধা দিল। কহিল, "এধারে রাস্তা নেই, ঘুরে যাও।"

ঘুরিয়া যাইতে হইলে প্রায় সমস্ত পথটাই আবার ঘুরিতে হয়। অজয় সংক্ষেপে কহিল, "রাস্তা নেই, ক'রে নিচ্ছি।" তারপর একটা ছোট ট্রাঙ্ক ধরিয়া টান দিতেই তাহার উপর হইতে একটি গোলাকার টুপির বাক্স গড়াইয়া পড়িয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় গিয়া পৌছাইল, এবং রেলিঙের গায়ে ধাক্কা খাইয়া থামিল। পলকে প্রলয় বাধিয়া গেল। লোকটা চীৎকার-শব্দে অজয়কে গালাগাল দিল, "সাব, সাব" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, যাহারা পূর্ব্ব হইতেই অজয়ের উপর বিরক্ত হইয়াছিল তাহারাও ঘিরিয়া আসিয়া সেই সোর-গোলে যোগ দিল। কাছাকাছি একটা কেবিন হইতে একজন অর্দ্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী বাহির হইয়া আসিলেন। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়া লইয়া মুসলমান খানসামাকে বকিয়া ঘাড়-ধাক্কা দিয়া নীচে টুপির উদ্ধারের কাজে পাঠাইলেন, তারপর উত্তেজনার অবশিষ্টাংশ ব্যয় করিবার অপর পথ না পাইয়া সম্ভবতঃ বালক-জ্ঞানে অজয়ের গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিলেন। অজয়ের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার স্বভাবের প্রচণ্ড অক্ষমা এবং নারীজাতি সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত গভীর সৌজন্য, এই দুই বিপরীত স্রোত মিলিয়া তাহার মনে ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইল, তথাপি আততায়িনীর অবমাননাসূচক কোনও বাক্য সে উচ্চারণ করিল না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিল, মহিলাটি তাহার অপর গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। সুভদ্র যখন ছুটিয়া আসিল, তখন অজয়ের রোখ চাপিয়া গিয়াছে, সে ক্রমাগত একই কথা বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছে এবং প্রহৃত হইতেছে।

সুভদ্র অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া মহিলাটির কাছে ক্ষমাভিক্ষা করিল, কিন্তু ফলে নিজের গালে একটি চপেটাঘাত লাভ করিল। যাত্রীরা সব সার দিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে, কেহ একটি কথাও কহিতেছে না। এমন নিরুপায় অবস্থায় সুভদ্র জীবনে কখনও পড়ে নাই। চকিতে একবার চারি দিক্‌টা চোখ বুলাইয়া সে দেখিয়া লইল, দেখিল, অদূরে একটি কেবিনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সম্ভবতঃ মহিলাটির সহযাত্রী এক যুবা অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়া হাসিতেছে।

সুভদ্র যেন অকূলে কূল পাইল, দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া দুই লাফে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বজ্রগর্জ্জনে কহিল, "হাসি থামাও।"

যুবক হাসি থামাইল বটে, কিন্তু রুখিয়া উঠিয়া বলিল, "যদি না থামাই ?"

সুভদ্র কহিল, "তাহ'লে তোমার এমন অবস্থা করব যে বাকী জীবন নকল দাঁত লাগিয়ে তোমাকে হাসতে হবে। অবিশ্যি তাতে তোমার চেহারা কতকটা ভালই হবার সম্ভাবনা।"

যুবক একথার জবাবে দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া তাহাকে কোনও প্রাণীবিশেষের সহিত উপমিত করাতে সুভদ্র প্রাণপণ শক্তিতে তাহার বাঁ গাল লক্ষ্য করিয়া ঘুঁসি চালাইল। কিন্তু দেখা গেল, ঘুঁসি চালানোর বিদ্যা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর কিছু কম আয়ত্ত নাই। বিদ্যুদ্বেগে নিজের মাথাটা সরাইয়া লইয়া প্রচণ্ড মুষ্টির এক আঘাতে সুভদ্রকে সে ধরাশায়ী করিল। সুভদ্র টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার তাহার সম্মুখীন হওয়াতে দ্বিতীয়

এক ঘুঁসির আঘাতে প্রায় অসাড় দেহে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

ততক্ষণে অজয়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমেই চকিত-দৃষ্টিতে সে একবার প্রথম শ্রেণীর ডেকের দিকে চাহিয়া দেখিল, মনে হইল সেদিকে কেহ নাই, ইতিপূর্ব্বে কেহ ছিল কি-না সে লক্ষ্য করে নাই। সুন্দরী সহযাত্রিণীর চোখে নিজেদের এই নিদারুণ অবমাননা ধরা পড়িবার ভয় তাহার সমস্ত শুভবুদ্ধিকে মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। দুই হাতে সিঁড়ির রেলিং চাপিয়া প্রায় গড়াইতে গড়াইতে তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে প্রায় ঘণ্টাখানেক সে ঘুরিল। সুভদ্রকে অনাত্মীয় জনাসমাবেশের মধ্যে এক ক্রুদ্ধ দুর্দ্দান্ত শত্রুর কবলে একাকী ফেলিয়া আসিয়া তিরস্কারের কশাঘাতে ক্রমাগত নিজেকে সে জর্জ্জরিত করিতেছিল, নিজের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিতেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সে ভুলিতে পারিতেছিল না, যে, ঠিক এমনই অবস্থায় এখনই যদি আবার তাহাকে পড়িতে হয়, আবারও সে পলাইবে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে, তাহাও সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনের কাছে স্বীকার করিতে পারিল না, যে, তাহার মধ্যে স্বভাবজ হীনতা কোথাও কিছু আছে। কাহাকেও সে-কথা বলিতে গেলে উপহাস লাভ করিয়া ফিরিতে হইবে তাহাও সে বিলক্ষণ জানে, কিন্তু কি অদ্ভুত অসহায়তা এবং নিরুপায়তা স্বভাবে দিয়া বিধাতা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন, সে-কথা তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার কথা নয়।

অন্ধকারে অশ্রুআপ্লুত নয়নে একতলার পিছনের ডেকের রেলিঙে বুকের ভর রাখিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, ব্যাধিশীর্ণতা, অনশন, অপমান, লাঞ্ছনা যাহাদের জন্য পথে পথে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বসিয়া আছে তাহাদেরও জন্য কেন যাত্রাসঙ্গিনীর দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া এত মধুর সঞ্চয়, কি হেতু তাহাদেরও বুক একখানি কোমল বলয়িত হস্তের আন্দোলনে এমন গভীর তালে না পাইলে কেন তাহাদেরও হৃদয় এমন করিয়া ভার হইয়া উঠে, প্রেয়সীর চোখে কেন তাহাদেরও নিজেকে সম্রাটের বেশে সাজাইতে ইচ্ছা করে?

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়াইয়া ছিল জানে না, দীর্ঘ শিটির শব্দে তাহার চেতনা হইল যে,জলযাত্রা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এবারে নামিয়া কলিকাতার দিকের ট্রেন ধরিবার পালা। কুণ্ঠিত লজ্জায় পা টিপিয়া টিপিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই সে উপরে উঠিয়া আসিল। দূর হইতেই দেখিল, সেই শ্বেতাঙ্গ যুবকের সঙ্গে সুভদ্রের খুব ভাব জমিয়া গিয়াছে, সুভদ্রের বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করিতে যুবক তাহাকে সাহায্য করিতেছে। একটু আগে যে নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হইয়াছে, সুভদ্রকে দেখিয়া তাহাও আর এখন বিশেষ বুঝিবার উপায় নাই। অজয়কে ধরিয়া আনিয়া যুবকের সঙ্গে সে পরিচয় করিয়া দিল, কহিল,"আমার বন্ধু মিষ্টার অজয় রায়, মিষ্টার স্মাইল্‌স্‌। মিষ্টার স্মাইল্‌স্‌ শিলঙে টিনের খাবারের দোকান করেন, কিন্তু ঘুঁসির বহর দেখে মনে হয় না সে-জাতীয় খাবারে নিজের তাঁর বেশী রুচি আছে।"

অজয়ের সঙ্গে করকম্পন করিয়া যুবক বলিল, "আপনার বন্ধু আমার সঙ্গে জোরে পারেন নি বটে, কিন্তু আজকার যুদ্ধে সত্যিকারের জয় তাঁরই। আমি এইটুকুতেই তাঁর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছি।"

অজয় কোনও কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে আবার বলিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে, আমার মায়ের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়নি, সেইটে করছি। আশা করি কিছু মনে রাখবেন না। মিষ্টার ব্যানার্জ্জী যে প্রথম আমাকে আক্রমণ করেছিলেন ঠিকই করেছিলেন। অপরাধটা আমার মায়ের চেয়েও আমারই আসলে বেশী। আমারই কর্ত্তব্য ছিল তাঁকে নিরস্ত করা। আপনারা ভদ্রলোক, স্ত্রীলোককে কিছু বলতে পারেন না ব'লে নীরবে মার খাচ্ছেন, এটা দাঁড়িয়ে দেখা আমার উচিত হয়নি।"

অজয় সংক্ষেপে বলিল, "সে যা হবার তা হয়ে গেছে।" কিন্তু যুবকের এই প্রাণখোলা স্বীকারোক্তিতেও তার দেহমনের জ্বালা কিছুমাত্র কমিল না।

লক্ষ্য করিতেছে কি-না চকিতে একবার দেখিয়া লইয়া অজয় সুভদ্রের দুটি হাতকে নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। কণ্ঠে আবেগ ভরিয়া কহিল, "ক্ষমা করার চাইতে ক্ষমা পাওয়ার প্রয়োজন আমার এখন বেশী। তুমি বল, আমাকে ক্ষমা করেছ, অপদার্থ অমানুষ ভাবনি ?"

সুভদ্র সত্যই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "অমানুষ কেন ভাবতে যাব ?"

কেন যে ভাবিতে যাইবে অজয় তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইল না, কহিল, "আজ সারা সন্ধ্যা তোমার প্রতি আমি সুবিচার করিনি। মিছিমিছি রাগ ক'রে না-খেয়ে, কথা না-ব'লে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি বল ক্ষমা করেছ, তা না হ'লে তোমার হাত ছাড়ব-না।"

সুভদ্র ভাবিয়াই পাইল না, অজয়ের এত আবেগের হঠাৎ কি কারণ হইয়াছে। তবু শুদ্ধমাত্র তাহাকে খুশী করিবার জন্য কহিল, "তোমাকে তখনই আমি ক্ষমা করেছি, এততেও কি তোমার সন্দেহ যায় নি ?"

অজয় কহিল, "হ্যাঁ গিয়েছে, সেইজন্যেই ত এত শীগ্‌গির আবার ফিরে আসতে পেরেছি।"

সুভদ্র কহিল, "ক্ষমা করিনি জান্‌লে ক্ষমা তুমি চাইতেও আস্‌তে না। ঠিক বলেছি কি-না বল।"

অজয় কহিল "কি-জানি, ঠিকই হয়ত বলেছ।"

দুই জোড়া ট্রাঙ্ক এবং সুটকেসের উপর দুইটি বিছানা চাপাইয়া দুই বন্ধু তাহার উপর পাশাপাশি গদিয়ান হইয়া বসিল। জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার অপেক্ষা করিতে করিতে মন খুলিয়া অনেক গল্পই ইহার পর হইল। দূরে যখন ষ্টেশনের সারিবন্দী আলো অন্ধকার নদীজলে সারি সারি আগুনের চঞ্চল আলিপনা আঁকিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন অজয় কহিল, "আজ প্রায় সারাটা দিন ধ'রে রাগারাগি ক'রে, অপরাধ ক'রে একদিক্ দিয়ে খুব ভালই হ'ল, তোমাকে কেবল পেলাম তা নয়, একদিনের পরিচয়ে অত্যন্ত কাছের ক'রে পেলাম।"

সুভদ্র কহিল, "কিন্তু তোমাকে যে আমি পেলাম, তার জন্যে কোনও দাম এখনও দেওয়া হয়নি।"

অজয় এবারেও বিনয় প্রকাশ করিল না, কহিল, "পরে হবে।"

আবার একবার নিঃশব্দে দুজনে দুজনের করমর্দ্দন করিয়া তাহারা উঠিয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে ট্রেনের একটা প্রায়ান্ধকার কামরায় স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গায় হাত-পা গুটাইয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া অজয় ভাবিতে লাগিল, এই দুইটি দিনের পসরা বোঝাই করিয়া তাহার অদৃষ্টদেবতা কি অদ্ভুত বিপ্লবই না তাহার জীবনে বহন করিয়া আনিয়াছেন। সে যেন কোনও অর্থেই আর সেই আগেকার মানুষ নহে। যাহাদের চিরকাল পরমাত্মীয় বলিয়া জানিয়াছে, এই দুইটি দিন মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের কথা তাহার মনে পড়ে নাই, অপরিচয়ের অন্ধকার কুক্ষিতল হইতে কাহারা উঠিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার ইহকাল পরকাল জুড়িয়া বসিয়াছে। সুভদ্র, প্রভা, কবরীভারপীড়িতা জ্যোতির্ম্ময়ী অপরিচিতা।...হঠাৎ তাহার মনে হইল, সেই অপরিচিতার মুখখানি কেমন, তাহার অনেকখানিই সে ভুলিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে স্মৃতির টুকরাগুলিকে সযত্নে সাজাইয়া বহু চেষ্টাতেও সেই মুখখানিকে সে আর গড়িতে পারিল না। প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের আভাসভরা একটি বিশেষ মুখভাব যেন অশরীরী হইয়া একটি বিদ্যুদুজ্জ্বল গৌরবর্ণকে তাহার মনের উপর ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, কেন এমন হইতেছে। পাছে স্মৃতির গড়া মুখটিতে কোথাও একটু ত্রুটি হয়, পাছে সেই মুখখানির অনিন্দ্যতায় ভুলের কলঙ্কের স্পর্শ লাগে, সেই ভয়েই কি তাহার মগ্ন মন স্মৃতির পথ এড়াইয়া বেড়াইতেছে ? না, সেই এক পলকের দেখাতে তাহার চোখদুটি নিজেদের তৃপ্তির দাবি মিটাইয়া স্মৃতির জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট রাখে নাই, তাই স্মৃতি এমন রিক্ত ? বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, স্বপ্নে তাহার সঙ্গে আর-একবার দেখা হউক। কিন্তু সুভদ্র ইচ্ছা করিলেই ত আর হীরার তাজ, মণিমাণিক্যের গহনা পরিয়া, গজদন্তের মায়াদণ্ড হাতে করিয়া ঘুমের সিংহদ্বার পার হইয়া তাহার স্বপ্নরাজ্যে হাজির হইতে পাইবে না, নয়ত তাহাকে বলিয়া দেখা যাইত।

ঘুম আসিয়াছিল, গাড়ীর ঝাঁকানিতে হঠাৎ চমকিয়া জাগিয়া মনে হইল, ট্রেনটা যেদিক হইতে আসিতেছিল,

আবার সেইদিকেই হু হু করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। মনে মনে নিজেকে ঘুরাইয়া লইয়া ভুলটার সংশোধন করিয়া লইল, তারপর খুশী হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ ঘাট হইতে নোঙর তোলা হইল, এবং কোন্ ঘাটে ফেলা হইল তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। পৃথিবীতে দিগ্বিদিকে কোনই প্রভেদ আসলে নাই। অত্যন্ত গভীর নিশ্চিন্ততার একটা নিঃশ্বাস লইয়া স্বল্পপরিসর বিছানাটাতে পাশ ফিরিয়া শুইল।

মনে আশা জাগিয়া রহিল, প্রভাতে কলিকাতায় নামিয়া কোনও অবকাশে অপরিচিতার মুখখানি আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে।

ক্রমশঃ

বিশ্বভারতী—নারী-বিভাগ

শ্রীআশা দেবী

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে নারী-বিভাগ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে ছোট ও বড় সকল বয়সের মেয়েদের জন্য একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক শিক্ষা দিবার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সকল শিক্ষার আয়োজনগুলিকে সংহত করিয়া একটি মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিবার সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠাতার মনে আছে। কিন্তু যতদিন না তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়, ততদিনও মেয়েদের নানাদিক হইতে শিক্ষা লাভ করিবার যত উপকরণ ও সুযোগ বিশ্বভারতীতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের অন্য কোনও নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাহা সম্ভব নয়।

১। **শিশু-বিভাগ**—ছয় হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত বালিকারা শিশু-বিভাগে পরিগণিত হইয়া থাকে। নারী-ভবনের একটি বিশেষ অংশে একজন পৃথক মেট্রনের তত্ত্বাবধানে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এই বয়সে তাহাদের বাড়িবার সময় বলিয়া তাহাদের খাদ্য, খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহাদের শিক্ষা যাহাতে কেবল পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ না থাকে, সেজন্য তাহাদের বহির্জগতের সহিত পরিচয়ের এবং হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়—বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ্য বিষয় ছাড়া তাহাদের সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রবিদ্যা, কাঠের কাজ, মৃৎ-শিল্প (clay-modelling), সেলাই প্রভৃতির শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

২। **স্কুল ও কলেজ বিভাগ**—স্কুল ও কলেজ বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমীডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের প্রস্তুত করা হয়। এই বিভাগের ছাত্রীরা তাহাদের পরীক্ষার পাঠ্য ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রকলা, সেলাই, বয়নশিল্প বা অন্য যে-কোনও হাতের কাজে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুবিধা দেওয়া হয়। মেয়েদের দেখাশোনা করিবার জন্য নারীভবনে একজন মহিলা ওয়ার্ডেন ও একজন মেট্রন থাকেন, কিন্তু তাহাদের জীবন পরিচালনা করিবার ও সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করিবার ভার প্রধানতঃ তাহাদের নিজেদেরই হাতে। এইরূপে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, সাধারণ রন্ধনশালার কার্য্যে যথাযোগ্য সাহায্য, শিশুদের সময়ানুসারে দেখাশোনা ও রোগীর সেবা প্রভৃতি কার্য্যভার লইয়া যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তাহাই এখানকার শিক্ষাবিধানের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া কেবল সাধারণভাবে শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা

করেন বা যে-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ কেবল তাহারই অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্যও বিশ্বভারতীর নারী-বিভাগে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩। **কলাভবন**—যাঁহাদের কেবলমাত্র সঙ্গীতে বা চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ, তাঁহারা বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্রী হইতে পারেন। কলাভবনের চিত্র-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বিভাগের ছাত্রীরা যদি তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষার জন্য আর কোনও বিভাগে কোনও বিষয় পড়িতে ইচ্ছা করেন তাহারও সুযোগ দেওয়া হয়।

৪। **বিদ্যাভবন**—যাঁহারা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিশেষভাবে কোনও বিষয়ের অধ্যয়ন বা গবেষণা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের ছাত্রী বলিয়া পরিগণিত হন এবং নির্ব্বাচিত বিষয়ে তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বিশ্বভারতী হইতে তাঁহাদের যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষভাবে অধ্যয়ন বা গবেষণা করিবার ব্যবস্থা আছে :—

(১) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, (২) পালি ভাষা ও সাহিত্য, (৩) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, (৪) হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য, (৫) উর্দ্দু, ফার্সী, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, (৬) প্রাচীন ভারতেতিহাস ও কৃষ্টি, (৭) ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, (৮) জৈন-দর্শন ও জৈনশাস্ত্র, (৯) ভারতীয় পাশ্চাত্য দর্শন, (১০) শিশু-মনস্তত্ত্ব ও শিশুশিক্ষা।

৫। **শিল্প-বিভাগ**—যাঁহারা সাধারণ শিক্ষার সহিত কোনও হাতের কাজ বা অর্থকর শিল্পে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত যে-কোন শিল্পে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন,—বয়ন, রঞ্জন, মুদ্রণ, বহি-বাঁধা, গালার কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাই, বাতিক্-কাজ (batik), কাঠ-খোদাই।

৬। **পল্লীসেবা-বিভাগ**—পাশ্চাত্য দেশে যে-সকল মহিলা সমাজের সেবা বা অন্য কোনও জনহিতকর কার্য্য জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেই সেই কার্য্যের জন্য যাহাতে আবশ্যক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, এমন অনেক প্রতিষ্ঠান ইউরোপে ও আমেরিকায় আছে। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে এইরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করিবার গভীর ইচ্ছা জাগিয়াছে, কিন্তু সেই ব্রতগ্রহণের উপযুক্ত হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ এক মহারাষ্ট্র প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত "শ্রীনিকেতনে" পল্লীসেবা ও বিশেষভাবে বাংলার পল্লীগ্রামের নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে সেখানে মেয়েদের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে।

পল্লীবাসী নরনারী বা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক জীবন, বা আর্থিক অনটন বা যে-কোন একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানকে জীবনের ব্রত বলিয়া যে-সকল মেয়েরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেজন্য নিজেদের উপযুক্ত করিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় গ্রামে গ্রামে যে-সকল অনুষ্ঠান আছে তাহাদের সহিত কাজ করিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন এবং পল্লীজীবনের সমস্যা লইয়া শ্রীনিকেতনে যে নিয়মিত বক্তৃতা ও আলোচনা হয় তাহাতে যোগদান করিয়া থিওরিটিক্যাল শিক্ষা লাভ করিতেও পারেন। তাঁহাদের থাকিবার ও কাজ করিবার সুবিধার জন্য সম্প্রতি শ্রীনিকেতনে একটি পৃথক ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হইয়াছে।

যে-শিক্ষা মানব-প্রকৃতির কোনও অংশের বিকাশকে খর্ব্ব না করিয়া তাহার সমগ্র বিচিত্রতাকে সহজ ও সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দেয়, সেই শিক্ষাই বিশ্বভারতীর আদর্শ ও লক্ষ্য। সেইজন্য বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন যেখানে তাহারা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানানুরাগ, সৌন্দর্য্যবোধ, সেবা ও কর্ম্মকুশলতা, সকল দিক হইতে নিজেকে প্রকাশ করিবার ও সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলে।

কষ্টিপাথর

ঐক্যের একটি পথ

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে অন্য অনেক দেশের লোকদের মত ঐক্য জন্মিবার অনেকগুলি বাধা আছে। সেগুলি ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে বটে, কিন্তু কতকগুলি এখনও প্রবল আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে ভাষার ভেদ একটি বাধা। যাহারা ইংরেজী জানে, তাহারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ইংরেজী-জানা লোকদের সহিত মিলামিশা করিতে পারে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী জানিলে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের বিস্তর লোকের সহিত কথাবার্ত্তা এবং ভাব ও চিন্তার বিনিময় চলিতে পারে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক লোক হিন্দী শিখিতেছে। বাংলা জানিলে বঙ্গ বিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা ও আসামের অধিকাংশ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চালান যায়; তদ্ভিন্ন অন্যত্র প্রবাসী বাঙালী এবং কতকগুলি বাংলা-জানা অবাঙালীর সহিতও ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান চলিতে পারে।

ধর্ম্মভেদ পরস্পরের সহিত মিলামিশার যতটা অন্তরায় আগে ছিল, এখন রাজনৈতিক কারণে উহা তদপেক্ষা গুরুতর বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা কর্ত্তব্যবোধে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে মিশিলে এই বাধা ক্রমশঃ কমিবে; কারণ মানুষের সঙ্গে না মিশিলে তাহাকে ভাল করিয়া জানা যায় না, এবং ভাল করিয়া না-জানিলে তাহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় না।

শুধু পুরুষ মানুষরাই পরস্পরের সহিত মিশিলে আমাদের জাতীয় ঐক্য অন্য অনেক দেশের লোকদের মত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নারীরা পরস্পরের সহিত মিশিলে এবং সকল প্রদেশ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীরা সুনীতি শিষ্টাচার অতিক্রম না করিয়া পরস্পরের সাহচর্য্য করিলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে। নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা এইরূপ মিলামিশা ও সাহচর্য্যের অন্তরায়।...এই বাধা অবশ্য ক্রমশঃ দূর হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এখনও চালাইতেছেন। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ইহা ব্যাপকতর হইয়াছে।

সম্প্রতি মুসলমান সমাজে একটি অভিজাততম পরিবারে পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ায় আশা হয়, যে, ক্রমশঃ এদেশের মুসলমান সমাজ হইতেও উহা উঠিয়া যাইবে, যেমন তুরস্ক, এবং কিয়ৎপরিমাণে পারস্য ও অন্য কোন কোন মুসলমান দেশ হইতে উহা উঠিয়া গিয়াছে।...

ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদের লোক-সংখ্যা এবং আয় সকলের চেয়ে বেশী। ইহার নৃপতি নিজামের চেয়ে বড় মুসলমান নৃপতি ভারতবর্ষে নাই। তিনি সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি যে-দিন মুসলমান বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন, সেদিন ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার সম্মানার্থ পর্দ্দা মানা হয় নাই। তিনি তাহাতে প্রীত হইয়া ছাত্রীদিগকে বলেন, "তোমরা দেখিতেছ আমার বাড়ীর মেয়েরা পর্দ্দা মানে না। তোমরাও তাহাদের মত পর্দ্দা মানিও না।" বস্তুত লক্ষ্ণৌতে নিজাম যতদিন

গিয়াছিলেন, বা শহরের দ্রষ্টব্য যে-সব স্থান ও অট্টালিকাদি দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেখানে যেখানে তাঁহার পরিবারের অন্তঃপুরিকারা গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় গিয়াছিলেন। ইহাতে লক্ষ্ণৌয়ের মত মুসলমান সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রের উলেমা ও মুজতাহিদগণ কোন প্রকার প্রতিবাদ বা আপত্তি করেন নাই।

তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশে এ বিষয়ে যেরূপ সংস্কার হইয়াছে, নিজামকে তাহার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছে।...

অবরোধপ্রথা, বোরখাপরিধান প্রভৃতি অনিষ্টকর রীতি দূর করিয়া পারস্যনারীদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা পারস্য দেশে বহু বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন কাল হইতে আগত সুফীদিগের ধর্ম্মমত এবং আধুনিক বাহাই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত এইরূপ চেষ্টার অনুকূল ছিল। ১৯২১ সালে যখন রিজা শাহ্ পহ্লবী তাৎকালিক পারস্যরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন, সেই সময়ে নূতন যুগ আরম্ভ হয় এবং পারস্যের স্বদেশপ্রেমিক মহিলাসমিতি স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্যাদিগকে নানা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। কিন্তু ইহার নিম্নলিখিত ছয়টি উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইতেছে,—

(১) স্ত্রীস্বাধীনতা; নারীদের মধ্য হইতে অবগুণ্ঠন অপসারণ।

(২) সামাজিক, পৌর ও রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে তাহাদের অধিকার স্থাপন।

(৩) ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাদের বিবাহ রদ করা।

(৪) বহুবিবাহ বন্ধ করা।

(৫) স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে বিবাহের সময় স্বামীর অঙ্গীকৃত যৌতুক স্ত্রীর জন্য আদায় করিবার নিমিত্ত বিশেষ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ।

(৬) নারীদের স্বাধীনভাবে সভাসমিতি গঠন ও পরস্পরের সাহচর্য্য করিবার অধিকার, এবং তাহাদের প্রতিপক্ষের সহিত তর্কবিতর্ক চালাইবার অধিকার স্থাপন।

পারস্যের পার্লেমেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভার নাম মজলিস্। কয়েক মাস ধরিয়া মজলিসের সম্মুখে পারস্যের বিবাহঘটিত আইনের পরিবর্ত্তনার্থ একটি বিল্ উপস্থাপিত ছিল। সম্ভবতঃ তাহা এতদিন আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহার একটি উদ্দেশ্য বিবাহের ন্যূনতম বয়স ৯ হইতে বাড়াইয়া ১৬ করা। আইনের আর একটি ধারায় আছে, যে, যদি কেহ একটি পত্নী থাকিতে আবার বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে যাহাকে দ্বিতীয় পত্নী করিতে যাইতেছে তাহাকে প্রথম পত্নীর অস্তিত্বের বিষয় জানাইতে হইবে; না জানাইলে দ্বিতীয় বিবাহ আইন অনুসারে অসিদ্ধ হইবে। আইনের অন্য একটি ধারা অনুসারে বিবাহ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার কেবল পুরুষদের একচেটিয়া থাকিবে না। ইহার অর্থ এই, যে, যে-যে রকম দুর্নীতি বা অন্য কারণে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, স্ত্রীও সেই সেই কারণে স্বামীকে তালাক দিতে পারিবে। তা ছাড়া, বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিলে স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীর নিকট যে-যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা

বিলটি আইন হইবার আগে হইতেই লোকমত পুলিসের সাহায্যে তদনুসারে কাজ আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দশ বৎসরের একটি মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য রাজপথ দিয়া একটি মিছিল যাইতেছিল। তাহাদিগকে থামাইয়া বিয়ের ক'নে ও তাহার বাপমাকে রাজকর্ম্মচারীদের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তাহারা তখনি সরাসরি বিচার করিয়া বিবাহ বন্ধ করিবার হুকুম দিল।

পারস্য অপেক্ষা তুরস্কে সামাজিক পরিবর্ত্তন বেশী হইয়াছে। বোরখা অবগুণ্ঠন তুরস্ক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তুর্করমণীরা এখন অবাধে মুখ খুলিয়া সর্ব্বত্র চলাফিরা করিতে পারে। আইনের দ্বারা তাহাদিগকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নূতন পদবীতে উন্নীত করা হইয়াছে। আর্থিক বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষদের সহিত সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিবাহবিষয়ক আইনও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কন্যাদিগকে আর সম্প্রদান করা হয় না; তাহারা নিজেই নিজের জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচন করে। তালাক দিতে হইলে সুইজারল্যাণ্ড দেশের অনুরূপ তুর্ক আইন অনুসারে ভিন্ন তাহা করা চলে না। সর্ব্বসাধারণের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে বালিকা ও তরুণীরা শিক্ষা পাইতে পারে এবং পাইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রী উভয়ের একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ সমর্থিত হইয়াছে এবং তদনুসারে কাজও হইতেছে।

ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমান সমাজের যে প্রগতি ও উন্নতি হইতেছে ভারতীয় মুসলমান সমাজ তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে না, পারিতেছে না। নিজামের আচরণ তাহার একটি প্রমাণ। বিদেশে যাহা ঘটিতেছে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও দ্বারা তাহার অন্ধ অনুকরণ সমর্থনযোগ্য নহে। বিচার করিয়া সাহসের সহিত শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান তাহা করিলে জাতীয় ঐক্য, সংহতি, প্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

বঙ্গলক্ষ্মী—বৈশাখ, ১৩৩৯]

সূর্য্যালোক ও কাষ্ঠালোকের সম্বন্ধ

ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি বক্সাডুয়ার বনের মধ্যে আমি একটি ভাস্বর কাষ্ঠখণ্ড (sterculia) পাইয়াছিলাম। উহা প্রায় আট মাস পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩০ সালের এপ্রিলের শেষভাগ পর্য্যন্ত আলোক বিকীরণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে ঘরের ভিতরে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। শুনিতে পাই, বর্ষায় ও শরতে নাকি এই সব বনপ্রদেশে ভাস্বর গলিত পত্র ও কাষ্ঠখণ্ড প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কাঠের ছোট একটি টুকরা দুইটি জীবাণুমুক্ত (sterilized) আমকাঠের ফালির মধ্যে রাখিয়া সমস্তটা ভিজা তুলা দিয়া জড়াইয়া একটী উল্টানো কাচপাত্রের ভিতরে রাখা হইয়াছিল। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেই ভাস্বর কাষ্ঠ হইতে অসংখ্য অতিসূক্ষ্ম hyphæ বাহির হইয়া সেই আমকাঠের ফালিদুটিকে ভালরূপে জড়াইয়া ধরিল, অন্ধকারে ঐগুলি বেশ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। অতএব নিঃসংশয়ে বুঝা গেল যে, এই ভাস্বরতার একমাত্র কারণ, sterculia-কাঠের অভ্যন্তরীণ অংশ হইতে আমকাঠের উপরে ছত্রকের উদ্ভব। শুষ্ককাঠে সচরাচর যে-সব বীজাণু থাকে, উহারা এই ভাস্বরতার কারণ নহে। Autoclaved কাঠ আলো বিকিরণ করে না; কারণ উহাকে ২০ মিনিট ধরিয়া ১৪২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত করিবার সময় ছত্রকগুলি মারা যায়।

এই-সব ভাস্বর কাষ্ঠের উপর সূর্য্যালোকের প্রভাব কতটুকু, এ যাবৎ বিশেষ আলোচনা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, ছত্রক ও জীবাণু সর্ব্বদাই আপনা হইতেই আলোক দিতে পারে; কিন্তু নিম্নে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এই দীপ্তি অবিরাম নহে; কারণ সূর্য্যালোকে সজীব hyphæ যে শক্তি লাভ করে, এই উজ্জ্বলতা তাহার উপরই নির্ভর করে।

অত্যুজ্জ্বল কয়েক টুকরা কাঠ শুষ্ক অবস্থায় একটি টেষ্টটিউবের মধ্যে রাখিয়া টিউবটিকে কালো কাপড়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া ভিতরে স্বাভাবিক উত্তাপের মধ্যে সাত দিন পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনই উহা খুলিয়া পরীক্ষা করা হইত; শেষে দেখা গেল যে, উহাদের আলোকবিকীরণ ক্ষমতা সপ্তম দিনের পর নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদিগকে একটি roux টিউবের সঙ্কুচিত অংশে একটু জল দিয়া আর্দ্র করিয়া পূর্ব্বের মত অন্ধকার ঘরে স্বাভাবিক উত্তাপের মধ্যে রাখিয়া দেখা গেল, তাহাদের ভাস্বরতা দুই সপ্তাহের অধিককাল স্থায়ী হইল, এবং আঠারো দিবসের পূর্ব্বে তাহা নিঃশেষ হইল না। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সজীব hyphæ শুষ্ক অবস্থা অপেক্ষা আর্দ্র অবস্থাতেই বেশী সক্রিয় থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ঐ কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে মুক্ত সূর্য্যালোকে ফেলিয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছিল, উহারা আবার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া পাইয়াছিল। একেবারে সোজাসুজি (direct) সূর্য্যালোকে এবং বিকীর্ণ (diffused) সূর্য্যালোকে কাষ্ঠখণ্ডটি রাখিয়া ভাস্বরতার একটু পার্থক্য দেখা গেল। বিকীর্ণ সূর্য্যালোকে কাঠের সাধারণ উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, আর সোজাসুজি সূর্য্যালোকে কাষ্ঠটির কোন কোন স্থান অতিশয় উজ্জ্বল, এবং কোন কোন স্থান অনুজ্জ্বল হইয়া রহিল।

পাঁচ হইতে দশ মিনিট সূর্য্যালোকে রাখার ফলে কাঠের উজ্জ্বলতা যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অতি সহজে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু উহাকে পনের ঘণ্টাকাল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে শুষ্ক অবস্থায় রাখিয়া দেখা গেল যে, উহার ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতা কমিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় কাঠের উপরিভাগ আস্তে আস্তে চাঁচিয়া ফেলিয়া এবং তাহাতে পরিস্রুত শীতল জলের ধারা দিয়া উহার দীপ্তি আবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; এরূপ করাতে ঐ কাষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ hyphæ বায়ু ও জলের সংস্পর্শে আসে। ঐ কাষ্ঠখণ্ড শুষ্ক অবস্থায় ক্রমাগত তিন দিনের বেশী অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে রাখিলে উহার ভাস্বরতা পুনর্লাভের একমাত্র উপায় উহাকে সূর্য্যালোকে ফেলিয়া রাখা। ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

যাহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন একখণ্ড কাঠকে প্রথমে দশ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত সূর্য্যকিরণে রাখিয়া দেখা গেল যে, প্রথম দশ কি পনের মিনিটের মধ্যেই উজ্জ্বলতা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে সেই আলো তীব্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে ও ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকে। ছয় ঘণ্টার পর সূর্য্যের তপ্ত কিরণের অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার ফলে সেই উজ্জ্বলতা আবার কমিয়া যায়। প্রখর সূর্য্যকিরণে (যথা এপ্রিল মাসের দিনের বেলা ১১টার পর) এই উজ্জ্বলতা আরও দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সজীব hyphæ প্রখর সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু যখন ঐ কাঠখানিকে একটি কাচ-নির্ম্মিত আবরণের (glass jacket) ভিতরে তপ্ত কিরণরাশি হইতে আড়াল করিয়া রাখা হইল এবং সেই আবরণের ভিতর দিয়া অবিশ্রান্ত জলস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন সাত ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবার পরেও ভাস্বরতা প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল।

সৌরকরের কোনও বিশিষ্ট রশ্মি এই দীপ্তি পুনর্লাভের কারণ কি-না, তাহা জানিবার জন্য কয়েকবার fi 'er-exper ment করা হইয়াছিল (কাষ্ঠ খণ্ডগুলিকে wr itten fi ter দ্বারা ঢাকিয়া সূর্য্যালোকে রাখা)। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এই উজ্জ্বলতার কারণ সজীব hyphae-র উপর সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক উত্তেজক প্রভাব। সেই কাঠের উপর ভারী কাচের আবরণ দিয়া বেগুনাতীত সূর্য্যরশ্মিকে রুদ্ধ করিয়াও অন্য কোনরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, বেগুনাতীত রশ্মি উজ্জ্বলতাবৃদ্ধির কারণ নহে।

ভাস্বর কাঠের অগ্নিশিখাটিকে micr -রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া অথবা রশ্মিবিশ্লেষণ যন্ত্রের (spectroscope) সাহায্যে পরীক্ষা করিয়াও তাহাতে কোন দীপ্তিশীল ধাতুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই; g ld-leaf electroscope-এর সাহায্যে ও কোন স্বতঃকিরণবিসারী পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু, আলোকবর্ষণে সাধারণতঃ ছোট তরঙ্গের রশ্মিগুলি শোষিত এবং দীর্ঘতর তরঙ্গের রশ্মিগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দীপ্তিশীলতাকে অধ্যাপক ই. এন্, হার্ভের মতানুসারে "Chem lupm nescen e" বলা উচিত।

Quartz রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্র সাহায্যে ভাস্বর কাষ্ঠ হইতে বিকীর্ণ আলোকের একটি ফটো লওয়া হইয়াছিল। উহাতে ·৪৬৫ μ হইতে ·৩৮০ μ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ সবুজ হইতে বেগুনাতীত অংশের প্রাথমিক ভাগ পর্য্যন্ত) একটি স্বল্পায়তন অবিচ্ছিন্ন বর্ণছত্র (spectrum) দেখা যায়।...

সম্প্রতি (১৯৩১ সাল) দক্ষিণ-ব্রহ্ম হইতে আমার নিকট কতকগুলি ভাস্বর কাষ্ঠখণ্ড প্রেরিত হইয়াছে। সেগুলি হইতে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে টেষ্টটিউবে এবং বড় বড় ফ্লাস্কে আমি একজাতীয় ছত্রক জন্মাইয়াছি। উহা অন্ধকারে সুন্দর শীতল আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই ছত্রক *Agaricus* জাতীয় *pleurotus* শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাস্বর কাষ্ঠগুলির সহিত কিন্তু সূর্য্যালোকের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি—পৌষ-মাঘ, ১৩৩৮]

মহিলা-সংবাদ

নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারকল্পে বিবিধ প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। কলিকাতা ৮০ বি ল্যান্সডাউন রোডস্থিত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারিণী মহিলাগণ ইহার কর্ম্মী। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করিয়াছেন, এবং একজন ডাক্তারও আছেন।

বিশেষ করিয়া প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের মধ্যে অত্যাবশ্যক বিষয়ে শিক্ষা প্রচার করাই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইঁহাদের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ১২—৩টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। এখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সন্তান-পালন স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্তানের জননীগণ সন্তানসহ এখানে আসিতে পারেন, কারণ শিশুগণকে রাখিবার স্থানেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুবর্ণ-
[illegible] উপরের ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে এ বিষয়ে সবিশেষ জানা যাইবে।

—

লাহোর মেয়ো আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এবার এই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার ছিল।

—

ময়মনসিংহ মহিলা-সমিতি। এই সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগের রিপোর্ট হইতে অবগত হইলাম, কুড়িটি কেন্দ্রে ইহার কাজ হয়। প্রতি কেন্দ্রে নিয়মমত তাঁতের কাজ ও সেলাইয়ের কাজ হয়। সেলাইয়ের কাজ শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষিত দরজী এবং তাঁতের কাজ শিখাইবার জন্য টিপ্‌রাই তাঁতে নিপুণ একটি শিল্পীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। চরকা ও টেকুয়া দ্বারা



নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ

প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রেই সুতা কাটা হয়। শুশ্রূষা ও ধাত্রী বিদ্যা শিখাইবার ক্লাস আছে। ব্যায়াম ও খেলা শিখাইবার ক্লাস আছে। মধ্যে মধ্যে মহিলাদের দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ জিনিষের প্রদর্শনী হয়। সমিতির অধিবেশনগুলিতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং নানা প্রকার হিতকর প্রস্তাবের আলোচনা হয়। এই সমিতির সভ্যসংখ্যা ৩৫০। দেশে এইরূপ সমিতির সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল।

—

আসাম গভর্ন্মেণ্ট সম্প্রতি শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দকে শিলচর সেণ্ট্রল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের পুত্রবধূ।

—

শ্রীমতী সুরভি সিংহ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বি-এল উপাধি প্রাপ্ত



শ্রীমতী সুরভি সিংহ



শ্রীমতী মায়ালতা সোম

হইয়াছেন। শ্রীমতী সুরভি কলিকাতা বীটন কলেজ হইতে ১৯৩০ সনে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন।

—

শ্রীমতী মায়ালতা সোম বিলাতে থাকিয়া মন্তেসরি শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্তেসরি বিভাগে শিক্ষকতা কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

—

শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক



শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত

বরিশালনিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। করুণাকণা ১৯২৭ সনে ঢাকা বোর্ডের হাই স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৯ সনে ঢাকায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। শ্রীমতী করুণাকণা এ-বৎসর সেখানকার ত্রৈবার্ষিক অনার্স (বি-এ) পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—

বহরমপুরে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী ও শ্রীযুক্তা সুষমা সিংহের



শ্রীযুক্তা সুষমা সিংহ

চেষ্টাযত্নে বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—

শ্রীমতী রমলা দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

—



শ্রীমতী রমলা দে



বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের অধিবাসিনীগণ



মেয়েরা বাগানে কাজ করিতেছে

ডক্টর থিলয়স্বালম, এম-এস্‌সি, পি-এইচ-ডি লক্ষ্ণৌএর ইসাবেলা থবার্ণ কলেজের জীবতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। তিনি মার্কিণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীপ্রতিষ্ঠান ওয়েলেসলি কলেজে এক বৎসরের জন্য বিনিময় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে লক্ষ্ণৌতে আসিবেন ওয়েলেসলি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর অষ্টীন। ইঁহারা উভয়েই কলুম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ডক্টর থিলয়স্বালম গত ২৮ এ এপ্রিল কলিকাতা হইতে মার্কিণ যাত্রা করিয়াছেন।

—

পুরীতে নারী মঙ্গল—

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির হাতে ৺ বসন্তকুমারী চট্টোপাধ্যায় (জষ্টিস স্যর প্রতুল চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী)

পুরীর যে বিধবাশ্রমের পরিচালনার ভার দিয়া গিয়াছেন, উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর উহা পরিচালনা করিতেছেন। উহার নাম পুরী "বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম"। বৎসর দেড়েক আগে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর (সর্ব্বত্র "বড়মা" বলিয়া পরিচিত) ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় স্থানীয় বালিকাদের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা না দেখিয়া বিধবাশ্রমের সংলগ্ন "নূতন বালিকা-বিদ্যালয়" খোলেন। ইহাই এখন এ অঞ্চলের প্রধান বালিকা-শিক্ষাকেন্দ্র। ইহার বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণীর সভার কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই প্রতিষ্ঠান কালে আরও অনেক বড় হইবে, "বড়মা" হয়ত না-ও থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে মশলা দিয়া ইহার মূল গঠন করিয়াছেন, তাহার স্মৃতিকে একটি সুবর্ণের অক্ষয় কৌটার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যালয়টি আরম্ভ হইয়াছে ঠিক এমনি সময়ে, যে-সময়ে প্রায় চতুর্দ্দিক হইতেই আর্থিক অসুবিধার জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। নানারকম আর্থিক অসুবিধার মধ্যে ইহা ভিতরে ভিতরে যে সফল হইয়াছে, তাহা ধরা পড়িয়াছে ঐ পুরস্কার বিতরণী সভার দিনে। সভা ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণে পূর্ণ ছিল। পুরীর রাজাসাহেব সভাপতি ছিলেন। এই জিনিষটির সম্বন্ধে বলা যতই সোজা হউক, কিন্তু বাংলার বাহিরে প্রতিকূল হাওয়ার মধ্যে ইহা গঠন করিয়া তোলা সোজা নহে। পুরস্কার বিতরণীর লম্বা প্রোগ্রাম দেখিয়া, আমার ভয় হইয়াছিল অনেক লোক এত সময় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা থাকিতে পারিবেন কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দৃশ্যটি এতই মধুর বোধ হইয়াছিল যে কেহই সভাত্যাগ করেন নাই। মেয়েদের আবৃত্তি, গান, গতিভঙ্গী, নারীমঙ্গল ও ড্রিল অতি সুন্দর হইয়াছিল। এই সব এমন ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল, যেন মনে হইতেছিল একটি উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতেছি।



শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী

শ্রীযুক্ত এন্ কে, রায় পুরস্কার বিতরণ করিয়া সভার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সভাপতি পুরীর রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেবকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর তিনি শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সহিত সহিত পরিচিত হন, এবং সভার সকল চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বহু ধন্যবাদ দেন। রাণী সাহেবার সহিত "বড়মা"র পরিচয় করিয়া দিবার জন্য তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন।

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

পারস্য-যাত্রা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ এপ্রেল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির ক'রে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হ'ল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্ত্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিনশা ইরাণী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী। তা ছাড়া খবর দিলেন যে, বোম্বাইয়ের পারসিক কন্সাল কেহান সাহেব পারসিক সরকারের পক্ষ থেকে আমার যাত্রার সাহচর্য্য ও ব্যবস্থার ভার পেয়েছেন।

এর পরে ভীরুতা করতে লজ্জা বোধ হ'ল। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না ব'লে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হ'ল। কথা রইল আমার শুশ্রূষার জন্যে বউমা যাবেন সঙ্গে, আর যাবেন কর্ম্মসহায়রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী। এক বায়ুযানে চার জনের জায়গা হবে না ব'লে কেদারনাথ এক সপ্তাহ আগেই শূন্যপথে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্ব্বে আর একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে-ধরাতল ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল স্থল আমাকে পিছু ডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলা দেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করচে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপুরি গাছের ডাল দুলচে বাতাসে, লতাপাতা ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিঃশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চল্‌ল। কোথাও বা দাগধরা পুরোনো পাকা দালান, তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ; শিবমন্দির জনশূন্য; এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পোড়ো জমি; পানাপুকুর; ঝোপঝাড়। পাখীদের বাসায় তখনো সাড়া পড়ে নি, জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মত পল্লীর জীবনযাত্রা ভোরবেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিস থানার পাশ দিয়ে মোটর পৌঁছল বড় রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। কেবল অন্ধকারের মধ্যে দুই সারি বনস্পতি পুঞ্জিত পল্লব-স্তবকে প্রাচীন কালের নীরব সাক্ষ্য নিয়ে স্তম্ভিত; সেই যে-কালে শতাব্দীপর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ অঙ্গন পার্শ্বে অতীত যুগের ইতিহাসধারা কখনো মন্দ গম্ভীর গতিতে কখনো ঘূর্ণাবর্ত্তসঙ্কুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল। রাজপরম্পরার পদচিহ্নিত এই পথে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ভীষণ বর্গী, কখনো কোম্পানির সেপাই ধুলোর ভাষায় রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে যাত্রা করেছে। তখন ছিল হাতী, উট, তাঞ্জাম, ঘোড়সওয়ারদের অলঙ্কৃত ঘোড়া; রাজপ্রতাপের সেই সব বিচিত্রবাহন ধুলোর ধূসর অন্তরালে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। একমাত্র বাকী আছে সর্ব্বজনের ভারবাহিনী করুণ মন্থর গরুর গাড়ি।

দম্ দম্-এ উড়ো জাহাজের আড্ডা ঐ দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার।

সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মত বন্ধু-বান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল।

সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জ্জনে যন্ত্র পক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে ক'রে চামড়ার দোলাওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে ব্যবহার্য্য সামগ্রীর হাল্কা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।

ব্যোমতরী বাংলা দেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চল্‌ল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানা-পুকুরের চারি ধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্ত্তি দেখা যায় ছাড়া ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষা-সন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্ম্মল নিরাময় জল-গণ্ডুষের জন্যে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর কারো 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই।

মানুষ পশু পাখী কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠচে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলো আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে, তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানালা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসচে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে, লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চারদিক ধূ ধূ করচে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হ'ল না। কোম্পানির একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে। তার পরে খাতায় দু-চার লাইন স্বাক্ষরের দাবি করল যখন, আমার হাসি পেল। আমার মনের মধ্যে তখন শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গরের শ্লোক গুঞ্জরিত। ঊর্দ্ধ্ব থেকে এই কিছু আগেই চোখে পড়েছে নির্জ্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের, গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্ত্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে-ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত; স্বয়ং ইতিবৃত্তবিৎ চিরকালের ছুটিতে অনুপস্থিত; রিসার্চ বিভাগের ভিৎটা-সুদ্ধ তলিয়ে গেছে মাটির নীচে।

এইখানে যন্ত্রটা পেটভ'রে তৈল পান ক'রে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ-যাত্রা সুরু। এতক্ষণ পর্য্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জ্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি মেনিলা দ্বীপে আখের ক্ষেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটোনো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্চেন, ক্ষণে ক্ষণে চলচে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল; কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন ক'রে পড়চেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্র-হুঙ্কারের তুফানে কথাবার্ত্তা যায় তলিয়ে। এককোণে বেতারবার্ত্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকী তিনজন পালাক্রমে তরি-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু বা আহার, কিছু বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুক্‌রো সজনতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে ঊর্দ্ধ্বতর আকাশে চড়চে, হাওয়া চঞ্চল, তরি টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত ক'রে এল। নীচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবা-ভূমির নির্জ্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্ণে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্র-পাখীর হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুন্‌বার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনই নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরে তখন প্রাণ-ধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্ত্তব্য সেরে হোটেলে এলুম।

হোটেলটি বায়ুতরিযাত্রীর জন্যে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তার যত রকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত।

পরের দিন ১২ই এপ্রেল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হ'ল। হাওয়ার গতিক পূর্ব্ব দিনের চেয়ে ভালই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌছনো গেল। সেখানে বাঙালী গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ক অন্ন ভোগ ক'রে আধঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ-দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়ফড়ানি। বহুদূর নীচে সমুদ্রে ফেনার শাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না-শুনি গর্জ্জন, না-দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্ণর বেতারে দূরলিপিযোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্ক-এ পৌছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপ্টা-ছাদের ছোট ছোট বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্ধুক।

আকাশযাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্য-সম্পদ কিছুই নেই। সেই জন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরীব মাটির 'পরে। কী সুগম্ভীর সূর্য্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান ক'রে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়ায় ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন ক'রে ধরলে।

এখানকার রাজকর্ম্মচারীর দল সম্মান-সম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরে বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েচে। যে দুই একজন ইংরেজী জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা হ'ল। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ ক'রে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জ্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানব-সম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্ত্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।

এখানে পরধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্ব্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্ত্তমান রাজার শাসনে পরধর্ম্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে, সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্ম্মহিংস্রতার নর-রক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকেব রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে,—অনতিকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্ব্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্ম্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম্মপ্রচারক, কোরাণ-পাঠক, সৈয়দ,—এরা সকলেই মোল্লাদের মত পাগড়ী ও

সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সঙ্কুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশী মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস ক'রে অথবা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি অনুসারে তবেই এই সাজ-ধারণের অধিকার পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে গেছে। লেখক বলেন,—Such were the results of the contact of Persia with the Western world. They could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the greatest man that Persia has produced for many centuries.

অন্তত একবার কল্পনা ক'রে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক ব'লে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি— কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরও অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার ক'রে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্চে বিনা বিচারে এবং উপবাস-পীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্চে, যার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তাহ'লে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে, যদি অন্যের জন্য হয় তাহ'লে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্ম্মকে যদি জীবিকা, এমন কি, লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্ম্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য একথা মানতেই হবে।

পরদিন তিনটে রাত্রে উঠতে হ'ল, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই মে তারিখে সকাল সাড়ে আটটার সময় বুশেয়ারে পৌছন গেল।

বুশেয়ারের গভর্ণর আমাদের আতিথ্যভার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই।

মাটির মানুষের সঙ্গে আকাশের অন্তরঙ্গ পরিচয় হ'ল, মনটা কী বললে এই অবকাশে লিখে রাখি।

ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম, মনে হ'ত দরকার আছে ব'লে উড়চে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার ক'রে চলেচে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্য্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্য্যে। নৌকোর পালকে বাতাসের মেজাজের সঙ্গে মানান রেখে চলতে হয়, সেই ছন্দ রাখবার খাতিরে পাল দেখতে হয়েচে সুন্দর। পাখীর পাখাও বাতাসের সঙ্গে মিল ক'রে চলে, তাই এমন তার সুষমা। আবার সেই পাখায় রঙের সামঞ্জস্যও কত। এই ত হ'ল প্রাণীর কথা, তারপরে মেঘের লীলা,—সূর্য্যের আলো থেকে কত রকম রং ছেঁকে নিয়ে আকাশে বানায় খেয়ালের খেলাঘর। মাটির পৃথিবীতে চলায় ফেরায় দ্বন্দ্বের চেহারা, সেখানে ভারের রাজত্ব, সকল কাজেই বোঝা ঠেলতে হয়। বায়ুলোকে এতকাল যা আমাদের মন ভুলিয়েছে, সে হচ্চে ভারের অভাব, সুন্দরের সহজ সঞ্চরণ।

এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরোল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল ক'রে নয়, বাতাসকে পীড়িত ক'রে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখীর গান নেই, জন্তুর গর্জ্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় ক'রে আজ চীৎকার করচে।

সূর্য্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টা

মাত্র করেনি। আকাশ নীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেন্টিমেণ্টের বালাই নেই, শোভাকে ও অবজ্ঞা করে, অনাবশ্যককে কনুয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্ব্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল। পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ঐ যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মত ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে চলল।

বায়ুতরি যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সঙ্কীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে-পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত ক'রে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব, তা হয়ে এল এক আয়তনের ছবি। সংহত দেশ কালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দ্দিষ্ট হ'তে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হ'ল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হ'ল, এমন অবস্থায় আকাশ-যানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্ম্মম ভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেন-না, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে-বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জ্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্ম্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্ম্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরচে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উর্দ্ধলোক থেকে মার খাচ্চে; এই সাম্রাজ্য-নীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট ক'রে দেয় ব'লেই তাদের মারা এত সহজ। খৃষ্ট এই সব মানুষকেও পিতার সন্তান ব'লে স্বীকার করেচেন, কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েচে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাঁদের, সেই জন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়চে সেই খৃষ্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানব-সত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসচে।

ইরাক বায়ুফৌজের ধর্ম্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে-বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক,—

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down

upon the world of Man for whom God feels ashamed.

নিকটের থেকে আমাদের চোখ যতটা দূরকে একদৃষ্টিতে দেখতে পায়, উপরের থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক দেশকে দেখে। এই জন্যে বায়ুতরি যখন মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ বেগে ছুটচে তখন নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না তার চলন এত দ্রুত। বহু দূরত্ব আমাদের চোখে সংহত হয়ে ছোট হয়ে গেছে বলেই সময় পরিমাণও আমাদের মনে ঠিক থাকল না। দুইয়ে মিলে আমাদের কাছে বাস্তবের যে প্রতীতি জন্মাচ্চে সেটা আমাদের সহজ বোধের থেকে অনেক তফাৎ। জগতের এই যন্ত্র-পরিমাপ যদি আমাদের জীবনের সহজ পরিমাপ হ'ত তাহ'লে আমরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করতুম। তাই ভাবছিলুম সৃষ্টিটা ছন্দের লীলা। যে-তালের লয়ে আমরা এই জগৎকে অনুভব করি সেই লয়টাকে দূনের দিকে বিলম্বিতের দিকে বদলে দিলেই সেটা আর এক সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অদৃশ্য রশ্মিতে আমরা বেষ্টিত। আমাদের স্নায়ুস্পন্দনের ছন্দ তাদের স্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না ব'লে তারা আমাদের অগোচর। কী ক'রে বলব এই মুহূর্ত্তেই আমাদের চারদিকে ভিন্ন লয়ের এমন অসংখ্য জগৎ নেই যারা পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ। সেখানকার মন আপন বোধের ছন্দ অনুসারে যা দেখে যা জানে যা পায় সে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য, বিভিন্ন মনের যন্ত্রে বিভিন্ন বিশ্বের বাণী এক সঙ্গে উদ্ভূত হচ্চে সীমাহীন অজানার অভিমুখে।

এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বোধ না ক'রে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য্য এই যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে, সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্ত্ত্যের দুষ্মন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন, আমারও সেই দশা। একালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হ'ত তাহ'লে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর—সেটাই সব চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দ্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একে ক্রমে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে হচ্চে, তবু এরা পরাভব মানচে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।

এই ব্যোমতরির চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্ত্তিমান উদ্যম। যে-আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূত বলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত। মনেপ্রাণে সাধনা ক'রে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি,—কিন্তু আমাদের মন যদি বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ঢেলে দিচ্চে। কেন-না, পর্য্যাপ্ত অন্নের জোরেই সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে-চিন্তার শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে-চিন্তা রাষ্ট্রগত, সেদিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হ'তে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।

গয়লানী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পিয়ালির খালটা যেখানে অকস্মাৎ একটু ঘাড় বেঁকিয়েছে এবং তারপরেই দীঘির মত খানিকটা প্রশস্ত হয়ে আবার সরু হয়ে দক্ষিণের দিকে চলে গেছে—এইখানেই পদ্ম গয়লানীর ঘর। এ জায়গাটা ঠিক গ্রামের ভিতরেও নয় অথচ বাইরে বলা চলে না। যেন এই জায়গাটুকুই গাঁয়ের অন্তর্গত হয়েও একঘরে হয়ে আছে। এই পৃথক করার কারণ হয়েছিল একটা প্রকাণ্ড বাগান। আম জাম কাঁঠাল নারকেল, এমনি সব ফলের গাছ প্রায় আধক্রোশব্যাপী। তাই বোধ হয় এর নাম ছিল হাজারি বাগান। সরু সাদা একটি পথ, বিধবার মাথার শুভ্র সিঁথির মতই গাঁয়ের সুমুখ ও পিছনের সংযোগ রক্ষা ক'রে আস্‌ছে।

পদ্ম আর ওর চার বছরের মেয়ে কুমুদ। বিশ্বসংসারে আপনার ব'লতে ওর আর কেউ নেই। কুমুদের বাপ মারা গিয়েছে সে আজ প্রায় বছর-তিনেকের কথা। বছর-পাঁচেক হয়ে গেল, কুমুদের বাপ এ-গাঁয়ে এসে বাসা বেঁধেছিল।

ছোট্ট কুঁড়েঘর, গোলপাতার ছাউনি। এদিকে চালা মত, গোয়ালঘর। উঠানটা বড়। তার একপাশে মাচাভরা কুম্‌ড়োর ডাঁটা। দশটা গরু, পদ্ম একলা সাম্‌লাতে পারে না। ঘরের অন্য কাজ তাই বাকী থেকে যায়। ওকে রাত থাকৃতে উঠ্‌তে হয়। সেবারে রাসলীলার মেলা থেকে ও রাধাকৃষ্ণের একটি যুগলমূর্ত্তি কিনে এনেছিল, আট পয়সা খরচ ক'রে। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে রেখে ও প্রত্যহ রীতিমত পূজো করে। ভোরবেলা উঠে প্রথমেই ঠাকুরের মুখ না দেখ্‌লে দিন কিছুতেই ভাল যাবে না, এই ওর স্থিরবিশ্বাস। অথচ তখন যথেষ্ট আলো হয় না, কাজেই প্রদীপটা ওকে একবার জ্বাল্‌তেই হয়। তারপর শিকের হাঁড়ি পেড়ে, এক ডেলা ক্ষীর ছোট্ট একটা কালো পাথরবাটিতে রেখে সেটা ঐ কাঠের সিন্দুকটার উপর কলাপাতা চাপা দিয়ে রাখে। একবার গিয়ে বাইরের কাজে ভিড়লে ওর আর ঘরে ফেরবার উপায় থাকে না, তাই কুমুদের জলযোগের ব্যবস্থাটা সেরে রেখেই যেতে হয়। তারপর একটা ভাঁড়ে গোবর গুলে ও ঘর দাওয়া উঠোন সমস্ত নিকিয়ে একবারে ঝরঝরে ক'রে তোলে। এর পরেই ওর গোয়ালঘরে যাবার পালা। গোবরে আর চোনায় সমস্ত গোয়াল ভরপূর; দশটা গরুর দশটা নাম,—মুঙলী রাঙী ধবলী লক্ষ্মী—এম্‌নি সব। পদ্ম ঘরে এলেই ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠে। সবাই মুখ বাড়িয়ে গলা উঁচু ক'রে এগিয়ে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। পদ্ম কখনই গরু বাঁধে না। ঘরে মাঠে সব সময়েই ওরা ছাড়া থাকে। তাই ইচ্ছামত ওরা পদ্মর কাছে আস্‌তে-যেতে পারে। পদ্ম ঘরে ঢুকলেই কোনোটা হয়ত গলা উঁচু ক'রে ওর হাতের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত একবার চেটে নিয়ে মুখ নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়ায়। কোনোটা এগিয়ে এসে ওর গায়ে এম্‌নি করে গা ঘসতে থাকে যে, বেচারী পদ্ম ঠেলায় ঠেলায় গোয়ালঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে পৌছে যায়।

পদ্ম গালাগালি ক'রে বলত, আ মর হতভাগী, আমায় খাবি নাকি! মাথাটা তার মুখের কাছে এনে বলত,—এই নে দেখ যদি তোর পেট ভরে। সেও তৎক্ষণাৎ নারকেল তেল-মাখা মাথাটা চেটে চেটে মুহূর্ত্তের মধ্যে রসসিক্ত ক'রে তবে চুপ করে। আবার কোনোটা হয়ত কাপড়ের খুঁট্‌টা একটু চিবিয়ে টানাটানি আরম্ভ ক'রে দেয়। এম্‌নি সব বিপদ। প্রথমটা গোয়ালে ঢুকে রোজই ওর খানিকটা সময় এম্‌নি ক'রে কাটে। কারুর গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, কারুর বা মাথায় চুমো খেয়ে, আবার কাউকে বা সর্ব্বাঙ্গে গোবর-মাখার জন্যে তিরস্কার ক'রে পদ্মর আরও কতকটা সময় যায়। বাঁশের

বেড়া দেওয়া বাইরে একটু খোঁয়াড় মত। সেখানকার গামলাগুলোয় খোল ভুসি মাখা খড়ের জাব রাতেই দিয়ে রাখে। গরুগুলোকে খোঁয়াড়ে পূরে পদ্ম গোয়াল পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। নিশ্চিন্ত মনে ওর কাজ করা হয় না। বারেবারে ওকে গিয়ে দেখে আস্‌তে হয় কুমুদ তখনও ঘুমুচ্ছে কিনা। ফুটফুটে রঙের ছোট্ট মেয়েটি,—যেন শরতের এক টুকরো লঘু মেঘের উপর ভোরের আলো লেগেছে। এক মাথা কালো চুল কানের তলা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। এই ছোট্ট মুখখানির উপর ওর মার যত লোভ, সেই জন্যে ভয়ও আছে।

এমনি ক'রে ছুটে দেখতে এসে একবার ও আর কুমুদকে বিছানায় দেখতে পেল না। পদ্মর মন হু হু ক'রে উঠল। ছুটে বাইরে এসে দেখলে পিয়ালির তীরে শুক্‌নো কাঠের গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে কুমুদ আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে আছে। তখনও পূবের দিকটা লাল হয়নি। মাত্র একটু আভা ফুটছে, ঝাঁকের পর ঝাঁক বক অর্দ্ধবৃত্তাকারে কঃ কঃ শব্দে ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে, এই খালের ও-পারের ধূ ধূ জলার দিকে। পাখার সেই সাঁই সাঁই শব্দ! ঝাঁকের পর ঝাঁক হাঁস কোথা থেকে উড়ে এসে পিয়ালির জলে ঝপাঝপ পড়তে থাকে,—মনে হয় কে যেন দূরের থেকে ভারী ভারী শাদা মেঘের টুকরো পিয়ালির জলে ছুঁড়ে ফেলছে। ডা'ক পাখীগুলোর ভয়ের আর সীমা নেই। ডেকে ডেকে ওরা চুপ করে। হঠাৎ তিতিরগুলো এমনি মুখ খুলল যেন থাম্‌বে না কিছুতেই। লম্বা ঘাড়ওয়ালা কালো কালো পানকৌড়ির-দল এদিক-ওদিক ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে দেখতে এসে জলে নাম্‌ল। হাঁসগুলো জলে ডিগবাজী খেয়ে, ঝাঁপাই জুড়ে, কলরব করে, এমন ক'রে তুলল যেন এই ওদের সত্যিকার জীবন।

পদ্ম কাছে এসে বললে,—মা কুমু।

কুমুদ অভিভূতের মত ছোট্ট হাতখানি তুলে ঐদিক পানে দেখিয়ে বললে,—মা দেখ।

পদ্ম ক্ষণেকের জন্যে ওইদিকে চেয়ে রইল, তারপর

কাজে চলে গেল। জলটাকেই ওর বিশেষ ভয়। মেয়েটাকে ও কিছুতেই এ পর্য্যন্ত সামলাতে পারে নি,—ভোরে উঠেই কুমুদ ওইখানটিতে গিয়ে বসবেই। আর সারা দিনমানটা ও ওখানে চুপ ক'রে বসে বসে পাখীগুলোকে নিরীক্ষণ করবে। খাওয়াবার সময়ে জোর করে ঘরে ধরে আন্‌তে হয়। তাও বেশীর ভাগ, দুধভাত মেখে ওইখানেই নিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক পাখীর চলাফেরা, পাখাঝাড়া, ডুব দেওয়া, ঘাড় বাঁকানো, ওড়া—সমস্তই ওর আয়ত্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রথম প্রথম সমস্তই ওর যা অদ্ভুত বোধ হ'ত তা আর বলবার নয়। পানকৌড়ি যখন প্রথম দিন ওর চোখের উপর ডুব দিলে, ও তখুনি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল,—ও মাগো, ডুবে গেল!

পদ্ম ছুটে এসে বললে,—কি হ'ল রে?

কান্নায় ওর গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু হাত তুলে জলটা দেখালে, যেখানে পানকৌড়ি ডোবার পর জলের উপর চক্রের রেখা বড় হ'তে বড় হচ্ছে। হঠাৎ পানকৌড়ি উঠল।

কুমুদ হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে ব'ললে,—ঐ যে, মা।

পদ্ম ওর চোখমুখ মুছিয়ে দিয়ে একটা চুমো খেয়ে বললে,—ওরা ওম্‌নি ক'রে খাবারের খোঁজ করে, ওতে ওদের কিচ্ছু কষ্ট নেই।

হাঁসগুলোকে যেদিন ও প্রথম দেখলে উড়ে এসে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কলরব ক'রে উঠল, সেদিনও কুমুদ কেঁদে মাকে ডেকেছিল,—ওমা, শিগ্‌গীর এস, প'ড়ে গিয়ে হাঁসগুলোর বড্ড লেগেছে। মা এসে অনেক ক'রে বুঝিয়ে দিলে, ওতে ওদের লাগে না, ঐ ওদের আমোদ।

কিন্তু যখন হাঁসগুলো গুগ্‌লি খুঁজতে মাথাটা জলের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে সমস্ত দেহটা উর্দ্ধে তুলে দিতে লাগ্‌ল, কুমুদ তখন মার গলা জড়িয়ে ধরে নিতান্ত মিনতি ক'রে বল্‌লে,—মা গো ওদের বারণ ক'রে দাও না তুমি। যা ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে, এক্ষুনি ঘাড়ে লাগবে যে!

ব্যবহারে। কঃ কঃ করতে করতে কেমন উড়ত ওরা। তারপর যখন নামত, তাও আস্তে আস্তে। জলের ধারে কি পদ্মপাতার উপর কতক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকৃত। তারপর জলের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে যেত। আনন্দে কুমুদ হাততালি দিয়ে মাকে ডাকৃত। শব্দ পেয়ে বকগুলো উড়ে যেত। তাই দেখে কুমুদের মন খারাপ হয়ে যেত। আবার তারা বস্‌লে কুমুদও চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখত, কি করে ওরা!

এখন আর ওর ভয় নেই। পানকৌড়ি বক কাছে ঘেঁষে না যদিও কিন্তু হাঁসেরা আসে। তাদের ও ধান খেতে দেয়। ওর মা মালসায় ক'রে রাতে ধান ভিজিয়ে রাখে। কুমুদ সেই মালসা হাতে নিয়ে যেম্‌নি এসে দাঁড়ায়, হাঁসেরা সব ওর চারপাশ ঘিরে ওকে ব্যস্তসমস্ত ক'রে তোলে। কুমুদের হাতের প্যানে লম্বা মুখ তুলে ডাকাডাকি করে।

ও চ্যাচামেচি করে বলে,—দাঁড়া দিচ্ছি।

ওদের আর তর সয় না। কুমুদের কাপড় ধ'রে টানাটানি করে, পায়ে আস্তে আস্তে কাম্‌ড়ে দেয়। শেষ পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে ওর কাঁধে বসে। ও তখন মালসাটা মাটিতে নামিয়ে রাখে। মালসার উপর সবাইকার আগ্রহ। সবাই তার মধ্যে মুখ গুঁজতে চায়। এমনি সব ঠেলাঠেলিতে মালসার ধান কতক-বা মাটিতে প'ড়ে যায়। কুমুদ ধমক দেয়। ওরা একবার ক'রে মালসার ধানে মুখ ডোবায়, আর আকাশের পানে মুখ তুলে একটু মাথা নেড়ে মুখের খাদ্যটা গলার মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এক মালসা ধানে সবাইকার কুলোয় না তাই কুমুদ অনেক কান্নাকাটি করেছে।

ও বলে, মালসার ধান ত ওদের তক্ষুনি খাওয়া হ'য়ে যায়, আবার যে আমার কাপড় ধ'রে টানাটানি করে,—ওদের পেট ভরে না, ওরা কি খালি পেটে থাকৃবে, ও মা! হেসে পদ্ম আরও দু-মালসা খোরাক বাড়িয়ে দিয়েছে। কুমুদের আনন্দের আর শেষ নেই। একটা মালসা ফুরোলেই ও ছুটে গিয়ে আর একটা আনে। ততক্ষণ হাঁসেরা চুপ ক'রে অপেক্ষা করে। কুমুদকে মালসা হাতে ছুটে আসতে দেখে ওরা সব গলা উঁচু ক'রে কলরব করতে করতে হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে যায়। খাওয়া শেষ হ'লে ওরা যখন পিঠের ও পাখার পালকের মধ্যে ঠোঁট চালিয়ে দেহ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে, কুমুদ তখন টপ ক'রে একটাকে ধ'রে ফেলে। কোলে তুলে নিয়ে কুমুদ তার চোখে চুমো খায়—হাঁসটা আকাশের দিকে গলা উঁচু ক'রে নিশ্চিন্ত আরামের ডাক ডাকে, প্যাঁক্। এমনি ক'রে, ঘরের খাইয়ে বনের হাঁস মানুষ করতে ওর যত আনন্দ।

দুপুর হ'লে পানকৌড়ি কোথায় চলে যায়। বকের দল পিয়ালির ওপারের প্রকাণ্ড জলার উপর দিয়ে উড়ে যায়, কুমুদ ঐদিকে চেয়ে থাকে। কেবল, হাঁসগুলো জলের ধার ঘেঁষে, গাছের ছায়ায়, পিঠের পালকে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোয়। হঠাৎ এক-একবার মুখ তুলে ডাকে, প্যাঁক্। আবার সব চুপচাপ। কুমুদের আনন্দের আর শেষ থাকে না। ওদের এমনি ক'রে ঘুমোতে দেখে ও নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে আসে।

পদ্মর এইটেই বিশেষ সুবিধে যে, দুধের কলসী কাঁখে নিয়ে ওকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। সবাই ওর বাড়িতে আসে। দুধটা খাঁটি, একবারে বটের আটা, তাই সকলে কষ্ট ক'রে আসে। নইলে কার ব'য়ে গেছে এই লম্বা পথ হেঁটে দুধ নিতে আসতে। সবাই এক-একটা ঘটি নিয়ে পদ্মর দাওয়া জাঁকিয়ে বসে। পাঁচজন মানুষ ওর ঘরে রোজ আসে কাজেই তাদের অভ্যর্থনার জন্যে হুঁকো ক'লকে তামাকের সকল অনুষ্ঠান রাখতে হয়েছে।

কেষ্টর তাড়া সবচেয়ে বেশী। সকলের প্রথমে ওর দুধ নেওয়া চাই। পদ্ম ওর ঘটীতে দুধ মেপে ঢেলে দিল। ঘটীটা তুলে নিয়ে কেষ্ট একটু আড়চোখে পদ্মর পানে চেয়ে হাসল।

সেদিন পদ্ম বল্‌লে, খুড়োর যে আজ মন খুব খুশী দেখছি, ব্যাপার কি। খুড়ী বুঝি খুব রুড় ক'রে রান্নার জোগাড় করেছে?

কেষ্ট আর একটু বেশী ক'রে হেসে বল্‌লে, উঁহু! বরঞ্চ তোকে দেখেই। লজ্জায় পদ্ম কাজের অজুহাতে ঘরে এসে ঢুকল।

নিবারণ দুধ নিতে এসে অম্‌নি ক'রে বল্‌লে, দেখ্ পদ্ম,

হ'লিই বা তুই বিধবা, তোর এমন কিছু বয়েস হয় নি যে গয়না প'রবি না, কেন বল্‌ত! অমন সোনার দুধে আলতা হাত দু-খানা, মাগো, কি ক'রে রেখেছে, খালি! দু-গাছা কাচের চুড়িও বুঝি প'রতে নেই, তুই নিজে হাতে কিন্‌তে না পারিস, আমি কিনে দেব, বুঝলি।

পদ্ম বোঝে সবই, শুধু কি করবে তাই আজও স্থির করতে পারেনি, এই যা।

তারপর একে একে আরও অনেকে বহু কথা ব'লে দুধ নিয়ে যায়, পিছনে রেখে যায় এক টুকরো আশা।

শ্রীপদর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে, তাই ওর ওঠা-হাঁটা করতে সময় লাগে। কাজেই সকলের শেষে ওকে দুধ নিতে হয়।

দুধ নিতে নিতে পদ্মর পানে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, অমন সোনার দেহ কি এই জঙ্গলের মধ্যে সাজে, না এই সব যত গু-গোবরের নোঙরা কাজে লাগান চলে। খেটে খেটে দেহটা একেবারে ক্ষয় ক'রে ফেল্‌লি।

ও আরও কি সব বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু পদ্ম বাধা দিয়ে বললে, জ্যাঠামশাই, অনেক বেলা হ'ল, কুমুর জন্যে দু'টো চাল সিদ্ধ করতে হবে। আর তিলমাত্র ও দাঁড়াল না; কলসীটা কাঁখে তুলে নিয়ে সে পিয়ালির দিকে চলে গেল। জলে নেমে ও চুপ ক'রে বসে রইল, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে সাহস হয় না, মনে হয়, শ্রীপদ হয়ত এখনও বসে আছে।

অনেক ভেবেও পদ্ম স্থির করতে পারে না, কি করবে। তোমরা আর এস না, এ কথা বলা চলে না। ওরা খদ্দের, দুধ নিচ্ছে, রীতিমত পয়সা দিয়ে দিচ্ছে, বাকী রাখে না। ওরা না এলে পদ্মকে দুধের কেঁড়ে কাঁখে নিয়ে হয়ত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হ'ত। তা হ'লে ঘরসংসার দেখ্‌ত কে, আর কুমুদকেই বা দেখ্‌ত কে! ওদের শক্ত ক'রে কিছু বলাও চলে না, অথচ অমন সব কথা কানে শোনাও যে যায় না!

অনুকূল আসবে দুধ নিতে সবচেয়ে বেলা ক'রে। সকালে ওর অনেক কাজ, সময় হয় না। বাড়ির মধ্যে গোটাকতক লঙ্কা ছিঁড়ে নিয়ে ডাক্‌ল, ও পদ্ম, মুড়িটুড়ি থাকে ত দে দুটো, খিদেয় প্রাণ যায়।

পদ্ম হাসিমুখে একখানা সান্‌কিতে গোটা মাখিয়ে মুড়ি এগিয়ে দিলে। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর উঠে ব'সে অনুকূল মুড়ি খেতে লাগল। ওর মুড়ি খাওয়া শেষ হ'লে পদ্ম এক ডেলা ক্ষীর দিয়ে এক ঘটী জল এগিয়ে দিল। ঢক্ ঢক্ ক'রে সমস্ত জলটা খেয়ে ও রুক্ষ স্বরে বললে, আজকে হাট-বার তা মনে আছে? কি কি আন্‌তে হবে চটপট ব'লে দে, আমার বস্‌বার সময় নেই।

হাট-বারটা পদ্মর কিছুতেই মনে থাকে না।

বিস্ময়ের স্বরে বললে, 'ওমা, ঘরে যে কিচ্ছু নেই, অনুকূল দা!' সমস্ত ফর্দ্দটা শুনে অনুকূল গজ্ গজ্ করতে করতে দুধের ঘটী নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পদ্ম পিছন পিছন ছুটে এসে বললে, ঘরে একটাও সুপুরি নেই ভাই, তোমায় পান দিতেও পারলুম না। আর বাতাসা এনো।

অনুকূল ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে বললে—যা যা আমি অত মাথায় ক'রে আন্‌তে পারব না।

ব'লে ও হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল।

পদ্ম স্বর উঁচু ক'রে বললে, একটা ঝুনো নারকেল এনো, তোমার নারকেল নাড়ু খাওয়া পাওনা আছে।

অনুকূল দাঁড়িয়ে পড়ে। আনন্দে ওর সমস্ত বুকখানা লাফিয়ে ওঠে। কোনো উত্তর না দিয়ে ও চলে যায়।

অপরাহ্ণে হাঁসের গলা পেলেই কুমুদ দৌড় দেয় পিয়ালির তীরের পানে। আবার পানকৌড়ি আসে, বক আসে। তারা শিকার খোঁজে। কুমুদ বসে বসে দেখে। হাঁসেরা সকালের মতই চঞ্চল হয়ে ওঠে। ও সেই শুকনো কাঠের গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে ওদিক পানে চেয়ে থাকে। ওরা যত কলরব করে কুমুদও ততই কথাগল্প বলে। ও মনে করে, ওরা বুঝি ওর কথা সবই শুনছে, তাই ওর ভারি আমোদ। সন্ধ্যা হয়ে আসে, ওরা আবার সবাই উড়ে যায়। পানকৌড়ি বক হাঁস,—সব দলে দলে ওড়ে। ও তাদের পানে মুখ তুলে চুপ করে চেয়ে থাকে।

কাছে আঁচল পেতে শুয়ে বললে, মা হাঁসরা সব এইবার ঘুমুবে ত, কে ওদের গল্প বলবে ?

পদ্ম ওর মুখে চুমু খেয়ে বললে,—তুমি বলো।

কুমুদ সোৎসাহে প্রশ্ন করে, কোনটা বলব মা, সেই রাজপুত্তুরের—। মার সম্মতি পেয়ে ও চালের কিনারা দিয়ে আকাশের তারার পানে চেয়ে আরম্ভ করল,—তা—আ—রপ—অ—র,সেই রাজপুত্তর যেতে যেতে যেতে দেখলে এক ফটিকের বাড়ি—বড় বড় থাম, বড় বড়, দরজা, তার ছাদে বসে রাজকন্যে চুল শু—খো, শু,—খো, ও—

সারাদিনের পরিশ্রমে বেচারী একেবারে শ্রান্ত হয়ে থাকত। তাই গল্প শুনে ওর হাঁসের দল ঘুমল কি না সে খবর নেবার আগেই ওর চোখের পাতা জুড়ে এল। মার বুকের উপর একখানা হাত রেখে অসমাপ্ত গল্পটার মধ্যেই ওর গভীর ঘুম সুরু হয়ে গেল।

অনুকূলের হাটবাজার নিয়ে ফিরতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। পিয়ালির খালে হাত-পা ধুয়ে এসে ও পদ্মর সঙ্গে খড় কুচিয়ে, খোল পচাতে দিল। পদ্ম ওকে গরম গরম নারকেল নাড়ু ক'রে খাওয়াল।

নাড়ু একপাশে সরিয়ে রেখে অনুকূল ওর কাছে এসে বললে, আমার কথাটার উত্তর আজ চাই।

ভীতস্বরে পদ্ম জিজ্ঞাসা করলে,—কিসের অনুকূল-দা ?

উত্তেজিত কণ্ঠে অনুকূল বললে, এতদিন ধরে যা ব'লে এলুম তারির।

পদ্ম তাড়াতাড়ি বললে,—অনুকূল-দা, তুমি আর-জন্মে আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে; তুমি এ গাঁয়ে না থাকলে আমার কি দুর্গতি হ'ত যে তা ভগবানই জানেন। তুমি কি বল্‌ছ অনুকূল-দা, ছিঃ। কুমুদ যে তাহ'লে আমাকে এ-জীবনেও ক্ষমা করতে পারবে না, তাকি হয়, ছি ভাই! হঠাৎ নিতান্ত উত্তেজিত হয়ে অনুকূল বল্‌লে,—ও সব কোন কথাই শুন্‌তে চাই না, তুই বল্‌—

ও তৎক্ষণাৎ পদ্মর খুন্তিসুদ্ধ সেই কোমল সুন্দর হাতখানা সজোরে ধ'রে ফেললে। পদ্মর সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠ্‌ল।

অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অনুকূল বললে, তাহ'লে—একখানা কাঁচি নিয়ে আয়—তোর মাথার সব চুল আমি নিজে হাতে কেটে দেব; আর ঐ—পোড়া কাঠে তোর সর্ব্বাঙ্গে কালো দাগ ক'রে দেব, ওঠ—কি দরকার তোর অত রূপে ?

প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে পদ্মর হাতখানা ছেড়ে দিলে।

এ-সম্বন্ধে পদ্ম অনেক দিন অনেক কথা ভেবেছে, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারেনি। আজ অনেকক্ষণ এমনি ভাবে চুপ ক'রে বসে থাক্‌বার পর হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল।

পদ্ম ব'ললে,—অনুকূল-দা, শ-পাঁচেক টাকা জোগাড় ক'রে দিতে পার ? কুমুদটাকে তাহ'লে গৌরীদান করি,—আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে একটা পাত্তরের সন্ধান পেয়েচি!

কুমুদটাই যত বিঘ্নের মূল, একথা অনুকূল অনেক দিন ভেবেছে। কিন্তু অমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটার উপরে ও কোনো দিন কুদৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করেনি। সেই কুমুদের এমন সুন্দর ব্যবস্থা পদ্ম যে স্বয়ং ক'রে দিতে পারে, একথা অনুকূল প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলে না। কিন্তু পদ্মর মুখের কথাগুলোয় এমনি একটা ভাব প্রকাশ পেল ওর মনে হ'ল, যে, কথাটা মিথ্যে হয়ে গরিব পদ্মর বিশেষ লাভ নেই।

তার উপর পদ্ম যখন বললে, আমার দশটা গরু, জমিজমা, ঘরদোর সবই তোমার কাছে বাঁধা রইল, টাকাটা দিয়ে মেয়েটাকে শুধু পার কর, তখন পদ্মর মনের সত্যি ইচ্ছে বুঝেছে ব'লে ওর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। এ কথা অনুকূলের স্পষ্টই মনে হ'ল যে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে পদ্ম নিজের বাড়িতে হ'লেও এক রকম অনুকূলের আশ্রয়ে থাকতে রাজী হয়েছে। একথা ভেবে অনুকূলের বুকের মধ্যে পুলকের বান ডাক্‌ল।

ও ধীরে ধীরে পদ্মর পিঠে হাত রেখে ব'ল্‌লে, টাকার ভাবনা কি ? ধানচালের কারবার আমার! তুই তাহ'লে কালই ভোরে চলে যা, আমি নিজে গিয়ে তোকে রেলে তুলে দিয়ে আসব। কিচ্ছু ভাবনা নেই তোর, ঘরদোর, গরুবাছুর, জায়গাজমি, সমস্ত আমি আগলে থাক্‌ব। ফিরে এলে তোর জিনিষ তোরই থাকবে, আমার অভাব

কিসের যে, তোর গরু মাটি নিতে যাই? দেখিস, তোর কোনো জিনিষটা এতটুকু টস্‌কাবে না, যেখানকার যা, সমস্তই ঠিক থাক্‌বে। তুই ফিরে এসে সমস্তই আবার আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিবি।

* * * *

কুমুদ কেঁদে কেঁদে আধখানা হয়ে গেছে। কাশার এত মানুষ, এত ভিড় ওর ভাল লাগে না। এখানে পানকৌড়ি নেই, বক নেই, হাঁস নেই—জলের কিনারা-টুকুতে ঘাস নেই, মানুষ, ছাতা আর পাথরের সিঁড়িতে মুড়ে গেছে।

ও কেবলই কাঁদে, আর বলে, মা ফিরে চল, ফিরে চল।

পদ্মও বিশ্বনাথের মন্দিরে মাথা ঠুকে কাঁদে। বলে, বাবা একি ক'রলে, মুঙলী ধবলী রাঙী যে আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছে, তোমার পায়ে এসেও ত শান্তি পাইনে। আমাকে দুঃখ দাও সইব, কিন্তু কুমুকে আমার শান্তি দাও বাবা, ওর কষ্টে যে আমার বুক ভেঙে যায়, সইতে পারিনে যে! আবার কি তবে ফিরে যাব, বাবা?

কুমুদ সন্ধ্যায় মার কোলের কাছে শুয়ে গায়ে গায়ে লাগান উঁচু বাড়িগুলোর স্বল্প ফাঁক দিয়ে একটুখানি আকাশের কতকগুলো মাত্র তারার পানে চেয়ে তেমনি ক'রে বলে, তা-আ-রূপ-অ-র, সেই রাজপুত্তর যেতে যেতে যেতে—দেখলে এক ফটিকের বাড়ি,—

বাড়ি কথাটায় ওর ঘরের শোক মনে পড়ে।

বলে, মা ঘরে চল না।

চোখের জল সামলে নিয়ে পদ্ম বলে, তোর বিয়ে দিতে এসেছি যে মা। মনে হয়, অনুকূল সব আগলে কি ক'রে বসে আছে, দিনের পর দিন ওর আশাপথ চেয়ে। এমনি আরও কত দিন, কত মাস, কত বৎসর যাবে, তার পর কোন্ লোকে পথ চাওয়া শেষ হবে কে জানে?

বেলা পড়ে আসে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বেলা পড়ে আসে,
শ্রান্ত রৌদ্র ধূসর আকাশে,
বিছাইতে চায় তার নিশীথ শয়ন,
আকাশে নক্ষত্র ম্লান; হেরে না নয়ন,
সপ্তর্ষির দিব্যমূর্ত্তি, কালপুরুষের
অমোঘ আজ্ঞার লিপি, জীবনশেষের
লেখা যারে যায় দেখা জ্যোতিষ্ক অক্ষরে,
দীপ্তিহীন, পূর্ণিমায় পড়ে নাকো ঝরে,
জোছনা নিঝর, মাতৃকা কুমার কোলে
নিরুদ্দেশ, গেল বুঝি ইন্দ্রলোকে চলে?
নন্দনবনের চিরবসন্তের দেশে,
পরিশ্রান্ত সপ্ত অশ্ব, সারথি আদেশে
শিথিল রশ্মির মালা শূন্যে দেয় দেখা,
কোথা ছায়া সহচরী, সূর্য্যদেব একা।
কুহেলীর অন্তরালে লুকাল সে আজ,
সিক্ত-ধূপ-ছায়াখানি, নাই পুষ্পসাজ।



ভারতবর্ষ

ভারতে বস্ত্রশিল্প—

সহযোগী 'আজাদ' বলেন—১৯৩২ সনের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত দশ মাসের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের উৎপন্নদ্রব্যের হিসাব সন্তোষজনক। ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যাপারে, বিশেষতঃ মোটা কাপড়ের ব্যাপারে যাঁহারা ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য চেষ্টিত তাঁহারা এই সংবাদে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। উক্ত দশ মাসের মধ্যে যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ১৩·৭ ভাগ অধিক এবং ১৯২৯–৩০ সনের অনুরূপ দশ মাসে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ১৯·৪ ভাগ অধিক। ১৯৩০–৩১ সনের এই দশ মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরের উৎপন্ন শার্টিং ও লংক্লথ শতকরা ৩৬·৮ ভাগ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে, থান কাপড় শতকরা ৩১·৮ ভাগ ও রঙীন কাপড় শতকরা ১৮·২ ভাগ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উৎপন্ন খদ্দরের পরিমাণ শতকরা ৩৩·৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ কাপড়ের কলই হাতে বোনা খদ্দরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সম্মত হয় নাই। এই দশ মাসে ভারতের কাপড়ের কলে সর্ব্বসমেত ২৪৫,৭৪,৬৮,৪২৯ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার স্থানে পূর্ব্ব বৎসরের এই দশমাসে ২১০,৯০,৩০,৪৬০ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতের সকল প্রদেশেই উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কলসমূহে উৎপন্নের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় কলসমূহের উৎপন্ন এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য ভারতকে যে এখনও বিদেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতীয় কলসমূহের উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ও বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণের মধ্যে এইরূপে এক তুলনামূলক হিসাব দেওয়া যাইতে পারে যে, ১৯৩১-৩২ সালের আলোচ্য দশ মাসে ১৯০,৯১,২৪,০০০ গজ পরিমাণ কোরা ও ধোয়া কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ৪৩,৩৬,৮৮,০০০ গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, ৫৪,৮৩,০৯,০০০ গজ রঙীন কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে ও ১৮,২৩,৭৬,০০০ গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।

বিমান-তরী প্রচলন প্রচেষ্টা—

ইদানীং সকল সভ্য দেশে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে বিমান-পথে গমনাগমনের চেষ্টা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ঐ ঐ দেশে বিবিধ সমিতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতবর্ষেও বিমান-তরীর প্রচলন সুরু হইয়াছে। এরিও ক্লাব অব ইণ্ডিয়া এণ্ড বর্ম্মা লিমিটেড সমিতি এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ঐ ১৯৩১ সনের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ,—ভারতবর্ষে এ-বৎসর সর্ব্বসমেত ৬৩ খানি বিমানপোত রেজেষ্টরী হইয়াছে। বাংলা ফ্লাইং ক্লাবের সভ্য সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ৩৫২ জন, বিমান-চালনায় দক্ষ ১৪২ জন, তন্মধ্যে ইউরোপীয় ৯৮ জন ও ভারতীয় ৪৪ জন। মান্দ্রাজের সভ্য সংখ্যা ২৭২ জন ও দিল্লীর ২৮৩ জন, শেষোক্ত স্থানে ভারতীয় ১৪৭ জন। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যোধপুর এ-বিষয়ে অগ্রণী। যোধপুরের মহারাজা স্বয়ং বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষা করিয়াছেন।

বে-সামরিক বিমানপোত পরিচালনায় উৎসাহ দিবার জন্য স্যর ভিক্টর সেসুন ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আরুইন ফ্লাইং ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং ইহাতে লক্ষ টাকা দান করেন। আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে নয় জন ভারতবাসী বিলাতে থাকিয়া বিমানপোত-সংক্রান্ত গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিমানপোতের সংশ্রবে কাজ করিতেছেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দীদের সংখ্যা—

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দীদের সংখ্যা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের গণনা অনুসারে আশী হাজার। য়্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফত সরকারী হিসাবও সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। সরকারের মতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন ৪৪,১৫৩ জন—জানুয়ারি মাসে ১৪,৮০০, ফেব্রুয়ারিতে ১৭,৮০০, মার্চ্চে ৬,৭০০ এবং এপ্রিল মাসে ৫,২০০ জন।

নিজাম বাহাদুরের দান—

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর লক্ষ্ণৌ পরিভ্রমণ উপলক্ষে সেখানকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যার্থ ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। কোন্ প্রতিষ্ঠানে কত টাকা দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। অযোধ চীফ্ কোর্টের চীফ জজ সার সৈয়দ ওয়াজির হোসেন এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ—

আমেরিকার প্রসিদ্ধ দাতা রকফেলার স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ১৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা আসবাব ও যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। কলুটোলা ষ্ট্রীটে উক্ত বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

নাগপুরে ছাত্রী কলেজ—

নাগপুরে ছাত্রীদের জন্য একটি নূতন কলেজ স্থাপনের কথা হইয়াছে কর্ণেল কুক্‌দে, মিঃ টি-জে, কেদার, মিঃ পুরাণিক, শ্রীমতী কামা, শ্রীমতী তাম্বে, কুমারী জে-সি, কতোয়াল, কুমারী এন-এস, কতোয়াল প্রভৃতি

এই কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য হইবেন। ৪ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষকে আপাততঃ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। শ্রীমতী রমাবাঈ তাম্বে, বি-এ, টি-ডি (লণ্ডন) এম-এস-সি এই কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

পরলোকে স্যর ডোরাবজী টাটা—

বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী স্যর ডোরাবজী টাটা গত ৩রা জুন জার্ম্মেণীর অন্তর্গত বাড কিসিংয়েন নামক স্থানের একটি স্বাস্থ্যনিবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

স্যর ডোরাবজী টাটা সন্স লিঃ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজী টাটার পুত্র। স্যর ডোরাবজী টাটা নানা জনহিতকর কার্য্যে সম্প্রতি তিন কোটি টাকা দান করিয়াছেন।

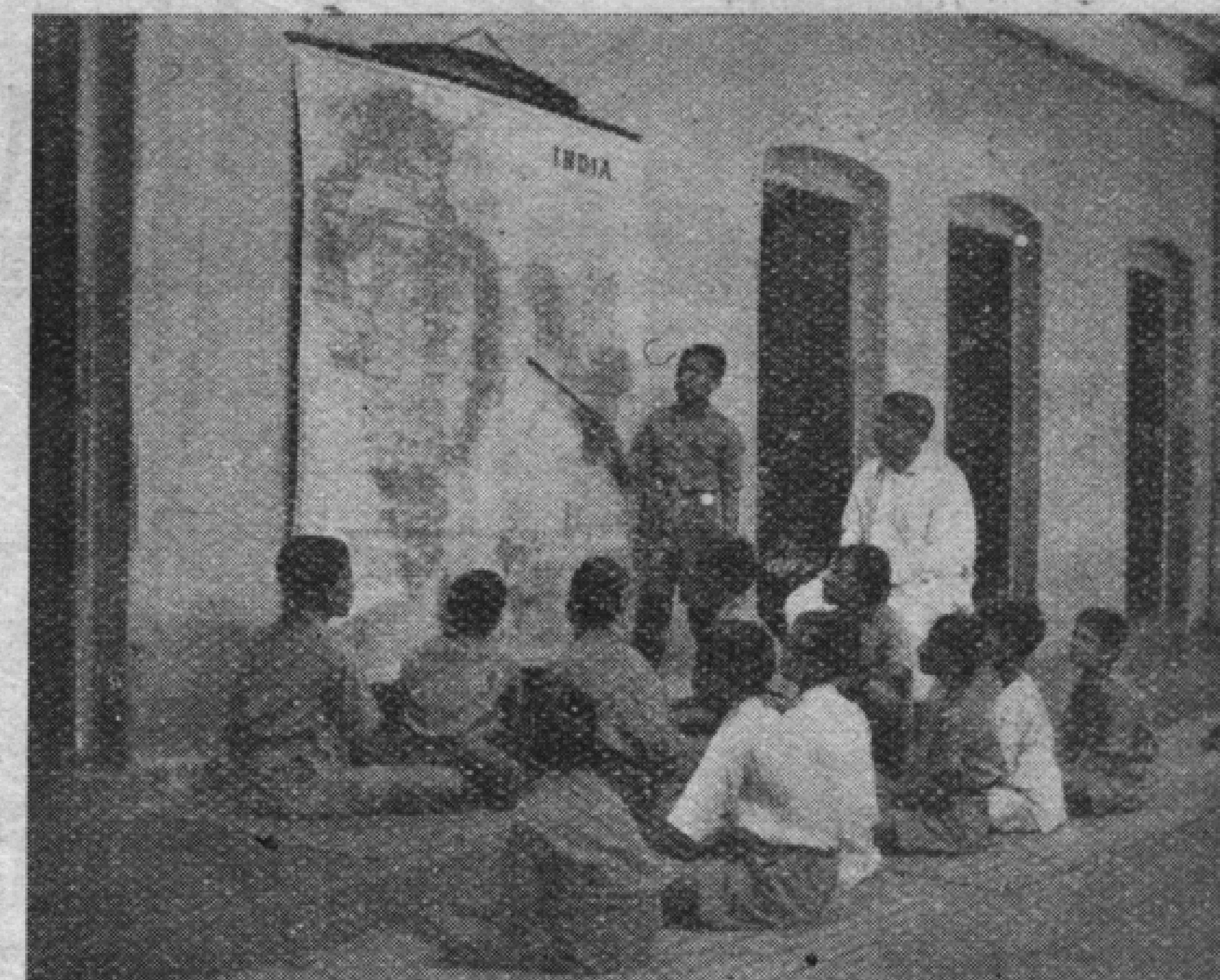
বাংলা

স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে সভাসমিতি—

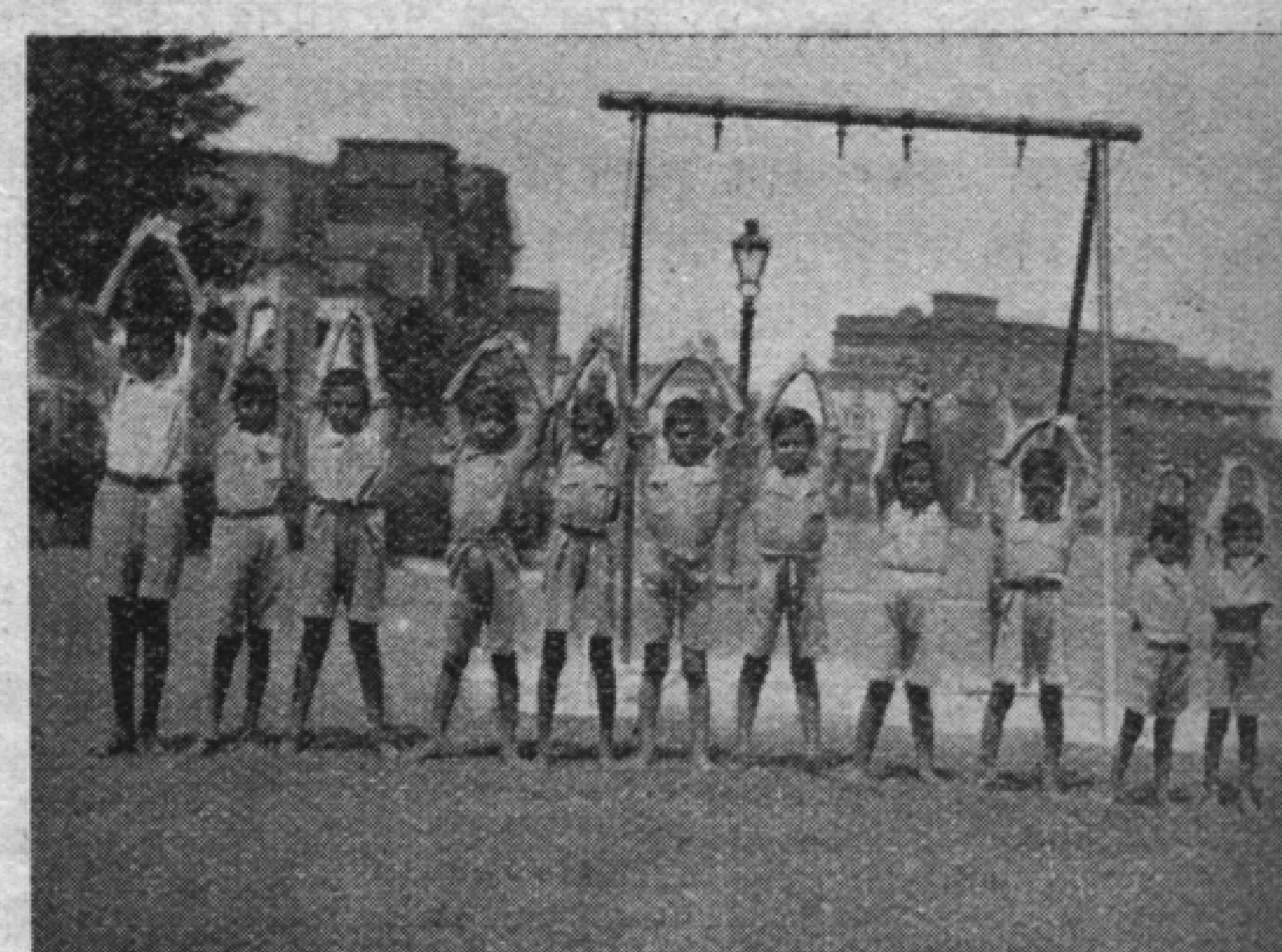
আবশ্যক জিনিষপত্রের জন্য স্বাবলম্বী হওয়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ এতদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া ছিল। আত্মকর্তৃত্বলাভ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির দিকেও ভারতবাসীর লক্ষ্য পড়িয়াছে। বাংলা দেশে স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি (১, ডালিমতলা লেন), বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বদেশী সঙ্ঘ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান স্বদেশী দ্রব্যের প্রচারে ব্যাপৃত আছেন। স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি স্বদেশী দ্রব্যের তালিকা, উৎপাদক কোম্পানী ও ঠিকানা সম্বলিত পুস্তিকাদি প্রকাশিত করিয়া শিল্পপ্রচারে সহায়তা করিতেছেন। 'দেশের কথা' নামে এইরূপ একখানি পুস্তিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী সঙ্ঘও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নানা লিপি প্রকাশ করিয়া স্বদেশী প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। বাঙালী তথা ভারতবাসী স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে তৎপর হইলে দেশের শুধু অর্থসম্পদই বাড়িবে না, বেকার সমস্যা দূরীভূত হইয়া বাঙালী আবার সবল হইয়া উঠিবে—আরও অধিকতর ভাবে জনসেবায় মনঃসংযোগ করিতে পারিবে।

বয়েজ নার্সারি হোম—

বোলপুর শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত ১৯১৭ সনে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রগণ এখানে সকাল বিকাল অধ্যয়ন করিয়া থাকে, নানাবিধ খেলাধূলারও ব্যবস্থা এখানে আছে। ১৮৩৮, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসীতে এই বিদ্যালয়ের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।



বয়েজ নার্সারী হোমের একটি ক্লাস



ব্যায়াম



ফুটবল খেলা

ময়মনসিংহে ঘূর্ণীবাত্যা—

গত ৯ই মে ময়মনসিংহ সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের উপর দিয়া যে প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্মান্তিক কাহিনী সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী ইস্তাহার পাঠ করিলেই সম্যক অবগত হওয়া যায়। এই ঘূর্ণীবাত্যা দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল ও প্রস্থে ৪০০ গজ স্থানের উপর দিয়া ধ্বংসলীলা সাধন করিয়া গিয়াছে। উহা ৪৫ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। মোট ৬০ জন গ্রামবাসী নিহত এবং প্রায় তিন শতাধিক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৩০ জনের আঘাত গুরুতর। গবাদি পশুও তিনশতাধিক নিহত ও আটশতাধিক আহত হইয়াছে।

সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা জেলেই ঘূর্ণীবাত্যার প্রকোপ অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। বাত্যার বেগে জেলের পশ্চিমদিকের প্রাচীর ধ্বসিয়া যায়; বাহিরের ক্ষুদ্র দালান গুলির অধিকাংশই ধ্বংস হয়, টিনের চালাগুলিও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। জেলে মোট ২৭ জন নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭ জন দণ্ডিত, ২ জন বিচারাধীন, ৩ জন ওয়ার্ডার, ৩ জন দর্শক, ১ জন কনেষ্টবল ও ১ জন স্ত্রীলোক। আহতের সংখ্যা ১০০; তন্মধ্যে ৩০ জন দণ্ডিত ও ৫ জন ওয়ার্ডার। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্যে ২ জন আহত ও ১ জন নিহত হইয়াছেন। যিনি নিহত হইয়াছেন তাঁহার নাম ৺মণীন্দ্রমোহন ঘোটক।

বাংলায় শিক্ষার অবস্থা—

ভারতীয় বালকদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে ৭,১২,০৮২ জন হিন্দু ও ৯,০৯,৪০০ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ১৯৩০ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,১৩,৪৭৭ ও ৮,৬৩,৫৯৩ ছিল। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ১,৩৬৫ জন কমিয়াছে, পক্ষান্তরে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৪৫,৮০৭ জন বাড়িয়াছে। মোট হিন্দু পুরুষ অধিবাসীর শতকরা ৬৭ জন এবং মুসলমান পুরুষ অধিবাসীর শতকরা ৭ জন ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে শতকরা হার যথাক্রমে ৬·৭ ও ৬·৫ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালকদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ৬৫,৪৫৮৯০ টাকা ব্যায় হইয়াছে। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ৬৮,০৯,২৪৫ টাকা. পাবলিক ফণ্ড হইতে শতকরা প্রায় ৫২ টাকা এবং প্রাইভেট ফণ্ড হইতে শতকরা, প্রায় ৪৮ টাকা লইয়া উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। পাবলিক ফণ্ডের অর্থ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত এবং জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ বুঝায়। আলোচ্য বর্ষে পাবলিক ফণ্ড হইতে ২১,৫৪,১৭২ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে ৬,৯৩,১৬৭ টাকা এবং জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ হইতে ৬,২৮,৮০৪ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে সকল শ্রেণীর ভারতীয় বালিকাদের জন্য ১৭,৪৮১টি বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে ৪,৪৬,২৮৮ জন বালিকা অধ্যয়ন করিত। ১৯৩০ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭,১২৯ এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪,৩৫,৪৬৩। সুতরাং বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৩৫২টি এবং ছাত্রী সংখ্যা ১০,৮২৫ জন বাড়িয়াছে।

১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বালিকা স্কুলে এবং বালকদের স্কুলে যে সকল বালিকা পড়িয়াছে, তাহাদের সংখ্যা মোট ৫,২৮,৩৩১; তন্মধ্যে হিন্দু ২,৩১,১৬৯ এবং মুসলমান ২,৮৭,৭১৬; অবশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালিকা।

ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার জন্য ১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বাংলায় ৬৮টি বিদ্যালর ছিল এবং আলোচ্য বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ১২৬ জন বাড়িয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ব্যতীত পার্শি, ইহুদী প্রভৃতি বালকগণও অধ্যয়ন করে। ঐরূপ ছাত্রের সংখ্যা ২,৩০৭। বাংলায় ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষার জন্য ১৯৩০-৩১ সনে মোট ৩৯,৯০,৮৮৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৪০,৫০,১৭১ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

১৯৩১ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ১৩,৪৪,-৯৪৫ জন মুসলমান ছাত্র পড়িয়াছে; তন্মধ্যে ১১,০৩,৭৪৬ জন পুরুষ ও ২,৮৭,৭১৬ জন স্ত্রীলোক। ঐ তারিখে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ১০,৪৬,-৮৬১ ও ছাত্রীসংখ্যা ২,৩১,১৬৯ ছিল।

মুসলমানদের এই ছাত্রসংখ্যা মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতির প্রকৃত চিত্র নহে, কারণ উচ্চ শ্রেণীসমূহে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে।

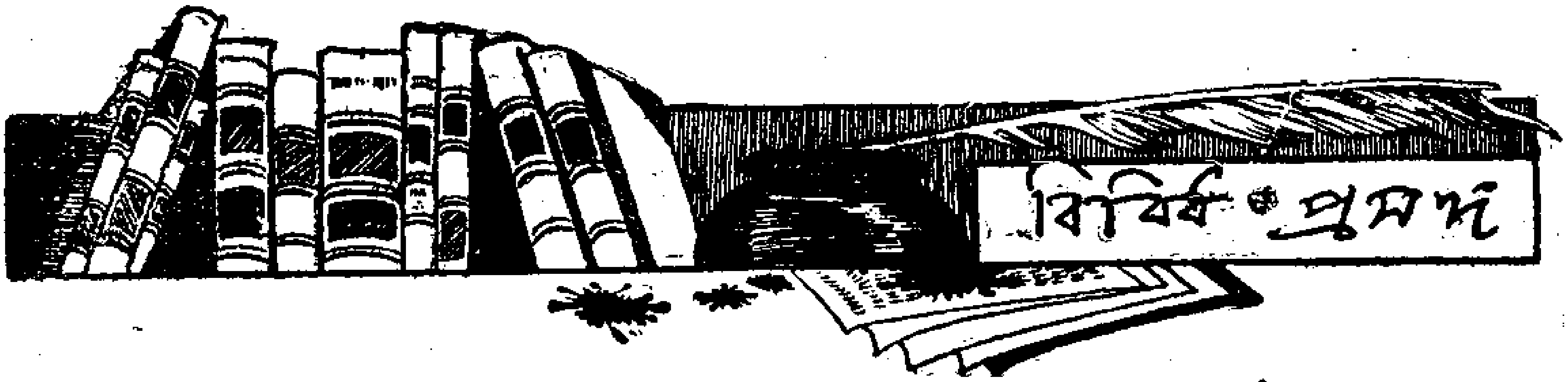
সঞ্জীবনী

শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বীরত্ব—

কলিকাতা রিপণ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তিনজন মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণ হইতে একটি হিন্দু বালিকাকে রক্ষা করিয়া সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন।



শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য



অর্ডিন্যান্সের পুনর্জন্ম

বঙ্গদেশের আকস্মিক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে আইনসঙ্গত ক্ষমতা আবশ্যক বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে তাহা দিবার জন্য ছয় মাস পূর্ব্বে বড়লাট একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। তাহার চলিত নাম বেঙ্গল এমার্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স। ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুসারে কোন অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের বেশী সময় বলবৎ থাকিতে পারে না। সেই জন্য আগেকার এই অর্ডিন্যান্সটার মিয়াদ গত ২৯শে মে উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে বড়লাট কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মূলতঃ সেইটাকেই নূতন অর্ডিন্যান্সরূপে ২৮শে মে জারি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ করায় ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারার বিরুদ্ধ আচরণ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহা বিলাতী কর্ত্তাদের অনুমোদন অনুসারে করা হইয়াছে। পার্লেমেণ্টে এখন তাঁহারাই দলে পুরু। সুতরাং তাঁহারা বেআইনী কাজ করিলেও তাহা সদ্য সদ্য নাকচ হইবার বা অন্য কোনরূপ প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই—বিশেষতঃ যখন বেআইনী কাজটার দ্বারা ইংলণ্ডের বা ইংরেজদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইতেছে না, অসুবিধা ক্ষতি ও দুঃখ হইতেছে পরাধীন বিদেশী ভারতীয়দের। আইন করেন পার্লেমেণ্ট ; তাহার বিপরীত কাজ পার্লেমেণ্টের প্রবলতম দলের রাজপুরুষেরা করিলে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা অরণ্যে রোদন। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের পেশাই অরণ্যে রোদন। অতএব বড়লাটের এই বেআইনী কাজটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারার নিম্নমুদ্রিত অংশটি আলোচ্য।

"The Governor-General may in cases of emergency make and promulgate Ordinances for the peace and good government of British India or any part thereof, and any Ordinance so made shall, for the space of not more than six months from its promulgation, have the like force of law as an Act passed by the Indian Legislature."

তাৎপর্য্য। "এমার্জেন্সী উপস্থিত হইলে বড়লাট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বা তাহার কোন অংশের শান্তি ও সুশাসনের জন্য অর্ডিন্যান্স রচনা ও জারি করিতে পারেন, এবং এই প্রকারে প্রণীত কোন অর্ডিন্যান্স জারির তারিখ হইতে ছয় মাসের অনধিক কালের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা অনুমোদিত কোন আইনের মত বলবৎ থাকিবে।"

এমার্জেন্সী ঘটিলেই তবে বড়লাট অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। সুতরাং এমার্জেন্সীর মানেটি কি দেখা দরকার। ইংরেজী ভাষা সকলের চেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে। আমেরিকার ওয়েবষ্টারের অভিধানে এই শব্দের মানে আছে, "An unforeseen occurrence or combination of circumstances which calls for immediate action or remedy," "এরূপ কোন ঘটনা বা এরূপ কোন অবস্থাসমষ্টি যাহার সংঘটন বা আবির্ভাব আগে হইতে অনুমান করা যায় নাই এবং যাহার জন্য অবিলম্বে কিছু করা বা যাহার অবিলম্বে প্রতিকার আবশ্যক।" ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড অভিধানে এমার্জেন্সীর অর্থ আছে, "Sudden juncture demanding immediate action," "আকস্মিক বা হঠাৎ-ঘটিত সঙ্কট অবস্থা যাহার জন্য তৎক্ষণাৎ কিছু করা আবশ্যক।" সকলেই জানেন, যে-সব ঘটনা বা অবস্থার ওজুহাতে নূতন অর্ডিন্যান্সটা জারি করা হইয়াছে, তৎসমুদয় ন্যূনকল্পে ছয় মাস আগে হইতে বিদ্যমান থাকিয়া আসিতেছে, এবং

সেই ওজুহাতে ছয় মাস পূর্ব্বে আলোচ্য অর্ডিন্যান্সের মতই একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ ঘটনাসমূহের বা অবস্থাসমষ্টির আকস্মিক আবির্ভাব হইয়াছে, বা সঙ্কটকালের আগমন হঠাৎ হইয়াছে, বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। এই জন্য আমরা মনে করি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যতই সঙ্গীন বিবেচিত হউক না, তাহা আগে হইতেই বিদ্যমান ছিল—কোন এমার্জেন্সী ঘটে নাই; অতএব অর্ডিন্যান্সটা জারি করায় ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

ঐ ধারাতে আছে, যে, কোন অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না। আগেকার অর্ডিন্যান্সটার সার অংশ, মূল অংশ, বজায় রাখিয়া অবান্তর কোন কোন অংশ বর্জ্জন বা সংযোগ করিয়া নূতন অর্ডিন্যান্সের আকারে তাহা জারি করিলেও জিনিষটা সেই একই আছে। কোন মানুষের গোঁফ-দাড়ী কামাইয়া ও নখ-চুল কাটিয়া দিলেও মানুষটা সেই একই থাকে। অতএব বড়লাট যে নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন তাহার দ্বারা পুরাতন অর্ডিন্যান্সের আয়ু আরও ছয় মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুসারে তাহা করা যায় না। অতএব এই বিষয়েও ঐ আইন লঙ্ঘিত হইয়াছে।

উক্ত ৭২ ধারার যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার শেষে আছে, যে, কোন অর্ডিন্যান্স যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা অনুমোদিত কোন আইনের সমান বলবৎ থাকিবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যই এই, যে, সাধারণতঃ তাহার দ্বারাই আইন প্রণীত হইবে, কিন্তু যখন উহার অধিবেশন হইতেছে না তখন একান্ত আবশ্যক স্থলে বড়লাট অর্ডিন্যান্স দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপন বা রক্ষা এবং দেশের সুশাসন করিতে পারিবেন। ৭২ ধারার শেষ কথাগুলি হইতেও পরোক্ষভাবে তাহাই বুঝায়। কিন্তু বড়লাট যাহা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যে, যেন তিনি ইচ্ছা করিলেই যত দিন ইচ্ছা অর্ডিন্যান্স দ্বারা দেশ শাসন করিতে পারেন এবং ব্যবস্থাপক সভাকে ও অধিকার লোপ করিতে পারেন। ইহা কখনই ভারত-শাসন আইনের অভিপ্রায় ছিল না। কেহ যদি বলেন, যে, উহার অভিপ্রায় ঐরূপই ছিল, তাহা হইলে তাঁহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে, যে, ঐ আইন যাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, একটা ভুয়ো ব্যবস্থাপক সভা দিয়া ভারতীয়দিগকে ঠকাইবার উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল।

গত ছয় মাসের মধ্যে অর্ডিন্যান্সগুলার অনুরূপ আইন পাস করাইবার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘকাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তখন প্রয়োজনীয় আইন বড়লাট উক্ত সভায় পেশ করাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করান নাই। এখনও তিনি বিশেষভাবে ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিতে পারিতেন। তাহাও তিনি করান নাই। এখন ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ন্মেণ্টের ইচ্ছানুরূপ আইন পাস করান যে অসম্ভব বা কঠিন নহে, তাহা বাংলার ডেটেনুদিগকে বঙ্গের বাহিরে পাঠাইবার আইন পাস হইতেই বুঝা যাইতেছে।

—

নূতন এমার্জেন্সী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স

এই অর্ডিন্যান্সের একটি বিধি অনুসারে, আগেকার অর্ডিন্যান্সে বিচারের জন্য যে তিন জন হাইকোর্ট জজের বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা ছিল, তাহার জায়গায় জেলা সেশুন জজের বা তৎসম পদের তিনজন বিচারকের বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে এইরূপ নিয়মও করা হইয়াছে। তিন জন হাইকোর্ট জজের আদালতের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের চেয়ে নিম্নপদস্থ বিচারকদের দ্বারা বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা কেন করা হইল জানি না। সেশুন জজদের কেহ কেহ কোন কোন হাইকোর্ট জজের চেয়ে সুবিচারক হইতে পারেন। কিন্তু, মোটের উপর হাইকোর্ট জজেরা সেশুন জজদের চেয়ে অভিজ্ঞ এবং সর্ব্বসাধারণের অধিক বিশ্বাসভাজন, এবং হাইকোর্ট জজদের গবর্ন্মেণ্টের মত ও প্রয়োজন নিরপেক্ষ হইবার এবং স্বাধীনচিত্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

সর্ব্বসাধারণের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মানও আবশ্যক। এই সব কারণে তিন জন হাইকোর্ট জজের বিশেষ আদালত বজায় রাখিলে ভাল হইত। হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেই যে আদালতে বিচার হয়, তাহাকেই যথাসম্ভব সুবিচারক্ষম করা উচিত ছিল।

কিছুকাল পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজদের বিচারে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত বিমল দাসগুপ্তের কোন শাস্তি হয় নাই, কুমিল্লার দুটি বালিকার হত্যাপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ফাঁসী না হইয়া অন্য শাস্তি হইয়াছিল, এবং ভূতপূর্ব্ব বঙ্গলাটকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত এক বালিকার সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হয় নাই। এইরূপ বিচারের ফলে সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষবৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু শাসক রাজপুরুষদের সন্তোষ জন্মিয়াছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। বিশেষ আদালত গঠন সম্বন্ধে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত হাইকোর্ট জজদের ঐ তিনটি রায়ের কোন পরোক্ষ সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

স্থলবিশেষে বিশেষ আদালতের বিচার অপ্রকাশ্য ভাবে হইতে পারিবে। যাহাতে অবিচার না হয় কিংবা অবিচার হইয়াছে বলিয়া লোকের সন্দেহ না হয়, অংশতঃ তাহার জন্য প্রকাশ্য বিচারের নিয়ম আছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার যথেষ্ট বা কোনও কারণ দেখান হয় নাই।

চট্টগ্রাম জেলায় এবং ভারত-গবন্মে‍র্ণ্টের ইচ্ছা হইলে অন্যত্রও সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বাংলার গবন্মে‍র্ণ্ট দিতে পারিবেন। হত্যা করিবার চেষ্টার জন্যও প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে। অনেক দিন হইতে নানা অর্ডিন্যান্সের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতার ও সম্পত্তির এবং পরোক্ষভাবে প্রাণের উপরও শাসক ও পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে অনিয়ন্ত্রিত অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়া আসিতেছে। ইহা "মার্শ্যাল ল" বা সামরিক আইনের মত। নূতন অর্ডিন্যান্সে অপ্রকাশ্য বিচারের ক্ষমতার, সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিবার, এবং হত্যাচেষ্টার জন্য প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বঙ্গের অবস্থাকে সামরিক আইনের দ্বারা শাসিত দেশের অবস্থার আরও নিকটবর্ত্তী করা হইল। ইহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

গত বৎসর উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের একটা রেগুলেশ্যন অনুসারে হত্যাচেষ্টার অপরাধে তথাকার হবীব নূর নামক একজন পাঠান. অধিবাসীর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার বিচার ও ফাঁসী হয়। এই ব্যাপার লইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল এক জন মুসলমান সভ্যের দ্বারা। অনেক মুসলমান ও হিন্দু সভ্য তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বাংলার জন্য যে এরূপ নিয়ম হইল তাহার বিরুদ্ধে ঐ সব সভ্য কিছু করিবেন কি? আমাদের যতদুর মনে পড়িতেছে, তাহাতে উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের রেগুলেশ্যন-সমূহের সম্বন্ধে অনুসন্ধাতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে হত্যাচেষ্টার জন্য ফাঁসীর তথাকার রেগুলেশ্যন উঠিয়া গিয়াছে। না উঠিয়া গেলেও, সেখানে উহা কেন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বিবেচনার বিষয়। উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের জন্য ঐরূপ রেগুলেশ্যনের সমর্থক ইংরেজদের মতে উহা তথায় এইজন্য আবশ্যক, যে, পাঠানেরা ধর্ম্মান্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং রক্তপাত করিতে দ্বিধা বোধ করে না; অধিকন্তু তাহারা নির্ভীক বলিয়া হঠাৎ অস্ত্র ব্যবহার করে। পাঠানদের সম্বন্ধে কথিত এই সব কথা সত্য কিনা তাহা এখন আলোচ্য নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, মেকলের সময় হইতে ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে ভীরুতম বলিয়া নিন্দিত ও অবজ্ঞাত বাঙালীরা কি এখন পাঠানদের মত হইয়া উঠিয়াছে? যদি হইয়া থাকে, কি কি কারণে ও প্রভাবে হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠানদের জন্য যে-নিয়ম হইয়াছিল, তাহা বাঙালীর জন্য কেন হইল?

—

দেওলী জেলের ডেটেনুদের জন্য নিয়মাবলী

বাঙালী ডেটেনুদিগকে আজমীর প্রদেশের দেওলী জেলে চালান করা হইতেছে। অনেককে ইতিমধ্যেই

পাঠান হইয়াছে। যে আইন অনুসারে পাঠান হইতেছে, তাহার পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যখন ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তখন কোন কোন সভ্য আইনটার অল্পস্বল্প সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। বাংলা দেশ হইতে ডেটেন্যুদের আত্মীয়-স্বজনদের দেওলী গিয়া তাহাদের সহিত কালেভদ্রে দেখা করা যাহাতে কার্য্যতঃ অসম্ভব না হয়, আইনের সেরূপ সব সংশোধন নামঞ্জুর হয়, এমন কি বাঙালী ডেটেন্যুদিগকে বাঙালীর খাদ্যাদি দিবার ব্যবস্থাও আইনে রাখাইবার চেষ্টা বিফল হয়।

দেওলী জেলে আবদ্ধ ডেটেন্যুদের সম্বন্ধে এই আইন অনুসারে কতকগুলি নিয়ম করা হইয়াছে। সব নিয়মের আলোচনা করিবার স্থান নাই। কোন নিয়মেরই আলোচনা দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য কয়েকটা কথা লিখিতেছি।

ডেটেন্যুরা আপনাদের অভাব-অভিযোগাদি সম্বন্ধে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কোন আবেদন পাঠাইতে চাহিলে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিজ মন্তব্যসহ তাহা পাঠাইবেন, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু—এই "কিন্তু"টি বিষম—যদি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মতে ঐ আবেদনে আপত্তিজনক বা অপমানকর কিছু থাকে, তাহা হইলে তিনি উহা না পাঠাইয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন, এবং যদি নষ্ট করেন সে কথা আবেদককে জানাইবেন। আপত্তিজনক ও অপমানকর এই দুইটি শব্দের অর্থ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নহে; সুতরাং অযথেষ্ট কারণে আবেদন না পাঠাইবার ও নষ্ট করিবার যথেষ্ট সুবিধা এই দুটি কথার মধ্যে রহিয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরা সাধারণতঃ দেবতুল্য হইবেন আশা করা যায় না। তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা জেলের কোন বন্দোবস্তের কোন সমালোচনা আবেদনে থাকিলে তাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টেরই দোষকীর্ত্তন বলিয়া আপত্তিজনক বিবেচিত হইতে পারে—সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিজের বিরুদ্ধে কিছু থাকিলে ত কথাই নাই। আমাদের বিবেচনায় যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আবেদনের উপর মন্তব্য লিখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং যখন ডেটেন্যুদের উপর প্রয়োজন হইলে তলোয়ার বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষমতা জেলের পাহারাওয়ালাদিগকেও দেওয়া হইয়াছে, তখন বন্দীদের কোন প্রতিকার পাইবার পথ এইপ্রকারে প্রায় বন্ধ না করিলেও চলিত। তাহারা অসহায়, এবং আপনাদিগকে অসহায় বলিয়া জানেও। তাহা আরও ভাল করিয়া তাহাদিগকে সমঝাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

নিয়মাবলীর দশম ও একাদশ নিয়ম অনুসারে দেওলী জেলের কোন অফিসার বা পাহারাওয়ালা নিম্নলিখিত কারণসমূহের যে-কোন কারণে ডেটেন্যুদের বিরুদ্ধে তলোয়ার, সঙ্গীন, বন্দুক বা অন্য অস্ত্র ব্যবহার, যতক্ষণ প্রয়োজন, করিতে পারিবে। যথা—বন্দী পলায়নপর হইলে বা পলায়নের চেষ্টা করিলে; বিদ্রোহ করিলে; গেট খুলিবার বা ভাঙিবার চেষ্টা, তারের বেড়া বা দেওয়াল ভাঙিবার চেষ্টা করিলে; বন্দী কোন জেল-কর্ম্মচারীর উপর বলপ্রয়োগ করিলে। অবশ্য ইহাও লেখা হইয়াছে, যে, অস্ত্রপ্রয়োগ না করিলে বন্দীদিগকে তাহাদের ঐ ঐ কাজ হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না, কিংবা বন্দীদের বা বন্দীবিশেষের দ্বারা আক্রান্ত কর্ম্মচারীর অঙ্গহানি প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অস্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তার এইরূপ বিশ্বাস থাকা চাই। কিন্তু নিয়মে এ কথা নাই, যে, অস্ত্রপ্রয়োগে কোন বন্দীর অঙ্গহানি প্রাণহানি ইত্যাদি ঘটিলে, অস্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তাদের উক্ত রূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ দেখাইতে হইবে; এ-কথাও নাই, যে, বন্দীরা যে পলায়ন গেটভাঙা তারের বেড়া ছেঁড়া দেওয়াল-ভাঙা ইত্যাদি কোন কার্য্য করিতেছিল, তাহা অস্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে।

এই নিয়মগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, অবস্থা-বিশেষে দেওলী জেলে বিনা বিচারে-বন্দীদের কার্য্যতঃ প্রাণদণ্ড দিবার ভার পাহারাওয়ালা শ্রেণীর লোকদের হাতে পড়িতে পারে। এই শ্রেণীরই একজন লোক হিজলীর সরকারী তদন্তকারী সরকারী কর্ম্মচারীদ্বয়ের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিল, যে, কোন ডেটেন্যুর প্রাণের চেয়ে তাহার কাছে সরকারী বন্দুকের মূল্য বেশী। বড়লাটের বা

কোন প্রাদেশিক লাটের্ কোন বন্দীর প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা নাই। কোনও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরও সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সাহায্যে বিচারানন্তর ব্যতিরেকে কাহারও প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সাধারণ পাহারাওয়ালা শ্রেণীর লোককে কার্য্যতঃ যাহাতে বন্দীদের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে এরূপ ক্ষমতা না দিলে সুবিবেচনার কাজ হইত।

যে-সব বন্দী এইরূপ ক্ষমতার অধীন হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বা তাহার কিছু অধিক লোক আদালতের বিচারে খালাস পাইবার পর বিনাবিচারে পুনর্ব্বার বন্দীকৃত ও জেলে আবদ্ধ হইয়াছে। বাকী কয়েক শত ডেটেন্যুরও কোন দোষ কোন কালে প্রমাণিত হয় নাই। এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে এরূপ বিপজ্জনক ব্যবস্থা করা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই।

ডেটেন্যুরা নিরস্ত্র। কোন অস্ত্র সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ডেটেন্যুদের আছে, যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায়—যদিও ইহা স্বীকার্য্য নহে—তাহা হইলেও দেওলীর মত অজানা স্থানে তাহাদের অস্ত্রসংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগকে সর্ব্বদা যেরূপ কড়া পাহারায় রাখা হয়, তাহাতে তাহাদের দ্বারা দলবদ্ধভাবে গেটভাঙা দেওয়ালভাঙা জেলের কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ ইত্যাদি কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করি না। এইজন্য তাহাদের প্রতি বন্দুকআদি অস্ত্রপ্রয়োগের নিয়ম অনাবশ্যক। ইহাতে কেবল, যাহারা ডেটেন্যুদিগকে জানে না এবং তাহাদের বন্দীদশার কারণ ও প্রণালী জানে না, তাহাদের মনে এই প্রমাণবিহীন ধারণা জন্মিবে, যে, তাহারা অতি ভয়ানক লোক বলিয়া নিশ্চিত জানা গিয়াছে। আর একটা কুফল এই হইবে, যে, ডেটেন্যুদের মনের উপর এরূপ বিপজ্জনক নিয়মাবলীর প্রভাবে তাহাদের মানসিক অবসাদের ফলে আয়ুহ্রাস হইতে পারে, এবং তাহারা কেহ কেহ চিত্তবিকৃতিবশতঃ আত্মহত্যাও করিতে পারে—যাহা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় ও অনাবশ্যক।

ডেটেন্যুদের পাঠ্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র

দেওলী জেলের ডেটেন্যুরা কি কি খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ পড়িতে পারিবে, তাহাদের জন্য প্রণীত নিয়মাবলীর শেষে তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। ইংরেজী দৈনিকগুলির মধ্যে কলিকাতার (অধুনা ছদ্মনামধারী) বেঙ্গলী এবং এলাহাবাদের লীডার আছে। বাকীগুলা এংলোইণ্ডিয়ান্ কাগজ। তাহাদের দলে লীডারকে কেন ফেলা হইল জানি না—বোধ করি উহা এক মডারেট নেতার দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া। উহার লেখা কিন্তু কলিকাতার দেশী দৈনিকগুলির চেয়ে অনেক সময় বেশী কড়াই হইয়া থাকে।

ইংরেজী মাসিকপত্রগুলির মধ্যে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার নাম নাই, বলাই বাহুল্য। বাংলা সচিত্র বড় মাসিক কাগজগুলির মধ্যে প্রবাসী সকলের চেয়ে পুরাতন। তালিকায় উহার নাম নাই, অপেক্ষাকৃত নূতন বড় সচিত্র মাসিকগুলির নাম আছে। আমাদের পাঠকদের মনে থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর আগে বাংলার শিক্ষা-বিভাগ স্কুলের পাঠাগার সকলের জন্য গ্রহণীয় মাসিকপত্র-সকলের যে তালিকা বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবাসীর নাম ছিল না। আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন মাননীয় সভ্য ঐ সভায় একটি প্রশ্ন করেন। তাহার সরকারী উত্তর শিশুদের পক্ষেও সহজে খণ্ডনীয় হইয়াছিল। গবর্মেণ্ট দেওলী জেলের জন্য বাংলা মাসিকপত্রের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা স্কুলের পাঠাগারসমূহের জন্য প্রস্তুত পূর্ব্বোক্ত তালিকার মত। স্কুল ও জেলকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। প্রবাসী বৈধ উপায়ে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী বলিয়াই সম্ভবতঃ স্কুলে যাহাদের নিকট হইতে বন্দীর মত বাধ্যতা প্রত্যাশা করা হয় এবং জেলে যাহারা প্রকৃত বন্দী, উভয় শ্রেণীরই উহা অপাঠ্য বিবেচিত হইয়া থাকিবে।

পরলোকগত মাসিকপত্র পাঠ

দেওলীর ডেটেন্যুদের পাঠ্য মাসিক পত্রসমূহের মধ্যে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র নাম আছে। ইহা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। ইহার সম্পাদক সঙ্গীতজ্ঞ সদালাপী মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অনেক বৎসর পরলোকগত হইয়াছেন। অন্যতর সম্পাদক বিখ্যাত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও ঐ মাসিক পত্রখানির বিলোপের অনেক পরে কিছুদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। গবর্মেণ্টের চরেরা গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বোমা, পিস্তল, রিভল্ভার, রাজনৈতিক ডাকাতি, খবরের কাগজের লেখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক বেয়াদবী ও কুমতলব ইত্যাদি আবিষ্কারে দিবারাত্রি এরূপ ব্যাপৃত থাকেন, যে, তাঁহারা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" সম্পর্কীয় সুবিদিত খবরগুলাও জানেন না বা জানিয়াও গবর্মেণ্টকে জানাইবার অবসর পান নাই। সুতরাং এখন যদি কোন ডেটেন্যু "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পড়িতে চায়, তাহা হইলে গবর্মেণ্টকে স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের সাহায্যে খবর লইতে হইবে যে উহা পরলোকে বাহির হইতেছে কি না এবং সেখান হইতে ইহলোকে উহা আনাইবার কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না।

—

ক্যাথেরিন্ মেয়োর দোসর

গত মে মাসে আমাদের দৈনিক কাগজগুলি বিলাত হইতে আমদানী এই একটি খবর প্রকাশ করেন, যে, প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল নামক এক স্ত্রীলোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আমেরিকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ঐ স্ত্রীলোক মিস্ মেয়োর বন্ধু। সে সম্প্রতি প্রাচ্য দেশে (ভারতবর্ষেও) তাহার চতুর্থ সফর শেষ করিয়া আমেরিকায় ফিরিয়াছে, এবং লণ্ডনে ভারতসচিবের ইণ্ডিয়া আপিস তাহাকে প্রদত্ত 'অযাচিত' সার্টিফিকেটগুলি দেখিয়া ভারী খুশী হইয়াছে। ঐ স্ত্রীলোকটি ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে এদেশে ব্রিটিশ-শাসনের কোমলতা ও মৃদুতায় (leniencyতে) মুগ্ধ হইয়াছিল বলিয়াছে। সুতরাং সে আমেরিকায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার খুবই উপযুক্ত ব্যক্তি।

তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি খবর যে মাসে বিলাত হইতে আমদানী হওয়ায় আমাদের খবরের কাগজগুলি মূল্য দিয়া সেই খবরগুলি কিনিয়া ছাপিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার একখানা বহি সম্বন্ধে কতকগুলি খবর ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিউতে ছাপিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তাহা বিনা মূল্যে উদ্ধৃত করা চলিত বলিয়া তাহার উপর সম্পাদকদের নজর পড়ে নাই। আমরা ইংরেজীতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার দু-একটা কথা বাংলায় লিখিতেছি।

ঐ স্ত্রীলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা বহি লিখিয়াছে। তাহার নাম, "Come with me to India: A Quest for Truth Among Peoples and Problems," "আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে এস;—লোকসমূহ ও সমস্যাসমূহের মধ্যে সত্যের খোঁজ।" প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের এই বহিতে কিরূপ সত্যরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে আমেরিকার একজন সমালোচক তাহার অনেক নমুনা দিয়াছেন। লেখিকার মতে ভারতবর্ষে শিশুহত্যা—শিশুকন্যা-হত্যা—ভারতবর্ষের প্রায় সব পিতামাতা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সব প্রমাণ ঐ স্ত্রীলোক ভারতীয় লোকদের মুখ দিয়া বলাইয়াছে, অর্থাৎ সে এতদ্বিষয়ক খবর ভারতীয়দের নিকট হইতে প্রাপ্ত ইহা তাহার পাঠকদিগকে বিশ্বাস করাইবার জন্য কল্পিত ভারতীয়দিগকেই ঐ সব কথা বলাইয়াছে। বহিখানার সমালোচক বলিতেছেন, যে, যেহেতু ১৯২১ হইতে ১৯৩১ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ হইয়াছে, অতএব তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, অন্ততঃ কতকগুলি স্ত্রীজাতীয় শিশুকে ভারতবর্ষের লোকেরা বাঁচিয়া থাকিতে দেয়! বাস্তবিক প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের এই সোজা তথ্যটার উপর কেন চোখ পড়ে নাই জানি না। ভারতবর্ষের যে প্রায় ৪ কোটি লোক বাড়িয়াছে তাহাদের জননীরা ভারতীয়া এবং এককালে শিশু ছিলেন। সমুদয় বা অধিকাংশ কন্যাসন্তানকে শৈশবে ভারতীয়েরা মারিয়া ফেলিয়া থাকিলে ভারতীয় কুপুত্রদের এত জননী কাহারা হইতেন?

যাহারা চোখ থাকিতেও দেখিবে না, তাহাদের মত অন্ধ আর কে?

প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের সত্যবাদিতার আর একটা নমুনা লউন। তাহার ভূগোলজ্ঞান অতি নিখুঁত ও অতি বিচিত্র। সবাই জানে, মান্দ্রাজ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত, এবং সমুদ্র মান্দ্রাজের পূর্ব্ব দিকে। কিন্তু প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল তাহার বহিতে দুই দুই বার লিখিয়াছে, যে, সে মান্দ্রাজে সূর্য্যকে সমুদ্রে অস্ত যাইতে দেখিয়াছে! সম্ভবতঃ সূর্য্যদেব তাহার গুণের বালাই লইয়া ডুবিয়া মরিবার জন্য একলম্ফে পশ্চিমদিকের অস্তাচল হইতে পূর্ব্বদিকের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন!

আমেরিকার সমালোচক তাঁহার সমালোচনার শেষে বলিতেছেন :—

"Our author says that the truth can free India. Of course it can. The truth can free anybody. The truth can free England. The truth can free Patricia Kendall.

"আমাদের গ্রন্থকর্ত্রী বলিতেছেন, সত্য ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে পারে। অবশ্যই পারে। সত্য যে-কোন জাতি বা ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারে। সত্য ইংলণ্ডকে মুক্তি দিতে পারে। [এমন কি] সত্য প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলকেও মুক্তি দিতে পারে।"

এ হেন যে প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল, সে অবশ্যই ক্যাথেরিন মেয়োর মত ইংলণ্ডের যশোগান এবং ভারতবর্ষের অপযশ কীর্ত্তনের উপযুক্ত লোক। এবং সে যে কাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিল এবং কাহাদের পক্ষ হইতে আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বৃত্তান্ত গত মাসের 'প্রবাসীতে' দিয়াছি। বিশেষ রকম অর্থাভাব ও অন্যান্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে উহা দ্বারা ভাল কাজ হইতেছে, তাহা বঙ্গের সরকারী চিকিৎসা-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী সার্জ্জন-জেনেরালের নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে।

"I visited the Hospital and the School this afternoon with the Civil Surgeon and met the Superintendent and the teachers of the School.

"I have already had good reports of its workings from Col. Stewart, who inspected the School for the State Medical Faculty, and am glad to find my impressions confirmed. It is obviously a very live and very active institution. The new buildings, laboratories and wards are of very good design and construction. The old ones will, I hope, be replaced in time; but wonderfully good work is being done under very unfavourable conditions and the staff obviously take a very keen interest and pride in their work. They have a good class of cases for instructional purposes in their wards and the standard of work seems quite good. I am very glad to inspect such a needful and progressive institution and wish it all success."

"আজ বিকালে সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে এই স্কুল ও হাসপাতাল দেখিলাম, এবং সেখানে স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও শিক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি আগেই কর্ণেল ষ্টুয়ার্টের নিকট হইতে স্কুলের কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট পাইয়াছিলাম; তিনি ষ্টেট্‌ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টীর পক্ষ হইতে উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে উৎপন্ন আমার ধারণা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত হওয়াতে প্রীত হইলাম। ইহা স্পষ্টতঃ একটি খুব "জ্যান্ত" ও খুব কর্ম্মিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। নূতন ইমারৎ, ল্যাবরেটরী ও হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি বেশ ভাল পরিকল্পনা-অনুসারে সুনির্ম্মিত। আমি আশা করি পুরাতনগুলির পরিবর্ত্তে কালক্রমে নূতন নির্ম্মিত হইবে; কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খুব আশ্চর্য্য রকম ভাল কাজ এখানে হইতেছে এবং স্পষ্টই বুঝা যায় ইহার শিক্ষক ও অন্য কর্ম্মীরা ইহার কাজে সাগ্রহ মনোযোগ দেন এবং তাহাতে গর্ব্ব অনুভব করেন। তাঁহাদের হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে তাঁহারা শিক্ষা দিবার পক্ষে বেশ উপযোগী রোগে আক্রান্ত লোক পাইয়া থাকেন, এবং কাজও উচ্চ আদর্শের অনুরূপ হয় মনে হইতেছে। আমি এরূপ একটি আবশ্যক ও প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া খুব সুখী হইলাম, এবং ইহার সর্ব্ববিধ সাফল্য কামনা করি।"

এই বিদ্যালয়টির আরও নানাদিকে উন্নতি ও বিস্তৃতির প্রয়োজন আছে। স্থানীয় ওয়েসলিয়ান্‌ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও বিজ্ঞান-অধ্যাপকদের সৌজন্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এখন সেখানেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নীবিদ্যা শিক্ষা করে। বিদ্যালয়টিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উহার নিজের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরী দুটি নির্ম্মিত ও যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক এবং বিজ্ঞান-শিক্ষকও নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার জন্য অনেক হাজার টাকা চাই। হাসপাতালে আরও অনেক রোগীর স্থান না হইলে ছাত্র বাড়ান যাইবে না। হাসপাতালের বাড়ি আরও বাড়াইতে হইবে। এইরূপ নানা খরচ আছে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা অনেক দান করিয়াছেন। তা ছাড়া গত পাঁচ বৎসরে প্রধান প্রধান নগদ দান যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা নীচে দিতেছি। তাহার পূর্ব্বেও অনেক দান পাওয়া গিয়াছিল।

১৯২৬-২৭ — অস্থল, রাজগঞ্জের মোহান্ত—৫০০৲ স্ত্রীলোকদিগের অস্ত্রচিকিৎসালয়ের জন্য

১৯২৮-২৯ — বর্দ্ধমানের মহারাজ—১০০৲ অস্ত্রচিকিৎসার সরঞ্জাম জন্য

১৯২৬-২৭, ১৯২৭-২৮, ১৯২৯-৩০ — রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৫০০১৲ অস্ত্রোপচার-গৃহের জন্য

— শ্রীমত্যা গঙ্গামণি দাস্যা - ৬৪২৲ প্রসবাগারের জন্য

— বাঁকুড়া মহিলা সমিতি—২৫০০৲ ”

(সভানেত্রী মিসেস্ এ. ই. ব্রাউনের দ্বারা সংগৃহীত)

১৯২৬-২৭, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩১ — শ্রীযুক্ত হরিপদ নন্দী—৪৬০।০—Isolation ward জন্য

১৯২৯-৩০, ১৯৩১-৩২ — শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫০০৲ হাসপাতালের জলের কলের জন্য

দানের অঙ্গীকারের মধ্যে, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের পুরুষদের অস্ত্রচিকিৎসালয়ের জন্য ১২,০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি উল্লেখযোগ্য। আগে আগে বাঁকুড়ার জনসাধারণ কিছু কিছু চাঁদা দিতেন এখন তাহা প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কলেজ ও স্কুলের কয়েক জন অধ্যাপক ও শিক্ষক বৎসরে ৩০০৲ দেন। ব্যবসায়ী, হাকিম, অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী, জমীদার, উকীল, মোক্তার, প্রভৃতিরও কিছু কিছু দেওয়া উচিত।

—

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

প্রসিদ্ধ বাগ্মী, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, এবং প্রাক্তন জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে এক জন শক্তিমান পুরুষের তিরোভাব হইল। যৌবনকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের মধ্যে আসিয়া স্বাধীনতার একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে আমাদের দেশে রামমোহন রায় এই আদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা জনসমাজের গোচর করেন। এই আদর্শ অনুসারে স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে, চিন্তার ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিতে, শিক্ষা সম্বন্ধে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতাও ইহার অন্তর্গত।

যৌবনকালে বিপিনচন্দ্র, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। তিনি মুন্সেফের কাজ করিতেন এবং



স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

তদ্ভিন্ন জমিদারীও বেশ ছিল। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সম্পত্তির লোভে সত্যকে ত্যাগ করেন নাই।

তাঁহার কণ্ঠের শক্তি ও বাগ্মিতা যেমন অসাধারণ, কোন বিষয় সুশৃঙ্খল ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও তেমনি অসামান্য ছিল। তিনি সমান দক্ষতার সহিত বাংলা ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এই উভয় ভাষাতে তাঁহার লিখিবার ক্ষমতাও প্রভূত ছিল। তিনি অনেক বিষয়ে বহু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল, যদিও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার চলনসই জ্ঞান ছিল।

বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে এবং পরে বাংলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবার পর যে "স্বদেশী"-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জনের আন্দোলন হয়, তাহাতে বিপিনচন্দ্র অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি তখনকার চরমপন্থীদলের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঘোষণা ও ব্যাখ্যা করেন, যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করিতে হইবে। পরিণত বয়সে তাঁহার এই

মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আগেকার মতের যে দার্শনিক ভিত্তি তাৎকালিক "বন্দে মাতরম" নামক ইংরেজী কাগজে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নিউ ইণ্ডিয়ায় ও হিন্দু রিভিউয়ে, এবং মান্দ্রাজের বক্তৃতামালায় ব্যাখ্যা করেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচয় হইয়া থাকিবে।

তিনি আরও অনেক কাগজের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে পরলোকগত পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক যে দৈনিক প্রতিষ্ঠিত করেন, বিপিনবাবু কিছুকাল তাহার সম্পাদক ছিলেন। যখন পণ্ডিত মোতীলাল অসহযোগ মত গ্রহণ করেন, তখন বিপিনবাবু ঐ কাগজের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে কাগজখানার পরিচালন বিষয়ে কিছু বলেন নাই, কাজ ছাড়িয়া দিতে ত বলেনই নাই, পরোক্ষভাবে কোন ইঙ্গিতও করেন নাই। কিন্তু বিপিনবাবু স্বয়ং স্বত্বাধিকারীর ও নিজের মতের পার্থক্য হেতু কাজ ছাড়িয়া দেন। পদটির বেতন শুনিয়াছি হাজার টাকা ছিল, এবং বিপিনবাবু কোন কালেই সঞ্চয়ী ছিলেন না। তথাপি চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিবার জন্য ইস্তফা দিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি য়্যাংলোইণ্ডিয়ান কাগজে লিখিতেন। ইহাতে অনেকে মনে করেন, যে, হয়ত তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মতেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং এই পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে অনিচ্ছাকৃতভাবে হইয়াছিল, এইরূপ মনে করাই আমাদের বিবেচনায় অধিক সঙ্গত বোধ হয়। কারণ, মতের একান্ত স্থৈর্য্য তাঁহার ছিল না।

প্রবাসীতে তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকের বৃত্তান্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া বাহির হইয়াছিল। ইংরেজীতেও তাঁহার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। আরও দুই খণ্ড বাহির হইবে। তাঁহার জীবন বঙ্গের ও ভারতবর্ষের একটি পরিবর্ত্তনবহুল ও ঘটনাবহুল যুগের সমসাময়িক এবং এই সময়ের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া যাঁহারা বিধাতার হাতে পরিবর্ত্তন ঘটাইবার অন্যতম যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন, তিনি

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনচরিত ব্যতীত ভারতবর্ষের ও বঙ্গের ইতিহাসের একটি অংশ বলিয়াও পড়িবার যোগ্য। তিনি যৌবনকালে কিছুদিন শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। তখন হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টার কাজও অনেক বার করিয়াছেন। যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমনি ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ছিল। এইজন্য, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও ইহার পরিচালকবর্গের সহিত অবান্তর নানা বিষয়ে তাঁহার অনেক অমিল ছিল।

তিনি কয়েক বার ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছিলেন। একবার যান, ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়নের বৃত্তি লইয়া। তথায় অধ্যাপকেরা ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারেন, যে, তিনি ঠিক্ ছাত্রপদবাচ্য নহেন। একবার বিলাতে থাকিতে তিনি "স্বরাজ্য" নাম দিয়া একখানি মাসিক কাগজ বাহির করেন। তাহার একটি সংখ্যায় তিনি "বঙ্গে বোমার নিদান" ("Aetiology of the Bomb in Bengal") শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা ভারত-সরকারের মতে রাজদ্রোহাত্মক বিবেচিত হওয়ায় এবং ঐ সংখ্যা ভারতবর্ষেও আমদানী হওয়ায়, তিনি উহার প্রকাশের পর বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবামাত্র ধৃত হন এবং বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার আরও একবার কারাদণ্ড হইয়াছিল। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ একবার রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে বিপিনবাবুকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়। এরূপ মোকদ্দমায় তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়া দেশহিতের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহার মনে হওয়ায় তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। সেইজন্য তাঁহার কারাদণ্ড হয়।

বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়া ও লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙালী বলিয়া তাঁহার একটি গৌরব-বোধ ছিল। তাহা আমাদের অন্য অনেকেরও আছে। দেশের গবর্মেণ্ট বা রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালন বিষয়ে, সমগ্র দেশের একটি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কতকগুলি ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, এবং প্রদেশগুলির

autonomy) থাকিবে, এই মত অনেকেরই আছে। কিন্তু বেসরকারী নানাবিধ সার্ব্বজনিক কাজেও যে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব থাকা উচিত, ইহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন না। এ বিষয়ে চিন্তা না-করার বড় দৃষ্টান্ত দিব না, ছোট দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যেহেতু গুজরাটে প্রভাত-ফেরী নাম প্রচলিত, অতএব বাংলা ঐরূপ শব্দ—বৈতালিক—থাকিলেও প্রভাত-ফেরীই বলিতে হইবে; যেহেতু গুজরাটে টেকো, টেকুয়া, বা টাকুকে তকলী বলে অতএব বাংলা দেশেও তাহাকে তকলী বলিতে হইবে; ইহা গতানুগতিকতা মাত্র। সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব করিবার লোক সব সময়ে বাংলা দেশেই জন্মিবে, ইহা হইতে পারে না। কিন্তু বাংলা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহার ফতোয়াও আসিবে বঙ্গের বাহির হইতে, ইহা সঙ্গত ও স্বাভাবিক নহে। ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যের বিধিব্যবস্থা ফ্রান্স হইতে, ফ্রান্সের কর্ত্তব্যের বিধিব্যবস্থা জার্ম্মেনী হইতে, জার্ম্মেনীর পালনীয় ফতোয়া রুশিয়া হইতে ত আসে না। আমরা যতটা বুঝিয়াছি, বিপিনবাবু মনে করিতেন, যে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বাঙালীর কর্ত্তব্যনির্ণয় বাঙালীরই করা উচিত এবং তাহা করিবার ক্ষমতা বাঙালীর আছে। এই মত যুক্তিতর্কের দিক দিয়া ঠিক হইলেও সকল সময়ে বঙ্গে ইহা অনুসৃত না হইবার কারণ এই, যে, সম্ভবতঃ বুদ্ধিমান্ বাঙালীরা পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু বেশী ঈর্ষ্যাপরায়ণ।

উপরে আভাস দিয়াছি, যে, বিপিনবাবু সব বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করিতে এবং নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যখন যে-মত পোষণ করিতেন, তাহার সমর্থক যুক্তির অবতারণা ও বিশদ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। সম্ভবত এইরূপ কারণে, তাঁহার প্রতিবাদপরায়ণতার মাত্রা কখন কখন অধিক হইত।

আমাদের দেশে আমরা যত জন বিখ্যাত সাংবাদিকের কথা অবগত আছি, তাঁহারা কোন কোন দিকে বিপিনচন্দ্রের চেয়ে শক্তিশালী হইলেও, মোটের উপর তাঁহার মত একাধারে নানাবিষয়িনী শক্তি আর কাহারও ছিল না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক চিন্তাকে যাঁহারা নূতন পথে চালিত করিয়াছেন, বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

—

বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র

খবরের কাগজে দেখিলাম, ইংরেজীতে একখানি সাময়িক পত্র বাঙ্গালোর হইতে বাহির হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষে কৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাহির হইবে। এরূপ পত্রিকার প্রয়োজন আছে এবং ইহার প্রকাশ সন্তোষের বিষয়। আমাদের কেবল জানিতে ইচ্ছা হয়, যে, ইহা কেন কলিকাতা হইতে বাহির হইল না। ভারতবর্ষের সব বড় কাজ বাঙালীরাই করিবে, আর কেহ কিছু করিবে না, আমাদের বক্তব্য ইহা নহে। আমাদের জিজ্ঞাসুতার কারণ অন্যরূপ। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারা উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাঙালীরাই প্রথমে করেন। অবাঙালী খুব বিখ্যাত গবেষক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামনও তাঁহার সব গবেষণা কলিকাতায় করিয়াছেন। এই জন্য এরূপ কাগজের আবির্ভাব বঙ্গেই হওয়া উচিত ছিল। বঙ্গদেশে যে-সব বৈজ্ঞানিক কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা ও একতা এবং উদ্যোগিতা না থাকাতেই কি যাহা কলিকাতায় হওয়া উচিত ছিল, তাহা বাঙ্গালোরে হইল?

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা "প্রকৃতি" নাম দিয়া যে বৈজ্ঞানিক ঋতুপত্রখানি বাহির করেন, তাহা বাংলায় লিখিত বলিয়া সমগ্র ভারতের কাজে লাগে না। তিনি কিংবা অন্য কেহ ইংরেজীতেও ঐরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বাহির করিলে ভাল হয়। কিন্তু বাংলাটিও থাকা চাই। তবে, দুঃখের বিষয় বেশী লোকে ইহার খবর রাখেন না ও পড়েন না। ইহার অনেক গ্রাহক ও পাঠক হওয়া উচিত। কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করে বটে, কিন্তু কেবল উহার দ্বারাই কোন ভাষা ও সাহিত্য সম্যক সমৃদ্ধ হইতে পারে না, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি নানাপ্রকারের সাহিত্যও আবশ্যক।

—

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার চিড়িয়াখানা

কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের সৌজন্যে আগরপাড়ায় তাঁহার চিড়িয়াখানা বা পক্ষী-নিকেতন দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। পক্ষীতত্ত্ব বিষয়ে তিনি আমাদের দেশের অথরিটী অর্থাৎ প্রামাণ্য ব্যক্তি। তাঁহার চিড়িয়াখানায় তিনি লোককে দেখাইবার জন্য কেবল বড় বড় পাখী সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই ; দুর্লভ নানাবিধ ছোট ছোট পাখী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া তাহাদের প্রকৃতি, সহজাত সংস্কার ও অভ্যাস সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহাদের খাদ্য, বাসা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাবিয়া-চিন্তিয়া নানারূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বুদ্ধিবিশিষ্ট সমুদয় প্রাণীর প্রকৃতিতে কতকটা সাদৃশ্য আছে। সেই জন্য পক্ষীদের ব্যবহারের সহিত মানুষের ব্যবহারেরও কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। লাহা মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার চিড়িয়াখানায় একবার ঘুরিয়া আসিলে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

—

গোবিন্দকুমার আশ্রম

লাহা মহাশয়ের চিড়িয়াখানা যেদিন দেখিতে যাই, সেইদিন পানিহাটীতে গোবিন্দকুমার আশ্রমের তত্ত্বাবধায়কদিগের সৌজন্যে তাহা দেখিবারও সুযোগ ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁহারা আশ্রম বলেন কি-না জানি না, অন্য কোন নাম হয়ত আছে। বাড়িটি ও তৎসংলগ্ন বাগানটি ঠিক্ গঙ্গার তীরে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় ইহা প্রতিষ্ঠানটিকে দান করিয়াছেন। বাড়িটি সুন্দর এবং রাখাও হইয়াছে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহাতে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। যে-সব অল্পবয়স্কা বালিকাকে নানাস্থান হইতে অসদুপায়ে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পণ্যস্ত্রীতে পরিণত করিবার জন্য কুস্থানে রাখা হয়, তাহাদেরই কতকগুলির সেই দুর্ভাগ্য নিবারণ করিয়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কদের যত্নাধীন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। এখন তিরাশিটি বালিকা এখানে

করিতে পারে, এখানে তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে তাহাদিগকে আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে। ইহার পরও তাহারা যাহাতে আরও পাঁচ-সাত বৎসর এমন কোন শিক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হয়, তাহার একটি প্রতিষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। কেন-না, আঠার বৎসর বয়সেই তাহাদের সেরূপ কোন শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইবারই কথা।

বালিকাগুলি সকলেই হিন্দু সমাজের। এই প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম অনুসারে তাহাদিগকে অন্য কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত করা বা তাহার চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। ইহাতেও একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে। বালক-বালিকারা বড় হইয়া বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবে, অধিকাংশের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। যে-সকল বালক-বালিকা নিজ নিজ পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের নিকট থাকে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ নানা কারণে অবিবাহিত থাকে ; কিন্তু অধিকাংশই বিবাহিত হইয়া নূতন নূতন গৃহস্থালীর পত্তন করে। এই প্রতিষ্ঠানের বালিকাগুলির পক্ষেও সেইরূপ জীবন বাঞ্ছনীয়। ইহাদিগকে যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। কিন্তু তাহাতে হিন্দু সমাজের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। অথচ হিন্দুসমাজে তাহাদের বিবাহ হওয়া সহজ নহে। এই জন্য হিন্দু জনমতকে এরূপ উদারভাবাপন্ন করিতে হইবে, যাহাতে ইহারা হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে পারে। নিজেরা তাহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে স্থান দিব না, অন্যকেও তাহা করিতে দিতে আপত্তি করিব, এরূপ মনোভাব ও আচরণ সঙ্গত নহে, এবং হিন্দুসমাজের ক্ষয় নিবারণেরও অনুকূল নহে। আগে আগে যে-সকল কুমারী, সধবা বা বিধবা অত্যাচরিতা হইত, হিন্দু সমাজে তাহাদের অনেকের আর স্থান হইত না। এখন সমাজ ঠিক্ ততটা নিষ্ঠুর ও অযৌক্তিক আচরণ করে না, নিগৃহীতারা সকলে না-হউক অনেকেই স্বসমাজে থাকিতে পায়—সকলেরই থাকিতে পাওয়া

পানিহাটীর প্রতিষ্ঠানটির বালিকারাও স্বয়ং নির্দোষ, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ ইহা নহে, যে, কাহারও একবার পদস্খলন হইলে আর সে ক্ষমার যোগ্য থাকে না; আমাদের মতে কেহ দোষ করিলেও সরল অন্তঃকরণে অনুতাপের পরিচয় ও প্রমাণ দিলে তাহার স্বসমাজে স্থান হওয়া উচিত এবং অনুতাপের সুযোগও তাহার পাওয়া উচিত। সুতরাং যাহারা কোন দোষই করে নাই, আমাদের মতে তাহাদের স্বসমাজে স্থান ত হওয়াই উচিত।

পানিহাটীর এই প্রতিষ্ঠানটিতে বালিকারা নিজেদের রন্ধন পরিবেষণাদি গৃহকর্ম্ম নিজেরাই করিয়া থাকে। তাহারা সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত কোন কোন কুটীর-শিল্পও শিখিয়া থাকে। তাহাদের নির্ম্মিত কোন কোন পণ্যদ্রব্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতি

গত মাসে আমরা সুখচরে ম্যালেরিয়া-বিনাশক কেন্দ্রীয় সমিতির কাজ কিছু কিছু দেখিতে গিয়াছিলাম। এই য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল অর্থাৎ ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতির স্থাপনকর্ত্তা ও পরিচালক ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে লইয়া গিয়া সংক্ষেপে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখাইলেন ও বুঝাইয়া দিলেন। ইহার দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। অনেক জেলায় বিস্তর গ্রামে ইহার শাখা-সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল জেলার সকল বড় গ্রামে ও ছোট ছোট গ্রামের সমষ্টিতে এক একটি সমিতি হওয়া উচিত।

বাস্তুভিটা-সংলগ্ন কৃষির সমিতি

ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতির কার্য্যের সহায়ক-স্বরূপ আরও একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গৃহস্থের বাস্তুভিটা-সংলগ্ন বা তাহার নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট জমীর টুকরা তরকারী ও ফলমূল উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত যাহাতে গৃহস্থদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এই সমিতির তাহাই উদ্দেশ্য। উৎপন্ন দ্রব্যজাত গৃহস্থেরা নিজের প্রয়োজনের মত রাখিয়া উদ্বৃত্ত যাহাতে বিক্রী করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সমিতির দ্বারা হয়।

ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হয়, গ্রামের এবং গৃহের আশপাশের ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা তাহার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কার একবার করিলেই ত হয় না। জমী পড়িয়া থাকিলে আবার তাহাতে জঙ্গল হয়, তাহা আবার কাটিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিশ্রম ও খরচ হইতে থাকে। কিন্তু জঙ্গল সাফ করিবার পর যদি তাহাতে তরকারী ফলমূলের চাষ করা যায়, তাহা হইলে আর জঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে না, অধিকন্তু তরকারী ফলমূল হইতে লাভ হয়।

ম্যালেরিয়া-নাশের জন্য ডোবা পুকুর প্রভৃতিও পরিষ্কার করা আবশ্যক হয়। তাহাতে মাছের চাষ করিলে ম্যালেরিয়া-নাশের আরও সুবিধা হয়, অধিকন্তু লাভও হয়।

কোরান সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ

বিলাতের স্যর ডেনিসন রস প্রাচ্য দেশসমূহ সম্বন্ধে একজন অথরিটী বা প্রামাণ্য ব্যক্তি বলিয়া বিলাতে পরিচিত। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনের অবজার্ভার নামক খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, তুরস্কে তুর্কী ভাষায় কোরানের যে অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে মূল আরবী কোরান মুদ্রিত হয় নাই, এবং কোরানের মূলবিহীন অনুবাদ প্রকাশের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত, কারণ আলাদা শুধু অনুবাদ প্রকাশ মুসলমানদের মধ্যে অধর্ম্ম বলিয়া এ পর্য্যন্ত বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। উহা অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় কি-না, তাহা মুসলমানেরা বলিতে পারিবেন। কিন্তু মূল না ছাপিয়া শুধু অনুবাদ ছাপার ইহা নিশ্চয়ই প্রথম দৃষ্টান্ত নহে। এরূপ ইংরেজী অনুবাদ ত আছেই, এরূপ বাংলা অনুবাদও আছে—মুসলমানের কৃত এরূপ বাংলা অনুবাদও আছে।

ক্যাথেরিন মেয়োর ভারতদর্শনের সহায়ক

প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের কথা বলিতে গিয়া, ক্যাথেরিন

20.441

PRIVATE SECRETARY TO THE GOVERNOR • BENGAL •

GOVERNMENT HOUSE,
CALCUTTA

Immediate.

24th February, 1925.

Dear * * ,

His Excellency has two American ladies staying at Government House who are anxious to study conditions in India and he would like them to see some of the work which is being done in the villages by your organisation. The only time they have got is tomorrow, Thursday, afternoon. Could you kindly let me know by the bearer of this whether you would be able to show them any of the village work being done by one of your societies? If so, where should they go and at what time tomorrow? I should be glad if you could suggest the route by which they should go to the place that you select. If, however, it is inconvenient for you to arrange at such short notice, please let me know and I shall fix up something else.

Yours sincerely,

H. R. Wilkinson.

মেয়ো কিরূপ শ্রেণীর লোকদের সাহায্যে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিল মনে পড়িল। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে যে-কোন আমেরিকান্ বা অন্য বিদেশী পুরুষ বা স্ত্রীলোক আসে সে-ই বড়লাট বা প্রাদেশিক লাটদের প্রাসাদে অতিথি হইতে পারে না; বিশেষ সম্ভ্রান্ত হইলে বা সরকারী উচ্চপদস্থ লোক হইলে, কিংবা জবর রকমের সুপারিশ থাকিলে বিদেশী পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরা 'লাটবেলাটের অতিথি হইতে পারে। ক্যাথেরিন মেয়ো এ রকম কোন

I see with great interest and sympathy this illustration of the true answer to all Indian questions & a proof positive of patriotism.
Katherine Mayo

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নহে। ভারতবর্ষের ও ভারতীয়দের কুৎসা করিয়া ভারতীয়দিগকে স্বাধীনতার অযোগ্য বলিয়া পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিবার নিমিত্ত "মাদার ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে, সে ভাড়াটে লেখিকা পুরুষজাতীয় আমেরিকানের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দেখেন। দর্শকদের বহিতে লিখিত মন্তব্য হইতে দেখা যায় একজন স্ত্রীলোক ক্যাথেরিন মেয়ো, পুরুষটি একজন ডাক্তার। উভয়ের মন্তব্যের প্রতিলিপি দিলাম।

Health work to be really successful must have the support and encouragement of the people. The effort here gives great promise of bringing support to the above principle and is one of the most encouraging I have seen anywhere.
25.2.26. Victor G. Heiser

হিসাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে ঐ উদ্দেশ্যে ঐরূপ একটা বহি লিখিয়াছিল—তাহার এইমাত্র পরিচয়। অথচ সে কলিকাতায় গবর্ন্মেণ্ট হাউস নামক বাড়িতে লর্ড লিটনের অতিথি ছিল। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ লর্ড লিটনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর একখানা চিঠির ফটোগ্রাফিক প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। এই চিঠি যাঁহাকে লিখিত হইয়াছিল তাঁহার নাম বাদ দিয়াছি। যেদিন এই চিঠি লিখিত হয়, তাহার পর দিন একটি কোন জায়গা দেখিবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত সম্বোধিত ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হয়। তিনি জানিতেন না, লর্ড লিটনের অতিথিরা কে। পরদিন, চিঠিতে উল্লিখিত আমেরিকান স্ত্রীলোক দুজন একজন

ক্যাথেরিন মেয়ো কি প্রকারে লর্ড লিটনের অতিথি হইতে পারিয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার আমাদের আবশ্যক নাই।

তুর্কীভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার

নব্য তুরস্কের রাজধানী আঙ্গোরা হইতে একখানি ইংরেজী কাগজের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, তুরস্কে সাধারণতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ের মত ভাষা ও সাহিত্যেরও সংস্কার হইতেছে। ভাষা ও সাহিত্যে বৈদেশিক প্রভাব কমাইবার জন্য গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যে

আরবী ও ফারসীর সংমিশ্রণের বিরোধী। তিনি বার-বার সাহিত্যে আরবী ও ফারসী শব্দ ও শব্দসমষ্টির পরিবর্ত্তে খাঁটি তুর্কী শব্দের ব্যবহারে উৎসাহ দিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার এই ইচ্ছা তুরস্কের বিদ্যালয়-সমূহে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য তিনি আবশ্যক পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। তিনি একখানি তুর্কী বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ বিশ্বকোষে এরূপ বিস্তর তুর্কী শব্দ ও শব্দসমষ্টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল তুর্ক সংবাদপত্র সমূহ দেখিলেই লিখিত ভাষায় কামাল পাশার দ্বারা সংসাধিত সংস্কার সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আগে সুলতানী আমলে লোকে যে রীতিতে লিখিত, তাহাতে লম্বা লম্বা বাক্য রচনা প্রচলিত ছিল। সেগুলা যেন শেষ হইতে চাহিত না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে সহজ ছোট ছোট বাক্য লিখিত হয় এবং তাহাতে খাঁটি তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাহাতে অল্পশিক্ষিত লোকেরাও ঐ সকল লেখা বুঝিতে পারে।

লণ্ডনে সঙ্গীতনিপুণা বাঙালী মহিলা

লণ্ডনে কুমারী বীণা আঢ্য নাম্নী খৃষ্টীয়ান বাঙালী মহিলা ভারতীয় গান, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, গাহিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইউরোপীয় শ্রোতাদের নিকট ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রকাশ্য কন্সার্টে ভারতীয় গান করিয়াছেন। লণ্ডন ও বার্লিনের ষ্টুডিও হইতে তাঁহার গান রেডিও সহযোগে নানাস্থানে শ্রুত হইয়াছিল। লাইপজিগের ফ্রেডরিক কিং এবং এলেনা গেরহার্ট তাঁহাকে গলা সাধিতে শিক্ষা দেন। কাগজে দেখিলাম, তিনি দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয়ের সঙ্গীত-বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিবার এবং ভারতীয় বালিকাদিগকে গলা সাধিবার বিদ্যা শিখাইবার আশা করেন।

বয়ঃস্থা গৃহিণীদের জ্ঞানানুরাগ

কাগজে দেখিলাম, মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন গুপ্তের পত্নী এবার ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি চারিটি সন্তানের মাতা, বয়স ৩২ বৎসর, সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার বড় মেয়ে আগামী বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের কনিষ্ঠা বিধবা ভ্রাতৃবধূ ৪০ বৎসর বয়সে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের জ্ঞানানুরাগ প্রশংসনীয়।

ঢাকায় প্রবেশিকায় অসদুপায় অবলম্বন

ঢাকায় যে সেকেণ্ডারী ও ইণ্টারমীডিয়েট শিক্ষা বোর্ড আছে তাহা প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষা এবং উচ্চ মাদ্রাসার পরীক্ষা লইয়া থাকেন। এবার ঐ সকল পরীক্ষায় যে সব ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, বোর্ডের সেক্রেটারীর প্রস্তুত একটি তালিকায় দেখিলাম, নোয়াখালী আহমদিয়া মাদ্রাসার পনের জন মুসলমান ছাত্রের, ভোলার আবদুর মাদ্রাসার দুই জন মুসলমান ছাত্রের, রাধানগর মাদ্রাসার একজন মুসলমান ছাত্রের, ঢাকা ইসলামিক ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের একজন মুসলমান ছাত্রের, চাঁদপুর নুরিয়া মাদ্রাসার এক জন মুসলমান ছাত্রের, করটিয়া রোকিয়া মাদ্রাসার দুই জন মুসলমান ছাত্রের, ঢাকা আরমানীটোলা হাইস্কুলের একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু ছাত্রের এবং ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের একজন হিন্দু ছাত্রের নাম তাহাতে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে নোয়াখালী আহমদিয়া মাদ্রাসার অপকীর্ত্তি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। একটি বিদ্যালয়ে পনের পনের জন ছাত্র পরীক্ষার সময় প্রতারণা করায় বিশেষ সন্দেহ হয়, যে, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে অবহেলা বা যোগ ছিল। ঢাকা বোর্ডের, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের এবং শিক্ষামন্ত্রীর এই মাদ্রাসা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দেওয়া উচিত। অন্য সব স্থলেও অনুসন্ধান ও শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কিন্তু অন্য সব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কোন দোষ সম্ভবতঃ ছিল না।

"জনশক্তি"র অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য

প্রেস আইনের কবলে পড়িয়া খবরের কাগজের অব্যাহতি পাওয়া প্রায় শুনা যায় না। এবার কিন্তু এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার একটি ঘটিয়াছে। শ্রীহট্টের "জনশক্তি" তিনজন পুলিস দারোগা ও ছয়জন কন্‌ষ্টেবলের দুর্ব্যবহারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় ঐ কাগজের এক হাজার টাকা জামীন তলব হয়। "জনশক্তি" এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়া জামীনের আদেশ নাকচ করিয়াছেন, যে, কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীর ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ কাগজে সমালোচনা করা দ্বারা গবর্ন্মেণ্টকে আক্রমণ করা হয় নাই। কিন্তু হাইকোর্ট এই মতও প্রকাশ করিয়াছেন, যে, কোন অবস্থাতেই পুলিসের কাজের উপর প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশকে গবর্ন্মেণ্টের উপর আক্রমণ বলা যায় না, এমন নয়।

বঙ্গের দুরবস্থা

জলপ্লাবনে ও ঝড়ে বঙ্গের অনেক জেলার লোক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছে। অনেকের মৃত্যুও হইয়াছে। তাহার উপর, নানাবিধ আইন ও অর্ডিন্যান্সে লোকে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ওলাউঠা আদি রোগও অনেক জায়গায় হইতেছে। তাহাতেই কি নিষ্কৃতি? কত গ্রামে যে নিত্য কত খুন ও ডাকাতি হইতেছে, তাহার সকল খবর কাগজে বাহির হয় না; কত বালিকা ও নারীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহারও সব খবর বাহির হয় না। যাহা বাহির হয়, তাহাতেই ত দেশের চরম দুর্দ্দশা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাটের দর যেরূপ কমিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ডাকাতি বাড়িবার খুব সম্ভাবনা। ঝড় ও জলপ্লাবন প্রাকৃতিক উৎপাত। তাহার জন্য কোন মানুষকে দায়ী করা যায় না, যদিও তদ্দ্বারা মানুষের যে দুর্দ্দশা হয়, তাহার কিছু প্রতিকার যাঁহারা বিপন্ন হন নাই তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত। অন্য যে-সব কারণে বঙ্গের দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে মানুষের দায়িত্ব আছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট রাজনৈতিক অবস্থা লইয়া এত ব্যাপৃত, যে, অন্য কোন বিষয়ে যথোচিত মন দিতেছেন না। সম্পাদকদের প্রধান কাজ দেশহিতকর বিষয়ে লেখা। সে কাজও আমরা ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না। তাহার একটি প্রধান কারণ, প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্স; অন্য প্রধান কারণ, নানা অর্ডিন্যান্স ও তদনুযায়ী নিয়ম এবং তৎসমুদয়ের ফলে জেলের বাহিরে ও ভিতরে মানুষের দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিব ও লিখিব, না অন্য কিছু বিষয়ে ভাবিব ও লিখিব?

—

"সাম্রাজ্য দিবসে" প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা

"সাম্রাজ্য দিবসে" প্রধান মন্ত্রী যে-বক্তৃতা করিয়াছেন, রয়টার তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। তাহার একটা প্রধান কথা এই, যে, প্রধান মন্ত্রীর মতে কংগ্রেস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা মীমাংসার পথে ভীষণ বাধা উপস্থিত করিয়াছে। আমরা বলি, ভারতবর্ষকে খাঁটি স্বরাজ না দিলে কোন মীমাংসা হইতে পারে না। কংগ্রেস সেইরূপ স্বরাজ চান। ইংরেজ পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল স্বরাজের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিয়া কাজ সারিতে চান। সুতরাং ব্রিটিশ মন্ত্রীরাই আমাদের মতে মীমাংসার পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এক পক্ষ, কংগ্রেস অপর পক্ষ। উভয়ের মধ্যে কে দোষী, অথবা কে কতটা দোষী, তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসওয়ালাদের মত যদি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে অপর পক্ষ যে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদের নেতা প্রধান মন্ত্রীর মতই বা গ্রাহ্য কি প্রকারে হইবে? কোন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মত কি, জানা আবশ্যক। আমরা ভারতবর্ষীয় এমন একজন লোককেও জানি না যিনি মনে করেন, যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন না। অথচ স্বরাজ ব্যতিরেকে ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

প্রধান মন্ত্রী নিজের দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন, "যে-দেশ নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজের সম্মুখীন হইতে ভয় পায় বলিয়া প্রতিপক্ষের সর্ত্তেই রাজী হইয়া যায়, সেই দেশ জগতের খুব বেশী অহিত করে, এবং তদ্দ্বারা জগতে স্বাধীনতা ও জ্ঞানালোকের শক্তির কার্য্যকারিতা না বাড়াইয়া বলপ্রয়োগজাত উপদ্রব, শক্রতা ও মানবসমাজ ভঙ্গের সহায়তা করে;"

("The country which yields because it is afraid to face its tasks does one of the greatest disservices that can be done to the world and lets loose not forces of enlightenment and liberty, but of violence, disruption and enmity.")

মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে, ভারতবর্ষে অগণিত এরূপ লোক আছে, যাহারাও নিজের দেশ সম্বন্ধে ঠিক এই রকম মনে করে। তাহারা মনে করে, ভারতবর্ষের সম্মুখে যে-কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা করিতে ভয় পাইয়া ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক কিন্তু ভারতের পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দাসখত লিখিয়া দেওয়ার সমান রফার সর্ত্তে রাজী হয়, তাহা হইলে জগতের হিত না হইয়া অহিত হইবে—তাহা হইলে জগতে স্বাধীনতা ও জ্ঞানালোকের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত না হইয়া বলপ্রয়োগ, শক্রতা, ও সমাজভঙ্গকর নানা শক্তিই বৃদ্ধি পাইবে।

প্রধান মন্ত্রীর মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানা জাতির লোক সুখী এই জন্য, যে, তাহারা যে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া আছে তাহা তাহাদের কাঁধের জোয়াল নহে, এবং তাহাতে কোন পরাধীনতা নাই। প্রধান মন্ত্রীর অভিধানে সুখী (happy) জোয়াল (yoke) এবং পরাধীনতা (subordination) কথা তিনটার অর্থ অসাধারণ রকমের।

—

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রবধূ পারস্য ও ইরাক দেশ দেখিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সহিত আমরাও আনন্দিত হইয়াছি। ঐ দুই দেশ দেখিয়া তাঁহার মনে কি কি চিন্তা ও ভাবের উদয় হইয়াছে, কবির নিকট হইতে তাহা

ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় গিয়াছিলেন। তাঁহারাও পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট হইতেও অনেক কথা জানা যাইবে।

কবি যে-দুটি দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং উভয়ের রাজা দুই জনও মুসলমান। অথচ ঐ দুই দেশের রাজা ও প্রজারা তিনি মুসলমান না-হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তাহার কারণ দেশ দুটি স্বাধীন, এবং হিন্দুদের সহিত সেখানকার অধিবাসীদের ঐতিহাসিক, কিংবা আধুনিক কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষ্যা নাই। দুটি মুসলমান দেশের রাজা ও প্রজার কবির প্রতি ব্যবহার হইতে মুসলমান ভারতীয়দের শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। হিন্দুরাও তাহা হইতে উপদেশ পাইতে পারেন।

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় কবির একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। তাঁহার ভ্রমণ-সম্পৃক্ত কয়েকখানি ছবিও আলাদা মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

—

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী নানা বিভাগে বিভক্ত। ইহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত। ইহার কলেজ-বিভাগকে ছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করিবার নিমিত্ত অনেক দিন হইতে ইহার প্রতিষ্ঠাতার আগ্রহ আছে। সম্প্রতি সেই দিকে তিনি বেশী মন দিতেছেন। অবশ্য ইহার সকল বিভাগে ছাত্রও লওয়া হইবে। তবে, বাহির হইতে কলেজ-বিভাগের জন্য যত ছাত্র লওয়া হইবে, তাহারা বিশ্বভারতীর সভ্য কিংবা অন্য জানাশুনা লোকদের পরিচয়-পত্র অনুসারে নির্ব্বাচিত হইবে।

শান্তিনিকেতনের কলেজে ছাত্রীদের যত প্রকারের শিক্ষার সুবিধা ও অন্য সুবিধা আছে, বাংলা দেশের অন্য কোথাও তাহা নাই। অতিরিক্ত কোন বেতন না দিয়া ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয় ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, সাধারণ ও আলঙ্কারিক সূচিশিল্প, রন্ধনাদি নানাবিধ গৃহকর্ম্ম, গ্রাম-সমূহের উন্নতি ও পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধীয় জনসেবার কাজ, শুশ্রূষা প্রভৃতি শিখিতে পারে। মানসিক পরিশ্রম যাহারা করে, তাহাদের খেলাধূলার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত। শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের জন্য প্রশস্ত ময়দানে তাহার মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণও আবশ্যক। শান্তিনিকেতন শহর হইতে দূরে, গ্রামও খুব নিকট নহে; এবং ইহা উচ্চ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। এইজন্য এখানে ছাত্রীরা প্রকৃতির শোভার মধ্যে মুক্ত বাতাসে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের মত নানা ভাষার ও নানা বিদ্যার মূল্যবান্ বহুসংখ্যক পুস্তকে পূর্ণ গ্রন্থসংগ্রহ বাংলা দেশের অল্প কলেজেই আছে। এইজন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ এখানে খুব আছে। বি-এ পরীক্ষার পর নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও উপযুক্ত অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র ও ছাত্রীরা করিতে পারেন। বর্ণপরিচয় হইতে উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত একই জায়গায় একই প্রতিষ্ঠানে পাইবার বন্দোবস্ত বঙ্গে একমাত্র এখানে আছে।

আজকাল আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকেরই হইয়াছে। সেইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে, অসচ্ছল অবস্থার যে-সব বালকবালিকা জ্ঞানানুরাগী ও বুদ্ধিমান, তাহাদের অন্ততঃ কয়েক জনের সাহায্যার্থ মাসিক সাত হইতে তিন টাকার কুড়িটি বৃত্তি এই বৎসর হইতে দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিদ্যালয় ২৩শে জুন খুলিবে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী রূপে বা অন্যত্র থাকিয়াও যাঁহারা শান্তিনিকেতনের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার কাজ করিলে ইহার কাজ বরাবর ভালরকম চলিতে পারে। এই বৎসর ইহার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম্-এ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন), বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ ভাবে মন দিবেন। বিশ্বভারতীর ১৯৩১ সালের রিপোর্টে (পৃষ্ঠা ১৫) লিখিত হইয়াছে,

"Miss Asha Adhikari and her sister Miss Bhakti Adhikari also left in the middle of July last. Their services cannot be adequately acknowledged; they left a gap which has not been filled up."

শ্রীমতী আশা অধিকারী বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি এক বৎসরের ছুটি লইয়া শান্তিনিকেতনে অবৈতনিক কাজ করিয়াছিলেন। তাহাতে শান্তিনিকেতনের যে উপকার হইয়াছিল তাহা রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত কথাগুলি পড়িলে বুঝা যায়। এ বৎসর তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদটি ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। ইহাতে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি, কিন্তু শান্তিনিকেতনের লাভ হইল। তিনি নারী-বিভাগের এবং বিদ্যালয়ের শিশু-বিভাগের

অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের এবং নূতন যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের সম্মিলিত যত্নে ইহার কাজ উত্তমরূপে চলিতে থাকিবে।

গত ৩০শে নবেম্বর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬৭। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, ইহার মধ্যে ৫৮ জন অবাঙালী, বেশীর ভাগ গুজরাটি।

কলাভবন ও শ্রীনিকেতনের বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

—

বিশ্বভারতীতে অর্থসাহায্য

বিশ্বভারতীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যাহা পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা দিয়াছেন, তাহা বাদ দিলে এই বিদ্যাপীঠে বাঙালীরা অল্পই সাহায্য করিয়াছেন, অন্য লোকেরাই বেশী দিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের খুঁত ধরাও তাহার উপকার করিবার একটা উপায় বটে, কিন্তু খুঁত ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সমালোচকেরা খুঁতটা সারিবার সাহায্যও করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের হিতৈষিতা প্রমাণিত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এইরূপ সহায়ক অপেক্ষা রবিবাবুর ও বিশ্বভারতীর কেবল খুঁত ও ত্রুটির আবিষ্কারকের সংখ্যাই বেশী। সেরূপ খুঁত ও ত্রুটি অবশ্যই আছে। কোথাও রবীন্দ্রনাথের সম্মান ও প্রশংসা হইলে, তিনি বাঙালী এবং আমরাও বাঙালী বলিয়া আমরা তাহাতে ভাগ বসাই, কিন্তু তাঁহার কাজে সহযোগিতা করি না।

পুনা ও বোম্বাইয়ে যে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (Indian Women's University) আছে, তাহা একটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিষ্ঠান। তাহাতে স্বর্গীয় স্যর বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসী শতকরা ৩৷৷০ সুদের ১৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। শ্রীযুক্ত গাডগিল ১০ বৎসর ধরিয়া বার্ষিক এক হাজার টাকা দেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রবাসী ডাঃ বিঠল রাঘোবা লাণ্ডে তাঁহার ৬০,০০০ টাকার সম্পত্তি উইল দ্বারা ইহাকে দিয়া যান। বোম্বাইয়ের শেঠ মূলরাজ খাটাও ৩৫,০০০৲ দেন। ৭৫ জন প্রত্যেকে এককালীন ১,০০০ হইতে ৮,০০০ টাকা দিয়া ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। ৩২৫ জন প্রত্যেকে ২০০ হইতে ৭০০ টাকা দিয়াছেন। প্রায় ৫০০ জন প্রত্যেকে ১৫০ বা তদূর্দ্ধ টাকা দিয়াছেন। প্রায় ৫০০ জন বার্ষিক দশ টাকা এবং প্রায় ১৩০০ জন বার্ষিক পাঁচ টাকা চাঁদা দেন। তদ্ভিন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া জমা করিয়াছেন। দাতারা প্রায় সকলেই গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কার্ভে ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে ৩০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয়দের দানশীলতা বাঙালীদের অনুকরণীয়।

—

শান্তিনিকেতনে উপনিবেশ স্থাপন

বিশ্বভারতী অনেক জমী কিনিয়াছেন। তাহার কিয়দংশে কর্ত্তৃপক্ষ পল্লী পত্তন করিতে চান। পল্লীটির নাম হইবে শান্তিনিবাস। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। অতি নিকটেই বর্ণপরিচয় হইতে পোষ্টগ্রাজুয়েট পর্য্যন্ত শিক্ষার আয়োজন থাকায়, যাঁহারা নিজের বাড়িতে সন্তানদিগকে রাখিয়া জ্ঞানী লোকদের প্রভাবের ও শিক্ষার অধীন করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। আপাততঃ একত্রিশটি ভিটা বিলি করা হইবে। আটটি ভিটার প্রত্যেকটি তিন বিঘা পরিমিত, কুড়িটি ভিটা দুই বিঘা করিয়া এবং তিনটি চারি বিঘা করিয়া। যাঁহারা জমী লইতে চান, তাঁহারা নক্সা, মূল্য ও সর্ত্তাদি সমেত দলিলের খসড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সাধারণ সেক্রেটারীকে চিঠি লিখিতে পারেন।

শান্তিনিকেতন পল্লীতে বিশ্বভারতীর সমুদয় প্রতিষ্ঠান যেরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, উৎকৃষ্ট অবস্থায় সেগুলির স্থায়িত্বের উপর এই পল্লীপত্তনের সঙ্কল্পের সাফল্য নির্ভর করে, এবং পল্লীপত্তন কার্য্যতঃ হইয়া গেলে তাহার দ্বারাও বিশ্বভারতীর স্থায়িত্বের সাহায্য হইবে। ইহা মনে রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে কাজ করিতে হইবে।

একজন ডেটেনুর শোচনীয় মৃত্যু

দেওলী জেলে যে-সকল বাঙালী ডেটেনুকে পাঠান হইয়াছে, তাহার মধ্যে মৃণালকান্তি রায় চৌধুরী নামক একটি যুবক গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। মানুষের মৃত্যু বার্দ্ধক্যে, রোগে, বজ্রাঘাতাদি আকস্মিক কারণে, অপর কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হওয়ায়, এবং আত্মহত্যায় হইয়া থাকে। এই যুবকটির মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত বলিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ খবর দিয়াছেন। সেই সংবাদের যাথার্থ্য ও নির্ভর-যোগ্যতা ভাল করিয়া পরীক্ষিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষের মতে তাহার যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ ইহাও বলিয়াছেন, যে, অন্য ডেটেনুরা তাহাকে সরকারী গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তাহার এই আশঙ্কা থাকায় সে জেলের বাহিরে স্বতন্ত্র থাকিতে চায়, এবং সেইজন্য তাহাকে আলাদা রাখা হইত। সে বড় বিষণ্ণ থাকিত। যক্ষ্মার সূত্রপাতের জন্য তাহাকে আলাদা রাখা হইত, না তাহার উক্ত আশঙ্কার জন্য আলাদা রাখা হইত? তাহার মৃত্যুর পর অন্য ডেটেনুরা তাহার শব কলিকাতায় লইয়া যাইবার ও সেখানে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা চাহিয়াছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত হরবিলাস শারদা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে টেলিগ্রাফ করেন। অন্য ডেটেনুরা যদি তাহাকে গোয়েন্দা মনে করিবে, তাহা হইলে তাহার যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টি-সংকারের জন্য তাহাদের আগ্রহ কেন হইল? সরকারী কম্যুনিকেতে আছে, যে, মৃত্যুর দিনের পূর্ব্বের রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল, সকালে তাহাকে বেশ প্রকৃতিস্থ দেখা গিয়াছিল, বেলা ২॥০টার সময়ও তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ("quite well") দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার দু-ঘণ্টা পরেই ৪॥০ টার সময় দেখা গেল সে তাহার ঘরের জানালা হইতে ঝুলিতেছে। সরকারী কম্যুনিকেতে আছে, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা এই অপমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান হয় এবং তিনি রায় দেন, যে, মৃত যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহার ঘাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটটি কে তাহা লেখা নাই, তিনি সাক্ষ্য সাবুদ কি লইয়াছিলেন লেখা নাই, কোন যোগ্য ডাক্তার শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন কি না লেখা নাই, মৃত ব্যক্তি দড়ি বা অন্য কি দিয়া উদ্বন্ধন করিয়াছিল লেখা নাই, এবং দড়ি বা অন্য জিনিষ কোথায় পাইল, লেখা নাই। ডেটেনুরা গবর্মেণ্টের গভীর সন্দেহভাজন লোক বলিয়া সকলেই কড়া পাহারায় থাকে। মৃণালকান্তিকে জেলের বাহিরে রাখায় তাহার উপর আরও কড়া পাহারা থাকিবার কথা। সুতরাং সে দিনের বেলা ৪॥০ টার আগে আত্মহত্যা করিল, অথচ কেহ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাতে বাধা দিল না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, সে আত্মহত্যাই করিয়াছে এবং তাহার মনে পূর্ব্বোল্লিখিত আশঙ্কা ছিল, তাহা হইলে অন্য ডেটেনুদের, তাহার শব কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হউক এই আগ্রহে, ঐ আশঙ্কা অমূলক, কল্পিত এবং তাহার মস্তিষ্কবিকারজনিত বলিয়াই মনে হয়। যখন ডেটেনুদিগকে বঙ্গের বাহিরে চালান করিবার আইন ব্যবস্থাপক সভায় বিবেচিত হইতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রচন্দ্র মিত্র বলেন, যে, "আমি এই ব্যবস্থাপক সভাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা এই বিলটি পাস করিলে তাঁহারা ডেটেনুদের সমাধিখনন করিবেন" ("by passing this Bill, I can assure the House, that they will be digging the grave of the political detenus")। তিনি আরও বলেন, যে, অনেক ডেটেনুর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে, এবং কি প্রকারে ও কেন ঘটে তাহাও বলেন। তাঁহার এই সব কথা যে অমূলক নহে, তাহার দুঃখকর প্রমাণ পাওয়া গেল।

মৃণালকান্তির শব কলিকাতায় পাঠাইবার কি বাধা ছিল, জানি না। যাহা হউক, আজমীর প্রদেশের জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার-জেনারেল তাহাতে সম্মত হন নাই। কিন্তু তাড়াতাড়ি শবটি পুড়াইয়া ফেলা হইল কেন? যুবকের আত্মীয়-স্বজনদের দেওলী পৌঁছা পর্য্যন্ত কি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা রাখা যাইত না? এমন ত মনে হয় না।

প্রবেশিকার সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ও পরীক্ষার সংস্কারের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটি রিপোর্ট দিয়াছেন। সেনেট তাঁহাদের রিপোর্ট গ্রহণ করিলে ১৯৩৭ সাল হইতে সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসারে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

কমিটি যে বলিয়াছেন, ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়ের পরীক্ষা দেশী ভাষার মধ্য দিয়া করিতে হইবে, ইহা আমরা ঠিক্ মনে করি। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত সব বিষয় বাংলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশী ভাষার সাহায্যে শিখান মোটেই কঠিন নয়। সব বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকও সহজেই রচিত হইতে পারে। উচ্চতর পরীক্ষাও পরে দেশী ভাষার সাহায্যে গৃহীত হওয়া উচিত।

মোটামুটি পাঁচ কোটি বাঙালী বাংলা বলে। বাঙালীদের সাহিত্য নিতান্ত অনুন্নত নয়। সংস্কৃতের সাহায্যে ইহার প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দও রচিত হইতেছে ও হইতে পারে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত বাংলা চলা উচিত। ইউরোপে অনেক দেশ আছে, যাহাদের লোকসংখ্যা বাংলার চেয়ে কম। অথচ তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষাও তাহাদের ভাষায় দেওয়া হয়। সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেশী ভাষায় না দিলে কখনও বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে না—যদিও কাব্য উপন্যাসাদির সমৃদ্ধি হইতে পারে। সর্ব্ববিধ জ্ঞান বাংলার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে দিলে ঐ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে বিস্তার লাভ করিবে।

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়বিশিষ্ট নিজস্বভাষাশালী কত দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম, তাহার একটি তালিকা নীচে দিতেছি। তুলনার জন্য বঙ্গের লোকসংখ্যাও দিতেছি।

দেশ	লোকসংখ্যা
বাংলা দেশ	৫,০১,২২,৫৫০
ডেন্মার্ক	৩৫,০০,০০০
ফ্রান্স	৪,০০,০০,০০০
গ্রীস্	৭০,০০,০০০
হাঙ্গেরী	৮০,০০,০০০
ইটালী	৪,২০,০০,০০০
হল্যাণ্ড	৭৫,২৭,০০০
নরওয়ে	২৭,৮৯,০০০
পোল্যাণ্ড	২,৭০,০০,০০০
পোর্টুগ্যাল	৬৪,০০,০০০
স্পেন	২,১৭,৬৩,০০০
সুইডেন	৬০,৭৪,০০০

এই সকল দেশে ইহাদের নিজেদের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া হয়।

কমিটি ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ভাবে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও উত্তম হইয়াছে। ছাত্রদের মত ছাত্রীরাও মানুষ। এইজন্য ছাত্রছাত্রী উভয়ের কতকগুলি সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা ছাড়া ছাত্রীদিগকে গার্হস্থ্য জীবনের উপযুক্ত করিবার জন্য এবং তাহাদের সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি বিষয় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কমিটির প্রস্তাব সমীচীন হইয়াছে। কমিটি ইংরেজী শিখাইবার জন্য যথোযোগ্য ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। ইউরোপের জার্মেনী প্রভৃতি দেশে কোন কোন ছাত্র ইস্কুলে সপ্তাহে অল্প কয়েক ঘণ্টা ইংরেজী পড়ে, অন্য সব বিষয় নিজেদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা করে। অথচ ঐ সব দেশের যাহারা ভারতবর্ষে অধ্যাপক, প্রত্নতাত্ত্বিক, বা অন্যবিধ বিশেষজ্ঞের কাজ লইয়া আসে, তাহারা এদেশে ইংরেজীতে নিজেদের কাজ বেশ চালায়। তাহার কারণ ইউরোপে ভাষা শিখাইবার প্রণালী উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশেও উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে ইংরেজী শিখাইলে আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্য সব বিষয় বাংলায় শিখিলেও তাহাদের ইংরেজীর জ্ঞান মন্দ হইবে না।

মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জন করা সহজ এবং

অপেক্ষাকৃত অল্পসময়সাপেক্ষ। আমরা সাড়ে দশ বৎসর বয়সে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিবার সময় ইংরেজী ইস্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্রদের সমান পাটীগণিত, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং জ্যামিতি জানিতাম। তদ্ভিন্ন (তাহারা তখন যাহা জানিত না সেই) পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, এবং পুরাবৃত্তসার অর্থাৎ প্রাচীন মিশর ফিনিসিয়া আসীরিয়া বাবিলোনিয়া প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতাম।

কমিটি পাঠ্যতালিকা হইতে সংস্কৃত বাদ না দিয়া ভাল করিয়াছেন। বিজ্ঞানেরও স্থান করিয়াছেন।

—

টেরারিস্ট দমনের নূতন নিয়মাবলী

গবন্মেণ্ট টেরারিষ্ট দমন করিবার জন্য কতকগুলি নূতন নিয়ম জারি করিয়াছেন। তাহাতে টেরারিষ্ট দমন হইবে কি-না জানি না, কিন্তু যাহাদের কাছে টেরারিষ্টের ট-ও অজ্ঞাত, এরূপ বিস্তর লোকের খুব অসুবিধা হইবে, তাহাদের উপর অত্যাচারও হইবার সম্ভাবনা আছে। নিয়মগুলি পাঠকেরা খবরের কাগজে দেখিয়া থাকিবেন।

—

পাঠান ও ভারতীয়

গত মে মাসে যখন বিলাতী পার্লেমেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয়, তখন উইং-কম্যাণ্ডার পদবী বিশিষ্ট জেম্স্ নামক একজন সভ্য তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন—

"Above all this must always be remembered in connection with the Frontier and the Pathans that the Pathans are not Indians. If you want to insult a Pathan you call him an Indian. He despises and dislikes the Indians. For a present purpose, he may combine with certain Indian factions, but that is bound to be a passing phase."

"উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও পাঠানদের সম্পর্কে সর্বোপরি এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, পাঠানরা ভারতবর্ষীয় নহে। যদি আপনি কোন পাঠানকে অপমান করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে ভারতীয় বলিবেন। সে ভারতীয়দিগকে না-পছন্দ ও অবজ্ঞা করে। বর্ত্তমান কোন প্রয়োজনে সে কোন কোন ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা অল্পকালস্থায়ী ব্যাপার।"

যদি পাঠানরা ভারতবর্ষীয় না-ই হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাজস্বের কোটি কোটি টাকা উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কাজ চালাইবার জন্য সেখানে ব্যয় করা কেন হয়? উহাকে যে গবর্নর-শাসিত নূতন প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছে, তাহা চালাইবার জন্ম বৎসরে ভারতীয়দের দেওয়া কোটি পরিমাণ টাকা ব্যয়িত হইবে। তাহারা ভারতীয় না-হইলে ইহার ন্যায্যতা কোথায়?

সকল পাঠান যে সকল ভারতীয়কে অবজ্ঞা করে না, তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রেস আইনের বর্ত্তমান ব্যাপকতা ও অনিশ্চিততা হেতু সে চেষ্টা করিব না। কেবল একটা কথা বলি। স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসু যখন আফগানিস্থান সীমান্তে কাজ করিতেন তখন কোনও রক্ষী না লইয়া পাঠান গ্রামসমূহে যাইতেন এবং পাঠানদের বাড়িতে বসিয়া গল্পগুজব করিতেন; পাঠানরা তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। তাহারা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিল, যে, তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই। তিনি পাঠানদের ভাষা পশ্‌তু উত্তমরূপে বলিতে পারিতেন। আমরা তাঁহাকে এলাহাবাদে তাঁহার এক পাঠান বন্ধুর সহিত পশ্‌তু ভাষায় গল্প করিতে দেখিয়াছি।



মন্দিরের পথে
(দ্বীপময় ভারতে)
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা